মুখতাসারুল মা'আনী

আরবি বাংলা

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ

মাওলানা মুহাম্মদ আবূ বকর কাসেমী
শিক্ষাসচিব, টঙ্গী দারুল উলূম মাদ্‌রাসা
চেরাগআলী, টঙ্গী, গাজীপুর

সম্পাদনায়

হযরত মাওলানা আহ্‌মদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭

পরিবেশক
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
মাওলানা মোঃ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

বর্ণবিন্যাস
আল-মাহমুদ কম্পিউটার হোম
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

হাদিয়া : ৩০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার,
ঢাকা- ১১০০

সম্পাদকের কথা

মুখতাসারুল মা'আনীর পরিচয় মাদরাসার কোনো ছাত্র শিক্ষকের নিকট অজানা নয়। কালে কালে গ্রন্থখানিকে সহজবোধ্য করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে অনেক। আরবি ভাষায় এ উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি। উর্দূ ভাষায়ও গ্রন্থখানির মর্মোদ্ধার ছাত্রদের নাগালের মধ্যে এনে দেওয়ার জন্য চেষ্টা-কোশেশ হয়েছে নানাভাবে।

ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার কাজ থেকে অনেকাংশে দূরে পড়ে থাকা আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলায়ও এর কিছুটা আংশিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কাজ হয়েছে ইতঃপূর্বে। কিন্তু বাংলা ভাষায় গ্রন্থখানির একটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক বিশ্লেষণধর্মী ভাষ্যগ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনেকে তীব্রভাবে অনুভব করে আসছিলেন, যাতে এর বিষয়বস্তু নিজ মাতৃভাষায় অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ কষ্টসাধ্য কাজটি আঞ্জাম দিতে অদম্য মনোবল নিয়ে এগিয়ে এনেছেন আমার আত্মজ-প্রতীম ছাত্র ও টঙ্গী দারুল উলূম মাদরাসার বর্তমান শিক্ষা সচিব মাওলানা আবূ বকর। তিনি গ্রন্থখানির মর্মোদ্ধার ও বিষয়বস্তুকে সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং আমার বিবেচনায় অনেকাংশে সফলও হয়েছেন। পরবর্তী সংস্করণে তিনি একে আরো বেশি সুন্দর ও পরিমার্জিত করার প্রতি প্রয়াসী হবেন বলে আমি আশা রাখি।

আল্লাহ তা'আলা ভাষ্যকার ও সম্পাদকের শ্রমটুকু কবুল করুন এবং এর দ্বারা ছাত্রবৃন্দকে উপকৃত করুন। এতে অযাচিত ও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে তা ক্ষমা করে দিন। আমীন।

আহমদ মায়মূন

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা- ১২১৭

লেখকের কথা

আল-হামদুলিল্লাহ! রাব্বুল আলামীনের অপার করুণায় কওমী মাদ্‌রাসার শিক্ষা কারিকুলামের অতিগুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কিতাব মুখতাসারুল মা'আনীর ভাষ্যগ্রন্থ (শরাহ্) লেখার কঠিন এক কাজ করার প্রয়াস পেয়েছি। ইলমে বালাগাত বিষয়ে রচিত আল্লামা তাফতাযানী (র.)-এর এ কিতাবটি বিভিন্ন কারণে দুর্বোধ্য। এর মর্মোদ্ধার করতে মেধাবী ছাত্রদেরও গলদগর্ম হতে হয়। অধিকন্তু এটি বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যাহ-এর সিলেবাসভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। কিতাবটি দুর্বোধ্য হওয়ায় এর বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীতা তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল দীর্ঘদিন যাবৎ। তা ছাড়া বহু কওমী মাদ্‌রাসায় এখন বাংলা মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। তাই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নীতিগতভাবে বাংলা ভাষ্যগ্রন্থ রচনার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও উস্তাদগণের সাথে পরামর্শ করত মুখতাসারুল মা'আনীর বাংলায় একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংকলনের কাজ হাতে নিয়েছিলাম বছর তিনেক আগে। পূর্ণ একবছর সময়ে তা احوال المسند পর্যন্ত সম্পন্ন হয়। এতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

ক. কিতাবের ইবারতের জটিল বিষয়গুলোকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে সহজ-সরল ভাষায়।

খ. বিশেষ বিবেচনায় গ্রন্থটির ইবারতের আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে।

গ. প্রথমে ইবারতের অনুবাদ, তারপর বিশ্লেষণ ও সবশেষে পুরো বিষয়ের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঘ. ইবারতে ব্যবহৃত تشبيه, استعارة ও كناية ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঙ. ইবারতের মাঝে سؤال مقدر (লুক্কায়িত আপত্তি) গুলো তুলে তার যথাযথ উত্তর প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এটি কোনো শরাহ-এর অনুবাদ নয়; বরং বিভিন্ন ভাষ্যগ্রন্থের সহায়তায় রচিত একটি মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ। কাজটি শুরু করেছিলাম উস্তাদগণের অনুপ্রেরণা, বন্ধু-বান্ধবের উৎসাহ ও ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে। তা ছাড়া বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, আমার লেখার জগতের পথপ্রদর্শক মান্যবর উস্তাদ প্রথিতযশা লেখক হযরত মাওলানা আহমদ মায়মূন (দা. বা.) মুদ্রণের পূর্বে এটি সম্পাদনা করবেন। আল-হামদু লিল্লাহ তা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ভাষ্যগ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে, তারপরেও যদি কোনো বিচ্যুতি থেকে থাকে তাহলে সম্মানিত ওলামায়ে কেরামের কাছে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল।

ভাষ্যগ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান যার তিনি হচ্ছেন ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী মাওলানা মোস্তফা সাহেব। ইসলামিয়া কুতুবখানার সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য বন্ধুবর মাওলানা আবুল কালাম মাসূমের অবদান কিছুতেই ভোলা যাবে না। যিনি প্রকাশনার প্রতিটি স্তরে এতে আন্তরিকতা পূর্ণ শ্রম দিয়েছেন। বিশেষভাবে (দু' বছর আগে পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়া) এর দ্রুত প্রকাশের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমার ছাত্রদের মধ্যে মুহাম্মদ মুখতার হুসাইন ও আরো কয়েকজন পাণ্ডুলিপি তৈরিতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। এছাড়া যারা আমার গড়ে উঠার পিছনে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন এবং আমার এ প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনার ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের অবদান এই মুহূর্তে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আল্লাহ সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। পরিশেষে মহান মাওলার দরবারে বিনীতভাবে কায়মনোবাক্যে এই দোয়া করছি হে আল্লাহ! আপনি অধমের এ শ্রমটুকু দয়া করে কবুল করুন এবং যাদের উদ্দেশ্য করে এটি লেখা হয়েছে একে তাদের পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়ার উপযুক্ত করে দিন। আল্লাহুম্মা আমীন।

আরজগুজার
মুহাম্মদ আবূ বকর
টঙ্গী দারুল উলূম মাদরাসা
টঙ্গী, গাজীপুর
তাং ১২ - ১১ - ২০০৫ ইং

ভূমিকা

ইলমুল বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র) মূলত তিনটি ইলমের (জ্ঞানের) সমষ্টি। ইলমুল বালাগাতের যে কোনো কিতাবে এই তিনটি ইলমের আলোচনা পর্যায়ক্রমে এসেছে। ইলম তিনটি হচ্ছে– ১. ইলমুল মা'আনী, ২. ইলমুল বায়ান ও ৩. ইলমুল বাদী'। নিম্নে এ তিনটি জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

১. عِلْمُ الْمَعَانِىْ : مَعَانِىْ শব্দটি مَعْنًى-এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে– উদ্দেশ্য, মর্ম ও তাৎপর্য।

পরিভাষায় : ইলমুল মা'আনী বলা হয় ঐ জ্ঞানকে, যার সাহায্যে আরবি বাক্যের ঐসব অবস্থা জানা যায়, যার দ্বারা বাক্যটি مُقْتَضٰى حَالْ (স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা) মোতাবেক হয়।

আল্লামা সাক্কাকীর মতে, বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও ভাষাপণ্ডিতদের রচনার বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসন্ধানকে مَعَانِىْ বলা হয়, যার দ্বারা সেসব বৈশিষ্ট্য জেনে নিজ কথাকে 'মুকতাযায়ে হাল'-এর অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়।

ইলমুল মা'আনীর আলোচ্য বিষয় : বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও ভাষাপণ্ডিতদের মুকতাযায়ে হাল অনুযায়ী রচিত বাক্যসমূহই ইলমুল মা'আনীর আলোচ্য বিষয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বাক্যকে মুকতাযায়ে হাল মোতাবেক গঠন করার ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি মুক্ত রাখা।

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : ইলমুল মা'আনীর উৎপত্তি সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, সর্বপ্রথম জা'ফর ইবনে ইয়াহইয়াহ বারমাকী (ইন্তেকাল : ১৮৭ হিজরি) এ বিষয়ে কিছু মূলনীতি তৈরি করেন। তবে তার এ মূলনীতিগুলো কোনো লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। তারপর আমর ইবনে বাহর ইবনে মাহবুব ইস্পাহানী (ইন্তেকাল : ২৫৫ হিজরি) যার উপনাম ছিল আবূ ওসমান এবং জাহিয নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি এ বিষয়টি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিন্যস্ত করেছেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ জন্য তাকে কেউ কেউ ইলমুল মা'আনীর জনক বলে থাকেন।

তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ "اَلْبَيَانُ وَالتَّبْيِيْنُ" এ বিষয়ে একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে সর্বজন সমাদৃত। তারপর শুরু হয় শায়খ আবূ বকর আব্দুল কাহির ইবনে আব্দুর রহমান জুরজানী (ইন্তেকাল : ৪৭১/৪৭৪ হিজরি)-এর যুগ। এ বিষয়ে তাঁর রচিত কালজয়ী গ্রন্থ "دَلَائِلُ الْاِعْجَازِ" এক অসামান্য কীর্তি। এ কিতাবে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সব আলোচনাকে একত্রিত ও সন্নিবেশিত করেছেন। তারপর শুরু হয় আবূ ইয়াকূব ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ সাক্কাকী (র.) (ইন্তেকাল : ৬২৬ হিজরি)-এর সময়কাল। তিনি ছিলেন একাধারে নাহু, সরফ, ফিক্‌হ, মানতিক ও বালাগাতের ইমাম। এক কথায় ইলমের সব শাখায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। তিনি তাঁর অনন্য গ্রন্থ مِفْتَاحُ الْعُلُوْمِ তিন খণ্ডে সমাপ্ত করেন। এর তৃতীয় খণ্ডে তিনি ইলমুল বালাগাতের তিনটি ইলম যথা ইলমুল মা'আনী, ইলমুল বায়ান ও ইলমুল বাদী' সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

২. عِلْمُ الْبَيَانِ : بَيَانٌ শব্দের অর্থ– স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। মনের ভাব প্রকাশের জন্য যে সুস্পষ্ট ও সাবলীল কথাবার্তা ব্যক্ত করা হয়, তাকেও بَيَانٌ বলা হয়।

পরিভাষায় : بَيَانٌ ঐ জ্ঞানকে বলা হয়, যার সাহায্যে একটি বিষয়কে একাধিকভাবে প্রকাশ করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। এর একেকটি পদ্ধতি অন্যটির তুলনায় উদ্দিষ্ট অর্থ আদায় করার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও উজ্জ্বলতর হয়। এ পদ্ধতিগুলো হলো تَشْبِيْه، اِسْتِعَارَةٌ ও مَجَازٌ ، كِنَايَةٌ ইত্যাদি।

আলোচ্য বিষয় : শব্দমালা এবং শব্দমালা দ্বারা গঠিত বাক্যাবলি, যেখানে মনের অভিব্যক্তির স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার বিচার করা হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : একটি বিষয়কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ করার যোগ্যতা অর্জন করা এ ইলমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : এ ইলমের জনকদের মধ্যে সীবওয়াইহ, খলীল ইবনে আহমদ, আবূ উবাইদাহ মা'মার ইবনে মুসান্না (র.) (ইন্তেকাল : ২০৯ হি.) প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। মা'মার ইবনে মুসান্না (র.) এ বিষয়ে "مَجَازُ الْقُرْاٰنِ" নামে একটি সমৃদ্ধ কিতাব লিখেন, এতে তিনি কুরআনের সকল বর্ণনা পদ্ধতি এবং রচনাশৈলীকে একত্রিত করার চেষ্টা করেন। আবূ আলী মুহাম্মদ ইবনে হাসান হাতেমী (র.) (ইন্তেকাল : ৩৮৮ হি.)-এর থেকে এ শাস্ত্রের ২য় যুগ শুরু হয়। তিনি

"سِرُّ الصِّنَاعَةِ وَاَسْرَارُ الْبَلَاغَةِ" নামে একটি কিতাব রচনা করেন। এ কিতাবের মাধ্যমে তিনি ইলমুল বয়ানের যথেষ্ট খেদমত আঞ্জাম দেন। তাঁর যুগের আরেকজন পণ্ডিত শামসুল মা'আনী কাবুস ইবনে দশমগীর (ইন্তেকাল : ৪০৩ হি.) كَمَالُ الْبَلَاغَةِ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেন।

তাঁদের পর আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে তাহির শরীফ রযী মূসাবী (ইন্তেকাল : ৪০৬ হিজরি) উল্লিখিত বিষয়ে দু'টি কিতাব লিখেন। এর একটি হলো تَلْخِيْصُ الْبَيَانِ عَنْ مَجَازَاتِ الْقُرْاٰنِ, অপরটি হলো مَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ কিতাবদ্বয়ে কুরআন ও হাদীস-এর অভিনব ইস্তিআরা (রূপক অর্থজ্ঞাপক) ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি এবং রাসূল ﷺ -এর অধিক অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ বাণী নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এরপর আবূ মুনসুর আব্দুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ ছা'আলিবী (ইন্তেকাল : ৪২৯ হি.) سِحْرُ الْبَلَاغَةِ وَسِرُّ الْبَرَاعَةِ নামে এ বিষয়ে একটি উত্তম কিতাব লিখেন। এরপর শায়খ আবূ বকর আব্দুল কাহির ইবনে আব্দুর রহমান জুরজানী (ইন্তেকাল : ৪৭৪ হিজরি) কর্তৃক রচিত اَسْرَارُ الْبَلَاغَةِ এবং আল্লামা জারুল্লাহ যমখশারী রচিত আসাসুল বালাগাহ্ (اَسَاسُ الْبَلَاغَةِ) এ বিষয়ে লিখিত প্রসিদ্ধতম কিতাব।

عِلْمُ الْبَدِيْعِ : بَدِيْع শব্দটি بَدَعَ الشَّيْءَ থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো– কোনো জিনিসকে উপমা বা নজিরবিহীন সৃষ্টি করা। সুতরাং بَدِيْع অর্থ হলো– অভিনব, নব উদ্ভাবিত, স্রষ্টা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সব কিছুকেই নজিরবিহীন সৃষ্টি করেছেন, তাই তাঁকে اَلْبَدِيْعُ বলা হয়। যেমন, কুরআনের আয়াত– بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আসমানসমূহ এবং জমিনের স্রষ্টা বা উদ্ভাবনকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা।

পরিভাষায় : بَدِيْع ঐ জ্ঞানকে বলা হয়, যার সাহায্যে বাক্যালঙ্কারের এমন সব নিয়ম-কানুন জানা যায়, যার প্রয়োগ বাক্যের ফাসাহাত ও বালাগাতের অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও সাহিত্য মানোত্তীর্ণ হওয়ার পর হয়।

আলোচ্য বিষয় : বাক্যালঙ্কারের এসব নিয়মনীতি সমৃদ্ধ ইবারতই এ বিষয়ের আলোচ্য বিষয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বিশুদ্ধ ও সাহিত্য মানোত্তীর্ণ বাক্যের মধ্যে অতিরিক্ত সৌন্দর্য মাধুর্য সৃষ্টি করা।

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : আমীরুল মু'মিনীন আবুল আব্বাস আল-মুরতাযী বিল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আল-মু'তায (ইন্তেকাল : ২৯৬ হিজরি) সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কলম ধরেন। তাঁর কিতাবের নাম اَلْبَدِيْعُ এটি কিছুকাল পূর্বে জার্মানে প্রকাশিত হয়েছে। জ্ঞানের এ শাখাটি তাঁর মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয় এবং তিনিই এ জ্ঞানের নাম "اَلْبَدِيْعُ" নির্বাচন করেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর কিতাবের শুরুতে লিখেন مَا جَمَعَ قَبْلِيْ فُنُوْنَ الْبَدِيْعِ اَحَدٌ 'আমার পূর্বে بَدِيْع বিষয়ে কেউ কলম ধরেনি।'

তিনি তাঁর কিতাবে ইলমে বদী'-এর সতেরোটি নিয়ম লিখে যান। তারপর কুদামা ইবনে জা'ফর (ইন্তেকাল : ৩৩৭ হিজরি) আরো তেরোটি নিয়ম বৃদ্ধি করেন। যার ফলে মোট ত্রিশটি নিয়ম হয়। তাঁর লিখিত কিতাবের নাম نَقْدُ النَّثْرِ। এতে তিনি قِيَاسٌ - حَدٌّ - وَصْفٌ ও رَسْمٌ-এর আলোচনা করেন। তাঁর আরেকটি কিতাবের নাম হলো نَقْدُ الشِّعْرِ। এ কিতাবে তিনি حَدُّ الشِّعْرِ - اَسْبَابُ جَوْدَةِ الشِّعْرِ - وَزْنُ قَافِيَه - تَرْصِيْع - تَمْثِيْل ـ تَشْبِيْه ـ مُبَالَغَه ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। তাঁর রচিত আরেকটি কিতাব রয়েছে, যার নাম جَوَاهِرُ الْاَلْفَاظِ।

পরবর্তীকালে আবূ হিলাল হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাহ্‌ল আসকারী صَنَاعَتْ-এর মধ্যে আরো সাতটি নিয়ম যোগ করেন। এতে صَنَاعَتْ-এর সংখ্যা দাঁড়ায় সাঁইত্রিশটি। তাঁর রচিত কিতাবের নাম "اَلصِّنَاعَتَيْنِ" কিতাবটি আলোচ্য বিষয়ের বিবেচনায় অদ্বিতীয়। তারপরে কাজি আবূ বকর বাকিল্লানী (ইন্তেকাল : ৪০৩ হিজরি) "اِعْجَازُ الْقُرْاٰنِ" নামে একটি কিতাব রচনা করেন। কিতাবটিতে তিনি ইলমে বাদী' সম্পর্কে তাঁর পূর্বসূরিদের মতামত পর্যালোচনা করে দলিলের সাহায্যে বিভিন্ন মতকে অগ্রাধিকার দেন। তারপর আবূ আলী হাসান ইবনে রাশীক কায়রাওয়ানী আয্‌দী (ইন্তেকাল : ৪৬৩ হিজরি) এবং শরফুদ্দীন আহমদ ইবনে ইউসুফ তীফাশী (ইন্তেকাল : ৬৫১ হিজরি) ইলমে বদী'-এর صناعت-এর আরো নিয়ম বৃদ্ধি করে তা সত্তরে উন্নীত করেন। এ ছাড়া ইবনে রাশীকের কিতাব "اَلْعُمْدَةُ فِيْ مَحَاسِنِ الشِّعْرِ وَاٰدَابِهٖ" ইবনে মুনকিয-এর কিতাব اَلتَّفْرِيْعُ فِى الْبَدِيْعِ এবং শায়খ হামাবীর কিতাব خَزَانَةُ الْاَدَبِ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তালখীসুল মিফতাহ্-এর লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম : মুহাম্মদ, উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ্, উপাধি আবুল মাআলী, জালালুদ্দীন ও কাযিল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি। তাঁর পিতার নাম– আব্দুর রহমান, উপনাম আবূ মুহাম্মদ। তিনি কাযবীনে ৬৬৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। এটি ইবনে হাজার আসকালানীর মত। অন্য মতে তাঁর জন্ম হলো ৬৬০ হিজরিতে। আল্লামা কাযবীনী হিজরি সপ্তম শতকের একজন বিখ্যাত (শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী) আলিম ছিলেন। খুবই অল্প বয়সে ইলমে ফিকহ্-এ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর রোমান সাম্রাজ্যের কোনো এক এলাকাতে বিচারক পদে নিয়োগ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। কিছুকাল পর তিনি জ্ঞানের শহর বলে খ্যাত দামেশ্‌কে আসেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশেষত আরবি সাহিত্য, মূলনীতিশাস্ত্র, ইলমে মা'আনী ও বায়ানে পারদর্শী হয়ে উঠেন। তিনি তখন সে যুগের বড় বড় আলিমদের থেকে ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি দামেশ্‌কের জামে মসজিদে খতিবের দায়িত্ব লাভ করেন। কিছুকাল পরে সুলতান নাসির তাঁকে সিরিয়ায় বিচারক নিযুক্ত করেন এবং সুলতান তাঁর যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করে দেন। এর কিছুকাল পরে মিসরে আল্লামা ইবনে জামাআর স্থানে বিচারকের দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি কবিতাও লিখতেন। তাঁর কিতাবে তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইন্তেকাল : এ জগদ্বিখ্যাত আলিম ১৫ই জুমাদাল উলা ৭৩৯ হিজরিতে ইহলোক পরিত্যাগ করে মহান রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান।

তাঁর রচনাবলি : তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলি হচ্ছে, তালখীসুল মিফতাহ্, আল-ঈযাহ্ ও আস-সূরুল মারজানী মিন শে'রিল আরজানী। এগুলোর মধ্যে তালখীস হলো আল্লামা সাক্কাকীর মিফতাহুল উলূমের ৩য় খণ্ডের সার-সংক্ষেপ, কিন্তু কিতাবটি লিখার পর দেখা গেল যে, অপ্রত্যাশিতভাবে কিতাবটি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তাই তিনি এর ব্যাখ্যাস্বরূপ একটি গ্রন্থ লিখেন, যার নাম হলো ঈযাহ্।

মুখতাসারুল মা'আনী গ্রন্থকারের জীবনালেখ্য

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

নাম : মাসউদ, **উপাধি :** সা'দ উদ্দীন। পিতার নাম ওমর, উপাধি : কাযী ফখরুদ্দীন। দাদার নাম : আব্দুল্লাহ্ এবং উপাধি : বুরহান উদ্দীন। তিনি ৭২২ হিজরির সফর মাসে তাফতাযান নামক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন।

তাফতাযান খুরাসানের অন্তর্গত একটি শহর। তবে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান رِيَاضُ الْمُرْتَاضِ কিতাবে তাঁকে نسا (নাসা)-এর অধিবাসী বলে মন্তব্য করেন। কথিত আছে যে, শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি খুব দুর্বল মেধাধিকারী ছিলেন। তাঁর উস্তাদ আযদুদ্দীন-এর দরসের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দুর্বল মেধার ছাত্র। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম ও কিতাব অধ্যয়নে তাঁর সমপর্যায়ের কেউ ছিল না। স্বপ্নযোগে রাসূল ﷺ-এর বরকত লাভ করে তিনি আশ্চর্য ধীশক্তির অধিকারী হন। আসুন তাঁর বর্ণনায় শোনা যাক– তিনি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক অপরিচিত লোক আমাকে বলছেন, সা'দ চলো সামান্য ঘুরে আসি। আমি বললাম, আমাকে তো ঘুরে বেড়ানোর জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরও কিতাব বুঝি না, আমি যদি ঘুরে বেড়াই, তবে আমার কি দশা হবে। একথা শুনে তিনি চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় আসলেন। এভাবে দু' তিনবার আসা-যাওয়ার পর তিনি বললেন, রাসূল ﷺ তোমাকে ডাকছেন। আমি হতভম্ব হয়ে খালি পায়ে তাঁর পেছনে চলতে চলতে শহরের বাইরে বৃক্ষ-লতা ঘেরা একস্থানে এসে উপনীত হলাম। সেখানে দেখলাম রাসূল ﷺ তাঁর কিছু সাহাবীদের নিয়ে অবস্থান করছেন। আমাকে দেখে তিনি মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে বললেন, "তোমাকে কতবার ডাকলাম; অথচ তুমি আসলে না।" আমি বললাম, হুযূর! আমিতো অবগত ছিলাম না যে, আপনি ডাকছেন। আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

এরপর আমি আমার মেধার দুর্বলতার কথা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, তুমি মুখ খোলো। আমি আমার মুখ খুললে তিনি তাঁর মুখের বরকতময় লালা আমার মুখগহ্বরে ফেললেন এবং দোয়া করে বিদায় দিলেন। জাগ্রত হওয়ার পর তিনি আযদুদ্দীন-এর মজলিসে উপস্থিত হলেন এবং পাঠদান শুরু হওয়ার পর তিনি উস্তাদকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তাঁর প্রশ্ন শুনে সহপাঠীরা এগুলো অবান্তর ও অনর্থক মনে করল; কিন্তু তাঁর উস্তাদ ঠিকই সেগুলো বুঝতে পারলেন এবং বললেন يَا سَعْدُ إِنَّكَ الْيَوْمَ غَيْرُكَ فِيْمَا مَضٰى অর্থাৎ হে সা'দ! আজ তুমিতো সেই (চির চেনা) পূর্বের সা'দ নও।

বিদ্যার্জন : তিনি বিভিন্ন আলিম ও পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তন্মধ্যে আযদুদ্দীন ও কুতুবুদ্দীন রাযীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা সমাপনের পর যুবা বয়সেই তাঁকে তৎকালীন বড় বড় বিদ্বানদের কাতারে গণ্য করা হতো। আল্লামা কাফাবী বলেন, তাঁর মতো বড় মাপের আলিম কেউ দেখতে পায়নি। লেখা-পড়া শেষ হওয়া মাত্রই তিনি অধ্যাপনার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্ররা হলো আব্দুল ওয়াসি' ইবনে খাযির, শায়খ শামসুদ্দীন ইবনে আহমদ হুফরী, আবুল হাসান বুরহান উদ্দীন প্রমুখ।

তাঁর রচনাবলি : আল্লামা তাফতাযানী (র.) বহুগ্রন্থ প্রণেতা, এখানে তাঁর কয়েকটি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হলো–

১. شَرْحُ تَصْرِيْفِ زَنْجَانِيْ এটি তাঁর রচিত প্রথম কিতাব, যা তিনি মাত্র ষোল বছর বয়সে লিখেছেন।
২. مُطَوَّلْ : এটি تَلْخِيْصُ الْمِفْتَاحِ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (রচনাকাল : ৭৪৮ হিজরি)।
৩. مُخْتَصَرُالْمَعَانِيْ এটি مُطَوَّلْ-এর সার সংক্ষেপ (রচনাকাল : ৭৫৬ হিজরি)।
৪. سَعْدِيَهْ এটি شَمْسِيَهْ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (রচনাকাল : ৭৫৭ হিজরি)।
৫. تَلْوِيْح এটি তুর্কিস্তানে অবস্থানকালে লিখেন।
৬. مَقَاصِدْ এটি আকিদার কিতাব।
৭. شَرْحِ مَقَاصِدْ এটি مَقَاصِدْ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
৮. شَرْحِ عَقَائِدِ نَسَفِيْ এটিও ইলমে কালামের উপর একটি কালজয়ী গ্রন্থ।

বড় বড় মনীষীদের দৃষ্টিতে আল্লামা তাফতাযানী : সায়্যিদ আহমদ তাহতাবী (র.) বলেন, তিনিই ছিলেন শীর্ষস্থানীয় হানাফী আলিম। আল্লামা কাফাবীর মতে, তিনি ছিলেন সে যুগের এক বিস্ময়কর প্রতিভা, তাঁর উপমা বড় বড় জ্ঞানীদের মাঝেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাঁর যোগ্যতা ও জ্ঞানের গভীরতা এ থেকে অনুমিত হয় যে, মীর সায়্যিদ শরীফ জুরজানীর মতো তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীগণও তাঁর কিতাবাদি ও যোগ্যতা দ্বারা উপকৃত হতেন। শাহ্ সুজা-এর দরবারে তিনি বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। এরপর তিনি তৈমূর লং-এর দরবারে صَدْرُ الصُّدُوْر নির্বাচিত হন। সম্রাট তৈমূর তাঁর খুবই গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তিনি তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি যখন তালখীস-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ مُطَوَّلْ লিখে সম্রাটের দরবারে পেশ করলেন, তখন সম্রাট এটি খুবই পছন্দ করলেন এবং বহুদিন ধরে সেটিকে হিরাত দুর্গের ফটকে (সদর দরজা) সম্মানের প্রতীক রূপে রাখা হয়।

মীর সায়্যিদ শরীফ এবং আল্লামা তাফতাযানীর তর্কযুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া শীর্ষক একটি পর্যালোচনা : এ বিষয়টি স্বীকৃত সত্য যে, আল্লামা তাফতাযানী এবং মীর সায়্যিদ শরীফ (র.) উভয়েই সে যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রতুল্য ছিলেন। তাঁদের পরে ইলমে হাদীস ছাড়া অন্যান্য ইলম যথা– সাহিত্য, তর্ক, কালাম, নাহু শাস্ত্রে তাঁদের মতো অভিজ্ঞ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আলিম অতিক্রান্ত হয়নি। তাঁরা ছিলেন মুহাক্কিক বা বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ আলিমকূলের মোহর। এদের মধ্যে তর্কশাস্ত্র, ইলমে কালাম, সাহিত্য ও ইলমে ফিকহ্-এর মধ্যে আল্লামা তাফতাযানী এক কদম অগ্রগামী ছিলেন। মীর সায়্যিদ শরীফ দীর্ঘকাল পর্যন্ত আল্লামা তাফতাযানীর অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণা ও রচনাতে তাফতাযানীর দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে উপকৃতও হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তৈমূর লং-এর দরবারে সভাসদ হন তখন তাদের মাঝে জ্ঞান বিষয়ক বিতর্কের কারণে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এসব বিতর্ক মাঝে মাঝে তাদের মনোমালিন্যের কারণ হতো। এমনকি একটি বিতর্কে নু'মান মু'তাযেলী বিচারকরূপে তাফতাযানীর বিপক্ষে ফয়সালা করেন। যার ফলে তিনি খুবই মর্মাহত হন। কেননা, তাফতাযানী সকলের কাছেই খ্যাতিমান ব্যক্তিরূপে মর্যাদা পেয়ে আসছিলেন, আর জুরজানী ছিল ছাত্রতুল্য। এছাড়া তৈমূর লং-এর দরবারে মীর সায়্যিদ শরীফ তাফতাযানীর হাত ধরেই এসেছিলেন। ইত্যাদি বহুবিদ কারণে তাঁর মর্ম বেদনা দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে যান। চিকিৎসা করা সত্ত্বেও তিনি আর পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেননি।

অবশেষে ৭৯২ হিজরির ২২-শে মহররম রোজ সোমবার সমরকান্দে ইন্তেকাল করেন। সেখানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। কারো মতে তাঁর ইন্তেকাল সন ৭৯১ হিজরি আবার কারো মতে ৭৯৭ হিজরি। তবে প্রথমোক্ত মতই বিশুদ্ধ।

মাযহাব : মীর সায়্যিদ শরীফ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এটা নিশ্চিত আল্লামা তাফতাযানী সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায়। **এক.** হানাফী মাযহাবের অনুসারী, **দুই.** শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। উভয় মতের সমর্থনে দলিল রয়েছে, তবে তাঁর হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার পক্ষে মতামত বেশি জোরালো।

শেষকথা : আল্লামা তাফতাযানী (র.) ছিলেন তাঁর যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইলমের প্রতিটি শাখায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ ও অতুলনীয়। তিনি তাঁর জ্ঞানকে উত্তরসূরিদের মাঝে রেখে যাওয়ার জন্য বহু কিতাব রচনা করেন। তাঁর কিতাব ও ইলমের মাধ্যমে তিনি আমাদের মাঝে অমর হয়ে আছেন। আল্লাহ তাঁকে তাঁর কীর্তির জন্য উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُكَ يَا مَنْ شَرَحَ صُدُوْرَنَا لِتَلْخِيْصِ الْبَيَانِ فِيْ اِيْضَاحِ الْمَعَانِيْ وَنَوَّرَ قُلُوْبَنَا بِلَوَامِعِ التِّبْيَانِ مِنْ مَطَالِعِ الْمَثَانِيْ ـ

অনুবাদ : আমরা আপনার প্রশংসা করছি, হে মহান সত্তা! যিনি মর্মকে সুস্পষ্ট করার সাথে সাথে মনের ভাবকে সংক্ষেপে প্রকাশের জন্য আমাদের বক্ষকে উন্মোচিত (অর্থাৎ আমাদের আত্মাকে প্রস্তুত) করেছেন। আর আমাদের অন্তঃকরণকে এমন সুস্পষ্ট ও প্রমাণসমৃদ্ধ বয়ান দ্বারা আলোকিত করেছেন, যা কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে প্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ نَحْمَدُ : এটি باب سمع-এর মাসদার حَمْدٌ থেকে উদ্ভূত, مضارع معروف-এর جمع متكلم-এর সীগাহ। حَمْد শব্দের অর্থ হলো هُوَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ لِلْجَمِيْلِ অর্থাৎ কারো সুন্দর গুণাবলির প্রশংসা মুখের ভাষা দ্বারা করা। يا শব্দটি حرف ندا।

شَرَحَ : (باب فتح) অর্থ– খোলা, উন্মোচন, উন্মুক্ত করা ইত্যাদি। তবে এখানে প্রস্তুত বা তৈরি করা অর্থে ব্যবহার হতে পারে।

صُدُوْرٌ শব্দটি صَدْرٌ-এর বহুবচন, অর্থ– বুক বা বক্ষ। তবে এখানে রূপক অর্থে বুক দ্বারা বুকের অভ্যন্তরীণ কলব, তারপর কলব দ্বারা রূহ বা আত্মাকে বুঝানো হয়েছে। تَلْخِيْص শব্দের অর্থ– সংক্ষেপকরণ। পরিভাষায় هُوَالْكَلَامُ الْخَالِيْ عَنِ الْحَشْوِ وَالزَّائِدِ (অতিরিক্ত ও অনর্থক কথা থেকে মুক্ত বাক্য)-কে তালখীস বলা হয়।

اَلْبَيَانِ : শব্দের অর্থ– প্রকাশ করা, বর্ণনা করা। পরিভাষায় هُوَ الْكَلَامُ الْفَصِيْحُ الْمُعْرِبُ عَمَّا فِى الضَّمِيْرِ অর্থাৎ মনের ভাব প্রকাশের জন্যে মানুষ যে সাবলীল কথা বলে, তাকে بيان বলা হয়। اِيْضَاح শব্দের অর্থ– সুস্পষ্ট করা, প্রকাশ করা। نور শব্দটি (باب تفعيل)-এর একটি فعل, অর্থ– আলোকিত করা, আলো দান করা। لَوَامِعْ শব্দটি لَمْعَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– আলো দানকারী যেমন : চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। تبيان শব্দের অর্থ– প্রমাণসমৃদ্ধ বয়ান। لَوَامِعُ التِّبْيَانِ-এর মধ্যে اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهِ اِلَى الْمُشَبَّهِ হয়েছে, অর্থাৎ এমন বয়ান যা নক্ষত্রের মতো পথহারাকে পথ দেখায়।

مَطَالِعْ : শব্দটি مَطْلَعٌ-এর বহুবচন। অর্থ– তারকারাজি উদয়ের স্থান। এখানে কুরআনের আয়াত উদ্দেশ্য– যেগুলোকে তারকারাজির উদয়ের স্থানের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। কেননা, যেমন উদয়স্থান থেকে তারকারাজি উদিত হয় তেমনি আয়াতসমূহ থেকে অর্থ ও মর্ম প্রকাশ পায়।

اَلْمَثَانِيْ : শব্দটি مَثْنٰى-এর বহুবচন। অর্থ– দুই দুই অথবা যা বারবার পাঠ করা হয়। এখানে কুরআন উদ্দেশ্য।

نَحْمَدُكَ এই ইবারতের দ্বারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রশংসা উদ্দেশ্য। তবে তো এখানে حَمْد শব্দের পরিবর্তে شُكْر শব্দটি ব্যবহার করা যেত। কেননা, شُكْر নিয়ামতের পরিবর্তেই ব্যবহার হয়। কিন্তু লেখক কেন حَمْد-কে ব্যবহার করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, তিনি তিনটি কারণে এখানে এরূপ করেছেন।

১. পবিত্র কুরআনুল কারীমের অনুসরণ করার জন্যে। কারণ কুরআন اَلْحَمْدُ দ্বারা শুরু হয়েছে,

২. হাদীসের উপর আমল করার জন্যে। কেননা, হাদীসে আছে যে, كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ اَجْزَمُ অর্থাৎ যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ حَمْدُ اللّٰهِ বা আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করা হয় না তা অপূর্ণাঙ্গ,

৩. প্রশংসা করার জন্যে شُكْر শব্দের চেয়ে حَمْد শব্দটি বেশি কার্যকর। কেননা, شُكْر তো মুখ দ্বারা হতে পারে আবার মুখ ছাড়াও হতে পারে। যেমন অন্তর দ্বারা এবং আচার-আচরণ দ্বারা। شُكْر-এর এ দু' প্রকার প্রকাশ্য নয় এবং এতে

অস্পষ্টতা বিদ্যমান। আর حَمْد (যা মুখ দ্বারা করা হয়) সবসময়ই প্রকাশ্য। তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে شُكْر-এর চেয়ে حَمْد স্পষ্টতর। তাই তিনি حَمْد ব্যবহার করেছেন।

লেখক তার (نَحْمَدُكَ) বাক্যে جملة فعلية مضارعية-কে বাদ দিয়ে جملة فعلية ماضية ও جملة اسمية ব্যবহার করেছেন, এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো প্রশংসা যেন সব সময় এবং বারবার হয়। যেহেতু ماضى কেবল অতীতের সাথে সম্পর্ক রাখে, আর جملة اسمية-এর সম্পর্ক যদিও دَوَامٌ-এর সাথে, কিন্তু তার মাঝে تَجَدُّدْ-এর অর্থ নেই। আর جملة فعلية مضارعية-এর মধ্যে دَوَامٌ-এর সাথে تَجَدُّدْ অর্থাৎ নবায়ন বা বারবার হওয়ার বিষয়টিও সংযুক্ত।

এখানে مَحْمُوْد عَلَيْهِ হলো দু'টি নিয়ামত এক. شَرْحُ الصُّدُوْرِ দুই. تَنْوِيْرُ الْقُلُوْبِ যেহেতু এগুলোর মধ্যে تَجَدُّدْ বা নবায়ন হবে, তাই حَمْد-এর মধ্যে تَجَدُّدْ বা নবায়ন থাকাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

এরপর লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, লেখক আল্লাহ তা'আলার নাম ব্যবহার না করে (অর্থাৎ نَحْمَدُ اللّٰهَ না বলে) তার পরিবর্তে ك যমীর দ্বারা আল্লাহকে সম্বোধন করে প্রশংসা করেছেন, যাতে প্রশংসাকারী ও প্রশংসিত ব্যক্তির মাঝে সম্পর্কের ঘনিষ্টতা বুঝানো যায়।

قَوْلُهُ فِىْ اِيْضَاحِ الْمَعَانِىْ : এখানে فِىْ শব্দটি مَعَ অর্থে হতে পারে, যেমন কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। اُدْخُلُوْا فِىْ أُمَمٍ اَىْ مَعَ اُمَمٍ এ অর্থ নিলে ঐ কথার প্রতি ইঙ্গিত হয় যে, اِيْضَاحْ مَعَانِىْ হলো مَقْصُوْدٌ بِالذَّاتِ কারণ مَعَ টা সব সময় مَقْصُوْد-এর উপর دَاخِلْ হয়। অথবা فِىْ এখানে لَامْ-এর অর্থে হতে পারে অথবা عِنْدَ-এর অর্থে ব্যবহার হতে পারে।

এখানে লক্ষণীয় যে, লেখক যেহেতু تَلْخِيْصُ الْبَيَانِ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তাই শব্দটির আভিধানিক অর্থের প্রতি খেয়াল করে কারো এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, কিতাবটিতে সম্পূর্ণভাবে اِيْضَاحْ مَعَانِىْ থাকবে না। তাই এরপর اِيْضَاحُ الْمَعَانِىْ শব্দটি উল্লেখ করে সে ধারণার অবসান ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ কিতাবটির বর্ণনাভঙ্গি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির হলেও এর অর্থ স্পষ্ট ও বোধগম্য।

তা ছাড়া মুসান্নিফ (র.)-এর ইবারত দ্বারা صَنْعَةْ بَرَاعَةْ اِسْتِهْلَالْ ও হয়েছে। صَنْعَةْ بَرَاعَةْ اِسْتِهْلَالْ বলা হয় খুতবা বা ভূমিকার মধ্যে এমন সব শব্দের সমাহার ঘটানো, যার দ্বারা বক্ষ্যমাণ কিতাবের কোনো পরিভাষা (اِصْطِلَاحْ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, অথবা কিতাব যে বিষয়ে রচিত– তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, অথবা আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্ন কিতাবের নাম খুতবার মধ্যে উল্লেখ করে সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, মুসান্নিফ (র.) তাঁর খুতবায় فَصَاحَةْ - بَلَاغَةْ শব্দদ্বয় দ্বারা কিতাবের পরিভাষাগত শব্দের প্রতি, اَلْبَيَانُ দ্বারা কিতাবের বিষয়ের প্রতি এবং تَلْخِيْص, اِيْضَاحْ, تِبْيَانٌ, دَلَائِلُ الْاِعْجَازِ, اَسْرَارُالْبَلَاغَةِ, الْمَعَانِىْ- এসব শব্দ দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বড় বড় কিতাবের নামের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

وَنُصَلِّيْ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ الْمُؤَيَّدِ دَلَائِلُ اِعْجَازِهٖ بِاَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ ـ

অনুবাদ : আর আমরা দরূদ ও সালাম পেশ করছি আপনার নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি, যাঁকে বালাগাতের সূক্ষ্ম-বিষয়াদি সমৃদ্ধ মু'জিযা দ্বারা শক্তিশালী ও প্রমাণিত করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ نُصَلِّيْ : باب تفعيل-এর مضارع-এর جمع متكلم-এর সীগাহ, صَلَاةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- দোয়া। রাসূল ﷺ -এর হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ উক্ত হাদীসের শেষাংশে فَلْيُصَلِّ শব্দটি দোয়া করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে কুরআনে وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ (এ আয়াতটিও) দোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীতে صَلَاةٌ শব্দটি مجاز مرسل হিসাবে নামাজ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা, নামাজের মধ্যেও দোয়া আছে। কোনো কোনো অভিধানবেত্তার মতে صَلَاةٌ শব্দটি বিভিন্ন দিকে নিসবত করা হলে তার অর্থ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে-

১. صَلَاةٌ শব্দটি আল্লাহর দিকে নিসবত করা হলে এর অর্থ হবে- রহমত। যেমন- صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ

২. যদি এর নিসবত ফেরেশতার প্রতি হয় তবে এর অর্থ হবে- اِسْتِغْفَارٌ বা ক্ষমা প্রার্থনা করা, দোয়া করা।

৩. আর যদি তা মু'মিনের প্রতি নিসবত করা হয়, তাহলে অর্থ হবে- রহমত অথবা ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৪. আর যদি পশু-পাখির প্রতি নিসবত হয়, তবে এর অর্থ হবে- তাসবীহ পাঠ করা।

قَوْلُهٗ نَبِيٌّ : نَبِيٌّ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো اَنْبِيَاءُ অর্থ- নবী বা আল্লাহর বার্তাবাহক, যিনি পৃথিবীতে আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। نَبِيٌّ শব্দটির لام كلمه তে হামযা ছিল, একে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে ياء-কে ياء-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। نَبِيٌّ শব্দটির মূল হলো نَبَأٌ এর অর্থ- উঁচু হওয়া ও সংবাদ দেওয়া। নবীগণ সংবাদ দিয়ে থাকেন এবং তাঁরা উঁচু মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন, এ জন্যে তাঁদেরকে نَبِيٌّ বলা হয়।

مُحَمَّدٌ : অর্থ- অধিক প্রশংসিত, এটি রাসূল ﷺ -এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত নাম।

اَلْمُؤَيَّدُ : এটি (باب تفعيل-এর) اسم مفعول-এর صيغه, تَايِيْد অর্থ- সাহায্য করা, শক্তিশালী করা। تركيب-এর মধ্যে এটি مُحَمَّدٌ-এর صفت হয়েছে।

دَلَائِلُ শব্দটি دَلِيْلٌ-এর বহুবচন, যেমন وَصِيْدٌ-এর বহুবচন وَصَائِدُ তবে فَعِيْلٌ-এর বহুবচন فَعَائِلُ-এর ওজনে হওয়া خلاف قياس (নিয়ম বহির্ভূত)।

কেউ কেউ বলেন, এটা دلالة-এর বহুবচন।

اِعْجَازٌ : শব্দের অর্থ হলো- অন্যকে অক্ষম করে দেওয়া। এখানে اِعْجَازٌ শব্দটি مُعْجِزَةٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مُعْجِزَةٌ বা অলৌকিক ঘটনা হলো মানুষের সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির উর্ধ্বের কিছু, যা মানুষকে তার মোকাবিলা করতে অক্ষম সাব্যস্ত করে। مُعْجِزَةٌ নবীর সত্যতা প্রমাণ করে। সুতরাং ইবারত অর্থের দিক থেকে এমন اَلْمُؤَيَّدُ دَلَائِلِ صِدْقِهٖ অর্থাৎ তাঁর সত্যতার প্রমাণ দ্বারা তাকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ بِاَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ : এখানে اَسْرَارٌ শব্দটি سِرٌّ-এর বহুবচন, অর্থ- গুপ্ত রহস্য বা ভেদ। এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐসব বিষয়, যাকে حال চায়। اَسْرَارٌ বলার কারণ, যেহেতু জ্ঞানী লোক ছাড়া অন্য কেউ এগুলো সম্পর্কে অবগত নয়, তাই এগুলোকে اَسْرَارْ বলা হয়েছে।

"بَلَاغَةٌ" -এর অর্থ : هُوَ مُطَابَقَةُ الْكَلَامِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ مَعَ فَصَاحَتِهٖ অর্থ- বাক্য সাবলীল হওয়ার সাথে সাথে তা مُقْتَضٰى حَالٍ-এর অনুযায়ী হওয়া।

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْمُحْرِزِيْنَ قَصَبَاتِ السَّبْقِ فِىْ مِضْمَارِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَرَاعَةِ وَبَعْدُ فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ اِلَى اللّٰهِ الْغَنِيِّ مَسْعُوْدُ بْنُ عُمَرَ الْمَدْعُوُّ بِسَعْدِ التَّفْتَازَانِىْ هَدَاهُ اللّٰهُ سَوَاءَ الطَّرِيْقِ ـ

অনুবাদ : এবং (দরূদ ও সালাম) তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের প্রতি, যারা সাবলীন বাচন ও শ্রেষ্ঠত্বের ময়দানে বিজয়ী হয়েছেন। হামদ্ ও সালাতের পর, অমুখাপেক্ষী মহান আল্লাহর প্রতি অধম ও মুখাপেক্ষী বান্দা অর্থাৎ মাসউদ ইবনে ওমর ওরফে সা'দ তাফতাযানী আল্লাহ তাঁকে সরলপথ প্রদর্শন করুন–

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ الْمُحْرِزِيْنَ : এটি اَلْ এবং اَصْحَابْ থেকে صفت হয়েছে, مُحْرِزِيْن শব্দটি مُحْرِزْ-এর বহুবচন, অর্থ হলো– অধিকর্তা বা অধিকারী।

قَوْلُهُ قَصَبَاتِ السَّبْقِ : قَصَبَاتٌ শব্দটি قَصَبَةٌ-এর বহুবচন, قَصَبَةٌ বলা হয় ঐ ছোট তীরকে যা প্রতিযোগিতার ময়দানের শেষপ্রান্তে পুঁতে রাখা হয়। এ জন্য যে, অশ্বারোহীদের মধ্যে যে বিজয়ী হবে সেই সে তীরটি নেবে।

سَبْق অর্থ– বিজয়ী হওয়া। সুতরাং قَصَبَاتُ السَّبْقِ-এর অর্থ ঐ তীর যা বিজয়ী হওয়ার উপর চিহ্ন বহন করে।

مِضْمَارْ অর্থ– প্রতিযোগিতার মাঠ। যেহেতু تَضْمِيْر করা ঘোড়া সে ময়দানে দৌড়ানো হতো, তাই একে مِضْمَارْ বলা হয়। تَضْمِيْر অর্থ হলো, প্রতিযোগিতার জন্যে কোনো একটি ঘোড়া নির্বাচন করে এটিকে প্রথমে খাইয়ে মোটাতাজা করা, তারপর সেটাকে বদ্ধ ঘরে রেখে চর্বি কমিয়ে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করা।

اَلْفَصَاحَةُ : অর্থ– প্রকাশিত হওয়া, স্পষ্ট হওয়া। পরিভাষায় فَصَاحَتْ বলা হয়– خُلُوْصُ الْكَلَامِ مِنْ تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ وَضُعْفِ التَّالِيْفِ وَالتَّعْقِيْدِ الْمَعْنَوِىْ مَعَ فَصَاحَتِهٖ অর্থাৎ কোনো একটি বাক্য تَنَافُرُ كَلِمَاتْ, ضُعْف تَالِيْف ও تَعْقِيْد مَعْنَوِى থেকে মুক্ত হওয়া– কালামটি ফসীহ হওয়ার সাথে সাথে।

اَلْبَرَاعَةُ : শব্দের অর্থ হলো উচ্চ মর্যাদা লাভ করা, সমসাময়িক লোকদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা।

بَعْدُ : শব্দটি এখানে ضمه-এর উপর مبنى, এর مضاف اليه শাব্দিকভাবে উহ্য হলেও মনে মনে আছে। অর্থাৎ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ

فَيَقُوْلُ : এখানে মুসান্নিফ غيب-এর صيغه ব্যবহার করেছেন; অথচ তিনি খুতবা শুরু করেছিলেন تكلم-এর صيغه দ্বারা। সুতরাং يَقُوْلُ-এর মধ্যে اِلْتِفَاتٌ مِنَ التَّكَلُّمِ اِلَى الْغَائِبِ হলো। এখানে এ اِلْتِفَاتْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো غيب-এর মাধ্যমে আবদিয়াত বা দাসত্বের পরাকাষ্ঠা রাব্বুল আলামীনের সামনে পেশ করা।

اَلْفَقِيْرُ : শব্দটি فعيل -এর ওজনে صفة مشبه এবং مبالغه-এর জন্যে আসে। فَقْر অর্থ হলো– মুখাপেক্ষিতা। সুতরাং فَقِيْر অর্থ হবে সব সময় ও চরম মুখাপেক্ষী, মূলত মানুষ মাত্রই সকলে আল্লাহর প্রতি সর্বদা চরম মুখাপেক্ষী। যেমন, আল্লাহর বাণী– يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী।

قَوْلُهُ اِلَى اللّٰهِ الْغَنِيِّ : এ ইবারতের মধ্যে اَلْغَنِيُّ শব্দটি আল্লাহর صفت (সিফত)। অর্থ হলো– অমুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহ যাবতীয় প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে। তাই তাঁর কোনো মুখাপেক্ষিতা নেই।

مَسْعُوْدُ بْنُ عُمَرَ : মুসান্নিফ (র.)-এর নাম, এটি اَلْعَبْدُ الْفَقِيْرُ থেকে بدل অথবা عطف بيان হয়েছে।

اَلْمَدْعُوُّ بِسَعْدِ التَّفْتَازَانِىْ : তিনি সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী নামে খ্যাত ও পরিচিত ছিলেন।

تَفْتَازَانْ : বর্তমানে ইরানের খুরাসানের অন্তর্গত একটি জনপদের নাম। (তাঁর জন্ম :৭১২ হি. ইন্তেকাল : ৭৯১ হি.)

قَوْلُهُ هَدَاهُ اللّٰهُ سَوَاءَ الطَّرِيْقِ : هِدَايَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– রাস্তা দেখানো, هِدَايَةٌ শব্দটির সাধারণত দু'টি مفعول হয়ে থাকে, এর মধ্যে দ্বিতীয় مفعول-এর প্রতি هِدَايَةٌ শব্দটি কখনো حرف جر-এর সাহায্যে متعدى হয়, কখনো حرف جر ছাড়াই দ্বিতীয় مفعول-এর প্রতি متعدى হয়। দ্বিতীয় প্রকারের هداية-এর অর্থ হলো اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ বা কাউকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। আর প্রথম অর্থাৎ حرف جر-এর সাহায্যে হলে তার অর্থ হবে اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ তথা রাস্তা দেখানো, বা দেখিয়ে দেওয়া। سَوَاءَ الطَّرِيْقِ-এর মধ্যে اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে অর্থাৎ বাক্যটি অর্থগতভাবে এরূপ হবে– هَدَاهُ اللّٰهُ اِلَى الطَّرِيْقِ السَّوِيِّ الْمُسْتَقِيْمِ

وَاَذَاقَهُ حَلَاوَةَ التَّحْقِيْقِ قَدْ شَرَحْتُ فِيْمَا مَضٰى تَلْخِيْصَ الْمِفْتَاحِ وَاَغْنَيْتُهُ بِالْاِصْبَاحِ عَنِ الْمِصْبَاحِ وَ اَوْدَعْتُهُ غَرَائِبَ نُكَتٍ سَمَحَتْ بِهِ الْاَنْظَارُ وَ وَشَّحْتُهُ بِلَطَائِفِ فِقَرٍ سَبَكَتْهَا يَدُ الْاَفْكَارِ ـ

অনুবাদ : এবং তাহকীক তথা (তত্ত্ব-গবেষণা)-এর সুমিষ্ট স্বাদ আস্বাদন করান। (তিনি) বলেন, অতীতে আমি তালখীসুল মিফতাহ-এর ব্যাখ্যা (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) লিখেছি এবং এটিকে প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো (অর্থাৎ তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মুতাওয়াল') দিয়ে অন্যান্য আলো (অর্থাৎ অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছি। আমি এতে সেসব দুর্লভ সূক্ষ্ম বিষয়কে সন্নিবেশিত করেছি, যেগুলোকে আমার চিন্তা-ভাবনা আমাকে দান করেছে অর্থাৎ আমার চিন্তাপ্রসূত। আমি সেটিকে বিরল অভিনব ছন্দ ও অন্তর্মিলসম্পন্ন বাক্য দ্বারা সুসজ্জিত করেছি, যেগুলো আমার চিন্তা-গবেষণার ফসল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاَذَاقَهُ حَلَاوَةَ التَّحْقِيْقِ : এখানে تحقيق-এর দু'টি অর্থ- ১. কোনো জিনিসকে সত্য সত্য উপস্থাপন করা, ২. কোনো মাসআলা বা বিষয়কে দলিল দ্বারা প্রমাণিত করা। এ বাক্যটিতে দু'ধরনের تشبيه-এর সম্ভাবনা রয়েছে। تشبيه দু'টির আলোচনার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ تشبيه ও استعارة-এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ-এর বিবরণ এখানে দেওয়া হলো।

একটি বিষয়কে অন্য আরেকটি বিষয়ের সাথে তুলনা করা বা উপমা দেওয়াকে تشبيه বলা হয়। যাকে উপমা দেওয়া হয়, তাকে مشبه বলা হয়। আর যার সাথে উপমা দেওয়া হয়, তাকে مشبه به বলা হয়। আর যে বিষয়ের কারণে বা মাধ্যমে উপমা দেওয়া হয়, তাকে وجه تشبيه বলা হয়। যেমন- দাঁতকে উপমা দেওয়া মুক্তার সাথে উজ্জ্বলতার ভিত্তিতে। উক্ত উপমার মধ্যে দাঁত হলো مشبه মুক্তা হলো مشبه به আর وجه شبه হলো উজ্জ্বলতা।

مجاز বলা হয় কোনো শব্দ তার মূল অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হওয়া, আর কোনো শব্দ যদি মূল অর্থ ছেড়ে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় আর মূল অর্থ ও রূপকার্থের মাঝে علاقة হয় تشبيه বা উপমা, তবে উক্ত مجاز-কে استعاره বলা হয়। استعاره মূলত تشبيه-কেই বলা হয়, তবে استعاره-এর মধ্যে مشبه ومشبه به-এর কোনো একটি, وجه تشبيه ও اداة تشبيه (এ তিনটি) উহ্য থাকে; কিন্তু تشبيه-এর মধ্যে তা হয় না। استعاره-এর উল্লেখযোগ্য প্রকারগুলো হচ্ছে, ১. مصرحه ২. كنايه/ مكنيه ৩. تخييليه ৪. مرشحة ৫. مجردة ৬. مطلقة ৭. اصليه ৮. تبعيه। এখানে প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা দেওয়া হলো-

১. مصرحه বলা হয় ঐ استعاره-কে যার মধ্যে শুধুমাত্র مشبه به উল্লেখ থাকে। যেমন- فَامْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِنْ نَرْجِسٍ এ কবিতায় مشبه به হিসেবে لؤلؤ এবং نرجس -কে উল্লেখ করা হয়েছে, এর مشبه হলো অশ্রু এবং চোখ।

২. مكنية বলা হয় ঐ استعارة-কে যার মধ্যে مشبه উল্লেখ থাকে এবং مشبه به উহ্য থাকে, যা আবশ্যিক, তবে مشبه به-এর কোনো لازم উল্লেখ করে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। যেমন- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ এ আয়াতে ذل-কে طائر (পাখি)-এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, এরপর مشبه به-কে উহ্য রাখা হয়েছে এবং مشبه به-এর লাযেম جناح-কে উল্লেখ করে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. تخييلية বলা হয় ঐ استعارة কে, যার মধ্যে مشبه به-এর কোনো لازم-কে مشبه-এর জন্য সাব্যস্ত করা হয়, যেমন- উপরের উদাহরণে الذل-এর জন্য جناح-কে সাব্যস্ত করার দ্বারা تخييلية হয়েছে।

৪. مرشحه বলা হয় ঐ استعاره-কে, যার মধ্যে مشبه به-এর কোনো মুনাসিব বা সংশ্লিষ্ট-সম্পর্কিত জিনিসকে উল্লেখ করা হয়। যেমন- أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ এ আয়াতে اشتراء হলো مشبه به, এর مشبه হলো استبدال, এরপর مشبه به-এর مناسب শব্দ تجارة এবং ربح-কে উল্লেখ করা হয়েছে مرشحة হিসেবে।

৫. مجردة বলা হয় ঐ استعارة-কে, যার মধ্যে مشبه-এর কোনো সংশ্লিষ্ট জিনিসকে উল্লেখ করা হয়। যেমন- فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ এ আয়াতে لباس হলো مشبه به আর مشبه হলো ক্ষুধা ও ভয়ের সময় মানুষের যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, আর اذاقة হলো مشبه-এর مناسب।

৬. مطلقة বলা হয় ঐ استعارة-কে, যার মধ্যে مشبه ও مشبه به-এর মধ্যে কোনোটার সংশ্লিষ্ট বিষয়কে উল্লেখ করা হয় না। যেমন– يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ

৭. اصلية বলা হয় ঐ استعارة-কে, যার মধ্যে مستعار বা مشبه به টা اسم جامد হয় এবং اسم مشتق হয় না। যেমন– ضلال-এর জন্য ظلام এবং هدى-এর জন্য نور ব্যবহার করা হয়; ظلام এবং نور উভয়টিই ইসমে জামেদ।

৮. تبعية বলা হয় ঐ استعارة-কে, যার মধ্যে مشبه বা মুশাব্বাহ বিহী فعل অথবা حرف কিংবা اسم مشتق হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার পর আমাদের উদ্দিষ্ট ইবারত اَذَاقَهُ حَلَاوَةَ التَّحْقِيْقِ-এর استعارة টি এখন আলোচনা করা হচ্ছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এতে দু' ধরনের ইসতি'আরা হতে পারে–

১. حلاوة التحقيق-এর حلاوة হলো مشبه به আর تحقيق হলো مشبه। সুতরাং এখানে اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهٖ اِلَى الْمُشَبَّهِ হয়েছে। আর اذاقه যেহেতু مشبه به তথা حلاوة-এর مناسب এ জন্যে এটি استعارة مرشحة হয়েছে।

২. تحقيق হলো مشبه আর مشبه به হচ্ছে কোনো সুমিষ্ট জিনিস, যেমন মধু ইত্যাদি। مشبه به উহ্য। অতএব استعارة بالكناية হলো।

আর حلاوة-কে تحقيق-এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা استعارة تخيلية হলো। আর مشبه به-এর مناسب বা সংশ্লিষ্ট জিনিস হলো اذاقه এ হিসেবে এটি استعارة مرشحة।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, حلاوة শব্দটি তার হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার যেমন সম্ভাবনা আছে, তেমনি এটি لذة-এর অর্থেও হতে পারে। তখন مشبه به হবে لذة যা উহ্য আছে, এ মতে এটি استعارة بالكناية হলো।

প্রকাশ থাকে যে, هَدَاهُ اللّٰهُ سَوَاءَ الطَّرِيْقِ এবং اذاقه حلاوة التحقيق বাক্যদ্বয় মুসান্নিফ (র.)-এর قول অর্থাৎ (فَيَقُوْلُ) এবং তার مقوله অর্থাৎ قَدْ شَرَّحْتُ الخ-এর মাঝে জুমলায়ে মু'তারিযা বা জুমলায়ে দু'আইয়্যাহ।

قَدْ شَرَّحْتُ দ্বারা অতীত বুঝা যাওয়া সত্ত্বেও فِيْمَا مَضٰى বাক্যটি মুসান্নিফ (র.) এনেছেন পূর্ববর্তী বাক্য (قَدْ شَرَّحْتُ) -এর تاكيد-এর জন্য এবং قَدْ شَرَّحْتُ যে مجاز হিসেবে اَشْرَحُ (مضارع)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে। তা ছাড়া مطول লিখার সাময়কাল যে নিকট অতীত নয় সে কথাও فِيْمَا مَضٰى দ্বারা বুঝা যায়।

تَلْخِيْصُ الْمِفْتَاحِ এটি একটি কিতাবের নাম, এটি আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান কাযবীনী কর্তৃক প্রণীত। এটি আল্লামা সাক্কাকীর مِفْتَاحُ الْعُلُوْمِ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের সার-সংক্ষেপ এবং مختصر المعانى-এর মতন।

قَوْلُهُ وَاَغْنَيْتُهُ بِالْاَصْبَاحِ عَنِ الْمِصْبَاحِ : এখানে اَغْنَيْتُهُ অর্থ– অমুখাপেক্ষী করা "ه"-এর مرجع হলো تَلْخِيْصُ الْمِفْتَاحِ, এ ছাড়া পরবর্তী ইবারতের معانيه ও استاره-এর ضمير-এর مرجعও তালখীসুল মিফতাহ। اَلْاَصْبَاحُ শব্দের অর্থ– ভোর বেলায় প্রবেশ করা বা সকাল হওয়া; কিন্তু استعارة হিসেবে মুসান্নিফ (র.)-এর কিতাব مُطَوَّلٌ উদ্দেশ্য। اَلْمِصْبَاحُ শব্দের অর্থ– প্রদীপ বা বাতি, এখানে استعارة হিসেবে তালখীসুল মিফতাহের অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থকে বুঝানো যায়।

قَوْلُهُ وَاَوْدَعْتُهُ غَرَائِبَ نُكَتٍ سَمَحَتْ بِهِ الْاَنْظَارُ : اَوْدَعَ অর্থ– আমানত রাখা, "ه"-এর مرجع হলো مطول। এ বাক্যটি মুসান্নিফ (র.) استعارة হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রথমত তিনি তাঁর কিতাবকে বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাথে উপমা দিয়েছেন। যেহেতু এখানে مشبه به উল্লেখ নেই; বরং مشبه উল্লেখ আছে, তাই এটি استعاره بالكناية। আর اودع-কে مشبهٌ-এর জন্য সাবিত করার দ্বারা استعارة تخييليه হয়েছে। উল্লেখ্য যে, اودع শব্দ দ্বারা তার প্রদত্ত نكتة গুলো যে খুবই মূল্যবান এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, মূল্যবান জিনিসই তো আমানত রাখা হয়। তা ছাড়া আমানত (اودع) দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, বিষয়গুলো তার সৃষ্টি। কেননা, মানুষ তার মালিকানাধীন জিনিসই আমানত রাখে।

قَوْلُهُ غَرَائِبَ نُكَتٍ : এটি مركب اضافى। এতে مشبه به-কে مشبه-এর প্রতি اضافت করা হয়েছে। বাক্যটি মূলত এরূপ اَوْدَعْتُهُ نُكَتًا غَرِيْبَةً : এখানে النكت শব্দটি نكتة-এর বহুবচন। نكت শব্দের অর্থ হলো– কাঠি বা লাঠি দ্বারা জমিনে কিছু তালাশ করা বা অঙ্কন করা। যেহেতু এরূপ করার দ্বারা সে স্থানটিতে একটি নতুন রঙ বের হয়, যা পূর্বের রঙের ব্যতিক্রম। অতএব, কোনো বাক্যের স্বাভাবিক বা সাধারণ অর্থের চেয়ে ভিন্ন সূক্ষ্ম অর্থ হলে, তাকে نكتة বলা হবে। অথবা نكتة দ্বারা গবেষণাপ্রসূত কোনো অর্থ উদ্দেশ্য। মানুষ চিন্তা করার সময় যেহেতু মাটিতে কাঠি দ্বারা আঁকাআঁকি করে, তাই চিন্তাপ্রসূত অর্থকে نكتة বলা হয়। উভয় সুরতে مجاز مرسل হয়েছে। غرائب শব্দটি غريبة-এর বহুবচন, অর্থ হলো– বিরল বা দুর্লভ জিনিস।

قَوْلُهُ سَمَحَتْ بِهِ الْاَنْظَارُ : এখানে سَمَحَتْ শব্দটি বাবে فتح-এর ماضى معروف সীগাহ واحد مؤنث غائب । অর্থ- দান করা। এখানে سَمَحَتْ শব্দের অর্থ- উদ্ভাবন করা। سَمَحَتْ শব্দটি দ্বারা আবারো نُكْتَةٌ গুলো মূল্যবান হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, বদান্যতা শব্দটি কৃপণতার বিপরীত শব্দ। আর মানুষ স্বভাবত মূল্যবান জিনিসের ব্যাপারেই কৃপণতার আশ্রয় নেয়। اَلْاَنْظَارُ শব্দটি سَمَحَتْ-এর فاعل । আর سَمَحَتْ-এর নিসবত اَنْظَارٌ-এর দিকে مجاز عقلى হিসেবে হয়েছে। কেননা, سماحت-এর নিসবত اَصْحَابُ الْاَنْظَارِ বা চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের প্রতি হওয়া হলো حقيقت।

এ বাক্যটিতে দু'টি استعاره হয়েছে-

১. انظار-কে এমন লোকদের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, যারা মূল্যবান সামগ্রী দান করে থাকে। যেহেতু مشبه به উহ্য আছে, তাই এটি استعارة بالكنايه হয়েছে।

২. سماحت-কে انظار-এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা استعارة تخيليه হয়েছে।

انظار শব্দটি نظر-এর বহুবচন। অর্থ- نظر বলা হয় ঐ চিন্তাকে, যার দ্বারা ইলম বা প্রবল ধারণা হাসিল হয়। এতে যে الف ولام আছে, তা مضاف اليه-এর পরিবর্তে ব্যবহার হয়েছে। মূলত শব্দটি হলো انظارى এখানে مضاف اليه হলো "يا", এর পরিবর্তে الف ولام আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَ وَشَّحْتُهُ بِلَطَائِفِ فِقَرٍ : وَشَّحْتُ শব্দটি باب تفعيل-এর ماضى مطلق معروف -এর واحد متكلم-এর صيغه। মাসদার تَوْشِيْحٌ ধাতুগত অর্থ হলো, وِشَاحٌ (মহিলাদের কণ্ঠে পরিধান করার হিরা-জহরত খচিত একটি অলঙ্কারের নাম) পরানো, তা ছাড়া কারুকাজপূর্ণ কোনো কাপড় পরানো, অথবা কারুকার্জ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে শেষোক্ত অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা এখানে استعارة হয়েছে তাও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ তার ব্যাখ্যাগ্রন্থটিকে তিনি জমকালো পোশাক পরিহিতা নববধূর সাথে উপমা দিয়েছেন। যেহেতু مشبه به উহ্য, অতএব এটি استعارة بالكناية আর تَوْشِيْح-কে এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা استعاره تخييليه হয়েছে।

لَطَائِفِ فِقَرٍ -এর মধ্যে اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে। মূলবাক্যটি হলো فِقَرًا لَطِيْفَةً তবে শব্দ দু'টিকে اضافت ছাড়া পড়লে فِقَرٍ শব্দটি لَطَائِفُ থেকে بدل বা عطف بيانও হতে পারে। لَطَائِفُ শব্দটি لَطِيْفَةٌ-এর বহুবচন। لطيفة-এর অর্থ হলো- বিরল বিষয় বা বস্তু। فِقَرٌ শব্দটি فِقْرَةٌ-এর বহুবচন। মেরুদণ্ডের হাঁড়কে فِقْرَةٌ বলা হয়। এরপর উপমার সাহায্যে বিশেষ এক প্রকার অলঙ্কারকেও فِقْرَةٌ বলা হয়। তারপর আবার এখানে সুন্দর অন্তর্মিল ও ছন্দমিলপূর্ণ বাক্য বা কবিতার পঙ্‌ক্তিকে এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু مشبه به উল্লেখ আছে এবং مشبه উহ্য, তাই এটি استعارة مصرحة । অথবা এখানে فقر দ্বারা বিশেষ অলঙ্কারই উদ্দেশ্য, তাহলে لَطَائِف (যা مضاف হয়েছে) হলো مشبه আর فِقَرٌ হলো مشبه به অর্থাৎ اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ اِلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ তখন বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে, فقر-এর মতো বিরল বাক্য দ্বারা সুসজ্জিত করেছি।

قَوْلُهُ سَبَكَتْهَا يَدُ الْاَفْكَارِ : এখানে سَبَكَ শব্দটি বাবে ضرب ও نصر হতে, শব্দের অর্থ হলো- স্বর্ণ বা রূপা জাতীয় খনিজ পদার্থ গালিয়ে ফর্মায় ঢালাই করা। سَبَكَ الْكَلَامُ অর্থ হলো কথাকে উত্তমরূপে পরিমার্জিত করল। এখানে ঢেলে দেওয়া বা বের করে দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। يَدٌ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো اَيْدِىْ অর্থ- হাত। اَلْاَفْكَارُ শব্দটি فِكْرٌ-এর বহুবচন। অর্থ- চিন্তা-ফিকির। يَدُ الْاَفْكَارِ-এর মধ্যে اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهِ اِلَى الْمُشَبَّهِ হয়েছে। অর্থাৎ চিন্তা-চেতনাকে উপমা দেওয়া হয়েছে হাতের সাথে। তখন سَبَكَتْهَا যেহেতু مشبه به-এর مناسب জিনিস, তাই استعارة مرشحة হবে। আবার এ বাক্যটিতে অন্যভাবেও استعارة হতে পারে। এর বর্ণনা এরূপ যে, فِكْرٌ বা চিন্তাকে উপমা দেওয়া হয়েছে স্বর্ণকারের সাথে। যেহেতু مشبه به উহ্য তাই এটি استعارة بالكناية আর يد বা হাতকে اَلْاَفْكَارُ -এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা استعارة تخييلية হয়েছে। আর سبك হলো مشبه به-এর مناسب তাই এটি استعارة مرشحة আর اَلْاَفْكَارُ-এর শুরুতে যে الف لام আছে তা مضاف اليه-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলবাক্যটি হলো اَفْكَارِىْ এখানে الف ولام-কে "ياء"-এর পরিবর্তে আনা হয়েছে।

ثُمَّ رَأَيْتُ الْكَثِيْرَ مِنَ الْفُضَلَاءِ وَالْجَمَّ الْغَفِيْرَ مِنَ الْأَذْكِيَاءِ يَسْئَلُوْنَنِيْ صَرْفَ الْهِمَّةِ نَحْوَ اِخْتِصَارِهِ وَالْاِقْتِصَارِ عَلَى بَيَانِ مَعَانِيْهِ وَكَشْفِ اَسْتَارِهِ لَمَّا شَاهَدُوْا مِنْ اَنَّ الْمُحَصِّلِيْنَ قَدْ تَقَاصَرَتْ هِمَمُهُمْ عَنْ اِسْتِطْلَاعِ طَوَالِعِ اَنْوَارِهِ وَتَقَاعَدَتْ عَزَائِمُهُمْ عَنْ اِسْتِكْشَافِ خَبِيَّاتِ اَسْرَارِهِ .

অনুবাদ : তারপর জ্ঞানী সমাজের একটি বড় অংশ ও মেধাবীদের অনেককেই আমি দেখতে পেলাম যে, তারা আমার কাছে এই (ব্যাখ্যাগ্রন্থ مُطَوَّلْ) সংক্ষিপ্ত করার এবং (তালখীসুল মিফতাহ)-এর মর্ম উদঘাটন ও জটিল স্থানগুলোর সমাধান করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি (ও কার্যকর পদক্ষেপ) নেওয়ার জন্য আবেদন করছে। কেননা, তারা ছাত্র ও জ্ঞান অন্বেষীদের উক্ত مُطَوَّلْ কিতাবের জ্যোতির্ময় বিষয়গুলো অনুধাবন ও আয়ত্ত করতে অক্ষম হতে দেখেছিলেন এবং উক্ত কিতাবের রহস্যময় ভেদগুলোর মর্ম উদ্ঘাটনে তাদের (ছাত্রদের) দৃঢ়প্রত্যয়ও ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ : এ বাক্যে ثُمَّ (حرف عطف) দ্বারা قَدْشَرَّحْتُ-এর উপর عطف করা হয়েছে। অর্থাৎ مُطَوَّلْ লেখার বেশ কিছুদিন পর আমি দেখলাম।

قَوْلُهُ الْفُضَلَاءِ : শব্দটি فَضِيْلٌ-এর বহুবচন। فَضِيْلٌ বা فَاضِلٌ শব্দের অর্থ ঐ ব্যক্তি, যিনি বিদ্যা অথবা বুদ্ধি কিংবা সততার গুণে গুনান্বিত। এখানে উদ্দেশ্য জ্ঞানীজন।

قَوْلُهُ اَلْجَمَّ الْغَفِيْرَ مِنَ الْأَذْكِيَاءِ : اَلْجَمُّ শব্দটি لُجُوْمٌ থেকে নির্গত, অর্থ– বেশি বা আধিক্য। اَلْغَفِيْرُ-এর বহুবচন اَلْغُفَرَاءُ, اَلْغَفِيْرُ শব্দটি اَلْغَفْرُ থেকে নির্গত। অর্থ– ঢেকে দেওয়া।

এখানে اَلْجَمُّ الْغَفِيْرُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন বিশাল দল, যা আধিক্যের কারণে ভূমিকে ঢেকে দেয়।

اَلْأَذْكِيَاءُ শব্দটি ذَكِيٌّ-এর বহুবচন। অর্থ–পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দ্রুত বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি।

قَوْلُهُ صَرْفَ الْهِمَّةِ نَحْوَ اِخْتِصَارِهِ : صَرْفٌ শব্দটি এখানে مَصْدَرٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– ফিরানো, রূপান্তর বা দিগান্তর করানো। اَلْهِمَّةُ শব্দের আভিধানিক অর্থ– ইচ্ছা ও প্রত্যয়, এর প্রচলিত অর্থ হচ্ছে মনের একটি অবস্থা, যার পরে কোনো কিছু অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়। এখানে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাক্যে استعارة مكنية হয়েছে। هِمَّةٌ-কে উপমা দেওয়া হয়েছে এমন বাধ্য উটনীর সাথে, যার বাগডোর তার মালিকের হাতে রয়েছে। মালিক তাকে যে দিকে ইচ্ছা ঘুরাতে পারে। আর صَرْف-কে هِمَّةٌ-এর জন্য সাবিত করার দ্বারা استعارة تخييلية হয়েছে।

نَحْوَ-এর অর্থ হলো– দিক, প্রকার, সদৃশ ও ইচ্ছা ইত্যাদি। এখানে দিক-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

اِخْتِصَار শব্দটি خَصْرٌ (কোমর) থেকে নির্গত, এর ব্যবহার এরূপ (فُلَانٌ) اِخْتَصَرَ অমুক তার কোমরে হাত রাখল। اِخْتَصَرَ الْكَلَامُ অর্থ– সে তার কথাকে সংক্ষিপ্ত করল এবং অনর্থক কথা পরিত্যাগ করল। এখানে কথা সংক্ষিপ্ত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। نَحْوَ اِخْتِصَارِهِ এতে استعارة بالكناية ও استعاره تخييلية হয়েছে। প্রথমত اِخْتِصَارْ-কে একটি স্থানের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। আর যেহেতু مشبه به উহ্য, তাই এটি استعارة بالكناية এরপর نَحْوَ-কে اِخْتِصَارْ-এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা تخييلية হয়েছে।

قَوْلُهُ الْاِقْتِصَارِ عَلَى بَيَانِ مَعَانِيْهِ : এখানে اِقْتِصَارْ-এর অর্থ হলো– কোনো মৌলিক বিষয়কে কাটছাট ও অতিরিক্ত বিষয় বাদ দিয়ে পেশ করা। اَلْاِقْتِصَارُ শব্দটির عطف হয়তো اِخْتِصَارْ-এর উপর হয়েছে অথবা এটি يَسْأَلُوْنَنِيْ-এর مفعول ثانى উভয় অবস্থায় اِقْتِصَارْ শব্দটি اِخْتِصَارْ-এর تفسير বা ব্যাখ্যা হবে। অর্থাৎ مُطَوَّلْ-এর সব বিষয়বস্তু অল্প কথায় প্রকাশ করবেন, এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং তালখীসুল মিফতাহ্-এর মর্ম উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এ দাবি সীমাবদ্ধ থাকবে।

قَوْلُهٗ وَكَشْفُ اَسْتَارِهٖ : كَشْف শব্দের অর্থ– উন্মুক্ত করা, খুলে দেওয়া। اَسْتَارٌ শব্দটি سِتْرٌ-এর বহুবচন, كَشْف اَسْتَارِهٖ-এর শাব্দিক অর্থ হলো– তালখীসুল মিফতাহ্ এর পর্দা উন্মোচন করা। আর মর্মার্থ হলো– তালখীস-এর জটিল বিষয়গুলো সমাধান করা। বলাবাহুল্য যে, كَشْفُ اَسْتَارِهٖ-এর মধ্যে استعاره হয়েছে। প্রথমত বিষয়গুলোকে নববধূর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু مشبه به উহ্য, তাই استعاره بالكناية হয়েছে। এরপর اَسْتَارٌ-কে সাবিত করার দ্বারা تخييليه হয়েছে। আর كَشْف যেহেতু مشبه به-এর সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, অতএব এটি استعارة مرشحة হয়েছে। অথবা استعاره এরূপ হবে যে, জটিল বিষয়গুলোকে اَسْتَارٌ বা পর্দার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, আর مشبه به উল্লেখ আছে এবং مشبه উহ্য, সুতরাং এ মতানুসারে استعارة مصرحة হয়েছে। উল্লেখ্য যে, كَشْفُ اَسْتَارِ-এর عطف হয়েছে بَيَانِ مَعَانِيْهِ-এর উপর। আর كَشْفُ اَسْتَارِهٖ বা মর্ম উদ্ঘাটন-এর বিষয় যেহেতু بَيَانِ مَعَانِيْهِ-এর মধ্যে চলে গেছে, (কেননা, সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হলে জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যাও হয়ে যায়।) অতএব, এখানে كَشْفُ اَسْتَارِ-এর আতফ بَيَانِ مَعَانِيْهِ-এর উপর عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ হিসেবে হয়েছে।

قَوْلُهٗ لَمَّا شَاهَدُوْا مِنَ الْمُحَصِّلِيْنَ : এ বাক্যটির সম্পর্ক يَسْأَلُوْنِيْ-এর সাথে, لَمَّا এখানে ظرف হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তেমনিভাবে 'ل' ইল্লতের অর্থে আর 'ما' اسم موصول-এর অর্থেও হতে পারে। شَاهَدُوْا (باب مفاعلة-এর صيغه جمع مذكر غائب) এর অর্থ– দেখা, প্রত্যক্ষ করা। এখানে নিশ্চিতভাবে জানাকেই مُشَاهَدَةٌ বলা হয়েছে। 'مِن' : (حرف جر) এখানে হয়তো بَيَانِيْهِ হবে অথবা زَائِدَةٌ তথা অতিরিক্ত হবে। اَلْمُحَصِّلِيْنَ : শব্দটি مُحَصِّلٌ-এর বহুবচন, مُحَصِّلٌ (باب تفعيل) واحد مذكر اسم فاعل-এর অর্থ– বিদ্যা অর্জনকারী, তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো বিদ্যান্বেষী ছাত্র, যারা মুসান্নিফ-এর কিতাব (مُطَوَّلٌ) থেকে ইলম অর্জনে ব্রতী।

قَدْ تَقَاصَرَتْ : এটি باب تفاعل-এর واحد مؤنث غائب-এর সীগাহ। قَصَرَ قُصُوْرًا অর্থ– অক্ষম হওয়া, হ্রাস পাওয়া ও নিবৃত্ত হওয়া। কারো মতে باب تفاعل-এর মধ্যে مبالغه-এর অর্থ রয়েছে, তাহলে تَقَاصَرَتْ-এর অর্থ হবে قَصَرَ قُصُوْرًا تَامًّا সে চরমভাবে অক্ষম হয়েছে। اَلْهِمَمُ শব্দটি هِمَّةٌ-এর বহুবচন। এখানে قُصُوْر-এর নিসবত اَلْهِمَمُ-এর দিকে এবং এর পরবর্তী বাক্যে قُعُوْد-এর নিসবত اَلْعَزَائِمُ-এর দিকে مجاز عقلى হিসেবে হয়েছে। কেননা, قُعُوْد ও قُصُوْرٌ-এর নিসবত صَاحِبُ الْهِمَّةِ وَالْعَزِيْمَةِ-এর দিকে হওয়া حقيقت।

قَوْلُهٗ عَنْ اِسْتِطْلَاعِ طَوَالِعِ اَنْوَارِهٖ : اِسْتِطْلَاعٌ : এটি باب استفعال-এর مصدر, প্রকাশ থাকে যে, استفعال-এর سين এবং تاء সাধারণভাবে طلب-এর অর্থ দেয়। কখনো سين ও تاء-এর কোনো অতিরিক্ত অর্থ থাকে না। সাধারণভাবে اِسْتِطْلَاعٌ-এর অর্থ হবে অনুসন্ধান করা বা কোনো কিছুর উদয় কামনা করা। কিন্তু এখানে طُلُوْعٌ শব্দটি দ্বারা استعاره হিসেবে اِدْرَاكٌ ও فَهْمٌ অর্থাৎ বুঝা ও অনুভব উদ্দেশ্য। এখানে استعارة مصرحة হিসেবে طُلُوْعٌ (مشبه به)-কে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর مشبه (اِدْرَاكٌ وَفَهْم) উহ্য আছে।

قَوْلُهٗ طَوَالِعِ اَنْوَارِهٖ : طَوَالِعُ : শব্দটি طَالِعَةٌ-এর বহুবচন, অর্থ– উদয়স্থল এবং اَنْوَارٌ হলো نُوْرٌ-এর বহুবচন। "طَوَالِعِ اَنْوَارِهٖ"-এর বাক্যে اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে। অর্থাৎ মূলবাক্য اَنْوَارُهُ الطَّالِعَةُ ছিল। اَنْوَارِهٖ বা اَنْوَارُ الشَّرْحِ দ্বারা উদ্দেশ্য এর অর্থ ও তাৎপর্য। তারপর এখানে তার কিতাবের অর্থ ও তাৎপর্য হলো مشبه, আর انوار হলো তার مشبه به যেহেতু مشبه به উল্লেখ আছে এবং مشبه উহ্য, তাই এটি استعارة مصرحة, আর طَوَالِعِ-এর দ্বারা استعارة مرشحة হয়েছে। অন্যমতে طَوَالِعِ দ্বারা কিতাবের اَلْفَاظٌ উদ্দেশ্য, আর اَنْوَارٌ দ্বারা কিতাবের مَعَانِيٌ উদ্দেশ্য, উভয় مشبه উহ্য এবং مشبه به উল্লিখিত। তাই এটি استعارة مصرحة হয়েছে। এ মতে ইবারত এরূপ হবে عَنْ اِدْرَاكِ مَعَانِي اَلْفَاظِهٖ অর্থ– তার কিতাবের শব্দের অর্থ বুঝতে তারা অক্ষম হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَتَقَاعَدَتْ عَزَائِمُهُمْ عَنِ اسْتِكْشَافِ خَبِيَّاتِ اَسْرَارِهٖ : এখানে تَقَاعَدَتْ ও اِسْتِكْشَافٌ-এর বেলায় সেসব কথা প্রযোজ্য, যা تَقَاصَرَتْ ও اِسْتِطْلَاعٌ-এর বেলায় হয়েছে। تَقَاعَدَتْ-এর অর্থ– বসে যাওয়া ও স্থবির হওয়া। اِسْتِكْشَافٌ-এর অর্থ– খোলা, উন্মুক্ত করা ও প্রকাশ করা বা উন্মুক্ত করতে চাওয়া। خَبِيَّاتِ اَسْرَارِهٖ : এ বাক্যে اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে। خَبِيَّاتٌ : শব্দটি خَبِيَّةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– গোপন বা লুক্কায়িত বিষয়। اَسْرَارٌ শব্দটি سر-এর বহুবচন, অর্থ– ভেদ ও রহস্য বা গোপন করে রাখা বস্তু। خَبِيَّاتِ اَسْرَارِهٖ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مُطَوَّلٌ কিতাবের সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়গুলো। এখানে এ বিষয়গুলোকে خَبِيَّاتِ اَسْرَارِ-এর সাথে তাশবীহ বা উপমা দেওয়া হয়েছে এবং مشبه به উল্লেখ আছে, তার مشبه উহ্য। অতএব, এখানে استعاره مصرحة হবে।

وَاَنَّ الْمُنْتَحِلِّيْنَ قَدْ قَلَّبُوْا اَحْدَاقَ الْاَخْذِ وَالْاِنْتِهَابِ وَمَدُّوْا اَعْنَاقَ الْمَسْخِ عَلٰى ذٰلِكَ الْكِتَابِ وَكُنْتُ اَضْرِبُ عَنْ هٰذَا الْخَطْبِ صَفْحًا وَاَطْوِىْ دُوْنَ مَرَامِهِمْ كَشْحًا عِلْمًا مِنِّىْ بِاَنَّ مُسْتَحْسَنَ الطَّبَائِعِ بِاَسْرِهَا وَمَقْبُوْلَ الْاَسْمَاعِ عَنْ اٰخِرِهَا اَمْرٌ لَا يَسَعُهُ مَقْدِرَةُ الْبَشَرِ وَ اِنَّمَا هُوَ شَاْنُ خَالِقِ الْقُوٰى وَالْقُدَرِ وَ اَنَّ هٰذَا الْفَنَّ قَدْ نَضَبَ الْيَوْمَ مَاؤُهٗ فَصَارَ جِدَالًا بِلَا اَثَرٍ وَ ذَهَبَ رُوَاؤُهٗ فَعَادَ خِلَافًا بِلَا ثَمَرٍ حَتّٰى طَارَتْ بَقِيَّةُ اٰثَارِ السَّلَفِ اَدْرَاجَ الرِّيَاحِ وَسَالَتْ بِاَعْنَاقِ مَطَايَا تِلْكَ الْاَحَادِيْثِ الْبِطَاحُ ـ

অনুবাদ : আর এদিকে রচনা চোরেরা (অর্থাৎ অন্য লেখকের রচনা নিজের বলে দাবিকারীরা) ছিনতাই ও লুটপাটের চক্ষু ঘুরাচ্ছে এবং সেই কিতাবের উপর বিকৃতির ঘাড় সম্প্রসারিত করছে। আমি এ মহৎ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখছিলাম এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা (বাস্তবায়ন করা) থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখছিলাম। কারণ আমি জানতাম, এ জাতীয় কাজ সকলের কাছে পছন্দনীয় হওয়া এবং সব শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া এমন বিষয়, যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এটাতো কেবল সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার উৎস, মহান স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। তা ছাড়া নিঃসন্দেহে এ যুগে জ্ঞানের এ শাখাটির পানি শুকিয়ে গেছে এবং এটি অনর্থক তর্ক-বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আর এর সজীবতা নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাই এটি বিফল মতানৈক্যের বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এমনকি পূর্বসূরিদের অবশিষ্ট চিহ্নটুকু হাওয়ায় মিশে গেছে এবং সে আলোচনার উটগুলো কঙ্করময় উপত্যকায় বয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ اَنَّ الْمُنْتَحِلِّيْنَ قَدْ قَلَّبُوْا اَحْدَاقَ الْاَخْذِ وَالْاِنْتِهَابِ : اَلْمُنْتَحِلِّيْنَ শব্দটি مُنْتَحِلٌّ-এর বহুবচন। مُنْتَحِلٌّ শব্দের অর্থ হচ্ছে هُوَ الْاٰخِذُ بِكَلَامِ الْغَيْرِ وَيَنْسِبُهٗ لِنَفْسِهٖ تَصْرِيْحًا اَوْ تَلْوِيْحًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের কথা বা রচনাকে সরাসরি অথবা প্রচ্ছন্নভাবে নিজের বলে দাবি করে অথবা যে ব্যক্তি অন্যের কথা বা রচনাকে নিজের বলে প্রকাশ করে।

قَلَّبُوْا : শব্দটি باب تفعيل-এর ماضى مطلق معروف-এর جمع مذكرغائب-এর সীগাহ। اَلتَّقْلِيْبُ অর্থ– ঘুরানো-ফিরানো। اَلْاَحْدَاقُ : এটি حَدْقَةٌ-এর বহুবচন, অর্থ চোখের কালো অংশ। اَلْاِنْتِهَابُ শব্দটির অর্থ ছিনতাই করা, কারো মাল জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া। এ বাক্যে চোরেরা চুরি করার সময় তাদের চোখকে যে এদিক সেদিক ঘুরায় সে কথাই বলা হয়েছে। قَلَّبُوْا اَحْدَاقَ الْاَخْذِ وَ الْاِنْتِهَابِ : এ অংশে اَلْاَخْذُ وَالْاِنْتِهَابُ-কে এক নিকৃষ্ট অত্যাচারীর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু مشبه به উহ্য, তাই এটি استعارة مكنية হবে। এরপর اَحْدَاقَ-কে مناسب مشبه به-এর ও اَخْذ-اِنْتِهَاب-এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা استعاره تخييليه হয়েছে। আর تَقْلِيْب যেহেতু مناسب مشبه به-এর অতএব এটি استعاره مرشحه হবে। পুরা বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা مُطَوَّلْ-কে সংক্ষিপ্তরূপে নিজের নামে পেশ করার জন্য যথেষ্ট তৎপর হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَمَدُّوْا اَعْنَاقَ الْمَسْخِ : مَدَّ يَمُدُّ مَدًّا (باب نصر)-এর অর্থ– সম্প্রসারিত করা, লম্বা করা। اَعْنَاقٌ : শব্দটি عُنُقٌ-এর বহুবচন, অর্থ– ঘাড়, গ্রীবা। اَلْمَسْخُ : শব্দের অর্থ هُوَ تَبْدِيْلُ صُوْرَةٍ بِصُوْرَةٍ اَدْنٰى مِنَ الْاُوْلٰى অর্থাৎ কোনো জিনিসের পূর্বের আকৃতি পরিবর্তন করে মন্দ আকৃতি দান করা। উক্ত বাক্যে استعارة مصرحة হয়েছে। তা এরূপ যে, প্রথমত কিতাবের বিষয়বস্তু ছিনিয়ে নেওয়াকে مَسْخ-এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, এরপর مشبه-কে উহ্য রেখে مشبه به-কে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, লেখক রচনাচোরদের সংক্ষিপ্তকরণকে مَسْخ বলে ব্যক্ত করেছেন। এতে এ

কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাদের সে কাজ বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই হবে না। عَلٰى ذٰلِكَ الْكِتَابِ : অর্থ ঐ কিতাব তথা مُطَوَّلْ-এর প্রতি। عَلٰى শব্দটি এখানে حَقِيْقِيْ অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, আবার اِلٰى-এর অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে اسم اشارة بعيد ব্যবহার করা হয়েছে কিতাবের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। অর্থাৎ কিতাবের মর্যাদা সেসব রচনাচোরদের চেয়ে অনেক বেশি।

وَكُنْتُ اَضْرِبُ عَنْ هٰذَا الْخَطْبِ صَفْحًا : واو এখানে حاليه, এটি এবং পরবর্তী বাক্য হলো حال।

اَلضَّرْبُ কখনো বিরত রাখা ও ফেরানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং এখানে এ অর্থ হলে অনুবাদ হবে আমি নিজেকে বিরত বা ফিরিয়ে রাখছিলাম। অথবা ضَرْبٌ-এর অর্থ এখানে মুখ ফিরিয়ে রাখা হবে। তাহলে অনুবাদ হবে এরূপ 'আমি মুখ ফিরিয়ে রাখছিলাম।' خَطْبٌ : অর্থ– মহৎ, বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো কিতাব সংক্ষিপ্ত করার বিষয়। صَفْحٌ অর্থ– মুখ ফিরানো। উক্ত বাক্যে এটি مفعول مطلق রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কারো মতে এটি مفعول لهও হতে পারে। তবে দ্বিতীয় মতটি আপত্তির ঊর্ধ্বে নয়।

قَوْلُهٗ اَطْوِىْ دُوْنَ مَرَامِهِمْ كَشْحًا : اَطْوِىْ শব্দটি باب ضرب থেকে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ– ভাঁজ করা, গুটিয়ে রাখা। دُوْنَ : এখানে قُدَّامٌ (সামনের) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مَرَامٌ : অর্থ– উদ্দেশ্য-গন্তব্য। اَلْكَشْحُ : অর্থ– কোমর। এখানে মধ্যবর্তী স্থান উদ্দেশ্য। আর কোমর বা মধ্যবর্তী স্থান গুটিয়ে রাখার অর্থ হলো তার কাছে যারা আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কোনো কিছু চেয়েছে তাদের সে আশা পূরণ না করা। عِلْمًا مِنِّىْ : عِلْمًا শব্দটি এর পরবর্তী ইবারতগুলোসহ اَضْرِبُ এবং اَطْوِىْ এ দু'টি فعل-এর কার্যকারণ বা مفعول له হয়েছে।

بِاَنَّ مُسْتَحْسَنَ الطَّبَائِعِ بِاَسْرِهَا : مُسْتَحْسَنْ শব্দটি باب استفعال-এর اسم مفعول-এর واحد مذكر, অর্থ– পছন্দনীয় ও উত্তম। اَلطَّبَائِعُ শব্দটি طَبِيْعَةٌ-এর বহুবচন। مُسْتَحْسَنُ الطَّبَائِعِ : এ বাক্যে اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْفَاعِلِ হয়েছে। অর্থ সব তবিয়ত বা মানুষের কাছে পছন্দনীয় বিষয়। اَسْرٌ : শব্দের অর্থ হলো– শিকল, যা দ্বারা বন্দীদের বেঁধে রাখা হয়। যেমন বলা হয় ذَهَبَ الْاَسِيْرُ بِاَسْرِهٖ অর্থাৎ বন্দী তার শিকলসহ পালিয়েছে। বন্দী শিকল নিয়ে পালানোর অর্থ হলো সবকিছু নিয়ে পালানো। তাই اَسْر বলে 'সবকিছু' বুঝানো হয়। এখানে 'সবকিছু' বুঝানোর জন্যই اَسْرٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَمَقْبُوْلُ الْاَسْمَاعِ عَنْ اٰخِرِهَا : اَسْمَاعٌ শব্দটি سَمْعٌ-এর বহুবচন, অর্থ– কান, শ্রবণেন্দ্রিয়, এখানে কান বলে কানওয়ালাকে বুঝানো হয়েছে। এখানেও مُسْتَحْسَنُ الطَّبَائِعِ-এর মতো اضافت হয়েছে। عَنْ اٰخِرِهَا : عَنْ শব্দটি এখানে اِلٰى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরো বাক্যটি এরূপ হবে– عَنْ اَوَّلِهَا اِلٰى اٰخِرِهَا অর্থ– শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই।

قَوْلُهٗ اَمْرٌ لَايَسَعُهٗ مَقْدَرَةُ الْبَشَرِ : مَقْدَرَةُ الْبَشَرِ শব্দটি لَايَسَعُ-এর فاعل এখানে لَايَسَعُ مَقْدَرَةُ الْبَشَرِ-এর অর্থ হলো, এমন বিষয় যাকে মানুষের ক্ষমতা পরিবেষ্টন করতে পারে না।

اِنَّمَا هُوَ شَاْنُ خَالِقِ الْقُوٰى وَالْقُدَرِ : قُوٰى শব্দটি قُوَّةٌ-এর বহুবচন, অর্থ– শক্তি। قُدَرٌ : শব্দটি قُدْرَةٌ-এর বহুবচন, অর্থ– ক্ষমতা, خَالِقِ الْقُوٰى وَالْقُدَرِ হচ্ছেন মহান আল্লাহ্ তা'আলা।

قَوْلُهٗ وَاَنَّ هٰذَا الْفَنَّ قَدْ نَضَبَ الْيَوْمَ مَاؤُهٗ : فَنٌّ শব্দের অর্থ– বিষয়, এর বহুবচন فُنُوْنٌ।

نَضَبَ : শব্দটি باب نصر ও ضرب থেকে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো– শুকিয়ে যাওয়া, শুষে যাওয়া ও ফুরিয়ে যাওয়া। وَاَنَّ هٰذَا الْفَنَّ : এটি ان مستحسن الطبائع-এর উপর عطف হয়েছে, এ বাক্যটি দ্বারা এই বিষয়ের তথা বালাগাতের আলোচনা নিঃশেষ হওয়া বুঝানো হয়েছে। এই فَنٌّ ফুরিয়ে যাওয়াকে نُضُوْبٌ অর্থাৎ পানি শুকিয়ে যাওয়ার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। এখানে مشبه به উল্লেখ আছে, আর مشبه হলো উহ্য। অতএব, এটি استعارة مصرحة হয়েছে। مَاءٌ : (مشبه به-এর مناسب)-কে উল্লেখ করার দ্বারা مرشحة হয়েছে। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, এই فن-এর মূল্যবান মাসআলাগুলোকে পানির সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, مشبه به উল্লেখ আছে, অতএব استعاره مصرحة হয়েছে। نَضَبَ : (مشبه به-এর مناسب) দ্বারা مرشحة হয়েছে।

قَوْلُهٗ فَصَارَ جِدَالًا بِلَا اَثَرٍ : صَارَ-এর اسم এই فن হতে পারে অথবা اَلتَّكَلُّمُ فِىْ هٰذَا الْفَنِّও হতে পারে, بِلَا اَثَرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো بِلَا فَائِدَةٍ পুরা বাক্যের মর্ম হবে জ্ঞানের ঐ শাখাটি নিঃশেষের পথে। তাই এখন এর গভীর জ্ঞান কারো কাছে নেই। যারা আলোচনা করে তারা কেবল বাহ্যিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যার দ্বারা কোনো ফল পাওয়া যায় না।

قَوْلُهٗ وَ ذَهَبَ رُوَاءُهٗ فَعَادَ خِلَافًا بِلَا ثَمَرٍ : رُوَاءُ অর্থ– সুন্দর দৃশ্য। সৌন্দর্য, শোভা, নয়নাভিরামতা, رواء-এর সাথে এই فَنْ-এর পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপমা দেওয়া হয়েছে। مشبه به উল্লেখ আছে এবং مشبه উহ্য, অতএব এতে استعارة مصرحه হয়েছে। অথবা এখানে فن-কে সুশ্রীর অধিকারী ব্যক্তির সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে استعارة مكنية হিসেবে। অতঃপর رُوَاءُ-কে مشبه-এর জন্য সাবিত করার দ্বারা استعارة تخييليه হয়েছে। عاد : শব্দটি এখানে صار-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর اسم-এর ক্ষেত্রে সেসব কথাই প্রযোজ্য, যা صَارَ-এর اسم-এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। خلاف শব্দের অর্থ– বিরোধপূর্ণ বিষয়, পার্থক্য, এক ধরনের বেতগাছ যাতে ফল হয় না। অতএব, এখানে ইলমে বালাগাতের আলোচনাকে এমন মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা কোনো ফায়দা হয় না। অথবা একে ফলহীন বেতগাছের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে مشبه ও مشبه به এবং اداة সবই ইবারতের মধ্যে রয়েছে।

قَوْلُهٗ حَتّٰى طَارَتْ بَقِيَّةُ اٰثَارِ السَّلَفِ : طَارَ طَيْرًا (باب ضرب) অর্থ– উড়ে যাওয়া, اَلسَّلَفُ : শব্দের অর্থ– পূর্বসূরি, এখানে উদ্দেশ্য হলো ইলমে বালাগাতের ওলামায়ে কেরাম। কেননা, তারাতো শিক্ষা জগতের পূর্বসূরি। بَقِيَّةٌ : শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো بَقَايَا অর্থ– অবশিষ্ট। اٰثَارٌ : শব্দটি اَثَرٌ-এর বহুবচন। অর্থ– চিহ্ন بَقِيَّةُ اٰثَارِ السَّلَفِ দ্বারা উদ্দেশ্য ইলমে বালাগাতের পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া জ্ঞান সামগ্রী অথবা তাদের ছাত্ররা। এ বাক্যে بَقِيَّةُ اٰثَارِ السَّلَفِ-কে طَائِرٌ বা পাখির সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। এরপর طَيَرَانٌ বা উড়াকে مشبه-এর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব এ বাক্যে استعارة مكنية وتخييلية হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَدْرَاجَ الرِّيَاحِ : اَدْرَاجٌ শব্দটি دَرَجٌ-এর বহুবচন। অর্থ– রাস্তা বা পথ।

رِيَاحٌ শব্দটি رِيْحٌ-এর বহুবচন, অর্থ– বাতাস, পুরো শব্দের অর্থ– বাতাসের পথে।

حَتّٰى طَارَتْ .... اَدْرَاجَ الرِّيَاحِ : অর্থ– তাদের চিহ্নসমূহ বাতাসের পথে মিলিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর আমরা জানি, বাতাস কোনো জিনিসের উপর দিয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হলে সেটিকে এত দূরে নিয়ে যায়, যার কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

قَوْلُهٗ وَسَالَتْ بِاَعْنَاقِ مَطَايَا تِلْكَ الْاَحَادِيْثِ الْبُطَاحُ : سَالَتْ শব্দটি باب ضرب হতে ব্যবহৃত হয়। অর্থ– প্রবাহিত হওয়া। এখানে سَالَتْ দ্বারা سَارَتْ উদ্দেশ্য। سَارَتْ : (باب ضرب)-কে سَالَتْ-এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। مشبه به উল্লেখ আছে আর مشبه উহ্য। অতএব استعارة مكنية হয়েছে। এখানে বুঝানো হচ্ছে, তাদের চলা এত দ্রুত হয়েছে যেন তা পানির প্রবাহের মতোই ছুটেছে। اَلْبُطَاحُ : শব্দটি اَبْطَحُ-এর বহুবচন। অর্থ– পাথুরে কঙ্করময় জমিন। ইবারতের মধ্যে بُطَاحٌ শব্দটি سَالَتْ-এর فاعل আর سيل-এর নিসবত এর দিকে مجازا হয়েছে। মূলত বাক্যটি অর্থগতভাবে এরূপ سَارَتْ مَطَايَا تِلْكَ الْاَحَادِيْثِ فِى الْبُطَاحِ কেননা, سَيْرٌ বা চলার নিসবত مَطَايَا বা উটের দিকে হবে। এরপর سَيْرٌ না বলে سَيْلٌ বলা হলো (এর কারণ পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এরপর سَيْلٌ-এর নিসবত করা হয়েছে উট চলার স্থানের দিকে مجاز عقلي হিসেবে। এটা করা হয়েছে مبالغه বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ উটের চলা এত দ্রুত হয়েছে, যেন তার সাথে তার চলার স্থান তথা بُطَاحٌ ও চলেছে।

بِاَعْنَاقٍ : দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مُلْتَبِسًا ذٰلِكَ السَّيْرُ بِاَعْنَاقٍ উটের سَيْرٌ বা سَيَلَانٌ-এর সাথে اَعْنَاقٌ (ঘাড়)-কে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এ জন্য যে, উটের দ্রুততা এবং ধীরগতি সাধারণত এর ঘাড়ে প্রকাশ পায়। এরপর জানা দরকার যে, مَطَايَا : (উটসমূহ) শব্দটি দ্বারা ইলমে বালাগাতের ওলামাদের বুঝানো হয়েছে। এখানে مشبه ও مشبه به-এর মাঝে مناسبت হলো, উট বোঝা বহন করে আর ওলামায়ে কেরাম ইলম বহন করে। مشبه به উল্লেখ আছে, আর مشبه উহ্য; সুতরাং استعارة مصرحة হয়েছে। اَعْنَاقٌ দ্বারা مرشحه হয়েছে। اَحَادِيْثُ দ্বারা ইলমে বালাগাতের জটিল বিষয়াদি উদ্দেশ্য। اَلْبُطَاحُ দ্বারা অবস্থানস্থল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মাদরাসাসমূহ। সর্বশেষ উপমা ইত্যাদির মাধ্যমে এখানে কি বুঝানো হয়েছে তা দেখা যাক سَارَتِ الْمَدَارِسُ অর্থাৎ মাদরাসাসমূহ ওলামাদের নিয়ে (যাদেরকে উটের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে) চলে গেছে, যারা ইলমে বালাগাতের জটিল বিষয়ের সমাধানদাতা ছিলেন।

এক কথায় ইলমে বালাগাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এবং ধারকগণ নিঃশেষ হয়েছেন, সেই সাথে এর বিদ্যাপীঠগুলোও নিঃশেষ হতে চলেছে।

وَاَمَّا اَلْاَخْذُ وَالْاِنْتِهَابُ فَاَمْرٌ يَرْتَاحُ بِهِ اللَّبِيْبُ فَلِلْاَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيْبٌ وَكَيْفَ يُنْهَرُ عَنِ الْاَنْهَارِ السَّائِلُوْنَ وَلِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ ثُمَّ مَا زَادَتْهُمْ مُدَافَعَتِيْ اِلَّا شَغَفًا وَغَرَامًا وَظَمَأً فِيْ هَوَاجِرِ الطَّلَبِ وَاُوَامًا فَانْتَصَبْتُ لِشَرْحِ الْكِتَابِ عَلٰى وُفْقِ مُقْتَرِحِهِمْ ثَانِيًا وَلِعَنَانِ الْعِنَايَةِ نَحْوَ اِخْتِصَارِ الْاَوَّلِ ثَانِيًا مَعَ جُمُوْدِ الْقَرِيْحَةِ بِصِرِّ الْبَلِيَّاتِ وَخُمُوْدِ الْفِطْنَةِ بِصَرْصَرِ النَّكَبَاتِ وَتَرَامِى الْبُلْدَانِ بِىْ وَالْاَقْطَارِ وَنُبُوِّ الْاَوْطَانِ عَنِّيْ وَالْاَوْطَارِ حَتّٰى طَفِقْتُ اَجُوْبُ كُلَّ اَغْبَرَ قَاتِمِ الْاَرْجَاءِ وَاُحَرِّرُ كُلَّ سَطْرٍ مِنْهُ فِيْ شَطْرٍ مِنَ الْغَبْرَاءِ شِعْرٌ فَيَوْمًا بِحَزْوٰى وَيَوْمًا بِالْعُقَيْقِ * وَبِالْعُذَيْبِ يَوْمًا وَيَوْمًا بِالْخُلَيْصَاءِ ـ

অনুবাদ : আর (রচনাচোরদের) চুরি এবং লুটপাটের বিষয়টি তো এমন যে, এর দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ লাভ করেন। কেননা, সম্মানিত ব্যক্তিদের পান-পাত্রের মধ্যে জমিনেরও অংশ রয়েছে। তা ছাড়া নদ-নদী থেকে কি করে পানিপ্রার্থীদের বাধা দেওয়া যায়? (অর্থাৎ বাধা দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়) আর এ ধরনের সফলতা লাভ করার জন্য কর্মোদ্যোমীদের কাজ করে যাওয়া উচিত। এরপর আমার পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান তাদের আগ্রহ, প্রচণ্ড তৃষ্ণা এবং দ্বি-প্রহরের উত্তপ্ত পিপাসাকেই বাড়িয়ে তুলল। অতঃপর পুনরায় আমার ইচ্ছার বাগডোরকে প্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থটি (مُطَوَّلْ) সংক্ষিপ্ত করার প্রতি ঘুরিয়ে নিয়ে তাদের চাহিদা মোতাবেক কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার জন্য প্রস্তুতি নিলাম, অথচ তখন বিপদাপদের কারণে আমার চেতনাবোধ স্থবির হয়ে পড়েছিল এবং দুঃখ-কষ্টের ঝড়ো হাওয়ায় মেধা নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া বিভিন্ন শহর ও দূরদূরান্ত এলাকাতে অবস্থান এবং আমার স্বদেশ ও প্রয়োজনাদি থেকে বহুদূরে থাকার কারণে (ও মেধা ক্ষয়িত হচ্ছিল) অবশেষে (অবস্থা এমন হলো যে,) পৃথিবীর ধূলিময় বিশাল এলাকাগুলো অতিক্রম করতে লাগলাম এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থের এককেটি লাইন জমিনের একেক অংশে লিখতে লাগলাম (কবিতা) একদিন হাযওয়াতে, একদিন ওকাইক, আর একদিন ওয়াইব ও আরেকদিন খুলাইসাতে (এভাবে বিভিন্ন স্থানে কিতাব লিখতে লাগলাম)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ اَمَّا الْاَخْذُ وَالْاِنْتِهَابُ فَاَمْرٌ .... : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) তাঁর কাছে কিতাব লেখার আবেদনকারীদের আবেদনের উত্তর দিচ্ছেন এই বলে যে, আপনারা সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার আবেদন যে দু'টি কারণে জানিয়েছেন তার মধ্যে একটি হলো রচনাচোরদের চুরি করার ভয়ে সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এ কারণটি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এদের চুরি তো আমার খুশির কারণ। এ ধরনের চুরিতে জ্ঞানীলোক খুশি হয় একথা ভেবে যে, তার লেখা থেকে অন্যেরা সাহায্য গ্রহণ করছে। يَرْتَاحُ : শব্দটি اَلْاِرْتِيَاحُ থেকে নির্গত। অর্থ– খুশি হওয়া। اَللَّبِيْبُ : শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো لُبَابَاءُ।

قَوْلُهٗ فَلِلْاَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيْبٌ : এটি জনৈক কবির কবিতার খণ্ডাংশ। পুরো কবিতাটি এরূপ–

شَرِبْنَا شَرَابًا طَيِّبًا عِنْدَ طَيِّبٍ * كَذَاكَ شَرَابُ الطَّيِّبِيْنَ يَطِيْبُ
شَرِبْنَا وَاَهْرَقْنَا عَلَى الْاَرْضِ جُرْعَةً * وَلِلْاَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيْبٌ

অর্থাৎ * আমরা উত্তম পানীয় উত্তম ব্যক্তির কাছে পান করেছি, আর উত্তম ব্যক্তিদের পানীয় এরূপ উৎকৃষ্টই হয়ে থাকে।

* আমরা পান করলাম আর এক ঢোক মাটিতে ঢেলে দিলাম। কেননা, সম্মানিত ব্যক্তিদের পানপাত্র থেকে জমিনের একটি অংশ পাওনা আছে।

শেষের পঙ্ক্তিটিতে তাশবীহ বা উপমার ব্যবহার হয়েছে। যেমন- اَلْكِرَامُ (সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ)-এর সাথে নিজেকে উপমা দিয়েছেন। مُطَوَّلٌ-কে كَأْسٌ-এর সাথে এবং مُنْتَحِلِيْنَ-কে اَرْض-এর সাথে উপমা দিয়েছেন। এতে مشبه به-কে উল্লেখ করে مشبه-কে উহ্য রাখা হয়েছে استعارة مصرحة হিসেবে।

قَوْلُهُ وَكَيْفَ يُنْهَرُ عَنِ الْاَنْهَارِ السَّائِلُوْنَ : كَيْفَ এখানে استفهام انكارى হয়েছে। كَيْفَ يُنْهَرُ দ্বারা مَا يُنْهَرُ উদ্দেশ্য, অর্থ- বাধা/ধমক দেওয়া যায় না। نَهَرَ : (باب فتح) অর্থ- প্রার্থী বা ভিক্ষুককে ধমকানো/বাধা দেওয়া। اَلْاَنْهَارُ : শব্দটি نَهْرٌ-এর বহুবচন। অর্থ- নদ-নদী اَلسَّائِلُوْنَ শব্দটি سَائِلٌ-এর বহুবচন। অর্থ- প্রার্থী, ভিক্ষুক। পুরো বাক্যের অর্থ হলো- কি করে আমি এই প্রার্থীদের (রচনাচোরদেরকে) বাধা দিবো নদীসমূহ অর্থাৎ مُطَوَّلٌ থেকে। বাক্যটির দু'টি স্থানে استعارة مصرحة হয়েছে। مُطَوَّلٌ-কে اَنْهَارٌ-এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। اَنْهَارٌ-কে مشبه به হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর রচনাচোরদের سَائِلُوْنَ-এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, (مشبه به) سَائِلُوْنَ-কে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, مُطَوَّلٌ একটি কিতাবকে অনেক নদীর সাথে উপমা দেওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, مُطَوَّلٌ-এর মধ্যে জ্ঞানের অনেক শাখা-প্রশাখার সমাবেশ ঘটেছে। তাই একটি কিতাবই যেন অনেক কিতাবের সমষ্টি, আর অনেকগুলো কিতাব উপকার লাভের দিক থেকে অনেক নদ-নদীর সমতুল্য।

قَوْلُهُ وَلِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ : এটি পবিত্র কুরআনুল মাজীদের একটি আয়াতের অংশ বিশেষ। আয়াতে لِمِثْلِ هٰذَا দ্বারা চূড়ান্ত সফলতা তথা জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমল করার কথা বলা হয়েছে। এখানে لِمِثْلِ هٰذَا দ্বারা مِثْلُ الْاَخْذِ وَالْاِنْتِهَابِ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রচনাচোরদের কথা নকল ও লুটপাটের দ্বারা দুনিয়াতে মর্যাদা ও খ্যাতি এবং আখিরাতে ছওয়াব লাভের জন্য মুসান্নিফের মতো লোকদের কাজ করে যাওয়া উচিত। কাজ পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ مَا زَادَتْهُمْ مُدَافَعَتِىْ اِلَّا شَغَفًا وَغَرَامًا وَظَمَأً فِىْ هَوَاجِرِ الطَّلَبِ وَاَوَامًا : ثُمَّ হরফে আত্ফ যা تَرَاخِىْ বুঝায়। অর্থাৎ معطوف عليه থেকে معطوف অনেক বিলম্বে সংঘটিত হয়েছে একথা বুঝায়। এখানে মুসান্নিফ (র.)-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার অনাগ্রহের পরে তাদের আগ্রহ বেড়েছে একথা বুঝানো হয়েছে। مُدَافَعَةٌ এটি باب مفاعلة-এর মাসদার। এর দ্বারা তাদের বারবার নিবেদন করা এবং মুসান্নিফ (র.)-এর বারবার প্রত্যাখ্যান করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। شَغَفٌ অর্থ- আসক্তি, মোহ, তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এ অর্থ شِغَافٌ থেকে উদ্ভূত। شِغَافٌ বলা হয় অন্তরস্থ চামড়া বা পর্দাকে। اَلْغَرَامُ অর্থ- অনুরাগ, মোহ, কামনা।

ظَمَأً অর্থ- পিপাসা। এখানে مشبه به হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর مشبه হলো অতি আগ্রহ।

هَوَاجِرُ শব্দটি هَاجِرَةٌ-এর বহুবচন। هَاجِرَةٌ প্রচণ্ড গরমকালের দ্বিপ্রহরকে বলা হয়। هَوَاجِرِ الطَّلَبِ-এর মধ্যে اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهِ اِلَى الْمُشَبَّهِ মূলবাক্যটি এরূপ- رَغْبَةٌ فِى الطَّلَبِ الشَّبِيْهِ بِالْهَوَاجِرِ তাদের طَلَبٌ বা আবদারের মধ্যে আগ্রহ এত বেশি যে, আবদার তাদের মনের মধ্যে পুষে রাখাটা দ্বিপ্রহরের সময়ের মতোই কষ্টকর। اُوَامٌ : শব্দের অর্থ- তৃষ্ণার তীব্রতা। এটি ظما বা তৃষ্ণার জন্য আবশ্যিক। এখানে اُوَامٌ দ্বারা এর مَلْزُوْمٌ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আকর্ষণ ও আগ্রহ।

قَوْلُهُ فَانْتَصَبْتُ لِشَرْحِ الْكِتَابِ عَلٰى وُفْقِ مُقْتَرِحِهِمْ ثَانِيًا :

اِنْتَصَبْتُ : অর্থ- দাঁড়ানো, এখানে প্রস্তুতি গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلٰى وُفْقِ مُقْتَرِحِهِمْ : বাক্যের এ অংশটি উহ্য موصوف-এর صفت সে موصوف টি হলো اِنْتِصَابًا বা شَرْحًا আর وَفْقًا-এর অর্থ- مُوَافَقَةٌ বা অনুযায়ী। مُقْتَرَحٌ : শব্দটি اقتراح-এর اسم مفعول আর اَلْاِقْتِرَاحُ অর্থ- কোনো জিনিস কারো কাছে চিন্তা-ভাবনা ছাড়া চাওয়া। ثَانِيًا : অর্থ- দ্বিতীয়বার। এটি تركيب-এর মধ্যে উহ্য مصدر-এর দ্বিতীয় صفت, সেই موصوف টি হলো اِنْتِصَابًا বা شَرْحًا তবে এটি ظرف হওয়ারও সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ فى زمان ثان ।

قَوْلُهُ وَلِعِنَانِ الْعِنَايَةِ نَحْوَ اِخْتِصَارِ الْاَوَّلِ ثَانِيًا : وَلِعِنَانِ-এর পূর্বে যে واو রয়েছে তা উহ্য হলে বাক্যটির অর্থ ও এর তারকীব যথাযথ হতো। কেননা, তখন ثَانِيًا শব্দটি اِنْتَصَبْتُ থেকে حال হতো। আর যদি واو থাকে তবে واو-কে حاليه বলা যায় না, কারণ واو حاليه সব সময় جملة-এর পূর্বে আসে, مفرد-এর পূর্বে আসে না। আর যদি واو-কে عاطفة বলা হয়, তবে ثَانِيًا-এর معطوف عليه হিসেবে ثَانِيًا পূর্বেরটিকে প্রয়োগ করা যায় না। অনেকে واو টিকে সঠিক ধরে নিয়ে এভাবে জবাব দিয়েছেন যে, واو এখানে عاطفة আর ثَانِيًا শব্দটি প্রথম ثَانِيًا-এর উপর عطفও হয়েছে, তবে এভাবে যে, দ্বিতীয় ثَانِيًا-এর পূর্বে একটি موصوف উহ্য রয়েছে। কারো মতে তারকীব এভাবেও হতে পারে যে, প্রথম ثَانِيًا টা اِنْتَصَبْتُ থেকে حال হয়েছে। আর দ্বিতীয় ثَانِيًا প্রথমটির معطوف হয়েছে। অথবা لِعِنَانِ الْعِنَايَةِ-এর পূর্বে একটি فعل উহ্য আছে, আর তা হলো اِجْتَهَدْتُ তখন ثَانِيًا শব্দটি اِجْتَهَدْتُ-এর فاعل থেকে حال হয়েছে বলা হবে। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় ثَانِيًا এখানে صَارِفًا বা প্রত্যার্পণকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

عِنَانٌ : (فاء كلمة مكسور) অর্থ– বাগডোর বা লাগাম।

عَنَانٌ : (فاء كلمه مفتوح) অর্থ : আকাশের উপরিভাগ। عَنَانٌ-এর বহুবচন اَعِنَّةٌ। আর عِنَايَةٌ অর্থ– সুদৃঢ় ইচ্ছা, গুরুত্ব عِنَايَةٌ শব্দটি مشبه, এর مشبه به হলো বাহনজন্তু। যেহেতু مشبه به উহ্য তাই এটি استعارة مكنية আর عِنَانٌ-কে مشبه-এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা استعارة تخييلية।

نَحْوَ اِخْتِصَارِ الْاَوَّلِ অর্থাৎ اِلَى اِخْتِصَارِ الْاَوَّلِ এখানে نَحْوُ শব্দটি جِهَةٌ অথবা اِلَى-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ مَعَ جُمُوْدِ الْقَرِيْحَةِ بِصِرِّ الْبَلِيَّاتِ : جُمُوْدٌ অর্থ– জমে যাওয়া, প্রবাহিত না হওয়া। এখানে দুর্বল হওয়ার অর্থে استعارة হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। قَرِيْحَةٌ অর্থ– স্বভাব বা তবিয়ত। قَرِيْحَةٌ শব্দের মৌলিক অর্থ হলো– কূপের উঠানো প্রথম পানি। এরপর استعارة হিসেবে নতুন উদ্ভাবিত علم-কে قَرِيْحَةٌ বলা হয়। কেননা, উভয়টি যথাক্রমে শরীর ও রূহের জীবন দানকারী। এরপর এটিকে عقل-এর অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেহেতু عقل হলো ইলমের স্থান। جُمُوْدُ الْقَرِيْحَةِ-এর قريحة-কে পানির সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। مشبه به উহ্য, مشبه উল্লেখ রয়েছে استعارة مكنية হিসেবে। এরপর جمود কে مشبه-এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা استعارة تخييلية হয়েছে। এরপর جُمُوْدٌ-কে مشبه-এর জন্য সাবিত করার দ্বারা استعارة تخييلية হয়েছে। صِرُّ الْبَلِيَّاتِ-এর মধ্যে اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهِ اِلَى الْمُشَبَّهِ হয়েছে। صِرٌّ হলো مشبه به এবং بَلِيَّاتٌ হলো مشبه।

بَلِيَّاتٌ : শব্দটি بَلِيَّةٌ-এর বহুবচন। অর্থাৎ বিপদাপদ । আর صِرٌّ-এর অর্থ হলো– হিমশীতল ঠাণ্ডা, যা পানিকে বরফে পরিণত করে।

قَوْلُهُ وَخُمُوْدِ الْفِطْنَةِ بِصَرْصَرِ النَّكَبَاتِ : خُمُوْدٌ শব্দটি মাসদার, অর্থ– আগুন নির্বাপিত হওয়া ।

اَلْفِطْنَةُ : অর্থ– বুঝ, শক্তি, বোধ। তবে এখানে মেধা বা জ্ঞানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

خُمُوْدِ الْفِطْنَةِ : এর মধ্যে দু'টি استعارة হয়েছে। (এক) فِطْنَةٌ-কে আগুনের সাথে استعارة بالكناية হিসেবে উপমা দেওয়া হয়েছে। আর (দুই) خُمُوْدٌ-কে فِطْنَةٌ (বা مشبه)-এর জন্য সাবিত করা হয়েছে استعارة تخييلية হিসাবে। صِرٌّ শব্দের অর্থ– ঝড়ো হওয়া বা ঘূর্ণিবায়ু। نَكَبَاتٌ শব্দটি نَكْبَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– নিত্য নতুন বিপদাপদ। صَرْصَرِ النَّكَبَاتِ-এর মধ্যে اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهِ اِلَى الْمُشَبَّهِ হয়েছে। صَرْصَرٌ হলো مشبه به এবং نَكَبَاتٌ হলো مشبه ।

قَوْلُهُ وَتَرَامِى الْبُلْدَانِ بِىْ وَالْاَقْطَارِ : এখানে تَرَامِى-এর আগে مَعَ উহ্য আছে। تَرَامِى : باب تفاعل-এর মাসদার । অর্থ– একস্থান হতে অন্য স্থানে নিক্ষেপ করা। بُلْدَانٌ শব্দটি بَلَدٌ-এর বহুবচন। অর্থ– শহর বা নগর। اَقْطَارٌ শব্দটি قُطْرٌ-এর বহুবচন। অর্থ– রাষ্ট্র । تَرَامِى الْبُلْدَانِ وَالْاَقْطَارِ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জ্ঞানের সন্ধানে বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়ানো এবং কোথাও স্থায়ীভাবে থাকতে না পারা। বাক্যটিতে استعارة بالكناية হয়েছে। কারণ, এতে بُلْدَانٌ

وَاَقْطَارْ-কে عُقَلَاءْ বা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। এরপর مشبه به-কে উহ্য রাখা হয়েছে এবং مشبه উল্লেখ আছে। আর تَرَامِىْ-কে مشبه-এর জন্য সাবিত করার দ্বারা استعارة تخييليه হয়েছে। আর اَلْبُلْدَانْ-এর পূর্বে একটি مضاف উহ্য আছে। অর্থাৎ تَرَامِىْ اَهْلِ الْبُلْدَانِ উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন শহরে স্থানান্তর হলে রাষ্ট্রেরও পরিবর্তন হয়, তাই اَقْطَارْ শব্দটিকে بُلْدَانْ-এর পর জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

وَنُبُوِّ الْاَوْطَانِ عَنِّىْ وَالْاَوْطَارِ : نُبُوٌّ (مصدر) অর্থ– দূরবর্তী হওয়া। اَوْطَانْ শব্দটি وَطَنٌ-এর বহুবচন। অর্থ– স্বদেশ। اَوْطَارْ শব্দটি وَطَرٌ-এর বহুবচন, অর্থ– প্রয়োজন, চাহিদা, পুরো বাক্যের অর্থ হলো স্বদেশ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও। উল্লেখ্য যে, লেখক জ্ঞানের সন্ধানে শহর-বন্দর ও দেশ-দেশান্তরে সফর করেছেন। যার কারণে তার স্বদেশ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি থেকে দূরে থাকাই ছিল স্বাভাবিক।

قَوْلُهٗ حَتّٰى طَفِقْتُ اَجُوْبُ كُلَّ اَغْبَرَ قَاتِمِ الْاَرْجَاءِ : حتى শব্দটি انتهاء غاية-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে حتى শব্দটি তার পূর্বে উল্লিখিত نُبُوِّ الْاَوْطَانِ থেকে غاية হয়েছে। طَفِقْتُ (افعال مقاربة-এর একটি) এটি فعل مضارع-এর উপর আসে এবং فعل مضارع-এর শুরু বুঝায়। اَجُوْبُ : অর্থ– কাটা। যেমন, কুরআন শরীফে আছে– وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ ; এখানে অতিক্রম করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। كُلَّ اَغْبَرَ -এর মধ্যে اَغْبَرَ-এর পূর্বে مَكَانْ শব্দটি উহ্য আছে। অর্থাৎ كُلَّ مَكَانٍ اَغْبَرَ।

اَغْبَرَ : অর্থ– ধূলিময় غَبَرٌ (ধূলি) মূলধাতু থেকে নির্গত। قَاتِمِ الْاَرْجَاءِ : قَاتِمْ শব্দের অর্থ– অন্ধকার, ঘন কালো, মূলত আরবি ভাষায় قاتم শব্দটি রঙের প্রকটতা বুঝায়। যেমন– اَسْوَدُ قَاتِمٌ (খুব কালো), اَحْمَرُ قَاتِمٌ (খুব লালো)। اَرْجَاءُ শব্দটি رَجَاءٌ-এর বহুবচন। অর্থ– কোণ, প্রান্ত, এলাকা ইত্যাদি। قَاتِمُ الْاَرْجَاءِ দ্বারা উদ্দেশ্য ধুলোয় অন্ধকার এলাকা।

قَوْلُهٗ اُحَرِّرُ كُلَّ سَطْرٍ فِىْ شَطْرٍ مِنْهُ مِنَ الْغَبْرَاءِ : اُحَرِّرُ (باب تفعيل)-এর مضارع معروف-এর واحد متكلم। তাহরীর বলা হয় কোনো বিষয়কে সুবিন্যস্তভাবে লেখা, সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা বা শুধুমাত্র লিপিবদ্ধ করা। سَطْرٌ-এর অর্থ– লাইন, সারি, ছত্র। এর বহুবচন اَسْطُرٌ، سُطُوْرٌ আর مِنْهُ-এর মারজি' হলো এই কিতাব, অর্থাৎ مِنَ الْكِتَابِ।

شَطْرٌ অর্থাৎ অংশ বা কোনো জিনিসের অর্ধেক। এখানে প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। غَبْرَاءُ অর্থ– ধূলিময় স্থান, এখানে সাধারণ ভূমি উদ্দেশ্য।

فَيَوْمًا بِحَزْوٰى وَيَوْمًا بِالْعُقَيْقِ * وَبِالْعُذَيْبِ يَوْمًا وَيَوْمًا بِالْخُلَيْصَاءِ

মুসান্নিফ এই কবিতাটিকে তার অবস্থা বুঝানোর জন্য এখানে উপস্থাপন করেছেন। এ কবিতাটি যিনি রচনা করেছেন তিনি যেমন– হাযওয়া, উকাইক, উযাইব এবং খুলাইসাতে এক একদিন করে অবস্থান করেছেন ঠিক তেমনি মুসান্নিফ (র.) এক একদিন এক একস্থানে অবস্থান করেছেন, কোথাও স্থায়ীভাবে বসে এ কিতাব লিখতে পারেননি।

ثُمَّ لَمَّا وُفِّقْتُ بِعَوْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَائِيْدِهِ لِلْاِتْمَامِ وَقَوَّضْتُ عَنْهُ خِيَامَهٗ بِالْاِخْتِتَامِ بَعْدَمَا كَشَفْتُ عَنْ وُجُوْهِ خَرَائِدِهِ اللِّثَامَ وَ وَضَعْتُ كُنُوْزَ الْفَرَائِدِ عَلٰى طَرْفِ الثُّمَامِ فَجَاءَ بِحَمْدِ اللّٰهِ كَمَا يَرُوْقُ النَّوَاظِرَ وَيَجْلُوْ صَدَأَ الْاَذْهَانِ وَيُرْهِفُ الْبَصَائِرَ وَ يُضِيْئُ الْبَابَ اَرْبَابَ الْبَيَانِ وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيْقُ وَالْهِدَايَةُ وَعَلَيْهِ التَّوَكُّلُ فِى الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَهُوَ حَسْبِىْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

অনুবাদ : অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও অনুগ্রহে ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সম্পূর্ণ করার জন্য তৌফিকপ্রাপ্ত হলাম এবং তার মনোরোমা চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে দেওয়ার পর এবং মহামূল্যবান মনিমুক্তার খনি ঘাসের ডগায় রেখে দেওয়ার পর এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের পরিপূর্ণতার তাঁবু কেটে দিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলার অপার মেহেরবানীতে এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি এমন রূপ লাভ করল যে, তা চক্ষুসমূহকে শীতল করে দেয়, মেধার মরীচিকা দূর করে দেয়। আর জ্ঞানকে শানিত করে। এটি বয়ানশাস্ত্রবিদদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে আলোকিত করে, তৌফিক (ভালো কাজ করার যোগ্যতা) ও হিদায়েত (সঠিক পথ প্রদর্শন) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই (লাভ করার আশা) শুরুতে এবং শেষে। একমাত্র তাঁর উপরই যাবতীয় ভরসা। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধাতা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ ثُمَّ لَمَّا وُفِّقْتُ بِعَوْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَائِيْدِهٖ : لَمَّا এখানে ظرف-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে شرط-এর অর্থ রয়েছে। وُفِّقْتُ : শব্দটি وُفِّقْتُ (باب تفعيل) تَوْفِيْق থেকে নির্গত। تَوْفِيْق শব্দের অর্থ হলো– ভালো কাজের জন্য উপায়, উপকরণ অনুকূল করে দেওয়া। عَوْنٌ : অর্থ– সাহায্য করা, تَائِيْد অর্থ– সাহায্য করা। اِتْمَامٌ দ্বারা উদ্দেশ্য এই মুখতাসারুল মা'আনীকে সম্পূর্ণ করা। এ বাক্য দ্বারা বুঝা গেল যে, কিতাব লেখার পর এ ভূমিকাটি লেখা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَقَوَّضْتُ عَنْهُ خِيَامَهٗ بِالْاِخْتِتَامِ : قَوَّضْتُ (باب تفعيل) تَقْوِيْض-থেকে নির্গত। অর্থ– কোনো নির্মাণ বা অবকাঠামো ধ্বংস না করে ভেঙ্গে ফেলা। এখানে استعارة تبعية হিসেবে দূর করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। عَنْهُ-এর ضمير-এর مرجع এ কিতাবের দিকে। خِيَامٌ : শব্দটি خَيْمَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– তাঁবু। اِخْتِتَامٌ : অর্থ– اِتْمَامٌ বা পরিপূর্ণ করা। বাক্যটিতে দু' ধরনের استعارة হয়েছে। প্রথমত কিতাবটিকে পূর্ণ করার পূর্বে মূল্যবান জিনিস (যেমন– নববধূ যা তাঁবুর ভেতরে রয়েছে)-এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। مشبه به উহ্য রয়েছে, অতএব এটি استعارة بالكناية। এরপর خِيَامٌ-কে مشبه-এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা استعارة تخييلية হয়েছে। এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এরূপ, যখন আমি এ কিতাবটি শেষ করতে সক্ষম হলাম এবং এটিকে লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকার পর সবার সামনে প্রকাশ করলাম, যেমন সাধারণ লেখকের বেলায় ঘটে থাকে।

قَوْلُهٗ بَعْدَمَا كَشَفْتُ عَنْ وُجُوْهِ خَرَائِدِهِ اللِّثَامَ : خَرَائِدُ : শব্দটি خَرِيْدَةٌ-এর বহুবচন। অর্থাৎ সুন্দরী রমণী, لِثَامٌ : শব্দটি كِتَابٌ-এর মতো। এর অর্থ– নেকাব যা মূলত চেহারায় দেওয়া হয়। মুসান্নিফ (র.) এ বাক্যে কিতাবের মাসআলাসমূহকে সুন্দরী রমণীর সাথে উপমা দিয়েছেন। مشبه به বাক্যে উল্লেখ্য আছে, অতএব এটি استعارة مصرحة হয়েছে। এরপর مشبه به-এর দুই مناسب যথা وُجُوْهٌ এবং لِثَامٌ-কে مرشحه হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কিতাবের মাসাআলাসমূহ থেকে দুর্বোধ্যতার আবরণ তুলে দিয়েছেন।

قَوْلَهُ وَ وَضَعْتُ كُنُوزَ الْفَرَائِدِ عَلٰى طَرَفِ الثُّمَامِ : وَضَعْتُ এটি كَشَفْتُ-এর উপর عطف হয়েছে। كُنُوْزٌ শব্দটি كَنْزٌ-এর বহুবচন। অর্থ– খনি। তবে এখানে শব্দটি مصدر হয়ে اسم مفعول-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ مَكْنُوْزٌ (জমাকৃত ও রক্ষিত) كُنُوْزَ الْفَرَائِدِ এটি مركب اضافى। এতে اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে। মূলত ইবারতটি এরূপ اَلْفَرَائِدُ الْمَكْنُوْزَةُ আর فَرَائِدُ শব্দটি فَرِيْدَةٌ-এর বহুবচন, অর্থ– মূল্যবান মুক্তা, যা বিশেষ যত্নে রাখা হয়। এখানে মুক্তা দ্বারা জটিল মাসআলাকে বুঝানো হয়েছে। مشبه به-কে বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এটি استعارة مصرحة।

ثُمَامٌ এক ধরনের ঘাস। এটি দেড়শত সেন্টিমিটার লম্বা হয়ে থাকে।

طَرَفِ الثُّمَامِ : অর্থ– ঘাসের অগ্রভাগ, এখানে উদ্দেশ্য হলো যা খুব সহজে আয়ত্ত করা যায়। এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য যে, তিনি কিতাবের কঠিন ও জটিল বিষয়গুলোকে সহজ-সরল ভাষায় পেশ করেছেন, যা আয়ত্ত করা ছাত্রদের জন্য খুব সহজ।

قَوْلَهُ فَجَاءَ بِحَمْدِ اللّٰهِ كَمَا يَرُوْقُ النَّوَاظِرَ : جَاءَ-এর فاعل হলো এ মুখতাসারুল মা'আনী। بِحَمْدِ اللّٰهِ এখানে উহ্য اسم فاعل যথা مُلْتَبِسًا-এর সাথে متعلق হয়ে حال হবে। يَرُوْقُ এটি (باب نصر-এর) رَوْقٌ হতে নির্গত। অর্থ– মুগ্ধ করা। نَوَاظِرُ : শব্দটি نَاظِرَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– দৃষ্টি, এখানে ব্যক্তি উদ্দেশ্য। قَوْلَهُ وَيَجْلُوْ صَدَأَ الْاَذْهَانِ : يَجْلُوْ অর্থ– দূর করা, صَدْأٌ অর্থ– মরীচিকা। اَذْهَانٌ : শব্দটি ذِهْنٌ-এর বহুবচন, অর্থ– মেধা, জ্ঞান ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, বাক্যটিতে اَذْهَانٌ -কে মূল্যবান পদার্থ যথা স্বর্ণ ইত্যাদির সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। مشبه به বাক্যে অনুল্লেখ রয়েছে। অতএব, এটি استعارة بالكناية হয়েছে।

قَوْلَهُ وَيُرْهِفُ الْبَصَائِرَ : يُرْهِفُ (باب افعال-এর) اِرْهَافٌ থেকে নির্গত, অর্থ– শানিত করা, ধারালো করা। بَصَائِرُ শব্দটি بَصِيْرَةٌ-এর বহুবচন, অর্থ– অন্তর্দৃষ্টি এখানে بَصَائِرُ-কে ভোতা বা ধারহীন তরবারির সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর مشبه به-কে উহ্য রাখা হয়েছে استعارة بالكناية হিসাবে। এরপর بَصَائِرُ-এর জন্য اِرْهَافٌ সাব্যস্ত করায় تخييليه হয়েছে।

وَيُضِيْءُ اَلْبَابَ اَرْبَابِ الْبَيَانِ : يُضِيْءُ (باب افعال-এর) اِضَاءَةٌ থেকে নির্গত। অর্থ– আলোকিত করা। اَلْبَابٌ শব্দটি لُبٌّ-এর বহুবচন। অর্থ– আকল বা জ্ঞান। اَرْبَابٌ শব্দটি رَبٌّ-এর বহুবচন। অর্থ– প্রতিপালক, অধিকারী; এখানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلَهُ وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيْقُ وَالْهِدَايَةُ : مِنَ اللّٰهِ অর্থ– আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই, অন্য কারো থেকে নয়। اَلتَّوْفِيْقُ وَالْهِدَايَةُ : এ দু'টি চাই বা আশা করি। بِدَايَةٌ অর্থ– শুরু। আর نِهَايَةٌ অর্থ– অন্তঃ বা শেষ, অর্থাৎ সর্বাবস্থায় হিদায়েত ও তৌফিক কামনা করি।

قَوْلَهُ هُوَحَسْبِيْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ : তিনি আমার জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই উত্তম কর্মবিধাতা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَلْحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلٰى قَصْدِ التَّعْظِيْمِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالنِّعْمَةِ اَوْ بِغَيْرِهَا وَالشُّكْرُ فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيْمِ الْمُنْعِمِ لِكَوْنِهٖ مُنْعِمًا سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ اَوْ بِالْجِنَانِ اَوْ بِالْاَرْكَانِ فَمَوْرِدُ الْحَمْدِ لَايَكُوْنُ اِلَّا اللِّسَانُ وَمُتَعَلِّقُهٗ يَكُوْنُ النِّعْمَةُ وَغَيْرُهَا وَمُتَعَلِّقُ الشُّكْرِ لَايَكُوْنُ اِلَّا النِّعْمَةُ وَمَوْرِدُهٗ يَكُوْنُ اللِّسَانُ وَغَيْرُهٗ فَالْحَمْدُ اَعَمُّ مِنَ الشُّكْرِ بِاِعْتِبَارِ الْمُتَعَلَّقِ وَاَخَصُّ بِاِعْتِبَارِ الْمَوْرِدِ وَالشُّكْرُ بِالْعَكْسِ ـ

অনুবাদ : পরম দয়াময়-মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা (আল্লাহ তা'আলা জন্য।) حَمْد বলা হয় সম্মান প্রদানের উদ্দেশ্যে কারো জন্য মুখে প্রশংসা করা। চাই (সে প্রশংসা) অনুগ্রহ (পাওয়ার)-এর সাথে সম্পর্কিত হোক অথবা অনুগ্রহ ছাড়াই হোক। شُكْر (কৃতজ্ঞতা) বলা হয়, এমন কোনো কাজকে যা দ্বারা অনুগ্রহকারীর প্রতি তার দানের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জানানো হয়। চাই সে প্রশংসা মুখে করা হোক অথবা অন্তরের (কৃতজ্ঞতার) দ্বারা হোক কিংবা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা হোক । সুতরাং حَمْد-এর প্রকাশস্থল শুধুমাত্র মুখ এবং حَمْد-এর সম্পর্ক অনুগ্রহ হতে পারে আবার অনুগ্রহ ছাড়াও হতে পারে। আর شُكْر-এর সম্পর্ক শুধুমাত্র অনুগ্রহের সাথে। আর شُكْر-এর প্রকাশস্থল মুখ এবং মুখ ছাড়াও হতে পারে। সুতরাং حَمْد শব্দটি شُكْر থেকে اَعَمٌّ (অধিক ব্যাপক) مُتَعَلَّق-এর বিবেচনায় এবং اَخَصّ প্রকাশের স্থলের হিসেবে। আর شُكْر শব্দটি এর উল্টো অর্থাৎ شُكْر প্রকাশের স্থান হিসেবে حَمْد থেকে عَام আর مُتَعَلَّقٌ হিসেবে شُكْر খাস।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ اَلْحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلٰى قَصْدِ التَّعْظِيْمِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالنِّعْمَةِ اَوْ بِغَيْرِهَا : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) حَمْد-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। حَمْد শব্দের অর্থ– প্রশংসা করা। পরিভাষায় حَمْد বলা হয় মুখে কারো গুণকীর্তন করা সম্মান দানের উদ্দেশ্যে। এর দ্বারা বুঝা গেল ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছলে কারো প্রশংসাসূচক শব্দ বললে সেটা حَمْد হয় না। সুতরাং বিদ্রূপাত্মক প্রশংসা حَمْد-এর সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেল।

قَوْلُهٗ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالنِّعْمَةِ الخ : এ অংশ দ্বারা شُكْر শব্দটি حَمْد থেকে পৃথক হয়ে গেল, কারণ شُكْر (বা কৃতজ্ঞতা) নিয়ামতের বিনিময়ে হয়। এখানে জেনে রাখা দরকার যে, حَمْد-এর সাথে পাঁচটি জিনিসের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ১. حَامِدٌ বা প্রশংসাকারী, ২. مَحْمُوْدٌ বা যার প্রশংসা করা হয়, ৩. مَحْمُوْدٌ عَلَيْهِ যে বিষয়টির কারণে প্রশংসা করা হয়, ৪. مَحْمُوْدٌ بِهٖ বা যে বিষয় দ্বারা প্রশংসা করা হয়, ৫. صيغه বা যে শব্দ حَمْد-এর বিষয়বস্তুর উপর দালালাত করে। যেমন কেউ বলল زَيْدٌ عَالِمٌ এখানে যে ব্যক্তি এ কথাটি বলেছে সে হলো حَامِدٌ আর زَيْدٌ হলো مَحْمُوْدٌ। এ কথাটি زَيْدٌ-এর জ্ঞান-গরিমার কারণে বলা হয়েছে। তাই তার জ্ঞান-গরিমা হবে مَحْمُوْدٌ عَلَيْهِ। আর زَيْدٌ عَالِمٌ এ বাক্যটির مَفْهُوْم হলো مَحْمُوْدٌ بِهٖ আর زَيْدٌ عَالِمٌ এটি হলো صِيْغَة। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আরো জেনে রাখা দরকার যে, মানতিকের পরিভাষায় كُلِّيٌّ বলা হয় এমন বিষয়বস্তুকে যা সত্তাগতভাবে অনেকের বেলায় প্রযোজ্য অথবা এর বিষয়বস্তুর কল্পনা করা হলে এর মধ্যে অনেক اَفْرَادٌ খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন حَيَوَانٌ-এর অনেকগুলো اَفْرَادٌ রয়েছে, যাদের উপর حَيَوَانٌ শব্দটি প্রযোজ্য হয়। এরপর আমরা দু'টি كُلِّي-এর মাঝে কি ধরনের নিসবত হতে পারে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। দু'টি كُلِّيْ-এর মাঝে চার ধরনের নিসবত পাওয়া যায়।

১. نِسْبَتُ تَسَاوِىْ অর্থাৎ দু'টি كلى পরস্পর এমন যে, প্রত্যেক كلى-কে অপর كُلِّيٌّ-এর প্রত্যেক اَفْرَادٌ-এর উপর প্রয়োগ করা যায়। যেমন– اِنْسَانٌ ও نَاطِقٌ

২. نسبت عام خاص مطلق অর্থাৎ দুই كلى পরস্পর এমন যে, একটি অপরটির প্রত্যেক افراد-এর মাঝে পাওয়া যায়; কিন্তু অপরটি প্রথমটির প্রত্যেক افراد-এর মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রথমটি হলো عام (ব্যাপক) আর অপরটি হলো خاص। যেমন- حَيَوَانٌ ও اِنْسَانٌ সমস্ত اِنْسَانٌ-এর মধ্যে حَيَوَانٌ পাওয়া যায়; কিন্তু সমস্ত حَيَوَانٌ-এর মধ্যে اِنْسَانٌ পাওয়া যায় না।

৩. عام خاص من وجه অর্থাৎ দুই كلى পরস্পর এমন যে, কোনোটি অপরটির সব افراد-এর উপর প্রয়োগ হয় না; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি পাওয়া যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপরটি পাওয়া যায় না। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপরটি পাওয়া যায়; কিন্তু প্রথমটি পাওয়া যায় না। যেমন اِنْسَانٌ ও اَبْيَضْ উভয়টি সাদা মানুষের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। কালো মানুষের মধ্যে اِنْسَانٌ পাওয়া যায়; কিন্তু সাদা পাওয়া গেল না। সাদা বকের ক্ষেত্রে اَبْيَضْ পাওয়া যায়; কিন্তু মানুষ পাওয়া যায় না।

৪. نسبت تباين অর্থাৎ দু'টি كلى পরস্পর বিপরীত ধর্মী' একটি অপরটির افراد-এর উপর প্রয়োগ হয় না। যেমন- شجر (গাছ), حجر (পাথর)।

এ ভূমিকার পর এখন حَمْد ও شُكْر (দু'টি كلى)-এর পরস্পর نسبت নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, তিনটি বিষয় যথা- مَوْرِدْ (প্রকাশের উৎস) مُتَعَلَّقْ (সম্পর্ক) ও مَفْهُوْم (অর্থ)-এর প্রতি লক্ষ্য করে حَمْد এবং شُكْر-এর মাঝে তিন ধরনের নিসবত বা সম্পর্ক পাওয়া যায়। প্রথমত مَوْرِدْ বা প্রকাশের উৎস হিসেবে উভয়ের মাঝে عام خاص مطلق-এর নিসবত; مَوْرِدْ হিসেবে شُكْر হলো عام। কেননা, شكر প্রকাশের উৎস তিনটি যথা মুখ, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর حَمْد হলো خاص। কেননা, এর প্রকাশের উৎস শুধু মুখ। দ্বিতীয়ত مُتَعَلَّقْ বা সম্পর্ক হিসেবেও উভয়ের মাঝে عام خاص مطلق-এর নিসবত। তবে مُتَعَلَّقْ হিসেবে حَمْد হলো عام। কেননা, حَمْد অনুগ্রহের বিনিময়ে হয়, আবার অনুগ্রহ না পেয়েও হতে পারে; কিন্তু شُكْرٌ শুধুমাত্র অনুগ্রহ পাওয়ার পরই হয়ে থাকে। তৃতীয় مفهوم হিসেবে عَامْ خَاصْ مِنْ وَجْهٍ-এর নিসবত। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি অনুগ্রহ পেয়ে মুখে প্রশংসা করে, তাহলে এটি حَمْد ও شُكْر উভয়ই হলো। আর যদি অনুগ্রহ না পেয়ে মুখে প্রশংসা করে, তাহলে শুধুমাত্র حَمْد হলো شُكْر হলো না। আর যদি অনুগ্রহ পেয়ে অন্তর অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রশংসা করে, তাহলে এটি شُكْر হলো, কিন্তু حَمْد হলো না। উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.) এ প্রকারটির কথা তাঁর কিতাবে আলোচনা করেননি।

لِلّٰهِ هُوَ اِسْمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَحِقِّ لِجَمِيْعِ الْمَحَامِدِ وَالْعُدُوْلُ اِلَى الْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الدَّوَامِ وَالثُّبَاتِ وَتَقْدِيْمُ الْحَمْدِ بِاعْتِبَارِ اَنَّهُ اَهَمُّ نَظَرًا اِلٰى كَوْنِ الْمَقَامِ مَقَامَ الْحَمْدِ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ صَاحِبُ الْكَشَّافِ فِىْ تَقْدِيْمِ الْفِعْلِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ عَلٰى مَا سَيَجِئُ وَاِنْ كَانَ ذِكْرُ اللّٰهِ اَهَمَّ نَظَرًا اِلٰى ذَاتِهٖ ـ

অনুবাদ : আল্লাহর তা'আলার জন্য, আল্লাহ এমন সত্তার নাম, যাঁর অস্তিত্ব অত্যাবশ্যকীয়, যিনি যাবতীয় প্রশংসার উপযুক্ত। جملہ اسمیہ-কে গ্রহণ করা হয়েছে دَوَامْ وَاسْتِمْرَارْ (অর্থাৎ বিরামহীন ও অব্যাহতভাবে প্রশংসা)-এর অর্থ দানের জন্য। আর حَمْد শব্দটিকে (لِلّٰه-এর উপর) مقدم করা হয়েছে এ জন্য যে, এ مَقَامْ (স্থান, কাল ও পাত্র) হিসেবে এখানে حَمْد টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন كشاف কিতাবের লেখক মহান আল্লাহর বাণী اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ-এর মধ্যে فعل টি (اَللّٰه-এর নামের উপর) مقدم করার ক্ষেত্রে একই মত পোষণ করেছেন, (অর্থাৎ স্থান, কাল ও পাত্র অনুসারে فعل টিকে আগে আনাই অধিক যুক্তিযুক্ত।) যদিও আল্লাহ তা'আলার নাম তাঁর সত্তা হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ لِلّٰهِ هُوَ اِسْمٌ لِلذَّاتِ : اَللّٰهُ শব্দের আলোচনা । মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা اَللّٰهُ শব্দের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে, এটি اسم আর اسم শব্দটি হরফ ও ফে'লের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। আবার এটি উপাধি, উপনাম ও গুণবাচক নাম বা صفة-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রথমোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। উপাধি, উপনাম ও গুণবাচক নামের বিপরীতে ব্যবহার হয়েছে বলা যায়। তবে গুণবাচক নাম বা صفة-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে বলাই শ্রেয়। এটি اسم جامد বনাম علم এবং جزئى। উল্লেখ্য যে, اَللّٰهُ শব্দটি মহান প্রভুর জন্য اسم ذاتى আর علم বা নামের মধ্যে যেহেতু অন্য কেউ কোনো শরিক থাকতে পারে না তাই এটি جزئى হবে, كلى হবে না। اَلْوَاجِبُ الْوُجُوْدُ অর্থ– যার অস্তিত্ব আবশ্যকীয় । اَلْمُسْتَجْمِعُ لِجَمِيْعِ الْمَحَامِد : অর্থ– যিনি সমস্ত প্রশংসা ও গুণের অধিকারী।

قَوْلُهٗ وَالْعُدُوْلُ اِلَى الْجُمْلَةِ : এ ইবারতের দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-এর বাক্যটি এখানে جملہ اسمیہ কিন্তু মূলে এটি جملہ فعلیہ ছিল। কেননা, এটি حَمْدًا لِلّٰهِ ছিল। حَمْدًا শব্দটি হয়তো বা উহ্য فعل-এর مفعول بہ অথবা উহ্য فعل-এর مفعول مطلق। এরপর حَمْدًا-এর نصب-কে ফেলে দিয়ে তাতে رفع দিয়ে এটিকে جملية اسمية-এ পরিণত করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, কেন এমন করা হলো?

এর জবাব اَلْعُدُوْلُ ... اِلٰى اٰخِرِهٖ দ্বারা দেওয়া হচ্ছে। জবাবের সারকথা হলো– মূল কিতাব তথা তালখীসুল মিফতাহ-এর লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে– আল্লাহর প্রশংসাকে সব সময় ও অব্যাহতভাবে করা, আর এই উদ্দেশ্য جملہ اسمیہ দ্বারা সাধিত হয়। কেননা, جملة اسمية কোনো কাজকে স্থায়ী ও সব সময়ের জন্য বুঝায়, আর فعلیہ নির্দিষ্ট কালের মধ্যে একটি কাজ সংঘটিত হওয়াকে বুঝায়।

قَوْلُهٗ تَقْدِيْمُ الْحَمْدِ بِاعْتِبَارِ الخ : এ ইবারতটিকেও আরো একটি প্রশ্নের উত্তর বলা যায়। প্রশ্নটি হলো– যুক্তি বা আকলের দাবি হলো যে, اَللّٰهُ ও اَلْحَمْدُ শব্দটির মধ্য থেকে اَللّٰهُ-কে আগে আনা অর্থাৎ এভাবে বলা যে, لِلّٰهِ الْحَمْدُ কেননা, اَللّٰهُ শব্দটি একটি সত্তাকে বুঝায়, আর حَمْد সেই সত্তার একটি গুণ। আর উল্লেখ্য যে, সবসময় সত্তা গুণাবলির উপর مقدم হয়, তাই বাক্য বিন্যাসের মধ্যে সত্তা আগে, আর গুণাবলি তারপর হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু তা করা হলো না কেন? এর উত্তর تقديم الحمد দ্বারা দেওয়া হচ্ছে। উত্তরের সারকথা হলো, اَللّٰهُ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার নাম হওয়ার কারণে যদিও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু কিতাব সংকলনের প্রারম্ভে তাঁর حَمْد বা প্রশংসা করা জরুরি। সুতরাং স্থান, কাল ও

পাত্র হিসেবে حَمْد টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মোটকথা, اَللّٰهُ শব্দটি সর্বস্থানেই আল্লাহর নাম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। আর حَمْد শব্দটি বিশেষ কারণে এখানে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, এখানে مقتضى حال হলো حمد-কে আগে আনা, তাই حَمْد-কে আগে আনা হয়েছে। যদি কোনো স্থানে দু'টি জিনিস দুই পৃথক কারণে গুরুত্ববহ হয়, তখন مقتضى حال-এর আশ্রয় নেওয়া হয়। আর مقتضى حال যাকে দাবি করে সেটিকে আগে এনে সমস্যার সমাধান করা হয়। যেমনটি كشاف (তাফসীরগ্রন্থ)-এর লেখক আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী (র.) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ الخ-এর মধ্যে اِقْرَأْ ফে'লটিকে بِاسْمِ رَبِّكَ-এর আগে আনার সম্পর্কে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, এখানে اِقْرَأْ ফে'লটি আল্লাহ তা'আলার নামের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এটি قِرَاءَةٌ-এর স্থান । অর্থাৎ এখানে اِقْرَأْ শব্দটি বলাই উদ্দেশ্য, আল্লাহ তা'আলার নাম মূল উদ্দেশ্য নয়।

মোটকথা, যেমনটি এখানে বিশেষ কারণে اِقْرَأْ শব্দটিকে بِاسْمِ رَبِّكَ-এর আগে আনা হয়েছে, তেমনি মূল কিতাবের লেখক আল্লামা আবুল মা'আলী জালালুদ্দীন একটি বিশেষ গুরুত্বের কারণে حَمْد শব্দটি اَللّٰهُ-এর আগে এনেছেন।

সার-সংক্ষেপ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-এর ব্যাখ্যায় যে কথাগুলো এসেছে এর সারসংক্ষেপ হচ্ছে—

ক. حَمْد বলা হয় সম্মান দানের উদ্দেশ্যে কারো মুখে প্রশংসা করা। এটা নিয়ামত ভোগ করেও হতে পারে, আবার নিয়ামত ভোগ না করেও হতে পারে।

খ. شُكْر বলা হয় সম্মান দানের উদ্দেশ্যে নিয়ামতদাতার প্রশংসা কথা/কাজ/অন্তর দ্বারা আদায় করা।

গ. প্রকাশস্থল হিসেবে হামদ্ খাস আর শুক্র আম (ব্যাপক)। পক্ষান্তরে متعلق হিসেবে শুক্র খাস এবং হামদ্ আম।

ঘ. اَللّٰهُ শব্দটি এমন সত্তার নাম, যিনি ওয়াজিবুল উজুদ (যাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য এবং না থাকা অসম্ভব) এবং যিনি যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী, এটি তাঁর নামবাচক শব্দ গুণবাচক শব্দ নয়।

ঙ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্যটিকে جملة اسمية রূপে ব্যবহার করা হয়েছে স্থায়িত্ব ও সর্বদা বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ প্রশংসা বিরামহীন ও অব্যাহতভাবে করার জন্য।

চ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এ বাক্যে حَمْد-কে اَللّٰهُ শব্দের উপর مقدم করা হয়েছে مقتضى حال-এর দাবি অনুযায়ী।

عَلٰى مَا اَنْعَمَ اَىْ عَلٰى اِنْعَامِهٖ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُنْعَمِ بِهٖ اِيْهَامًا لِقُصُوْرِ الْعِبَارَةِ عَنِ الْاِحَاطَةِ بِهٖ وَلِئَلَّا يَتَوَهَّمَ اِخْتِصَاصُهٗ بِشَيْءٍ دُوْنَ شَيْءٍ وَعَلَّمَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ رِعَايَةً لِبَرَاعَةِ الْاِسْتِهْلَالِ وَتَنْبِيْهًا عَلٰى فَضِيْلَةِ نِعْمَةِ الْبَيَانِ مِنَ الْبَيَانِ بَيَانٌ لِقَوْلِهٖ مَا لَمْ نَعْلَمْ قُدِّمَ رِعَايَةً لِلسَّجْعِ وَالْبَيَانُ هُوَ الْمَنْطِقُ الْفَصِيْحُ الْمُعْرِبُ عَمَّا فِى الضَّمِيْرِ ـ

অনুবাদ : (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার) **তিনি যে নিয়ামত দিয়েছেন তার জন্য।** অর্থাৎ তাঁর নিয়ামত দানের জন্য। মুসান্নিফ (র.) مُنْعَمٍ بِهٖ (নিয়ামতসমূহের বর্ণনা)-এর উল্লেখ করেননি এ কথা জানানোর জন্য যে, সেগুলোকে আয়ত্ত ও গণনা করতে ভাষা অক্ষম এবং (কতেক উল্লেখ করলে) যেন এ ধারণা না জাগে যে, নিয়ামত কিছু জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। **এবং তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।** এটি হলো خاص-কে عام-এর উপর عطف করা (এমনটি করা হয়েছে) بَرَاعَةِ اِسْتِهْلَالٌ-এর প্রতি লক্ষ্য করে এবং 'বয়ান'-এর নিয়ামতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য مِنَ الْبَيَانِ এটি মূলত মূল লেখকের (ইবারাতাংশ) مَا لَمْ نَعْلَمْ-এর বয়ান বা ব্যাখ্যা। (مِنَ الْبَيَانِ) এটিকে مَا لَمْ نَعْلَمْ-এর আগে আনা হয়েছে অনুপ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করে। اَلْبَيَانُ বলা হয় ঐ সাবলীল বক্তব্যকে, যা মনের ভাব প্রকাশ করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এখান থেকে মূল কিতাবের লেখক مَحْمُوْدٌ عَلَيْهِ বা যে কারণে প্রশংসা করা হয়েছে, সেটি উল্লেখ করেছেন। এখানে দু'টি مَحْمُوْدٌ عَلَيْهِ-এর উল্লেখ করেছেন। (ক) তাঁর নিয়ামত দান। (খ) তিনি আমাদের অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞাত করেছেন বা শিখিয়েছেন। عَلٰى مَا اَنْعَمَ বাক্যটি اَلْحَمْدُ-এর সাথে متعلق হয়নি; বরং এর متعلق উহ্য আছে। সেই উহ্য (كَائِنٌ)-এর সাথে متعلق হয়ে এটি দ্বিতীয় খবর হবে। এ অবস্থায় এ বাক্যটি ইঙ্গিত বহন করে যে, আল্লাহর সত্তা যেমন حَمْد-এর উপযুক্ত, তেমনি তাঁর صفات বা গুণাবলিও حَمْد-এর উপযুক্ত। অথবা এটি উহ্য خبر-এর সাথে متعلق আর لِلّٰهِ হলো اَلْحَمْدُ-এর সাথে متعلق হয়ে مبتدأ। অথবা, এটির আগে একটি উহ্য ফে'ল اَحْمَدُ-এর সাথে متعلق হয়ে নতুন বাক্য।

قَوْلُهٗ عَلٰى مَا اَنْعَمَ : এর ব্যাখ্যা মুসান্নিফ (র.) عَلٰى اِنْعَامِهٖ-এর দ্বারা করে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, ما এখানে مصدريه-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, موصوله বা موصوفه হয়নি। وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُنْعَمِ بِهٖ এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, তালখীসুল মিফতাহ -এর মুসান্নিফ (র.) مُنْعَمْ بِهٖ অর্থাৎ নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করেননি কেন? এর উত্তর হলো, আল্লাহর নিয়ামত অসংখ্য ও অগণিত। তিনি কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন 'তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতের গণনা করতে চাও তবে তা গণে শেষ করতে পারবে না।' (সূরা ইবরাহীম) সুতরাং আপনি যদি যাবতীয় নিয়ামত উল্লেখ করতে চান, তাহলে তো তা সম্ভব নয়। কেননা, তাঁর নিয়ামত অসংখ্য ও অগণিত, কোনো লেখনী তা লিখে শেষ করতে পারবে না। আর যদি কিছু নিয়ামত উল্লেখ করা হয়, তাহলে তার مُنْعَمْ بِهٖ কিছু নিয়ামতের সাথে খাস হয়ে গেল। যার ফলে এ ধারণা জন্মাতে পারে যে, উল্লিখিত নিয়ামতসমূহের জন্যই আল্লাহ তা'আলা حَمْد-এর উপযুক্ত, অন্য নিয়ামতের জন্য প্রশংসার উপযুক্ত নয়। অথচ এ ধারণাটি সঠিক নয়। অতএব, مُنْعَمْ بِهٖ উল্লেখ না করাই যুক্তিযুক্ত।

قَوْلُهٗ وَعَلَّمَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ : এ ইবারতের মূলকথা হলো, علم শব্দটি معطوف, এর معطوف عليه হলো اَنْعَمَ, আর اَنْعَمَ-এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সব নিয়ামতের কথা সার্বিকভাবে বলা হয়েছে। আর عَلَّمَ-এর মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ামত (যা নিয়ামতসমূহের একটি) তথা বয়ান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতএব, معطوف عليه হলো عام আর معطوف হলো خاص।

قَوْلُهُ رِعَايَةً لِبَرَاعَةِ الْاِسْتِهْلَالِ وَتَنْبِيْهًا الخ : এ বাক্যটি উহ্য একটি فعل-এর مفعول له উহ্য ইবারাতটি হলো رِعَايَةً عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ -এর অর্থ হলো, علم-কে انعم-এর উপর عطف করার কারণ হলো দু'টি–

১. بَرَاعَةُ اِسْتِهْلَالْ-এর প্রতি লক্ষ্য করে।

بَرَاعَةُ اِسْتِهْلَالْ-এর সংজ্ঞা : কিতাবের শুরুতে লিখা হয়েছে সেখানে দেখুন। এখানে অর্থাৎ ভূমিকাতে بَيَانْ শব্দটির দ্বারা بَرَاعَةُ اِسْتِهْلَالْ হয়েছে। ২. দ্বিতীয় কারণ হলো بَيَانْ-এর নিয়ামতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। কেননা, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলোর একটি হলো মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে; কিন্তু অন্য প্রাণী তা পারে না। অতএব, বাক্যটির অর্থ এরূপ হলো– بَرَاعَةُ اِسْتِهْلَالْ এবং বয়ানের নিয়ামতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার জন্য خاص-কে عام-এর উপর عطف করা হয়েছে। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেন, مِنَ الْبَيَانِ-এর مِنْ শব্দটি بَيَانِيَّةٌ যা মূলত مَا لَمْ نَعْلَمْ-এর বয়ান বা ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ قَدَّمَ رِعَايَةً الخ এ ইবারত দ্বারাও মুসান্নিফ একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, مَا لَمْ مِنَ الْبَيَانِ যদি نَعْلَمْ-এর বয়ান হয়, তবে এটি তো مَالَمْ نَعْلَمْ-এর পরে আসার কথা; কিন্তু বাস্তবে আগে আনা হলো কেন?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, مِنَ الْبَيَانِ টিকে سجع অর্থাৎ অনুপ্রাসের জন্য مَالَمْ نَعْلَمْ-এর আগে আনা হয়েছে। سجع অর্থ– অনুপ্রাস। অর্থাৎ দু'টি বাক্যের শেষ একই রকম হওয়া। আগের বাক্যে اَنْعَمَ-এর শেষাক্ষর মীম (م), مِنَ الْبَيَانِ-কে আগে আনা হলে এ বাক্য : مَالَمْ نَعْلَمْ-এর শেষাক্ষরও মীম হবে। এতে অনুপ্রাস পাওয়া গেল। আর যদি مَالَمْ نَعْلَمْ مِنَ الْبَيَانِ লেখা হয়, তবে এ মিলটি হয় না। এতে বাক্যের সৌন্দর্যহানী হতো।

قَوْلُهُ وَالْبَيَانُ هُوَ الْمَنْطِقُ الْفَصِيْحُ الْمُعْرِبُ عَمَّا فِى الضَّمِيْرِ : বয়ান অর্থ– সাবলীল বক্তব্য যা মনের ভাব প্রকাশ করে। সুতরাং মনের ভাব প্রকাশকারী যে কোনো সাবলীল বক্তব্যই হলো বয়ান।

সার সংক্ষেপ :

ক. আল্লাহর নিয়ামত অসংখ্য ও অগণিত, তাই নির্দিষ্ট নিয়ামত উল্লেখ করা হয়নি।

খ. عَلَّمَ-এর আত্ফ اَنْعَمَ-এর উপর عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ-এর ভিত্তিতে করা হয়েছে।

গ. নিয়ামতে বয়ানের শ্রেষ্ঠত্ব ও بَرَاعَةُ اِسْتِهْلَالْ-এর উদ্দেশ্যে বয়ান শিখানোর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

وَالصَّلٰوةُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ نَطَقَ بِالصَّوَابِ وَاَفْضَلِ مَنْ اُوْتِىَ الْحِكْمَةَ هِىَ عِلْمُ الشَّرَائِعِ وَكُلُّ كَلَامٍ وَافَقَ الْحَقَّ وَتُرِكَ فَاعِلُ الْاِيْتَاءِ لِاَنَّ هٰذَا الْفِعْلَ لَايَصْلَحُ اِلَّا لِلّٰهِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اَىِ الْخِطَابَ الْمَفْصُوْلَ الْبَيِّنَ الَّذِىْ يَتَبَيَّنُهُ مَنْ يُخَاطَبُ بِهٖ وَلَا يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ اَوِ الْخِطَابَ الْفَاصِلَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَعَلٰى اٰلِهٖ اَصْلُهٗ اَهْلٌ بِدَلِيْلِ اُهَيْلٍ ـ

অনুবাদ : **দরূদ ও সালাম আমাদের সরদার মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি ছিলেন সেই সব লোকদের শ্রেষ্ঠ যাঁরা সত্য ও সঠিক কথা বলেছেন এবং সে সব লোকদের মাঝে সর্বোত্তম যাঁদের হিকমত দান করা হয়েছে।** হিকমত হচ্ছে শরিয়তের জ্ঞান এবং ঐ কথা যা হক বা সত্যের অনুকূল বা এর সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হয়। اِيْتَاءٌ-এর فاعل বা কর্তাকে (এখানে) উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, এ কাজ (اِيْتَاءُ حِكْمَةٍ) আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো দ্বারা সম্পাদন সম্ভব নয়। **এবং (যাদের) সুস্পষ্ট বক্তব্য (দান করা হয়েছে)** অর্থাৎ এমন সুস্পষ্ট কথা, যা সম্বোধিত ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারে এবং তার কাছে কথাটি অস্পষ্ট অনুভূত হয় না অথবা এমন বক্তব্য যা সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। **এবং (দরূদ ও সালাম) তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজনের প্রতি।** اٰلٌ শব্দটির মূল হলো اَهْلٌ ; এর প্রমাণ এই যে, এর تَصْغِيْر হলো اُهَيْلٌ। (কেননা تصغير-এর দ্বারা শব্দের মূলরূপ প্রতিভাত হয়।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى سَيِّدِنَا الخ : صَلٰوةٌ শব্দের আলোচনা কিতাবের শুরুতে খুতবার মধ্যে করা হয়েছে, তাই এখানে পুনঃ উল্লেখ করা হলো না। سَيِّدٌ অর্থ– নেতা, সরদার, প্রধান কর্তা ইত্যাদি। এর বহুবচন سَادَةٌ، اَسْيَادٌ، سَيَائِدُ ব্যবহার হয়। خَيْرٌ শব্দটি اَخْيَرُ، اسم تفضيل-এর কোমল রূপ। خَيْرٌ রূপেই এর ব্যবহার প্রচলিত।

قَوْلُهٗ نَطَقَ بِالصَّوَابِ : نَطَقَ يَنْطِقُ (باب ضرب) থেকে নির্গত, অর্থ– কথা বলা। اَلصَّوَابُ : শব্দটির অর্থ হলো ضِدُّ الْخَطَاءِ অর্থ– ভুলের বিপরীত যে কোনো সঠিক বা সত্য বিষয়। এখানে মূল কিতাবের লেখক রাসূলে কারীম ﷺ-এর হাজারো প্রশংসনীয় গুণাবলির মধ্য থেকে نَطَقَ بِالصَّوَابِ বা সত্য বলার গুণটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বয়ানের নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। এ ছাড়া বাক্যটি দ্বারা কুরআনের আয়াত وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى-এর প্রতি تَلْمِيْح করা হয়েছে। تَلْمِيْح হলো বালাগাতের একটি পরিভাষা। تَلْمِيْح বলা হয় কথার মাঝে কোনো প্রসিদ্ধ ঘটনা, কবিতা, কিংবা কুরআনের বা হাদীসের বিশেষ আয়াতের প্রতি ঈঙ্গিত করা ।

قَوْلُهٗ وَاَفْضَلِ مَنْ اُوْتِىَ الْحِكْمَةَ : বাক্যটি خَيْرِ مَنْ نَطَقَ-এর উপর عطف হয়েছে। حِكْمَةٌ শব্দের ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ (র.) বলেন, حكمة বলা হয় শরিয়ত ও আহকাম তথা বিধি-বিধানের জ্ঞানকে এবং ঐ কথাকে, যা সত্য এবং বাস্তবের অনুযায়ী হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, হিকমতের প্রথম ব্যাখ্যাটি خاص আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি عام বা ব্যাপক। সে হিসাবে وَكُلُّ كَلَامٍ الخ বাক্যটি দ্বারা عَطْفُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ করা হলো। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার উদাহরণ যেমন– এক দু'য়ের অর্ধেক এটি বাস্তবসম্মত কথা কিন্তু শরিয়ত নয়।

قَوْلُهٗ تُرِكَ فَاعِلُ الْاِيْتَاءِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো– مَنْ اُوْتِىَ الْحِكْمَةَ এ বাক্যটিতে اوتى ফে'লটি مجهول হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর فاعل-কে উল্লেখ করা হয়নি। এখানে প্রশ্ন হলো, ফে'লটি مجهول ব্যবহার করে فاعل-কে উল্লেখ কেন করা হলো না? এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, اِيْتَاءٌ-এর فاعل সুনির্দিষ্ট এবং একজন মাত্র, আর তিনি হচ্ছেন মহান রাব্বুল 'আলামীন। কেননা, হিকমত বা শরিয়ত দান আল্লাহ ছাড়া আর কারো দ্বারা হতে পারে না। সুতরাং যেহেতু اِيْتَاءٌ-এর فاعل লেখক ও পাঠক সবার মনে নির্দিষ্ট, তাই এটিকে উল্লেখ করা হয়নি।

قَوْلُهُ وَفَصْلَ الْخِطَابِ : এটি اَلْحِكْمَةَ-এর উপর عطف হবে। অর্থাৎ যাদের হিকমত এবং فَصْلَ الْخِطَابِ দেওয়া হয়েছে তিনি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। فَصْلَ الْخِطَابِ-এর ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটি একটি مصدر متعدى। অতএব, এটি اسم مفعول-এর অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, তখন ইবারত হবে- اَلْخِطَابُ الْمَفْصُوْلُ অথবা এটি اسم فاعل-এর অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, তখন ইবারত হবে- اَلْخِطَابُ الْفَاصِلُ। প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে- এমন কথা যা সম্বোধিত ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে- সত্য ও মিথ্যার মাঝে প্রভেদকারী। উভয় অবস্থায় فَصْل-এর সম্পর্ক اَلْخِطَابْ-এর সাথে اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ হিসেবে। তবে فَصْل শব্দটিকে مصدر-এর অর্থে বাকি রাখাও সম্ভব। তখন فَصْل-এর اضافت-টি হবে جَرْدُ قَطِيْفَةٍ-এর মতো مبالغة হিসাবে। অর্থাৎ এর আমল হবে خِطَابْ فَصْل যেমন- رَجُلٌ عَدْلٌ

خِطَابْ : শব্দের অর্থ- সম্বোধন করা বা সম্বোধনের বাক্য। حِكْمَةً وَفَصْلَ الْخِطَابِ শব্দদ্বয় দ্বারা মূল লেখক কুরআনের আয়াত وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ-এর প্রতি تَلْمِيْح করেছেন।

يَتَبَيَّنُهُ : اَلْبَيِّنُ الَّذِىْ يَتَبَيَّنُهُ مَنْ يُخَاطَبُ بِهٖ وَلَايَلْتَبِسُ عَلَيْهِ অর্থ- স্পষ্ট ও প্রকাশমান পাওয়া, এটি اَلْبَيِّنُ শব্দের تفسير বা ব্যাখ্যা। এমনিভাবে وَلَايَلْتَبِسُ শব্দটিও بَيِّن-এর ব্যাখ্যা, اِلْتِبَاسْ শব্দের অর্থ- অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত। সুতরাং لَايَلْتَبِسُ-এর অর্থ হলো সহজবোধ্য ও সন্দেহযুক্ত।

সার-সংক্ষেপ :

ক. صَلٰوة শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। এখানে দরূদ ও দোয়া-এর অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

খ. حِكْمَةٌ শব্দের অর্থ- শরিয়তসম্মত এবং সত্য ও বাস্তবভিত্তিক কথা।

গ. فَصْلَ الْخِطَابِ দু' অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যথা- ১. اَلْخِطَابُ الْمَفْصُوْلُ ২. اَلْخِطَابُ الْفَاصِلُ

قَوْلُهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْلُهُ اَهْلٌ بِدَلِيْلِ اُهَيْلٍ : প্রথমত এ কথাটি জানা দরকার যে, ال শব্দের اضافت যমীরের দিকে করা যায় কিনা? এ নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, এর اضافت প্রকাশ্য ইসমের দিকে যেমন বৈধ, তেমনি ضمير বা সর্বনামের দিকেও বৈধ। এর দলিল হলো আব্দুল মুত্তালিব-এর একটি পঙ্‌ক্তি :

اُنْصُرْ عَلٰى اٰلِ الصَّلِيْبِ * وَعَابِدِيْهِ الْيَوْمَ اٰلُكَ

اَصْلُهُ اَهْلٌ : বলে মুসান্নিফ (র.) দাবি করছেন যে, اٰلٌ শব্দের মূল হলো اَهْلٌ, اَهْلٌ-এর هاء-কে হামযা দ্বারা প্রথমে পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, تَعْلِيْل বা শব্দরূপ পরিবর্তন করা হয় সহজকরণের জন্য, অথচ هاء-কে همزه দ্বারা পরিবর্তন করলে তো শব্দটি আগের চেয়ে কঠিন হয়ে গেল। উত্তর হলো- এখানে الف দ্বারা পরিবর্তন করাই উদ্দেশ্য (যা পরবর্তীতে হয়েছে।) কিন্তু প্রাথমিকভাবে তা সম্ভব না হওয়াতে همزه-এর সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

بِدَلِيْلِ اُهَيْلٍ : বলে মুসান্নিফ (র.) তাঁর দাবির স্বপক্ষে দলিল দিচ্ছেন। দলিলের সারকথা হলো, تَصْغِيْر (فُعَيْلٌ وَفُعَيْلَةٌ-এর ওজন) ইসমকে তার মূলরূপে নিয়ে যায়। অর্থাৎ تَصْغِيْر-এর মাধ্যমে ইসমের সব মূল অক্ষরগুলো প্রকাশ পায়, এটি একটি স্বীকৃত নিয়ম । সুতরাং اٰلٌ-এর تَصْغِيْر যেহেতু اُهَيْلٌ হয়, তাই اٰلٌ যে মূলে اَهْلٌ -ই ছিল তা প্রমাণিত হয়।

خُصَّ اِسْتِعْمَالُهٗ فِى الْاَشْرَافِ وَ اُولِى الْخَطَرِ الْاَطْهَارِ جَمْعُ طَاهِرٍ كَصَاحِبٍ وَاَصْحَابٍ وَصَحَابَتِهِ الْاَخْيَارِ جَمْعُ خَيِّرٍ بِالتَّشْدِيْدِ اَمَّا بَعْدُ هُوَ مِنَ الظُّرُوْفِ الزَّمَانِيَّةِ الْمَبْنِيَّةِ الْمُنْقَطِعَةِ عَنِ الْاِضَافَةِ ـ

অনুবাদ : এর ব্যবহার সম্মানিত এবং অভিজাত ব্যক্তির বেলায় বিশেষভাবে হয়ে থাকে اَطْهَارٌ (অর্থ পূত-পবিত্র) শব্দটি طَاهِرٌ-এর বহুবচন। যেমন- اَصْحَابٌ শব্দটি صَاحِبٌ-এর বহুবচন। এবং (দরূদ ও সালাম) তার সৎ ও মহৎ সাহাবীদের প্রতি। (اَخْيَارٌ শব্দটি) خَيِّرٌ (তাশদীদযুক্ত)-এর বহুবচন। আম্মা বা'দ بَعْدُ শব্দটি এরূপ ظرف زمان-এর অন্তর্ভুক্ত, যা মাবনী এবং মুযাফ ইলাইহ থেকে বিচ্ছিন্ন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ خُصَّ اِسْتِعْمَالُهٗ فِى الْاَشْرَافِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, اٰلٌ শব্দটি যদিও অর্থগতভাবে ব্যাপক তবু এর ব্যবহার সম্মানিত ও অভিজাত লোকদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ । আর اَهْلٌ সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। اَهْلٌ ও اٰلٌ-এর মাঝে এটি ছাড়া আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন- اٰلٌ শব্দটির ব্যবহার শুধুমাত্র জ্ঞানসম্পন্নদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, কিন্তু اَهْلٌ শব্দটি জ্ঞানহীনের প্রতিও হয়ে থাকে। যেমন- اَهْلُ الْاِسْلَامِ ও اَهْلُ بَنْغَلَادِيْش ইত্যাদি। এমনিভাবে اٰلٌ শব্দটি শুধুমাত্র পুরুষের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। আর اَهْلٌ-এর ব্যবহার পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। اٰلٌ-এর صفت হিসেবে اَطْهَارٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা কুরআনের একটি আয়াত اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا-এর প্রতি تَلْمِيْح করা হয়েছে।

وَصَحَابَتِهِ الْاَخْيَارِ : صَحَابَةٌ শব্দটি মূলত মাসদার। এটি বিশেষভাবে রাসূল ﷺ-এর সহচরদের পবিত্র জামাআতকে বুঝায়। اَخْيَارٌ শব্দটি خَيِّرٌ (তাশদীদযুক্ত)-এর বহুবচন। আবার خَيْرٌ (তাশদীদমুক্ত)-এর বহুবচন ও اَخْيَارٌ-ই ব্যবহৃত হয়। তবে দু'টির অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। خَيْرٌ (তাশদীদমুক্ত) যে কোনো শ্রেষ্ঠত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। আর خَيِّرٌ (তাশদীদযুক্ত) সততা ও মহত্ত্বের মাঝে শ্রেষ্ঠতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। اَخْيَارٌ শব্দটি দ্বারা মূল কিতাবের লেখক কুরআনের আয়াত كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ الخ এবং হাদীসে রাসূল خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ-এর প্রতি تَلْمِيْح করেছেন।

قَوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ هُوَ مِنَ الظُّرُوْفِ .. : اَمَّا তার পরবর্তী কথাকে তাকিদের সাথে পূর্ববর্তী কথা থেকে পৃথক করার জন্য আসে। তাকিদের বিষয়টি আমরা একটি উদাহরণ থেকে বুঝতে পারি যে, কেউ যখন বলে زَيْدٌ قَائِمٌ তখন এর মধ্যে তাকিদ থাকে না; কিন্তু যখন সে বলে اَمَّا زَيْدٌ قَائِمٌ তখন এতে তাকিদ থাকে। কেননা, اَمَّا-এর পুরো বাক্য হলো مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ قَائِمٌ অর্থ- যখনই কোনো জিনিস অস্তিত্বশীল হবে তখন যায়েদ দাঁড়ানো অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে হাজারো জিনিসের অস্তিত্ব যেমন সত্য, তেমনি যায়েদের দাঁড়ানোও সত্য। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, بَعْدُ এখানে মাবনী। কেননা, بَعْدُ এখানে مضاف اليه থেকে শাব্দিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং مضاف اليه লেখক এবং পাঠকের মনে রয়েছে এবং অর্থগতভাবেও বিদ্যমান। আমরা জানি قَبْلُ, بَعْدُ ও حَيْثُ ইত্যাদি শব্দের مضاف اليه যদি শাব্দিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয় এবং মনে থাকে, তবে এগুলো মাবনী (অপরিবর্তনশীল) হয়।

اَىْ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ وَالْعَامِلُ فِيْهِ "اَمَّا" لِنِيَابَتِهَا عَنِ الْفِعْلِ وَالْاَصْلُ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَئٍ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ وَ"مَهْمَا" هٰهُنَا مُبْتَدَأٌ وَالْاِسْمِيَّةُ لَازِمَةٌ لِلْمُبْتَدَأِ وَيَكُنْ شَرْطٌ وَالْفَاءُ لَازِمَةٌ لَهُ غَالِبًا فَحِيْنَ تَضَمَّنَتْ "اَمَّا" مَعْنَى الْاِبْتِدَاءِ وَالشَّرْطِ لَزِمَتْهَا الْفَاءُ وَلُصُوْقُ الْاِسْمِ اِقَامَةَ اللَّازِمِ مَقَامَ الْمَلْزُوْمِ وَاِبْقَاءً لِاَثَرِهٖ فِى الْجُمْلَةِ ـ

অনুবাদ : অর্থাৎ (মুযাফ ইলাইহসহ এরূপ) بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ (হামদ ও সালাতের পর) এতে আমেল হলো اَمَّا কেননা, এখানে اَمَّا শব্দটি فعل-এর স্থলাভিষিক্ত। মূল বাক্যটি হলো এরূপ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَئٍ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ (এ বাক্যটির মধ্যে) مَهْمَا হলো মুবতাদা। আর মুবতাদার জন্য ইসম হওয়া জরুরি يَكُنْ ফে'লটি شرط। شرط-এর জবাবের (جَزَاءٌ) মধ্যে সাধারণত فاء আনতে হয়। সুতরাং যখন اَمَّا শব্দটি ইবতেদা এবং شَرْط-এর অর্থকে ধারণ করল, তখন এর জন্য (জবাবের মধ্যে) فاء আনা জরুরি হয়েছে। আর لُصُوْقُ اِسْم (অর্থাৎ اما এরপর اِسْم আনা) হলো লাযেমকে তার মালযূমের স্থানে রাখা এবং এর (اَثَرْ) যে কোনো একভাবে বাকি রাখা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَالْعَامِلُ فِيْهِ : বলে মুসান্নিফ بَعْدُ-এর عَامِلْ-এর আলোচনা শুরু করেছেন, প্রথমে তিনি বলেন যে, এর عامل হলো اَمَّا তবে সরাসরি নয়। এখানে عَامِلْ হয়েছে فعل-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে। এখন প্রশ্ন হলো কোথায় সেই فعل যার স্থলাভিষিক্ত اَمَّا হয়েছে? এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেছেন যে, اَمَّا আসলে مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَئٍ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ ছিল অর্থাৎ এখানে বাক্যটি এরূপই হওয়া দরকার ছিল। অতএব, اَمَّا হরফটি يَكُنْ-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে তাকে عامل বলা হয়েছে। এরপর মুসান্নিফ مَهْمَا يَكُنْ الخ-এর বাক্যের তারকীব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথমত مَهْمَا এ বাক্যে مبتدأ হয়েছে। মুবতাদা হওয়ার জন্য اسم হওয়া জরুরি। কেননা, হরফ এবং ফে'ল মুবতাদা হতে পারে না। يَكُنْ ফে'লটি يُوْجَدُ-এর অর্থে (অর্থাৎ এটি فعل تام) এর ضمير হলো ফায়েল, যা مَهْمَا-এর দিকে ফিরেছে। مِنْ شَئٍ হলো مَهْمَا-এর بيان। সুতরাং يَكُنْ مِنْ شَئٍ হলো شرط আর আমরা জানি شرط-এর জবাব جزاء-এর মধ্যে সাধারণত فاء আসে। এ উহ্য ইবারতের ব্যাখ্যার পর এখানে দু'টি আপত্তি হচ্ছে তা হলো, উহ্য ইবারতের مَهْمَا (মুবতাদা) এবং يَكُنْ (شرط) উভয়টি স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে اَمَّا সুতরাং اَمَّا-এর মধ্যে ابتداء এবং শর্ত উভয়ের অর্থ বিদ্যমান। অর্থাৎ اَمَّا শব্দটি এখানে মুবতাদা এবং শর্ত উভয়ই। তাই মুবতাদা হওয়ার কারণে এর ইসম হওয়া এবং شرط হওয়ার কারণে এর জওয়াব بَعْدُ-এর উপর فاء আসা দরকার। অথচ اَمَّا এখানে ইসমও হয়নি এবং এর জবাবের মধ্যে فاء আসেনি?

এর উত্তরে মুসান্নিফ যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো এই যে, উভয় আপত্তিই সঠিক, অর্থাৎ مَهْمَا (মুবতাদা)-এর জন্য যেমন ইসম হওয়া জরুরি তেমনি এর স্থলাভিষিক্ত اَمَّا-এর জন্যও ইসম হওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু اَمَّا তো নিশ্চিতভাবে হরফ। তাই এখানে لُصُوْق اِسْم অর্থাৎ اَمَّا-এর সাথে بَعْدُ যে মিলে এসেছে, সেই মিলে আসাটাকেই আমরা اَمَّا-এর ইসমের পরিবর্তে ধরে নেব। অর্থাৎ এভাবে بَعْدُ-এর মিলে আসার কারণে اما-এর মধ্যে যেন اسميت এসে গেল। সুতরাং এখন اَمَّا-এর মুবতাদা হতে কোনো বাধা নেই। আমরা এখানে لُصُوْق اِسْم-কে ইসমের স্থলাভিষিক্ত করলাম مَالَا يُدْرِكُ كُلُّهٗ وَلَا يَتْرُكُ كُلُّهٗ (অর্থাৎ কোনো বস্তুর সবটা না পেলে তার সবটা ছেড়ে দেওয়া যাবে না; বরং যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকু কুড়িয়ে নেওয়া উচিত) বাকি রইল فاء-এর বিষয়টি। অর্থাৎ اَمَّا যেহেতু يَكُنْ-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে شرط হলো তাই এর জবাব بَعْدُ-এর মধ্যে فاء আসা দরকার, কিন্তু এমন করতে গেলে اما شرطيه এবং فاء جزائيه একই সাথে হয়ে যাচ্ছে। অথচ শর্তের অক্ষর এবং جزاء-এর শুরুতে فاء না এনে; বরং جزاء-এর মধ্যখানে (لَمَّا-এর উপর) فاء দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, لازم ও ملزوم-এর যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে তা হলো এরূপ- مبتدأ হলো ملزوم-এর জন্য لازم হলো اسميت। এমনিভাবে شرط হলো ملزوم, এর জন্য لازم হলো فاء।

فَلَمَّا هُوَ ظَرْفٌ بِمَعْنَى إِذْ يُسْتَعْمَلُ اِسْتِعْمَالَ الشَّرْطِ يَلِيْهِ فِعْلٌ مَاضٍ لَفْظًا وَمَعْنًى كَانَ عِلْمُ الْبَلَاغَةِ هُوَ الْمَعَانِىْ وَالْبَيَانُ وَعِلْمُ تَوَابِعِهَا هُوَ الْبَدِيْعُ مِنْ اَجَلِّ الْعُلُوْمِ قَدْرًا وَ اَدَقِّهَا سِرًّا اِذْ بِهِ اَىْ بِعِلْمِ الْبَلَاغَةِ وَتَوَابِعِهَا لَا بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُلُوْمِ كَاللُّغَةِ وَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ يُعْرَفُ دَقَائِقُ الْعَرَبِيَّةِ وَاَسْرَارُهَا فَيَكُوْنُ مِنْ اَدَقِّ الْعُلُوْمِ سِرًّا وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوْهِ الْاِعْجَازِ فِىْ نَظْمِ الْقُرْاٰنِ اَسْتَارُهَا اَىْ بِهِ يُعْرَفُ اَنَّ الْقُرْاٰنَ مُعْجِزٌ لِكَوْنِهِ فِىْ اَعْلَى مَرَاتِبِ الْبَلَاغَةِ لِاِشْتِمَالِهِ عَلَى الدَّقَائِقِ وَالْاَسْرَارِ الْخَارِجَةِ عَنْ طَوْقِ الْبَشَرِ وَهٰذَا وَسِيْلَةٌ اِلٰى تَصْدِيْقِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ وَسِيْلَةٌ اِلَى الْفَوْزِ بِجَمِيْعِ السَّعَادَاتِ فَيَكُوْنُ مِنْ اَجَلِّ الْعُلُوْمِ لِكَوْنِ مَعْلُوْمِهِ وَغَايَتِهِ مِنْ اَجَلِّ الْمَعْلُوْمَاتِ وَالْغَايَاتِ وَتَشْبِيْهُ وُجُوْهِ الْاِعْجَازِ بِالْاَشْيَاءِ الْمُحْتَجَبَةِ تَحْتَ الْاَسْتَارِ اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ ـ

অনুবাদ : **অতঃপর যখন** لَمَّا শব্দটি যরফ, যা إذ-এর অর্থে شرط-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়। এরপর ইবারতে ফে'লে মাযী ব্যবহৃত হয় অথবা ফে'লে মাযীর অর্থ উহ্য থাকে। **ইলমে বালাগাত** (অর্থাৎ) ইলমে মা'আনী ও বয়ান **এবং এর অনুগামী ইলম** (অর্থাৎ) ইলমে বদী' **মর্যাদার দিক থেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ** এবং **রহস্যভেদের বিচারে সবচেয়ে সূক্ষ্ম। কেননা, এর দ্বারা** অর্থাৎ ইলমে বালাগাত এবং তার অনুগামী ইলমের দ্বারা - **অন্য ইলম যথা** অভিধান শাস্ত্র, নাহব, সরফ ইত্যাদি দ্বারা নয়। **জানা যায় আরবি ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি এবং রহস্যসমূহ।** সুতরাং এটি তো রহস্য-এর দিক থেকে সবচেয়ে সূক্ষ্ম হবেই। **এবং এ ইলম দ্বারা মু'জিযার চেহারা থেকে** পর্দা উন্মোচন করা যায়। **যা (মু'জিযা) ছিল কুরআনের ইবারতের মধ্যে।** অর্থাৎ এর দ্বারা বুঝা যায়, কুরআন মানুষের অক্ষমতা প্রমাণ করে, কেননা, এটি (কুরআন) বালাগাতের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। কারণ, মানবীয় মেধার অতীত সূক্ষ্মতা ও রহস্যভেদ কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। এটি মহানবী ﷺ -এর সত্যতা প্রমাণের জন্য অসিলা বা মাধ্যম । আর মহানবী ﷺ -এর সত্যতা প্রমাণ সমস্ত সৌভাগ্য লাভের সোপান। সুতরাং এটি তো সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হবেই। তা ছাড়া এর বিষয়সমূহ ও উদ্দেশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ। قَوْلُهُ وُجُوْهِ الْاِعْجَازِ : (বা ই'জাযের বিভিন্ন পদ্ধতি)-কে পর্দার নিচে আচ্ছাদিত কোনো বস্তুর সাথে উপমা দেওয়াটা اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ هُوَ ظَرْفٌ بِمَعْنَى اِذْ : এখানে মুসান্নিফ (র.) لَمَّا সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি ظرف زمان (কাল অর্থবোধক বিশেষ্য) যা إذ অতীতকালের জন্য ব্যবহৃত হয়, তেমনি لَمَّا ও অতীতকালের জন্য ব্যবহৃত হবে। তাই এরপরে ফে'লে মাযী আসবে। তবে إذا-এর ব্যতিক্রম, কারণ এটি ভবিষ্যৎকালের জন্য হয়। (চাই এরপর ফে'লে মাযী হোক বা মুযারে-ই হোক।) এ কথা জেনে রাখা দরকার যে, لَمَّا তখনই কালের অর্থ দেবে যখন এরপর এমন দু'টি বাক্য হবে যার দ্বারা প্রথমটি شرط এবং দ্বিতীয়টি جزاء হওয়ার যোগ্যতা রাখে। অন্যথা এটি অতীতকালের অর্থ প্রদান করবে না। তখন সেটি لَمْ-এর মতো না-বাচক অব্যয়ের অর্থ দেবে- (نَدِمَ زَيْدٌ وَلَمَّا يَنْفَعْهُ النَّدَمُ)। অথবা সেটি الا (حرف استثناء)-এর অর্থ দেবে। যেমন- اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একজন রক্ষক নিয়োজিত)।

قَوْلُهُ يُسْتَعْمَلُ اِسْتِعْمَالَ الشَّرْطِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) لَمَّا-এর ব্যবহারের বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন যে, (اِذْ যেমন شرط-এর অর্থে হয় তেমনি لَمَّاও শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়) অর্থাৎ لَمَّا-এর পর شرط এবং جزاء-এর দু'টি বাক্য থাকে। প্রথম বাক্যটি ফে'লে মাযী (অতীতকালের ক্রিয়া) আসবে। তবে ফে'লে মাযী বাক্যের মধ্যে উল্লেখ থাকতে পারে, আবার উহ্যও থাকতে পারে। এটি শব্দগতভাবে মাযী (অতীত) হতে পারে। যেমন, ইবারতের মধ্যে لَمَّا দাখিল হয়েছে كَانَ-এর উপর। আবার অর্থগতভাবেও মাযী হতে পারে। অর্থাৎ শব্দগতভাবে যদিও মাযী নয়, কিন্তু لَمْ-এর দ্বারা (অর্থগত) মাযী বানানো হয়েছে। যেমন- لَمَّا لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ قَائِمًا اَكْرَمْتُكَ (যখন যায়েদ দাঁড়াল না তখন আমি তোমার সম্মান করলাম) এ বাক্যে لَمْ يَكُنْ অর্থগত মাযী হয়েছে। মূল কিতাবের লেখক عِلْمُ الْبَلَاغَةِ ও تَوَابِعُهَا শব্দদ্বয়কে উল্লেখ করেছেন। মুসান্নিফ (র.) عِلْمُ الْبَلَاغَةِ-এর ব্যাখ্যায় ইলমুল মা'আনী ও বয়ান (এ দু'টি ইলম)-কে লিখেছেন। আর تَوَابِعُهَا-এর ব্যাখ্যায় ইলমে বদী'-এর কথা লিখেছেন। এরপর মূল কিতাবের লেখক এ ইলম সম্পর্কে দু'টি বিশেষণ লিখেছেন। একটি হলো مِنْ اَجَلِّ الْعُلُوْمِ قَدْرًا এ বাক্যের মধ্যে مِنْ শব্দটি تَبْعِيْض-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَجَلّ শব্দটি اسم تفضيل-এর সীগাহ এটি عُلُوْم-এর দিকে مضاف হয়েছে। যেহেতু এখানে مِنْ শব্দটি بَعْض-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই আমরা 'অন্যতম' দ্বারা তরজমা করেছি। উল্লেখ্য যে, ইলমে তাওহীদ ও ইলমে হাদীস ইলমে বালাগাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই ইলমে বালাগাতকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায় না। দ্বিতীয়টি হলো- اَدَقُّ الْعُلُوْمِ سِرًّا এ বাক্যের মধ্যে اَدَقّ শব্দটি اسم تفضيل আর سِرًّا শব্দটি قَدْرًا-এর মতো تمييز হয়েছে। বাক্যটির অর্থ হলো- সূক্ষ্মতার বিচারে ইলমে বালাগাত অদ্বিতীয়। বাস্তবেও তাই। এরপর মুসান্নিফ (র.) উক্ত দু'টি বিশেষণের পক্ষে দলিল দিচ্ছেন, দলিলের সারকথা হলো, প্রথম বিশেষণের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমের মধ্যে বালাগাতের সূক্ষ্ম নিয়ম-কানুনের সমাবেশ ঘটেছে। যেগুলোর ব্যবহার বড় বড় সাহিত্যিকের লেখায়ও পাওয়া অসম্ভব। তাই বালাগাতের এ সব নিয়ম-কানুন প্রমাণ করে যে, কুরআন মু'জিযা এবং মানুষ তার মোকাবিলা করতে অক্ষম। আর মানুষের অক্ষমতা দ্বারা আল্লাহর কালাম হওয়া নিশ্চিত হয়। সুতরাং রাসূল ﷺ যিনি এ কালাম প্রচার করেছেন তিনিও সত্য। আর যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর সত্যতা স্বীকার করল বা তাঁর সব কথা মেনে নিল, সে উভয় জাহানের সফলতা লাভ করল। যেহেতু ইলমে বালাগাতের মাধ্যমেই এ সব অর্জিত হলো সেহেতু ইলমে বালাগাতই উত্তম ইলম হবে বৈকি। তা ছাড়া যে কোনো ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এর দ্বারা অর্জিত জ্ঞান ও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মাধ্যমে। আর ইলমে বালাগাতের معلوم বা এর দ্বারা অর্জিত জ্ঞান হলো- اِعْجَازُ قُرْآنٍ (যা অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জিত জ্ঞান) আর উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ-কে সত্য মেনে নেওয়া বা উভয় জাহানের সফলতা অর্জন করা (যা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য)। অতএব, معلوم ও غَايَة-এর দিক থেকেও এটিই সর্বোত্তম জ্ঞান হবে।

قَوْلُهُ وَتَشْبِيْهُ وُجُوْهِ الْاِعْجَازِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) يُكْشَفُ عَنْ وُجُوْهِ الْاِعْجَازِ اَسْتَارُهَا বাক্যের মধ্যে যে ইসতি'আরাগুলো হয়েছে তার আলোচনা শুরু করেছেন।

وُجُوْهٌ শব্দটি وَجْهٌ-এর বহুবচন। وَجْهٌ শব্দের দুটি অর্থ (এক) চেহারা। এ অর্থে وَجْهٌ প্রচলিত ও বেশি ব্যবহৃত। (দুই) পদ্ধতি বা তরিকা। এ অর্থে وَجْهٌ অপ্রসিদ্ধ ও কম ব্যবহৃত। এখানে দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে প্রথমে ইসতি'আরা বর্ণনা হচ্ছে, সুতরাং وُجُوْهُ اِعْجَازٍ-এর অর্থ ইজাযের পদ্ধতি বা প্রকারসমূহ। ইসতি'আরা সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন, وُجُوْهُ اِعْجَازٍ (মুশাব্বাহা)-কে উপমা দেওয়া হয়েছে পর্দার নিচে আচ্ছাদিত গোপন বস্তু (মুশাব্বাহা বিহী)-এর সাথে । যেহেতু মুশাব্বাহ বিহী এখানে উহ্য এবং মুশাব্বাহ উল্লিখিত তাই এটি ইসতি'আরায়ে মাকনিয়া বা কিনায়া হবে। এরপর اَسْتَارٌ (মুশাব্বাহ বিহীর লাযেম)-কে মুশাব্বাহ (وُجُوْهُ اِعْجَازٍ)-এর জন্য সাবিত করার দ্বারা এটি تَخْيِيْلِيَّةٌ হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. ইলমুল বালাগাত দ্বারা উদ্দেশ্য ইলমুল মা'আনী ও ইলমুল বয়ান। عِلْمُ تَوَابِعِهَا বা বালাগাতের অনুগামী ইল্ম দ্বারা উদ্দেশ্য ইলমুল বদী'।

খ. বালাগাত দ্বারা আরবি ভাষার সূক্ষ্ম ও চমকপ্রদ কলা-কৌশল সম্পর্কে অবগতি লাভ হয় এবং বিশেষভাবে কুরআনের ই'জায প্রমাণিত হয় ও রাসূলের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং বালাগাত শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ইলম।

وَإِثْبَاتُ الْاَسْتَارِ لَهَا تَخْيِيْلِيَّةٌ وَ ذِكْرُ الْوُجُوْهِ إِيْهَامٌ اَوْ تَشْبِيْهُ الْاِعْجَازِ بِالصُّوَرِ الْحَسَنَةِ اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ وَإِثْبَاتُ الْوُجُوْهِ لَهُ تَخْيِيْلِيَّةٌ وَ ذِكْرُ الْاَسْتَارِ تَرْشِيْحٌ وَنَظْمُ الْقُرْاٰنِ تَالِيْفُ كَلِمَاتِهِ مُتَرَتِّبَةَ الْمَعَانِيْ مُتَنَاسِقَةَ الدَّلَالَاتِ عَلٰى حَسْبِ مَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْلُ لَا تَوَالِيْهَا فِى النُّطْقِ وَضَمُّ بَعْضِهَا اِلٰى بَعْضٍ كَيْفَ مَا اتَّفَقَ ـ

অনুবাদ : আর إِعْجَازْ وُجُوْهْ-এর জন্য اَسْتَارْ বা পর্দাকে সাব্যস্ত করার দ্বারা استعارة تخييلية হয়েছে। (এ অবস্থায়) وُجُوْهْ শব্দটির إِيْهَامْ হলো। অথবা إِعْجَازْ-কে সুন্দর মনোরম চেহারার সাথে উপমা দেওয়াটা استعارة بالكناية। আর وُجُوْهْ শব্দটিকে (إِعْجَازْ)-এর জন্য সাবিত করার দ্বারা এটি استعاره تخييلية হলো। এরপর اَسْتَارْ বা পর্দার উল্লেখ করার দ্বারা এটি مرشحة হলো। نَظْمُ الْقُرْاٰنِ-এর অর্থ হলো, কুরআনের বাক্যগুলো এমনভাবে লিপিবদ্ধ, যার অর্থ সুবিন্যস্ত এবং যার ইঙ্গিত যুক্তিসঙ্গত। نَظْمُ الْقُرْاٰنِ-এর অর্থ এই নয় যে, মনের ভাব আদায়ে কয়েকটি বাক্যের মিলন এবং ঘটনাক্রমে একটিকে অপরটির সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَ ذِكْرُ الْوُجُوْهِ إِيْهَامٌ : إِيْهَامٌ এটি ইলমে বদী' এর পরিভাষা এর অপর নাম تَوْرِيَةٌ।

إِيْهَامٌ-এর সংজ্ঞা : কোনো শব্দের দু'টি অর্থ থাকা যার একটি নিকটবর্তী ও বেশি প্রচলিত; আর অপরটি দূরবর্তী এবং অপ্রচলিত। এ দু'টি অর্থ থেকে শব্দটি বলে যদি প্রচলিত অর্থ বাদ দিয়ে অপ্রচলিত অর্থটিকে গ্রহণ করা হয়, তখন এটিকে إِيْهَامْ বা تَوْرِيَةٌ বলা হয়। উল্লিখিত বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, وُجُوْهْ শব্দটিকে এখানে إِيْهَامْ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সে হিসেবেই ইসতি'আরা বর্ণনা করা হলো। আর যদি وُجُوْهْ-এর প্রচলিত অর্থ নেওয়া হয়, তবে ইসতি'আরা কিরূপ হবে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো। اَوْ تَشْبِيْهُ الْاِعْجَازِ বলে মুসান্নিফ সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। প্রথমত ইবারতের إِعْجَازْ শব্দটিকে সুশ্রী চেহারার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে إِعْجَازْ হলো মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহী صُوْرَةٌ حَسَنَةٌ বা সুন্দর চেহারা। মুশাব্বাহ বিহী উহ্য এবং মুশাব্বাহ উল্লিখিত। অতএব, এটি ইসতি'আরায়ে মাকনিয়াহ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মুশাব্বাহ ও মুশাব্বাহ বিহীর মধ্যে وجه تشبيه বা সম্পর্ক হলো সুন্দর চেহারার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। তেমনি মু'জিযার প্রতিও মানুষ আকৃষ্ট হয়। এরপর وُجُوْهْ (যা মুশাব্বাহ বিহীর লাযেম)-কে মুশাব্বাহ-এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা ইসতি'আরায়ে তাখঈলিয়াহ হয়েছে। আর اَسْتَارْ (যা মুশাব্বাহ বিহীর মুনাসিব)-কে উল্লেখ করার দ্বারা এটি استعارة مرشحة হয়েছে।

قَوْلُهُ وَنَظْمُ الْقُرْاٰنِ تَالِيْفُ كَلِمَاتِهِ مُرَتَّبَةِ الخ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) نَظْمُ الْقُرْاٰنِ-এর ব্যাখ্যা শুরু করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, نَظْم শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– মনিমুক্তাকে সুতায় গাঁথা। কুরআনের শব্দাবলিকে একত্রিত করার বিষয়টিকে সুতার মালার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। এ হিসেবে استعارة مصرحة অর্থাৎ উপমার পর মুশাব্বাহ বিহীকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুশাব্বাহ উহ্য। অথবা কুরআন মুশাব্বাহ, এর মুশাব্বা বিহী হলো মুক্তার মালা। এ হিসেবে এটি ইসতি'আরায়ে মাকনিয়াহ। এরপর نَظْم-কে সাবিত করার দ্বারা তাখঈলিয়্যাহ হয়েছে। نَظْمُ الْقُرْاٰنِ-এর ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ (র.) বলেন, এর অর্থ হলো– কুরআনের শব্দাবলিকে এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা যার অর্থসমূহ সুবিন্যস্ত এবং এর ভাব বা ইঙ্গিতের মধ্যে যুক্তির গ্রাহ্যতা রয়েছে। এর ভাব কোনো ক্রমেই যুক্তির দিক থেকে অসামঞ্জস্য নয়; বরং তা مقتضى حال অনুসারে হয়েছে। তাকীদের স্থানে তাকীদ এবং তাকীদ না হওয়ার স্থানে না হওয়া ইত্যাদি। মুসান্নিফ (র.) বলেন, পবিত্র কুরআনে একের পর এক বাক্য লিপিবদ্ধ করা এবং مقتضى حال অনুসরণ ছাড়া যেভাবে ইচ্ছা বাক্য সংযুক্ত করা হয়নি।

وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ مِفْتَاحِ الْعُلُومِ الَّذِى صَنَّفَهُ الْفَاضِلُ الْعَلَّامَةُ اَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ السَّكَّاكِى تَغَمَّدَهُ اللّٰهُ بِغُفْرَانِهِ اَعْظَمَ مَا صُنِّفَ فِيهِ اَىْ فِىْ عِلْمِ الْبَلَاغَةِ وَتَوَابِعِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ بَيَانٌ لِمَا صُنِّفَ نَفْعًا تَمْيِيزٌ مِنْ اَعْظَمَ لِكَوْنِهِ اَىْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ اَحْسَنَهَا اَىْ اَحْسَنَ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ تَرْتِيبًا هُوَ وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِى مَرْتَبَتِهِ وَ لِكَوْنِهِ اَتَمَّهَا تَحْرِيرًا هُوَ تَهْذِيبُ الْكَلَامِ وَاَكْثَرَهَا اَىْ اَكْثَرَ الْكُتُبِ لِلْاُصُولِ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ يُفَسِّرُهُ قَوْلُهُ جَمْعًا لِاَنَّ مَعْمُولَ الْمَصْدَرِ لَايَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَالْحَقُّ جَوَازُ ذٰلِكَ فِى الظُّرُوفِ لِاَنَّهَا مِمَّا تَكْفِيهِ رَائِحَةٌ مِنَ الْفِعْلِ -

অনুবাদ : **আর মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ড, যা সঙ্কলন করেছেন মহাজ্ঞানী আবূ ইয়াকূব ইউসুফ সাক্কাকী (র.)** আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমার (চাদর) দ্বারা আবৃত করে দিন। **যা এ বিষয়ে** অর্থাৎ ইলমে বালাগাত ও এর অনুগামী শাস্ত্রের **লিখিত প্রসিদ্ধ কিতাবাদির মধ্যে উপকৃত হওয়ার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব।** مِنَ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ এটি مَا صُنِّفَ-এর বয়ান। نَفْعًا এটি اَعْظَمَ-এর তামঈয। (সর্বশ্রেষ্ঠ) **কারণ** (অর্থাৎ ৩য় খণ্ড) সেগুলোর অর্থাৎ প্রসিদ্ধ কিতাবাদির মধ্যে **বিন্যাসের দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর।** ترتيب বলা হয় প্রত্যেকটি জিনিসকে তার স্বস্থানে রাখা। এবং (এটি) **সেগুলোর মধ্যে অনর্থক কথা মুক্ত হওয়ার দিক থেকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ।** تَحْرِيرٌ বলা হয় কথাকে ত্রুটি ও অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত রাখা। **এবং** (শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি কারণ হলো) **সেটি** অন্যান্য কিতাবের চেয়ে **বেশি মূলনীতি সমৃদ্ধ।** لِلْاُصُولِ এটি (حرف جر و مجرور) মুতাআল্লিক সংযুক্ত হবে উহ্য ফে'লের সাথে। (উহ্য ফে'লের) তাফসীর হচ্ছে তার শব্দ جَمْعًا। কেননা, মাসদারের মা'মূল (অর্থাৎ মাসদার যার উপর আমল করেছে) তার অর্থাৎ মাসদারের আগে আসতে পারে না। তবে সঠিক কথা হচ্ছে ظرف-এর ক্ষেত্রে এটি (মাসদারের মা'মূল আগে আসা) সম্ভব বা বৈধ । কেননা, এর (ظرف) জন্য তো ফে'লের ঘ্রাণ (অর্থাৎ সামান্য সংযোগ) যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ : বাক্যটি لَمَّا كَانَ عِلْمُ الْبَلَاغَةِ বাক্যের উপর عطف হয়েছে। وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ বলে মূল কিতাবের লেখক তার কিতাব লেখার দ্বিতীয় কারণটি উল্লেখ করেছেন। (প্রথম কারণটি পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, এ ইলম মর্যাদার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সূক্ষ্মতার বিচারে সবার আগে। তাই এ বিষয়ে কিতাব লেখা উচিত।) দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে যা বলেছেন, তার সারমর্ম হলো– ইমাম আবূ ইয়াকূব ইউসুফ সাক্কাকীর লেখা কিতাব মিফতাহুল উলূমের ইলমে বালাগাত সম্পর্কে তাঁর লেখা তৃতীয় খণ্ড একটি বড় মাপের কিতাব। এটি এ বিষয়ে লেখা প্রসিদ্ধ কিতাবাদির মধ্যে উপকারিতার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। এর কারণ তাঁর মতে তিনটি– ১. সবচেয়ে সুবিন্যস্ত, ২. অনর্থক ও অযথা বিষয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও ৩. এতে অন্যান্য কিতাবের তুলনায় নিয়ম-কানুন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এত কিছুর পরও কিতাবটিতে حَشْو، تَطْوِيل ও تَعْقِيد স্থানে স্থানে রয়ে যাওয়াতে আমার এমন কিতাব লেখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে, কিতাবটি এসবের থেকে মুক্ত হবে। মুসান্নিফ (র.) এ ইবারতের বিভিন্ন স্থানে নাহু বা ব্যাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন– مَا صُنِّفَ অর্থ– যা লেখা হয়েছে, এ কথাটি অস্পষ্ট, এর বয়ান হলো مِنَ الْكُتُبِ المشهورة অর্থাৎ লিখিত

প্রসিদ্ধ কিতাবাদি থেকে। نَفْعًا এটি تمييز এর مميز হলো أَعْظَمَ এমনভাবে أَحْسَنَهَا-এর تمييز হলো تَرْتِيْبًا। أَتَمَّهَا-এর تمييز হলো تَحْرِيْرًا এবং أَكْثَرَهَا-এর تمييز হলো جَمْعًا আমরা জানি تمييز-এর মধ্যে نصب হয়। তাই এগুলোর মধ্যে نصب হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) تحرير ও ترتيب-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন- اَلتَّرْتِيْبُ هُوَ وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِى مَرْتَبَتِهِ এর অর্থ- প্রত্যেকটি জিনিসকে তার স্থানে রাখা অর্থাৎ উপযুক্ত স্থানে রাখা।

قَوْلُهُ تَحْرِيْرًا هُوَ تَهْذِيْبُ الْكَلَامِ اَىْ تَخْلِيْصُهُ مِنَ الزَّوَائِدِ : অর্থ- কথাকে অনর্থক ও অতিরঞ্জিত থেকে বাঁচানো। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, للاصول তারকীব-এর মধ্যে حرف جر ও مجرور মিলে উহ্য جَمْعًا-এর সাথে متعلق। ইবারতের মধ্যে যে جَمْعًا আছে এর সাথে متعلق হবে না। সুতরাং উহ্য ইবারত এমন হবে أَكْثَرَهَا (جَمْعًا) لِلْأُصُوْلِ جَمْعًا এ অবস্থায় প্রথম উহ্য جَمْعًا-এর তাফসীর হবে দ্বিতীয় উল্লিখিত جَمْعًا তবে প্রশ্ন হলো উল্লিখিত جَمْعًا-এর সাথে متعلق না করে উহ্য جَمْعًا-এর সাথে متعلق কেন করা হলো? উত্তর হলো, যদি উল্লিখিত جَمْعًا-এর সাথে متعلق করা হতো, তাহলে মাসদার (جَمْعًا)-এর معمول (যার উপর মাসদার আমল করেছে) অর্থাৎ لِلْأُصُوْلِ-কে মাসদারের পূর্বে আনতে হয়। অথচ এমনটি করা যায় না। এটি হলো সমস্ত নাহবীদের অভিমত। এ অনুযায়ী মুসান্নিফ (র.) তারকীব করেছেন, তবে এরপর তিনি বলেছেন, সঠিক মত হলো- যদি ظروف মাসদারের معمول হয়, তাহলে তাকে মাসদার-আমিলের পূর্বে আনা যায়। সুতরাং মুসান্নিফ (র.)-এর মতে للاصول টি جَمْعًا-এর আগে এসেছে। আর এর আমিল جَمْعًا যা এর পরে এসেছে। এটি আল্লামা রযীর মাযহাব। এর উদাহরণ কুরআনেও পাওয়া যায়। যেমন- فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ এখানে مَعَهُ-এর আমিল السَّعْىَ যা مَعَهُ-এর পরে এসেছে। এমনিভাবে وَلَاتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ...। উদাহরণেও بِهِمَا-এর আমিল رَأْفَةٌ যা بِهِمَا-এর পরে এসেছে। ظرف-এর ক্ষেত্রে এরূপ বৈধ হওয়ার কারণ হলো ظرف-এর মধ্যে এমন ব্যাপকতা রয়েছে যা অন্য কিছুর মধ্যে নেই। কেননা, এমন কোনো সৃষ্টি নেই যা স্থান-কাল ছাড়া সামান্য সময় অতিবাহিত করতে পারে; বরং এমন চিন্তা করাও অসম্ভব। এ ব্যাপকতার কারণেই ظرف সব স্থানেই আসতে পারে। আমেলের আগেও পরেও। আমেল ফে'ল, শিবহে ফে'ল, মাসদার যাই হোক না কেন? এ কথাটিকে মুসান্নিফ (র.) এভাবে বলেছেন-ظرف-এর মধ্যে আমল করার জন্য ফে'লের ঘ্রাণই যথেষ্ট। অর্থাৎ যার মধ্যে ফে'লের সাথে সামান্যতম সংশ্লিষ্টতা আছে, সেটাই ظرف-এর উপর আমল করতে পারে। চাই ظرف আগে আসুক বা পরে আসুক। সুতরাং মাসদার যেহেতু ফে'লের তিন অংশ (মাসদার, জমানা ও ফায়েলের দিকে নিসবত)-এর একটি অংশ, এ কারণে মাসদারের ফে'লের সাথে সামান্য সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, মাসদার ظرف-এর উপর আমল করবে, চাই ظرف আগে আসুক বা পরে আসুক।

সার-সংক্ষেপ :

আল্লামা ইয়াকূব ইউসুফ সাক্কাকী (র.) রচিত মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ড বিন্যাস ও নিয়মাবলি বেশি হওয়ার বিবেচনায় ইলমুল বালাগাতের বড়, প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত কিতাব।

وَلٰكِنْ كَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ غَيْرَ مَصُوْنٍ اَىْ غَيْرَ مَحْفُوْظٍ عَنِ الْحَشْوِ وَهُوَ الزَّائِدُ الْمُسْتَغْنٰى عَنْهُ وَالتَّطْوِيْلِ وَهُوَ الزَّائِدُ عَلٰى اَصْلِ الْمُرَادِ بِلَا فَائِدَةٍ وَسَتَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِىْ بَحْثِ الْاِطْنَابِ وَالتَّعْقِيْدِ وَهُوَ كَوْنُ الْكَلَامِ مُغْلَقًا لَا يَظْهَرُ مَعْنَاهُ بِسُهُوْلَةٍ قَابِلًا خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ اَىْ كَانَ قَابِلًا لِلْاِخْتِصَارِ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّطْوِيْلِ مُفْتَقِرًا اَىْ مُحْتَاجًا اِلَى الْاِيْضَاحِ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّعْقِيْدِ وَاِلَى التَّجْرِيْدِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْحَشْوِ -

---

অনুবাদ : কিন্তু (মিফতাহুল উলূমের) **তৃতীয় খণ্ড حَشْو তথা অতিরিক্ত কথা থেকে অরক্ষিত ছিল।** حَشْو বলা হয় এমন অতিরিক্ত কথাকে, যার প্রতি মূল ইবারত অমুখাপেক্ষী। **এবং تَطْوِيْل থেকে** (অরক্ষিত ছিল)। تَطْوِيْل বলা হয় এমন অউপকারী ও অতিরিক্ত কথাকে যা মূল উদ্দেশ্যের বাইরে। আর এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য তুমি اِطْنَابْ-এর অধ্যায়ে জানতে পারবে। **এবং تَعْقِيْد থেকে** (অরক্ষিত ছিল) تَعْقِيْد বলা হয় বাক্য দুর্বোধ্য হওয়াকে, যার অর্থ সহজে উদ্ধার হয় না বা প্রকাশ হয় না। **এর তৃতীয় খণ্ড উপযুক্ত ছিল।** (قَابِلًا শব্দটি) খবরের পর দ্বিতীয় খবর। অর্থাৎ বাক্যটি এরূপ হবে كَانَ قَابِلًا لِلْاِخْتِصَارِ। অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ড উপযুক্ত ছিল **সংক্ষেপনের।** কেননা, এতে تَطْوِيْل রয়েছে। **এবং** (মুখাপেক্ষী ছিল) তাজরীদ বা মুক্তকরণের প্রতি। কেননা, এতে حَشْو রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ لٰكِنْ كَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ : এ বাক্যে لٰكِنْ শব্দটি اِسْتِدْرَاكْ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। اِسْتِدْرَاكْ বলা হয় পূর্ববর্তী কথার দ্বারা যে ধারণা সৃষ্টি হয় لٰكِنْ দ্বারা সে ধারণাকে খণ্ডন করা। যেমন– এখানে মিফতাহুল উলূমের ৩য় খণ্ড সম্পর্কে যেসব প্রশংসা করা হয়েছে।

এ দ্বারা কারো এ ধারণা হতে পারে যে, ৩য় খণ্ড সম্ভবত تَطْوِيْل ، حَشْو এবং تَعْقِيْد মুক্ত হবে। এ ধারণাকে দূর করার জন্য لٰكِنْ-কে ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, ৩য় খণ্ড এগুলো থেকে মুক্ত ছিল না। অতএব, حَشْو-এর উপস্থিতির কারণে تَجْرِيْد (অর্থাৎ حَشْو মুক্তকরণ)-এর প্রয়োজন ছিল। تَعْقِيْد-এর কারণে اِيْضَاحْ (অর্থাৎ দুর্বোধ্যতা মুক্তকরণ)-এর প্রয়োজন ছিল এবং تَطْوِيْل-এর কারণে اِخْتِصَارْ তথা সংক্ষেপনের প্রয়োজন ছিল। মুসান্নিফ (র.) حَشْو، تَطْوِيْل ও تَعْقِيْد-এর প্রতিটির সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।

حَشْو-এর সংজ্ঞা : اَلْحَشْوُ هُوَ الزَّائِدُ الْمُسْتَغْنٰى عَنْهُ ; এটি মুসান্নিফের সংজ্ঞা; তবে এর পরিপূর্ণ সংজ্ঞাটি এরূপ–

هُوَ اللَّفْظُ الزَّائِدُ فِى الْكَلَامِ الْمُسْتَغْنٰى فِىْ اَدَاءِ الْمُرَادِ سَوَاءٌ كَانَ لِفَائِدَةٍ اَمْ لَا كَانَ مُتَعَيِّنًا اَمْ لَا

অর্থাৎ حَشْو বলা হয়- বাক্যের ঐ অতিরিক্ত কথাকে, যার প্রতি বাক্যটি মুখাপেক্ষী নয়। চাই সেই অতিরিক্ত কথা উপকারী হোক বা না হোক এবং সেটি নির্দিষ্ট হোক বা না হোক।

تَطْوِيْل-এর সংজ্ঞা : هُوَ اللَّفْظُ الزَّائِدُ عَلٰى اَصْلِ الْمُرَادِ بِلَا فَائِدَةٍ

অর্থাৎ تَطْوِيْل বলা হয়, বাক্যের ঐ অতিরিক্ত কথাকে যা আসল উদ্দেশ্যের বাইরে এবং যার দ্বারা কোনো উপকারও হয় না । মুসান্নিফ (র.) এ দু'টির সংজ্ঞা লেখার পর বলেছেন যে, এ দু'টির পার্থক্য اِطْنَابْ-এর অধ্যয়ে আলোচনা করবেন। উল্লেখ্য যে, সংজ্ঞা বর্ণনা দ্বারাই দু'টির মাধ্যকার পাঁথক্য অনেকটা ফুটে উঠেছে । তা হচ্ছে (এক) এ দু'টির একটি হলো عام বা ব্যাপক, অপরটি হলো خاص। (দুই) تَطْوِيْل-এর মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই। আর حَشْو-এর মধ্যে উপকারিতা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। সুতরাং যে অতিরিক্ত কথার فائده নেই এটিকে حَشْو ও تَطْوِيْل উভয়টি বলা যাবে, আর যে অতিরিক্ত কথার উপকারিতা আছে তাকে حَشْو বলা হয়; تَطْوِيْل বলা যাবে না ।

মুসান্নিফ (র.) যে পার্থক্যের কথা إِطْنَابٌ-এর অধ্যায় জানা যাবে বলে বলেছেন, তা হচ্ছে حَشْو বলা হয় এমন অতিরিক্ত কথাকে, যা সুনির্দিষ্ট যেমন- أَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ * وَلٰكِنَّنِى عَنْ عِلْمِ مَا فِىْ غَدٍ عَمِىٌّ। এ কবিতার প্রথম লাইনের الْأَمْسِ এর পরবর্তী শব্দ قَبْلَهُ অতিরিক্ত এবং এটি অতিরিক্ত হওয়ার বিষয়টিও নির্দিষ্ট যেমন- قَوْلُكَ كِذْبٌ وَمَيْنٌ। এ বাক্যের مَيْن ও كِذْب শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে কোনো একটি অতিরিক্ত কিন্তু কোনটি অতিরিক্ত তা নির্দিষ্ট নয়। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এভাবে ব্যাখ্যা করলে تَطْوِيْل ও حَشْو-এর মধ্যে تَبَايِن-এর নিসবত।

تَعْقِيْد-এর সংজ্ঞা : كَوْنُ الْكَلَامِ مُغْلَقًا لَا يَظْهَرُ مَعْنَاهُ بِسُهُوْلَةٍ

অর্থাৎ تَعْقِيْد বলা হয় কোনো কথা দুর্বোধ্য হওয়া, যার অর্থ সহজে প্রকাশ পায় না। জেনে রাখা দরকার যে, تَعْقِيْد তিন ধরনের হতে পারে- ১. শব্দগত ত্রুটির কারণে অর্থ বোধগম্য নয়, একে تَعْقِيْد لَفْظِى বলে। ২. ضَمِيْر ইত্যাদির مرجع অস্পষ্ট অথবা শব্দের মধ্যে আগ-পিছ হওয়ার কারণে যে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয় একে تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ বলা হয়, ৩. বাক্যের মধ্যে ব্যাকরণজনিত সমস্যা সৃষ্টি হলে যে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয়, তাকে এখানে تَعْقِيْد-এর মধ্যে শামিল করা হয়েছে। যদিও অন্যান্য স্থানে সেটি ضُعْفُ تَالِيْف-এর শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এরপর মুসান্নিফ (র.) তারকীব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন- قَابِلًا لِلْاِخْتِصَارِ এটি كَانَ-এর দ্বিতীয় খবর। كَانَ-এর প্রথম খবর হলো غَيْرُ مَصُوْنٍ। كَانَ-এর ইসম হলো كَانَ-এর উহ্য যমীর। সুতরাং كَانَ-এর اِسْم ও দুই খবর মিলে جمليه اسميه।

সার-সংক্ষেপ :

ক. আল্লামা সাক্কাকীর মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ডে অপ্রয়োজনীয়, অউপকারী কথা ও দুর্বোধ্যতা রয়েছে।

খ. এ কারণে মূল লেখক মিফতাহ-এর তালখীস (সার-সংক্ষেপ) লেখার তাকিদ অনুভব করে নিয়মাবলি, উদাহরণ ও শাহেদ সম্বলিত 'তালখীসুল মিফতাহ' কিতাব লিখেন।

اَلَّفْتُ جَوابُ لَمَّا مُخْتَصَرًا يَتَضَمَّنُ مَا فِيْهِ اَىْ فِى الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنَ الْقَوَاعِدِ جَمْعُ قَاعِدَةٍ وَهِىَ حُكْمٌ كُلِّىٌّ يَنْطَبِقُ عَلٰى جَمِيْعِ جُزْئِيَّاتِهٖ لِيَتَعَرَّفَ اَحْكَامُهَا مِنْهُ كَقَوْلِنَا كُلُّ حُكْمٍ مَعَ مُنْكِرٍ يَجِبُ تَوْكِيْدُهٗ وَيَشْتَمِلُ عَلٰى مَايَحْتَاجُ اِلَيْهِ مِنَ الْاَمْثِلَةِ وَهِىَ الْجُزْئِيَّاتُ الْمَذْكُوْرَةُ لِاِيْضَاحِ الْقَوَاعِدِ وَالشَّوَاهِدِ وَ هِىَ الْجُزْئِيَّاتُ الْمَذْكُوْرَةُ لِاِثْبَاتِ الْقَوَاعِدِ فَهِىَ اَخَصُّ مِنَ الْاَمْثِلَةِ وَلَمْ اٰلُ مِنَ الْاَلْوِ وَهُوَ التَّقْصِيْرُ جُهْدًا اَىْ اِجْتِهَادًا وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ الْاَلْوُ هٰهُنَا مُتَعَدِّيًا اِلٰى مَفْعُوْلَيْنِ وَحُذِفَ الْمَفْعُوْلُ الْاَوَّلُ وَالْمَعْنٰى لَمْ اَمْنَعْكَ جُهْدًا فِىْ تَحْقِيْقِهٖ اَىْ اَلْمُخْتَصَرِ يَعْنِىْ فِىْ تَحْقِيْقِ مَا ذُكِرَ فِيْهِ مِنَ الْاَبْحَاثِ وَتَهْذِيْبِهٖ اَىْ تَنْقِيْحِهٖ ـ

অনুবাদ : আমি সংকলন করলাম اَلَّفْتُ টি لَمَّا-এর জবাব-**সংক্ষিপ্ত কিতাব যা শামিল করবে ঐ** সব বিষয়কে যা **তাতে** (অর্থাৎ মিফতাহুল উলূমের) **তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে রয়েছে তথা বিভিন্ন নিয়মাবলি।** قَوَاعِدْ শব্দটি قاعدة-এর বহুবচন। قاعدة বলা হয়- প্রত্যেক এমন حُكْم كلى যা তার প্রত্যেকটি جزئى-এর উপর প্রযোজ্য হয়, যাতে جزئى গুলোর বিধান كلى থেকে জানা যায়। যেমন– আমরা বলে থাকি كُلُّ حُكْمٍ مَعَ مُنْكِرٍ يَجِبُ تَوْكِيْدَهٗ (অর্থাৎ যেসব খবরকে অস্বীকার করার অবকাশ থাকে সেসব খবরকে تاكيد-এর সাথে বলা ওয়াজিব।) **এবং** (আমার সংক্ষিপ্ত কিতাবটিতে) **শামিল থাকবে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ।** امثله বলা হয় এমন সব جزئيات-কে যেগুলোকে উল্লেখ করা হয় কায়দাসমূহকে স্পষ্ট করার জন্য। এবং (প্রয়োজনীয়) শাওয়াহেদ বা প্রমাণভিত্তিক উদাহরণসমূহ। شَوَاهِدْ বলা হয় এমন সব جزئيات-কে, যেগুলোকে উল্লেখ করা হয় নিয়মাবলিকে প্রমাণিত করার জন্য। এটি মিছাল থেকে কম ব্যাপক। **আর আমি পরিশ্রমের ব্যাপারে কোনো অবহেলা করিনি।** اٰلُ এটি اَلْاَلْوُ (মাসদার) থেকে নির্গত। جُهْدًا অর্থ– اِجْتِهَادًا বা পরিশ্রম। এখানে اَلْاَلْوُ শব্দটিকে দু' মাফঊলের দিকে মুতায়াদ্দী রূপে ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রথম মাফঊলটিকে উহ্য রাখা হয়েছে। তখন অর্থ (হবে এরূপ) আমি তোমার থেকে পরিশ্রমকে বাধা দেইনি। **এর তাহকীক করার ব্যাপারে,** অর্থাৎ মুখতাসারের তাহকীকের ব্যাপারে। লেখকের উদ্দেশ্য (মুখতাসার)-এর মধ্যে যে সকল বিষয় এসেছে তার তাহকীক-এর ব্যাপারে **এবং এর তাহযীব তথা সম্পাদনার ব্যাপারে।**

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ اَلَّفْتُ جَوابُ لَمَّا : এ ইবারতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلَّفْتُ থেকে শুরু করে সামনের ইবারত। এটি মূল কিতাবের লেখকের ভূমিকার لَمَّا كَانَ عِلْمُ الْبَلَاغَةِ الخ (থেকে শুরু করে اَلَّفْتُ-এর পূর্ব পর্যন্ত) বাক্যের জবাব। অর্থাৎ لَمَّا كَانَ থেকে اَلَّفْتُ-এর আগ পর্যন্ত হলো شرط আর اَلَّفْتُ হলো এর জবাব। شرط-এর মধ্যে কিতাব লেখার দু'টি কারণ আর جواب-এর মধ্যে কিতাব লিখা শুরু করার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) দাবি করেছেন যে, তিনি এমন একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা লিখেছেন, যার মধ্যে মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ কায়দাসমূহ রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় মিছাল ও শাওয়াহেদ সব কিছুই এতে রয়েছে।

قَوْلُهُ جَمْعُ قَاعِدَةٍ وَهُوَ حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلٰى الخ : এখান থেকে قَوَاعِدُ শব্দের তাহকীক শুরু করেছেন। প্রথমে জানা দরকার যে, قَوَاعِدُ শব্দটি قَاعِدَةٌ-এর বহুবচন। قَاعِدَةٌ বলা হয়- এমন কুল্লীকে যা তার অধীন সমস্ত جزئيات-এর উপর প্রযোজ্য হয়, যাতে করে সেই কুল্লীর হুকুম দ্বারা جزئيات-এর সব অবস্থা অবগত হওয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে, মুসান্নিফ (র.) قاعدة-এর সংজ্ঞা মানতেক এবং এর পরিভাষার সাহায্যে দিয়েছেন। আমরা জানি كلى এবং جزئى উভয়টি মানতেকের দু'টি পরিভাষা। সুতরাং حكم كلى-এর সাহায্যে جزئيات-এর বিধি-বিধান জানার পদ্ধতিটিও মানতেকের নিয়মাবলির সাহায্যেই বুঝতে হবে। অনুসন্ধানী ও মেধাবী ছাত্রদের ইলমের পিপাসা মিটানোর জন্য এখানে সে পদ্ধতিটি উল্লেখ করা হলো- আমরা যে جزئى-এর বিধান বা হুকুম জানতে চাই প্রথমত তাকে موضوع বা মুবতাদা বানাব। قَاعِدَةٌ বা সার্বিক হুকুমটির মুবতাদাকে সেই جزئى-এর محمول বা খবর বানাব। এ মুবতাদা এবং খবর মিলে যে বাক্যটি হবে সেটি হচ্ছে صغرى এরপর উল্লেখিত কায়দা বা সার্বিক হুকুমকে বানাব كبرى। এ صغرى ও كبرى মিলে এটি হবে شكل اول। এরপর حد اوسط-টিকে ফেলে দেওয়ার পর যে ফলাফল বা نتيجه-টি বের হবে তাই হচ্ছে সেই جزئى-এর হুকুম। যেমন- আপনি جَاءَنِيْ زَيْدٌ এ বাক্যটির মধ্যে অবস্থিত زَيْدٌ-এর হুকুম জানতে ইচ্ছুক যে, زَيْدٌ কি مرفوع নাকি مجرور অর্থাৎ زَيْدٌ (جزئى) আপনি قَاعِدَةٌ -এর মাধ্যমে তার বিধান জানতে চান। এমতাবস্থায় আপনি (পূর্বে উল্লিখিত নিয়মানুসারে) زَيْدٌ-কে موضوع বা মুবতাদা বানান। এরপর নাহুর একটি قَاعِدَةٌ : كُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوْعٌ (প্রত্যেক فاعل-পেশ বিশিষ্ট হয়)। এ قاعده-এর মুবতাদাকে زَيْدٌ-এর محمول বা খবর বানান। তাহলে বাক্যটি এরূপ হবে- زَيْدٌ فَاعِلٌ। এরপর قَاعِدَةٌ টিকে كبرى বানান كُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوْعٌ সুতরাং نتيجه বা ফলাফল আসবে এরূপ- زيد مرفوع। মুসান্নিফ (র.) এখানে قَاعِدَةٌ-এর উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন এটিকে كُلُّ حُكْمٍ مَعَ مُنْكِرٍ يَجِبُ تَوْكِيْدُهٗ অর্থাৎ যে হুকুম বা বিষয়ের অস্বীকারকারী রয়েছে সে হুকুমকে তাকিদের সাথে আনতে হয়। সুতরাং আমাদের কেউ বলল, যায়েদ দাঁড়ানো। অপর একজন তা অস্বীকার করতে পারে যে, যায়েদ দাঁড়ানো নয়। এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তিকে অবশ্যই বলতে হবে যায়েদ অবশ্যই দাঁড়ানো।

قَوْلُهُ يَشْتَمِلُ عَلٰى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ : উল্লেখ্য যে, লেখক এখানে প্রয়োজনীয় উদাহারণের কথা বলেছেন, এতে বুঝা যায় যে, এ কিতাবের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় উদাহরণ আনা হয়নি । কারণ তাহলে তো এতেও حَشْو, زوائد ও تطويل থেকে যাবে। এ ইবারত দ্বারা এ কথাও বুঝা গেল যে, তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় উদাহরণ রয়েছে। امثلة শব্দটি مثال-এর বহুবচন। মুসান্নিফ (র.)-এর ভাষায় মিছাল বলা হয় এমন উদাহরণকে যার দ্বারা কায়দাটি স্পষ্ট ও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে। মিছাল দ্বারা কায়দা প্রমাণিত হয় না।

আর شَوَاهِدُশব্দটি شَاهِدَةٌ-এর বহুবচন। شَاهِدٌ বলা হয়- এমন উদাহরণকে, যার দ্বারা কায়দাটি প্রমাণিত হয়। প্রথমটির উদহরণ- যে কেউ একটি কায়দা বলল 'প্রত্যেক মাফউল নসব বিশিষ্ট হয়'এরপর مثال দিল যেমন- رَأَيْتُ زَيْدًا এতে زَيْدً মাফউল হওয়ার কারণে নসব বিশিষ্ট হয়েছে। এ মিছালটি কায়দটিকে স্পষ্ট করল বটে; তবে এ مثال দ্বারা কায়দা প্রমাণিত হয়েছে এ কথা বলা যাবে না।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ- যে কেউ একটি কায়দা বলল : لَنْ-নূন اعرابى-কে বিলুপ্ত করে দেয়। এরপর (شاهد) উদাহরণ দিল, যেমন- কুরআনের আয়াত لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ আলোচ্য আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি جمع مذكر حاضر-এর نون اعرابى-কে لَنْ এসে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এটি এমন উদাহরণ যে, যাকে شَاهِدٌ বলা হয়। কারণ এটির দ্বারা قاعده শুধুমাত্র স্পষ্টই হয়নি; বরং প্রমাণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْأَمْثِلَةِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) شَاهِدٌ এবং مثال-এর মাঝের নিসবত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, শাহেদ মিছাল থেকে খাস বা কম ব্যাপক অর্থাৎ উভয়ের মাঝে عام خاص مطلق-এর নিসবত বিদ্যমান। কারণ, শাহেদ বলা হয় সেসব উদাহরণকে যা কুরআন, হাদীস ও র্নিভরযোগ্য কোনো আরবি কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আর মিছাল যে কোনো উদাহরণকে বলা হয়। সুতরাং شَاهِدٌ-কে مثال বলা গেলেও যে কোনো مثال-কে শাহেদ বলা যাবে না। তা ছাড়া এভাবেও বলা যায় যে, মিছাল দ্বারা কায়েদাটি স্পষ্ট হয় আর শাহেদ দ্বারা স্পষ্ট হয় এবং প্রমাণিতও হয়। এ হিসেবে শাহেদ كلى-এর পর্যায়ে, আর মিছাল جزئى-এর পর্যায়ে। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, كلى তার جزئى-এর তুলনায় খাস হয়।

তবে যদি এ কথা বলা হয় যে, শাহেদ শুধুমাত্র কায়দা প্রমাণ করে, আর মিছাল শুধুমাত্র কায়দা সাবিত করে তাহলে বলতে হবে যে, উভয়ের মাঝে تباين-এর নিসবত। তখন عام خاص مطلق হবে না।

قَوْلُهُ وَلَمْ اٰلُ مِنَ الْاَلْوِ وَهُوَ التَّقْصِيْرُ : وَلَمْ اٰلُ বাক্যটি اَلَّفْتُ-এর উপর عطف হয়েছে।

তবে এটি اَلَّفْتُ-এর فاعل থেকে حالও হতে পারে। اٰلُ ফে'লটি اُأْلُوْ ছিল। (واحد متكلم مضارع-এর সীগাহ) تعليل হয়ে এখন اٰلُوْ হয়েছে। এরপর لَمْ আসার কারণে واو পড়ে গেছে। মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, এটি اَلْاَلْوُ (মাসদার) থেকে নির্গত। اَلْوٌ অর্থ- (تَقْصِيْر) অলসতা করা, ঢিলেমি করা। তবে কখনো تَضْمِيْن-এর ভিত্তিতে منع বা নিষেধ করার অর্থে ব্যবহার হয়। لَمْ اٰلُ جُهْدًا অর্থ- আমি পরিশ্রমের বা চেষ্টার ত্রুটি করিনি। দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হলে এর দু'টি মাফঊল থাকবে। তবে তখন এখানে প্রথম মাফঊলটি হযফ করা হয়েছে বলতে হবে। তখন বাক্যটির ব্যাখ্যা এ রকম হবে : لَمْ اَمْنَعْكَ جُهْدًا অর্থ- আমি তোমাকে পরিশ্রম করতে বাধা দিচ্ছি না। এখানে كاف خطاب দ্বারা ব্যাপকতা উদ্দেশ্য। মূলত ইবারত এরূপ لَمْ اَمْنَعْ اَحَدًا অর্থ- আমি কাউকেই পরিশ্রম করতে বাধা দেইনি।

قَوْلُهُ فِيْ تَحْقِيْقِهِ اَيْ الْمُخْتَصَرِ : অর্থাৎ এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার বিষয়াদি তাহকীকের ব্যাপারে বা তাহকীকের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করিনি।

قَوْلُهُ وَتَهْذِيْبِهِ : মুসান্নিফ (র.) تَهْذِيْب অর্থ লিখেছেন تَنْقِيْح এর অর্থ হলো- অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাকে বাদ দেওয়া এবং পরিবর্তন করা। একে এক কথায় সম্পাদনা করাও বলা যায়। সুতরাং পুরো বাক্যের অর্থ হলো, আমি তাহকীক (বিশ্লেষণ) এবং তাহযীব (অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে) কোনো ত্রুটি করিনি; বরং যথাসাধ্য তা পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করেছি।

সার সংক্ষেপ :

ক. প্রত্যেক جزئى-এর মাঝে প্রয়োগযোগ্য সামগ্রিক নিয়মকে قَاعِدَةٌ বলা হয়।

খ. যেসব উদাহরণ দ্বারা নিয়ম-কায়দা প্রমাণ করা হয় তথা কুরআন, হাদীস ও আরবি সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাব থেকে উদ্ধৃতকে شَاهِدْ বলা হয়।

গ. যে কোনো উদাহরণকে مِثَالٌ বলা হয়।

ঘ. مِثَالٌ হলো عَامْ আর شَاهِدْ খাস।

وَ رَتَّبْتُهُ اَىْ اَلْمُخْتَصَرَ تَرْتِيْبًا اَقْرَبُ تَنَاوُلًا اَىْ اَخْذًا مِنْ تَرْتِيْبِهِ اَىْ تَرْتِيْبِ السَّكَّاكِيِّ اَوِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ اِضَافَةُ الْمَصْدَرِ اِلَى الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُوْلِ بِهِ وَلَمْ اُبَالِغْ فِىْ اِخْتِصَارِ لَفْظِهِ تَقْرِيْبًا مَفْعُوْلٌ لَهُ لِمَا تَضَمَّنَهُ مَعْنٰى لَمْ اُبَالِغْ اَىْ تَرَكْتُ الْمُبَالَغَةَ فِى الْاِخْتِصَارِ تَقْرِيْبًا لِتَعَاطِيْهِ اَىْ تَنَاوُلِهِ وَطَلَبًا لِتَسْهِيْلِ فَهْمِهِ عَلٰى طَالِبِيْهِ وَالضَّمَائِرُ لِلْمُخْتَصَرِ وَ فِىْ وَصْفِ مُؤَلِّفِهِ بِاَنَّهُ مُخْتَصَرٌ مُنَقَّحٌ سَهْلُ الْمَاْخَذِ تَعْرِيْضٌ بِاَنَّهُ لَا تَطْوِيْلَ فِيْهِ وَلَا حَشْوَ وَلَا تَعْقِيْدَ كَمَا فِى الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَاَضَفْتُ اِلٰى ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَغَيْرِهَا فَوَائِدَ عَثَرْتُ اَىْ اِطَّلَعْتُ فِىْ بَعْضِ كُتُبِ الْقَوْمِ عَلَيْهَا اَىْ عَلٰى تِلْكَ الْفَوَائِدِ وَ زَوَائِدَ لَمْ اَظْفَرْ اَىْ لَمْ اَفُزْ فِىْ كَلَامِ اَحَدٍ بِالتَّصْرِيْحِ بِهَا اَىْ بِتِلْكَ الزَّوَائِدِ وَلَا بِالْاِشَارَةِ اِلَيْهَا بِاَنْ يَّكُوْنَ كَلَامُهُمْ عَلٰى وَجْهٍ يُمْكِنُ تَحْصِيْلُهَا مِنْهُ بِالتَّبْعِيَّةِ وَاِنْ لَمْ يَقْصُدُوْهَا ـ

অনুবাদ : **আর আমি এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাকে** সাক্কাকী (র.) অথবা (তার কিতাবের) তৃতীয় খণ্ডের বিন্যাস থেকে অধিকতর **আয়ত্তের উপযোগী করে সুবিন্যস্ত করেছি।** تَرْتِيْبِهٖ-এর মধ্যে মাসদার হয়তো ফায়েলের দিকে অথবা মাফঊলের দিকে ইযাফত হয়েছে। **এবং এর ইবারত সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষেত্রে আমি অতিরঞ্জন করিনি।** (আয়ত্তের) **কাছাকাছি নেওয়ার জন্য।** تَقْرِيْبًا এটি মাফঊলে লাহু ঐ ফে'লের জন্য যে ফে'লের মধ্যে لَمْ اُبَالِغْ-এর অর্থ শামিল হয়েছে। অর্থাৎ আমি অতিরঞ্জন পরিত্যাগ করেছি সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষেত্রে একে আয়ত্ত করার কাছে নেওয়ার জন্য। **এবং এর শিক্ষার্থীদের কাছে এটির বোধগম্যতাকে সহজ করার আশায়।** সবগুলো সর্বনামের উদ্দেশ্য হলো মুখতাসার তথা এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। লেখক (কিতাবের) গুণ হিসেবে مُخْتَصَرٌ (সংক্ষিপ্ত) مُنَقَّحٌ (অনর্থক কথা বিবর্জিত) এবং سَهْلُ الْمَأْخَذِ (সহজে আয়ত্তাধীন) বলেছেন, এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে تَطْوِيْل ، حَشْو ، تَعْقِيْد নেই। যেমনটি রয়েছে (মিফতাহুল উলূমের) তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে। **আর আমি এর সাথে তথা উল্লিখিত নিয়মাবলির ইত্যাদির সাথে বৃদ্ধি করেছি বেশকিছু উপকারী বিষয়, যেগুলো আমি জেনেছি** বালাগাতের বড় পণ্ডিতদের কোনো কিতাব থেকে, **আর কিছু অতিরিক্ত বিষয় যা** (হাসিল করতে) **সক্ষম হইনি কারো কথা থেকে প্রত্যক্ষভাবেও নয় এবং প্রচ্ছন্নভাবেও নয়।** (পরোক্ষ বা ইশারা) অর্থাৎ তাদের কথা এমনও ছিল না যে, তাদের কথা থেকে হাসিল করা যায়। যদিও তারা এমনটি উদ্দেশ্য করেননি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَ رَتَّبْتُهُ আর আমি একে বিন্যস্ত করেছি এমনভাবে যে, তা আয়ত্ত করা খুব সহজ সাক্কাকী (র.)-এর বিন্যাসের তুলনায়। এক কথায় এটি বিন্যাসের দিক থেকে সাক্কাকী (র.)-এর তৃতীয় খণ্ডের তুলনায় সহজপাঠ্য।

قَوْلُهُ مِنْ تَرْتِيْبِهٖ : এর ضمير-এর مَرْجِعْ কি? একটি মত হলো, এর مرجع হলো সাক্কাকী। দ্বিতীয় মত হলো, এর مَرْجِعْ (মিফতাহুল উলূমের) ৩য় খণ্ড। প্রথম মতানুসারে تَرْتِيْب মাসদারের اضافت তথা সম্বন্ধ হলো ফায়েলের দিকে। কারণ, মিফতাহুল উলূমের বিন্যাসকারী তিনিই। দ্বিতীয় মতানুসারে মাসদারের সম্বন্ধ হবে মাফঊলের দিকে। কারণ, ৩য় খণ্ডকেই বিন্যস্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَفْعُوْلٌ لَهُ لِمَا تَضَمَّنَهُ مَعْنٰى لَمْ اُبَالِغْ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ طَلَبًا এবং تَقْرِيْبًا-এর তারকীবের ব্যাখ্যা করছেন। তিনি বলছেন যে, এ মাসদারদ্বয় مفعول له হয়েছে। এদের ফে'ল হলো لَمْ اُبَالِغْ-এর অর্থের মধ্যে শামিল একটি

ফে'ল যথা تَرَكْتُ الْمُبَالَغَةَ। তখন এখানে একটি আপত্তি দেখা দেয় যে, لَمْ اُبَالِغْ-এর অর্থের মধ্যে শামিল একটি ফে'ল বলার মধ্যে কি তাৎপর্য? এর উত্তর হলো, মাফঊলে লাহুর ক্ষেত্রে নিয়ম হলো– মাফঊলে লাহু হ্যাঁ-বাচক ফে'ল থেকে হয়, না বাচক ফে'ল থেকে হয় না। যেহেতু لَمْ اُبَالِغْ একটি না-বাচক ফে'ল, তাই এখানে طَلَبًا وَ تَقْرِيْبًا এমন হ্যাঁ-বাচক ফে'ল থেকে মাফঊলে লাহু হবে যা لَمْ اُبَالِغْ-এর অর্থের মধ্যে শামিল রয়েছে। কারো মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মাফঊলে লাহু না-বাচক ফে'ল থেকে কেন হতে পারে না? এর উত্তর হলো, মাফঊলে লাহুর সংজ্ঞা হলো– مَا فُعِلَ لِاَجْلِه فعل -যার জন্য ফে'লটি করা হয়। আর এখানে উল্লিখিত لَمْ اُبَالِغْ বা عَدَمُ مُبَالَغَةْ তো ফে'ল নয়; বরং عَدَمُ فِعْلٍ। এজন্য এর থেকে মাফঊলে লাহু হবে না।

قَوْلُهُ وَالضَّمَائِرُ لِلْمُخْتَصَرِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, لَفْظِه، تَعَاطِيْه، فَهْمِه، طَالِبِيْه এ চারটি শব্দের ضمير গুলো مختصر অর্থাৎ তালখীসুল মিফতাহ-এর দিকে ফিরেছে।

মূল কিতাব (তালখীসুল মিফতাহ)-এর লেখক তার কিতাব সম্পর্কে তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করেছেন– ১. এ কিতাবটি مختصر বা সংক্ষিপ্ত – এ কথাটি তার ইবারত اَلَّفْتُ مُخْتَصَرًا وَلَمْ اُبَالِغْ فِى اِخْتِصَارِ لَفْظِه থেকে পাওয়া যায়। ২. এ কিতাবটি مُنَقَّحٌ বা অতিরিক্ত কথামুক্ত– এটি তার ইবারত وَلَمْ اٰلُ جُهْدًا فِىْ تَحْقِيْقِه وَتَهْذِيْبِه থেকে পাওয়া যায়। ৩. তার কিতাব سَهْلُ الْمَأْخَذِ বা সহজে পাঠোদ্ধার করা যায়। এটি তার ইবারত طَلَبًا لِتَسْهِيْلِ فَهْمِه থেকে পাওয়া যায়। লেখক তার কিতাবের এ তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার দ্বারা আল্লামা সাক্কাকীর প্রতি تَعْرِيْض (বিশেষ ইঙ্গিত) করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, আমার কিতাবে تَعْقِيْد، حَشْو ও تَطْوِيْل-নেই। কিন্তু মিফতাউল উলূমের তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে এ তিনটি বিষয়ই বিদ্যমান।

تَعْرِيْض বলা হয় কোনো একটি কথা বলে কথার মধ্যে অনুল্লিখিত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করাকে, এর অপর নাম تَلْوِيْح।

প্রকাশ থাকে যে, মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে حَشْو، تَطْوِيْل ও تَعْقِيْد আছে। এ কথার প্রতি تَعْرِيْض এখানে দ্বিতীয়বারের মতো করা হলো। প্রথমে كَانَ قَابِلًا لِلْاِخْتِصَارِ مُفْتَقِرًا اِلَى الْاِيْضَاحِ বলে প্রথমবার تَعْرِيْض করা হয়েছিল যে, এতে উল্লিখিত তিনটি জিনিস বিদ্যমান।

قَوْلُهُ وَاَضَفْتُ اِلٰى ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ : মুসান্নিফ (র.) اَلْمَذْكُوْر শব্দটি উল্লেখ করে ذٰلِكَ ইসমে ইশারার مشار اليه দেখালেন। কেননা, যদি اَلْمَذْكُوْر-কে مشار اليه না বলে সরাসরি قَوَاعِدُ ও اَمْثِلَةٌ -কে مشاراليه বলা হতো, তাহলে ইসমে ইশারা ও مشاراليه-এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা পাওয়া যেত না। তখন ইসমে ইশারা একবচন ও مشاراليه বহুবচন হতো।

এরপর লেখক বলেন যে, তিনি মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ডে নেই এমন বিষয়াদিও এ কিতাবে লিপিবদ্ধ বা সংযোজন করেছেন। লেখকের বক্তব্য অনুসারে এসব বিষয় দু' ধরনের (এক) فَوَائِدُ (এটি فَائِدَةٌ-এর বহুবচন) অর্থ– উপকারী বিষয়সমূহ। فَوَائِدُ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এগুলো তিনি বালাগাতশাস্ত্রে লিখিত কিতাবাদি থেকে গ্রহণ করেছেন। (দুই) زَوَائِدُ (এটি زَائِدَةٌ-এর বহুবচন) অর্থ– অতিরিক্ত বিষয়সমূহ। এগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এগুলো গবেষণালব্ধ বিষয়, কারো থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এগুলো নেননি। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ বিষয়াদিকে زَوَائِدُ বা অতিরিক্ত বিষয় বলেছেন। এটা তিনি কেন বললেন? এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর হতে পারে। ১. প্রথম উত্তর হলো, এমনভাবে ব্যক্ত করা তার নিজের সম্পর্কে দীনতা-বিনয়ের প্রকাশ। জ্ঞানীজন নিজকে ছোট বলে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তারা কখনো জ্ঞানের বড়াই করেন না। ২. দ্বিতীয় উত্তর হলো, এখানে زَوَائِدُ দ্বারা অতিরিক্ত অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং فَوَائِدُ-এর চেয়েও বেশি কিছু বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমার গবেষণাপ্রসূত বিষয়গুলো فَوَائِدُ থেকেও উত্তম। যেমন কুরআনের আয়াত– لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ (যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং তার চেয়ে বেশি কিছু) এখানে زِيَادَةٌ বা বেশি কিছু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার দিদার, যা জান্নাতের সকল নিয়ামতেরও উর্ধ্বে।

সার-সংক্ষেপ :

মূল লেখক বলেন, তালখীসকে সুবিন্যস্ত এবং সহজ পাঠ্য করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছি, তবে সীমাতিরিক্ত সংক্ষেপ করিনি। আর আমি অতিরিক্ত কিছু বিষয় সংযোজন করেছি।

وَسَمَّيْتُهُ تَلْخِيصَ الْمِفْتَاحِ لِيُطَابِقَ اِسْمُهُ مَعْنَاهُ وَاَنَا اَسْأَلُ اللّٰهَ قُدِّمَ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ قَصْدًا اِلَى جَعْلِ الْوَاوِ لِلْحَالِ مِنْ فَضْلِهِ حَالٌ مِنْ اَنْ يَّنْفَعَ بِهِ اَىْ بِهٰذَا الْمُخْتَصَرِ كَمَا نَفَعَ بِاَصْلِهِ وَهُوَ الْمِفْتَاحُ اَوِ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْهُ اَنَّهُ اَىِ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلِيُّ ذٰلِكَ النَّفْعِ وَهُوَ حَسْبِىْ اَىْ مُحْسِبِىْ وَكَافِىْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَطْفٌ اِمَّا عَلٰى جُمْلَةِ وَهُوَ حَسْبِىْ وَالْمَخْصُوْصُ مَحْذُوْفٌ وَاِمَّا عَلٰى حَسْبِىْ اَىْ وَهُوَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ فَالْمَخْصُوْصُ هُوَ الضَّمِيْرُ الْمُتَقَدِّمُ عَلٰى مَا صَرَّحَ بِهٖ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ وَغَيْرُهُ فِىْ نَحْوِ زَيْدٌ نِعْمَ الرَّجُلُ وَعَلٰى كِلَا التَّقْدِيْرَيْنِ قَدْ عُطِفَ الْاِنْشَاءُ عَلَى الْاِخْبَارِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **আর আমি এর নামকরণ করেছি তালখীসুল মিফতাহ করে।** যাতে এর নামটি তার অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেছি–মুসনাদ ইলাইহ (اَنَا)-কে আগে আনা হয়েছে واو-কে حال-এর জন্য বানানোর জন্য। **তার অনুগ্রহ–** مِنْ فَضْلِهٖ এটি حال হয়েছে اَنْ يَّنْفَعَ থেকে–**যেন তিনি এর দ্বারা** অর্থাৎ এ সংক্ষিপ্ত কিতাব দ্বারা **উপকৃত করেন যেমন তিনি তাঁর মূল কিতাব দ্বারা উপকৃত করেছেন।** (তাঁর মূল কিতাব হচ্ছে) মিফতাহুল উলূম অথবা তার তৃতীয় খণ্ড। **আর আল্লাহ তা'আলা উপকার করার মালিক। তিনি আমার জন্য যথেষ্ট** এবং **তিনি উত্তম কর্মবিধাতা।** نِعْمَ الْوَكِيْلُ হয়তোবা جملہ তথা هُوَ حَسْبِىْ-এর উপর عطف হবে। এমতাবস্থায় মাখসূস (বিল মাদাহ) উহ্য থাকবে। অথবা এটি حَسْبِىْ-এর উপর عطف হবে। অর্থাৎ وَهُوَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ। তখন মাখসূস হবে هُوَ যমীরটি, যা অগ্রবর্তী। এ মতটি মিফতাহ কিতাবের লেখক ও অন্যান্যদের। যেমন–زَيْدٌ نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর মধ্যে তাদের মতে (অগ্রবর্তী زَيْدٌ হলো মাখসূস বিল মাদাহ) উভয় অবস্থায় هُوَ حَسْبِىْ ، حَسْبِىْ-এর عطف হলো জুমলায়ে ইনশাইয়্যাকে জুমলায়ে খবরিয়্যা-এর উপর عطف করা হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَسَمَّيْتُهٗ تَلْخِيْصَ الْمِفْتَاحِ الخ : উল্লিখিত ইবারতের মধ্যে মুসান্নিফ (র.) কিতাবের নামকরণ এবং এটি উপকারী করার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করেছেন। মুসান্নিফ কিতাবের নাম তালখীসুল মিফতাহ রেখেছেন। কেননা, এটি মিফতাহুল উলূমের বড় একটা অংশের তালখীস বা সার-সংক্ষেপ। তিনি বলেন, এটির নাম তালখীস রেখেছি যাতে এর নাম তার আসল অর্থ (সংক্ষেপণ-বিয়োজন)-এর সাথে মিলে যায়।

قَوْلُهٗ وَاَنَا اَسْئَلُ اللّٰهَ : এ বাক্যটিতে اَنَا সর্বনাম যা اَسْئَلُ اللّٰهَ-এর মধ্যে বিদ্যমান এবং اَسْئَلُ-এর مسند اليه-কে আগে আনা হয়েছে। যাতে اَسْئَلُ اللّٰهَ-এর واو টিকে حاليه বলা যায়। কেননা, اَنَا-কে যদি আগে না আনা হতো বরং اَسْئَلُ-এর উহ্য ضمير-ই রয়ে যেত (যা হুকুম হিসেবে পরে এসেছে–এভাবে যে (وَاَسْئَلُ اللّٰهَ) তাহলে واو টিকে حاليه বলা যেত না। এমনিভাবে واو টিকে عطف-এর জন্য বলাও মুনাসিব হতো না। তখন حال-এর জন্য এ কারণে হতো না যে, নাহুবিদদের কায়দা হলো, যদি হ্যাঁ-বাচক ফে'লে মুযারে حال হয় তখন এটিকে ذو الحال-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য এর মধ্যে ضمير বা সর্বনাম আনা হয়, واو আনা হয় না। আর যদি جملہ اسميه হয়, তখন এটিকে ذو الحال-এর সম্পর্কযুক্ত করার জন্য واو আনা হয়। অতএব, اَسْئَلُ اللّٰهَ-কে জুমলায়ে ইসমিয়া বানানোর জন্য اَنَا-কে আগে আনা হয়েছে। আর যখন জুমলায়ে ইসমিয়া হলো, তখন واو হালের জন্য হওয়া নিশ্চিত হলো। আর عطف-এর واو বলা এ কারণে

ঠিক নয় যে, عطف-এর জন্য معطوف এবং معطوف عليه উভয়ের মাঝে মিল থাকা উচিত। অর্থাৎ উভয়টা মাযী অথবা মুযারে' হবে। কিন্তু এখানে معطوف হলো মুযারে', আর معطوف عليه হয়েছে মাযী। সুতরাং واو টি عطف-এর জন্য হয়েছে এ কথা বলা সমীচীন নয়।

قَوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ حَالٌ مِنْ اَنْ يَّنْفَعَ بِهِ : মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, مِنْ فَضْلِهِ এটি حال এর ذو الحال হলো بِهِ । اَنْ يَّنْفَعَ তার তারকীবের মধ্যে মাসদার হয়ে اَسْئَلُ اللّٰهَ-এর মাফঊল হয়েছে। সাধারণত حال তার ذو الحال-এর পরে আসে। এখানে حال টি ذو الحال -এর আগে এসেছে।

উল্লেখ্য যে, مِنْ فَضْلِهِ শব্দটি اَنْ يَّنْفَعَ-এর معمولহয়নি। এর عامل উহ্য ফে'ল বা শিবহে ফে'ল। যদি اَنْ يَّنْفَعَ-এর معمول হতো তাহলে মাসদারের মা'মূল তার আমেলের আগে আসা লাযেম হতো যা আরবি ব্যাকরণে নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ بِاَصْلِهِ وَهُوَ الْمِفْتَاحُ اَوِ الْقِسْمُ الثَّالِثُ : লেখকের কিতাব তালখীসুল মিফতাহের মূল কিতাব হলো মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ড অথবা মিফতাহুল উলূম। এখানে কেউ যদি আপত্তি তোলে যে, মিফতাহুল উলূমের ১ম ও ২য় খণ্ডের সাথে তো তালখীসের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই পুরো মিফতাহকে তার মূল কিতাব বলা কি সঠিক? এর উত্তর হলো, কোনো বইয়ের একটি অংশ যদি অন্য বইয়ের মূল হয়, তাহলে পুরো বইটিও সে বইয়ের আসল হয়। কারণ, একটা جزء যদি কারো মূল হয়, তবে সে جزء-এর كلও মূল হবে।

قَوْلُهُ وَاَنَّهُ وَلِيُّ ذٰلِكَ : اَنَّهُ-এর همزه-এর মধ্যে যবর হবে। কারণ, اَنَّهُ-এর আগে একটি لام (হরফে যর) উহ্য আছে, অর্থাৎ لِاَنَّهُ। এ অবস্থায় اَنَّهُ ইল্লত হবে اَسْئَلُ ফে'লের তখন অর্থ হবে এরূপ– আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কারণ তিনিই তো উপকারের মালিক।

قَوْلُهُ وَهُوَ حَسْبِىْ اَىْ مُحْسِبِىْ : মুসান্নিফ حَسْبِىْ-এর ব্যাখ্যায় مُحْسِبٌ ও كَافِىْ বলে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, حَسْبٌ (মাসদার) এখানে ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, حَسْبٌ তারকীবের মধ্যে খবর হয়েছে। কায়দা আছে যে, মাসদার মুবতাদা (ذات বা সত্তার)-এর উপর حَمْلٌ হতে পারে না। এ জন্য এখানে মাসদার ইসমে ফায়েলের অর্থে বলা হয়েছে। আর ইসমে ফায়েল যেহেতু ذَاتٌ مَعَ الصِّفَةِ, তাই তা আরেক ذات (মুবতাদা)-এর উপর حمل হতে পারে।

قَوْلُهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَطْفٌ اِمَّا عَلٰى : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর আলোচনা শুরু করেছেন। وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর واو নিশ্চিতভাবেই حرف عطف, এর معطوف عليه কি হবে? এ নিয়ে দু'টি মত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর পূর্বে তিনটি বাক্য বা জুমলা রয়েছে। ১. اَسْئَلُ اللّٰهَ ২. اَنَّهُ وَلِيُّ ذٰلِكَ ৩. هُوَ حَسْبِىْ। প্রথম জুমলা اَسْئَلُ اللّٰهَ-এর معطوف عليه হতে পারে না। কারণ, اَسْئَلُ اللّٰهَ তারকীবের মধ্যে حال হয়েছে। সুতরাং نِعْمَ الْوَكِيْلُ যদি এর উপর عطف হয়, তাহলে نِعْمَ الْوَكِيْلُও حال হবে। কেননা, আমরা জানি معطوف عليه-এর যে হুকুম معطوف-এরও একই হুকুম। কিন্তু نِعْمَ الْوَكِيْلُ এখানে জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ হওয়ার কারণে حال হতে পারে না। সুতরাং نِعْمَ الْوَكِيْلُ এখানে اَسْئَلُ اللّٰهَ-এর معطوف হবে না। এরপর اَنَّهُ وَلِيُّ ذٰلِكَও نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর معطوف عليه হতে পারে না। কারণ, اَنَّهُ وَلِيُّ ذٰلِكَ পূর্বের বাক্যের সবব হয়েছে। সুতরাং نِعْمَ الْوَكِيْلُ-কে এর উপর عطف করা হলে نِعْمَ الْوَكِيْلُও সবব হবে। যেহেতু نِعْمَ الْوَكِيْلُ জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ তাই এটি সবব হতে পারে না। অতএব, نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর معطوف عليه হবে هُوَ حَسْبِىْ। আমরা পেছনে বলে এসেছি যে, এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। ১. هُوَ حَسْبِىْ-এর পুরো বাক্য نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর معطوف عليه। ২. هُوَ حَسْبِىْ-এর حَسْبِىْ অংশ نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর معطوف عليه, পুরো বাক্য নয়। প্রথম মতানুসারে عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ হবে। অর্থাৎ معطوف عليه (هُوَحَسْبِىْ টা) জুমলায়ে ইসমিয়্যা খবরিয়্যা এবং معطوف (نِعْمَ الْوَكِيْلُ) ও জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ হবে। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, نِعْمَ الْوَكِيْلُ বাক্যটির সম্পূর্ণ অংশ তো এখানে নেই, কারণ আমরা জানি اَفْعَالُ مَدْحٍ وَذَمٍّ-এর জন্য তিনটি অংশ প্রয়োজন ১. فِعْلُ مَدْحٍ, ২. فَاعِلُ مَدْحٍ, ৩. مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ اَوِ الذَّمِّ এখানে نِعْمَ হলো ফে'লে মাদাহ, اَلْوَكِيْلُ হলো তার ফায়েল মাদাহ, মাখসূস বিল মাদাহ তো নেই। এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন– এখানে মাখসূস উহ্য আছে। মূল ইবারত এরূপ হবে– نِعْمَ الْوَكِيْلُ اللّٰهُ

দ্বিতীয় মত অনুযায়ী বাহ্যিকভাবে عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْمُفْرَدِ হচ্ছে। অথচ এ ধরনের বাক্য আরবি ব্যাকরণে সঠিক নয়, তাহলে এখানে তারকীব কিভাবে সঠিক হবে? এর উত্তর হলো, যদি কোনো مفرد-এর মধ্যে ফে'লের অর্থ থাকে, তাহলে সে مفرد-কে ফে'ল-এর হুকুমে ধরা যায়। এখানে حَسْبِيْ মুফরাদ مَحْسَبِيْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর مَحْسَبِيْ (যা শিবহে ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊল মিলে) জুমলা। সুতরাং এ অবস্থায়ও عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ হবে। দ্বিতীয় তারকীবের মধ্যে نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর মাখসূস বিল মাদাহ হবে ঐ ضمير যা مَحْسَبِيْ-এর আগে রয়েছে। মূল ইবারত হবে এরূপ–وَهُوَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ (কেননা, عطف-এর ক্ষেত্রে معطوف عليه-এর আগে যে শব্দ থাকে معطوف-এর আগেও সেই শব্দই ধরা হয়।)

মোটকথা, ضمير হবে মাখসূস যা نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর আগে এসেছে। সাধারণত মাখসূস জুমলার পরে আসে। আল্লামা তাফতাযানী (র.)-এর মতে পরে আসাটাই সঠিক। কিন্তু এখানে মাখসূসকে আল্লামা সাক্কাকীর মতানুযায়ী আগে আনা হয়েছে, যা তাফতাযানীর মতের বিরোধী সিদ্ধান্ত। তাই তিনি মাখসূস বিল মাদাহ আগে আসার বিষয়টিকে আল্লামা সাক্কাকী (মিফতাহুল কিতাবের লেখক) এবং অন্যান্যদের মতো বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, زَيْدٌ نِعْمَ الرَّجُلُ-এর মধ্যে সাক্কাকী প্রমুখের মতে زَيْدٌ যেমন মাখসূস (যা আগে এসেছে) তেমনি هُوَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর মধ্যেও هُوَ মাখসূস। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, উভয় অবস্থায় অর্থাৎ معطوف عليه ، هُوَ حَسْبِيْ অথবা শুধু حَسْبِيْ জুমলায়ে খবরিয়্যার উপর জুমলায়ে ইনশাইয়ার عطف হচ্ছে। কারণ نِعْمَ الْوَكِيْلُ তো ইনশাইয়্যাহ। অথচ এটি জায়েজ নেই। কিন্তু সায়্যিদ শরীফ مُطَوَّلْ-এর পার্শ্ব টীকায় লিখেছেন যে, তাফতাযানী বিষয়টিকে যতটা কঠিন করেছেন বিষয়টি মূলত ততটা কঠিন নয়। কারণ, نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর পূর্বে যদি مَقُوْلٌ فِيْ شَانِهِ উহ্য রাখা হয়, তাহলে ইবারত হবে এরূপ–هُوَ مَقُوْلٌ فِيْ شَانِهِ نِعْمَ الْوَكِيْلُ। এখন এটি জুমলায়ে ইসমিয়াই খবরিয়ায় পরিণত হলো। অতএব, এখন عَطْفُ الْخَبَرِيَّةِ عَلَي الْخَبَرِيَّةِ হলো।

সার-সংক্ষেপ :

ক. نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর আত্ফ দু'ভাবে হতে পারে। এক. মা'তূফ আলাইহি অথবা **দুই.** শুধুমাত্র حَسْبِيْ। প্রথম অবস্থায় نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর عطف হবে جملة-এর উপর, আর দ্বিতীয় অবস্থায় عطف হবে مفرد-এর উপর।

খ. نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর মাখসূস বিল মাদাহ نِعْمَ الْوَكِيْلُ-এর পূর্বের هُوَ মাখসূস এখানে উহ্য আছে।

مُقَدَّمَةٌ رَتَّبَ الْمُخْتَصَرَ عَلٰى مُقَدَّمَةٍ وَثَلَاثَةِ فُنُوْنٍ لِاَنَّهُ الْمَذْكُوْرُ فِيْهِ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ قَبِيْلِ الْمَقَاصِدِ فِىْ هٰذَا الْفَنِّ اَوْلَا اَلثَّانِىْ اَلْمُقَدَّمَةُ وَالْاَوَّلُ اِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ اَلْاِحْتِرَازَ عَنِ الْخَطَاِ فِىْ تَاْدِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ فَهُوَ الْفَنُّ الْاَوَّلُ وَ اِلَّا فَاِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ اَلْاِحْتِرَازَ عَنِ التَّعْقِيْدِ الْمَعْنَوِىْ فَهُوَ الْفَنُّ الثَّانِىْ وَ اِلَّا فَهُوَ الْفَنُّ الثَّالِثُ وَجَعْلُ الْخَاتِمَةِ خَارِجَةً عَنِ الْفَنِّ الثَّالِثِ وَهْمٌ كَمَا نُبَيِّنُ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَمَّا انْجَرَّ كَلَامُهُ فِىْ اٰخِرِ هٰذِهِ الْمُقَدَّمَةِ اِلَى انْحِصَارِ الْمَقْصُوْدِ فِى الْفُنُوْنِ الثَّلَاثَةِ نَاسَبَ ذِكْرُهَا بِطَرِيْقِ التَّعْرِيْفِ الْعَهْدِىْ بِخِلَافِ الْمُقَدَّمَةِ فَاِنَّهَا لَا مُقْتَضٰى لِاِيْرَادِهَا بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ فَنَكَّرَهَا وَقَالَ مُقَدَّمَةٌ وَالْخِلَافُ فِىْ اَنَّ تَنْوِيْنَهَا لِلتَّعْظِيْمِ اَوِ التَّقْلِيْلِ مِمَّا لَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَّقَعَ بَيْنَ الْمُحَصِّلِيْنَ ـ

<u>অনুবাদ :</u> এটি মুকাদ্দিমাহ (ভূমিকা)। লেখক মুখতাসার (তালখীস)-কে একটি মুকাদ্দিমাহ ও তিনটি বিষয়ে বিন্যস্ত করেছেন। কেননা, এতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হয়তো এ শাস্ত্রের উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে পড়ে না অথবা পড়ে। দ্বিতীয় প্রকার হলো মুকাদ্দিমাহ। প্রথম প্রকারে যদি উদ্দিষ্ট অর্থ আদায়ে ভুলের থেকে দূরে থাকা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেটা প্রথম বিষয়। আর যদি তা না হয়ে تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ (ভাবগত দুর্বোধ্যতা) থেকে দূরে থাকা উদ্দেশ্য হয়, তবে এটি দ্বিতীয় বিষয়। আর যদি তাও না হয় (তাহলে) এটি তৃতীয় বিষয়। খাতেমা (পরিশিষ্ট)-কে তৃতীয় বিষয়ের বাইরে গণ্য করা একটি ভ্রান্তি, যা ইনশাআল্লাহ আমরা বর্ণনা করব। আর যখন এ মুকাদ্দিমার শেষভাগে মাকসাদকে তিনটি বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ করার কথা তিনি বলেছেন, অতএব একে নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করা সমীচীন হলো। কিন্তু মুকাদ্দিমা শব্দটি এর বিপরীত। কেননা, একে নির্দিষ্টরূপে আনার জন্য এখানে কোনো দাবি নেই। এ কারণে একে نَكِرَةْ (অনির্দিষ্টরূপে) আনা হলো এবং বললেন مُقَدَّمَةٌ। তবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এ তানবীন (তা'যীম) সম্মান প্রদর্শনের জন্য হবে নাকি সামান্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে– এ নিয়ে অবশ্য ছাত্রদের ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ مُقَدَّمَةٌ শব্দটি উহ্য মুবতাদার খবর, অর্থাৎ هٰذِهٖ مُقَدَّمَةٌ। মূল কিতাবের লেখক এ কিতাবে একটি مُقَدَّمَةٌ ও তিনটি বিষয়ের তথা ফনের আলোচনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) মুকাদ্দিমা এবং তিনটি বিষয়ের মধ্যে তার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার কারণ বর্ণনা করেছেন বা দলিলে হসর বর্ণনা করেছেন, তা এভাবে– এ কিতাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রথমত দুপ্রকার। হয়তো আলোচনা মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। সংশ্লিষ্ট না হলে এটি মুকাদ্দিমা। আর যদি সংশ্লিষ্ট হয়, তবে হয় উদ্দেশ্য হবে উদ্দিষ্ট অর্থ আদায়ে ভুল থেকে দূরে থাকা তাহলে এটি প্রথম বিষয় বা ইলমে মা'আনী। অথবা উদ্দেশ্য হবে تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ থেকে দূরে থাকা, তাহলে এটি দ্বিতীয় বিষয় বা ইলমে বয়ান। আর যদি এ দু'টি উদ্দেশ্য না হয়; বরং উদ্দেশ্য হয় ইবারতের মধ্যে অতিরিক্ত সৌন্দর্য বর্ধন তাহলে এটি তৃতীয় বিষয় বা ইলমে বদী'।

قَوْلُهُ جَعْلُ الْخَاتِمَةِ خَارِجَةً عَنِ الْفَنِّ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, এ কিতাবের শেষাংশে একটি خَاتِمَةٌ রয়েছে। মুসান্নিফ (র.) এ কিতাবকে তিনটি বিষয়ে এবং একটি মুকাদ্দিমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন এটা বলা হলো, অথচ তিনি خاتمة-এর সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এর উত্তর হলো, কিতাবের শেষভাগে উল্লিখিত (خَاتِمَةٌ) পরিশিষ্টটি فَنْ ثَالِثْ বা তৃতীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যেহেতু এটি তৃতীয় বিষয়ের মধ্যে গণ্য হবে, তাই মূল কিতাবের অংশ হিসেবে গণ্য হবে না। মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, যারা خَاتِمَةٌ-কে তৃতীয় বিষয়ের অংশ মনে করে না; বরং এর বাইরে মনে করে– তারা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন।

قَوْلُهُ وَلَمَّا انْجَرَّ كَلَامُهُ فِىْ اٰخِرِ هٰذِهٖ الخ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) আরেকটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, তালখীসুল মিফতাহ কিতাবের লেখক مُقَدَّمَةٌ শব্দটিকে نَكِرَةٌ (অনির্দিষ্ট), আর তিনটি বিষয়কে مَعْرِفَةٌ নির্দিষ্টরূপে কেন বর্ণনা করেছেন। তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন– اَلْفَنُّ الْاَوَّلُ، اَلْفَنُّ الثَّانِىْ، اَلْفَنُّ الثَّالِثُ এর উত্তর হলো, ইসমের আসল হলো نكره, তবে معرفة আনার মতো যৌক্তিক কোনো কারণ যখন থাকে , তখন ইসমটি معرفة রূপে আনা হয়। যেমন কোনো একটি শব্দকে একবার বলা হলো। এরপর দ্বিতীয়বার বলার সময় সেই ইসমকে الف ولام عهد خارجى-এর সাথে معرفة বা নির্দিষ্ট করে বলা হয়। তবে এ الف ولام দ্বারা معرفة করার জন্য অবশ্যই এর আলোচনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পূর্ব হওয়া জরুরি। সুতরাং এ স্থানে যেহেতু مُقَدَّمَةٌ শব্দটির আলোচনা ইতঃপূর্বে হয়নি এবং একে معرفة করার কোনো কারণও নেই, তাই একে نكره রূপে আনা হয়েছে। পক্ষান্তরে اَلْفَنُّ الْاَوَّلُ، اَلْفَنُّ الثَّانِىْ، اَلْفَنُّ الثَّالِثُ، বলার পূর্বে যেহেতু এ তিন فن বা বিষয়ের আলোচনা লেখক مُقَدَّمَةٌ-এর শেষে করেছেন, তাই এগুলোকে معرفة (নির্দিষ্টসূচক) ভাবে আগে আনা যথার্থ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْخِلَافُ فِىْ اَنَّ تَنْوِيْنَهَا لِلتَّعْظِيْمِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) مُقَدَّمَةٌ শব্দের "ة"-এর উপর যে তানবীন রয়েছে, সেটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। কারো মতে এটি تَعْظِيْمٌ বা বড়–মহৎ বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ মতের স্বপক্ষে তারা বলেন, مُقَدَّمَةٌ যেহেতু খুবই উপকারী তাই এটি تَعْظِيْمٌ-এর অর্থে হবে। আর যারা মনে করেন مُقَدَّمَةٌ খুব বেশি তাৎপর্যবহ নয়, তারা তানবীনকে تَقْلِيْلٌ -এর অর্থে বলেছেন। মুসান্নিফ (র.) এরপর বলেছেন যে, এটি অর্থাৎ তানবীন কোন প্রকারের তা নিয়ে আলোচনা এমন এক বিষয়, যার বিশেষ কোনো উপকারিতা নেই। এ জন্যে এতে ছাত্র ও আলিমগণের মূল্যবান সময় ব্যায় করা উচিত নয়।

সার-সংক্ষেপ :

ক. তালখীসুল মিফতাহ কিতাবে একটি ভূমিকা এবং তিনটি মূল বিষয় রয়েছে। ভূমিকাটি মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত নয়।

খ. ইলমুল মা'আনীর সাহায্যে শাব্দিক ভুল-ত্রুটি থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়।

গ. ইলমুল বয়ানের সাহায্যে অর্থগত দুর্বোধ্যতা থেকে বিরত থাকা যায়।

ঘ. ইলমুল বদী' দ্বারা বাক্যের শব্দগত ও অর্থগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

وَالْمُقَدَّمَةُ مَاخُوْذَةٌ مِنْ مُقَدَّمَةِ الْجَيْشِ لِلْجَمَاعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْهَا مِنْ قَدَّمَ بِمَعْنٰى تَقَدَّمَ يُقَالُ مُقَدَّمَةُ الْعِلْمِ لِمَا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشُّرُوْعُ فِىْ مَسَائِلِهٖ وَمُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ لِطَائِفَةٍ مِنْ كَلَامِهٖ قُدِّمَتْ اَمَامَ الْمَقْصُوْدِ لِارْتِبَاطٍ لَهٗ بِهَا وَانْتِفَاعٍ بِهَا فِيْهِ وَهِىَ هٰهُنَا لِبَيَانِ مَعْنَى الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ وَانْحِصَارِ عِلْمِ الْبَلَاغَةِ فِىْ عِلْمَيِ الْمَعَانِىْ وَالْبَيَانِ وَمَا يُلَائِمُ ذٰلِكَ وَلَايَخْفٰى وَجْهُ ارْتِبَاطِ الْمَقَاصِدِ بِذٰلِكَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مُقَدَّمَةِ الْعِلْمِ وَمُقَدَّمَةِ الْكِتَابِ مِمَّا خَفِىَ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنَ النَّاسِ اَلْفَصَاحَةُ هِىَ فِى الْاَصْلِ تُنْبِئُ عَنِ الْاِبَانَةِ وَالظُّهُوْرِ يُوْصَفُ بِهَا الْمُفْرَدُ مِثْلُ كَلِمَةٍ فَصِيْحَةٍ وَالْكَلَامُ مِثْلُ كَلَامٍ فَصِيْحٍ وَقَصِيْدَةٍ فَصِيْحَةٍ ـ

অনুবাদ : اَلْمُقَدَّمَةُ শব্দটি مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ তথা 'সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল' থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি قَدَّمَ (যা تَقَدَّمَ-এর অর্থে ব্যবহৃত) থেকে নির্গত হয়েছে। ঐ সব বিষয়কে مُقَدَّمَةُ الْعِلْمِ বলা হয় যার উপর সেই জ্ঞানের বিশদ বিষয়াবলির আলোচনার সূচনা নির্ভরশীল। আর مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ বলা হয় কিতাবের ঐ অংশকে, যাকে মূল উদ্দেশ্যের আগে আনা হয়। উদ্দেশ্যের সম্পর্ক এর সাথে থাকা এবং এর দ্বারা মূল মাকসাদের মাঝে উপকৃত হওয়ার কারণে। এটি এখানে ফাসাহাত ও বালাগাতের অর্থ এবং ইলমে বালাগাত দু'টি ইলম তথা ইলমে মা'আনী ও বয়ান এবং বালাগাতের অনুগামী ইলম (তথা ইলমে বদী')-এর মাঝে সীমাবদ্ধ হওয়ার বর্ণনা দানের জন্য। এ সকল বিষয়ের সাথে মূল মাকসাদের সংযোগ থাকার দিকটি এখানে অস্পষ্ট নয়। আর মুকাদ্দামাতুল কিতাব ও মুকাদ্দামাতুল ইলমের মাঝে পার্থক্য এমন যে, তা অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। **ফাসাহাত** শব্দটি মূলত প্রকাশ হওয়া ও স্পষ্ট হওয়ার অর্থ প্রদান করে। **মুফরাদ শব্দকে ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত করা হয়।** যেমন (বলা হয়) كَلِمَةٌ فَصِيْحَةٌ **এবং কালাম** (পূর্ণবাক্য ফাসাহাত দ্বারা) বিশেষিত হয়। যেমন বলা হয়– كَلَامٌ فَصِيْحٌ ও قَصِيْدَةٌ فَصِيْحَةٌ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَالْمُقَدَّمَةُ مَاخُوْذَةٌ مِنْ مُقَدَّمَةِ الْجَيْشِ : মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, مُقَدَّمَةٌ (ভূমিকা) শব্দটি مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ থেকে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমাদের প্রথমে জানতে হবে مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ কাকে বলে। مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ বলা হয়, যে কোনো সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলকে– যে দলকে সাধারণত শত্রুবাহিনীর অবস্থান এবং তাদের খোঁজ খবর ও নিজ বাহিনীর জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য পাঠানো হয়। যেমনিভাবে مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ মূল বাহিনীর আগে চলে তেমনি مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِও মূল কিতাবের আগে আসে, যা কিতাব সম্পর্কে পাঠকদের আগাম ধারণা দিয়ে থাকে। উক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ-কে مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, مُقَدَّمَةٌ শব্দটি ধাতুগতভাবে قَدَّمَ بِمَعْنٰى تَقَدَّمَ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যা মোটামুটি এরূপ– مُقَدَّمَةٌ শব্দটির دال-এর নিচে যের এবং دال-এর উপর যবর উভয়ভাবেই পড়া যায়। যদি دال-এর নিচে যের পড়া হয়, তবে এর ফে'ল قَدَّمَ যা تَقَدَّمَ (ফে'লে লাযেম)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআনের আয়াত– لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ (অর্থাৎ মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না) এ বাক্যে تُقَدِّمُوْا শব্দটি تَقَدَّمُوْا (تاء-এ যবর দিয়ে)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় مُقَدِّمَةٌ শব্দের অর্থ– যা অগ্রে এসেছে। তবে এটি قَدَّمَ (ফে'লে মুতা'আদ্দী) থেকেও নির্গত হতে পারে। তখন অর্থ হবে, যা অন্যকে অগ্রগামী করে দেয়। আর যদি مُقَدَّمَةٌ শব্দটিকে دال-এর উপর যবর দিয়ে পড়া হয়, তবে এটি قَدَّمَ ফে'লে মুতা'য়াদ্দী থেকে নির্গত হবে। তখন এর অর্থ হবে, যাকে আগে আনা হয়েছে। যেহেতু مُقَدَّمَةٌ-কে মূল কিতাবের আগে আনা হয়, তাই একে مُقَدَّمَةٌ বলা হয়। তবে মুকাদ্দিমা শব্দটি মুতাকাদ্দিমা অর্থ গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেন, مُقَدَّمَةٌ দু' প্রকার : ১. مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ ২. مُقَدَّمَةُ الْعِلْمِ।

مُقَدَّمَةُ الْعِلْمِ বলা হয়- এমন সব বিষয়কে (অর্থাৎ তিনটি বিষয় যথা- সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) যার উপর সেই জ্ঞানের মাসায়িল বুঝা নির্ভরশীল। আর مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ বলা হয়-এমন সব বিষয়কে যা কিতাবের শুরুতে আনা হয় এবং এ সব বিষয়াদির সাথে কিতাবের মূল বক্তব্যের যোগসূত্র থাকে এবং এসব বিষয় জানার দ্বারা মূল মাকসাদের ক্ষেত্রে উপকারও পাওয়া যায়।

এ কিতাবের মুকাদ্দিমাতে লেখক ফাসাহাত ও বালাগাতের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। তারপর ইলমে বালাগাত তথা ইলমে মা'আনী ও বয়ান এবং (বালাগাতের সংশ্লিষ্ট ইলম) ইলমে বদী'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, মুকাদ্দিমাতে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর সাথে মূল মাকসাদ বা আলোচনার সম্পর্ক কারো কাছে অস্পষ্ট নেই। কেননা, মুকাদ্দিমাতে যেসব বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে এসেছে সে বিষয়গুলোরই তাফসীল বা বিস্তারিত আলোচনা কিতাবে এসেছে।

قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مُقَدَّمَةِ الْعِلْمِ وَمُقَدَّمَةِ الْكِتَابِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলতে চেয়েছেন যে, কিতাবের মুকাদ্দিমা ও ইলমের মুকাদ্দিমার মাঝে পার্থক্য অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। তারা উভয় মুকাদ্দিমাকে এক করে দেখেন। তিনি পেছনের লেখায় উভয়ের মাঝে পার্থক্য দেখিয়েছেন। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর লিখিত মুকাদ্দিমা কিতাবের মুকাদ্দিমা, ইলমের মুকাদ্দামা নয়। যদি এটি ইলমের মুকাদ্দিমা হতো তাহলে মা'আনী, বয়ান ও বদী'-এর সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সবই থাকত; কিন্তু লেখক এ মুকাদ্দিমায় শুধুমাত্র ইলমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখেছেন। এদের সংজ্ঞা এবং আলোচ্য বিষয় লেখক আনেননি। অতএব, এটি মুকাদ্দিমাতুল কিতাব হবে, মুকাদ্দামতুল ইলম হতে পারে না। তা ছাড়া এ দু'টির মাঝে আরেক পার্থক্য হলো, মুকাদ্দিমাতুল ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মা'আনী আর মুকাদ্দিমাতুল কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلْفَاظٌ বা শব্দের সমষ্টি।

সার-সংক্ষেপ :

ক. مُقَدَّمَةٌ-এর قَدَّمَ ফে'লটি লাযেম ও মুতাআদ্দী উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। مُقَدَّمَةٌ কথাটি مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ হতে গৃহীত। আর مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ বলা হয় সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলকে। এখানে কিতাবের শুরু কথাকে مُقَدَّمَةٌ বলা হয়েছে। مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ বলা হয় কিতাবের প্রারম্ভিক আলোচনাকে।

খ. লেখকের এই مُقَدَّمَةٌ টি مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ

গ. مُقَدَّمَةُ الْعِلْمِ বলা হয় সেই ইলমের সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে। আর مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ বলা হয় কিতাবের প্রারম্ভিক আলোচনাকে।

قَوْلُهُ اَلْفَصَاحَةُ هِيَ فِي الْاَصْلِ تُنْبِئُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, অভিধানে ফাসাহাত শব্দটি স্পষ্ট ও প্রকাশিত হওয়ার অর্থ প্রদান করে। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, মুসান্নিফ (র.) اَلْفَصَاحَةُ لُغَةً الْاِبَانَةُ وَالظُّهُوْرُ এভাবে না বলে বরং اَلْفَصَاحَةُ تُنْبِئُ عَنْ বলেছেন। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, মুসান্নিফ এভাবে ফাসাহাতের অর্থ কেন বর্ণনা করলেন? এর উত্তর হলো, اَلْاِبَانَةُ وَالظُّهُوْرُ ফাসাহাতের প্রকৃত আভিধানিক অর্থ নয়; বরং ফাসাহাতের একাধিক অর্থ থেকে এ দু'টি অর্থ পাওয়া যায়। ফাসাহাত শব্দের অর্থগুলো নিম্নরূপ- ১. মুখে কথা ফোটা বা কথা বলতে পারা। ২. কোনো তরল কিছুর উপর থেকে ফেনা বা বুদবুদ সরে যাওয়া। ৩. ভোরের আলো। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ তিনটি অর্থের মধ্যে 'দালালতে ইলতিযামী' হিসাবে প্রকাশ হওয়া এবং স্পষ্ট হওয়ার অর্থ পাওয়া যায়। যদিও এর আভিধানিক অর্থ তা নয়। এরপর মুসান্নিফ (র.) ফাসাহাতকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন- ১. ফাসাহাতে মুফরাদ, ২. ফাসাহাতে কালাম ও ৩. ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম।

ফাসাহাতে মুফরাদ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুফরাদ বা কালিমা (একক শব্দ) ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হয় এবং ফাসাহাত শব্দটি মুফরাদ বা কালিমার সিফাত হয়। যেমন- বলা হয়, كَلِمَةٌ فَصِيْحَةٌ، وَ مُفْرَدٌ فَصِيْحٌ। **ফাসাহাতে কালাম :** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো - কালাম বা বাক্য ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হয় এবং ফাসাহাত শব্দটি কালামের সিফাত হয়। যেমন বলা হয়, قَصِيْدَةٌ فَصِيْحَةٌ ও كَلَامٌ فَصِيْحٌ।

قِيلَ الْمُرَادُ بِالْكَلَامِ مَا لَيْسَ بِكَلِمَةٍ لِيَعُمَّ الْمُرَكَّبَ الْإِسْنَادِيَ وَغَيْرَهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَيْتٌ مِنَ الْقَصِيدَةِ غَيْرَ مُشْتَمِلٍ عَلٰى إِسْنَادٍ يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَتَّصِفُ بِالْفَصَاحَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ ذٰلِكَ لَوْ أَطْلَقُوْا عَلٰى مِثْلِ هٰذَا الْمُرَكَّبِ أَنَّهُ كَلَامٌ فَصِيحٌ وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُمْ ذٰلِكَ وَاتِّصَافُهُ بِالْفَصَاحَةِ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ بِاعْتِبَارِ فَصَاحَةِ الْمُفْرَدَاتِ عَلٰى أَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمُفْرَدِ لِأَنَّهُ يُقَالُ عَلٰى مَا يُقَابِلُ الْمُرَكَّبَ وَعَلٰى مَا يُقَابِلُ الْمُثَنّٰى وَالْمَجْمُوْعَ وَعَلٰى مَا يُقَابِلُ الْكَلَامَ وَمُقَابَلَتُهُ بِالْكَلَامِ هٰهُنَا قَرِيْنَةٌ عَلٰى أَنَّهُ أُرِيْدَ بِهِ الْمَعْنَى الْأَخِيْرُ أَعْنِيْ مَا لَيْسَ بِكَلَامٍ وَ يُوْصَفُ بِهَا الْمُتَكَلِّمُ أَيْضًا يُقَالُ كَاتِبٌ فَصِيْحٌ وَشَاعِرٌ فَصِيْحٌ وَالْبَلَاغَةُ وَهِيَ تُنْبِئُ عَنِ الْوُصُوْلِ وَالْإِنْتِهَاءِ يُوْصَفُ بِهَا الْأَخِيْرَانِ فَقَطْ أَيْ الْكَلَامُ وَالْمُتَكَلِّمُ دُوْنَ الْمُفْرَدِ إِذْ لَمْ يُسْمَعْ كَلِمَةٌ بَلِيْغَةٌ -

অনুবাদ : কারও কারও মতে কালাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন বাক্য যা কালিমা নয়। তাহলে কালাম মুরাক্কাবে ইসনাদী এবং ইসনাদবিহীন মুরাক্কাব (উভয়কে) শামিল করে। কেননা, কখনো কবিতার একটি পঙ্‌ক্তিতে এমন ইসনাদ থাকে না, যার উপর চুপ থাকা যায়। এতদসত্ত্বেও এটি 'ফাসাহাত' দ্বারা বিশেষিত হয়। তবে এ মতের উপর আপত্তি আছে। এ (মতটি) কেবল তখনি সঠিক হতো যদি তারা (আরবরা) এ জাতীয় মুরাক্কাবকে كَلَام فَصِيْح বলত। অথচ তাদের থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে একে ফাসাহাতযুক্ত বলা যেতে পারে এর একক শব্দাবলির ফসীহ হওয়ার ভিত্তিতে। তা ছাড়া সঠিক কথাতো এটাই যে, এগুলো মুফরাদ-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মুফরাদ বলা হয় যা মুরাক্কাবের বিপরীতে বা দ্বিবচন ও বহুবচনের বিপরীতে এবং কালামের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে কালামের বিপরীতে ব্যবহার করাটা প্রমাণ করে যে, এখানে শেষার্থ (কালাম নয়)-ই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুফরাদ দ্বারা আমার উদ্দেশ্য (এমন মুরাক্কাব) যা কালাম নয়। **আর মুতাকাল্লিম** ও ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হয়। যেমন– বলা হয় كَاتِب فَصِيْح ও شَاعِر فَصِيْح (অর্থাৎ একজন সাবলীল ভাষার লেখক এবং সুভাষী কবি।) **বালাগাত** শব্দটি وُصُوْل (পৌঁছা) এবং اِنْتِهَاء (সমাপ্তিতে উন্নীত হওয়া)-এর অর্থ প্রদান করে। **এর দ্বারা কেবল শেষ দু'টি** অর্থাৎ কালাম এবং মুতাকাল্লিম **বিশেষিত হয়**। মুফরাদ বালাগাত দ্বারা বিশেষিত হয় না। কেননা, كَلِمَة بَلِيْغَة কাউকে বলতে শোনা যায়নি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ قِيْلَ الْمُرَادُ بِالْكَلَامِ : এ ইবারত দ্বারা মূল লেখকের উপর উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে– উত্তরটি দিয়েছেন খালখালী ও যুযানী (র.)। প্রশ্নটি হলো, কিছু বাক্যাংশ রয়েছে যা কালিমাও নয় এবং কালামও নয়। যেমন– মুরাক্কাবে নাকিস– এটি মুফরাদ নয়, কারণ মুরাক্কাব মুফরাদের বিপরীত। আবার কালামও নয়। কারণ, কালাম বলা হয় মুরাক্কাবে তামকে। এটি মুরাক্কাবে তাম নয়। অতএব, লেখক মুরাক্কাবে নাকিসের ব্যাপারে নীরব রইলেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মুরাক্কাবে নাকিস ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হতে পারে না। অথচ বিষয়টি এমন নয়; বরং মুরাক্কাবে নাকিসও ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হয়। যেমন –বলা হয় مُرَكَّب فَصِيْح। সুতরাং বুঝা গেল যে, মূল লেখকের কথার মাঝে অপূর্ণতা রয়েছে। লেখকের এ অপূর্ণতা নিরসনে আল্লামা খালখালী ও যুযানী এগিয়ে এসেছেন। তারা মুরাক্কাবে নাকিসকে

লেখকের বর্ণিত 'কালাম'-এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারা বলেন, এখানে কালাম দ্বারা উদ্দেশ্য আম বা ব্যাপক অর্থাৎ مَا لَيْسَ بِكَلِمَةٍ যা কালিমা নয়, তাই কালাম। কালামের এ সংজ্ঞা দ্বারা مُرَكَّب نَاقِص কালামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ, مُرَكَّب نَاقِص তো কালিমা নয়। এভাবে তারা মুরাক্কাবে নাকিসকে কালামের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু মুসান্নিফ তাদের এ উত্তরটিকে فِيْهِ نَظَر বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, আরবগণ যদি এ ধরনের (নাকিস) মুরাক্কাবকে كَلَام فَصِيْح বলত, তবে এ বক্তব্য সঠিক হতো; কিন্তু আরবগণ এ ধরনের মুরাক্কাবকে كَلَام فَصِيْح বলে না। এরপর তিনি লেখকের উপর উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব এভাবে দেন যে, 'মুরাক্কাবে নাকিস'-কে مُرَكَّب فَصِيْح বলা হয় এর মুফরাদগুলোর হিসেবে, মুরাক্কাবের হিসেবে নয়। অর্থাৎ মুরাক্কাবে নাকিসের সবগুলো মুফরাদ ফসীহ হলে একে مُرَكَّب فَصِيْح বলা হয়। অতএব মুরাক্কাবে নাকিসকে কালামের অন্তর্ভুক্ত করাটা সঠিক নয়।

قَوْلُهُ عَلٰى اَنَّ الْحَقَّ اَنَّهُ دَاخِلٌ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, আমরা যদি মেনেও নেই যে, مُرَكَّب نَاقِص-কে তার গোটা সত্তা হিসেবেই فَصِيْح বলা হয়েছে, (মুফরাদগুলো হিসেবে নয়) তবু মূল লেখকের কথায় কোনো অপূর্ণতা নেই। কারণ, مُرَكَّب نَاقِص তো এখানে মুফরাদের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু মুফরাদ ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হয় এবং মুরাক্কাবে নাকিসও মুফরাদ, অতএব, مُرَكَّب نَاقِصও ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হবে। এর দলিল : ১. মুফরাদকে কখনো মুরাক্কাবের বিপরীতে ব্যবহার করা হয়। যেমন– বলা হয় এটি মুফরাদ মুরাক্কাব নয়। ২. মুফরাদকে কখনো দ্বিবচন, বহুবচনের বিপরীতে ব্যবহার করা হয়। যেমন– বলা হয় এটি মুফরাদ, দ্বিবচন বা বহুবচন নয়। ৩. আবার কখনো কালামের বিপরীতে ব্যবহার করা হয়। যেমন– বলা হয় এটি মুফরাদ, কালাম নয়। এ তিন ব্যবহারের মধ্যে মূল লেখকের এখানে তৃতীয়টিই উদ্দেশ্য। কারণ তিনি এখানে মুফরাদকে কালামের বিপরীতে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, وَيُوْصَفُ بِهَا الْمُفْرَدُ وَالْكَلَامُ সুতরাং এখানে মুফরাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَا لَيْسَ بِكَلَامٍ অর্থাৎ যা কালাম নয় তাই মুফরাদ। আর আমরা জানি, مُرَكَّب نَاقِص কালাম নয়। অতএব, مُرَكَّب نَاقِص এখানে মুফরাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা হলো, যেহেতু মুফরাদ বলার দ্বারা 'মুরাক্কাবে নাকিস'ও বলা হয়েছে, তাই مُرَكَّب نَاقِص-কে আলাদা করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। আমাদের লেখক তাই আলাদা করে উল্লেখ করেননি। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেন, متكلم বা ব্যক্তিকে ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত করা যায়। যেমন– কেউ বলল كَاتِبٌ فَصِيْحٌ وَشَاعِرٌ فَصِيْحٌ।

সার-সংক্ষেপ :

ক. فَصَاحَة শব্দের অর্থ– সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ। অলংকারশাস্ত্রে ফাসাহাত শব্দ বাক্য এবং বক্তা (متكلم)-এর وصف (বিশেষণ) হয়।

খ. আল্লামা তাফতাযানী (র.)-এর মতানুযায়ী مُرَكَّب نَاقِص মুফরাদের অন্তর্ভুক্ত, কালামের অন্তর্গত নয়। অতএব মুফরাদ যেমন ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হয় তদ্রূপ মুরাক্কাবে নাকিসও ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হবে।

قَوْلُهُ وَالْبَلَاغَةُ وَهِيَ تُنْبِئُ الخ : بلاغة শব্দটি পৌঁছা, সমাপ্তিতে উন্নীত হওয়া-এর অর্থ প্রদান করে। بلاغة দু' প্রকার– ১. বালাগাতে কালাম ও ২. বালাগাতে মুতাকাল্লিম। অর্থাৎ কালাম ও মুতাকাল্লিম বালাগাত দ্বারা বিশেষিত হয়। তবে মুফরাদ বা কালিমা বালাগাত দ্বারা বিশেষিত হয় না। কারণ, আরবি ভাষাভাষীদের থেকে كَلِمَة بَلِيْغَة বলতে শোনা যায় না। আর এটা জানা কথা যে, যদি কালিমা বালাগাত দ্বারা বিশেষিত হতো, তাহলে অবশ্যই আরবরা كَلِمَة بَلِيْغَة বলত। উল্লেখ্য যে, مُرَكَّب نَاقِصও যেহেতু মুসান্নিফের মতে مفرد-এর অন্তর্ভুক্ত, তাই مُرَكَّب نَاقِص-এরও মুফরাদের মতো হুকুম অর্থাৎ মুরাক্কাবে নাকিস বালাগাত দ্বারা বিভূষিত হতে পারে না। এটি তার মতে মুফরাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে মূল লেখক আলাদা করে একে উল্লেখ করেননি।

وَالتَّعْلِيْلُ بِاَنَّ الْبَلَاغَةَ اِنَّمَا هِيَ بِاعْتِبَارِ الْمُطَابَقَةِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَهِيَ لَاتَتَحَقَّقُ فِي الْمُفْرَدِ وَهْمٌ لِاَنَّ ذٰلِكَ اِنَّمَا هُوَ فِيْ بَلَاغَةِ الْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ وَاِنَّمَا قَسَّمَ كُلًّا مِّنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ اَوَّلًا لِتَعَذُّرِ جَمْعِ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ الْغَيْرِ الْمُشْتَرِكَةِ فِيْ اَمْرٍ يَعُمُّهَا فِيْ تَعْرِيْفٍ وَاحِدٍ وَهٰذَا كَمَا قَسَّمَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْمُسْتَثْنٰى اِلٰى مُتَّصِلٍ وَمُنْقَطِعٍ ثُمَّ عَرَّفَ كُلًّا مِنْهُمَا عَلٰى حِدَةٍ ـ

অনুবাদ : এর কারণ দর্শানো হয় যে, বালাগাত তো বাক্য مُقْتَضٰى حَالْ-এর অনুযায়ী হওয়ার দ্বারা পাওয়া যায়। অথচ এটি মুফরাদে হতে পারে না। (তাই মুফরাদ বালাগাত দ্বারা বিশেষিত হয় না) এটা ভুল। কারণ مُقْتَضٰى حَالْ-এর অনুযায়ী হওয়া কেবল বালাগাতে কালাম এবং মুতাকাল্লিম-এর মধ্যে হয়। লেখক ফাসাহাত ও বালাগাতের প্রকারভেদ প্রথমে উল্লেখ করেছেন। পরস্পরে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অর্থকে একটি সংজ্ঞার মধ্যে একত্রিত করা অসম্ভব হওয়ার কারণে। এটি ইবনে হাজিব (কাফিয়া কিতাবের লেখক) যেরূপ মুস্তাছনাকে মুত্তাসিল ও মুনকাতি' দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এরপর প্রত্যেকটির আলাদা সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তার মতোই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالتَّعْلِيْلُ بِاَنَّ الْبَلَاغَةَ اِنَّمَا هِيَ بِاعْتِبَارِ الخ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ মুফরাদ বালাগাতের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার জন্য কি কারণ দায়ী? এ ব্যাপারে কতিপয় ব্যক্তির মতামতকে উল্লেখ করত সে মতের অসারতা প্রমাণ করেছেন। তারা বলেন, বালাগাত বলা হয়- مُطَابَقَةُ الْكَلَامِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ অর্থাৎ বাক্য مُقْتَضَى الْحَالِ-এর অনুযায়ী হওয়াকে। বালাগাতের এ সংজ্ঞা যেহেতু মুফরাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয় তাই মুফরাদ বালাগাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুসান্নিফ তাদের উক্ত কারণ দর্শানো সম্পর্কে বলেন, এভাবে মুফরাদ-এর অন্তর্ভুক্ত না করার ব্যাখ্যা দেওয়া ভুল এবং ভিত্তিহীন কথা। এর প্রমাণ হচ্ছে- আপনারা বালাগাতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তা মূলত বালাগাতে কালাম ও বালাগাতে মুতাকাল্লিম-এর জন্য প্রযোজ্য। এ ছাড়াও বালাগাতের এমন সংজ্ঞা থাকতে পারে যা মুফরাদকে শামিল করবে। সে হিসেবে মুফরাদ বালাগাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অতএব এভাবে কারণ বর্ণনা না করে, বরং এ কথা বলাই উত্তম যা আমি আগে বলে এসেছি। অর্থাৎ আরবি ভাষা-ভাষীদের থেকে كَلِمَةٌ بَلِيْغَةٌ বলতে শোনা যায় না। যদি মুফরাদ বালাগাতের সাথে বিশেষিত হতো, তাহলে অবশ্যই كَلِمَةٌ بَلِيْغَةٌ ; مُفْرَدٌ بَلِيْغٌ এরূপ শোনা যেত। আর এ কারণেই মুফরাদ বালাগাতের সাথে বিশেষিত হয় না।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا قَسَّمَ كُلًّا مِنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখকগণ সাধারণভাবে প্রথমে কোনো একটি বিষয়ের সংজ্ঞা বর্ণনা করেন, এরপর প্রকারভেদ বর্ণনা করেন। কিন্তু এখানে তালখীসের লেখক ফাসাহাত ও বালাগাতের ক্ষেত্রে তা করেননি। তার এরূপ করাটা কি ঠিক? উত্তরের সারকথা হলো এই যে, مُعَرَّف (যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়)-এর জন্য এমন একটি সার্বিক অর্থ থাকা দরকার, যা তার অধীনের সবগুলো বিষয়ের মাঝে পাওয়া যায়। আর অধীন বিষয়গুলো এই সার্বিক অর্থের মাঝে পরস্পর অভিন্ন। কিন্তু ফাসাহাত ও বালাগাতের মধ্যে এমন একটি সার্বিক অর্থ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যা উভয়ের প্রত্যেক অধীন বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান। এ জন্য প্রথমে تقسيم করে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা বর্ণমা করেছেন। এ স্থানের জন্য এটিই যথার্থ হয়েছে। যেমন- কাফিয়া কিতাবের লেখক আল্লামা ইবনে হাজিব প্রথমে মুস্তাছনার প্রকার বর্ণনা করেছেন, তারপর متصل ও منقطع-এর আলাদা সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।

সার-সংক্ষেপ :

ক. بَلَاغَةٌ শব্দের অর্থ পৌছা ও শেষপ্রান্তে উপনীত হওয়া। পরিভাষায় بلاغة শব্দটি বাক্য ও বক্তার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় মুফরাদ (كلمة)-এর বিশেষণ হয় না।

খ. মূল লেখক ফাসাহাত ও বালাগাতের সংজ্ঞা বর্ণনা না করে প্রথমেই প্রকারভেদ করেছেন। কেননা, ফাসাহাত ও বালাগাতের এমন সংজ্ঞা দান সম্ভব নয়, যা সব প্রকারকে শামিল করে। তাই তিনি প্রকারভেদ করে প্রত্যেক প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা লিখেছেন।

فَالْفَصَاحَةُ فِى الْمُفْرَدِ قَدَّمَ الْفَصَاحَةَ عَلَى الْبَلَاغَةِ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ الْبَلَاغَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْفَصَاحَةِ لِكَوْنِهَا مَاخُوْذَةً فِى تَعْرِيفِهَا ثُمَّ قَدَّمَ فَصَاحَةَ الْمُفْرَدِ عَلَى فَصَاحَةِ الْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ لِتَوَقُّفِهِمَا عَلَيْهَا خُلُوصُهُ اَىْ خُلُوْصُ الْمُفْرَدِ مِنْ تَنَافُرِ الْحُرُوْفِ وَالْغَرَابَةِ وَمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ اللُّغَوِيِّ اَيِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنْ اِسْتِقْرَاءِ اللُّغَةِ وَتَفْسِيْرُ الْفَصَاحَةِ بِالْخُلُوْصِ لَا يَخْلُو عَنْ تَسَامُحٍ -

---

<u>অনুবাদ :</u> **মুফরাদের ক্ষেত্রে ফাসাহাত** (এর সংজ্ঞা) তিনি ফাসাহাতকে বালাগাতের আগে এনেছেন, বালাগাতের পরিচয় ফাসাহাতের পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে। কেননা, ফাসাহাত গৃহীত হয়েছে বালাগাতের মধ্যে। তারপর তিনি ফাসাহাতে মুফরাদকে ফাসাহাতে কালাম ও ফাসাহাতে মুতাকাল্লিমের আগে এনেছেন, কারণ উভয়টি (ফাসাহাতে কালাম ও ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম) ফাসাহাতে মুফরাদের উপর নির্ভরশীল। (সংজ্ঞা) ফাসাহাতে মুফরাদ বলা হয়- **তানাফুরে হুরূফ, গারাবাত এবং মুখালিফাতে কিয়াসে লুগাবী থেকে মুক্ত হওয়া।** অর্থাৎ সেই কিয়াস বা নিয়ম যা অভিধান গবেষণা করে উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফাসাহাতের সংজ্ঞা خلوص দ্বারা করা– তাসামুহ থেকে মুক্ত নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَالْفَصَاحَةُ فِى الْمُفْرَدِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ফাসাহাতের তিন প্রকারের সংজ্ঞা বর্ণনা ও বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন, তাই الفصاحة-এর শুরুতে فاء تفسيرية ও تفصيلية এনেছেন।

قَوْلُهُ قَدَّمَ الْفَصَاحَةَ عَلَى الْبَلَاغَةِ : বলে মুসান্নিফ ফাসাহাতকে বালাগাতের আগে আনার কারণ বর্ণনা করেছেন। কারণ হচ্ছে– বালাগাতের পরিচয় ফাসাহাতের পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। কেননা, বালাগাতের সংজ্ঞার মধ্যে ফাসাহাতের কথা রয়েছে যেমন বলা হয়েছে (বালাগাতের মধ্যে) مُطَابَقَةُ الْكَلَامِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ مَعَ فَصَاحَتِهِ সুতরাং যেহেতু বালাগাতের সংজ্ঞার মধ্যে ফাসাহাত গৃহীত হয়েছে এবং فصاحة শব্দটিকে নেওয়া হয়েছে, তাই আগে ফাসাহাতকে বুঝতে হবে। এরপর মুসান্নিফ (র.) ফাসাহাতে মুফরাদকে ফাসাহাতে কালাম ও ফাসাহাতে মুতাকাল্লিমের আগে আনার কারণ একইভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো, ফাসাহাতে কালাম ও মুতাকাল্লিম বুঝা ফাসাহাতে মুফরাদ বা কালিমা বুঝার উপর নির্ভরশীল।

قَوْلُهُ خُلُوْصُهُ مِنْ تَنَافُرِ الْحُرُوْفِ وَالْغَرَابَةِ وَمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ اللُّغَوِى : প্রথমে প্রশ্ন হলো, ফাসাহাতে মুফরাদের জন্য ক্ষতিকারক তিনটি বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার যুক্তি কি? এর উত্তর হলো, মুফরাদের মধ্যে তিনটি দিক রয়েছে– ১. مادہ বা তার মূল অক্ষরসমূহ, ২. তার আকৃতি বা সীগাহ ও ৩. তার দালালত বা অর্থ বুঝানো। সুতরাং তার مادہ-এর মধ্যে দোষ-ক্রটি দেখা দিলে তাকে تنافر বলবে। তার সীগাহ-আকৃতির মধ্যে দোষ-ক্রটি দেখা দিলে مُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ اللُّغَوِى বলবে। আর এর অর্থ বুঝানোর ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে, তাকে غرابة বলবে। خُلُوْصُهُ অর্থাৎ خُلُوْصُ الْمُفْرَدِ। মুফরাদ এ তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ হলো এ তিনটি বিষয়ের সাথে যুক্ত না হওয়া বা عَدَمُ الْاِتِّصَافِ। এখানে কোনো শব্দের মধ্যে এ তিনটি বিষয় প্রথমে হওয়ার পর এগুলো থেকে মুক্ত হওয়া মোটেও উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ اَلْمُسْتَنْبِطِ مِنْ اِسْتِقْرَاءِ اللُّغَةِ : মুসান্নিফের এ বাক্যটি اَلْقِيَاسُ اللُّغَوِيُّ-এর ব্যাখ্যা। قياس শব্দটি শোনা মাত্র পাঠকের মনে পারিভাষিক কিয়াসের কথা আসবে। অর্থাৎ একটি বিষয়কে আরেকটি বিষয়ের সাথে মিলানো এদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকার ভিত্তিতে। কিন্তু সেই কিয়াস এখানে উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে সেই কিয়াস উদ্দেশ্য যা অভিধানশাস্ত্রে গবেষণা দ্বারা পাওয়া যায়। অর্থাৎ কিয়াসে সরফী যেমন– অভিধানের শব্দাবলি সম্পর্কে তত্ত্ব-তালাশ করে তারা এ নিয়ম নির্ধারণ করেছেন যে, হরকতযুক্ত واو অথবা ياء-এর পূর্বের অক্ষর যদি যবর বিশিষ্ট হয়, তাহলে সেই واو এবং ياء-কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন মূল লেখকের উপর আরোপিত হতে পারে, তা হলো– মুসান্নিফ (র.) সরাসরি قِيَاس صَرْفِي বললেই তো পারতেন, তা না করে তিনি قِيَاس لُغَوِي বলে قِيَاس صَرْفِي উদ্দেশ্য করেছেন। এর উত্তর হলো, তিনি قِيَاس لُغَوِي বলে ইঙ্গিত করেছেন এই দিকে যে, قِيَاس صَرْفِي-এর লক্ষ্য হলো অভিধানের শব্দাবলির গবেষণা-অনুসন্ধান। যদি قِيَاس لُغَوِي না বলতেন, তাহলে সে দিকে ইঙ্গিত হতো না।

قَوْلُهُ وَتَفْسِيْرُ الْفَصَاحَةِ بِالْخُلُوْصِ لَايَخْلُوْ عَنْ تَسَامُحٍ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখককে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। প্রশ্নটি হলো, ফাসাহাত শব্দটি وجودى বা অস্তিত্বশীল। কিন্তু এর সংজ্ঞা خُلُوْصٌ (যা عدم-কে লাযেম করে) দ্বারা করা কতটা সঠিক? কারণ তখন একটি অস্তিত্বশীল শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে অনস্তিত্বশীল শব্দ দ্বারা, যা সংজ্ঞা বর্ণনার ক্ষেত্রে দূষণীয়। অতএব, ফাসাহাতের সংজ্ঞা خُلُوْصٌ দ্বারা করা সমীচীন হয়নি। আর অসমীচীন কাজ করাকে আরবিতে تسامح বলা হয়। তা ছাড়া শুধুমাত্র এ তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত হলেই সেটা ফাসাহাতে মুফরাদ হয়ে যাবে না; বরং এর এমন কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে, যার দ্বারা এটি ফাসাহাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অথচ তার সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, خلوص টাই ফাসাহাত। এখানে ফাসাহাতের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া হলো–

اَلْفَصَاحَةُ هِيَ كَوْنُ الْكَلِمَةِ جَارِيَةً عَلَى الْقَوَانِيْنِ الْمُسْتَنْبِطَةِ مِنْ اِسْتِقْرَاءِ كَلَامِ الْعَرَبِ مُتَنَاسِبَةُ الْحُرُوْفِ كَثِيْرَةَ الْاِسْتِعْمَالِ عَلَى اَلْسِنَةِ الْعَرَبِ الْمُوْثَقُ بِعَرَبِيَّتِهِمْ

অর্থাৎ ফাসাহাতে মুফরাদ বলা হয় এমন কালিমাকে, যা সরফের নিয়ামাবলির অনুসরণে গঠিত; যার অক্ষরগুলো সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আরবি ভাষায় বহুল ব্যবহৃত ও এর আরবি হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত।

সার-সংক্ষেপ :

فَصَاحَةُ مُفْرَدْ বলা হয় تَنَافُرُ حُرُوْف, مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ ও غَرَابَة (এ তিনটি দোষ) থেকে কোনো শব্দ মুক্ত হওয়াকে।

فَالتَّنَافُرُ وَصْفٌ فِى الْكَلِمَةِ تُوجِبُ ثِقْلَهَا عَلَى اللِّسَانِ وَعُسْرَ النُّطْقِ بِهَا نَحْوَ مُسْتَشْزِرَاتٍ فِى قَوْلِ امْرَأِ الْقَيْسِ شِعْرٌ غَدَائِرُهُ اَىْ ذَوَائِبُهُ جَمْعُ غَدِيْرَةٍ وَالضَّمِيْرُ عَائِدٌ اِلَى الْفَرْعِ مُسْتَشْزِرَاتٌ اَىْ مُرْتَفِعَاتٌ اَوْ مَرْفُوْعَاتٌ يُقَالُ اِسْتَشْزَرَهُ اَىْ رَفَعَهُ وَاِسْتَشْزَرَ اَىْ اِرْتَفَعَ اِلَى الْعُلٰى * تَضِلُّ الْعُقَاصُ فِى مُثَنًّى وَمُرْسَلِ ـ تَضِلُّ اَىْ تَغِيْبُ وَالْعُقَاصُ جَمْعُ عَقِيْصَةٍ وَهِىَ الْخُصْلَةُ الْمَجْمُوْعَةُ مِنَ الشَّعْرِ وَالْمُثَنّٰى الْمَفْتُوْلُ وَالْمُرْسَلُ خِلَافُ الْمُثَنّٰى يَعْنِىْ اَنَّ ذَوَائِبَهُ مَشْدُوْدَةٌ عَلَى الرَّاْسِ بِخُيُوْطٍ وَ اَنَّ شَعْرَهُ يَنْقَسِمُ اِلَى عُقَاصٍ وَمُثَنًّى وَمُرْسَلٍ وَالْاَوَّلُ يَغِيْبُ فِى الْاَخِيْرَيْنِ وَالْغَرَضُ بَيَانُ كَثْرَةِ الشَّعْرِ ـ

অনুবাদ : **তানাফুর** বাক্যের এমন এক সিফাত যা মুখের ব্যবহারে শব্দটিকে কঠিন এবং উচ্চারণকে কষ্টসাধ্য করে দেয়। যেমন– ইমরাউল কায়সের কবিতায় مُسْتَشْزِرَاتٌ শব্দটি (কবিতা) তার জুলফি (কপালের দু'পাশের চুল)। غَدَائِرُ শব্দটি غَدِيْرَةٌ-এর বহুবচন। এর ضمير (সর্বনাম) "ه"-এর مرجع হলো فرع। উঠানো অর্থাৎ উঠে গেছে বা উঠানো হয়েছে। যেমন– বলা হয়ে থাকে اِسْتَشْزَرَهُ অর্থ رَفَعَهُ সে তাকে উঁচুতে উঠাল এবং اِسْتَشْزَرَ অর্থ– اِرْتَفَعَ সে উপরে উঠেছে। اِلَى الْعُلٰى উঁচুতে বা উচ্চে। আর চুলের খোঁপা বেণি ও ছাড়া চুলের মধ্যে বা নিচে হারিয়ে যায়। تَضِلُّ অর্থ– تَغِيْبُ অদৃশ্য হয়ে যায়। عُقَاصٌ শব্দটি عَقِيْصَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– চুলের একাংশের সমষ্টি। مُثَنًّى বলা হয়– পেঁচানো বা বেণী করা চুলকে। مُرْسَلٌ হলো– ছাড়া চুল। অর্থাৎ তার খোঁপা মাথায় সুতা দ্বারা বাঁধা। আর তার (সব চুল খোঁপা), বেণি ও ছাড়া চুলে বিভক্ত। প্রথম প্রকার (খোঁপা) শেষ দু'প্রকারের মাঝে হারিয়ে যায় আর (এ সব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো) চুলের আধিক্য বর্ণনা করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ فَالتَّنَافُرُ وَصْفٌ فِى الْكَلِمَةِ تُوْجِبُ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) যে তিনটি বিষয় হতে فصاحت-এর مفرد-এর মুক্ত হওয়া শর্ত সেগুলোর আলোচনা শুরু করেছেন।

প্রথমত تَنَافُرُ الْكَلِمَةِ সম্পর্কে বলেছেন যে, তানাফুর কালিমার এমন দোষকে বলা হয়, যা উচ্চারণে শব্দটিকে কঠিন করে তুলে। ثقل শব্দটির উচ্চারণ– ث-এর নিচে যের , ق-এর উপর যবর হলে مصدر আর ق-এর উপর জযম হলে اسم হবে। উভয়ভাবে পড়া যায়।

قَوْلُهُ وَعُسْرُ النُّطْقِ بِهَا : এবং এর উচ্চারণকে কষ্টসাধ্য করে দেয়। কারো মতে عُسْرُ النُّطْقِ-এর عطف তাফসীর হিসাবে হয়েছে অর্থাৎ ثِقْلَهَا عَلَى اللِّسَانِ এবং عُسْرُ النُّطْقِ-এর অর্থ একই। আবার কারো মতে عُسْرُ النُّطْقِ হলো مسبب আর ثِقْلَهَا عَلَى اللِّسَانِ হলো سبب। অর্থাৎ শব্দটি মুখের জন্য কঠিন হওয়াতেই উচ্চারণ কঠিন হয়েছে। যেমন مستشزرات শব্দটি متنافر বা তানাফুরযুক্ত হয়েছে। এ শব্দটি জাহিলিয়া যুগের আরবের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরাউল কায়স-এর প্রসিদ্ধ معلقة থেকে নেওয়া হয়েছে। যে معلقة-এর প্রথম পঙ্ক্তি হলো–

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرٰى حَبِيْبٍ وَّمَنْزِلٍ * بِسِقْطِ اللِّوٰى بَيْنَ الدَّخُوْلِ فَحَوْمَلِ

উক্ত শব্দটি যে পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে তা উত্তমরূপে অনুধাবনের জন্য সেই পঙ্‌ক্তি এবং এর পূর্বের পঙ্‌ক্তিটি এখানে অর্থসহ উল্লেখ করা হলো–

وَفَرْعٍ يَزِيْنُ الْمَتَنَ اَسْوَدُ فَاحِمٌ * اَثِيْثٌ كَقِنْوِ النَّخْلَةِ الْمُتَعَثْكِلِ

غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ اِلَى الْعُلٰى * تَضِلُّ الْعُقَاصُ فِىْ مُثْنًى وَمُرْسَلِ

অর্থাৎ এবং কয়লা সদৃশ কালো এবং বহু কাঁদি বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষের থোকা সদৃশ অধিক কেশরাজি, যা পিঠের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তার চুলের জুলফি উর্ধ্বগামী। তার খোঁপা বেণি ও ছাড়া চুলের মাঝে হারিয়ে যায়।

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত পঙ্‌ক্তির প্রতিটি শব্দের তাহকীক করেছেন। غَدَائِرُهُ শব্দটি غَدِيْرَةٌ-এর বহুবচন। তিনি غَدَائِرُ-এর ব্যাখ্যায় ذَوَائِبُهُ শব্দটি এনেছেন। ذَوَائِبُ শব্দটি ذَائِبَةٌ-এর বহুবচন। ذَوَائِبُ অর্থ– মাথা থেকে পিঠের দিকে ছেড়ে দেওয়া চুল, যা কখনো একত্রিত করে মাথার মধ্যখানে খোঁপা করে রাখা হয়। এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। غَدَائِرُهُ-এর ضمير-এর مرجع হলো পূর্বের পঙ্‌ক্তির فَرْعٌ শব্দটি। فَرْعٌ অর্থ– সাধারণ চুল। مُسْتَشْزِرَاتٌ শব্দটি مُسْتَشْزِرَةٌ-এর বহুবচন। এটি নির্গত হয়েছে اِسْتَشْزَرَ ফে'লটি থেকে। এ ফে'লটি লাযেম ও মুতাআদ্দী উভয়রূপেই ব্যবহার হতে পারে। যেমন– اِسْتَشْزَرَهُ অর্থাৎ رَفَعَهُ অর্থ– সে উঁচু করল اِسْتَشْزَرَ অর্থাৎ اِرْتَفَعَ উঁচু হলো। اَلْعُلٰى শব্দটি عَلِيٌّ-এর বহুবচন, অর্থ– উঁচু স্থান বা দিক। এখানে আকাশের দিক উদ্দেশ্য। تَضَلُّ শব্দটি ضَلَالٌ থেকে নির্গত। অর্থ– হারিয়ে যায়। عُقَاصٌ শব্দটি عين-এর নিচে যের এবং উপরে পেশ, عَقِيْصَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ–ফিতা দ্বারা পেঁচানো চুল, খোঁপা। مُثْنًى শব্দের مَفْتُوْلٌ বা পেঁচানো, বেণি করা চুল। مُرْسَلٌ খোলা-ছাড়া চুল। اَلْمَتَنُ অর্থ– কোমর। এর বহুবচন مُتُوْنٌ। اَلْفَاحِمُ ঘন কালো যা فَحْمٌ (কয়লা)-এর মতো কালো। اَثِيْثٌ অর্থ– বেশি ঘন। قِنْوَةٌ অর্থ– খেজুরের গোছা, খেজুরের ফুলের গুচ্ছ। مُتَعَثْكِلُ অর্থ– অধিক থোকা বিশিষ্ট। عَثَاكِيْلُ অর্থ– থোকা। কারো মতে এখানে غَدَائِرُ শব্দটি সাধারণ চুলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থানুসারে غَدَائِرُهُ -এর মধ্যে اضافت হবে اِضَافَت بَيَانِيَة।

قَوْلُهُ يَعْنِىْ اَنَّ ذَوَائِبَهُ مَشْدُوْدَةٌ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) পুরো শেয়েরের সারাংশ তুলে ধরেছেন। আর তা হলো– তার চুলের একাংশ মাথার মধ্য ভাগে ফিতা দ্বারা বাঁধা। এর উপরে আবার বেণি ও খোলা চুল রয়েছে। যার ফলে খোঁপাটি আর দৃশ্যমান হচ্ছে না। এতে অনুমান করা যায়, তার চুল অনেক বেশি ছিল বিধায় খোঁপাটি গোচরিভূত হচ্ছিল না। মোদ্দাকথা, কবিতার مُسْتَشْزِرَاتٌ শব্দটি উচ্চারণে কঠিন হওয়ার কারণে এতে تنافر হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

تَنَافُرُ الْحُرُوْفِ বলা হয় শব্দের এমন অবস্থাকে, যার দ্বারা শব্দে শ্রুতিকটুতা ও উচ্চারণ জনিত কাঠিন্য সৃষ্টি হয়। যেমন– مُسْتَشْزِرَاتٌ

وَالضَّابِطَةُ هٰهُنَا اَنَّ كُلَّ مَا يَعُدُّهُ الذَّوْقُ الصَّحِيْحُ ثَقِيْلًا مُتَعَسِّرَ النُّطْقِ فَهُوَ مُتَنَافِرٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قُرْبِ الْمَخَارِجِ اَوْ بُعْدِهَا اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ عَلٰى مَا صَرَّحَ بِهٖ اِبْنُ الْاَثِيْرِ فِى الْمَثَلِ السَّائِرِ وَ زَعَمَ بَعْضُهُمْ اَنَّ مَنْشَأَ الثِّقْلِ فِىْ مُسْتَشْزِرَاتٍ هُوَ تَوَسُّطُ الشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ الَّتِىْ هِىَ مِنَ الْمَهْمُوْسَةِ الرِّخْوَةِ بَيْنَ التَّاءِ الَّتِىْ مِنَ الْمَهْمُوْسَةِ الشَّدِيْدَةِ وَالزَّاءِ الْمُعْجَمَةِ الَّتِىْ هِىَ مِنَ الْمَجْهُوْرَةِ وَلَوْ قَالَ مُسْتَشْرِفٌ لَزَالَ ذٰلِكَ الثِّقْلُ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ الرَّاءَ الْمُهْمَلَةَ اَيْضًا مِنَ الْمَجْهُوْرَةِ ـ

অনুবাদ : এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো– যে সকল শব্দকে সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কঠিন এবং উচ্চারণে কষ্টকর মনে করে সেটাই মুতানাফির। চাই সেটা কাছাকাছি মাখরাজের কারণে হোক, দূরবর্তী মাখরাজের কারণে হোক অথবা অন্য কোনো কারণে হোক এটি ইবনে আছীরের অভিমত; যা তিনি (তাঁর রচিত গ্রন্থ) আল মাছালুস সায়ির নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কতিপয় লোক মনে করেন مُسْتَشْزِرَاتٌ শব্দের মধ্যে কাঠিন্যের উৎপত্তি হচ্ছে মাহমূসাহ ও রিখওয়া-এর অন্তর্গত অক্ষর شين। মাহমূসায়ে শাদীদার অক্ষর تاء এবং মাজহূরার অক্ষর زاء-এর মাঝে আসা। তারা বলেন, তিনি যদি مُسْتَشْرِفٌ বলতেন, তাহলে এ কাঠিন্য দূর হয়ে যেত, কিন্তু এ মতেও আপত্তি আছে। কারণ, راء ও তো মাজহূরার অক্ষর।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالضَّابِطَةُ هٰهُنَا اَنَّ كُلَّ مَا يَعُدُّهُ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ تنافر-এর সংজ্ঞা মূলনীতি আকারে বর্ণনা করেছেন। মূলনীতিটি হলো– সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি যে শব্দের উচ্চারণ কঠিন ও কষ্টকর মনে করেন সে শব্দটিই متنافر বা তানাফুরযুক্ত। এতে শব্দের অক্ষরগুলো পরস্পর নিকটবর্তী মাখরাজের (হরফ উচ্চারণের স্থান) অথবা অক্ষরগুলোর দূরবর্তী মাখরাজ হওয়া কিংবা অন্য কিছু হওয়া লক্ষণীয় নয়; বরং এসবের দ্বারা تنافر হওয়া বা না হওয়া নির্ভরশীল নয়। এ মূলনীতিটি আল্লামা ইবনুল আছীর (র.) 'আল-মাছালুস সায়ির' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেন, কেউ কেউ অর্থাৎ আল্লামা খালখালী-এর মতে مُسْتَشْزِرَاتٌ-এর মধ্যে تنافر-এর কারণ হরফের সিফাত সংক্রান্ত বৈপরীত্য।

প্রকাশ থাকে যে, সিফাত শব্দের অর্থ হরফের স্বভাব বা গুণাগুণ। হরফের সিফাত সাধারণত দু'প্রকার : ১. সিফাতে যাতিয়াহ ও ২. সিফাতে আরযিয়্যাহ। সিফাতে যাতিয়াহকে সিফাতে লাযিমাহও বলে। সিফাতে যাতিয়াহ বা লাযিমিয়াহ দু'প্রকার : ১. সিফাতে মুতাযাদ্দাহ বা বিরুদ্ধবাদী সিফাত ও ২. সিফাতে গায়রে মুতাযাদ্দাহ বা অবিরুদ্ধবাদী সিফাত। সিফাতে মুতাযাদ্দাহ পাঁচ জোড়ায় ১০টি, প্রতিটি জোড়ায় একটি সিফাত অপরটির বিপরীত। কোনো হরফের মধ্যে এক জোড়ার একটি সিফাত পাওয়া গেলে অপরটি পাওয়া যাবে না, তবে অন্য জোড়ায় আরেকটি সিফাত পাওয়া যাওয়া সম্ভব। مُسْتَشْزِرَاتٌ এ শব্দটির شين হরফটির আগের অক্ষর হলো تاء আর পরের অক্ষরটি হলো زاء। এখানে এ তিনটি অক্ষরের সিফাত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। شين-এর মধ্যে দু'টি সিফাত রয়েছে– ১. همس (এর হরফকে মাহমূসাহ বলে) এর

উচ্চারণ নরম এবং বাতাস চালু থাকবে। (همس-এর বিপরীত হলো جهر ; এর হরফকে মাজহূরাহ বলে) ২. رخوة-এর উচ্চারণের সময় আওয়াজ জারি থাকবে। شين-এর পূর্বে تاء। এর মধ্যে দু'টি সিফাত– ১. همس ২. شدة ; এর হরফকে شديدة (শাদীদাহ) বলে। এর উচ্চারণে আওয়াজ বন্ধ ও শক্ত হবে। شين-এর পরে زاء -এর মধ্যে ১টি সিফত (جهر) রয়েছে। অতএব, مُسْتَشْزِرَاتٌ-এর মধ্যে মুতাযাদ্দাহ সিফাত যথা همس-এর বিপরীত جهر এবং شدة-এর বিপরীত رخوة ইত্যাদি একত্রিত হয়েছে। আর একই শব্দের মধ্যে সিফাতে মুতাযাদ্দাহ একাত্রিত হলে শব্দটির উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়। তাই আল্লামা খালখালী (র.) বলেন, مُسْتَشْرِفَاتٌ বললে تنافر-এর সমস্যা থাকবে না এবং শব্দটির উচ্চারণ সহজ হয়ে যাবে।

আমাদের মুসান্নিফ আল্লামা খালখালীর উক্ত মতটিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তার এ অভিমতটিতে আপত্তি রয়েছে। مُسْتَشْزِرَاتٌ-এর মধ্যে زاء যেমন মাজহূরার অক্ষর, তেমনি مُسْتَشْرِفَاتٌ-এর شين-এর পরে راءও তো মাজহূরার অক্ষর, তাহলে সিফাতের বৈপরীত্বের সমস্যা তো রয়েই গেল। অর্থাৎ مُسْتَشْزِرَاتٌ-এর মধ্যে যে সকল সিফাতে মুতাযাদ্দা পাওয়া গিয়েছিল مُسْتَشْرِفَاتٌ-এর মধ্যেও সেগুলো পাওয়া গেল। অতএব, এ সকল সিফাতের কারণে যদি مُسْتَشْزِرَاتٌ তানাফুরযুক্ত হয়, তবে একই কারণে مُسْتَشْرِفَاتٌও তানাফুরযুক্ত হওয়া দরকার। অতএব, একথাই প্রমাণিত হলো যে, আল্লামা খালখালী যা বললেন– তা تنافر-এর কারণ নয়; বরং তানাফুরের কারণ সেটাই যা মুসান্নিফ (র.) বর্ণনা করেছেন।

وَقِيْلَ اِنَّ قُرْبَ الْمَخَارِجِ سَبَبٌ لِلثِّقْلِ الْمُخِلِّ بِالْفَصَاحَةِ وَاِنَّ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَلَمْ اَعْهَدْ ثِقْلًا قَرِيْبًا مِنْ حَدِّ التَّنَافُرِ فَيُخِلُّ بِفَصَاحَةِ الْكَلِمَةِ لٰكِنَّ الْكَلَامَ الطَّوِيْلَ الْمُشْتَمِلَ عَلٰى كَلِمَةٍ غَيْرِ فَصِيْحَةٍ لَايَخْرُجُ عَنِ الْفَصَاحَةِ كَمَا لَا يَخْرُجُ الْكَلَامُ الطَّوِيْلُ الْمُشْتَمِلُ عَلٰى كَلِمَةٍ غَيْرِ عَرَبِيَّةٍ عَنْ اَنْ يَّكُوْنَ عَرَبِيًّا وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ فَصَاحَةَ الْكَلِمَاتِ مَاخُوْذَةٌ فِىْ تَعْرِيْفِ فَصَاحَةِ الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ طَوِيْلٍ وَقَصِيْرٍ عَلٰى اَنَّ هٰذَا الْقَائِلَ فَسَّرَ الْكَلَامَ بِمَا لَيْسَ بِكَلِمَةٍ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْكَلَامِ الْعَرَبِىْ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُ خُرُوْجِ السُّوْرَةِ عَنِ الْفَصَاحَةِ فَمُجَرَّدُ اِشْتِمَالِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى كَلَامٍ غَيْرِ فَصِيْحٍ بَلْ عَلٰى كَلِمَةٍ غَيْرِ فَصِيْحَةٍ مِمَّا يَقُوْدُ اِلٰى نِسْبَةِ الْجَهْلِ وَالْعَجْزِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ـ

অনুবাদ : আর কেউ কেউ বলেন, মাখরাজের অক্ষর (একত্রিত) হওয়া কাঠিন্যের কারণ, যা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'আলার বাণী اَلَمْ اَعْهَدْ-এও (উচ্চারণগত) অসুবিধা রয়েছে যা তানাফুরের সীমানার নিকটবর্তী। ফলে এটি শাব্দিক ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর হবে; কিন্তু ফাসাহাতযুক্ত একটি শব্দের কারণে দীর্ঘ বাক্য ফাসাহাতের থেকে বের হয়ে যায় না। যেমন একটি অনারবী শব্দযুক্ত দীর্ঘ আরবি বাক্য অনারবী হয়ে যায় না। এ মতের মধ্যেও আপত্তি রয়েছে। কেননা, বাক্যের ফাসাহাতের জন্য (সকল) শব্দসমূহের ফাসাহাতযুক্ত হওয়া জরুরি। এ (শর্তের) ব্যাপারে বড় ও ছোট বাক্যের কোনো পার্থক্য নেই। তা ছাড়া এ মতের প্রবক্তা كلام বা বাক্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন। مَا لَيْسَ بِكَلِمَةٍ (যা কালিমা নয়, তাই কালাম বা বাক্য), বলে। আর আরবি বাক্যের সাথে একে তুলনা করা স্পষ্ট ভুল। যদিও ফাসাহাতমুক্ত শব্দ থাকা সত্ত্বেও সূরা ফাসাহাত থেকে বের হয় না, এ কথা মেনে নেওয়া হয়, তবু কুরআনুল কারীমে একটি ফাসাহাতমুক্ত বাক্য, বরং একটি ফাসাহাতমুক্ত শব্দ থাকাও আল্লাহর প্রতি অজ্ঞতা বা অক্ষমতার সম্বন্ধ জুড়ে দেওয়ার নামান্তর। আল্লাহ এর থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَقِيْلَ اِنَّ قُرْبَ الْمَخَارِجِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) تنافر -এর ব্যাপারে ইমাম যুযানীর অভিমত উল্লেখ করেছেন। তার মতে কাছাকাছি মাখরাজের অক্ষরসমূহ একটি শব্দের মধ্যে একত্রিত হলে শব্দটি তানাফুরযুক্ত হয় এবং এর উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়। আর আমরা জানি কোনো শব্দের মধ্যে تَنَافُرِ حُرُوْف পাওয়া গেলে সেটি غَيْر فَصِيْح হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ইমাম যুযানীর এ মতের উপর আপত্তি উঠবে, তাহলে তো কুরআনে কারীমের প্রতিটি শব্দ ফাসাহাতযুক্ত হবে না। কারণ, কুরআনের আয়াতে اَلَمْ اَعْهَدْ শব্দটি রয়েছে। আর এতে এমন অক্ষরসমূহের সমন্বয় ঘটেছে, যেগুলো পরস্পর কাছাকাছি মাখরাজের। যথা– همزه এবং ه-এর মাখরাজ হলো اَقْصٰى حَلْق বা কণ্ঠনালীর শুরু। আর عين-এর মাখরাজ হলো وَسْط حَلْق বা কণ্ঠনালীর মধ্যখান। অতএব اَلَمْ اَعْهَدْ কুরআনের যে সূরায় রয়েছে সে সূরাটিও ফাসাহাত সমৃদ্ধ হবে না; অথচ এটা অসম্ভব। ইমাম যুযানী لٰكِنَّ الْكَلَامَ বলে তার উপর আরোপিত সেই আপত্তি খণ্ডন করে বলছেন যে, একটি লম্বা বাক্যের মধ্যে যদি কোনো একটি ফাসাহাতবিহীন শব্দ থাকে, তাহলে সেই লম্বা বাক্যটি ফাসাহাত থেকে বের হয়ে যায় না। যেমন একটি বড় আরবি বাক্যের মধ্যে কোনো একটি অনারবী শব্দ ঢুকে পড়লে সেই আরবি বাক্যটি অনারবী হয়ে যায় না। যেমন কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ কিতাব। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا (আমি কুরআনকে আরবি ভাষায় নাজিল করেছি) কিন্তু এতে অনারবী শব্দ বহু রয়েছে। যেমন– قِسْطَاسٌ (পাল্লা), سِجِلٌ (নিবন্ধনবহি), مِشْكَاةٌ (বাতিদান), ইব্রাহীম ইত্যাদি শব্দ, ঠিক তেমনি ফাসাহাতবিহীন শব্দ থাকা সত্ত্বেও বাক্যটি 'কালামে ফসীহ' বলেই অভিহিত হবে এবং তা ফাসাহাতবিহীন হবে না।

ইমাম যুযানীর মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে মুসান্নিফ (র.) বলেন, তার এ মতে যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। কারণ, তার কথায় তিনি দু'টি বিষয়ের দাবি করেছেন, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ১. একটি দীর্ঘ বাক্যের কোনো একটি ফাসাহাতবিহীন শব্দের কারণে বাক্যটি ফাসাহাত থেকে বের হয় না। ২. এ ধরনের বাক্যকে বড় আরবি বাক্যের সাথে তুলনা করেছেন। তার প্রথম দাবিটি এ জন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, كَلَام فَصِيح-এর জন্য কালামের প্রতিটি কালিমা বা শব্দ فصيح হওয়া শর্ত। ফাসাহাতে কালামের সংজ্ঞাতে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। সেখানে কালামের বড় বা ছোট হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সংজ্ঞা মতে কোনো কালাম বা বাক্যের একটি শব্দও যদি ফাসাহাতবিহীন হয় তবুও সেটা কালামে ফসীহ হবে না। সুতরাং তার প্রথম দাবিটি অগ্রাহ্য হলো।

قَوْلُهُ إِنَّ هٰذَا الْقَائِلَ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) ইমাম যুযানীর উপর পাল্টা প্রশ্ন তুলে বলেছেন– তাঁর মতে ফাসাহাতে কালামের জন্য কালিমাগুলো ফাসাহাতযুক্ত হওয়ার গুরুত্ব তুলনামূলক বেশি। কারণ, কালামের সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন– اَلْكَلَامُ مَا لَيْسَ بِكَلِمَةٍ কালাম বলা হয়– এমন বাক্যকে, যা কালিমা বা একক শব্দ নয়। সুতরাং مُرَكَّب نَاقِص এবং مُرَكَّب تَام উভয়েই কালামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আর ফাসাহাতে কালামের জন্য কালিমাগুলো ফাসাহাতযুক্ত হওয়া সকলের মতেই শর্ত। অতএব, তার মতে مُرَكَّب تَام-এর প্রতিটি কালিমা এবং مُرَكَّب نَاقِص-এর প্রতিটি কালিমা ফাসাহাতযুক্ত হওয়া শর্ত এবং কোনো একটি ফাসাহাতবিহীন কালিমা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে مُرَكَّب تَام এবং مُرَكَّب نَاقِص উভয়েই ফাসাহাতবিহীন হয়ে যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তাঁর মতানুসারে ফাসাহাত ছাড়া কালিমা ধারণ করার কারণে দু'স্থানে সমস্যা হচ্ছে– ১. مُرَكَّب تَام-এর মধ্যে, ২. مُرَكَّب نَاقِص-এর মধ্যে। আর মুসান্নিফ (র.)-এর মতে مُرَكَّب نَاقِص কালামের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই 'কালিমাসমূহের ফাসাহাত' শুধুমাত্র مُرَكَّب تَام-এর সংজ্ঞায় শর্ত, مُرَكَّب نَاقِص-এর মধ্যে শর্ত নয়। সুতরাং কালামের মধ্যে যদি কোনো শব্দ ফাসাহাতবিহীন হয়, তবে এর দ্বারা কেবল مُرَكَّب تَام ফাসাহাতবিহীন হবে এবং এতে সমস্যা আসবে। সারকথা হলো, কালামের মধ্যে ফাসাহাতবিহীন কালিমা অন্তর্ভুক্ত হলে ইমাম যুযানীর মতানুসারে সমস্যা বেশি হবে। অর্থাৎ مُرَكَّب تَام এবং مُرَكَّب نَاقِص উভয়ই ফাসাহাতবিহীন বলে গণ্য হবে। আর মুসান্নিফ (র.)-এর ব্যাখ্যানুসারে শুধুমাত্র مُرَكَّب تَام-এর মধ্যে সমস্যা হবে।

قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْكَلَامِ الْعَرَبِيِّ : এ বাক্য দ্বারা ইমাম যুযানীর দ্বিতীয় দাবি বা আরবি বাক্যের সাথে তুলনাকে খণ্ডন করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ তুলনাটি সঠিক নয়; বরং নিশ্চিতভাবেই ভ্রান্তি। নিম্নে এর কারণ দেওয়া হলো– ১. ফাসাহাতে কালামের জন্য কালামের সবগুলো শব্দ ফসীহ হওয়া শর্ত। কিন্তু আরবি বাক্য হওয়ার জন্য এর প্রতিটি শব্দ আরবি হওয়া শর্ত নয়; বরং অধিকাংশ শব্দ আরবি হলেই সেটি আরবি বাক্য হয়ে যাবে। ২. কুরআনে অনারবী শব্দ আছে, এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। যেসব শব্দকে হিব্রু, ল্যাটিন বা ভারতীয় বলা হয়, সেগুলো সম্পর্কে আমাদের মত হচ্ছে এসব শব্দের ক্ষেত্রে উভয় ভাষার ঐক্য হয়েছে। অর্থাৎ শব্দটি আরবি এবং হিব্রু, অথবা আরবি এবং ফারসি ইত্যাদি। ৩. এ সব শব্দকে অনারবী মেনে নেওয়া হলেও إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا দ্বারা গোটা কুরআনকে আরবি বলা হয়েছে একথা আমরা মানি না এবং আয়াতে أَنْزَلْنَاهُ বলে সূরা বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ কুরআনের একটি বিশেষ অংশ আরবি বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা যে বলেন, কুরআনের বড় অংশ আরবি তাই আরবি বলা হয়েছে। এ কথা আমরা মানি না।

وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُ خُرُوْجِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ বলেন, যদিও বা একথা মেনে নেওয়া হয় যে, কোনো একটি শব্দ ফাসাহাতবিহীন হলে পুরো সূরা ফাসাহাতবিহীন হয়ে যায় না বা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর নয়; কিন্তু তার পরেও আপনি এ দাবির কারণে বিপদমুক্ত হতে পারছেন না। কেননা, তখন এতটুকু মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, কুরআনে ফাসাহাতবিহীন শব্দ এসেছে। আর এতটুকুতেই বিরাট এক প্রশ্ন এসে যায় যে, এতটুকু ত্রুটির কথা কি আল্লাহ জানতেন না? যদি বলেন না, জানতেন না। তাহলে আল্লাহর প্রতি অজ্ঞতার সম্বন্ধ করতে হয়। আর যদি বলেন, আল্লাহ জানতেন বটে, তবে এটি কুরআন থেকে দূর করতে অক্ষম ছিলেন, তাই করেননি। এতে আল্লাহর প্রতি অপারগতা অক্ষমতার সম্বন্ধ করতে হয়। অথচ অজ্ঞতা ও অক্ষমতার সাথে দূরতম সম্পর্ক আল্লাহর নেই। তিনি এসব থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি সবধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র।

সার-সংক্ষেপ :

تَنَافُرُ الْحُرُوْفِ চিহ্নিত করার নিয়ম হচ্ছে সাহিত্যের সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি যে শব্দকে متنافر মনে করে সেটাই তানাফুরযুক্ত। এ ব্যাপারে অন্য মতগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

وَالْغَرَابَةُ كَوْنُ الْكَلِمَةِ وَحْشِيَّةً غَيْرَ ظَاهِرَةِ الْمَعْنٰى وَلَا مَأْنُوْسَةَ الْاِسْتِعْمَالِ نَحْوُ مُسَرَّجٍ فِىْ قَوْلِ اِبْنِ الْعَجَّاجِ شِعْرٌ وَمُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا * اَىْ مُدَقَّقًا مُطَوَّلًا وَفَاحِمًا اَىْ شَعْرًا اَسْوَدَ كَالْفَحْمِ وَمَرْسِنًا اَىْ اَنْفًا مُسَرَّجًا اَىْ كَالسَّيْفِ السُّرَيْجِىِّ فِى الدِّقَّةِ وَالْاِسْتِوَاءِ وَسُرَيْجٌ اِسْمُ قَيْنٍ يُنْسَبُ اِلَيْهِ السُّيُوْفُ اَوْ كَالسِّرَاجِ فِى الْبَرِيْقِ وَاللَّمْعَانِ فَاِنْ قُلْتَ لِمَ لَمْ يَجْعَلُوْهُ اِسْمَ مَفْعُوْلٍ مِنْ سَرَّجَ اللّٰهُ وَجْهَهُ اَىْ بَهَّجَهُ وَحَسَّنَهُ قُلْتُ لِاِحْتِمَالِ اَنْ يَكُوْنَ مُسْتَحْدَثًا وَمُوَلَّدًا مِنَ السِّرَاجِ اَوْ يَكُوْنَ مِنْ بَابِ الْغَرَابَةِ اَيْضًا ـ

অনুবাদ : গারাবাত বলা হয়– কোনো একটি শব্দ এমন বিরল হওয়া, যার অর্থ সুস্পষ্ট নয় এবং এর ব্যবহার অপরিচিত। যেমন ইবনুল আজ্জাজের কবিতায় مُسَرَّجٌ শব্দটি। কবিতা– আর চোখ, দীর্ঘ-চিকন ভ্রূ এবং কয়লার মতো কালো কেশরাজি, আর এমন নাক যা তীক্ষ্ণতা এবং লম্বায় সুরাইজীর তরবারির মতো। সুরাইজ এক বিখ্যাত কামারের নাম। তার প্রস্তুতকৃত তরবারিগুলো তার নামেই পরিচিত ও প্রচলিত। অথবা (তার নাক) দীপ্তি ও উজ্জ্বলতায় প্রদীপের ন্যায়। যদি আপনি বলেন, তারা কেন এটিকে سَرَّجَ اللّٰهُ وَجْهَهُ যা بَهَّجَهُ وَحَسَّنَهُ-এর অর্থে (আল্লাহ তাকে জ্যোতির্ময় এবং সুন্দর করুন)-এর ইসমে মাফউল করলেন না? আমি বলি (এ মতে) এটি سراج (প্রদীপ) থেকে পরবর্তীতে উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট হতে পারে। অথবা এটি গারাবাত জাতীয় (বিরল) শব্দ (যার অর্থ স্পষ্ট নয়)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْغَرَابَةُ كَوْنُ الْكَلِمَةِ الخ : গারাবাত হলো দ্বিতীয় ত্রুটি-যার কারণে মুফরাদ শব্দ ফাসাহাতবিহীন বলে বিবেচিত হয়। গারাবাত বলা হয়– কালিমাটি এমন হওয়া যা তার নির্দিষ্ট অর্থের উপর সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে না। অর্থাৎ সে শব্দটি শোনা মাত্র আমরা এর অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হই না। তা ছাড়া এটি আরবি ভাষা-ভাষীদের কাছেও পরিচিত নয়। সংজ্ঞাটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, লেখক গারাবাতকে দু'ভাবে বিভক্ত করেছেন– ১. বিরল শব্দ, যার অর্থ স্পষ্ট নয়, ২. ব্যবহার প্রচলিত নয়। ১ম প্রকারের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– শব্দটির অর্থ সাধারণভাবে জানা যায় না এবং এর অর্থের প্রতি সহজে ধারণা জন্মায় না; বরং এর অর্থ জানার জন্য বড় বড় অভিধানগ্রন্থ অনুসন্ধান করতে হয়। এ প্রকারের উদাহরণ লেখক দেননি। যেমন– تَكَأْكَأَ (একত্রিত হওয়া) اِفْرَنْقَعَ (বিচ্ছিন্ন হওয়া)। দ্বিতীয় প্রকার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, শব্দটি আদি বা মূল আরবীয়দের কাছে অব্যবহৃত হওয়া। আর অব্যবহৃত হওয়ার কারণে এর তত্ত্ব-তালাশও অভিধান গ্রন্থগুলোতে হয় না; বরং এটি বুঝার জন্য দূরবর্তী কার্যকারণ বা দূর সম্পর্কের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতে হয়। প্রথম প্রকার সাধারণভাবে ইসমে জামেদ এবং মাসদারের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার সাধারণত مشتق-এর ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ مُسَرَّجٌ শব্দটি। এ শব্দটি কবি রুবা ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাসরী আবূ মুহাম্মদ ইবনুল আজ্জাজ আত-তামীমী আস-সায়েদীর কবিতায় পাওয়া যায়। কবি ইবনুল আজ্জাজ ও তার পিতা আজ্জাজ 'রাজায' কবিতার রচয়িতা ছিলেন। আজ্জাজ আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস সরাসরি শুনেছেন।

مُسَرَّجٌ শব্দটি যে কবিতায় রয়েছে তার বিশেষ কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

اَزْمَانُ اَبْدَتْ وَاضِحًا مُفَلَّجًا * اَغَرَّ بَرَّاقًا طَرْفًا اَبْرَجَا

وَمُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا * وَفَاحِمًا وَمَرْسِنًا مُسَرَّجَا

চয়নকৃত অংশের অনুবাদ : আমার প্রিয়া আজমান তার উজ্জ্বল-শুভ্র ও প্রশস্ত দন্তরাজি খুলে (হেসেছে) এবং ডাগর চক্ষু মেলে তাকিয়েছে। সে তার দীর্ঘ-সরু ভ্রূযুগলও সুরাইজী তরবারির মতো খাড়া এবং চিকন নাক প্রকাশ করেছে।

কবিতার শব্দার্থ : أَزْمَانُ প্রিয়ার নাম, أَبْدَتْ প্রকাশ করা, وَاضِحًا প্রশস্ত, এখানে سِنًّا وَاضِحًا উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রশস্ত দন্তরাজি। مُفَلَّجًا ফাঁকা ফাঁকা দাঁত, أَغَرَّ শুভ্র-সাদা, بَرِيْقٌ-এর বহুবচন بَرَاقٌ উজ্জ্বল, طَرْفٌ চোখ, مُقْلَةٌ পুরো চোখ, أَبْرَجُ প্রশস্ত-বড়, حَاجِبٌ ভ্রূ, مُزَجَّجٌ সরু ও লম্বা, فَاحِمٌ কয়লা, مَرْسِنًا নাক, مُسَرَّجٌ সুরাইজী তরবারি।

কবিতায় উল্লিখিত مُسَرَّجٌ শব্দটি গারাবাতের উদাহরণ। এ শব্দটির ব্যবহার মূল আরবীয়দের কাছে অপরিচিত। প্রথমত এতটুকু বুঝা গেছে যে, শব্দটি باب تفعيل-এর تَسْرِيْجٌ-এর ইসমে মাফউল। কিন্তু এ মুশতাকের مشتق منه বা ধাতু মূল কোনো অভিধান গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ শব্দটিকে ভুলও ধরা যায় না, কারণ একজন খ্যতিমান কবির কথায় এটি পাওয়া গেছে। এ জন্য মূল খোঁজা শুরু হয়। অবশেষে এর مَادَّة বা মূল অক্ষরের দু'টি শব্দ পাওয়া যায়। ১. سُرَيْجٌ এক কামারের নাম। ২. سِرَاجٌ প্রদীপ। এরপর এ দু'দিক বিবেচনা করে مُسَرَّجٌ শব্দের অর্থ নেওয়া হয় তাশবীহ বা তুলনা করে। প্রথমটির দিকে লক্ষ্য করলে এর অর্থ হবে সুরাইজির তরবারির ন্যায় সোজা ও সূক্ষ্ম তার নাক। এ ব্যাখ্যা ইবনে দুরাইদ থেকে বর্ণিত। আর سِرَاجٌ-এর দিকে লক্ষ্য করলে এর অর্থ হবে প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল এবং জ্যোতির্ময় তার নাক। এটি ইবনে সীদা-এর ব্যাখ্যা।

মোটকথা, مُسَرَّجٌ শব্দটির ব্যবহার উজ্জ্বলতা, মসৃণ ও সোজা-এর ক্ষেত্রে আরবদের কাছে অপরিচিত ছিল। তাই এ অর্থ প্রদানের জন্য বলতে হয়েছে যে, কবি তার প্রিয়ার নাককে سُرَيْجٌ নামক এক কামারের তরবারির সাথে কিংবা প্রদীপের সাথে তুলনা করেছেন।

قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْتَ لِمَ لَمْ يَجْعَلُوْهُ : এখানে একজন লোকের একটি ব্যাখ্যাকে আপত্তি আকারে তুলে ধরা হয়েছে। তা হচ্ছে আপনি مُسَرَّجٌ শব্দটিকে سَرَّجَ اللّٰهُ وَجْهَهُ থেকে ইসমে মাফউল ধরে নিন। তাহলে তো তাশবীহ বা তুলনা করার প্রয়োজন দেখা দিবে না এবং শব্দটিও গারাবাত থেকে মুক্ত হয়ে যায়। উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, سَرَّجَ اللّٰهُ وَجْهَهُ-এর এ অর্থ (অর্থ- بَهَّجَهُ وَ حَسَّنَهُ) অভিধান গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাই সম্ভবত এটি পরবর্তীকালের লোকেরা سِرَاجٌ থেকে উদ্ভাবন করেছেন এবং مُسَرَّجٌ শব্দটিকে سَرَّجَ-এর ইসমে মাফউল বলে দিয়েছেন। তবে তাদের এ ব্যাখ্যা ইবনে আজ্জাজের কবিতায় প্রযোজ্য হবে না। কেননা, سَرَّجَ-এর এই ব্যাখ্যা ইবনে আজ্জাজের ব্যবহারের পরে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং কবির ব্যবহার আগে হয়েছে। অতএব, পূর্ববর্তী ব্যবহারের উৎস পরবর্তীতে উদ্ভাবিত ব্যবহার হওয়া অসম্ভব। তাই এ ব্যাখা গ্রহণযোগ্য নয়। অথবা আমরা বলব, এটি গারাবাতের প্রথম প্রকারের মধ্যে শামিল, অর্থাৎ مُسَرَّجٌ-এর অর্থ- উজ্জ্বলতা, সোজা ও তীক্ষ্ণ রূপে প্রসিদ্ধ নয় এবং সাধারণের কাছে অজ্ঞাত। এর অর্থ জানতে হলে বড় বড় অভিধানে অনুসন্ধান করতে হবে। পূর্বে আমরা বলেছি যে, শব্দের অর্থ স্পষ্ট নয়; বরং তার অর্থ জানার জন্য অভিধান তালাশ করতে হয় তা গারাবাতের প্রথম প্রকারের শামিল।

সার-সংক্ষেপ :

ক. غرابة শব্দের অর্থ অপরিচিত হওয়া এবং শব্দের ব্যবহার বিরল বা প্রচলিত না হওয়া।

খ. غرابة দু' ধরনের- ১. শব্দের অর্থ অপরিচিত হওয়া। তবে অভিধানগ্রন্থ তালাশ করে এর অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব। যেমন- ২. এমন শব্দ যা অভিধানে পাওয়া যায় না। যেমন- سرج

وَالْمُخَالَفَةُ اَنْ تَكُوْنَ الْكَلِمَةُ عَلٰى خِلَافِ قَانُوْنِ مُفْرَدَاتِ الْاَلْفَاظِ الْمَوْضُوْعَةِ اَعْنِىْ عَلٰى خِلَافِ مَا ثَبَتَ عَنِ الْوَاضِعِ نَحْوُ الْاَجْلَلِ بِفَكِّ الْاِدْغَامِ فِىْ قَوْلِهٖ ع اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْاَجْلَلِ وَالْقِيَاسُ اَلْاَجَلُّ فَنَحْوُ اٰلٌ وَمَاءٌ وَ اَبٰى يَاْبٰى وَعَوِرَ يَعْوَرُ فَصِيْحٌ لِاَنَّهٗ ثَبَتَ عَنِ الْوَاضِعِ كَذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : মুখাফালাত বলা হয় শব্দটি অর্থবোধক একক শব্দাবলির ব্যবহারিক নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া। অর্থাৎ শব্দের واضع বা গঠনকারী থেকে যেরূপ বর্ণিত তার বিপরীত হওয়া। **যেমন–** اَلْاَجْلَلُ শব্দটি ইদগাম ছাড়া ব্যবহৃত হয়েছে কবির কবিতা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْاَجْلَلِ-এ **সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলা জন্য,** যিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ। নিয়ম মোতাবেক শব্দটি হলো اَجَلُّ (দু' লামের মধ্যে ইদগামসহ) আর اٰلٌ - مَاءٌ - اَبٰى يَاْبٰى এবং عَوِرَ يَعْوَرُ জাতীয় শব্দ বিশুদ্ধ বা ফাসাহাতযুক্ত। কেননা, এগুলো واضع বা শব্দগঠনকারী থেকে এভাবেই বর্ণিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَالْمُخَالَفَةُ اَنْ تَكُوْنَ الخ : ফাসাহাতে মুফরাদের ক্ষেত্রে তৃতীয় ত্রুটি হলো মুখালাফাতে কিয়াসে লুগাবী অর্থাৎ মুফরাদ একক শব্দাবলির ব্যবহারিক নিয়মের বিপরীত হওয়া। অর্থাৎ শব্দটি প্রথম যার থেকে বর্ণিত বা প্রথম ব্যবহারকারী থেকে যেভাবে বর্ণিত সে নিয়মে ব্যবহার না করা এবং সরফের নিয়মের ব্যতিক্রম ব্যবহার করা। যেমন– قال (তা'লীলসহ) এবং مد (ইদগামসহ) এ দু'টি শব্দ সরফের নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে এবং واضع থেকে অনুরূপ প্রমাণিতও আছে। আবার ماء ও ال শব্দ দু'টি সরফের নিয়মের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও মুখালাফাত হয়নি। কারণ এর ব্যবহার واضع থেকে এমনই প্রমাণিত। মোটকথা, مُخَالَفَة قِيَاس لُغَوِى এবং مُوَافَقَة قِيَاس لُغَوِى-এর ক্ষেত্রে واضع-এর থেকে প্রমাণ হওয়ার বিষয়টিই আসল। مُخَالَفَة قِيَاس لُغَوِى-এর উদাহরণ اَلْاَجْلَلُ শব্দটি। এটি আবুন নাজম ফযল ইবনে কুদামা ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আমালীর কবিতায় পাওয়া যায়। কবিতার দু'লাইনসহ বক্ষ্যমাণ অংশটি এখানে দেওয়া হলো–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْاَجْلَلِ ٭ اَلْوَاحِدِ الْفَرْدِ الْقَدِيْمِ الْاَوَّلِ

اَنْتَ مَلِيْكُ النَّاسِ رَبًّا فَاقْبَلْ ٭ ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ الْاَفْضَلِ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সুমহান ও শ্রেষ্ঠ। তিনি একক অদ্বিতীয়, অনাদি ও চিরস্থায়ী।

আপনি সব মানুষের প্রভু, অধিকর্তা, অতএব আপনি কবুল করুন আমার দোয়া। অতঃপর দরূদ ও সালাম শ্রেষ্ঠ নবীর উপর।

এ কবিতায় اجلل শব্দটি সরফের নিয়ম বহির্ভূত এবং واضع থেকে এ শব্দের যে ব্যবহার বর্ণিত তারও বিপরীত। এ শব্দের সঠিক ব্যবহার হলো اجل দু' লামের ইদগামসহ, যা واضع থেকে বর্ণিত আছে। তা ছাড়া সরফ বা শব্দ তত্ত্বের নিয়ম হলো, যদি এক জাতীয় দু'টি অক্ষর এক সাথে মিলিত হয় এবং এর কোনো একটি ساكن (সাকিন) হয়, তখন একটিকে অপরটির মধ্যে ইদগাম করা হয়। অতএব, اجلل শব্দটি مُخَالَفَة قِيَاس لُغَوِى হওয়ার কারণে ফাসাহাতবিহীন হয়েছে।

قَوْلُهٗ فَنَحْوُ اٰلٌ وَمَاءٌ وَاَبٰى يَاْبٰى وَعَوِرَ يَعْوَرُ : ইবারতের এ অংশটুকু দ্বারা মুসান্নিফ (র.) এমন কতগুলো উদাহরণ পেশ করেছেন যেগুলো সরফ-এর নিয়মের বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও واضع থেকে এর ব্যবহার এরূপেই থাকার কারণে

ফাসাহাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন- آلٌ-এর মূল হলো أَهْلٌ এবং مَاءٌ -এর আসল হলো مَوْهٌ। শব্দ দু'টিতে هاء-কে همزه দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। هاء-কে همزه দ্বারা পরিবর্তন করা যদিও সরফের নিয়মের বহির্ভূত, কিন্তু واضع থেকে এ পরিবর্তনসহ বর্ণিত, বিধায় শব্দ দু'টি قياس لغوى-এর অনুযায়ী হবে। এমনিভাবে أَبَى يَأْبَى-এর فتح يفتح থেকে হওয়া সরফের নিয়মের খেলাফ। কেননা, সরফের নিয়ম হলো- باب فتح -এর জন্য عين অথবা لام কালিমাতে حروف حلقى-এর কোনো একটি অক্ষর থাকবে। কিন্তু أَبَى يَأْبَى-এর মধ্যে তা পাওয়া যায়নি। যেহেতু أَبَى يَأْبَى-এর باب فتح থেকে হওয়া واضع থেকে বর্ণিত, তাই এটি مُخَالَفَة قِيَاس لُغَوِى-এর মধ্যে পড়বে না এবং এটি ফাসাহাতের অন্তর্ভুক্ত বলেও গণ্য হবে। এমনিভাবে عَوِرَ يَعْوَرُও সরফের নিয়মের বিপরীত। কেননা, সরফের নিয়ম অনুসারে এর ব্যবহার زَالَ يَزَالُ-এর মতো عَارَ يَعَارُ হওয়া উচিত। কেননা, সরফের নিয়ম হলো واو متحرك এবং পূর্বাক্ষরে যবর এমতাবস্থায় উক্ত واو-কে الف দ্বারা পরির্বতন করা উচিত। কিন্তু এখানে তা না করে واو-কে আপন অবস্থায় বহাল রাখা হয়েছে। আর واضع-থেকে যেহেতু এরূপেই বর্ণিত আছে, তাই সরফের নিয়মের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও ফাসাহাতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে; ফাসাহাতের বাইরে যাবে না।

সার-সংক্ষেপ :

ক. مُخَالَفَة قِيَاس لُغَوِى-এর অর্থ কোনো শব্দ সরফ বা শব্দপ্রকরণ শাস্ত্রের নিয়ম এবং শব্দের গঠনকারীর ব্যবহারের বিপরীত হওয়া। যেমন- اجلل

قِيلَ فَصَاحَةُ الْمُفْرَدِ خُلُوصُهُ مِمَّا ذُكِرَ وَمِنَ الْكَرَاهَةِ فِي السَّمْعِ بِاَنْ يَكُوْنَ اللَّفْظُ بِحَيْثُ يَمُجُّهَا السَّمْعُ وَيَتَبَرَّأُ عَنْ سَمَاعِهَا نَحْوُ الْجِرِشَّى فِيْ قَوْلِ اَبِى الطَّيِّبِ شِعْرٌ مُبَارَكُ الْاِسْمِ اَغَرُّ اللَّقَبِ * كَرِيْمُ الْجِرِشَّى اَيِ النَّفْسِ شَرِيْفُ النَّسَبِ وَالْاَغَرُّ مِنَ الْخَيْلِ الْاَبْيَضُ الْجَبْهَةِ ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِكُلِّ وَاضِحٍ مَعْرُوْفٍ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّمْعِ اِنَّمَا هِيَ مِنْ جِهَةِ الْغَرَابَةِ الْمُفَسَّرَةِ بِالْوَحْشَةِ مِثْلُ تَكَاْكَأْتُمْ وَافْرَنْقِعُوْا وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَقِيلَ لِاَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّمْعِ وَعَدَمَهَا يَرْجِعَانِ اِلَى طِيْبِ النَّغَمِ وَعَدَمِ الطِّيْبِ لَا اِلٰى نَفْسِ اللَّفْظِ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِلْقَطْعِ بِاسْتِكْرَاهِ الْجِرِشَّى دُوْنَ النَّفْسِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ النَّغَمِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **কেউ কেউ বলেন যে,** ফাসাহাতে মুফরাদ হলো উল্লিখিত বিষয়সমূহ এবং كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ **থেকে মুক্ত হওয়া।** অর্থাৎ শব্দটি এমন হওয়া যে, কান তা শোনতে বাধা দেয়। (অর্থাৎ শ্রুতিমধুর নয় তাই অনাগ্রহ নিয়ে শোনে) এবং এটি শোনা থেকে নিজেকে সংযত রাখে। **যেমন** আবু তায়্যিবের কবিতায় جِرِشَّى শব্দটি। কবিতা– তিনি মুবারক নামের এবং উজ্জ্বল উপাধির অধিকারী, **তিনি সুন্দর মন এবং অভিজাত বংশের লোক।** اغر শব্দটি ঘোড়ার ক্ষেত্রে শুভ্র কপালের ঘোড়াকে বলা হয়। পরবর্তীতে শব্দটিকে রূপকভাবে আপন মহিমায় উজ্জ্বল বিখ্যাত যে কোনো জিনিসের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। **এ মতের উপর আপত্তি আছে।** কেননা, শ্রুতিকটু হওয়ার বিষয়টি গারাবাত তথা বিরল জাতীয় শব্দ-এর অন্তর্গত। যেমন– تَكَاْكَأْتُمْ (তোমরা একত্রিত হয়েছ) এবং اِفْرَنْقَعُوْا (তোমরা বিচ্ছিন্ন হও) এবং এ ধরনের অন্য শব্দসমূহ। কেউ বলে থাকেন শ্রুতিকটু বা তা না হওয়ার বিষয়টি তো সুরেলা কণ্ঠস্বর বা মন্দ কণ্ঠস্বর হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। এটি শুধু শব্দের সাথে সম্পর্কিত নয়। তবে এ মতেও আপত্তি রয়েছে। কেননা, কণ্ঠস্বরের দিকে দৃষ্টিপাত না করলেও جِرِشَّى শব্দটি নিশ্চিতভাবেই শ্রুতিকটু, কিন্তু نفس শব্দটি তা নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ قِيلَ فَصَاحَةُ الْمُفْرَدِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, কারো কারো মতে كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ (শ্রুতিকটু হওয়া) ফাসাহাতে মুফরাদের জন্য দূষণীয়। তারা বলেন, মুফরাদ তানাফুর, গারাবাত ও মুখালাফাতে কিয়াসে লুগাবী থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ থেকেও মুক্ত হতে হবে। মুসান্নিফ (র.) قيل বলে কাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাদের নির্দিষ্ট কোনো নাম ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তার সমকালীন কোনো আলিমের অভিমত।

كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ-এর ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ (র.) লিখেন اَنْ يَكُوْنَ اللَّفْظُ بِحَيْثُ يَمُجُّهَا السَّمْعُ وَيَتَبَرَّأُ عَنْ سَمَاعِهَا অর্থাৎ শব্দটি এমন হওয়া যে, কান তা শোনতে প্রস্তুত থাকে না।

نَحْوُ الْجِرِشَّى فِيْ قَوْلِ اَبِى الطَّيِّبِ : যেমন– جِرِشَّى শব্দটি কবি আবূ তায়্যিব আহমদ ইবনে হুসাইন মুতানাব্বীর কবিতায় পাওয়া যায়। মুতানাব্বী তৎকালীন শাসক সাইফুদদাওলা ইবনে হামদানের প্রশংসায় কবিতাটি রচনা করেন। جرشى শব্দটির পঙ্ক্তিসহ এখানে তিন লাইন উল্লেখ করা হলো–

اَفِي الرَّأْيِ يُشْبَهُ اَمْ فِي السَّخَاءِ * اَمْ فِي الشَّجَاعَةِ اَمْ فِي الْاَدَبِ

مُبَارَكُ الْاِسْمِ اَغَرُّ اللَّقَبِ * كَرِيْمُ الْجِرِشَّى شَرِيْفُ النَّسَبِ

اِذَا حَازَ مَالًا فَقَدْ حَازَهُ * فَتًى لَا يُسَرُّ بِمَا لَا يَهَبُ

অর্থাৎ কিসে তার তুলনা চিন্তা-চেতনা, নাকি দানশীলতায়?
বীরত্বে নাকি সাহিত্যে? (সবকিছুতেই তিনি অতুলনীয়)
তিনি মুবারক নাম ও উজ্জ্বল উপাধিতে ভাস্বর। তিনি মহৎ হৃদয় ও অভিজাত বংশের অধিকারী।
যখন সে সম্পদ সঞ্চয় করে তখন সেগুলোকে উত্তমরূপে সংরক্ষণ করে, সে এমন যুবক যে, দান না করলে প্রফুল্লিত হয় না।

কবিতার ব্যাখ্যা : তার নাম মুবারক বলার কারণ হচ্ছে, তার নাম চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.)-এর নামের সাথে মিলে গেছে। তার উপাধি উজ্জ্বল বা প্রসিদ্ধ। কেননা, তার উপাধি ছিল সাইফুদ দাওলা, যা হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ (রা.)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা ছাড়া বাস্তবিকেই এই উপাধিতে সে তৎকালে খ্যাতি লাভ করেছিল। তার বংশ শরীফ বা অভিজাত। কারণ, সে ছিল আব্বাসী বংশের অধঃস্তন পুরুষ। أَغَرُّ اللَّقَبِ-এর أَغَرُّ-এর ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ (র.) বলেন, اَلْأَغَرُّ مِنَ الْخَيْلِ الْأَبْيَضُ الْجَبْهَةِ অর্থাৎ অশ্বের ক্ষেত্রে أَغَرُّ শব্দটি ব্যবহার হলে তার অর্থ হবে শুভ্র কপালের অশ্ব। উল্লেখ থাকে যে, أَغَرُّ শব্দের দু'টি অর্থ পাওয়া যায়, ১. যে কোনো সাদা রঙকে أَغَرُّ বলা হয়, ২. ঘোড়ার সাদা কপালকে أَغَرُّ বলা হয় এ অর্থে শব্দটি প্রসিদ্ধ। অবশ্য মুসান্নিফ প্রথম অর্থটি গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি اَلْأَغَرُّ مِنَ الْخَيْلِ الْأَبْيَضُ الْجَبْهَةِ বলেছেন। তিনি বলেন, أَغَرُّ শব্দটি উজ্জ্বল বা পরিচিত এর অর্থে إِسْتِعَارَة বা مُجَازٌ مُرْسَلٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

মোটকথা, যারা كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ-কে ফাসাহাতের সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়ার শর্ত করতে চান তারাই كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ-এর উদাহরণ দেন اَلْجِرِشَّى শব্দটি দ্বারা যে, এটি শ্রুতিকটু । তাই এটি ফাসাহাতবিহীন শব্দ। কিন্তু মুসান্নিফ (র.)-এর বক্তব্য হলো كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ-কে এর আলাদা শর্ত করে বাদ দেওয়ার দরকার নেই; বরং যারা আলাদা করে বাদ দিতে চান তাদের ব্যাপারে আমাদের আপত্তি আছে। কারণ, كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ তো গারাবাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, গারাবাতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে وَحْشِيٌّ বা বিরল হওয়া। বিরল বা অপরিচিত হলে শব্দটি শুনতে ভালো লাগে না। যেমন আমরা দেখি একটি কঠিন উচ্চারণের শব্দও পরিচিত হয়ে গেলে আর কঠিন মনে হয় না, সহজ হয়ে যায়।

আমরা ইতঃপূর্বে গারাবাত থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত করেছি। যার দ্বারা كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ থেকে মুক্ত হওয়ার কথা চলে এসেছে। কারণ, غَرَابَة ও كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ-এর মধ্যে سبب و مسبب-এর সম্পর্ক। غرابة হলো سبب আর كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ হলো مسبب। অর্থাৎ গারাবাতের কারণেই كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ হয়। অতএব, سبب যদি অন্তর্নিহিত হয়, তবে مسبب ও অন্তর্নিহিত হবে। যেমন- تَكَأْكَأْتُمْ، اِفْرَنْقَعُوْا বা এ জাতীয় শব্দ।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّمْعِ وَعَدَمِهَا : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) সেসব লোকের মতামত তুলে ধরেছেন যারা তার মতো كراهة فى السمع-কে আলাদা করে ফাসাহাত থেকে বের করার পক্ষপাতী নন। তবে তারা كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ-কে বাদ দেওয়ার কারণ কি হবে এ নিয়ে মুসান্নিফ (র.)-এর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তারা বলেন, كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। কারণ, كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ বা শ্রুতিকটু হওয়া বা না হওয়ার সম্পর্ক তো কণ্ঠস্বর ভালো ও মন্দ হওয়ার সাথে। এ শ্রুতিকটু হওয়ার বিষয়টি মূল শব্দের সাথে সম্পর্কিত নয়।

قَوْلُهُ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِلْقَطْعِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) উপরোক্ত দলের মতকে খণ্ডন করে বলেছেন, আপনাদের এ মতটি সঠিক নয়। কারণ, আপনাদের কথা দ্বারা বুঝা যায় كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ-এর সম্পর্ক কণ্ঠস্বর ভালো বা মন্দের সাথে। তাহলে কি جَرِشَّى শব্দটি যেমন কণ্ঠ দ্বারাই পড়া হোক না কেন তা ফাসাহাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এর বিপরীতে اَلنَّفْسُ শব্দটি সুরেলা বা হেড়ে গলা যেভাবেই উচ্চারণ করা হোক না কেন তা ফাসাহাতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অতএব, كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ-কে বাদ দেওয়ার সঠিক কারণ সেটাই যা আমি বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ কোনো শব্দ শ্রুতিকটু হয় গারাবাতের কারণে। গারাবাত থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত আলাদা করে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

সার-সংক্ষেপ :

কারো কারো মতে مُخَالَفَةُ قِيَاسٍ ও غَرَابَة ,تَنَافُر এ তিনটি দোষ ছাড়াও শ্রুতিকটু হওয়া থেকে মুক্ত হওয়া ফাসাহাতের জন্য শর্ত। কিন্তু লেখক মনে করেন, শ্রুতিকটুতা তানাফুরের মাঝে নিহিত। সুতরাং শব্দ তানাফুরবিহীন হলে শ্রুতিকটুতা থেকেও মুক্ত হবে।

وَالْفَصَاحَةُ فِى الْكَلَامِ خُلُوْصُهُ مِنْ ضُعْفِ التَّالِيْفِ وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ وَالتَّعْقِيْدِ مَعَ فَصَاحَتِهَا هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ فِىْ خُلُوْصِهٖ وَاحْتَرَزَ بِهٖ عَنْ مِثْلِ زَيْدٌ اَجْلَلُ وَشَعْرُهٗ مُسْتَشْزِرٌ وَاَنْفُهٗ مُسَرَّجٌ وَقِيْلَ هُوَ حَالٌ مِنَ الْكَلِمَاتِ وَلَوْ ذَكَرَهٗ بِجَنْبِهَا لَسَلِمَ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْحَالِ وَ ذِيْهَا بِالْاَجْنَبِيِّ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّهٗ حِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ قَيْدًا لِلتَّنَافُرِ لَا لِلْخُلُوْصِ وَيَلْزَمُ اَنْ يَكُوْنَ الْكَلَامُ الْمُشْتَمِلُ عَلٰى تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ الْغَيْرِ الْفَصِيْحَةِ فَصِيْحًا لِاَنَّهٗ يَصْدُقُ عَلَيْهِ اَنَّهٗ خَالِصٌ عَنْ تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ حَالَ كَوْنِهَا فَصِيْحَةً فَافْهَمْ ـ

অনুবাদ : **ফাসাহাতে কালাম** (এর সংজ্ঞা, ফাসাহাতে কালাম বলা হয়) **শব্দটি** تَنَافُرُ ,ضُعْف تَالِيْف الْكَلِمَاتِ **এবং** تعقيد **থেকে মুক্ত হওয়া। এমতাবস্থায় যে, উক্ত কালামের সবগুলো শব্দ ফাসাহাতসমৃদ্ধ হবে।** (مَعَ فَصَاحَتِهَا) টা خُلُوْصُهٗ-এর ضمير থেকে حال হয়েছে। এ শব্দটি দ্বারা زَيْدٌ اَجْلَلُ، شَعْرُهٗ مُسْتَشْزِرٌ এবং اَنْفُهٗ مُسَرَّجٌ জাতীয় বাক্যসমূহকে বের করা হয়েছে। (এ বাক্যগুলোর সব শব্দ ফসীহ নয়) কেউ কেউ বলেন, (مَعَ فَصَاحَتِهَا) এটি كلمات থেকে حال হয়েছে। তারা বলেন, যদি লেখক এটিকে (كلمات)-এর পাশে উল্লেখ করতেন, তাহলে حال এবং ذوالحال-এর মধ্যে সম্পর্কহীন শব্দের দ্বারা দূরত্ব সৃষ্টি হতো না। এতে আপত্তি আছে। কেননা, তখন مَعَ فَصَاحَتِهَا টা تنافر -এর قيد হবে, خُلُوْصُهٗ -এর قيد হবে না। আর এতে করে তানাফুরযুক্ত ফাসাহাতবিহীন কালিমাসমৃদ্ধ বাক্য ফসীহ হওয়া নিশ্চিত হতো। কেননা, এ জাতীয় বাক্যের উপর সংজ্ঞাটি প্রয়োগ হয় অর্থাৎ কালাম তানাফুরে কালিমা থেকে মুক্ত এমতাবস্থায় যে, এর কালিমাগুলো ফাসাহাতযুক্ত। অতএব, তুমি ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা কর।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَالْفَصَاحَةُ فِى الْكَلَامِ الخ : ফাসাহাতে মুফরাদের আলোচনা শেষ হওয়ার পর এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ফাসাহাতে কালামের আলোচনা শুরু করেছেন। ফাসাহাতে কালামের সংজ্ঞা–

خُلُوْصُ الْكَلَامِ مِنْ ضُعْفِ التَّالِيْفِ وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ وَالتَّعْقِيْدِ مَعَ فَصَاحَتِهَا

অর্থাৎ ফাসাহাতে কালাম বলা হয় এমন বাক্যকে, যা ضُعْفُ التَّالِيْفِ (ব্যাকরণগত ত্রুটি), تنافر الكلمات (উচ্চারণগত ত্রুটি) এবং تعقيد (দুর্বোধ্যতা) থেকে মুক্ত হয় এবং বাক্যের অন্তর্গত সবগুলো শব্দ ফসীহ বা বিশুদ্ধ থাকে। উল্লেখ থাকে যে, ضُعْفُ التَّالِيْفِ থেকে তখনই মুক্ত হবে যখন বাক্যটি সম্পূর্ণভাবে সর্বসম্মত নাহু বা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ব্যবহার হবে। আর تعقيد থেকে তখনই মুক্ত হবে যখন বাক্যটির অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা থাকবে না। চাই সেটা শাব্দিকভাবে হোক অথবা ভিন্ন মাত্রিক হোক। আর تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে একাধিক শব্দের মিলনে কোনো ধরনের উচ্চারণগত জড়তা বা সমস্যা সৃষ্টি না হওয়া।

قَوْلُهٗ مَعَ فَصَاحَتِهَا : বাক্যের এ অংশটি حال হয়েছে। এ অভিমত সকলেরই। কিন্তু এর ذو الحال কি হবে তা নিয়ে মুসান্নিফ (র.) ও কতিপয় আলিমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। মুসান্নিফের ভাষ্য হলো هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ فِىْ خُلُوْصِهٖ অর্থাৎ এটি خُلُوْصُهٗ-এর ضمير থেকে حال হয়েছে। অর্থাৎ خُلُوْصُهٗ-এর "ہ" যমীর হলো ذو الحال এভাবে তারকীব করা হলে বাক্যটি অর্থগতভাবে এরূপ হবে–

اَلْفَصَاحَةُ فِى الْكَلَامِ اِنْتِفَاءُ ضُعْفِ التَّالِيْفِ وَتَنَافُرِ كَلِمَاتِهٖ وَتَعْقِيْدِهٖ حَالَ كَوْنِ فَصَاحَةِ كَلِمَاتِهٖ تَقَارَنَ ذٰلِكَ الْاِنْتِفَاءَ ـ

অর্থাৎ ফাসাহাতে কালাম হলো কালামের মধ্যে ضُعْفُ التَّالِيْفِ، تَنَافُرِكَلِمَات، تَعْقِيْد না হওয়া এবং সেই কালামের প্রত্যেকটি কালিমা ফাসাহাত সমৃদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ প্রথমে এ তিনটি জিনিস থেকে মুক্ত হবে। সেই সাথে এর প্রত্যেকটি শব্দ ফাসাহাতযুক্ত হতে হবে। অতএব, যে সকল বাক্যের সবগুলো শব্দ ফাসাহাতযুক্ত না হবে, সেগুলো ফাসাহাতে কালামের আওতায় আসবে না। যেমন– زَيْدٌ اَجْلَلُ এ বাক্যের اَجْلَلُ শব্দটি মুখালাফাতের দোষে দুষ্ট, তাই ফাসাহাতে কালামের অন্তর্ভুক্ত হবে না। شَعْرُهٗ مُسْتَشْزِرٌ এ বাক্যে مُسْتَشْزِرٌ শব্দটি তানাফুরের দোষে দুষ্ট, এ কারণে এটিও ফাসাহাতে কালামের সংজ্ঞার মধ্যে আসবে না। এমনিভাবে اَنْفُهٗ مُسَرَّجٌ এ বাক্যের مُسَرَّجٌ শব্দটি গারাবাতের দোষে দুষ্ট, তাই এ বাক্যটি ও ফাসাহাতে কালামের আওতায় পড়বে না।

قَوْلُهٗ وَقِيْلَ هُوَ حَالٌ مِنَ الْكَلِمَاتِ : এখান থেকে مَعَ فَصَاحَتِهَا-এর তারকীবের ব্যাপারে একটি ভিন্নমত তুলে ধরা হয়েছে। যারা ভিন্নমত পোষণ করেন, তাদের মতে مَعَ فَصَاحَتِهَا হাল হয়েছে كلمات থেকে। তারা এও বলেন, كلمات (ذو الحال) এবং مَعَ فَصَاحَتِهَا (حال)-এর মাঝে التعقيد শব্দটি দ্বারা দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে, যা উচিত নয়। তাই যদি লেখক حال-কে ذو الحال তথা كلمات-এর পাশে উল্লেখ করতেন এভাবে যে, تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ مَعَ فَصَاحَتِهَا وَالتَّعْقِيْد তাহলে حال এবং ذو الحال-এর মাঝে اجنبى (تعقيد) দ্বারা পার্থক্য সৃষ্টি হতো না।

قَوْلُهٗ وَفِيْهِ نَظَرٌ : এখানে থেকে মুসান্নিফ (র.) তার সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের বক্তব্যের জবাব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, যদি فَصَاحَتِهَا-কে كلمات থেকে حال বলা হয়, তবে লেখকের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে যায়। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো– আমরা জানি, حال তার ذو الحال-এর আমেলের জন্য قيد হয়। আরেকটি কায়দা হলো– قيد যুক্ত কোনো শব্দের উপর যদি نفى আসে, তখন সেই نفى আসে قيد-এর উপর, مقيد বা قيد যুক্ত শব্দটির উপর নয়। যেমন- কেউ বলল جَاءَنِىْ زَيْدٌ رَاكِبًا অর্থ– যায়েদ আমার নিকট আরোহী হয়ে এসেছে। এখানে راكبا (حال) তার ذو الحال-এর عامل-جاء-এর জন্য قيد। এমতাবস্থায় যদি এর উপর نفى আসে যেমন– مَا جَاءَنِىْ زَيْدٌ رَاكِبًا তাহলে قيد নফী হবে. مقيد বা مجىء নফী হবে না। সুতরাং যাদের মতে فَصَاحَتِهَا শব্দটি كلمات থেকে حال হয়েছে, সে মতে مَعَ فَصَاحَتِهَا তার ذو الحال (كلمات)-এর আমেল تنافر-এর জন্য قيد হবে। আর خُلُوْصُهٗ শব্দটি যা মূলত না-বাচকের অর্থ প্রদান করে, تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ-এর উপর প্রবেশ করে قيد-কে নফী করবে, مقيد-কে নফী করবে না। অতএব, مَعَ خُلُوْصُهٗ দ্বারা فَصَاحَتِهَا-এর নফী হবে, مقيد তথা تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ-এর নফী হবে না। তখন বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে, যদি تَنَافُرُالْكَلِمَاتِ থাকে এবং শব্দসমূহ ফসীহ না হয়, তবে কালামটি ফসীহ হবে। অর্থাৎ কোনো বাক্যে শব্দসমূহ তানাফুরযুক্ত এবং ফাসাহাত ছাড়া হলে তা কালামে ফসীহ। কেননা, এ কথাটির উপরই তাদের সংজ্ঞা প্রয়োগ হয় যে, কালাম বা বাক্য تَنَافُر كَلِمَات থেকে ঐ অবস্থায় মুক্ত হবে যখন এর শব্দসমূহ ফসীহ বা বিশুদ্ধ হয়। অর্থাৎ কালিমা যদি ফসীহ হয় তাহলে তানাফুর থেকে মুক্ত হওয়া দরকার, আর যদি ফসীহ না হয় তাহলে তানাফুর থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি নয়। অতএব, কোনো কালাম বা বাক্য যদি তানাফুরে কালিমাত থেকে মুক্ত হয় এবং শব্দগুলো ফাসাহাত ছাড়া হয় তবে সে কালাম ফসীহ বা বিশুদ্ধ হবে। আর এ ব্যাখ্যা লেখকের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। কেননা, তার মতে কালাম তখনই বিশুদ্ধ হবে, যখন এর শব্দসমূহ বিশুদ্ধ হবে এবং তানাফুরে কালিমাত থেকে মুক্ত হবে; অন্যথায় নয়। فَافْهَمْ অর্থ– ভালোভাবে বুঝে নাও। মুসান্নিফ (র.) এ জাতীয় শব্দ সে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন , যেখানে বিষয়বস্তু জটিল হয়।

বি. দ্র. এখানে কারো দৃষ্টিতে মুসান্নিফের তারকীবের ব্যাপারে আপত্তি আসতে পারে যে, حال (مَعَ فَصَاحَتِهَا) এবং ذو الحال (خُلُوْصُهٗ-এর যমীর)-এর মধ্যে অনেক দূরত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ حال ও ذوالحال-এর মাঝে দূরত্ব থাকা সমীচীন নয়। জবাব হলো– حال এবং ذو الحال-এর মাঝে যদি اجنبى কোনো প্রতিবন্ধক আসে তাহলে সেটা দূষণীয়; কিন্তু এখানে তা হয়নি। কারণ, এখানে প্রতিবন্ধক হিসেবে যেসব শব্দাবলি এসেছে যথা , ضُعْفُ التَّالِيْفِ، تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ، اَلتَّعْقِيْدُ প্রত্যেকটিই ذو الحال-এর আমেলের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ خُلُوْصُهٗ-এর মা'মূল, অতএব প্রতিবন্ধকগুলো جنبى না হওয়াতে তারকীবের মধ্যে কোনো ত্রুটি রইল না।

সার-সংক্ষেপ : ফাসাহাতে কালাম বলা হয়– বাক্যের প্রতিটি শব্দ ফসীহ হওয়ার সাথে সাথে ضُعْفُ التَّالِيْفِ. تَعْقِيْد ও تَنَافُر كَلِمَات (এ তিনটি দোষ) থেকে মুক্ত হওয়া।

فَالضُّعْفُ اَنْ يَكُوْنَ تَالِيْفُ الْكَلَامِ عَلٰى خِلَافِ الْقَانُوْنِ النَّحْوِيْ اَلْمَشْهُوْرِ بَيْنَ الْجُمْهُوْرِ كَالْاِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَحُكْمًا نَحْوُ ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا وَ التَّنَافُرُ اَنْ تَكُوْنَ الْكَلِمَاتُ ثَقِيْلَةً عَلَى اللِّسَانِ وَاِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا فَصِيْحَةً نَحْوُ ع وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ وَهُوَ اِسْمُ رَجُلٍ قَبْرٌ وَصَدْرُ الْبَيْتِ وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ اَىْ خَالٍ عَنِ الْمَاءِ وَالْكَلَاِ ذَكَرَ فِىْ عَجَائِبِ الْمَخْلُوْقَاتِ اَنَّ مِنَ الْجِنِّ نَوْعًا يُقَالُ لَهُ الْهَاتِفُ فَصَاحَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلٰى حَرْبِ بْنِ اُمَيَّةَ فَمَاتَ فَقَالَ ذٰلِكَ الْجِنِّىُّ هٰذَا الْبَيْتَ وَقَوْلُهُ شِعْرٌ كَرِيْمٌ مَتٰى اَمْدَحْهُ اَمْدَحْهُ وَالْوَرٰى * مَعِىْ وَاِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِىْ فَالْوَاوُ فِىْ وَالْوَرٰى لِلْحَالِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَعِىْ ـ

অনুবাদ : আর الضعف হলো বাক্যের তারকীব নাহু বা ব্যাকরণবিদগণের প্রসিদ্ধ নিয়মের বিপরীত হওয়া। যেমন– নাম বা বিষয়ের আগে সর্বনাম ব্যবহার করা শাব্দিকভাবে, অর্থগতভাবে, হুকুমের দিক থেকে। **যেমন–** ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا অর্থ– **যায়েদের দাস যায়েদকে প্রহার করেছে। আর তানাফুর হলো** (বাক্যের অন্তর্ভুক্ত) শব্দগুলোর উচ্চারণ কঠিন হওয়া। যদিও প্রত্যেকটি শব্দ ফসীহ। যেমন কবিতা– وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ অর্থ– হারবের কবরের নিকট কোনো কবর নেই। حرب এক ব্যক্তির নাম। এ পঙক্তিটির প্রথম অংশ হলো قَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ হারবের কবর বিরান ভূমিতে অর্থাৎ ঘাস পানিশূন্য খালি জায়গায়। মুসান্নিফ (র.) عجائب المخلوقات নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, জিনদের মাঝে এমন সম্প্রদায় আছে যাদেরকে হাতিফ বলা হয়। সে সম্প্রদায়ের একটি লোক হারব ইবনে উমাইয়ার নিকট এক বিকট চিৎকার দিল। ফলে সে মারা গেল। তখন সেই জিনটিই উপরিউক্ত পঙক্তিটি আবৃত্তি করেছিল এবং কবির উক্তি : كَرِيْمٌ مَتٰى اَمْدَحْهُ اَمْدَحْهُ وَالْوَرٰى * مَعِىْ وَاِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِىْ

অর্থ– সে সম্মানিত, যখন আমি তাঁর প্রশংসা করি, প্রশংসা করি এমতাবস্থায় যে, জগদ্বাসী আমার সাথে থাকে। আর আমি যখন তাঁর নিন্দা করি, তখন আমি একাই তাঁর নিন্দা করি, (আর কেউ তার নিন্দা করে না।) والورى-এর শুরুতে যে, واو আছে তা حال-এর জন্য, এটি (الورى) হলো مبتدأ আর معى হলো এর খবর।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ فَالضُّعْفُ اَنْ يَكُوْنَ الخ : যে সকল ত্রুটি কালামকে ফাসাহাতবিহীন করে দেয় সেগুলো তিনটি– ১. ضُعْفُ التَّالِيْفِ ২. تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ ৩. اَلتَّعْقِيْدُ এগুলোর মধ্যে ضُعْفُ التَّالِيْفِ হলো প্রথম ত্রুটি। ضُعْفُ التَّالِيْفِ বলা হয় কালামের বা বাক্যের নাহু বা আরবি ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ নিয়মের বিপরীত হওয়া। যেমন– اَلْاِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ কোনো বস্তুর নাম উল্লেখ করার আগে তার সর্বনাম ব্যবহার করা। আর তা لفظا (শব্দগতভাবে), معنى (অর্থগতভাবে) এবং حكما (বিধানগত ভাবে) হবে। অতএব, যদি শুধু শাব্দিক ভাবে অথবা শুধু অর্থগতভাবে কিংবা শুধু বিধানগত ভাবে সর্বনাম অগ্রে আনা হয়, তাহলে বৈধ হবে এবং তখন ضُعْفُ التَّالِيْفِ হবে না। উল্লেখ থাকে যে, جمهور-এর অর্থ– সংখ্যাগরিষ্ঠ, সর্বসম্মত নয়। কারণ, উল্লিখিত নিয়মটি সকলের মতে সর্বসম্মত মতের বিপরীত হলে তো অবশ্যই ضُعْفُ التَّالِيْفِ হবে। যেমন– اِنَّمَا قَائِمٌ زَيْدٌ। এ বাক্যে قائم খবরকে مسند اليه (زيد)-এর পরে আনা সকলের মতে ওয়াজিব।

تَقْدِيمْ لَفْظِى : এর অর্থ হলো– শব্দগতভাবে এবং মর্যাদাগতভাবে বিষয়টি বা নাম আগে আসে। যেমন–
(ক) ضَرَبَ زَيْدًا غُلَامُهُ (খ) ضُرِبَ زَيْدٌ غُلَامُهُ।

تَقْدِيمْ مَعْنَوِى : এর অর্থ হলো শব্দগতভাবে বিষয় বা নাম আগে আসে না বটে; তবে অর্থের দিক থেকে সর্বনামের আগে বিষয়টি আসে। যেমন, কুরআনের আয়াত– اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى এখানে هو-এর مرجع বা বিষয় হলো عدل যা পৃথকভাবে আগে আসেনি; কিন্তু اعدلوا-এর মাঝে عدل অর্থগতভাবে আগে উল্লিখিত হয়েছে।

تَقْدِيمْ حُكْمِى : এর অর্থ হলো– শাব্দিকভাবে مرجعবা বিষয়টি সর্বনামের পরে আসে এবং এখানে مرجع-কে আগে আনার কোনো বিধান নেই। তবে মূল নিয়ম (অর্থাৎ সর্বনামের আগে সর্বদা নাম বা বিষয় আসে) রয়েছে। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে। যেমন– نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ এখানে نعم-এর মধ্যে একটি সর্বনাম আছে, যার مرجع (رجلا)-এর পূর্বে এসেছে নাহুর নিয়মেই। আরেকটি উদাহরণ হলো– قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ-এর মধ্যে هو হলো ضمير شان-এর مرجع হলো الله (যা পরে এসেছে)। এ জাতীয় সর্বনামের নামকে হুকুম বা বিধান মতে مقدم বলা হয়ে থাকে। ضُعْفُ التَّالِيْفِ পাওয়া গেছে এর উদাহরণ ضُرِبَ غُلَامُهُ زَيْدٌ। এ উদাহরণে সর্বনাম 'ه' তার নাম زيد-এর আগে এসেছে। শাব্দিকভাবে (ও মর্যাদাগতভাবে), অর্থগতভাবে এবং حُكْمِى বা বিধানগতভাবে (কারণ মাফঊল পরে আসা-ই নিয়ম)।

قَوْلُهُ اَلتَّنَافُرُ اَنْ تَكُوْنَ الْكَلِمَاتُ ثَقِيْلَةً : তানাফুরে কালিমাত-এর অর্থ হলো– কয়েকটি শব্দ এমনভাবে পরস্পর মিলে আসা যার দ্বারা উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায় এবং উচ্চারণের মধ্যে সাবলীলতা নষ্ট হয়ে যায়।

যদিও প্রত্যেকটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে ফাসাহাতযুক্ত। যেমন– এই কবিতায় হয়েছে– قَبْرُحَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ * وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ – কবিতাটির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লেখক তার রচিত গ্রন্থ আজায়েবুল মাখলুকাত-এ লিখেছেন যে, জিন জাতির একটি শ্রেণীর নাম 'হাতিফ'। তাদের মধ্য হতে এক জিন হারব ইবনে উমাইয়ার নিকট এক বিকট চিৎকার করে, যার ফলে হারব মৃত্যুবরণ করে। এই চিৎকার দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথিত আছে যে, হরব সাপের ছদ্মবেশী একটি জিনকে পদদলিত করে হত্যা করে। এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আরেকটি জিন তার সামনে বিকটস্বরে চিৎকার করলে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু যে স্থানে তার মৃত্যু হয় সেখানে কোনো আবাদী বা কবরস্থান ছিল না। সে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে সেই জিন এক কবিতার এ পঙ্ক্তিটি আবৃতি করে। কবিতার দ্বিতীয় লাইনের قبر , حرب, قرب ও قبر পৃথকভাবে প্রত্যেকটি ফসীহ বা বিশুদ্ধ শব্দ। কিন্তু একসাথে এভাবে একত্রিত হওয়ার কারণে কবিতার উচ্চারণ কঠিন হয়ে গেছে। যেমন – আমরা বাংলায় বলে থাকি 'পাখি পাকা পেপে খায়'।

قَوْلُهُ شِعْرُ كَرِيْمٌ مَتٰى اَمْدَحْهُ اَمْدَحْهُ وَالْوَرٰى : এটি তানাফুরে কালিমাতের দ্বিতীয় উদাহরণ। কবিতার ভাবার্থ– সে সম্মানিত ও মহৎ ব্যক্তি। যখন আমি তার প্রশংসা করি জগদ্বাসী সকলেই আমার সাথে প্রশংসা করে। অর্থাৎ বিশ্ববাসী সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর যখন তার নিন্দা করি তখন আমার কোনো সাথী থাকে না। তিনি এত গুণের আধার যে, তার নিন্দায় কোনো লোক পাওয়া যায় না। এ কবিতার প্রত্যেকটি শব্দ পৃথকভাবে ফসীহ বা শুদ্ধতা সাবলীলতার মানোত্তীর্ণ। কিন্তু সবগুলো শব্দের মিলনে এটি মাধুর্যতা হারিয়েছে এবং এর উচ্চারণ কঠিন হয়ে গেছে।

সার-সংক্ষেপ :

تَنَافُرُ كَلِمَات বলা হয় বাক্যের প্রতিটি শব্দ আলাদাভাবে বিশুদ্ধ, ত্রুটিমুক্ত ও শ্রুতিমধুর হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর একত্রে উচ্চারণ কঠিন হয়েছে। যেমন– قَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ * وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ

উল্লেখ্য যে, এ কবিতার প্রতিটি শব্দ শুদ্ধ-সাবলীল তথা তানাফুরমুক্ত। কিন্তু শব্দগুলোর এভাবে একত্রিত হওয়াটা একে মুতানাফির করে দিয়েছে।

وَاِنَّمَا مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ لِاَنَّ الْاَوَّلَ مُتَنَاهٍ فِى الثِّقْلِ وَالثَّانِىْ دُوْنَهُ لِاَنَّ مَنْشَأَ الثِّقْلِ فِى الْاَوَّلِ نَفْسُ اِجْتِمَاعِ الْكَلِمَاتِ وَفِى الثَّانِىْ اِجْتِمَاعُ حُرُوْفٍ مِنْهَا وَهُوَ فِىْ تَكْرِيْرِ اَمْدَحُهُ دُوْنَ مُجَرَّدِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَاءِ وَالْهَاءِ لِوُقُوْعِهِ فِى التَّنْزِيْلِ مِثْلَ فَسَبِّحْهُ فَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِاَنَّ مِثْلَ هٰذَا الثِّقْلِ مُخِلٌّ بِالْفَصَاحَةِ ذَكَرَ الصَّاحِبُ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبَّادٍ اَنَّهُ اَنْشَدَ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةَ بِحَضْرَةِ الْاُسْتَاذِ اِبْنِ الْعَمِيْدِ فَلَمَّا بَلَغَ هٰذَا الْبَيْتَ قَالَ لَهُ الْاُسْتَاذُ هَلْ تَعْرِفُ فِيْهِ شَيْئًا مِنَ الْهُجْنَةِ قَالَ نَعَمْ مُقَابَلَةُ الْمَدْحِ بِاللَّوْمِ وَاِنَّمَا يُقَابَلُ بِالذَّمِّ اَوِ الْهِجَاءِ فَقَالَ الْاُسْتَاذُ غَيْرَ هٰذَا اُرِيْدُ فَقَالَ الصَّاحِبُ لَا اَدْرِىْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَقَالَ الْاُسْتَاذُ هٰذَا التَّكْرِيْرُ فِىْ اَمْدَحُهُ اَمْدَحُهُ مَعَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَاءِ وَالْهَاءِ وَهُمَا مِنْ حُرُوْفِ الْحَلْقِ خَارِجٌ عَنْ حَدِّ الْاِعْتِدَالِ نَافِرٌ كُلَّ التَّنَافُرِ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ الصَّاحِبُ ـ

অনুবাদ : তিনি (মূল লেখক) দু'টি উদাহরণ পেশ করেছেন। কারণ, প্রথম উদাহরণ চরম কঠিন, আর দ্বিতীয় উদাহরণ (প্রথমটির চেয়ে) কম কঠিন। কেননা, প্রথমটির মধ্যে কাঠিন্যের উৎস হলো কয়েকটি কালিমার মিলন, আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অনেকগুলো হরফ একত্র হওয়া। আর এটি হয়েছে اَمْدَحُهُ দু'বার আনার কারণে, শুধুমাত্র حاء এবং هاء-এর মিলনের কারণে নয়। কেননা এ ধরনের ব্যবহার পবিত্র কুরআনে হয়েছে। যেমন- سَبِّحْهُ। সুতরাং একথা বলা সঠিক হবে না যে, এতটুকু কাঠিন্য ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর।

জনাব ইসমাঈল ইবনে আব্বাদ বলেন, তিনি এ কবিতাটি উস্তাদ ইবনুল 'আমীদের সামনে আবৃত্তি করেন। যখন এ পঙ্ক্তি পর্যন্ত পৌঁছলেন, উস্তাদ তাকে বললেন, তুমি কি এতে কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ! এতে مدح শব্দের বিপরীতে لوم শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ مدح-এর বিপরীতে هجاء و ذم ব্যবহার হয়ে থাকে। তখন উস্তাদ বললেন, আমার উদ্দেশ্য এটি নয়, তখন সাহিব ইবনে আব্বাদ বললেন, আমার তো এটি ছাড়া আর কিছু জানা নেই। উস্তাদ বললেন, حاء এবং هاء-এর মিলন এবং সেই সাথে اَمْدَحُهُ-কে দু'বার ব্যবহার করা। উল্লেখ্য যে, এ দু'টি অক্ষরের মাখারাজ কণ্ঠনালী। এসব মিলিয়ে বাক্যটির উচ্চারণ স্বাভাবিক ভারসাম্যতার বাইরে চলে গেছে। ফলে এটি সম্পূর্ণভাবে তানাফুরযুক্ত হয়েছে। অতঃপর সাহিব ইবনে আব্বাদ (তার এ ব্যাখ্যা শুনে) তার প্রশংসা করলেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, মূল লেখক তানাফুরের দু'টি উদাহরণ দিলেন কেন? তিনি ইতঃপূর্বে ضُعْفُ تَالِيْف-এর মধ্যে তো তা করেননি? এর জবাব দিতে গিয়ে ব্যাখ্যাকার বলেছেন, তানাফুর দু' ধরনের- ১. চূড়ান্তভাবে কঠিন, ২. সাধারণ পর্যায়ের কঠিন- যা প্রথম প্রকারের চেয়ে কম কঠিন হয়ে থাকে। তাই তানাফুরের প্রথম প্রকারকে সুস্পষ্ট করার জন্য প্রথম উদাহারণ তথা لَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ টি পেশ করেছেন। এ কবিতায় قبر و قرب ইত্যাদি একত্রে আসার কারণে উচ্চারণ তার সাবলীলতা হারিয়েছে এবং এর

উচ্চারণ চরম কঠিন হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কবিতা তথা كَرِيْمٌ مَتَى اَمْدَحْهُ اَمْدَحْهُ وَالْوَرٰى-এর মধ্যে اَمْدَحْهُ-এর দু'বার ব্যবহার সেই সাথে حاء এবং هاء একত্রে দু'বার এসেছে। শুধু هاء এবং حاء-এর মিলন এমন সমস্যা সৃষ্টি করে না, যা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর। তবে এখানে ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর হয়েছে দু'টি বিষয় মিলে, যথা حاء এবং هاء-এর মিলন এবং اَمْدَحْهُ-এর তাকরার। তবে এটি প্রথম উদাহরণের তুলনায় কম কঠিন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, শুধুমাত্র حاء এবং هاء-এর মিলন যদিও সামান্য জড়তা সৃষ্টি করে তবু তা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর নয়। কেননা, কুরআনুল কারীমে এ ধরনের মিলন দেখা যায়। যেমন- فَسَبِّحْهُ আর এ কথা সর্বসম্মত যে, পবিত্র কুরআনে কোনো ফাসাহাতবিহীন শব্দ নেই।

قَوْلُهُ ذَكَرَ الصَّاحِبُ اِسْمٰعِيْلَ : এখানে মুসান্নিফ (র.) একটি ঘটনা বর্ণনা করছেন, যা তার দাবিকে জোরালো করে। অর্থাৎ শুধুমাত্র حاء এবং هاء-এর মিলন ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং حاء এবং هاء যে শব্দে একত্রিত হয়েছে সে শব্দের তাকরার দ্বারা- ফাসাহাত নষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইসমাঈল ইবনে আব্বাদ-এর উস্তাদ ইবনুল 'আমীদ। আর ইসমাঈল ইবনে আব্বাদ হলেন ইলমে বালাগাতের জনকদের অন্যতম। তিনি আব্দুল কাহির জুরজানির উস্তাদ। الصاحب ইসমাঈল ইবনে আব্বাদের উপাধি। কারণ, ইসমাঈল ছিলেন বাদশাহের দরবারের একজন বিশিষ্ট সভাসদ। তৎকালে বাদশাহের সভাসদদের صاحب উপাধিতে ভূষিত করা হতো। একদা ইসমাঈল তার উস্তাদ ইবনুল 'আমীদের সামনে ঐ কবিতাটি আবৃত্তি করলেন, যার মধ্যে এই পঙ্ক্তিটি ছিলো- كَرِيْمٌ مَتَى اَمْدَحْهُ اَمْدَحْهُ وَالْوَرٰى مَعِيْ ইসমাঈল যখন এ পঙ্ক্তিটি আবৃত্তি করলেন, তখন তার উস্তাদ তাকে বললেন, তোমার দৃষ্টিতে এতে কোনো ত্রুটি আছে? জবাবে ইসমাঈল বললেন, কবি এ পঙ্ক্তিটির মধ্যে مدح শব্দের বিপরীতে لوم শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অথচ সাধারণভাবে مدح-এর বিপরীতে ذم বা هجاء ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উস্তাদ তাকে বললেন, এটি ছাড়া আর কোনো ত্রুটি কি লক্ষ্য করছ? তিনি বললেন, না। তখন উস্তাদ বললেন, حاء ও هاء উভয়টির (মাখরাজ কণ্ঠনালী) মিলন এবং اَمْدَحْهُ-এর তাকরার (এ দু'টি বিষয়) তাকে কঠিন করে তুলেছে এবং বাক্যটির স্বাভাবিক সাবলীলতা-স্বাচ্ছন্দ্য ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফলে বাক্যটিতে তানাফুর সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাখ্যা শোনে ইসমাঈল তার উস্তাদ ইবনুল 'আমীদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। উল্লেখ্য যে, ইবনুল 'আমীদের মতে শুধুমাত্র حاء ও هاء-এর দ্বারা ফাসাহাত নষ্ট হয়নি; বরং এ দু'টির মিলনের সাথে اَمْدَحْهُ-এর তাকরার তথা দু'বার ব্যবহার দ্বারা তানাফুর সৃষ্টি হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

উপরোক্ত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের তানাফুরের দু'টি উদাহরণ উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তানাফুরের মাত্রা যে কমবেশি হতে পারে তা বুঝানোর জন্য লেখক দু'টি উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথম কবিতাটিতে তানাফুরের পরিমাণ বেশি, আর দ্বিতীয়টিতে এর চেয়ে কম।

وَالتَّعْقِيْدُ اَىْ كَوْنُ الْكَلَامِ مُعَقَّدًا اَنْ لَايَكُوْنَ الْكَلَامُ ظَاهِرَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ لِخَلَلٍ وَاقِعٍ اِمَّا فِى النَّظْمِ بِسَبَبِ تَقْدِيْمٍ اَوْ تَاخِيْرٍ اَوْ حَذْفٍ اَوْ اِضْمَارٍ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا يُوْجِبُ صُعُوْبَةَ فَهْمِ الْمُرَادِ كَقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ فِىْ مَدْحِ خَالِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَهُوَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ الْمَخْزُوْمِىْ شِعْرٌ وَمَا مِثْلُهُ فِى النَّاسِ اِلَّا مُمَلَّكًا * اَبُوْ اُمِّهٖ حَىٌّ اَبُوْهُ يُقَارِبُهُ اَىْ لَيْسَ مِثْلُهُ فِى النَّاسِ حَىٌّ يُقَارِبُهُ اَىْ اَحَدٌ يَشْبِهُهُ فِى الْفَضَائِلِ اِلَّا مُمَلَّكٌ اَىْ رَجُلٌ اُعْطِىَ الْمُلْكَ يَعْنِىْ هِشَامًا اَبُوْ اُمِّهٖ اَىْ اَبُوْ اُمِّ ذٰلِكَ الْمُمَلَّكِ اَبُوْهُ اَىْ اِبْرَاهِيْمَ الْمَمْدُوْحِ اَىْ لَايُمَاثِلُهُ اَحَدٌ اِلَّا ابْنُ اُخْتِهٖ وَهُوَ هِشَامٌ فَفِيْهِ فَصْلٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَاِ وَالْخَبَرِ اَعْنِىْ اَبُوْ اُمِّهٖ اَبُوْهُ بِالْاَجْنَبِىِّ الَّذِىْ هُوَ حَىٌّ وَ بَيْنَ الْمَوْصُوْفِ وَالصِّفَةِ اَعْنِىْ حَىٌّ يُقَارِبُهُ بِالْاَجْنَبِىِّ الَّذِىْ هُوَ اَبُوْهُ وَتَقْدِيْمُ الْمُسْتَثْنٰى اَعْنِىْ مُمَلَّكًا عَلَى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ اَعْنِىْ حَىٌّ وَفَصْلٌ كَثِيْرٌ بَيْنَ الْبَدَلِ وَهُوَ حَىٌّ وَالْمُبْدَلِ مِنْهُ وَهُوَ مِثْلُهُ فَقَوْلُهُ مِثْلُهُ اِسْمُ مَا وَفِى النَّاسِ خَبَرُهُ وَمُمَلَّكًا مَنْصُوْبٌ لِتَقَدُّمِهٖ عَلَى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ ـ

অনুবাদ : تعقيد অর্থ বাক্য দুর্বোধ্য হওয়া বা **কাঙ্ক্ষিত অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট না হওয়া। বাক্য বিন্যাসের বেলায় ত্রুটি** তথা শব্দটি তার স্থান থেকে অগ্র-পশ্চাতে হওয়া, উহ্য হওয়া, সর্বনাম ব্যবহার করা ইত্যাদি কারণে, যা অর্থ বোঝানোর ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করে। **যেমন ফারাযদাকের কবিতা যা তিনি হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের মামা** ইবরাহীম ইবনে হিশাম ইবনে ইসমাঈল আল-মাখযূমীর **প্রশংসায় রচনা করেছেন। কবিতা– এমন কোনো ব্যক্তি আর জীবিত নেই, যে সৎগুণাবলিতে তার সমকক্ষ হবে, তবে তার ভাগ্নে** (বাদশাহ হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক) **ব্যতীত। অর্থাৎ** তার মতো কোনো **জীবিত ব্যক্তি** (এ যুগের লোকদের মধ্যে নেই) অর্থাৎ সৎগুণাবলিতে **তার উপমা হওয়ার মতো। তবে একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।** مُمَلَّكٌ অর্থ যাকে ক্ষমতা দান করা হয়েছে। তিনি এখানে হিশামকে বুঝিয়েছেন। **তার মায়ের পিতা** তথা সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত বাদশাহর মায়ের পিতা **তার** অর্থাৎ আলোচিত ইবরাহীমের **পিতা,** অর্থাৎ তার বোনের ছেলে ছাড়া কেউ তার সমকক্ষ নেই। সে হলো হিশাম। এ পঙক্তিটির মধ্যে মুবতাদা তথা اَبُوْ اُمِّهٖ এবং খবর তথা اَبُوْهُ-এর মাঝে اجنبى (এ দুয়ের সাথে সম্পর্কহীন শব্দ) তথা حَىٌّ দ্বারা দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। মাওসূফ তথা حَىٌّ এবং সিফাত তথা يُقَارِبُ-এর মধ্যে اجنبى তথা اَبُوْهُ দ্বারা দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর মুসতাছনা তথা مُمَلَّكًا (শব্দটি)-কে মুসতাছনা মিনহু তথা حى-এর আগে আনা হয়েছে। আর بدل তথা حى এবং مبدل منه তথা مثله-এর মধ্যে রয়েছে বিরাট দূরত্ব। مِثْلُهُ হলো ما-এর ইসম। فِى النَّاسِ হলো এর খবর। مُمَلَّكًا-কে যবর দেওয়া হয়েছে মুসতাছনা মিনহুর আগে আসার কারণে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالتَّعْقِيْدُ اَىْ كَوْنُ الْكَلَامِ الخ : ফাসাহাতে কালামের জন্য ক্ষতিকর তৃতীয় দূষণীয় বিষয়টি হলো تعقيد আর تعقيد বলা হয় বাক্যের মধ্যে এমন জটিলতা পাওয়া যাওয়া যার দ্বারা বাক্যে বক্তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে হয়ে যায়। বাক্যের মধ্যে এ রকম জটিলতা দু'ধরনের হতে পারে– ১. ইবারত বা বাক্যের গঠন প্রণালীতে জটিলতা থাকবে। যেমন কোনো একটি শব্দকে তার স্থান থেকে আগে নিয়ে আসা অথবা পরে আনা। ২. অথবা কোনো একটি শব্দ উহ্য রাখা কিংবা নামের স্থানে সর্বনাম ব্যবহার করা ইত্যাদি। এ ধরনের জটিলতাকে تَعْقِيْد لَفْظِى বলা হয়। মুসান্নিফ (র.) এর উদাহরণ হিসেবে বিখ্যাত কবি ফারাযদাকের একটি কবিতার অংশ পেশ করেন।

কবি ফারাযদাকের পরিচয় :

নাম : হাম্মাম ইবনে গালিব ইবনে সা'সা'আ আত-তামীমি (৬৪১-৭৩৩)। তিনি উমাইয়া যুগের বিখ্যাত কবি ছিলেন। তার চেহারা বসন্তে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। তার পিতা গালিব গোত্রীয় নেতা ছিল। তার উপনাম হলো আবুল আখতাল। তার ছেলের নাম আখতাল, সে হিসেবে তার ডাকনাম হয়েছিল আবুল আখতাল। তার ছেলেও কবি ছিলেন। তার দাদা সা'সা'আ সাহাবী ছিলেন। তার মায়ের নাম লায়লা বিনতে হাবিস। যিনি আকরা ইবনে হাবিসের বোন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী। তিনি হযরত আলী, আবূ হুরায়রা, ইবনে ওমর, হুসাইন ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার যুগের কবি জারীরের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তারা পরস্পরকে ঘায়েল করার জন্য কবিতা রচনা করতেন। তাই তারা مدح ও هجاء-তে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

কবিতাটি তিনি হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান-এর মামা ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈলের প্রশংসায় রচনা করেন। ইবরাহীম ছিলেন তার ভাগ্নে হিশামের পক্ষ থেকে মদীনার গভর্নর। কবিতা وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلَّا مُمَلَّكًا * أَبُوْ أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوْهُ يُقَارِبُهُ ভাবার্থ– জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইবরাহীমের মতো সৎগুণের অধিকারী কোনো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে একজন বাদশাহ তার মতো উত্তম হবেন যার মায়ের পিতা এবং তার পিতা একই ব্যক্তি অর্থাৎ তার ভাগ্নে হিশাম তার মতো হতে পারে। এছাড়া আর কেউ সৎ গুণাবলিতে তার সমকক্ষ হবে না।

يُقَارِبُهُ অর্থ : يُشْبِهُهُ فِي الْفَضَائِلِ অর্থাৎ সৎগুণাবলিতে তার সমকক্ষ। مُمَلَّكٌ (اسم مفعول) অর্থ যাকে ক্ষমতা এবং রাজত্ব দান করা হয়েছে।

উক্ত কবিতার মধ্যে যেসব সমস্যা রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো– ১. أَبُوْ أُمِّهِ হলো মুবতাদা, তার খবর হলো أَبُوْهُ এ মুবতাদা ও খবরের মঝে حَيٌّ শব্দটি এসেছে, যা উভয়ের সাথে সম্পর্কহীন বা أَجْنَبِي।

২. حَيٌّ হলো মাওসূফ يُقَارِبُهُ তার সিফাত। এ মাওসূফ সিফাতের মাঝে ابوه শব্দটি বিচ্ছিন্নকারী হিসেবে এসেছে এবং ابوه-এর সাথে সিফাত ও মাওসূফের কোনো সম্পর্ক নেই।

৩. مستثنى منه হলো حَيٌّ আর مستثنى হলো مُمَلَّكًا। এখানে مستثنى-কে مستثنى منه-এর আগে আনা হয়েছে।

৪. مثله হলো مبدل منه আর بدل হলো حى। এখানে এ দু'টির মাঝে ব্যাপক দূরত্ব বিদ্যমান।

কবিতাটির সঠিক বিন্যাস এরূপ– لَيْسَ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ حَيٌّ يُقَارِبُهُ إِلَّا هِشَامٌ أَبُو أُمِّهِ أَبُوْهُ

মুসান্নিফ (র.) তারকীব করতে গিয়ে বলেন, مِثْلُهُ হলো ما-এর اسم আর فِي النَّاسِ হলো খবর, আর مُمَلَّكًا হলো مستثنى এখানে এটি مستثنى منه-এর আগে হওয়ার কারণে যবর বিশিষ্ট হবে, পরে আসলে رفع হবে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. تعقيد অর্থ বাক্য দুর্বোধ্য হওয়া। تعقيد দু'ভাবে পাওয়া যায়– ১. لفظى ভাবে, যাকে تَعْقِيْد لَفْظِيْ বলা হয়। ২. অর্থগতভাবে যাকে تَعْقِيْد مَعْنَوِيْ বলা হয়। যে কোনো বাক্য فصيح হওয়ার জন্য উভয়বিধ تعقيد থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

খ. تَعْقِيْد لَفْظِيْ বলা হয় বাক্যের শব্দাবলির মাঝে বিন্যাসগত ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলার কারণে বাক্যের অর্থ দুর্বোধ্য ও কঠিন হয়ে যাওয়া। বিন্যাসগত ত্রুটি– যেমন কোনো শব্দ তার স্থান থেকে আগে চলে আসা। যে দু'টি শব্দ একত্রে থাকার কথা তা বিচ্ছিন্নভাবে আসা। تعقيد لفظى-এর উদাহরণ : وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلَّا مُمَلَّكًا * أَبُوْ أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوْهُ يُقَارِبُهُ

কবিতাটির সঠিক বিন্যাস এরূপ– لَيْسَ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ حَيٌّ يُقَارِبُهُ إِلَّا هِشَامٌ أَبُوْ أُمِّهِ أَبُوْهُ

قِيلَ ذِكْرُ ضُعْفِ التَّالِيْفِ يُغْنِى عَنْ ذِكْرِ التَّعْقِيْدِ اللَّفْظِى وَفِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ اَنْ يَحْصُلَ التَّعْقِيْدُ بِاجْتِمَاعِ عِدَةِ اُمُوْرٍ مُوْجِبَةٍ لِصُعُوْبَةِ فَهْمِ الْمُرَادِ وَاِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا جَارِيًا عَلٰى قَانُوْنِ النَّحْوِ وَبِهٰذَا يَظْهَرُ فَسَادُ مَا قِيلَ اِنَّهُ لَاحَاجَةَ فِىْ بَيَانِ التَّعْقِيْدِ فِى الْبَيْتِ اِلٰى ذِكْرِ تَقْدِيمِ الْمُسْتَثْنٰى عَلَى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ بَلْ لَا وَجْهَ لَهٗ لِاَنَّ ذٰلِكَ جَائِزٌ بِاِتِّفَاقِ النُّحَاةِ اِذْ لَايَخْفٰى اَنَّهٗ يُوْجِبُ زِيَادَةَ التَّعْقِيْدِ وَهُوَ مِمَّا يَقْبَلُ الشِّدَّةَ وَالضُّعْفَ ـ

অনুবাদ : কেউ কেউ বলেন যে, ضُعْفُ التَّالِيْفِ-এর আলোচনা تَعْقِيْد لَفْظِى-এর আলোচনার প্রয়োজন রাখেনি। কিন্তু এ মতে আপত্তি আছে। কেননা, কয়েকটি বিষয়ের সমন্বয়ে تَعْقِيْد পাওয়া যাওয়া সম্ভব, যা কাঙ্ক্ষিত অর্থ বুঝাতে জটিলতা সৃষ্টি করে; যদিও এর প্রতিটি বিষয় নাহু বা ব্যাকরণের নিয়ম মাফিক ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা ঐ কথার অসারতা প্রমাণিত হয়, যা বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত পঙক্তিটিতে تَعْقِيْد বর্ণনার জন্য مُسْتَثْنٰى-কে مُسْتَثْنٰى مِنْه-এর আগে আনার বিষয়টি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই; বরং এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। কেননা, এ তো সব নাহুবিশারদদের ঐকমত্যে বৈধ। (তাদের কথাটি অসার হওয়ার) কারণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি (অর্থাৎ مُسْتَثْنٰى-কে مُسْتَثْنٰى مِنْه-এর আগে আনা) تَعْقِيْد (দুর্বোধ্যতা)-এর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। আর تَعْقِيْد বা দুর্বোধ্যতার মধ্যে কমবেশি হতে পারে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ قِيلَ ذِكْرُ ضُعْفِ التَّالِيْفِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) আল্লামা খালখালীর একটি মন্তব্য পেশ করছেন। খালখালী বলেন, تَعْقِيْد لَفْظِى তো ضُعْفُ التَّالِيْفِ থেকে উদ্ভূত। অতএব, বাক্য যখন ضُعْف تَالِيْف থেকে মুক্ত হবে তখন تَعْقِيْد থেকেও মুক্ত হবে। সুতরাং ضُعْفُ التَّالِيْفِ থেকে মুক্ত করার শর্তারোপ করার পর আলাদা করে تَعْقِيْد থেকে মুক্ত করার শর্ত করা নিরর্থক কাজ। তাই তিনি বলেন, ضُعْفُ التَّالِيْفِ-এর আলোচনা تَعْقِيْد-এর আলোচনা প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে দিয়েছে।

এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, فِيهِ نَظَرٌ অর্থাৎ আপনার দাবি সঠিক নয়। কেননা, ضُعْفُ التَّالِيْفِ বলা হয় কালামের শব্দাবলির গঠন ব্যাকরণের নিয়ম বহির্ভূত হওয়া। কিন্তু আমরা কখনো দেখতে পাই যে, কালামের অন্তর্গত সব শব্দাবলি ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু তারপরেও কয়েকটি বিষয় এমনভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে যার দ্বারা বাক্যটির মর্মার্থ কঠিন হয়ে تَعْقِيْد لَفْظِى-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অতএব ضُعْفُ التَّالِيْفِ ছাড়াও تَعْقِيْد لَفْظِى পাওয়া যাওয়া সম্ভব। এমনিভাবে কখনো দেখা যায় যে, ضُعْفُ التَّالِيْفِ হয়েছে; কিন্তু تعقيد হয়নি। তাই تعقيد-এর আলোচনা পৃথকভাবে করাই বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهٗ بِهٰذَا يَظْهَرُ فَسَادُ مَا قِيلَ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের উল্লিখিত জবাব দ্বারা এ ব্যাপারে উত্থাপিত একটি আপত্তির নিরসন হয়ে যায়।

আপত্তিটি হলো– উল্লিখিত শ্লোকে تَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنٰى عَلَى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ-কে অনেকে تعقيد-এর মধ্যে শামিল করে থাকেন। অথচ تَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنٰى عَلَى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ-কে تَعْقِيْد لَفْظِى-এর মধ্যে শামিল করা ঠিক নয়। কারণ, مُسْتَثْنٰى-কে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর আগে আনা নাহুবিদদের মতে সঠিক এবং এ ধরনের تقديم গ্রহণযোগ্য। যেহেতু এটি ব্যাকরণগতভাবে সঠিক, তাই একে تعقيد-এর মধ্যে শামিল করা মোটেও ঠিক নয়।

উত্তর : আমরা বলি, এই প্রশ্ন তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য যারা ضُعْفُ التَّالِيْفِ-এর মধ্যে تَعْقِيْد لَفْظِي-কে শামিল করেন এবং তারা মনে করে থাকেন যে, বৈকরণিক ক্রটি হলে تعقيد হয়, অন্যথায় নয়। আমরা ইতঃপূর্বে বলে এসেছি যে, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বাক্য ব্যবহৃত হওয়ার পরও এতে تعقيد পাওয়া যেতে পারে। অতএব, এখানেও تَقْدِيْمُ الْمُسْتَثْنٰى عَلَى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ যদিও বৈধ, কিন্তু মুবতাদা ও খবরের মাঝে এবং মাওসূফ ও সিফাতের মাঝে প্রতিবন্ধক আর بدل ও مُبْدَل مِنْهُ-এর মাঝে দূরত্ব হওয়ার কারণে যে تعقيد সৃষ্টি হয়েছে تَقْدِيْمُ الْمُسْتَثْنٰى عَلَى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ দ্বারা তার মাঝে আরো বেশি দুর্বোধ্যতা যোগ হয়েছে। অতএব, এটিকে تعقيد-এর অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

আর এ কথাও সকলের জানা যে, বাক্যের মধ্যে تعقيد বা দুর্বোধ্যতার মাত্রা কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে। অর্থাৎ কোনো বাক্য কম দুর্বোধ্য, আর কোনো বাক্য বেশি দুর্বোধ্য হতে পারে।

সার-সংক্ষেপ :

আল্লামা খালখালীর মতে تَعْقِيْد لَفْظِي টা ضُعْفُ التَّالِيْفِ-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই পৃথকভাবে تَعْقِيْد لَفْظِي আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানীর মতে এ মতটি সঠিক নয়। কেননা, ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী গঠিত বাক্যের মধ্যেও تَعْقِيْد لَفْظِي পাওয়া যাওয়া সম্ভব, আর ضُعْفُ التَّالِيْفِ অর্থ হচ্ছে ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া।

وَاَمَّا فِى الْاِنْتِقَالِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ اِمَّا فِى النَّظْمِ اَىْ لَايَكُوْنُ الْكَلَامُ ظَاهِرَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ لِخَلَلٍ وَاقِعٍ فِىْ اِنْتِقَالِ الذِّهْنِ مِنَ الْمَعْنَى الْاَوَّلِ الْمَفْهُوْمِ بِحَسْبِ اللُّغَةِ اِلَى الثَّانِى الْمَقْصُوْدِ وَ ذٰلِكَ بِسَبَبِ اِيْرَادِ اللَّوَازِمِ الْبَعِيْدَةِ الْمُفْتَقِرَةِ اِلَى الْوَسَائِطِ الْكَثِيْرَةِ مَعَ خِفَاءِ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَقْصُوْدِ كَقَوْلِ الْاٰخَرِ وَهُوَ عَبَّاسُ بْنُ الْاَحْنَفِ وَلَمْ يَقُلْ كَقَوْلِهٖ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ عَوْدَ الضَّمِيْرِ اِلَى الْفَرَزْدَقِ شِعْرٌ سَاَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرَبُوْا * وَتَسْكُبُ بِالرَّفْعِ هُوَ الصَّحِيْحُ عَيْنَاىَ الدُّمُوْعَ لِتَجْمُدَا جَعَلَ سَكْبَ الدُّمُوْعِ كِنَايَةً عَمَّا يَلْزَمُ فِرَاقَ الْاَحِبَّةِ مِنَ الْكَاٰبَةِ وَالْحُزْنِ وَاَصَابَ لٰكِنَّهٗ اَخْطَاَ فِىْ جَعْلِ جُمُوْدِ الْعَيْنِ كِنَايَةً عَمَّا يُوْجِبُهٗ دَوَامُ التَّلَاقِىْ مِنَ الْفَرَحِ وَالسُّرُوْرِ فَاِنَّ الْاِنْتِقَالَ مِنْ جُمُوْدِ الْعَيْنِ اِلٰى بُخْلِهَا بِالدُّمُوْعِ حَالَ اِرَادَةِ الْبُكَاءِ وَهِىَ حَالَةُ الْحُزْنِ عَلٰى مُفَارَقَةِ الْاَحِبَّةِ لَا اِلٰى مَا قَصَدَهٗ مِنَ السُّرُوْرِ الْحَاصِلِ بِالْمُلَاقَاةِ وَمَعْنَى الْبَيْتِ اِنِّى الْيَوْمَ اُطَيِّبُ نَفْسًا بِالْبُعْدِ وَالْفِرَاقِ وَ اُوَطِّنُهَا عَلٰى مُقَاسَاةِ الْاَحْزَانِ وَالْاَشْوَاقِ وَاَتَجَرَّعُ غُصَصَهَا وَاَتَحَمَّلُ لِاَجْلِهَا حُزْنًا يُفِيْضُ الدُّمُوْعَ مِنْ عَيْنَىَّ لِاَتَسَبَّبَ بِذٰلِكَ اِلٰى وَصْلٍ يَدُوْمُ وَ مَسَرَّةٍ لَاتَزُوْلُ فَاِنَّ الصَّبْرَ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ وَمَعَ كُلِّ عُسْرٍ يُسْرًا وَلِكُلِّ بِدَايَةٍ نِهَايَةٌ وَاِلٰى هٰذَا اَشَارَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَاهِرِ فِىْ دَلَائِلِ الْاِعْجَازِ وَلِلْقَوْمِ هٰهُنَا كَلَامٌ فَاسِدٌ اَوْرَدْنَاهُ فِى الشَّرْحِ ـ

অনুবাদ : **অথবা ত্রুটি থাকবে** (শব্দ থেকে মর্ম পর্যন্ত) **পৌঁছার ক্ষেত্রে।** وَاَمَّا فِى الْاِنْتِقَالِ শব্দটি লেখকের ইবারত اَمَّا فِى النَّظْمِ-এর উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ কালামটি উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে সুস্পষ্ট হবে না অভিধান থেকে প্রাপ্ত (শব্দের) প্রথম অর্থ (তথা শব্দের প্রকৃত আক্ষরিক অর্থ) থেকে কাঙ্ক্ষিত অর্থে পৌঁছার ক্ষেত্রে ত্রুটির কারণে। আর এমনটা হয় সুদূরবর্তী لَوَازِم-কে ব্যবহার করার ফলে, যে لَوَازِم অনেক মাধ্যম বা ভায়ার প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে। সেই সাথে কাঙ্ক্ষিত অর্থের প্রতি ইঙ্গিতবহ দলিলসমূহও প্রচ্ছন্ন থাকে। **যেমন অপর একজনের কবিতা**– তিনি হচ্ছেন আব্বাস ইবনে আহনাফ। লেখক 'যেমন তার কবিতা' এ কথাটি বলেননি, যাতে সর্বনাম দ্বারা ফারাযদাক উদ্দেশ্য বলে এমন ধারণা না হয়।

কবিতা : আমি তোমাদের থেকে আবাসস্থলের দূরত্ব কামনা করছি, যাতে তোমরা কাছে আসতে পার। تَسْكُبُ (পেশ সহকারে) **আর আমার দু'চোখ অশ্রু বর্ষণ করছে যাতে সেগুলো শুকিয়ে যায়।** অশ্রুবর্ষণ দ্বারা তিনি কিনায়া বা ইঙ্গিত করেছেন বন্ধুদের বিচ্ছেদের মাধ্যমে যা লাযেম হয় অর্থাৎ দুঃখ-দুর্দশার প্রতি এবং তাঁর (এ কিনায়া) সঠিক হয়েছে। তবে তিনি ভুল করেছেন– চোখ শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারা কিনায়া করতে গিয়ে এমন বিষয়ের প্রতি যা আবশ্যকীয় হয় সব সময়ের দেখা সাক্ষাতের দ্বারা অর্থাৎ আনন্দ ও প্রফুল্লতার প্রতি। **কেননা, চোখ শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারা কাঁদার ইচ্ছা করা অবস্থায়** চোখের অশ্রুমালা বর্ষণে কৃপণতার প্রতি মানুষের ধারণা হয়, সেটি অর্থাৎ চোখ শুকিয়ে যাওয়া হচ্ছে বন্ধুদের বিরহের কারণে দুঃখের অবস্থা। **সেদিকে ধারণা যায় না, যা তিনি ইচ্ছা করেছেন।** অর্থাৎ আনন্দ ও প্রফুল্লতা, যা বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের দ্বারা লাভ হয়। পুরো পঙ্ক্তির ব্যাখ্যা হলো– আজ আমি আমার মনকে বিচ্ছেদ ও বিরহে প্রফুল্ল রাখছি এবং তাকে এ দুঃখ-যাতনা ভোগে অভ্যস্ত করে

তুলেছি এবং তীব্র কামনার তিক্ত ঢোক গিলছি, আর সেই কামনার কারণে সহ্য করছি এমন (হৃদয় বিদারক) দুঃখ, যা চোখের অশ্রু প্রবাহিত করছে। যাতে আমি স্থায়ী মিলন এবং অনন্তসুখের অসিলা হতে পারি। কেননা, ধৈর্য সফলতার চাবিকাঠি। প্রতিটি দুঃখের সাথে সুখ রয়েছে এবং সব শুরুরই শেষ আছে। শায়খ আব্দুল কাহের দালায়েলুল ইজায গ্রন্থে এ মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ ব্যাপারে অবশ্য বিভিন্ন লোকদের অনেক ভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা রয়েছে, যা আমি ব্যাখ্যাগ্রন্থ (মুতাওয়াল)-এ আলোচনা করেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاَمَّا فِى الْاِنْتِقَالِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, واما فى الانتقال-এর واو হলো حرف عطف আর اما فى الانتقال হলো معطوف-এর معطوف عليه পূর্বের ইবারতের মধ্যে গেছে। তা হচ্ছে اما فى النظم।

قَوْلُهُ اَىْ لَايَكُوْنُ الْكَلَامُ ظَاهِرَ الدَّلَالَةِ : অর্থাৎ কালাম বা বাক্যটি শ্রোতার কাছে কাঙ্ক্ষিত অর্থ বোঝাতে অস্পষ্ট হবে। কারণ, বাক্যের শাব্দিক বা অভিধানিক অর্থ থেকে কাঙ্ক্ষিত অর্থ পর্যন্ত পৌঁছতে মাঝখানে অনেকগুলো মাধ্যম থাকবে। আর মাধ্যমগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়ার মতো কোনো স্পষ্ট দলিল থাকবে না। ফলে শ্রোতার মেধা আভিধানিক অর্থ থেকে কাঙ্ক্ষিত অর্থ পর্যন্ত পৌঁছতে ব্যর্থ হবে এবং বাক্যটি দুর্বোধ্য হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.) শাব্দিক বা প্রকৃত অর্থ থেকে উদ্দিষ্ট অর্থ পর্যন্ত পৌঁছাকে انتقال বলেছেন।

قَوْلُهُ وَ ذٰلِكَ بِسَبَبِ اِيْرَادِ اللَّوَازِمِ الْبَعِيْدَةِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) انتقال-এর ক্ষেত্রে কেন ত্রুটি হয়ে থাকে তা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, এর কারণ হলো, বাক্যের মধ্যে অনেক দূরবর্তী لازم থাকে, যেগুলোর জন্য অনেক واسطه-এর প্রয়োজন হয়। সেই সাথে উদ্দেশ্য প্রকাশকারী কোনো সুস্পষ্ট দলিলও থাকে না।

বি. দ্র. মুসান্নিফ (র.)-এর উক্ত ইবারতে সামান্য ত্রুটি রয়েছে। তা হচ্ছে, তাঁর ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, বাক্যের لوازم উল্লেখ থাকবে এবং এর দ্বারা ملزومات উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু এ বিষয়টি তার অনুসৃত নীতির পরিপন্থি। কারণ, তাঁর মতে مجاز এবং كناية-এর মধ্যে ملزوم থেকে لازم-এর দিকে যাওয়া হয়, لازم থেকে ملزوم-এর দিকে নয়। অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে ملزوم উল্লেখ থাকে,এর দ্বারা لازم-কে উদ্দেশ্য করা হয়। তাই মুসান্নিফের ইবারত بِسَبَبِ اِيْرَادِ الْمَلْزُوْمَاتِ الْبَعِيْدَةِ হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। তাহলে এটি তার নীতির সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হতো। তার বাক্য بسبب ايراد اللوازم দ্বারা তার মতের বিপরীত বিষয় প্রমাণিত হয়। তাই আমরা ইবারতকে সামান্য পরিবর্তন করবো তার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য। অর্থাৎ তার ইবারত এরূপ হওয়া উচিত ছিল–

بِسَبَبِ قَصْدِ اللَّوَازِمِ وَاِرَادَتِهَا مِنَ الْمَلْزُوْمَاتِ اَوْ بِسَبَبِ اِيْرَادِهَا بِلَفْظِ الْمَلْزُوْمَاتِ

অর্থাৎ لوازم-এর ইচ্ছা করা হবে ملزوم-এর শব্দ দ্বারা।

সারকথা হলো, বাক্যের মধ্যে ملزوم উল্লেখ থাকে, কিন্তু উদ্দেশ্য হয় তার لازم। আর ملزوم এবং لازم-এর মাঝে এক বা একাধিক মাধ্যম থাকে। সেই সাথে উদ্দেশ্য নির্দেশকারী কোনো প্রমাণাদি থাকে না।

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে– অর্থ অস্পষ্ট হওয়ার মূল কারণ হলো দলিল বা করীনার অস্পষ্ট বা অজ্ঞাত হওয়া, মাধ্যম বেশি হওয়া নয়। যেমন– كَثِيْرُ الرَّمَادِ বলে দানশীল বা অতিথিপরায়ণ বোঝানো। এখানে كثير الرماد হলো ملزوم, এর لازم হচ্ছে جواد বা অতিথিপরায়ণ। এই لازم ও ملزوم-এর মধ্যে একাধিক মাধ্যম থাকার পরও তা অস্পষ্ট নয় দলিল থাকার কারণে।

ملزوم ও لازم-এর মধ্যে কম মাধ্যমের উদাহরণ হলো, طَوِيْلُ النِّجَادِ বলে দীর্ঘকায় বোঝানো।

قَوْلُهُ كَقَوْلِ الْاٰخَرِ وَهُوَ عَبَّاسُ بْنُ الْاَحْنَفِ : আব্বাস ইবনে আহনাফ বনী হানীফা গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি বাদশাহ হারূনুর রশীদের দরবারের কবি ছিলেন। মুসান্নিফ বলেন, লেখক كقوله বলেননি। কারণ, এমনটি বললে শ্রোতা-পাঠকের মনে হতো যে, এ শে'রটিও পূর্বের শে'রটির মতো ফারাযদাকেরই রচিত। কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে আব্বাস ইবনে আহনাফের রচিত। سَاَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرُبُوْا * وَتَسْكُبُ عَيْنَاىَ الدُّمُوْعَ لِتَجْمُدَا

উল্লিখিত কবিতার প্রথম শব্দ سَاطْلُبُ-এর سين হলো তাকিদের জন্য, ভবিষ্যৎ বুঝানোর জন্য নয়। যেমন- سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا কুরআনের আয়াতের মধ্যে ব্যবহার হয়েছে। تَسْكُبُ-এর উপর পেশ হবে। কারণ, এটি سَاطْلُبُ-এর উপর عطف হবে, لِتَقْرَبُوْا-এর উপর عطف হবে না। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ কবিতায় লেখক দু'টি কিনায়া করেছেন। প্রথমত অশ্রুমালা প্রবাহিত হওয়ার দ্বারা তিনি দুঃখ-যাতনার প্রতি কিনায়া করেছেন। তিনি চোখের অশ্রুমালা প্রবাহিত হওয়ার দ্বারা কিনায়া করেছেন ঐ বিষয়ের প্রতি যা বন্ধুদের বিচ্ছেদের জন্য আবশ্যিক অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট। দুঃখ-কষ্ট যেমন বিচ্ছেদের জন্য আবশ্যিক, তেমনি অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার জন্যও আবশ্যিক। তাই মুসান্নিফ যদি عَمَّا يَلْزَمُ مِنَ الْكَآبَةِ وَالْحُزْنِ বলতেন, তাহলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হতো। কথাটিকে তিনি ঘুরিয়ে বলেছেন। যা হোক তার এ কিনায়া সঠিক হয়েছে। তার দ্বিতীয় কিনায়া হলো جُمُوْد عَيْن বা অশ্রু শুকিয়ে যাওয়া দ্বারা তিনি আনন্দ এবং সুখাবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সে আনন্দ বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের দ্বারা হাসিল হয়। মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখকের এ ব্যাখ্যাটি সঠিক হয়নি। কারণ, جُمُوْد عَيْن বা অশ্রু শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারা ইঙ্গিত সাধারণত হয় দুঃখের সময় কান্নার ইচ্ছা সত্ত্বেও কান্না না আসার প্রতি। লেখকের উদ্দেশ্য আনন্দ-প্রফুল্লতা, যা হাসিল হয় সবসময় দেখা-সাক্ষাতের দ্বারা। এর প্রতি جُمُوْد عَيْن-এর কোনো ইঙ্গিত নেই। আর এ কারণেই এতে تعقيد বা দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, ملزوم অর্থাৎ جُمُوْد عَيْن এবং لازم আনন্দ-খুশি-এর মাঝে বহু ভায়া ও মাধ্যম রয়েছে। সেই সাথে উদ্দিষ্ট অর্থের প্রতি নির্দেশকারী দলিলও এখানে অস্পষ্ট।

مَعْنَى الْبَيْتِ : কবিতার পঙক্তি দ্বারা কবির উদ্দেশ্য হলো- আমি এখন তোমাদের থেকে দূরে চলে গিয়ে স্বীয় মনকে বিচ্ছেদ-বিরহের জন্য প্রস্তুত করবো। আর আমার মনকে দুঃখ-বেদনা এবং প্রেমের জ্বালা সহ্য করার ব্যাপারে অভ্যস্ত করবো। তীব্র আসক্তির তিক্ততাকে ঢোক গিলে খাবো অর্থাৎ যাতনা সহ্য করবো তাদের ভালোবাসার কারণে এমন দুঃখ সহ্য করবো যা আমার চোখের অশ্রুমালা প্রবাহিত করে। এত কিছু করবো আমি স্থায়ী মিলন এবং অনন্ত সুখের আশায়। অবশেষে আমার সে সুখ আমার হাতের নাগালে আসবে। কারণ দুঃখের পর সুখ, ব্যথার পর আরাম আসবেই, এটাই তো শাশ্বত নিয়ম। বলা হয়ে থাকে- ধৈর্যই সফলতার চাবিকাঠি, দুঃখের পর সুখ আসে এবং যে কোনো শুরুর শেষ আছে। সুতরাং যখন আমার সুখ আনন্দ আসবে, তখন চোখের পানি শুকিয়ে যাবে। তখন আর চোখের অশ্রু ঝরবে না।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, লেখকের ملزوم (جُمُوْد عَيْن) এবং لازم (আনন্দ)-এর মাঝে কতগুলো মাধ্যম বা ভায়া এবং তার এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত কতটা অস্পষ্ট। মুসান্নিফ (র.) বলেন, শায়খ আবদুল কাহের জুরজানী 'দালায়েলুল ই'জায' গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাটিই করেছেন। তিনি বলেন, এ কবিতার ব্যাখ্যায় অনেকের ভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা রয়েছে, যা তিনি মুতাওয়ালের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এখানে সে ধরনের কিছু কথা আলোচনা করা হলো।

কেউ কেউ বলেন, (কবিতার অর্থ হলো) অতীত থেকে এই পর্যন্ত বন্ধুদের নৈকট্য ও সান্নিধ্য চেয়ে আসছি, কিন্তু আমার ভাগ্যে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। তাই আমি এখন থেকে দুঃখ ও বিরহ কামনা করবো, যাতে আমার ভাগ্যে নৈকট্য লাভ হয়। কেননা, যুগ ও কালের এবং সাথীদের অভ্যাস এমনি যে, তাদের কাছে যা চাওয়া হয় তার বিপরীত জিনিস তারা দেয়। তাই কবি তাদের কাছে তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কিছু চাচ্ছেন, যাতে কাঙ্ক্ষিত জিনিস হাসিল হয়।

সার-সংক্ষেপ :

ক. تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ বলা হয় বাক্যের অর্থ উদ্ধারে জটিলতা সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে অপ্রচলিত مجاز (রূপকার্থ) ও অপ্রচলিত কিনায়া (ইঙ্গিতার্থ) ব্যবহার করা এবং মূল অর্থ ও রূপক অর্থের মাঝে এমন দূরত্ব থাকা যে, মূল অর্থ পর্যন্ত পৌঁছা সহজে সম্ভব হয় না। এর উদাহরণরূপে লেখক আব্বাস ইবনে আহনাফের কবিতা পেশ করেছেন-

سَاطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرَبُوْا * وَتَسْكُبُ عَيْنَاىَ الدُّمُوْعَ لِتَجْمُدَا

এখানে جُمُوْد عَيْن-এর প্রচলিত ইঙ্গিতার্থ (কাঁদার চেষ্টা করা সত্ত্বেও চোখে পানি না আসা) গ্রহণ না করে অপ্রচলিত ইঙ্গিতার্থ (দুঃখের অবসান ও সুখ লাভ করা) গ্রহণ করার কারণে تعقيد সৃষ্টি হয়েছে। আর এ কারণেই কবিতাটি غير فصيح হয়ে গেছে।

قِيلَ فَصَاحَةُ الْكَلَامِ خُلُوْصُهُ مِمَّا ذُكِرَ وَمِنْ كَثْرَةِ التَّكْرَارِ وَتَتَابُعِ الْإِضَافَاتِ كَقَوْلِهِ شِعْرٌ وَ تُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ * سَبُوْحٌ أَيْ فَرَسٌ حَسَنُ الْجَرْيِ لَاتُتْعِبُ رَاكِبَهَا كَأَنَّهَا تَجْرِي عَلَى الْمَاءِ لَهَا صِفَةُ سَبُوْحٍ مِنْهَا حَالٌ مِنْ شَوَاهِدَ عَلَيْهَا مُتَعَلِّقٌ بِشَوَاهِدِ شَوَاهِدُ فَاعِلُ الظَّرْفِ اَعْنِيْ لَهَا يَعْنِيْ اَنَّ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَامَاتٍ دَالَّةً عَلَى نَجَابَتِهَا قِيلَ التَّكْرَارُ ذِكْرُ الشَّيْءِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرٰى وَلَا يَخْفٰى اَنَّهُ لَايَحْصُلُ كَثْرَتُهُ بِذِكْرِهِ ثَالِثًا وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَثْرَةِ هٰهُنَا مَا يُقَابِلُ الْوَحْدَةَ وَلَايَخْفٰى حُصُوْلُهَا بِذِكْرِهِ ثَالِثًا ـ

অনুবাদ : কেউ কেউ বলেন, ফাসাহাতে কালাম বলা হয় উল্লিখিত বিষয় থেকে মুক্ত থাকা এবং অধিক تكرار এবং একের পর এক ইযাফাত হওয়া থেকে মুক্ত হওয়া। যেমন– কবির কবিতার চরণ; (অনুবাদ) আমাকে বিপদাপদে সাহায্য করে এমন দ্রুতগামী ঘোড়া যা তার আরোহীকে ক্লান্ত করে না; যেন এটি পানির উপর চলছে। لها এটি سَبُوْح-এর সিফাত। مِنْهَا (শব্দটি) شَوَاهِد থেকে حال হয়েছে। عَلَيْهَا মুতা'আল্লিক হবে شَوَاهِد-এর সাথে। شَوَاهِد হলো ظرف তথা لَهَا-এর (উহ্য ফে'লের) ফায়েল। অর্থাৎ তার (ঘোড়ার) নিজের মধ্যে এমন কিছু আলামত বা চিহ্ন রয়েছে যেগুলো তার উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করে। কেউ কেউ বলেন, তাকরার অর্থ কোনো বিষয়ের উল্লেখ একবার করার পর আবার করা।

অতএব, এটা কোনো অস্পষ্ট বিষয় নয় যে, কোনো শব্দ বা বিষয় তৃতীয়বারের মতো উল্লেখ করা হলে তা অধিক বলে সাব্যস্ত হয় না। (বরং কমপক্ষে চতুর্থবার উল্লেখ করা হলে তা অধিক বলে বিবেচিত হবে) এ মতের উপর আপত্তি আছে। কারণ, এখানে كثرة দ্বারা উদ্দেশ্য এককের বিপরীত। আর এ অর্থে তৃতীয়বার উল্লেখ করার দ্বারাই যে, তাকরার হাসিল হয় তা প্রকাশ্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ قِيلَ فَصَاحَةُ الْكَلَامِ الخ : কেউ কেউ বলেন, ফাসাহাতে কালামের জন্য ضُعْفُ التَّالِيْفِ, تَنَافُر كَلِمَات এবং تَعْقِيْد থেকে মুক্ত হওয়া যেমন শর্ত, তেমনি কালাম كَثْرَةُ التَّكْرَار এবং تَتَابُع إضَافَت থেকেও মুক্ত থাকা শর্ত, তাই আগের তিনটির সাথে এ দু'টি বিষয়কেও কালাম ফসীহ হওয়ার শর্তাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তারা বলেন, অন্যান্য শর্তের মতো এ দু'টিকেও ফসীহ কালাম থেকে বাদ দিতে হবে। উল্লেখ্য যে,

تُسْعِدُنِيْ فِيْ غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ * سَبُوْحٌ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ

এ শে'রের মধ্যে দ্বিতীয় লাইনে ها (সর্বনাম) একাধিকবার এসেছে। শে'রটি আবূ তায়্যিব আহমদ মুতানাব্বীর রচনা থেকে চয়ন করা হয়েছে। তিনি সাইফুদ দাওলা ইবনে হামদানের প্রশংসায় এটি রচনা করেন।

কবিতার ব্যাখ্যা :

تُسْعِدُ : শব্দটি إِسْعَادٌ (باب افعال) থেকে নির্গত। অর্থ– সাহায্য করা। غَمْرَةٌ অর্থ– ডুবে যাওয়া, তবে এখানে বিপদ-আপদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। سَبُوْحٌ শব্দটি উহ্য মাওসূফের সিফাত, এর মাওসূফ হলো فَرَس আর سَبُوْحٌ ব্যবহৃত হয়েছে فَعُوْلٌ-এর ওজনে– এটি পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। سَبُوْحٌ শব্দটি (باب فتح) سَبَاحَةً وَسَبْحًا থেকে নির্গত। অর্থ– সাঁতার কাটা। সুতরাং سَبُوْحٌ অর্থ– দ্রুত সাঁতারু। উত্তম ঘোড়ার ক্ষেত্রে শব্দটি مجاز হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কবি এখানে سَبُوْحٌ শব্দটিকে দ্রুতগামী বুঝানোর জন্য إِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

এ ব্যাখ্যার প্রতি মুসান্নিফ (র.) فَرَسٌ حَسَنُ الْجَرْيِ বলে ইঙ্গিত করেছেন। তবে মুসান্নিফের এ ব্যাখ্যার উপর একটি প্রশ্ন এসে যায়। তা হলো فرس : হচ্ছে مؤنث سماعى-এর সিফাত حَسَنُ الْجَرْيِ-কে তিনি কিভাবে مذكر ব্যবহার করলেন? উত্তর হলো فرس-কে তিনি এখানে مركوب করে এর সিফাত حسن (مذكر) এনেছেন। অথবা فرس দ্বারা তার উদ্দেশ্য خيل সামনের বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মুশাব্বাহ ও মুশাব্বা বিহীর মাঝে وجه شبه বর্ণনা করেছেন যে, لَاتُتْعِبُ رَاكِبَهَا كَأَنَّهَا تَجْرِىْ عَلَى الْمَاءِ অর্থাৎ দ্রুতগামী ঘোড়া তার সওয়ারীকে ক্লান্ত করে না, যেন সেটি পানির উপর সাঁতরিয়ে চলে।

قَوْلُهُ لَهَا صِفَةُ سُبُوْحٍ : لَهَا হলো سُبُوْحٌ-এর সিফাত অর্থাৎ لَهَا তার شبه فعل ও فاعل মিলে سُبُوْحٌ-এর সিফাত।

قَوْلُهُ مِنْهَا حَالٌ مِنَ الشَّوَاهِدِ : مِنْهَا হলো شَوَاهِدُ-এর حال। মূলত مِنْهَا ছিল شَوَاهِدُ-এর সিফাত। তবে قاعده হলো نكره-এর সিফাত কে যদি نكره-এর আগে আনা হয়, তবে তা حال হয়।

عَلَيْهَا মুতা'আল্লিক হবে شَوَاهِدُ-এর সাথে। উল্লেখ্য যে, شَوَاهِدُ এখানে علامة বা নিদর্শনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। شَوَاهِدُ-এর মুতা'আল্লিক মিলে ذو الحال আর مِنْهَا হলো حال। حال এবং ذو الحال মিলে لَهَا-এর ফায়েলে যরফ। যরফ তার ফায়েলসহ سُبُوْح-এর সিফাত। সিফাত ও মাওসূফ মিলে تسعد ফে'লের فاعل।

قَوْلُهُ يَعْنِىْ أَنَّ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَامَاتٍ دَالَّةً عَلٰى نَجَابَتِهَا : অর্থাৎ তার নিজের মধ্যেই এমন কতক নিদর্শন রয়েছে যা তার উৎকৃষ্টতার প্রমাণ। মুসান্নিফের এ ইবারত ইঙ্গিত করে যে, عَلَيْهَا-এর মধ্যে مضاف উহ্য আছে, তা হলো نجابة।

قَوْلُهُ قِيْلَ التَّكْرَارُ ذِكْرُ الشَّيْءِ : আল্লামা যাওযানী বলেন, تكرار বলা হয় কোনো জিনিসকে দুবার উল্লেখ করা অর্থাৎ তাকরার হওয়ার জন্য কোনো কিছু দু'বার উল্লেখ হওয়ার প্রয়োজন। একাধিক তাকরার হওয়ার জন্য কমপক্ষে চারবার উল্লেখ হতে হবে। আর সে হিসেবে অধিক বা كثير হওয়ার জন্য কমপক্ষে ছয়বার হতে হবে। অথচ এখানে ها সর্বনামটি তিনবার উল্লিখিত হয়েছে। অতএব, كَثْرَةُ تَكْرَارٍ হলো কি করে?

قَوْلُهُ وَفِيْهِ نَظَرٌ : মুসান্নিফ বলেন, তার এ মতটি সঠিক নয়, কারণ তার تكرار-এর সংজ্ঞা সঠিক হয়নি। তাকরার বলা হয় কোনো কিছু একবার উল্লেখ করার পর দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার উল্লেখটি হলো তাকরার। সুতরাং এরপর আবার উল্লেখ করলে হবে দ্বিতীয় তাকরার। এভাবে তিনবার উল্লেখ করলে তৃতীয় তাকরার হলো। এখানে كثرة দ্বারা যদি আমরা একের অধিক উদ্দেশ্য করি, তবে তা তৃতীয়বার উল্লেখ করার দ্বারাই হয়ে যায়।

অতএব, এ শে'রের মধ্যে এ সর্বনামটি (ها) যেহেতু তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এটিকে كَثْرَةُ التَّكْرَارِ বলা যায়। আর এ দোষে দুষ্ট হওয়ায় এটি ফাসাহাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

সার-সংক্ষেপ :

কেউ কেউ মনে করেন, ফাসাহাতে কালামের জন্য উপরোক্ত দোষসমূহ থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে كَثْرَةُ التَّكْرَارِ (অধিক পুনরুক্তি) ও تَتَابُعُ الْإِضَافَاتِ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত। كثرة التكرار-এর উদাহরণ হলো মুতানাব্বীর একটি শে'র- تُسْعِدُنِىْ فِىْ غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ * سَبُوْحٌ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ

وَتَتَابُعِ الْاِضَافَاتِ مِثْلُ قَوْلِهِ شِعْرٌ حَمَامَةُ جَرْعٰى حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ اِسْجَعِى * فَاَنْتِ بِمَرْأًى مِنْ سُعَادَ وَ مَسْمَعٍ، فَفِيْهِ اِضَافَةُ حَمَامَةٍ اِلٰى جَرْعٰى وَجَرْعٰى اِلٰى حَوْمَةٍ وَحَوْمَةٍ اِلَى الْجَنْدَلِ وَالْجَرْعَاءُ تَانِيْثُ الْاَجْرَعِ قَصْرُهَا لِلضُّرُوْرَةِ وَهِىَ اَرْضٌ ذَاتُ رَمْلٍ لَاتُنْبِتُ شَيْئًا وَالْحَوْمَةُ مُعْظَمُ الشَّيْئِ وَالْجَنْدَلُ اَرْضٌ ذَاتُ حِجَارَةٍ وَالسَّجْعُ هَدِيْرُ الْحَمَامِ وَنَحْوِهِ وَقَوْلُهُ فَاَنْتِ بِمَرْأًى اَىْ بِحَيْثُ تَرَاكِ سُعَادُ وَتَسْمَعُ صَوْتَكِ يُقَالُ فُلَانٌ بِمَرْأًى مِنِّىْ وَمَسْمَعٍ اَىْ بِحَيْثُ اَرَاهُ وَاَسْمَعُ قَوْلَهُ كَذَا فِى الصِّحَاحِ فَظَهَرَ فَسَادُ مَا قِيْلَ اِنَّ مَعْنَاهُ اَنْتِ بِمَوْضِعٍ تَرَيْنَ مِنْهُ سُعَادَ وَتَسْمَعِيْنَ كَلَامَهَا وَفَسَادُ ذٰلِكَ مِمَّا يَشْهَدُ بِهِ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ ـ

অনুবাদ : এবং একের পর এক ইযাফত হওয়া। যেমন কবির **কবিতার চরণ** : (যার অর্থ) **হে বিশাল প্রস্তরাকীর্ণ বালুময় স্থানের কবুতর! তুমি গান করো**। কেননা, তুমি সু'আদের দেখার এবং শোনার স্থানে অবস্থান করছ। এতে حَمَامَةٌ শব্দটিকে جَرْعٰى-এর দিকে ইযাফত করা হয়েছে। اَلْجَرْعٰى শব্দটিকে حَوْمَةٌ-এর দিকে ইযাফত করা হয়েছে এবং حَوْمَةٌ শব্দটিকে الجندل-এর দিকে ইযাফত করা হয়েছে। আর اَلْجَرْعٰى শব্দটি اَلْاَجْرَعُ-এর مؤنث। একে الف مقصورة দ্বারা লেখা হয়েছে ছন্দের প্রয়োজনে। আর এর অর্থ হলো বালুময় ভূমি, যা কোনো কিছু উৎপন্ন করে না। حَوْمَةٌ বলা হয়, কোনো জিনিসের বড় অংশকে। جَنْدَلٌ বলা হয় পাথুরে ভূমিকে। سَجْعٌ অর্থ– কবুতর ইত্যাদির সুরেলা ডাক বা গান। কবির বাক্য فَاَنْتِ بِمَرْأًى অর্থ– তুমি এমন স্থানে আছ যে, সু'আদ তোমাকে দেখছে এবং তোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন, فُلَانٌ بِمَرْأًى مِنِّىْ وَمَسْمَعٍ অর্থাৎ সে এমন স্থানে আছে যে, আমি তাকে দেখছি এবং তার কথা শুনতে পাচ্ছি। صحاح নামক অভিধানগ্রন্থে এরূপই লেখা রয়েছে। অতএব, এ ব্যাপারে যে ব্যাখ্যা কথিত আছে তার ভ্রান্তি প্রমাণিত হলো। সেই ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, তুমি এমন স্থানে রয়েছ যে, তুমি সু'আদকে দেখছ এবং তার কথা শুনতে পাচ্ছ। এর ভ্রান্তির ব্যাপারে যুক্তি ও বর্ণনা উভয়ের সমর্থন পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَتَتَابُعِ الْاِضَافَاتِ : تتابع শব্দের অর্থ একের পর এক বা ধারাবাহিক ভাবে। اضافات শব্দটি اضافة-এর বহুবচন। আরবিতে বহুবচনের জন্য কমপক্ষে তিন সংখ্যা লাগে। এখানে বহুবচন দ্বারা একের অধিক বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একের পর এক ইযাফত ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর। মুসান্নিফ تتابع اضافة-এর উদাহরণ প্রসঙ্গে আব্দুস সামাদ ইবনে মানসূর ইবনে হাসান ইবনে বাবুকের একটি শে'র পেশ করেছেন।

حَمَامَةُ جَرْعٰى حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ اِسْجَعِى * فَاَنْتِ بِمَرْأًى مِنْ سُعَادَ وَمَسْمَعٍ

حَمَامَةُ হলো منادى مضاف। এর حرف ندا এখানে উহ্য আছে। অতএব, حَمَامَةُ-এর মধ্যে نصب হবে। حَمَامَةُ অর্থ– মাদী কবুতর। جَرْعَاءُ শব্দটি أَجْرَعُ -এর مونث। এর শেষে همزة যুক্ত الف ممدودة ছিল; কিন্তু ছন্দের প্রয়োজনে তা লুপ্ত করে الف مقصوره দ্বারা লেখা হয়েছে। جَرْعَاءُ অর্থ– বালুময় সমতল ভূমি তথা মরুভূমি যেখানে কোনো ফসল

উৎপাদন হয় না। حَوْمَةٌ শব্দটি قَوْمَةٌ-এর ওজনে। অর্থ– কোনো বস্তুর বড় অংশ। جَنْدَلْ অর্থ– পাথুরে ভূমি। সিহাহ গ্রন্থে রয়েছে جَنْدَل (نون-এর উপর সাকিন) অর্থ– পাথর। আর جَنَدِل (نون-এর উপর যবর এবং دال-এর নিচে যের) অর্থ– পাথুরে ভূমি।

মুসান্নিফের ব্যাখ্যা আমাদের বর্ণনানুসারে সঠিক। তবে সিহাহ গ্রন্থের বর্ণনার সাথে মিলে না। কারণ, جندل অর্থ পাথর অথচ মুসান্নিফ তরজমা করেছেন পাথুরে ভূমি। এ দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য দেখাতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন, বাক্যে مجاز-এর ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ حَال (পাথর) বলে مَحَل (পাথুরে ভূমি) উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالسَّجْعُ هَدِيْرُ الْحَمَامِ وَنَحْوِهِ : অভিধানে سجع বলা হয় উটনী এবং কবুতরের আওয়াজকে এবং উভয় প্রাণীর আওয়াজের ক্ষেত্রে এটি حقيقت। আর هَدِيْر শব্দটি শুধু কুবতরের ডাকের ক্ষেত্রে حقيقت অর্থাৎ هدير-এর প্রকৃত অর্থ কবুতরের ডাক। আর উটনীর ডাক বা আওয়াজকে রূপকভাবে هَدِيْر বলা হয়। مَرَأى এবং مَسْمَع উভয়টি ইসমে যরফের সীগাহ। অর্থ– শোনার এবং দেখার স্থান। سعاد হলো প্রেমিকার নাম এবং এখানে مَسْمَع ও مَرَأى-এর فاعل। কারণ, সিহাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, مسمع ও مرأى-এর পর من (حرف جر)-এর مجرور তারকীবের মধ্যে مَسْمَع ও مَرَأى-এর ফায়েল হয়, মাফউল নয়। যেমন– فُلَانٌ بِمَرْأًى مِنِّىْ وَمَسْمَعٍ অর্থাৎ সে এমন স্থানে আছে যে, আমি তাকে দেখছি এবং তার কথা শুনতে পাচ্ছি।

قَوْلُهُ فَظَهَرَ فَسَادُ مَا قِيْلَ اِنَّ مَعْنَاهُ اَنْتِ بِمَوْضِعٍ تَرَيْنَ مِنْهُ سُعَادَ : মুসান্নিফ বলেন, আমাদের এ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কেউ কেউ শে'রটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা ভুল। আমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে শে'রটির তরজমা হলো– হে বিশাল প্রস্তরাকীর্ণ বালুময় ভূমির কবুতর! তুমি গান করো– কেননা, তুমি এমন স্থানে অবস্থান করছ যে, তোমাকে আমার প্রিয়া দেখছে এবং তোমার কথা শুনছে। তাদের মতে দ্বিতীয় অংশের তরজমা হলো– কেননা, তুমি এমন স্থানে অবস্থান করছ যে, তুমি সেখান থেকে সু'আদকে দেখছ এবং তার কথা শুনতে পাচ্ছ।

قَوْلُهُ وَفَسَادُ ذٰلِكَ مِمَّا يَشْهَدُ بِهِ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ তরজমা যে সঠিক নয় তা প্রমাণিত হয় বর্ণনা ও যুক্তি বিবেচনায়। বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার অর্থ হলো, মুসান্নিফ তার তরজমাকে প্রামাণ্য অভিধান গ্রন্থ সিহাহ-এর বর্ণনা দ্বারা সপ্রমাণ করেছেন। সুতরাং যে তরজমা তার তরজমার বিপরীত হবে তা সিহাহ-এর হবে। অতএব, সে তরজমা উক্ত বর্ণনা দ্বারা ভুল প্রমাণিত হলো। তা ছাড়া যুক্তিও তাদের এ তরজমাকে সমর্থন করে না। কেননা, একদিকে কবুতরকে বলা হচ্ছে তুমি গান গাও, অপর দিকে তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সে সু'আদের কথা শুনছে। অর্থাৎ কবুতর একই সাথে গান গাইবে আবার কথাও শুনবে যা বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের তরজমা অনুসারে কবুতরকে বলা উচিত ছিল তুমি চুপ করো এবং তার কথা শোনো। অতএব, তাদের এ তরজমা গ্রহণযোগ্য নয়।

বি. দ্র. এখানে কেউ কেউ বলে আল্লামা যাওযানী প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেকের মতে تتابع اضافات ফাসাহাতে কালামের জন্য ক্ষতিকর। বক্ষ্যমাণ ইবারতে কবি আব্দুস সামাদ ইবনে মানসূরের একটি শে'র দ্বারা تتابع اضافات-এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তা হলো :

حَمَامَةَ جَرْعٰى حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ اِسْجَعِىْ ٭ فَاَنْتِ بِمَرْأًى مِنْ سُعَادَ وَمَسْمَعٍ

وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ كُلًّا مِنْ كَثْرَةِ التَّكْرَارِ وَ تَتَابُعِ الْاِضَافَاتِ اِنْ ثَقُلَ اللَّفْظُ بِسَبَبِهِ عَلَى اللِّسَانِ فَقَدْ حَصَلَ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ بِالتَّنَافُرِ وَاِلَّا فَلَا يُخِلُّ بِالْفَصَاحَةِ كَيْفَ وَقَدْ وَقَعَ فِي التَّنْزِيْلِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ـ

অনুবাদ : তাদের এ মতে আপত্তি রয়েছে। কেননা كثرة التكرار (একাধিক তাকরার) এবং تتابع الاضافات (একের পর এক ইযাফত করে যাওয়া) উভয়টির কারণে যদি শব্দটি (-র উচ্চারণ) জিহ্বার জন্য কঠিন হয়ে যায় তাহলে এটি থেকে বিরত থাকা (তানাফুর থেকে বিরত থাকার) দ্বারাই সম্ভব। অন্যথা তা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকারক হবে না। আর কি করেই বা হবে? যখন স্বয়ং কুরআনেই এর উপমা বিদ্যমান : مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْحٍ (অর্থ নূহ সম্প্রদায়ের স্বভাবের ন্যায়) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ (আর তোমার প্রভুর তার বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করার আলোচনা) এবং وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا (অর্থ– প্রাণ এবং যিনি একে সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর কসম। অতঃপর তিনি সৎকর্ম এবং অসৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَفِيْهِ نَظَرٌ : মুসানিফ (র.) বলেন, ফাসাহাতে কালামের জন্য كَثْرَةُ التَّكْرَارِ এবং تَتَابُعِ اِضَافَات-এর থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত করার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এ ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি আছে। অর্থাৎ আমরা এ কথা মানি না যে, এ দু'টি বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আলাদাভাবে এ দু'টি বিষয়কে উল্লেখ করার দরকার আছে। কেননা, كَثْرَةُ التَّكْرَارِ এবং تَتَابُعِ اِضَافَات বাক্যের মধ্যে যদি কোনোরূপ উচ্চারণগত জড়তা সৃষ্টি করে যার দ্বারা বাক্যের বা শব্দের সাবলীলতা নষ্ট হয়ে যায়, তবে এ দু'টি তানাফুরের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তানাফুর থেকে মুক্ত হওয়ার শর্তের সাথে এগুলো থেকে বাক্য মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি এগুলো তানাফুরের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে এগুলো থাকার দ্বারা বাক্যের মধ্যে কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হবে না। কারণ, তখন সেগুলো ফাসাহাতে কালামের জন্য ক্ষতিকর বলে সাব্যস্ত হবে না। তা ছাড়া كَثْرَةُ التَّكْرَارِ এবং تَتَابُعِ اِضَافَات-এর উদাহরণ– ১. مِثْلُ دَأْبِ قَوْمِ نُوْحٍ এ আয়াতে مثل ইযাফত হয়েছে داب-এর দিকে, داب হয়েছে قوم-এর দিকে এবং قوم হয়েছে نوح-এর দিকে। ২. ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا এ আয়াতে ذكر-এর ইযাফত হয়েছে رحمة-এর দিকে, رحمة হয়েছে رب-এর দিকে এবং رب-এর হয়েছে ك-এর দিকে।

كَثْرَةُ التَّكْرَارِ-এর উদাহরণ :

قَوْلُهُ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا : এ আয়াতে "ها" সর্বনামের মধ্যে كَثْرَةُ التَّكْرَارِ হয়েছে। আয়াতগুলো দৃষ্টে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, كَثْرَةُ التَّكْرَارِ এবং تَتَابُعِ اِضَافَت সাধারণভাবে ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকারক নয়। যদি ক্ষতিকারক হতো, তাহলে পবিত্র কুরআনে এর ব্যবহার কিছুতেই হতো না। অতএব, যারা এ থেকে কালামকে মুক্ত করার শর্ত করেন, তাদের মতামত সঠিক নয়।

وَالْفَصَاحَةُ فِي الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ وَهِيَ كَيْفِيَّةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ وَالْكَيْفِيَّةُ عَرَضٌ لَايَتَوَقَّفُ تَعَقُّلُهُ عَلٰى تَعَقُّلِ الْغَيْرِ وَلَا يَقْتَضِي الْقِسْمَةَ وَاللَّا قِسْمَةَ فِي مَحَلِّهِ اِقْتِضَاءً اَوَّلِيًّا فَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْاَوَّلِ الْاَعْرَاضُ النِّسْبِيَّةُ مِثْلُ الْاِضَافَةِ وَالْفِعْلِ وَالْاِنْفِعَالِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَبِقَوْلِنَا لَايَقْتَضِي الْقِسْمَةَ اَلْكَمِّيَّاتُ وَبِقَوْلِنَا اللَّا قِسْمَةَ النُّقْطَةُ وَالْوَحْدَةُ وَقَوْلُنَا اَوَّلِيًّا لِيَدْخُلَ فِيهِ مِثْلُ الْعِلْمِ بِالْمَعْلُوْمَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْقِسْمَةِ اَوِ اللَّا قِسْمَةِ فَقَوْلُهُ مَلَكَةٌ اِشْعَارٌ بِاَنَّهُ لَوْ عَبَّرَ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِلَفْظٍ فَصِيْحٍ لَا يُسَمّٰى فَصِيْحًا فِي الْاِصْطِلَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ رَاسِخًا فِيهِ وَقَوْلُهُ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيْرِ عَنِ الْمَقْصُوْدِ دُوْنَ اَنْ يَقُوْلَ يُعَبِّرُ اِشْعَارٌ بِاَنَّهُ يُسَمّٰى فَصِيْحًا اِذَا وُجِدَ فِيهِ تِلْكَ الْمَلَكَةُ سَوَاءٌ وُجِدَ التَّعْبِيْرُ اَوْ لَمْ يُوْجَدْ وَقَوْلُهُ بِلَفْظٍ فَصِيْحٍ لِيَعُمَّ الْمُفْرَدَ وَالْمُرَكَّبَ اَمَّا الْمُرَكَّبُ فَظَاهِرٌ وَ اَمَّا الْمُفْرَدُ فَكَمَا تَقُوْلُ عِنْدَ التَّعْدَادِ دَارٌ غُلَامٌ جَارِيَةٌ ثَوْبٌ بِسَاطٌ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম– এমন একটি যোগ্যতা, مَلَكَةٌ হলো অন্তরে বদ্ধমূল একটি كَيْفِيَّةٌ বা অবস্থা, كَيْفِيَّةٌ হলো একটি 'আরয যা অনুধাবন করা অন্য কিছু অনুধাবন করার উপর নির্ভরশীল নয় এবং এটি প্রথম দাবি হিসেবে স্ব-স্থানে বিভক্তি এবং অবিভক্তিকে চায় না। প্রথম قيد (لَايَتَوَقَّفُ تَعَقُّلُهُ) দ্বারা বের হয়ে গেছে اَعْرَاض نَسَبِيَّة যেমন– اِضَافَة (সম্বন্ধ), فِعْل (ক্রিয়া) ও اِنْفِعَال (প্রতিক্রিয়া) ইত্যাদি। তারপর আমাদের বাক্য لَايَقْتَضِي الْقِسْمَةَ দ্বারা كَمِّيَّات সংখ্যা ইত্যাদি বের হয়ে গেছে এবং আমাদের বাক্য لَاقِسْمَةَ দ্বারা নুকতা (বিন্দু) এবং وحدة (একক, অণু) বের হয়ে গেছে। আমাদের শব্দ اَوَّلِيًّا বলা হয়েছে যেন তাতে عِلْمٌ بِالْمَعْلُوْمَاتِ যা বিভক্তি অথবা অবিভক্তি চায়, অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মূল লেখকের শব্দ مَلَكَةٌ ইঙ্গিত করছে যে, যদি কেউ তার কাঙ্ক্ষিত অর্থ শুদ্ধ-সাবলীল শব্দ দ্বারা আদায় করে তবু তাকে পরিভাষায় ফসীহ বলবে না, যে পর্যন্ত না তা তার মধ্যে বদ্ধমূল বা সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়। তার বাক্য– يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيْرِ عَنِ الْمَقْصُوْدِ (সে সক্ষম হবে কাঙ্ক্ষিত অর্থ আদায়ে) এ কথা বলা হয়নি যে, কাঙ্ক্ষিত অর্থ আদায় করবে। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তিকে ফসীহ বলা হবে, যার মধ্যে সেই যোগ্যতা আছে। চাই তার মধ্যে অর্থ ব্যক্তকরণ পাওয়া যাক বা না পাওয়া যাক। তার উক্তি بِلَفْظٍ فَصِيْحٍ (শুদ্ধ-সাবলীল কথায়) বলা হয়েছে, যাতে মুফরাদ এবং মুরাক্কাব উভয়কে শামিল করে। মুরাক্কাবের বিষয়টি তো স্পষ্ট। আর মুফরাদ বা একক শব্দও তুমি গণনা করার সময় বলে থাক বাড়ি, ক্রীতদাস, দাসী, কাপড় ও বিছানা ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْفَصَاحَةُ فِي الْمُتَكَلِّمِ : উল্লিখিত বাক্যে মূল লেখক ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। মুসান্নিফ (র.) তার সেই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করেছেন। মূল লেখকের সংজ্ঞা–

اَلْفَصَاحَةُ فِي الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيْرِ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِلَفْظٍ فَصِيْحٍ

অর্থাৎ ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম এমন এক যোগ্যতাকে বলা হয়, যার দ্বারা মুতাকাল্লিম শুদ্ধ-সাবলীল ভাষায় তার কাঙ্ক্ষিত অর্থ আদায়ে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হয়।

قَوْلُهُ مَلَكَةٌ وَهِيَ كَيْفِيَّةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ملكة-এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, هى كيفية অর্থাৎ অস্তিত্বশীল গুণ। উল্লেখ্য যে, তিনি كيفية বলেছেন, কিন্তু صفت বলেননি। এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি مَقُوْلَات عَشَرَة-এর মধ্য থেকে مَقُوْلَات كَيْف-এর অন্তর্ভুক্ত।

كيف মোট চার প্রকার। যথা–

১. اَلْكَيْفِيَّةُ الْمَحْسُوْسَةُ ২. اَلْكَيْفِيَّةُ الْكَمِّيَّاتُ ৩. اَلْكَيْفِيَّةُ النَّفْسَانِيَّةُ ৪. اَلْكَيْفِيَّةُ الْإِسْتِعْدَادِيَّةُ। আমাদের আলোচ্য ملكة তৃতীয় প্রকার তথা اَلْكَيْفِيَّةُ النَّفْسَانِيَّةُ-এর অন্তর্ভুক্ত। نفسانية বলা হয় যা প্রাণীজগতের সাথে, বিশেষভাবে নফস বা আত্মার সাথে সম্পর্কিত। যেমন– জীবন, অনুভূতি শক্তি, অজ্ঞতা, জ্ঞান, মনোগত স্বাদ ও মনোগত ব্যথা ইত্যাদি। এটি মনের মধ্যে راسخ বা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কেননা, মনের মধ্যে প্রথমত যে অবস্থার সৃষ্টি হয়; কিন্তু স্থায়ী হয় না তাকে حال বলা হয়। ব্যক্তি এ حال-কে দূর করতে সক্ষম হয়। যেমন– আনন্দ, ব্যথা, কষ্ট ও মুগ্ধতা ইত্যাদি। আর যখন মনের মধ্যে সে অবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তাকে দূর করা অসম্ভব হয়ে যায়, তখন তাকে ملكة বা যোগ্যতা বলা হয়। যখন যার মধ্যে এ যোগ্যতা হাসিল হবে সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী সেটাকে যেভাবে ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারে।

মুসান্নিফ رَاسِخٌ فِي النَّفْسِ বলেছেন, رَاسِخَةٌ فِي الْجِسْمِ বলেননি। কারণ, অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেই একে ملكة বলা হয়, পক্ষান্তরে শরীরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে একে كيفية বলে। যেমন– শুভ্রতা, এটা শরীরের মধ্যে বিদ্যমান, তাই একে كيفية বলবে।

قَوْلُهُ وَالْكَيْفِيَّةُ عَرَضٌ لَايَتَوَقَّفُ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ كيفية-এর সংজ্ঞা বর্ণনা শুরু করেছেন। সেই সংজ্ঞা জানার আগে কতিপয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি।

মুতাকাল্লিমীনের মতে বিশ্বের যাবতীয় অস্তিত্বশীল জিনিসকে প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সকল জিনিস অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব পেয়েছে এবং এক সময় তা আবার বিলীন-বিনাশ হয়ে যাবে তা দু' প্রকার ১. جَوْهَر ২. عَرَض। পরবর্তী প্রজন্মের দার্শনিকগণ عرض-কে নয় ভাগে ভাগ করেন। যথা– ১. كَمّ ২. كَيْف ৩. إِضَافَة ৪. مَتٰى ৫. أَيْنَ ৬. وَضْع ৭. مِلْك ৮. فِعْل ৯. إِنْفِعَال এ নয় প্রকার এবং جوهر-কে সম্মিলিতভাবে مَقُوْلَات عَشَرَة বলা হয়। مقول অর্থ– محمول অর্থাৎ কোনো জিনিস সম্পর্কে যদি কোনো কিছু বলা হয়, তাহলে এ বক্তব্য এ দশটির কোনো একটির মধ্যে গণ্য হবে। কেননা, দার্শনিকগণ এগুলোকে অস্তিত্বশীল জিনিসের জন্য أَجْنَاس عَالِيَه নির্ধারণ করেছেন। এরপর তারা এগুলোকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন– ১. نسبية ২. غيرنسبيه।

نسبيه বলা হয় যাকে বুঝার জন্য বা কল্পনা করার জন্য আরেকটি বস্তু বুঝার বা কল্পনা করার উপর নির্ভর করতে হয়। غير نسبيه বলা হয় যার মধ্যে তা করতে হয় না।

غير نسبيه তিনটি– ১. جوهر ২. كم ৩ كيف। এ ছাড়া বাকি সাতটি نسبيه।

১. جَوْهَر বলা হয় যা স্বয়ংসম্পূর্ণ বা নিজ সত্তার উপর অস্তিত্বশীল।

২. كَمّ বলা হয় ঐ 'আরযকে যা বিভক্তিকে গ্রহণ করে। كيف-এর সংজ্ঞা তো মুসান্নিফ নিজেই দিয়েছেন। যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা অচিরেই পেশ করবো। সাতটি نسبيه-এর সংজ্ঞা সংক্ষেপে এখানে প্রদান করা হলো।

৩. إِضَافَة বলা হয় ঐ 'আরযকে, যা কারো সাথে সম্পর্কিত হয় অন্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কের আলোকে। যথা পিতৃত্ব এবং পুত্র হওয়া ও মালিকানা ইত্যাদি। এখানে লক্ষণীয় যে, পিতৃত্বের প্রমাণের জন্য পুত্রের সম্পর্ক জরুরি, অন্যথা পিতৃত্ব প্রমাণ করা যাবে না।

৪. مَتٰى ঐ 'আরযকে বলা হয়, যা কাল বা সময়ের মধ্যে কোনো বস্তুর অবস্থানকে বুঝায়। যেমন– রোজা রমজান মাসে হয়।

৫. أَيْنَ - ঐ 'আরযকে বলা হয়, যা স্থান বা জায়গার মধ্যে কোনো বস্তুর বিদ্যমান হওয়াকে বুঝায়। যেমন- যায়েদ ঘরে অবস্থান করে।

৬. وَضْع ঐ 'আরযকে বলা হয়, যা একটি অবস্থা। এটি কোনো বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় তার কতক অংশ অন্যান্য অংশের প্রতি সম্পর্কিত হওয়ার ভিত্তিতে। যেমন হেলান দিয়ে বসা বা চিৎ হয়ে শোয়া, অথবা অন্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে।

৭. مِلْك ঐ 'আরযকে বলা হয় যা কোনো বস্তুকে পূর্ণ রূপে পরিব্যাপ্ত করা হিসেবে তার উপর বিরাজ করে এবং বস্তুটির স্থানান্তরের দ্বারা সেটিও স্থানান্তরিত হয়। যেমন- কোনো ব্যক্তির জামা অথবা পাগড়ি পরিধান করা। এখানে জামাটি তাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং ব্যক্তির স্থানান্তরের দ্বারা সেটিও স্থানান্তরিত হয়।

৮. فِعْل ঐ 'আরযকে বলা হয় যে, কোনো বস্তু অন্যের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা যতক্ষণ তা প্রভাব বিস্তার করে রাখে। যেমন, তাপ সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু অন্যকে উত্তপ্ত করে যতক্ষণ উত্তপ্ত করার মধ্যে থাকে। যেমন- আগুন পানি উত্তপ্ত করে যতক্ষণ জ্বলে।

৯. اِنْفِعَال কোনো বস্তুর অন্য থেকে প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা, বা অন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া। যেমন- পানি আগুন দ্বারা উত্তপ্ত হয় যতক্ষণ তা উত্তপ্ত থাকে।

১০. كَيْف সম্পর্কে মুসান্নিফ যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার প্রতি নজর দেওয়া যাক-

اَلْكَيْفِيَّةُ عَرَضٌ لَايَتَوَقَّفُ تَعَقُّلُهٗ عَلٰى تَعَقُّلِ الْغَيْرِ وَلَايَقْتَضِى الْقِسْمَةَ وَاللَّاقِسْمَةَ فِىْ مَحَلِّهٖ اِقْتِضَاءً اَوَّلِيًّا ـ

অর্থাৎ كيف এমন 'আরযকে বলা হয়, যার অনুধাবন অন্য কিছুর অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল নয় এবং এটি তার স্থানে প্রথম দাবি বা সত্তাগতভাবে বিভক্তি এবং অবিভক্তিকে চায় না।

মুসান্নিফের উক্ত সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এতে একটি جنس ও চারটি فصل আছে। তিনি فصل-কে قيد বা সীমাবদ্ধকারী বলেছেন। উল্লেখ্য যে, عرض থেকে সংজ্ঞা শুরু হয়েছে। আর الكيفية হচ্ছে معرف বা যার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

جنس ও فصل গুলো নিম্নরূপ : عرض হলো جنس। এটি সমস্ত 'আরযকে শামিল করে।

১ম ফস্ল : لَايَتَوَقَّفُ تَعَقُّلُهٗ عَلٰى تَعَقُّلِ الْغَيْرِ- তার এ বাক্যটি দ্বারা সংজ্ঞা থেকে أَعْرَاض نَسَبِيَه সাতটি বের হয়ে গেল। অর্থাৎ مَتٰى، وَضْع، مِلْك، فِعْل، اِنْفِعَال، اَيْنَ، اِضَافَةَ।

২য় ফস্ল : لَا يَقْتَضِى الْقِسْمَةَ - এ 'আরযটি দ্বারা كيف-এর সংজ্ঞা থেকে كم (যা এতক্ষণ অন্তর্ভুক্ত ছিল) বের হয়ে গেল। কেননা, كم স্বয়ং বিভক্তিকে গ্রহণ করে।

৩য় ফস্ল : وَاللَّاقِسْمَةَ এ অংশটি দ্বারা সংজ্ঞা থেকে نقطة এবং وحدة বের হয়ে গেল। কেননা, এ দু'টি অবিভক্তিকে গ্রহণ করে।

৪র্থ ফস্ল : اِقْتِضَاءً اَوَّلِيًّا - এ অংশটি সংজ্ঞা থেকে কোনো কিছুকে বের করার জন্য সংজ্ঞার সাথে যুক্ত হয়নি; বরং এর সংযুক্তি عِلْمٌ بِالْمَعْلُوْمَاتِ-কে كيفية-এর সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

قَوْلُهٗ اِقْتِضَاءً اَوَّلِيًّا অর্থ হলো لذاته বা সত্তাগতভাবে এবং অন্য বস্তুর সাথে সম্পর্কিত না করে। অর্থাৎ لَايَقْتَضِى الْقِسْمَةَ وَلَاعَدَمَهَا لِذَاتِهٖ এটি সত্তাগতভাবে বিভক্তি বা অবিভক্তি চায় না। وَاَمَّا بِالنَّظَرِ لِمُتَعَلِّقِهٖ فَقَدْ يَقْتَضِى الْقِسْمَةَ وَقَدْ يَقْتَضِى عَدَمَهَا অর্থাৎ আর তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে এটি কখনো বিভক্তিকে গ্রহণ করে, আবার কখনো অবিভক্তিকে গ্রহণ করে।

اِقْتِضَاءً اَوَّلِيًّا বুঝার পর আমরা দেখতে পাই যে, اَلْعِلْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْمَعْلُوْمَاتِ এমন একটি 'আরয যার অনুধাবন অন্য কিছুর অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল নয় এবং এটি বিভক্তি এবং অবিভক্তি কোনোটিকে সত্তাগতভাবে গ্রহণ করে না। কিন্তু তার معلومات-এর প্রতি লক্ষ্য করে কখনো বিভক্তিকে গ্রহণ করে, আবার কখনো অবিভক্তিকে গ্রহণ করে। যেমন- কোনো علم বা জ্ঞান একক কোনো বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হলে সে علم বা জ্ঞান বিভক্তি গ্রহণ করবে না। কিন্তু এটি সত্তা হিসেবে নয়; বরং সংশ্লিষ্ট বস্তুর সাহায্যে। পক্ষান্তরে علم টি যদি দু'বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে বিভক্তিকে গ্রহণ করবে। মোটকথা, اِقْتِضَاءً اَوَّلِيًّا-এর দ্বারা اَلْعِلْمُ بِالْمَعْلُوْمَاتِ ও كيفة-এর সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهٗ فِىْ مَحَلِّهٖ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সত্তা যার মাধ্যমে كيفية অস্তিত্বশীল হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, কোনো 'আরয তার অস্তিত্বের জন্য যে কোনো সত্তার উপর নির্ভরশীল। 'আরযের নিজস্ব বা পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই।

فَقَوْلُهٗ مَلَكَةٌ إِشْعَارٌ بِأَنَّهٗ لَوْ عَبَّرَ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলতে চেয়েছেন যে, লেখক ফাসাহাতে মুতাকাল্লিমের সংজ্ঞায় ملكة বা যোগ্যতা শব্দটি এনেছেন صفة শব্দটি আনেননি। এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত হয় যে, যদি কেউ তার কাঙ্ক্ষিত কথা শুদ্ধ-সাবলীল শব্দাবলির সাহায্যে উপস্থাপন করে তাহলেই সে مُتَكَلِّم فَصِيْح বা বিশুদ্ধ বক্তা হয়ে যাবে না, যে পর্যন্ত না তার মধ্যে শুদ্ধ-সাবলীল কথা বলার যোগ্যতা অর্জন হবে এবং তার মধ্যে বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সারকথা হলো, যোগ্যতাই ফসীহ হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য। যোগ্যতা ছাড়া কয়েকটি শুদ্ধ-সাবলীল কথা বললে সে ফসীহ হবে না।

وَقَوْلُهٗ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيْرِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, يقتدر শব্দটি ব্যবহার করেছেন يعبر শব্দটি ব্যবহার করেননি। এর দ্বারা লেখক এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে শুদ্ধ-সাবলীল কথায় মনের ভাব প্রকাশ করার যোগ্যতা থাকে, তাহলে সে ফসীহ হবে। ফসীহ হওয়ার জন্য প্রকাশ করা জরুরি নয়, চাই সে প্রকাশ করুক বা না করুক। তিনি যদি يعبر শব্দটি ব্যবহার করতেন তাহলে যোগ্যতা আছে এমন ব্যক্তিকে চুপ থাকা অবস্থায় ফসীহ বলা যেত না। কারণ, তখন তো ফসীহ হওয়ার জন্য প্রকাশ জরুরি হতো।

وَقَوْلُهٗ بِلَفْظٍ فَصِيْحٍ : এ কথার সাহায্যে মুসান্নিফ (র.) লেখকের لفظ শব্দটি ব্যবহার করার উপকারিতা এবং كلام শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন না– এর কারণ বর্ণনা করছেন।

তিনি বলছেন, লেখক كلام শব্দটি ব্যবহার না করে لفظ শব্দটি ব্যবহার করেছেন এ জন্য যে, كلام ব্যবহার করলে কারো কারো মনে এ ধারণা জন্মাতো যে, ফসীহ হতে হলে متكلم বা বক্তাকে তার মনের ভাব অবশ্যই শুদ্ধ-সাবলীল বাক্য দ্বারা প্রকাশ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। অথচ এটি অসম্ভব। কেননা, বক্তার কখনো তার মনের ভাব বা উদ্দেশ্য একক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যেমন– কোনো ব্যক্তি তার হিসাব সম্পূর্ণ করার জন্য হিসাব রক্ষকের কাছে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদির গণনা করতে গিয়ে এভাবে বলবে, বাড়ি, কাপড়, দাস-দাসী, বিছানা-পত্র ইত্যাদি।

لفظ শব্দটি একক ও যুক্ত শব্দ এবং বাক্য সব কিছুকেই শামিল করে। অতএব, لفظ-এর ব্যবহার করার কারণে কারো মনে এ ধরনের অমূলক ধারণা জন্মাবে না যে, مفردات বিশুদ্ধভাবে বললে মুতাকাল্লিমে ফসীহ হতে পারবে না; বরং একক শব্দের কথকও ফসীহের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

قَوْلُهٗ أَمَّا الْمُرَكَّبُ فَظَاهِرٌ : অর্থাৎ মুরাক্কাব শামিল হওয়ার উদাহরণ এবং এর ক্ষেত্রে প্রচুর। তাই এটিকে উদাহরণের সাহায্যে বুঝতে হবে না।

সার-সংক্ষেপ :

ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম বলা হয় বক্তার এমন এক যোগ্যতাকে, যার সাহায্যে সে উদ্দেশ্য ও মনের ভাবকে বিশুদ্ধ বাক্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

وَالْبَلَاغَةُ فِى الْكَلَامِ مُطَابِقَتُهُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ مَعَ فَصَاحَتِهِ اَىْ فَصَاحَةِ الْكَلَامِ وَالْحَالُ هُوَ الْاَمْرُ الدَّاعِىْ اِلَى اَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ الْكَلَامِ الَّذِىْ يُؤَدَّى بِهِ اَصْلُ الْمُرَادِ خُصُوصِيَّةً مَّا وَهُوَ مُقْتَضَى الْحَالِ مَثَلًا كَوْنُ الْمُخَاطَبِ مُنْكِرًا لِلْحُكْمِ حَالٌ تَقْتَضِىْ تَاكِيْدَ الْحُكْمِ وَالتَّاكِيْدُ مُقْتَضَى الْحَالِ وَقَوْلُكَ لَهُ اِنَّ زَيْدًا فِى الدَّارِ مُؤَكَّدًا بِاِنَّ كَلَامٌ مُطَابِقٌ لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَتَحْقِيْقُ ذٰلِكَ اَنَّهُ مِنْ جُزْئِيَّاتِ ذٰلِكَ الْكَلَامِ الَّذِىْ تَقْتَضِيْهِ الْحَالُ فَاِنَّ الْاِنْكَارَ مَثَلًا يَقْتَضِىْ كَلَامًا مُؤَكَّدًا وَهٰذَا مُطَابِقٌ لَهُ بِمَعْنٰى اَنَّهُ صَادِقٌ عَلَيْهِ عَلٰى عَكْسِ مَا يُقَالُ اِنَّ الْكُلِّىَّ مُطَابِقٌ لِلْجُزْئِيَّاتِ وَاِنْ اَرَدْتَّ تَحْقِيْقَ هٰذَا الْكَلَامِ فَارْجِعْ اِلٰى مَا ذَكَرْنَاهُ فِى الشَّرْحِ فِىْ تَعْرِيْفِ عِلْمِ الْمَعَانِىْ ـ

অনুবাদ : বালাগাতে কালাম বলা হয় কালাম বা বাক্য শুদ্ধ-সাবলীল হওয়ার পর مُقْتَضَى الْحَالِ (অবস্থার চাহিদা)-এর মোতাবেক ও অনুযায়ী হওয়াকে مَعَ فَصَاحَتِهِ অর্থ فَصَاحَة كَلَام (অর্থাৎ "ه" সর্বনামের مرجع হলো কালাম)। حال হলো ঐ বিষয় যা দাবি করে– যে বাক্য দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা হচ্ছে সে বাক্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা। সেই বৈশিষ্ট্য হলো مُقْتَضَى الْحَالِ। উদাহরণ স্বরূপ– শ্রোতার কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা হলো حال যা বিষয়টির জোর তাকিদ চায়। তাকিদটি হলো مُقْتَضَى الْحَالِ। আর অস্বীকারকারীকে (উদাহরণ স্বরূপ) তাকিদ সহকারে اِنَّ زَيْدًا فِى الدَّارِ বলা, তোমার এ কথা হলো এমন বাক্য, যা مقتضى حال-এর মোতাবেক হয়েছে।

এর বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, এ বাক্যটি ঐ বাক্যের একটি جزئى যাকে حال চায় বা দাবি করে। উদাহরণ স্বরূপ অস্বীকার তাকিদযুক্ত কালাম চায়। এ বাক্যটি ঐ বাক্যের মোতাবেক, অর্থাৎ এটি ঐ বাক্যের উপর প্রযোজ্য। (আমার এ ব্যাখ্যা) কথিত ব্যাখ্যার বিপরীত। (বলা হয়ে থাকে) كلى মোতাবেক হয় جزئيات-এর। তুমি যদি এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ (পাঠ করতে) চাও, তবে আমি ইলমে মা'আনীর সংজ্ঞার মধ্যে (আমার) ব্যাখ্যাগ্রন্থ (মুতাওয়াল)-এ সে আলোচনা করেছি, তা দেখতে পার।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْبَلَاغَةُ فِى الْكَلَامِ : এখান থেকে বালাগাতে কালামের সংজ্ঞা ও এর বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। লেখক বলেন, বালাগাতে কালাম বলা হয়– مُطَابَقَتُهُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ مَعَ فَصَاحَتِهِ অর্থাৎ কালাম مُقْتَضٰى حَال-এর অনুযায়ী হওয়া এবং একই সাথে কালাম ফসীহ হওয়া বা ফাসাহাতযুক্ত হওয়া। এখানে مُطَابَقَتُهُ দ্বারা فِى الْجُمْلَةِ উদ্দেশ্য। مطابقة تامة উদ্দেশ্য নয়। مُطَابَقَتُهُ فِى الْجُمْلَةِ অর্থ حال-এর একাধিক مقتضى থাকা অবস্থায় যদি কোনো একটি مقتضى-এর অনুযায়ী হয়, তাহলে فِى الْجُمْلَةِ-হয়ে যাবে। যেমন– حال দু'টি জিনিস চাচ্ছে– ১. تاكيد ২. تعريف। এমতাবস্থায় কালাম যদি শুধুমাত্র তাকিদযুক্ত আনা হয়, তবেই مُطَابَقَةٌ فِى الْجُمْلَةِ হয়ে গেল। আর যদি দু'টি বিষয় অনুযায়ী কালাম ব্যবহার হয়, তবে একে مُطَابَقَة تَامَّة বলা হবে। مُطَابَقَة تَامَّة হলে কালামটি বালাগাতের উচ্চ পর্যায়ে চলে যাবে। যেমন– আল্লাহ তা'আলার কালাম সব مقتضى-এর অনুযায়ী হয়ে থাকে। লেখকের সংজ্ঞায় তিনটি বিষয় এসেছে, যথা– ১. حال ২. مُقْتَضٰى حَال ৩. مُطَابَقَةُ مُقْتَضَى الْحَالِ। মুসান্নিফ (র.) এ তিনটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

حال সম্পর্কে বলেন, বক্তা তার কাঙ্ক্ষিত অর্থ আদায় করতে যে বাক্য ব্যবহার করে সে বাক্যে শ্রোতার অবস্থানুপাতে যে বৈশিষ্ট্য দাবি করা হলো উক্ত দাবিকে حال বলা হয়, যেমন শ্রোতা যায়েদের দণ্ডায়মান হওয়াকে অস্বীকার করেছে। শ্রোতার এ অস্বীকার বক্তাকে (যে زَيْدٌ قَائِمٌ বলবে) উদ্বুদ্ধ করছে যেন বক্তা যায়েদ দণ্ডায়মান এ কথার সাথে তাকীদযুক্ত করে জোরালোভাবে বলে اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ আমরা লক্ষ্য করছি যে, শ্রোতার অস্বীকার বক্তব্যটিকে জোরালো বা তাকিদযুক্ত করার দাবি জানাচ্ছে। সুতরাং শ্রোতার অস্বীকার হলো حال। আর যে বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করা হয়েছে (অর্থাৎ তাকিদযুক্ত বাক্য) তা হলো– مقتضى الحال। এরপর বক্তার তাকিদযুক্ত কালাম বা বাক্য যেমন– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ হলো– مُطَابَقَةُ مُقْتَضَى حَال।

قَوْلُهُ وَتَحْقِيْقُ ذٰلِكَ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, লেখকের বাহ্যিক বক্তব্য থেকে حال, مُقْتَضَى حَال ও مُطَابَقَةُ مُقْتَضَى حَال-এর উপরোক্ত সংজ্ঞাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আমাদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভিন্ন। নিম্নে এর আলোচনা করা হলো।

حال সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য তাই যা পূর্বে আলোচনা করা হলো। অর্থাৎ حال বলা হয় অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের দাবি করাকে। مُقْتَضَى حَال-এর ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো حال যে বৈশিষ্ট্য দাবি করে সেটিকে مُقْتَضَى حَال বলা হয় না; বরং مُقْتَضَى حَال বলা হয় حال-এর দাবিকৃত সেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক সামগ্রিক বাক্য كَلَام كُلِّي-কে আর مُطَابِق مُقْتَضَى حَال হলো বক্তার পক্ষ থেকে শ্রোতার সামনে পেশকৃত বাক্য অর্থাৎ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ। মুসান্নিফের বক্তব্য হলো اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ বাক্যটি হচ্ছে– তাকিদযুক্ত সামগ্রিক বাক্যের একটি جزئي যা কালামে কুল্লী বা তাকিদযুক্ত সামগ্রিক বাক্যের مُطَابِق হয়েছে। আর কালামে কুল্লী হলো مُطَابَقٌ তথা باء-এর উপর যবর দিয়ে। এ কথায় মুসান্নিফের গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ দাবি করে حال-এর চাহিদা অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যযুক্ত সামগ্রিক বাক্য مُقْتَضَى حَال আর বক্তার শ্রোতার সামনে পেশকৃত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বাক্য যেমন– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ বাক্যটি مُطَابِق مُقْتَضَى حَال।

মুসান্নিফের এ বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে, جزئي মোতাবেক হবে كلي-এর। অর্থাৎ كلي হলো مُطَابَق (اسم مفعول) আর جزئي হলো مُطَابِق (اسم فاعل) কিন্তু তার এ ব্যাখ্যাটি মানতিক বা তর্কশাস্ত্রের বিপরীত। কারণ, তাদের মতে كلي তার جزئي-এর مطابق হয়। অর্থাৎ كلي টি তার جزئي-এর উপর প্রয়োগ হয়। অতএব, এখানে এ প্রশ্নটি এসে যায় যে, মুসান্নিফ (র.) মানতিক বা তর্কশাস্ত্র-এর নীতি বিরুদ্ধ কাজ কেন করলেন ? এর জবাব হলো, মুসান্নিফ (র.) তর্কশাস্ত্রের সাথে জাহেরী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন। কেননা, লেখকের বক্তব্য হলো مُطَابَقَتُهُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ। এ বাক্যের مُطَابَقَتُهُ অংশে মাসদারকে তার ফায়েলের দিকে নিসবত করা হয়েছে। সুতরাং এটি مطابق (ইসমে ফায়েল)। আর مُقْتَضَى حَال যাকে মুসান্নিফ কালামে কুল্লী বলেছেন সেটিই مطابق (ইসমে মাফঊল)। অতএব, اِنَّ زَيْدًا فِى الدَّارِ- كَلَام جُزْئِي উদাহরণ স্বরূপ مُطَابِق (তথা ইসমে ফায়েল) আর مقتضى حال তথা কালামে কুল্লীকে مطابق তথা ইসমে মাফঊল বানিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন– هٰذَا اَىْ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ مُطَابِقٌ لَهُ اَىْ لِلْكَلَامِ الْكُلِّي الْمُؤَكَّدِ সবশেষে তিনি বলেন, আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ জানার জন্য অনুসন্ধানী জ্ঞানপিপাসুরা মুতাওয়াল অধ্যয়ন করতে পারেন।

সার-সংক্ষেপ :

ক. বালগাতে কালাম বা كَلَام بَلِيْغ বলা হয় এমন বাক্যকে যা বাক্য فصيح হওয়ার সাথে সাথে مُقْتَضَى حَال (স্থান-কাল ও পাত্র) অনুযায়ী হয়।

খ. حال বলা হয় এমন বিষয়কে, যা বাক্যের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করার দাবি করে।

গ. যে বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করার দাবি করা হয় তাকে مقتضى বলা হয়। যেমন শ্রোতা কর্তৃক সংবাদ অস্বীকার যা তাকিদযুক্ত বাক্য চায় তা হচ্ছে حال, আর তাকিদযুক্ত বাক্য হচ্ছে حال-এর مقتضى।

ঘ. মুসান্নিফ (র.)-এর ব্যাখ্যানুযায়ী বৈশিষ্ট্যযুক্ত كَلَام كُلِّيْ (সামগ্রিক বাক্য) হচ্ছে مُقْتَضَى الْحَالِ আর বক্তা কর্তৃক শ্রোতার সামনে পেশকৃত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বাক্য (যেমন– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ) হচ্ছে مُطَابِقُ مُقْتَضَى الْحَالِ।

وَهُوَ أَيْ مُقْتَضَى الْحَالِ مُخْتَلِفٌ فَإِنَّ مَقَامَاتِ الْكَلَامِ مُتَفَاوِتَةٌ لِأَنَّ الْاِعْتِبَارَ اللَّائِقَ بِهٰذَا الْمَقَامِ يُغَايِرُ الْاِعْتِبَارَ اللَّائِقَ بِذَاكَ وَهٰذَا عَيْنُ تَفَاوُتِ مُقْتَضَيَاتِ الْأَحْوَالِ لِأَنَّ التَّغَايُرَ بَيْنَ الْحَالِ وَالْمَقَامِ إِنَّمَا هُوَ بِحَسْبِ الْاِعْتِبَارِ وَهُوَ أَنَّهُ يُتَوَهَّمُ فِي الْحَالِ كَوْنُهُ زَمَانًا لِوُرُوْدِ الْكَلَامِ فِيْهِ وَفِي الْمَقَامِ كَوْنُهُ مَحَلًّا لَهُ وَفِيْ هٰذَا الْكَلَامِ إِشَارَةٌ إِجْمَالِيَّةٌ إِلَى ضَبْطِ مُقْتَضَيَاتِ الْأَحْوَالِ وَتَحْقِيْقٌ لِمُقْتَضَى الْحَالِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **আর এটি** অর্থাৎ মুকতাযায়ে হাল **বিভিন্ন ধরনের** । **কেননা, বাক্যের অবস্থানসমূহ** পার্থক্যপূর্ণ। কেননা, যে বিষয়টি এ অবস্থার জন্য উপযোগী তা ঐ অবস্থার জন্য উপযোগী বিষয়ের বিপরীত হবে। এটিই বিভিন্ন মুকতাযায়ে হালের পার্থক্য। কেননা, হাল এবং মাকামের পার্থক্য এ'তেবারী বিষয়। আর তা হচ্ছে, মনে করা হয় হাল হলো কালাম (বাক্য) বলার একটি সময়, আর মাকাম হলো বাক্য বলার স্থান। (সামনের) এই বাক্যে হালের বিভিন্ন মুকতাযার সীমাবদ্ধতার প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত রয়েছে এবং রয়েছে মুকতাযায়ে হালের বিশ্লেষণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ مُقْتَضَى الْحَالِ الخ : উল্লিখিত ইবারতের পর মুসান্নিফ (র.) হালের মুকতাযাগুলো তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ এবং মুকতাযায়ে হালের বিশ্লেষণ করবেন। উল্লিখিত ইবারতে সেই আলোচনারই একটি ভূমিকা পেশ করা হচ্ছে। তিনি বলছেন, হালের মুকতাযা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে । এর দলিল বা প্রমাণ কালামের স্থানসমূহ অর্থাৎ ঐ সকল বিষয় যা বাক্যের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং ইঙ্গিত বহনের দাবি করে বা বিভিন্ন ধরনের এবং পরস্পর পার্থক্যপূর্ণ। আর কালামের স্থানসমূহ বিভিন্ন হওয়ার কারণ হচ্ছে, একটি বৈশিষ্ট্য একটি স্থানের উপযোগী হলো– তো অন্য একটি স্থানের জন্য তা উপযোগী নয়; বরং অন্য স্থানটির জন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে হয়। যেমন– শ্রোতার অস্বীকারের ক্ষেত্রে তাকীদযুক্ত বাক্য ব্যবহার করা উচিত। আবার শ্রোতার এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকা অবস্থায় তাকিদ ছাড়া বাক্য ব্যবহার করা উচিত। আর এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, তাকিদ যা শ্রোতার অস্বীকারের বেলায় প্রযোজ্য, সেটি শ্রোতার সাধারণ অবস্থায় ব্যবহার করা অনুচিত। অতএব, مقتضى حال তথা তাকিদযুক্ত বাক্য এবং তাকিদ ছাড়া বাক্য পরস্পর যেমন বিপরীত তেমনি অস্বীকার এবং সাধারণ অবস্থার মাকাম পরস্পর বিপরীত।

মোটকথা, কালামের মাকাম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যা পরস্পর পার্থক্যপূর্ণ। যেমন– শ্রোতার অস্বীকার ও শ্রোতার সাধারণ অবস্থা। আর একথা সকলের জানা যে, حال এবং مقام সত্তাগতভাবে একই। তাদের মধ্যে অন্য হিসেবে সামান্য পার্থক্য রয়েছে।

তাহলে ফলাফল এই দাঁড়াচ্ছে যে, কালামের মাকাম যেমন বিভিন্ন ধরনের তেমনি মুকতাযায়ে হালও বিভিন্ন ধরনের।

হাল ও মাকামের পার্থক্য : হাল এবং মাকাম বা অবস্থান বলা হয় ঐ বিষয়কে যার দাবি হলো– বক্তা যেন তার কথায় উদ্দেশ্যের সাথে অতিরিক্ত একটি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে, কিন্তু এ দু'টির মাঝে পার্থক্য হলো এই যে, এ বিষয়টিকে যদি বক্তার কথার কাল ধরা হয় তাহলে একে حال বলা হয়। আর যদি বিষয়টিকে বক্তার কথার ক্ষেত্র ধরা হয়, তাহলে একে মাকাম বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি বক্তার কথার কালও নয়, আবার স্থানও নয়; বরং এটা এক ধরনের ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাই হাল ও মাকাম পরস্পর একই সংজ্ঞার অধীন একই জিনিস যা দু' নামে ব্যবহৃত হয়েছে, এ কারণেই يتوهم বলা হয়েছে। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, লেখক সামনের বাক্যগুলোতে মুকতাযায়ে হাল যে তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ এর আলোচনা এবং মুকতাযায়ে হালের বিশ্লেষণ করেছেন।

সার-সংক্ষেপ : ক. বাক্যসমূহের مقتضى حال বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কারণ, বাক্য বা কথা উপস্থাপন করার স্থান-কাল ও পাত্র বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

খ. حال ও مقام শব্দদ্বয়ের মর্মার্থ একই। তবে এ দু'য়ের মাঝে এভাবে পার্থক্য বর্ণনা করা যেতে পারে যে, কথা বলার কালকে حال আর কথা বলার স্থানকে مقام বলা হয়।

فَمَقَامُ كُلٍّ مِنَ التَّنْكِيْرِ وَالْاِطْلَاقِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالذِّكْرِ يُبَايِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ اَىْ خِلَافِ كُلٍّ مِنْهَا يَعْنِىْ اَنَّ الْمَقَامَ الَّذِىْ يُنَاسِبُهُ تَنْكِيْرُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ اَوِ الْمُسْنَدِ يُبَايِنُ الْمَقَامَ الَّذِىْ يُنَاسِبُهُ التَّعْرِيْفُ وَمَقَامُ اِطْلَاقِ الْحُكْمِ اَوِ التَّعَلُّقِ اَوِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ اَوِ الْمُسْنَدِ اَوْ مُتَعَلَّقِهِ يُبَايِنُ مَقَامَ تَقْيِيْدِهِ بِمُؤَكِّدٍ اَوْ اَدَاةِ قَصْرٍ اَوْ تَابِعٍ اَوْ شَرْطٍ اَوْ مَفْعُوْلٍ اَوْ مَا يُشْبِهُ ذٰلِكَ وَمَقَامُ تَقْدِيْمِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ اَوِ الْمُسْنَدِ اَوْ مُتَعَلِّقَاتِهِ يُبَايِنُ مَقَامَ تَاخِيْرِهِ وَكَذَا مَقَامُ ذِكْرِهِ يُبَايِنُ مَقَامَ حَذْفِهِ فَقَوْلُهُ خِلَافِهِ شَامِلٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ـ

অনুবাদ : **নাকেরা (অনির্দিষ্টতা), ইতলাক (সাধারণ হুকুম বা কয়েদহীনতা), তাকদীম (যথাস্থানের আগের ব্যবহার) এবং যিকর (উল্লেখ করা) প্রত্যেকটি তার বিপরীত বিষয়ের মাকামের সাথে পার্থক্যপূর্ণ হবে।** অর্থাৎ প্রত্যেকটি তার বিপরীতের সাথে পার্থক্যপূর্ণ। তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন, যে স্থানটির জন্য মুসনাদ ইলাইহ (উদ্দেশ্য) অথবা মুসনাদ (বিধেয়) অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক হওয়া সমীচীন। সেটি বিপরীত হবে ঐ স্থানের যেখানে মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ) নির্দিষ্টজ্ঞাপক হওয়া সমীচীন। এমনিভাবে হুকুম অথবা তা'আল্লুক (সম্পর্ক) অথবা মুসনাদ ইলাইহ অথবা মুসনাদ অথবা মুসনাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়, মুতলাক (সাধারণ قيد বিহীন) হওয়া ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে এগুলো قيد যুক্ত হবে তাকীদকারী দ্বারা, অথবা কসরের অক্ষর দ্বারা, অথবা তাবে' দ্বারা, অথবা শর্ত দ্বারা কিংবা মাফঊল দ্বারা বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা, আর (এমনিভাবে) মুসনাদ ইলাইহ অথবা মুসনাদ নতুবা মুসনাদের মুতা'আল্লিক যথাস্থানের আগে আসা ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে এগুলো পরে আসে এবং তেমনি উল্লেখ থাকা উহ্য থাকার বিপরীত। তার শব্দ خلافه এ সবকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ فَمَقَامُ كُلٍّ مِنَ التَّنْكِيْرِ الخ : আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি, 'মুকতাযায়ে হাল' তিন প্রকার فَمَقَامُ كُلٍّ مِنَ التَّنْكِيْرِ বলে লেখক এখানে প্রথম প্রকারের আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, ذِكْر، اِطْلَاق، تَنْكِيْر، تَقْدِيْم এবং এদের প্রত্যেকটির মাকাম প্রত্যেকটির বিপরীত বিষয়ের মাকামের খেলাফ। এ কথার বিশ্লেষণ এরূপ যে, উদাহরণ স্বরূপ যে স্থানে মুসনাদ ইলাইহ (উদ্দেশ্য)-কে অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক ব্যবহার করা সমীচীন। যথা– جَاءَ رَجُلٌ অথবা رَجُلٌ فِى الدَّارِ قَائِمٌ এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টজ্ঞাপক আনা সমীচীন। যথা– جَاءَ خَالِدٌ অথবা خَالِدٌ عَالِمٌ

এমনিভাবে যে স্থানটিতে মুসনাদ অনির্দিষ্টজ্ঞাপক আনা সমীচীন। যেমন– خَالِدٌ فَاضِلٌ এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে মুসনাদকে নির্দিষ্ট আনা সমীচীন। যেমন– اَللّٰهُ اِلٰهُنَا এমনিভাবে যেখানে হুকুম (বিষয়) মুতলাক অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে বিষয়টি মুতলাক নয়; বরং কোনো তাকিদ দ্বারা قيد যুক্ত। যেমন– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ অথবা কসরের শব্দ দ্বারা قيد যুক্ত। যেমন– مَا زَيْدٌ اِلَّا قَائِمًا এবং اِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ

প্রকাশ থাকে যে, হুকুম বলা হয় ঐ বিষয়কে যা মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ-এর মধ্য থেকে পাওয়া যায়। আর এ হুকুমের কারণেই মুসনাদ (বিধেয়) محكوم به ও তার উদ্দেশ্য مَحْكُوْم عَلَيْهِ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এমনিভাবে যেখানে মুসনাদের تعلق অর্থাৎ মুসনাদের مفعول-এর সাথে মুসনাদের সম্পর্ক মুতলাক (সাধারণ) সেটি ঐ স্থানের বিপরীত যেখানে তা কোনো قيد যুক্ত আছে। যেমন– اِضْرِبْ زَيْدًا এখানে ضرب বা মুসনাদের সাথে তার معمول (زَيْدًا)-এর সম্পর্ক সাধারণ, এতে কোনো قيد নেই। আবার لَاَضْرِبَنَّ زَيْدًا এখানে মুসনাদ ضرب-এর সাথে তার معمول (زَيْدًا)-এর সম্পর্ক তাকিদের দ্বারা قيد যুক্ত। অথবা সেটি কসরের শব্দ দ্বারা قيد যুক্ত, যেমন– مَا ضَرَبْتُ اِلَّا زَيْدًا

এমনিভাবে যেখানে মুসনাদ ইলাইহ تابع (যথা– তাকিদ, সিফাত, বদল ইত্যাদি) থেকে মুক্ত সেটি ঐ স্থানের বিপরীত যেখানে تابع আছে। যেমন– ১. زَيْدٌ قَائِمٌ ২. زَيْدُ الْعَالِمُ قَائِمٌ হুবহু এ বিষয়টি মুসনাদের দ্বারাও হতে পারে। অর্থাৎ যেখানে বিধেয়ের মুতাআল্লিক تابع থেকে মুক্ত। যেমন– زَيْدٌ ضَارِبٌ رَجُلًا এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে বিধেয়ের মুতাআল্লিক تابع দ্বারা যুক্ত। যেমন– زَيْدٌ ضَارِبٌ رَجُلًا طَوِيْلًا এ স্থানে একটি বিষয় জেনে নেওয়া দরকার যে, তাকিদকারী, কসরের শব্দসমূহ, তাবে'সমূহ, শর্ত, মাফউল, হাল এবং তামঈয প্রত্যেকটি দ্বারা হুকুম তা'আল্লুক, মুসনাদ ইলাইহ, মুসনাদ এবং মুসনাদের মুতাআল্লিককে قيد যুক্ত করা যায় না; বরং বিষয়টি বিশ্লেষণের দাবি রাখে,

এক. তাকিদকারী এবং কসরের শব্দ দ্বারা দু'টি বিষয়কে قيد যুক্ত করা যায়– ক. حكم বা বিষয়, খ. তা'আল্লুক।

দুই. تابع (অনুবর্তী ও অনুগামী)-এর দ্বারা মুসনাদ ইলাইহ, মুসনাদ এবং মুসনাদের মুতা'আল্লিক (যথা– মাফউল ইত্যাদি) قيد যুক্ত করা হয়।

তিন. شرط দ্বারা কেবল মুসনাদকে কয়েদযুক্ত করা হয়। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ সবগুলো সব বিষয় দ্বারা قيد যুক্ত হতে পারে না। شرط-এর ব্যাপারে ব্যাখ্যা হলো, যেখানে মুসনাদকে শর্ত থেকে মুক্ত রাখা (মুতলাক রাখা) হয়, যেমন– خَالِدٌ قَائِمٌ এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে মুসনাদকে শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়। যেমন– خَالِدٌ قَائِمٌ إِنْ قَامَ عَمْرٌو

চার. মাফউল দ্বারা মুসনাদ ইলাইহ, মুসনাদ এবং মুসনাদের মুতা'আল্লিককে কয়েদযুক্ত করা হয়। অতএব, যেখানে এ তিনটি বিষয় মাফউলের দ্বারা কয়েদযুক্ত নয়, তা ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে তা মাফউল দ্বারা কয়েদযুক্ত।

উদাহরণ : ১. زَيْدٌ ضَارِبٌ ২. زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرًا দ্বিতীয় উদাহরণে মাফঊল দ্বারা মুসনাদকে قيد যুক্ত করা হয়েছে, প্রথম উদাহরণে তা নেই।

قَوْلُهُ وَمَا يُشْبِهُ ذٰلِكَ : অর্থ– এ জাতীয় আরো যা আছে, এর দ্বারা মুসান্নিফ (র.) حال এবং تمييز-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। উল্লেখ্য যে, কেবল মুসনাদ ইলাইহ এবং মুসনাদের বিশেষ মুতা'আল্লিক অর্থাৎ মাফউলকে حال এবং تمييز দ্বারা কয়েদযুক্ত করা যায়। অতএব, যেখানে حال এবং تمييز দ্বারা মুসনাদ ইলাইহ কয়েদযুক্ত নেই, যেমন– ذَهَبَ زَيْدٌ এবং طَابَ رَاشِدٌ এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে حال এবং تمييز দ্বারা কয়েদযুক্ত করা হয়েছে। যেমন– ذَهَبَ زَيْدٌ رَاكِبًا এবং طَابَ رَاشِدٌ نَفْسًا। এমনিভাবে যেখানে মাফউল حال ও تمييز দ্বারা কয়েদযুক্ত হয়নি, যেমন– إِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ এবং بِعْتُ عِشْرِيْنَ (আমি ঘোড়া ক্রয় করেছি এবং বিক্রয় করেছি বিশটি।) এ দু'টি ঐ দু'স্থানের বিপরীত, যেখানে কয়েদযুক্ত করা হয়েছে। যেমন– إِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ مُسْرَجًا ও بِعْتُ عِشْرِيْنَ غُلَامًا

পাঠক অবশ্য উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝতে পারছেন যে, সবকিছু দ্বারা সবকিছুকে কয়েদ করা যায় না। বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা সকলেই তা বুঝতে পারছেন। বিস্তারিত আলোচনা না করলে হয়তো তা বুঝা যেতো না। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেস্থানে মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা সমীচীন, যেমন– رَاشِدٌ جَاهِلٌ সেটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে মুসনাদ ইলাইহকে পরে আনা সমীচীন, যেমন– فِى الدَّارِ رَاشِدٌ এমনিভাবে যেখানে মুসনাদকে আগে আনা সমীচীন, যেমন– قَامَ زَيْدٌ তা ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে তাকে পরে আনা সমীচীন, যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ। এমনিভাবে মুসনাদের মুতাআল্লিককে যেস্থানে আগে আনা সমীচীন, যেমন– زَيْدًا ضَرَبْتُ সেটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে তা পরে আনা সমীচীন, যেমন– ضَرَبْتُ زَيْدًا তারপর মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেখানে মুসনাদ ইলাইহ, মুসনাদ এবং মুসনাদের মুতা'আল্লিককে উল্লেখ করা সমীচীন, তা ঐ স্থানের বিপরীত যেখানে সেটিকে উল্লেখ না করা সমীচীন। মূল লেখকের শব্দ خلافه প্রত্যেকটির বিপরীত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নাকেরার বিপরীত মা'রেফা (নির্দিষ্টজ্ঞাপক) মুতলাকের বিপরীত تقييد আর تقديم-এর বিপরীত تاخير (পরে আনা) এবং উল্লেখ করার বিপরীত হলো উহ্য রাখা ইত্যাদি।

وَاِنَّمَا فَصَلَ قَوْلَهُ وَمَقَامُ الْفَصْلِ يُبَايِنُ مَقَامَ الْوَصْلِ تَنْبِيْهًا عَلٰى عِظَمِ شَانِ هٰذَا الْبَابِ وَاِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِهٖ لِاَنَّهٗ اَخْصَرُ وَ اَظْهَرُ لِاَنَّ خِلَافَ الْفَصْلِ اِنَّمَا هُوَ الْوَصْلُ وَلِلتَّنْبِيْهِ عَلٰى عِظَمِ الشَّانِ فَصَلَ قَوْلَهُ وَمَقَامُ الْاِيْجَازِ يُبَايِنُ مَقَامَ خِلَافِهٖ اَيِ الْاِطْنَابِ وَالْمُسَاوَاةِ وَكَذَا خِطَابُ الذَّكِيِّ مَعَ خِطَابِ الْغَبِيِّ فَاِنَّ مَقَامَ الْاَوَّلِ يُبَايِنُ مَقَامَ الثَّانِىْ فَاِنَّ الذَّكِيَّ يُنَاسِبُهٗ مِنَ الْاِعْتِبَارَاتِ اللَّطِيْفَةِ وَالْمَعَانِى الدَّقِيْقَةِ الْخَفِيَّةِ مَا لَايُنَاسِبُ الْغَبِيَّ وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَ صَاحِبَتِهَا اَىْ مَعَ كَلِمَةٍ اُخْرٰى مُصَاحِبَةٍ لَهَا مَقَامٌ لَيْسَ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ مَعَ مَا يُشَارِكُ تِلْكَ الصَّاحِبَةَ فِىْ اَصْلِ الْمَعْنٰى مَثَلًا اَلْفِعْلُ الَّذِىْ قُصِدَ اِقْتِرَانُهٗ بِالشَّرْطِ فَلَهٗ مَعَ اِنْ مَقَامٌ لَيْسَ لَهٗ مَعَ اِذَا وَكَذَا لِكُلِّ كَلِمَةٍ مِنْ اَدَوَاتِ الشَّرْطِ مَعَ الْمَاضِىْ مَقَامٌ لَيْسَ لَهٗ مَعَ الْمُضَارِعِ وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ ـ

অনুবাদ : মুসান্নিফ তাঁর বাক্য وَمَقَامُ الْفَصْلِ يُبَايِنُ مَقَامَ الْوَصْلِ (এবং পৃথক-বিচ্ছিন্ন স্থান মিলিত স্থানের বিপরীত) টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন, এ পরিচ্ছেদের বিশেষ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। আর (এখানে) مَقَام خِلَافه এ কথাটি বলেননি (যেমন পূর্বে বলেছিলেন)। কেননা, এর বিপরীত বিষয়টি খুব সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্টতর। কারণ, فصل-এর বিপরীত وصل। তদ্রূপ বিশেষ তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে তার বাক্য وَمَقَامُ الْاِيْجَازِ يُبَايِنُ مَقَامَ خِلَافِهٖ اَيِ الْاِطْنَابِ وَالْمُسَاوَاةِ (এবং বাক্যের সংক্ষেপণের বিষয়টি তার বিপরীত বিষয় তথা ইত্নাব-বাক্যের দীর্ঘতা এবং মুসাওয়াত-ভাবের সমমাত্রিকতা-এর সাথে বৈপরীত্য রাখে। **এমনিভাবে মেধাবীর প্রতি সম্বোধন নির্বোধের প্রতি সম্বোধনের বিপরীত**। নিশ্চয়ই প্রথমটির অবস্থা দ্বিতীয়টির অবস্থার বিপরীত। কেননা, মেধাবীকে বিশেষ সূক্ষ্ম বিষয় এবং তথ্যপূর্ণ-রহস্যপূর্ণ বিষয় সহকারে সম্বোধন করা হয়, যা নির্বোধের জন্য সমীচীন নয়। **প্রত্যেকটি শব্দ তার সাথে বিশেষভাবে মিলিত শব্দের যে অবস্থা,** তা ঐ শব্দের সমার্থক শব্দ আরেক শব্দের সাথে সম্মিলিত অবস্থা থেকে ভিন্ন, উদাহরণ স্বরূপ যে ফে'লটিকে শর্তের সাথে মিলানোর ইচ্ছা করা হয়েছে সেটির اِنْ-এর সাথের অবস্থা اِذَا-এর সাথের অবস্থার অমিল, এমনিভাবে শর্তের শব্দগুলোর ফে'লে মাযী (অতীতকাল)-এর সাথের অবস্থা মুযারের সাথে ঐ শর্তের শব্দগুলোর অবস্থা সেরূপ নয়, এর উপর অন্যান্যগুলোকে কিয়াস করে নিন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا فَصَلَ قَوْلَهٗ وَمَقَامُ الْفَصْلِ : এখান থেকে মূল লেখক মুকতাযায়ে হালের দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা শুরু করেছেন। দ্বিতীয় প্রকার হলো মুকতাযায়ে হাল, যখন দু'টি বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। দু'টি বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখা অবস্থায় মুকতাযায়ে হাল বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। মূল লেখক বলেছেন, যে স্থানটিতে ফসল অর্থাৎ একটি বাক্যকে আরেকটি বাক্যের সাথে আত্ফ বা সংযুক্ত না করে ব্যবহার করা হয়, তা ঐ স্থানের বিপরীত যেখানে দু'টি বাক্যের মধ্যে আতফ করা হয়।

এখানে মুসান্নিফ প্রথমে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখক فصل-কে তার পূর্বের আলোচনার সাথে কেন যুক্ত করলেন না, তিনি যদি এভাবে বলে দিতেন- فَمَقَامُ كُلٍّ مِنَ التَّنْكِيْرِ وَالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالذِّكْرِ وَالْفَصْلِ يُبَايِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ তাহলেই তো চলত; কিন্তু তা না করে তিনি مَقَامُ الْفَصْلِ বলে পৃথকভাবে বিষয়টি কেন উল্লেখ করলেন? এর উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, تَنْبِيْهًا عَلٰى عِظَمِ شَانِ هٰذَا الْبَابِ অর্থাৎ লেখক فصل এবং وصل-এর আলোচনা পৃথকভাবে করেছেন وصل এবং فصل-এর অধ্যায় বালাগাতের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ববহ হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِهِ : এ বাক্য দ্বারাও মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো- লেখক পূর্বের অনুসরণ করত مَقَامَ خِلَافِهِ বললেই তো পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে مَقَامَ الْوَصْلِ কেন বললেন এবং পূর্বের রীতি কেন বর্জন করলেন? এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে কোনো বিষয়কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে নিয়ম, কিন্তু পূর্বের আলোচনাতে তিনি مَقَامَ خِلَافِهِ বলে সে রীতি ভঙ্গ করেছেন তার বাক্য দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে এ ভয়ে এবং সংক্ষেপে বক্তব্য প্রদানের উদ্দেশ্যে (তা করেছিলেন)। কিন্তু مَقَامَ خِلَافِهِ-এর চেয়ে مَقَامَ الْوَصْلِ-এর মধ্যে সংক্ষেপণ বেশি দু'ভাবে- ১. خلافه-এর মধ্যে দু'টি শব্দ مضاف এবং مضاف اليه ২. خلافه-এর মধ্যে অক্ষর পাঁচটি। পক্ষান্তরে الوصل-এর মধ্যে শব্দ একটি এবং همزء وصل-কে বাদ দিলে এতে অক্ষর হয় চারটি। কারণ, همزه وصل পড়ার মধ্যে আসে না। দ্বিতীয়ত মুসান্নিফ (র.) বলছেন, مَقَامَ خِلَافِهِ-এর চেয়ে مَقَامَ الْوَصْلِ-এর মধ্যে বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে বেশি, কেননা خلافه বললে তো وصل ছাড়া অন্য কিছুর ভাবনা আসে; কিন্তু مَقَامَ الْوَصْلِ বলা হলে বুঝা যায় فصل-এর বিপরীত কেবল وصل-ই রয়েছে অন্য কিছু নেই এবং বাস্তবতাও তাই অর্থাৎ فصل-এর বিপরীত কেবল وصل-ই।

قَوْلُهُ وَلِلتَّنْبِيْهِ عَلٰى عِظَمِ الشَّانِ : এখান থেকে মুকতাযায়ে হালের তৃতীয় প্রকারের আলোচনা শুরু হয়েছে। তৃতীয় প্রকার হলো যা এক বাক্যের কোনো অংশের সাথে খাস নয় এবং দু'টি বাক্যের সাথেও খাস নয়; বরং উভয়ের সাথেই সম্পর্ক রাখে। তৃতীয় প্রকারের আলোচনা লেখক এভাবে শুরু করেছেন- مَقَامُ الْاِيْجَازِ يُبَايِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ মুসান্নিফ (ব্যাখ্যাকার) لِلتَّنْبِيْهِ عَلٰى عِظَمِ شَانٍ বলে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, وصل এবং فصل-এর মতো লেখক পৃথকভাবে اِيْجَاز وَاِطْنَاب-এর আলোচনা কেন করলেন? উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূলত দু'টি কারণে এর আলোচনা পৃথকভাবে করা হয়েছে- ১. প্রথমত এ অধ্যায়ের আলোচনা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য এর আলোচনা পৃথকভাবে করেছেন, ২. ইতঃপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, এটি মুকতাযায়ে হালের তৃতীয় প্রকার। আর একটি ভিন্ন প্রকারকে পৃথকভাবে আলোচনা করাই সমীচীন। তাই তিনি এর আলোচনা পৃথকভাবে করেছেন। এখানে যে আলোচনাটি করা হয়েছে তার বিবরণ মূলত এরূপ- বাক্য সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে- ভাবের চেয়ে বাক্যের দীর্ঘতা বেশি, ভাবের সমমাত্রিক বাক্য ও সংক্ষিপ্ত বাক্য। ১. (اطناب) তথা ভাবের চেয়ে বাক্যের দীর্ঘতা তখন সাব্যস্ত হয়, যখন বাক্যের মধ্যে মূল বক্তব্যের চেয়ে অতিরিক্ত কথা থাকে। তবে অতিরিক্ত কথার দ্বারা উপকার পাওয়া যায়, অতিরিক্ত কথা অনর্থক নয়। ২. (مساواة) ভাব ও বাক্যের সমমাত্রিকতা তখন সাব্যস্ত হয়, যখন প্রয়োজনের চেয়ে কমও না হয়, আবার বেশিও না হয়; বরং প্রয়োজন অনুপাতেই শব্দাবলি থাকে।

(ايجاز) তথা বক্তব্যের চেয়ে বাক্যের হ্রস্বতা তখন সাব্যস্ত হয়, যখন কোনো বাক্যের বক্তব্য বুঝাতে প্রয়োজনের চেয়ে কম শব্দ ব্যবহার করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এ তিন প্রকারের অবস্থা পরস্পর ভিন্ন, একটির সাথে অপরটির সামঞ্জস্য নেই। তাই লেখক বলেছেন,

قَوْلُهُ وَمَقَامُ الْاِيْجَازِ يُبَايِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ : অর্থাৎ বাক্যের সংক্ষেপণের বিষয়টি তার বিপরীত তথা ইতনাব (বক্তব্যের চেয়ে বাক্যের দীর্ঘতা) এবং مساوات (ভাব ও বাক্যের সমমাত্রিকতা)-এর মাকামের সাথে ভিন্নতা বজায় রাখে। এরপর তিনি বলেছেন, এমনিভাবে মেধাবীর প্রতি সম্বোধন এবং নির্বোধের প্রতি সম্বোধন-এর পরস্পরের অবস্থা ভিন্ন, কেননা, প্রথমটি (অর্থাৎ মেধাবীর প্রতি সম্বোধন)-এর মাকাম দ্বিতীয়টির (অর্থাৎ নির্বোধের প্রতি সম্বোধন) মাকামের বিপরীত। কেননা, মেধাবীর জন্য সূক্ষ্ম বিষয়াদি, রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিতবহ কথা বলা উচিত; কিন্তু নির্বোধের ক্ষেত্রে এসব বিষয় বলা অনর্থক এবং বোকামি।

قَوْلُهُ وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَ صَاحِبَتِهَا : এখান থেকে লেখক আরেকটি বিষয়ের মাধ্যমে মুকতাযায়ে হাল-এর বিভিন্ন অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একটি শব্দ তার সাথে আসা, অপর একটি শব্দের দ্বারা যে অবস্থা সৃষ্টি হয় সেই শব্দের সাথে আগের শব্দের সমার্থবোধক বা সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকটি শব্দ মিললে তার অবস্থা ভিন্ন হবে। যেমন– فعل একটি কালিমা। এর সাথে إن (حرف شرط)-এর যে মাকাম (شرطية) إذا-এর সাথে তার মাকাম ভিন্ন। এখানে আমরা দেখছি যে, ان ও اذا যদিও উভয়টি شرط-এর অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু তার পরেও দু'টির দু'অবস্থা। কেননা, ان (حرف شرط) অনিশ্চিত-এর অর্থ দেয় আর اذا নিশ্চয়তার অর্থ প্রদান করে, তাই ان-এর অবস্থান اذا-এর অবস্থানের চেয়ে ভিন্নই হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, শর্তের অক্ষরগুলোকে মাযী (অতীত কালের ফে'ল)-এর সাথে মিলালে যে অর্থ পাওয়া যায়, মুযারের সাথে সে অর্থ থাকবে না। তাই মাযীর সাথের মাকাম মুযার-এর সাথের মাকাম থেকে ভিন্ন। আমরা দেখতে পাই মাযী এবং মুযারে'-এর মধ্যে কাল পাওয়া যাওয়া এবং নতুন অর্থ প্রকাশ পাওয়ার দিক থেকে সামঞ্জস্য আছে; কিন্তু এদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায় এভাবে যে মাযী অতীতকালে কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হওয়াকে বুঝায়, আর মুযারে বর্তমান ও ভবিষ্যতে কোনো কাজ সংঘটিত হওয়াকে বুঝায়। অতএব, শর্তের শব্দ বা অক্ষর এ দু'টির সাথে মিলিত হওয়ার পর এ দু'টির অবস্থা ভিন্ন হবে।

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاس : মুসান্নিফ বলেন, এর উপর অন্যান্য শব্দ বা অক্ষরকে কিয়াস করে নাও। যেমন– استفهام-এর দু'টি অক্ষর همزه এবং هل; কিন্তু এ দু'টি কোনো কালিমার সাথে মিলে আসলে দু'টির অবস্থা বা মাকাম ভিন্ন হবে, যদিও استفهام বা প্রশ্ন করার দিক থেকে উভয়ের অর্থ একই।

সার-সংক্ষেপ :

ক. মুকতাযায়ে হাল তিন ধরনের। একটি বাক্যের সাথে সম্পর্কিত, এ প্রকারে إِطْلَاقْ ، تَقْيِيْد ، تَعْرِيْف ، تَنْكِيْر - ذِكْر، حَذْف ও تَقْدِيْم ، تَاخِيْر এসব পরস্পর বিরোধী বিষয়গুলোর দ্বারা حال ও مقام-এর مقتضى ভিন্ন হবে।

খ. মুকতাযায়ে হাল দু'টি বাক্যের সাথে সম্পর্কিত হলে দু'টি বাক্যের মাঝে আত্ফ করা বা না করার কারণে مقتضى ভিন্ন হবে।

اِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ فِى الْحُسْنِ وَالْقَبُوْلِ بِمُطَابَقَتِهٖ لِلْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ وَانْحِطَاطُهٗ اَىْ اِنْحِطَاطُ شَانِهٖ بِعَدَمِهَا اَىْ بِعَدَمِ مُطَابَقَتِهٖ لِلْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ وَالْمُرَادُ بِالْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ اَلْاَمْرُ الَّذِىْ اِعْتَبَرَهُ الْمُتَكَلِّمُ مُنَاسِبًا لِلْمَقَامِ بِحَسْبِ السَّلِيْقَةِ اَوْ بِحَسْبِ تَتَبُّعِ تَرَاكِيْبِ الْبُلَغَاءِ يُقَالُ اِعْتَبَرْتُ الشَّىْءَ اِذَا نَظَرْتَ اِلَيْهِ وَ رَاعَيْتَ حَالَهٗ وَاَرَادَ بِالْكَلَامِ اَلْكَلَامَ الْفَصِيْحَ وَبِالْحُسْنِ اَلْحُسْنَ الذَّاتِىَّ الدَّاخِلَ فِى الْبَلَاغَةِ دُوْنَ الْعَرَضِىِّ الْخَارِجِ لِحُصُوْلِهٖ بِالْمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيْعِيَّةِ ـ

অনুবাদ : কালামের সৌন্দর্য এবং গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে এর মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়া নির্ভর করে اِعْتِبَار مُنَاسِب মোতাবেক হওয়ার উপর এবং কালামের মর্যাদা-গুরুত্ব হ্রাস পায় এটি না হওয়া অর্থাৎ اِعْتِبَار مُنَاسِب-এর মোতাবেক না হওয়ার দ্বারা। اِعْتِبَار مُنَاسِب দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ বিষয় যাকে বক্তা মাকাম (পরিবেশ-পরিস্থিতি)-এর জন্য উপযুক্ত মনে করেন- তার প্রতিভা বলে অথবা বালাগাত শাস্ত্রবিদদের রচনাবলি গভীর অধ্যয়নের সাহায্যে। اعتبار শব্দের ব্যবহার যেমন اِعْتَبَرْتُ الشَّىْءَ অর্থ- যখন তুমি সেই বস্তুটিকে দেখ এবং সেটির অবস্থা বিবেচনা কর। এখানে কালাম বলে ফসীহ বাক্য বুঝানো হয়েছে। আর حُسْن শব্দ দ্বারা সত্তাগত সৌন্দর্য বুঝানো হয়েছে, বালাগাতের অন্তর্ভুক্ত حُسْن عَرَضِى (সংযুক্ত সৌন্দর্য)-কে বুঝানো হয়নি, যা (কালামের সত্তার) বহিরাগত। কেননা, তা হাসিল হয় مُحَسِّنَات بَدِيْعَة দ্বারা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ اِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ الخ : প্রকাশ থাকে যে, যে কোনো বাক্য বালাগাতের ক্ষেত্রে দু'ধরনের হয়ে থাকে- ১. বালাগাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের। ২. এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের না হয়ে নিম্ন পর্যায়ের হওয়া। এ দু' প্রকার حُسْنٌ لِذَاتِهٖ (সত্তাগত সৌন্দর্য) এবং قَبُوْلُ السَّامِعِ তথা শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে। উল্লেখ্য যে, فِى الْحُسْنِ وَالْقَبُوْلِ-এর মধ্যে যে عطف হয়েছে, তাকে عَطْفٌ عَلَى الْمَلْزُوْمِ বলা হয়। অর্থাৎ حسن হলো ملزوم-এর জন্য لازم হলো قبول অর্থাৎ শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে তা সুন্দর হতো না। শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতার কারণেই এটি حسن বা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। فِى الْحُسْنِ وَالْقَبُوْلِ এ দু'টি কয়েদ দ্বারা লেখক অন্যভাবে কালামের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিকে খারেজ করেছেন। যেমন- تَرْغِيْب وَتَرْهِيْب হিসেবে কালামের কথা বলা হয়নি। কেননা, তখন সেই কালামেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের হয়ে যাবে যার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করার যোগ্যতা বেশি থাকবে। মূল লেখক সৌন্দর্য এবং গ্রহণযোগ্যতার বিচারে সর্বোত্তম বাক্য এবং অন্যতম সুন্দর বাক্য হওয়ার জন্য اِعْتِبَار مُنَاسِب-এর মোতাবেক হওয়া বা না হওয়ার শর্ত করেছেন। এখন আমাদের জানা দরকার اَلْاِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ কাকে বলে?

قَوْلُهٗ وَالْمُرَادُ بِالْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) اِعْتِبَار مُنَاسِب-এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তিনি বলেন, اَلْاَمْرُ الَّذِىْ اِعْتَبَرَهُ الْمُتَكَلِّمُ مُنَاسِبًا لِلْمَقَامِ بِحَسْبِ السَّلِيْقَةِ اَوْ بِحَسْبِ تَتَبُّعِ تَرَاكِيْبِ الْبُلَغَاءِ অর্থাৎ এমন একটি বিষয়, যাকে বক্তা শ্রোতার অবস্থা অনুপাতে উপযুক্ত মনে করেন। আর সে এটা মনে করে নিজ প্রতিভা বলে অথবা বালাগাত শাস্ত্রবিদদের রচনাবলি গভীর অধ্যয়নের সাহায্যে। অতএব বক্তার কথা যদি উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়, তাহলে সেটি সর্বোত্তম বাক্য। আর যদি তার কথা সেই বিষয়ের সাথে কোনোভাবেই না মিলে, তাহলে তার কথা বালাগাতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে। তখন তার কথা আর পশুদের আওয়াজের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। এখানে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়।

এক. মুসান্নিফের اعتبار শব্দটি মাসদার, এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اسم مفعول তাই মুসান্নিফ (র.) পরে ব্যাখ্যায় এনেছেন اَلْاَمْرُ الْمُعْتَبَرُ বা اَلْاَمْرُ الَّذِىْ اِعْتَبَرَهُ।

দুই. এখানে اَلْاَمْرُ الْمُعْتَبَرُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সব বৈশিষ্ট্য, যা বাক্যের মধ্যে আসল অর্থ আদায়ের পর গ্রহণ করা হয়। যেমন, শ্রোতার انكار বা অস্বীকারের সময় তাকিদ ইত্যাদি। এ কথায় বুঝা যাচ্ছে যে, পূর্বের বর্ণিত মুকতাযায়ে হালই হলো اِعْتِبَار مُنَاسِب।

اَلسَّلِيْقَةُ-এর অর্থ প্রতিভা, এটা বাগ্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা আরবীয় এবং ভাষাজ্ঞানে দক্ষ। আর যারা অনারবী তারা তাদের বাক্যকে اِعْتِبَار مُنَاسِب-এর মোতাবেক করার জন্য আরবি বালাগাতশাস্ত্রবিদদের রচনার মুখাপেক্ষী হন। তাদের বালাগাতশাস্ত্রবিদদের রচনা থেকে আয়ত্ত করা দু'ভাবে হতে পারে–

১. بِالْوَاسِطَةِ ২. بِلَا وَاسِطَه ; بِالْوَاسِطَةِ-এর অর্থ হচ্ছে, তাদের রচনাবলির আলোকে তৈরি নিয়মাবলি তথা ব্যাকরণশাস্ত্রের সাহায্যে আয়ত্ত করা। بِلَا وَاسِطَه-এর অর্থ হচ্ছে, ব্যাকরণের নিয়মের মাধ্যমে নয়; বরং সরাসরি বালাগাতশাস্ত্রবিদদের রচনা থেকে হাসিল করা।

قَوْلُهُ يُقَالُ اِعْتَبَرْتُ الشَّيْءَ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) তার দেওয়া اِعْتِبَار-এর ব্যাখ্যার প্রমাণ অভিধান থেকে দিচ্ছেন। তিনি ব্যাখ্যায় বলেছিলেন যে, اعتبار-এর অর্থ اَمْر مُعْتَبَرٌ তিনি বলেন اِعْتَبَرْتُ الشَّيْءَ তখন বলা হয়, যখন আপনি একটি বিষয়কে দেখবেন এবং তার অবস্থানকে বিবেচনা করবেন (আমলে নিবেন) যেমন– বক্তা শ্রোতাকে খবর অস্বীকার করতে দেখল, অতঃপর সে শ্রোতার সামনে তাকিদের সাথে কথা বলল । আর শ্রোতার অবস্থাকে বিবেচনা করাই হলো اَمْر مُعْتَبَرٌ, অতএব এখানে اعتبار দ্বারা اَمْر مُعْتَبَرٌ-ই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَاَرَادَ بِالْكَلَامِ اَلْكَلَامَ الْفَصِيْحَ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখক বলেছেন اعتبار مناسب-এর মোতাবেক হওয়ার দ্বারা বাক্যের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বাক্যের মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তার এ বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা, মোতাবেক হওয়ার দ্বারা কেবলমাত্র حسن (সৌন্দর্য) বৃদ্ধি পায়, বাক্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না। মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কালামের পরিপূর্ণ মোতাবেক হওয়া জরুরি। তাই লেখকের এভাবে বলা উচিত ছিল– اِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ فِى الْحُسْنِ وَالْقَبُوْلِ بِكَمَالِ مُطَابَقَتِهٖ কিন্তু তিনি তো এরূপ বলেননি? এর উত্তর হলো, তার বক্তব্য اِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ-এর মধ্যে كلام দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كَلَام فَصِيْح আর যদি কালামে ফাসীহ উদ্দেশ্য হয়, তবে সাধারণ حسن (সৌন্দর্য) তো কালামে ফাসীহ দ্বারাই পাওয়া যায়। আর اِرْتِفَاعُ الشَّانِ-এর জন্য مطابقة যথেষ্ট, আর যেহেতু সাধারণ مطابقة-এর দ্বারা সৌন্দর্য পাওয়া যাওয়া সম্ভব, তাই এর মধ্যে كَمَال مُطَابَقَة-এর قيد জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَبِالْحُسْنِ اَلْحُسْنَ الذَّاتِىْ : বাক্যের এ অংশ দ্বারা মুসান্নিফ (র.) আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখকের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে কালামের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় মোতাবেক হওয়ার দ্বারা, এ কথাটি সঠিক নয়। কারণ, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে কালামের মর্যাদা مُحَسِّنَات بَدِيْعِيَّة দ্বারা হাসিল হয়, মোতাবেক হওয়ার দ্বারা নয়। আর مُحَسِّنَات بَدِيْعِيَّة-এর আলোচনা ইলমে বদী'-এ আসবে। এ প্রশ্নের উত্তর হলো حسن (কালামের সৌন্দর্য) দু'ধরনের– ১. حسن ذاتى (সত্তাগত সৌন্দর্য), ২. حُسْن عَرْضِى (অতিরিক্ত সংযুক্ত সৌন্দর্য)। مُحَسِّنَات بَدِيْعِيَّة দ্বারা حُسْن عَرْضِى হাসিল হয় حُسْن ذَاتِى হাসিল হয় না। حُسْن ذَاتِى হাসিল হয় বালাগাত দ্বারা। এখানে حُسْن ذَاتِى-ই উদ্দেশ্য حُسْن عَرْضِى উদ্দেশ্য নয়। حُسْن ذَاتِى-এর আলোচনা ইলমে মা'আনীতে হয় এবং حُسْن عَرْضِى-এর আলোচনা ইলমে বদী'-এর মধ্যে হয়।

সার-সংক্ষেপ :

(ক) কোনো বাক্যের সৌন্দর্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় সে বাক্যটির اِعْتِبَار مُنَاسِب বা مُقْتَضٰى حَال-এর মোতাবেক হওয়ার দ্বারা। অর্থাৎ সে বাক্য যতটা مُقْتَضٰى حَال-এর (স্থান-কাল ও পাত্র) অনুযায়ী হবে, সেই বাক্য ততটা সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হবে।

فَمُقْتَضَى الْحَالِ هُوَ الْاِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ لِلْحَالِ وَالْمَقَامِ يَعْنِى اِذَا عُلِمَ اَنْ لَيْسَ اِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ الْفَصِيْحِ فِى الْحُسْنِ الذَّاتِى اِلَّا بِمُطَابَقَتِهِ لِلْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ عَلٰى مَا يُفِيْدُهُ اِضَافَةُ الْمَصْدَرِ وَمَعْلُوْمٌ اَنَّهُ اِنَّمَا يَرْتَفِعُ بِالْبَلَاغَةِ الَّتِى هِىَ عِبَارَةٌ عَنْ مُطَابَقَةِ الْكَلَامِ الْفَصِيْحِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ فَقَدْ عُلِمَ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ وَمُقْتَضَى الْحَالِ وَاحِدٌ وَاِلَّا لَمَا صَدَقَ اَنَّهُ لَايَرْتَفِعُ اِلَّا بِالْمُطَابَقَةِ لِلْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ وَلَا يَرْتَفِعُ اِلَّا بِالْمُطَابَقَةِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ فَلْيَتَأَمَّلْ -

অনুবাদ : আর মুকতাযায়ে হাল-ই হলো اَلْاِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ لِلْحَالِ وَالْمَقَامِ **(হাল এবং মাকামের উপযুক্ত ই'তিবার)** অর্থাৎ যখন এ বিষয়টি জানা গেল যে, কালামে ফাসীহ (বিশুদ্ধ বাক্য)-এর মর্যাদা-গুরুত্ব حُسْن ذَاتِى (তথা সত্তাগত সৌন্দর্য)-এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হয় না, তবে (তখনই হয়) যখন اِعْتِبَار مُنَاسِب-এর মোতাবেক হয়- এ কথার উপর যে, মাসদারের ইযাফত এ অর্থই প্রদান করছে। আবার এ কথাও জ্ঞাত যে, কালামের মর্যাদা-গুরুত্ব বালাগাতের দ্বারাই হয়, যা মূলত কালামে ফাসীহ-এর মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়াকে বুঝায়। সুতরাং এখন বুঝা গেল اِعْتِبَار مُنَاسِب এবং মুফতাযায়ে হালের অর্থ একই। অন্যথায় এ কথা সত্য হতো না যে, শুধুমাত্র اِعْتِبَار مُنَاسِب-এর মোতাবেক হওয়ার দ্বারা কালামের মর্যাদা-গুরুত্ব সর্বোচ্চ হয় এবং শুধুমাত্র মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়ার দ্বারাই কালামের মর্যাদা-গুরুত্ব সর্বোচ্চ হয়। (অথচ এ দু'টি কথাই যখন সত্য) সুতরাং মুকতাযায়ে হাল এবং اِعْتِبَار مُنَاسِب উভয়টা একই, আপনি ভালোভাবে চিন্তা করে অনুধাবন করুন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ فَمُقْتَضَى الْحَالِ : এখান থেকে লেখকের আগের বক্তব্য اِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ-এর تفريع (প্রাসঙ্গিক আলোচনা) শুরু হয়েছে। তিনি বলেছেন, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে اِعْتِبَار مُنَاسِب-এর মোতাবেক হওয়ার দ্বারাই কালামের শান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু اِعْتِبَار مُنَاسِب কি? এর উত্তরে তিনি বলছেন مُقْتَضٰى حَال হলো اِعْتِبَار مُنَاسِب লেখক এ দু'টোর অর্থ বা সত্তা যে এক তা বুঝানোর জন্য هو সর্বনামটিকে এনেছেন। কেননা, ضَمِير فَصْل (মুবতাদা এবং খবরের মাঝখানে যে ضمير আসে) তা حصر (সীমাবদ্ধতার) অর্থ প্রদান করে। তাই আমরা অর্থ করেছি মুকতাযায়ে হালই হলো اِعْتِبَار مُنَاسِب বা اِعْتِبَار مُنَاسِب মানেই মুকতাযায়ে হাল। এরপর মুসান্নিফ (র.) এ কথার পক্ষে দলিল পেশ করছেন। তার দেওয়া দলিলটি মানতিকের বিখ্যাত কায়দা اَلشَّكْلُ الْاَوَّلُ দ্বারা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে صُغْرٰى, এরপর كُبْرٰى, এরপর نتيجه এখানে মনে রাখা দরকার যে, মূল লেখক فَمُقْتَضَى الْحَالِ هُوَ الْاِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ বলে نَتِيْجَة টি উল্লেখ করেছেন। এর আগে মূল লেখকের ইবারত اِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ-কে মুসান্নিফ كُبْرٰى বানিয়েছেন। আর صُغْرٰى যা মূল লেখক উল্লেখ করেননি। কিন্তু صُغْرٰى-এর বক্তব্য ইলমে বালাগাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে জ্ঞাত এবং প্রসিদ্ধ আছে। হয়তোবা এ কারণেই মূল লেখক এটি বর্ণনা করেননি। মুখতাসারুল মা'আনীর লেখক বিষয়টি সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি লেখকের উদ্ধৃত كُبْرٰى-কে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

لَيْسَ اِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ الْفَصِيْحِ فِى الْحُسْنِ الذَّاتِى اِلَّا بِمُطَابَقَتِهِ لِلْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ

অর্থাৎ কালামে ফাসীহের সত্তাগত সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি কেবল اِعْتِبَار مُنَاسِب-এর মোতাবেক হওয়ার দ্বারাই পাওয়া যায়; কিন্তু মুসান্নিফের এ বক্তব্যের উপর আপত্তি আসে যে, মূল লেখকের কথায় তো حصر (সীমাবদ্ধতা) নেই। কারণ, তিনি এভাবে বলেছেন- اِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ فِى الْحُسْنِ وَالْقَبُوْلِ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ

অর্থাৎ إِعْتِبَار مُنَاسِب-এর মোতাবেক হলে কালামের শান বাড়বে। কিন্তু মোতাবেক না হলে বাড়বে কিনা তাতো বলা হয়নি। তাহলে মুসান্নিফ حصر-এর অর্থ (কেবল إِعْتِبَار مُنَاسِب-এর মোতাবেক হওয়ার দ্বারাই কালামের শান বাড়বে।) কোথায় পেলেন? মুসান্নিফ عَلٰى مَا يُفِيْدُهُ إِضَافَةُ الْمَصْدَرِ ইবারত দ্বারা উপরের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, মূল লেখকের ইবারতে حصر নেই এ কথা সত্য নয়; বরং মূল লেখকের ইবারতেও حصر আছে। কেননা, তার ইবারতে মাসদারের ইযাফত (তথা ارتفاع-এর اضافت) হয়েছে তার পরবর্তী শব্দের দিকে। আর একথা স্বীকৃত যে, মাসদারে মুফরাদ যদি معرفة (নির্দিষ্টসূচক) শব্দের প্রতি ইযাফত হয় তখন ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করে। আর ব্যাপকতার অর্থ দ্বারা حصر সৃষ্টি হয়। অতএব, বাক্যের অর্থ হবে كُلُّ إِرْتِفَاعٍ فَهُوَ بِالْمُطَابِقِ অর্থ– প্রত্যেক ارتفاع হাসিল হবে اعتبار مناسب-এর মোতাবেক হওয়ার দ্বারা, যার ফলাফল হলো مطابقة ছাড়া কোনো ارتفاع হতে পারে না। আর এটাই حصر যা মুসান্নিফ বয়ান করলেন। এ কথাটি এভাবেও বলা যায় ارتفاع মাসদার যা اسم جنس আর اسم جنس-এর মধ্যে قليل এবং كثير উভয়টাই শামিল।

বিখ্যাত নাহুবিদ আল্লামা রযীর মতে, اسم جنس ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যদি এমন কোনো প্রমাণ না থাকে যা جنس-কে সীমাবদ্ধ করে দেয়, এমতাবস্থায় اسم جنس ব্যাপকতা (استغراق)-এর ফায়দা দেয়। আর আমরা পূর্বে বলে এসেছি যে, ব্যাপকতার মধ্যে حصر-এর অর্থ পাওয়া যায়। যেভাবেই হোক একথা প্রমাণিত হলো মুসান্নিফের حصر যুক্ত বাক্যটি মূল লেখকের বাক্য থেকেই নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَعْلُوْمٌ أَنَّهُ إِنَّمَا يَرْتَفِعُ : এ বাক্য বলে মুসান্নিফ তার দলিলের صغرى-কে উল্লেখ করছেন। তিনি বলেন, এ কথা সবার জানা আছে যে, কালামের শান বালাগাত তথা কালামে ফাসীহ মুকতাযায়ে হালের অনুযায়ী হওয়া দ্বারাই লাভ করে (মর্যাদা উন্নীত হয়) অতএব صغرى হলো– إِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ بِمُطَابَقَتِهِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ আর كبرى হলো– إِرْتِفَاعُ الْمُطَابَقَةُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ هِيَ الْمُطَابَقَةُ لِلْإِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ হলো نتيجه-এর شَانِ الْكَلَامِ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْإِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ

نتيجه-এর অর্থ– মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়াই إِعْتِبَار مُنَاسِب-এর মোতাবেক হওয়া। এটি মানতিকের شَكْلِ ثَالِث হয়েছে। এ شكل দ্বারা আমাদের বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত না হলেও شكل আমাদের বক্তব্যকে লাযেম করে। কেননা, এখানে বলা হয়েছে মুকতাযায়ে হালের অনুযায়ী হওয়াই إِعْتِبَار مُنَاسِبْ-এর অনুযায়ী হওয়া। অতএব, মুকতাযায়ে হাল এবং إِعْتِبَار مُنَاسِب একই হবে। তবে شَكْلِ أَوَّل দ্বারা এভাবে বলা হলে আমাদের বক্তব্য সরাসরি প্রমাণিত হতো। নিম্নে এর বিবরণ দেওয়া হলো।

مُقْتَضَى الْحَالِ شَيْءٌ يَرْتَفِعُ بِمُطَابَقَتِهِ الْكَلَامُ : হলো صُغْرٰى
وَكُلُّ شَيْءٍ يَرْتَفِعُ بِمُطَابَقَتِهِ الْكَلَامُ إِعْتِبَارٌ مُنَاسِبٌ لِلْحَالِ : হলো كُبْرٰى
مُقْتَضَى الْحَالِ هُوَ الْإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ : হলো نَتِيْجَة

قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمَا صَدَقَ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) مُقْتَضَى الْحَالِ এবং الْإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ-কে এক বা সত্তাগতভাবে এক মনে না করলে কি সমস্যা হয় তার আলোচনা শুরু করছেন। তিনি বলেন, যদি এক মনে না করা হয় তাহলে আগে যে দু'টি حصر বয়ান করা হয়েছে তথা– إِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ بِمُطَابَقَتِهِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ এবং إِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ بِطَابَقَتِهِ الْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ উভয়টি মিথ্যা হওয়া জরুরি হয়ে যায়। উভয়টি মিথ্যা হওয়া যেহেতু অসম্ভব, তাই উভয়ের মাঝে সত্তাগতভাবে এক না হওয়াও অসম্ভব। অতএব, এ কথাই সত্য যে, উভয়টি এক। তবে এখানে বুঝার বিষয় হচ্ছে, মুকতাযায়ে হাল এবং إِعْتِبَار مُنَاسِب-এর মাঝে ঐক্য না মানা হলে উভয় حصر কিভাবে বাতিল হয়। বিষয়টি এরূপ যে, প্রথম حصر হলো কালামের শান বৃদ্ধি পায় শুধুমাত্র মুকতাযায়ে হালের অনুযায়ী হওয়ার দ্বারা, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। অথচ এ কথাটি ভুল। কেননা, إِعْتِبَار مُنَاسِب-এর মোতাবেক হওয়ার দ্বারাই কালামের শান বৃদ্ধি পায়। এরপর দ্বিতীয় حصر হলো, কালামের শান শুধুমাত্র إِعْتِبَار مُنَاسِب-এর মোতাবেক হওয়ার দ্বারাই হয়। অন্য কিছু দ্বারা হয় না। অথচ এটিও ভুল কেননা, মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়ার দ্বারাও কালামের শান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি আপনি মেনে নেন যে, مُقْتَضَى الْحَالِ এবং إِعْتِبَار مُنَاسِب উভয়টি এক এবং এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তাহলে উভয় حصر ঠিক থাকে।

সার-সংক্ষেপ : ক. مُقْتَضٰى حَال ও إِعْتِبَار مُنَاسِب উভয়ে একই এবং পরস্পর অভিন্ন। এদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং বলা যায় এরা সমার্থক। সুতরাং مُقْتَضٰى حَال অনুযায়ী হওয়া হওয়া অর্থই হচ্ছে إِعْتِبَار مُنَاسِب-এর অনুযায়ী হওয়া।

فَالْبَلَاغَةُ صِفَةٌ رَاجِعَةٌ اِلَى اللَّفْظِ بِمَعْنٰى اَنَّهٗ كَلَامٌ بَلِيْغٌ لٰكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ لَفْظٌ وَصَوْتٌ بَلْ بِاعْتِبَارِ اِفَادَتِهِ الْمَعْنٰى اَىِ الْغَرَضِ الْمَصُوْغِ لَهُ الْكَلَامِ بِالتَّرْكِيْبِ مُتَعَلِّقٌ بِاِفَادَتِهٖ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْبَلَاغَةَ كَمَا مَرَّ عِبَارَةٌ عَنْ مُطَابَقَةِ الْكَلَامِ الْفَصِيْحِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَظَاهِرٌ اَنَّ اِعْتِبَارَ الْمُطَابَقَةِ وَعَدَمِهَا اِنَّمَا يَكُوْنُ بِاعْتِبَارِ الْمَعَانِىْ وَالْاَغْرَاضِ الَّتِىْ يُصَاغُ لَهَا الْكَلَامُ لَا بِاعْتِبَارِ الْاَلْفَاظِ الْمُفْرَدَةِ وَالْكَلِمِ الْمُجَرَّدَةِ وَكَثِيْرًا مَا نَصْبٌ عَلَى الظَّرْفِ لِاَنَّهٗ مِنْ صِفَةِ الْاَحْيَانِ وَمَا لِتَاكِيْدِ مَعْنَى الْكَثْرَةِ وَالْعَامِلُ فِيْهِ قَوْلُهٗ يُسَمّٰى ذٰلِكَ الْوَصْفُ الْمَذْكُوْرُ فَصَاحَةً اَيْضًا كَمَا يُسَمّٰى بَلَاغَةً فَحَيْثُ يُقَالُ اِنَّ اِعْجَازَ الْقُرْاٰنِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهٖ فِىْ اَعْلٰى طَبَقَاتِ الْفَصَاحَةِ يُرَادُ بِهَا هٰذَا الْمَعْنٰى ـ

অনুবাদ : **বালাগাত** এমন একটি সিফাত **যার সম্পর্ক لَفْظ (শব্দের) সাথে,** তবে এ অর্থে যে, এটি হচ্ছে كَلَامٌ بَلِيْغٌ (অর্থাৎ কালাম মাওসূফ, بَلِيْغٌ তার সিফাত)। এ হিসেবে (لَفْظ-এর সিফাত) নয় যে, এটি শুধুমাত্র শব্দ ও আওয়াজ; **বরং ইবারত এমন অর্থ প্রদান করে,** যে অর্থের জন্য বাক্যটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। بِالتَّرْكِيْبِ শব্দটি اِفَادَتِهٖ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হবে। আর এটি এ কারণে যে, যেমনটি ইতঃপূর্বে বালাগাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কালামে ফাসীহ (বিশুদ্ধ বাক্য)-এর মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়াকে বালাগাত বলা হয়। আর এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, (যে কোনো বাক্যের) মোতাবেক হওয়া এবং মোতাবেক না হওয়ার সম্পর্ক অর্থ এবং উদ্দেশ্যের সাথে; যার জন্য বাক্যটিকে ব্যবহার করা হয়েছে, শুধুমাত্র শব্দ (বা বাক্য)-এর সাথে নয়। **অনেক সময়** এটি (كَثِيْرًا مَا) যবর যুক্ত হয়েছে ظَرْف-এর কারণে। কেননা, (মূলত) এটি اَحْيَانْ-এর সিফাত। مَا আধিক্যের অর্থের তাকিদ করার জন্য (আনা হয়েছে,) এর মধ্যে আমেল হলো লেখকের يُسَمّٰى শব্দটি। উল্লিখিত বিষয় (অর্থাৎ মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়া)-কে **ফাসাহাতও বলা হয়ে থাকে,** যেমনটি বালাগাত বলা হয়। সুতরাং যেখানে বলা হয় কুরআনের ই'জায ফাসাহাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে হওয়ার কারণেই, সেখানে এ অর্থেই (অর্থাৎ ফাসাহাত দ্বারা বালাগাত) উদ্দেশ্য করা হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ فَالْبَلَاغَةُ صِفَةٌ الخ : উল্লিখিত ইবারত দ্বারা লেখক তার বর্ণিত বালাগাতের সংজ্ঞার একটি ভিন্নধর্মী বিশ্লেষণ শুরু করছেন। বিষয়টি হলো– পাঠকের বালাগাতের সংজ্ঞা থেকে এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে, বালাগাত শব্দটি শুধুমাত্র لَفْظ (শব্দের) সিফাত, (অর্থের সাথে এর সম্পর্ক গৌণ)। এমন ধারণা হওয়ার কারণ হলো, সংজ্ঞার শব্দ চয়ন। সংজ্ঞার মধ্যে বলা হয়েছে مُطَابَقَةُ الْكَلَامِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ এখানে মোতাবেক হওয়া যাকে বালাগাত বলা হচ্ছে– এটি কালামের সিফাত। তার মাওসূফ হলো কালাম। কালাম তো لَفْظ (শব্দ), অতএব তার সিফাত (বালাগাত) ও শব্দই হবে। কিন্তু পাঠকের এ ধারণা যাতে না হয়, তাই লেখক এ বিষয়টির অবতারণা করলেন। তিনি বলেন, বালাগাত যদিও لَفْظ-এর সিফাত, কিন্তু অর্থ ছাড়া শুধুমাত্র لَفْظ-এর সিফাত নয়; বরং এমন لَفْظ-এর সিফাত, যা অর্থ প্রদান করে। এ অর্থেই বালাগাত বিশারদগণ বালাগাতকে لَفْظ-এর সিফাত বলেছেন। পাঠকের এ ধারণা খণ্ডন করার সাথে লেখক আরেকটি تَنَاقُضْ (বৈপরীত্য)-কে দূর করতে চান। যা শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর বক্তব্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি দালায়েলুল ই'জায গ্রন্থে বালাগাতকে কখনো لَفْظ-এর সিফাত বলেছেন, আবার কখনো مَعْنٰى-এর সিফাত বলেছেন। তিনি কখনো لَفْظ থেকে বালাগাতকে نَفْى করেছেন; আবার কখনো مَعْنٰى থেকে نَفْى করেছেন। তার এসব বক্তব্যে এক ধরনের বিভ্রান্তি এবং বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে। মূল লেখক সেই বিভ্রান্তি দূর করতে গিয়ে বলেন, বালাগাত لَفْظ-এর সিফাত, তবে অর্থ প্রদানকারী হিসেবে لَفْظ বলতে সাধারণত যা বুঝা যায় (শব্দ বা আওয়াজ), এ হিসেবে বালাগাত لَفْظ-এর সিফাত

নয়। অর্থ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐ অতিরিক্ত অর্থ যার উদ্দেশ্যে বাক্যটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থ বলতে ঐ সব বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তাকিদ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে যাকে حال চায়, কেননা কালামে বালীগ (অলঙ্কারসমৃদ্ধ)-এর মধ্যে মূল অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য হয় না। কেননা, মূল অর্থ (বাক্যের সাধারণ অর্থ) তো বালাগাত ছাড়া কালামেও পাওয়া যায়। কালামে বালীগের মধ্যে সেই অতিরিক্ত অর্থ বুঝানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যাকে حال চায়। একেই মুকতাযায়ে হাল বা إِعْتِبَارْ مُنَاسِبْ বলা হয়।

সারকথা হলো, আল্লামা জুরজানীর বক্তব্যে লেখকের ব্যাখ্যা অনুসারে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা, তিনি যেখানে বালাগাতকে لفظ-এর সিফাত বলেছেন, সেখানে لفظ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ لفظ যা কাঙ্ক্ষিত অর্থ প্রদান করে। আর যেখানে তিনি مَعْنى-এর সিফাত বলেছেন, সেখানে অর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ অতিরিক্ত অর্থ, যার প্রতি لفظ ইঙ্গিত করে।

قَوْلُهُ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْبَلَاغَةَ كَمَا مَرَّ عِبَارَةٌ : এ ইবারত দ্বারা তিনি তার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, আমি যে বলেছি বালাগাত لفظ-এর সিফাত, এর প্রমাণ হলো– বালাগাতের সংজ্ঞার মধ্যে বলা হয়েছে যে, কালামে ফাসীহ মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়াকে বলে। এ সংজ্ঞার মধ্যে مطابقت-এর اضافت হয়েছে কালামের দিকে, আর কালাম হলো لفظ, সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, বালাগাত সিফাত হয়েছে এমন বিষয়ের থেকে যা لفظ বা শব্দ।

قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ اَنَّ اِعْتِبَارَ الْمُطَابَقَةِ : এখান থেকে লেখক তার দাবির আরেকটি অংশকে প্রমাণ করছেন। দাবির এ অংশটি হলো, বালাগাত শুধুমাত্র শব্দ বা আওয়াজের সিফাত নয়; বরং এমন শব্দের সিফাত যা উদ্দেশ্যকে বুঝায়। তার প্রমাণ এই যে, বালাগাতের সংজ্ঞার মধ্যে মোতাবেক হওয়া এবং মোতাবেক না হওয়ার কথা রয়েছে। আর মোতাবেক হওয়া বা না হওয়ার সম্পর্ক অর্থ এবং উদ্দেশ্য (হালের বিভিন্ন মুকতাযা)-এর সাথে, যার জন্য বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর সম্পর্ক ঐ শব্দের সাথে নেই, যা অর্থ এবং উদ্দেশ্যের প্রতি দিক নির্দেশ করে না।

মোটকথা, যেহেতু মোতাবেক হওয়া বা না হওয়ার সম্পর্ক অর্থ এবং উদ্দেশ্যের সাথে। তখন বলতে হবে– বালাগাত এমন শব্দের সিফাত, যা অর্থ ও উদ্দেশ্যের প্রতি দিক নির্দেশ করে।

قَوْلُهُ كَثِيْرًا مَا نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِ : এখান থেকে লেখক উপরে উল্লিখিত বিষয়ের নামের ব্যবহারে যে ব্যাপকতা রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, উল্লিখিত বিষয় (অর্থাৎ মুকাতযায়ে হালের মোতাবেক হওয়া)-কে যেমন– বালাগাত বলা হয়, তেমনি কখনো এটিকে ফাসাহাত বলা হয়ে থাকে। মোটকথা, বিষয়টির নাম বালাগাত হলেও কখনো কখনো একে ফাসাহাত বলে ব্যক্ত করা হয়। যেমন– إِنَّ اِعْجَازَ الْقُرْاٰنِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهٖ فِىْ اَعْلٰى طَبَقَاتِ الْفَصَاحَةِ এ বাক্যে طَبَقَاتِ الْفَصَاحَةِ দ্বারা উদ্দেশ্য طَبَقَاتُ الْبَلَاغَةِ কেননা, এখানে فَصَاحَةٌ শব্দ বলে কালামের মুকতাযায়ে হালের অনুরূপ হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। মোদ্দাকথা এই যে, বালাগাতের স্থলে কখনো কখনো ফাসাহাত শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়।

মুসান্নিফ প্রথমেই كَثِيْرًا مَا-এর ব্যাকরণগত দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, তিনি বলেন كَثِيْرًا-এর মধ্যে نصب হয়েছে ظرف زمان হওয়ার কারণে। কিন্তু কিভাবে এটি ظرف زمان হলো? এর উত্তর মুসান্নিফ (র.) নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি اَحْيَانًا (মাওসূফ)-এর সিফাত। اَحْيَانًا (সময়) ظرف হওয়ার কারণে منصوب, অতএব এর সিফাতও মানসূবই হবে। এখানে কারো এটা মনে করা উচিত হবে না যে, كَثِيْرًا বর্তমানেও اَحْيَانًا উহ্য মাওসূফের সিফাত এবং উহ্য ইবারত এরূপ اَحْيَانًا كَثِيْرًا কারণ এমনটি মনে করলে প্রশ্ন দেখা দিবে যে, তাহলে তো মাওসূফ এবং সিফাতের মাঝে تطابق হলো না। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি হলো, كَثِيْرًا প্রথমত اَحْيَانًا-এর সিফাত ছিল اَحْيَانًا كَثِيْرَةً হিসেবে, এরপর اَحْيَانًا-কে স্থায়ীভাবে উহ্য রেখে তার স্থানে كَثِيْرًا-কে রেখে দেওয়া হয়েছে। তাই এখন كَثِيْرًا-এর ঐ অর্থই হবে, যা احيان-এর হয়ে থাকে এবং كَثِيْرًا-এর উপর نصب হবে যা ছিল احيان-এর উপর। কেননা, কোনো বস্তুকে نائب বানানো হলে সেটি আসলের হুকুম গ্রহণ করে। যেহেতু এখানে كَثِيْرًا-কে اَحْيَانًا-এর স্থলবর্তী করা হয়েছে, তাই এখন اَحْيَانًا-এর সহযোগিতার প্রয়োজন হবে না; বরং كَثِيْرًا-ই اَحْيَانًا-এর অর্থ প্রদান করবে এবং ই'রাব গ্রহণ করবে। مَا শব্দটি كَثْرَةً-এর তাকিদের জন্য আনা হয়েছে। যেমন– قلة-এর তাকিদের জন্য مَا-কে আনা হয়, যেমন বলা হয় وَالْعَامِلُ فِيْهِ قَلِيْلًا مَا অর্থাৎ ظرف-এর عامل ناصب (نصب প্রদানকারী আমেল) হলো يُسَمّٰى ফে'লটি। আর ذٰلِكَ الْوَصْفُ এটি يُسَمّٰى ফে'লে মাজহূলের نائب فاعل।

قَوْلُهُ الْوَصْفُ الْمَذْكُوْرُ : দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– اَلْمُطَابَقَةُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ

সার-সংক্ষেপ : ক. بَلَاغَةٌ যদিও لفظ-এর صفت (বিশেষণ), কিন্তু তা অর্থ বিবর্জিত لفظ-এর বিশেষণ নয়; বরং এতে لفظ এবং অর্থ উভয়ের সমান গুরুত্ব রয়েছে। খ. بلاغة-কে কখনো فَصَاحَةٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়।

وَلَهَا اَىْ لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ طَرْفَانِ اَعْلٰى وَهُوَ حَدُّ الْاِعْجَازِ وَهُوَ اَنْ يَّرْتَقِىَ الْكَلَامُ فِىْ بَلَاغَتِهٖ اِلٰى اَنْ يَّخْرُجَ عَنْ طُوْقِ الْبَشَرِ وَيُعْجِزُهُمْ عَنْ مُعَارَضَتِهٖ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ هُوَ وَالضَّمِيْرُ فِىْ مِنْهُ عَائِدٌ اِلٰى اَعْلٰى يَعْنِىْ اَنَّ الْاَعْلٰى وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ كِلَاهُمَا حَدُّ الْاِعْجَازِ هٰذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِى الْمِفْتَاحِ وَ زَعَمَ بَعْضُهُمْ اَنَّهٗ عَطْفٌ عَلٰى حَدِّ الْاِعْجَازِ وَالضَّمِيْرُ عَائِدٌ اِلَيْهِ يَعْنِىْ اَنَّ الطَّرْفَ الْاَعْلٰى هُوَ حَدُّ الْاِعْجَازِ وَمَا يَقْرُبُ مِنْ حَدِّ الْاِعْجَازِ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ الْقَرِيْبَ مِنْ حَدِّ الْاِعْجَازِ لَايَكُوْنُ مِنَ الطَّرْفِ الْاَعْلٰى وَقَدْ اَوْضَحْنَا ذٰلِكَ فِى الشَّرْحِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **এবং তার** অর্থাৎ বালাগাতে কালামের **দু'টো দিক রয়েছে। সর্বোচ্চ এবং এটি ই'জাযের পর্যায়ের।** আর তা হচ্ছে বাক্যটি বালাগাতের ক্ষেত্রে এমন উঁচুতে উঠে যে, এটি মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে যায় এবং এটি তাদের অক্ষম করে দেয় তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এবং যা সর্বোচ্চ পর্যায়ের কাছাকাছি। وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ বাক্যটি আতফ হয়েছে তার ইবারত هُوَ-এর উপর। مِنْهُ-এর সর্বনামটির مرجع হলো اَعْلٰى । অর্থাৎ اَعْلٰى (সর্বোচ্চ) এবং এর নিকটবর্তী-উভয়টি ই'জাযের পর্যায়ে এটি মিফতাহ গ্রন্থের বক্তব্যের অনুরূপ ব্যাখ্যা। কেউ কেউ ধারণা করে, এটি (مَا يَقْرُبُ مِنْهُ) عطف হয়েছে حَدُّ الْاِعْجَازِ-এর উপর। আর (مِنْهُ-এর) সর্বনামটি সম্পর্কিত (حَدُّ الْاِعْجَازِ)-এর প্রতি। অর্থাৎ সর্বোচ্চ দিক হচ্ছে ই'জাযের পর্যায়ে এবং এর কাছাকাছি যা হয়। কিন্তু এ মতে আপত্তি আছে। কেননা, যা ই'জাযের কাছাকাছি (কিন্তু ই'জায নয়) তা সর্বোচ্চ পর্যায়ের হবে না। এ বিষয়টি ব্যাখ্যাগ্রন্থ (মুতাওয়াল) এ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَلَهَا اَىْ لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ طَرْفَانِ : এখান থেকে বালাগাতে কালামের প্রকারভেদ শুরু হচ্ছে। এ প্রকার মূলত হালের বিভিন্ন মুকতাযা বা চাহিদানুপাতে বাক্য ব্যবহারের কারণেই হয়ে থাকে। এ প্রকার সম্পর্কে মূল লেখকের বক্তব্য হলো বালাগাত দু' প্রকার : ১. اَعْلٰى ২. اَسْفَلْ কিন্তু লেখক যে বিষয়ের ভিত্তিতে প্রকার করেছেন, তাতে তিন প্রকার বলাটাই সমীচীন। অর্থাৎ ১. اَعْلٰى যা বালাগাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে, ২. اَسْفَلْ যা বালাগাতের সর্বনিম্ন পর্যায়ে, ৩. اَوْسَطْ মধ্যম পর্যায়ে। তবে বিষয়টি কেউ কেউ এভাবে বলেছেন, বালাগাত একটি كُلى যার তিনটি স্তর রয়েছে– ১. اَعْلٰى-এর দু'টি فرد আছে, ২. اَسْفَلْ-এর একটি فرد, ৩. اوسط-এর অনেকগুলো فرد রয়েছে। মুসান্নিফ বালাগাতকে দু'প্রকারে বর্ণনা করার কারণ সম্পর্কে আল্লামা দুসুকী (র.) বলেন, লেখক বালাগাতকে استعارة بالكناية হিসেবে একটি লম্বা বস্তুর সাথে উপমা দিয়েছেন। مشبه উল্লেখ আছে, কিন্তু مشبه به উহ্য। এরপর তিনি طَرْفَانِ শব্দটিকে استعاره تخيلية হিসেবে এনেছেন। সুতরাং তার মূলত এখানে দু'টি দিক দ্বারা প্রকার বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। আর যদি মূলত প্রকার বর্ণনা উদ্দেশ্য হতো, তাহলে যে কোনো মানুষের بليغ হওয়ার জন্য উভয় প্রকার ব্যবহার করা জরুরি হতো। অথচ এটা অসম্ভব, কেননা, উভয় প্রকারের মধ্যে বৈপরীত্য বা স্ববিরোধিতা রয়েছে।

قَوْلُهٗ اَعْلٰى وَهُوَ حَدُّ الْاِعْجَازِ : اَعْلٰى বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের, তার স্তর হলো اِعْجَازْ-এর স্তর। حَدُّ الْاِعْجَازِ এটি مركب اضافى তবে এখানে حد-এর ইযাফত اِعْجَازْ-এর দিকে بيان হিসেবে হয়েছে। এ মতে অর্থ হবে বালাগাতের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো حَدٌّ অর্থাৎ ই'জায। উল্লেখ্য যে, এখানে اِعْجَازْ-এর আগে একটি ذو (مضاف) উহ্য আছে। অর্থাৎ বালাগাতের সর্বোচ্চ পর্যায়টি اِعْجَازْ সমৃদ্ধ অর্থাৎ তাতে اِعْجَازْ রয়েছে।

وَهُوَ اَنْ يَرْتَقِى الْكَلَامُ فِى بَلَاغَتِهٖ اِلٰى اَنْ يَّخْرُجَ عَنْ طَوْقِ الْبَشَرِ وَيُعْجِزُهُمْ عَنْ مُعَارَضَتِهٖ : اِعْجَاز-এর সংজ্ঞা
অর্থাৎ اِعْجَازْ বলা হয় বাক্যটি বালাগাতের ক্ষেত্রে এমন স্তরে পৌঁছে যায়, যা মানুষের সাধ্যাতীত ক্ষমতার বাইরে এবং এ স্তর মানুষকে তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অপারগ করে দেয়।

وَقَوْلُهٗ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ الخ : এ বাক্যটি معطوف হয়েছে। এর معطوف عليه-এর ব্যাপারে মুসান্নিফের বক্তব্য হলো هُوَ -وَهُوَ حَدُّ الْاِعْجَازِ-এর মধ্যস্থ هُوَ সর্বনাম। আর مِنْهُ-এর সর্বনাম-এর مرجع হলো اَعْلٰى এ হিসেবে বাক্যটি এরূপ হবে- هُوَ وَمَا يَقْرُبُ كِلَاهُمَا حَدُّ الْاِعْجَازِ অর্থাৎ বালাগাতের সর্বোচ্চ স্তর এবং সর্বোচ্চ স্তরের নিকটবর্তী স্তর উভয়টি ই'জাযের পর্যায়ে। অর্থাৎ শুধুমাত্র সর্বোচ্চ স্তরই ই'জাযের পর্যায়ে নয়; বরং সর্বোচ্চ স্তরের নিকটবর্তী স্তরও ই'জাযের পর্যায়ে, যা মানবীয় রচনার সাধ্যের বাইরে। মুসান্নিফ حَدُّ الْاِعْجَازِ (خبر)-এর كِلَاهُمَا (مبتدأ)-কে উহ্য রেখেছেন, যাতে حَدُّ الْاِعْجَازِ (مفرد)-কে اَعْلٰى এবং وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ উভয়ের খবর বলা বিশুদ্ধ হয়। কেননা, مبتدأ যদি দু'টি বিষয় হয়, তাহলে তার خبر দ্বিবচন আনতে হয়। তখন مفرد খবর হতে পারে না। এখন كِلَاهُمَا حَدُّ الْاِعْجَازِ পুরো বাক্যটি খবর হবে।

قَوْلُهٗ هٰذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِى الْمِفْتَاحِ : এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, مَا يَقْرُبُ مِنْهُ-এর معطوف عليه-এর ব্যাপারে আমি যা বললাম, তা আল্লামা সাক্কাকীর মিফতাহুল উলূমের বক্তব্য অনুযায়ী সঠিক বা এর অনুরূপ।

قَوْلُهٗ وَ زَعَمَ بَعْضُهُمْ اَنَّهٗ عَطْفٌ : এখান থেকে মুসান্নিফ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ-এর معطوف عليه-এর ব্যাপারে কতিপয় লোকের মন্তব্য উপস্থাপন করতঃ তার অসারতা প্রমাণ করেছেন। কতিপয় লোক হচ্ছেন اِيْضَاحْ গ্রন্থের কতিপয় ব্যাখ্যাকার। তারা বলেন, مَا يَقْرُبُ مِنْهُ-এর معطوف عليه হলো حَدُّ الْاِعْجَازِ আর منه-এর সর্বনামের مَرْجِعْ হলো حَدُّ الْاِعْجَازِ অর্থাৎ মুসান্নিফ যা বলেছেন, তার বিপরীত। মুসান্নিফের কথা দ্বারা বুঝা গেল حَدُّ الْاِعْجَازِ একটি نوع যার দু'টি فرد আছে- ১. اَعْلٰى ২. مَا يَقْرُبُ مِنَ الْاَعْلٰى আর কতিপয় লোকের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যাচ্ছে اَلطَّرْفُ الْاَعْلٰى একটি نوع যার দু'টি فرد রয়েছে- ১. حَدُّ الْاِعْجَازِ ২. مَا يَقْرُبُ مِنْ حَدِّ الْاِعْجَازِ

قَوْلُهٗ وَفِيْهِ نَظَرٌ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়, কারণ তাদের কথা দ্বারা বুঝা যায় طَرْف اَعْلٰى-এর দু' প্রকার- ১. حَدُّ الْاِعْجَازِ ২. مَا يَقْرُبُ مِنْ حَدِّ الْاِعْجَازِ অথচ এটি সঠিক হতে পারে না। কারণ, طَرْف اَعْلٰى এমন একটি একক যা বিভক্তিকে চায় না। طرف বা শীর্ষের ক্ষেত্রে এ নীতিই কার্যকর। কেননা, طرف বা শীর্ষদেশ হলো نقطه-এর মতো, যা বিভক্তিকে গ্রহণ করে না। তা ছাড়া তাদের বক্তব্য দ্বারা اَخْبَارٌ عَنِ الْوَاحِدِ بِمُتَعَدِّدٍ অর্থাৎ এক বস্তুর খবর একাধিক বস্তু দ্বারা দেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এ দু'টি বিষয় সঠিক নয়।

সারকথা হলো, طَرْف اَعْلٰى একটিই হয়ে থাকে, একাধিক হতে পারে না। কিন্তু তাদের عطف অনুসারে طَرْف اَعْلٰى একাধিক হয়ে যায়, তাই তাদের বক্তব্য গ্রহণ করা গেল না। অর্থাৎ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ-এর আত্ফ حَدُّ الْاِعْجَازِ-এর উপর হবে না; বরং هُوَ-এর উপরই হবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ বিষয়ে আমি মুতাওয়ালে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তোমাদের যাদের আগ্রহ আছে তারা মুতাওয়াল দেখতে পার। কারণ, সমুদ্রের গভীর তলদেশে না গেলে মুক্তা পাওয়া যায় না।

সার-সংক্ষেপ :

ক. বালাগাতে কালামের প্রধানতম দু'টি স্তর রয়েছে- ১. প্রথম স্তরটি হচ্ছে اَعْلٰى বা চূড়ান্ত পর্যায়ের ও সর্বোচ্চ স্তরের বালাগাত সমৃদ্ধ। এ স্তরকে حَدُّ الْاِعْجَازِ বলা হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীম এ স্তরের উদাহরণ।

খ. লেখক বলেন, اَعْلٰى-এর কাছাকাছি স্তরটিও اِعْجَازْ-এর পর্যায়ে।

وَاَسْفَلُ وَهُوَ مَا اِذَا غُيِّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ اِلٰى مَا دُوْنَهٗ اَىْ اِلٰى مَرْتَبَةٍ وَهِىَ اَدْنٰى مِنْهُ وَاَنْزَلُ اِلْتَحَقَ الْكَلَامُ وَاِنْ كَانَ صَحِيْحَ الْاِعْرَابِ عِنْدَ الْبُلَغَاءِ بِاَصْوَاتِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِىْ تَصْدُرُ عَنْ مَحَالِّهَا بِحَسْبِ مَا يَتَّفِقُ مِنْ غَيْرِ اِعْتِبَارِ اللَّطَائِفِ وَالْخَوَاصِّ الزَّائِدَةِ عَلٰى اَصْلِ الْمُرَادِ وَبَيْنَهُمَا اَىْ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ مَرَاتِبُ كَثِيْرَةٌ مُتَفَاوِتَةٌ بَعْضُهَا اَعْلٰى مِنْ بَعْضٍ بِحَسْبِ تَفَاوُتِ الْمَقَامَاتِ وَ رِعَايَةِ الْاِعْتِبَارَاتِ وَالْبُعْدِ مِنْ اَسْبَابِ الْاِخْلَالِ بِالْفَصَاحَةِ ـ

অনুবাদ : আর (আরেক প্রকার হলো) اَسْفَلُ তা **হচ্ছে কালামকে তার থেকে নিচুস্তরের দিকে পরিবর্তন করে নিম্নগামী করে দেওয়া,** যা তা থেকে নিচুস্তরের এবং কম মর্যাদার। **ফলে ইবারত** ব্যাকরণগতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও **বালাগাত শাস্ত্রবিদদের নিকট ইতর প্রাণীদের আওয়াজের সাথে মিলে যায় বা সমপর্যায়ে হয়ে যায়,** যা স্বস্থান থেকে কোনো একভাবে নির্গত হয় এবং যার মধ্যে আসল অর্থের চেয়ে বেশি ঐ সব সূক্ষ্ম বিষয় এবং অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য থাকে না। **এতদুভয়ের মাঝে** অর্থাৎ দু'দিকের মাঝে **পরস্পর ভিন্ন অনেক স্তর রয়েছে।** যার কতকগুলো অন্য কতকগুলো থেকে উত্তম, মাকামের ভিন্নতা, বিভিন্ন বিষয় লক্ষ্য করা এবং ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয় থেকে দূরে থাকার কারণে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَاَسْفَلُ وَهُوَ الخ : উপরোক্ত ইবারতে বালাগাতের দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা এসেছে। দ্বিতীয় প্রকার طَرْفُ اَسْفَلُ বা সর্ব নিম্নস্তর। (طَرْفُ اَسْفَلُ) বা সর্ব নিম্নস্তর কাকে বলে? এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মূল লেখক বলেন- وَهُوَ مَا اِذَا غُيِّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ اِلٰى مَا دُوْنَهٗ অর্থাৎ এটি এমন একটি স্তর যেখানে কালামকে اَسْفَلْ-এর নিচুস্তর নামিয়ে দেওয়া হয় বা কালাম এমন নিম্নমানের হয় যে, মুকতাযায়ে হালের প্রতি সামান্যতম লক্ষ্য করা হয়নি। যার ফলে এ ধরনের কথা ব্যাকরণগতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বালাগাতশাস্ত্রবিদদের নিকট ইতর প্রাণীদের আওয়াজের পর্যায়ে চলে যায়, যা কোনো একভাবে মুখ থেকে নির্গত হয়, না থাকে এতে সূক্ষ্ম বিষয়ের লক্ষ্য এবং না থাকে এতে আসল অর্থের বাইরে অতিরিক্ত কোনো বৈশিষ্ট্য।

قَوْلُهٗ وَبَيْنَهُمَا اَىْ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ مَرَاتِبُ كَثِيْرَةٌ : এখান থেকে লেখক اَعْلٰى এবং اَسْفَلْ-এর মধ্যবর্তী প্রকার সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছেন। তিনি বলেন, اَعْلٰى এবং اَسْفَلْ-এর মধ্যে অনেকগুলো মধ্যস্তরের প্রকার রয়েছে, যেগুলো পরস্পর ভিন্ন, তাদের মাঝে এই ভিন্নতা কালামের মাকামের ভিন্নতা এবং বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করা বা না করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণেই একটি অন্য আরেকটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ এক শ্রোতার মাঝে দশটি حال পাওয়া গেল, এর প্রত্যেকটি একেকটি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। এমতাবস্থায় বক্তা যদি তার কথায় দশটি বৈশিষ্ট্যকেই ব্যবহার করে, তাহলে তার কথা বালাগাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হলো। আর যদি শ্রোতার حال অনুসারে দশটির একটি বৈশিষ্ট্যকে তার কথায় ব্যবহার করে, তাহলে সেটি اَسْفَلْ বা সর্বনিম্নস্তরের বালাগাত হলো। এ দু'টির (দশ ও একের) মাঝে অনেকগুলো স্তর আছে। যাদের একটি অন্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। যেমন- বক্তার কথায় পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকলে সেটি উত্তম হবে বক্তার ঐ কথা থেকে, যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এমনিভাবে যার কথায় ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদি নেই এবং কথাটি মুকতাযায়ে হাল অনুসারে ব্যবহার হয়েছে তার এ কথাটি ঐ কথার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে যার মধ্যে ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর সামান্য কিছু পাওয়া গেল, কিন্তু সেটি কথাকে ফাসাহাত থেকে বের করেনি। যদিও বাক্যটি মুকতাযায়ে হাল অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে।

মোটকথা, কালামের হালের ভিন্নতা, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করার কারণে বালাগাতের স্তরের মাঝে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদির উপস্থিতির কারণেও বালাগাতের স্তর বিভিন্ন ধরনের হয়।

সার-সংক্ষেপ : ক. বালাগাতে সর্ব নিম্নস্তর বা اَسْفَلْ স্তর হচ্ছে এমন ভাষা যা (লেখকের ভাষ্যানুসারে) ইতর প্রাণীদের আওয়াজের পর্যায়ে পড়ে। খ. বালাগাতের সর্বোচ্চ স্তর ও সর্বনিম্ন স্তরের মাঝে অনেকগুলো মধ্যবর্তী স্তর রয়েছে।

وَتَتْبَعُهَا اَىْ بَلَاغَةَ الْكَلَامِ وُجُوْهٌ اُخَرُ سِوَى الْمُطَابَقَةِ وَالْفَصَاحَةِ تُوْرِثُ الْكَلَامَ حُسْنًا وَفِىْ قَوْلِهٖ تَتْبَعُهَا اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ تَحْسِيْنَ هٰذِهِ الْوُجُوْهِ لِلْكَلَامِ عَرَضِىٌّ خَارِجٌ عَنْ حَدِّ الْبَلَاغَةِ وَاِلٰى اَنَّ هٰذِهِ الْوُجُوْهَ اِنَّمَا تُعَدُّ مُحَسِّنَةً بَعْدَ رِعَايَةِ الْمُطَابَقَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَجَعَلَهَا تَابِعَةً لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ دُوْنَ الْمُتَكَلِّمِ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُجْعَلُ الْمُتَكَلِّمُ مُتَّصِفًا بِصِفَةٍ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **বালাগাতে কালামের সাথে** ফাসাহাত এবং মুতাবাকাত ছাড়া **আরো কতক বিষয় যুক্ত হয়, যা কালাম বা কথাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।** লেখকের تَتْبَعُهَا-এর মধ্যে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাক্যের সৌন্দর্যের এ সকল বিষয় সত্তাগত নয়। (এগুলো) বালাগাতের সংজ্ঞার বাইরে এবং এ কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, এ সকল বিষয়কে সৌন্দর্য বর্ধনকারী হিসেবে গণ্য করা হয় ফাসাহাত ও মুতাবাকাতের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখার পর। (লেখক) এ সকল বিষয়কে বালাগাতে কালামের অনুগামী করেছেন, মুতাকাল্লিম বা বক্তার গুণাবলির মধ্যে গণ্য করেননি। কেননা, এগুলো তো এমন নয় যে, বক্তাকে এগুলো দ্বারা ভূষিত করা যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَتَتْبَعُهَا اَىْ بَلَاغَةَ الْكَلَامِ الخ : এ ইবারত দ্বারা লেখক ইলমে বদী'-এর مُحَسِّنَاتٌ বা সৌন্দর্যদানকারী বিষয়গুলোর আলোচনার অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন, ফাসাহাত এবং বালাগাত দ্বারা যেমন বক্তার কথার সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তেমনি ইলমে বদী'-এর مُحَسِّنَاتٌ দ্বারাও কথার মধ্যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। অতএব, مُحَسِّنَاتٌ-এর আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে। তবে ফাসাহাত বালাগাতের সৌন্দর্য এবং مُحَسِّنَاتٌ-এর সৌন্দর্যের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য আছে, তা হলো ফাসাহাত ও বালাগাতের সৌন্দর্য সত্তাগত, আর مُحَسِّنَاتٌ-এর সৌন্দর্য সত্তাগত নয়; বরং এগুলো সত্তাগত সৌন্দর্যের পরে যুক্ত হয়, তাই এগুলো বালাগাতের সংজ্ঞার বাইরে।

قَوْلُهٗ وَفِىْ قَوْلِهٖ تَتْبَعُهَا اِشَارَةٌ الخ : এখানে মুসান্নিফ লেখকের تَتْبَعُهَا বাক্যটির বিশ্লেষণ শুরু করেছেন। تَبِعَ يَتْبَعُ تَبْعًا অর্থ– পিছু পিছু চলা, পদাঙ্ক অনুসরণ করা। উল্লেখ্য যে, যে জিনিস পিছনে পিছনে চলে বা অনুসরণ করে তা অগ্রগামী ব্যক্তির বা অনুসরণীয় ব্যক্তি বা বস্তুর সত্তা হয় না; বরং সত্তা থেকে ভিন্ন হয়। অতএব, تَتْبَعُهَا শব্দের মধ্যে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, বালাগাতে কালামের পেছনে যে বিষয়গুলো যুক্ত হয় সেগুলো বালাগাতে কালামের সাথে পরবর্তীতে যুক্ত হয় এবং বালাগাত কালামের সংজ্ঞার বাইরের বলে গণ্য হয়।

এ ছাড়া تَتْبَعُهَا-এর মধ্যে এ কথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ফাসাহাত ও মুতাবাকাত তথা বালাগাত হাসিল হওয়ার পর এগুলো ধর্তব্য হয়, অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে প্রথমত বালাগাত থাকতে হবে, তারপর এতে ইলমে বদী'-এর সৌন্দর্যদানকারী বিষয়গুলোর অনুপ্রবেশ ঘটবে।

قَوْلُهٗ وَجَعَلَهَا تَابِعَةً : এ কথার দ্বারা মুসান্নিফ একটি কারণ দর্শাচ্ছেন। কারণটি হলো লেখক ইলমে বদী'-এর বিষয়গুলোকে শুধুমাত্র বালাগাতে কালামের تَابِعٌ বা অনুগামী কেন করলেন? এবং বালাগাতে কালামের সাথে মুতাকাল্লিমের অনুগামী কেন করলেন না? এর কারণ হলো, ইলমে বদী'-এর مُحَسِّنَاتٌ পরিভাষায় কালামের সিফাত হয়। মুতাকাল্লিম

এগুলো দ্বারা ভূষিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ কোনো ব্যক্তি যদি তার কথার মধ্যে تَرْصِيْع ، تَطْبِيْق ، تَجْنِيْس ইত্যাদি صنعت গুলোকে ব্যবহার করে, তাহলে তার কথাকে যথাক্রমে كَلَامٌ مُرَصَّعٌ، كَلَامٌ مُطَبَّقٌ، كَلَامٌ مُجَنَّسٌ বলা হয়; কিন্তু এসব صنعت-কে মুতাকাল্লিম-এর সিফাত হিসেবে ব্যবহার করে مُتَكَلِّمٌ مُجَنَّسٌ وَمُطَبَّقٌ وَمُرَصَّعٌ বলা যায় না। অতএব, যেহেতু বালাগাতশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় مُحَسِّنَاتٌ মুতাকাল্লিমের সিফাতরূপে ব্যবহার করার রীতি নেই, তাই এগুলোকে মুসান্নিফ মুতাকাল্লিমের সিফাত হিসেবে দেখাননি; বরং (বালাগাতের ব্যবহার অনুযায়ী) কালামের সিফাতরূপে দেখিয়েছেন। তা ছাড়া এভাবেও বলা যায় যে, এসব صنعت কেবল কালামের জন্য مُحَسِّنَةٌ বা সৌন্দর্য দানকারী, মুতাকাল্লিমের مُحَسِّنَةٌ নয়। এ কারণে মুসান্নিফ (র.) এগুলোকে মুতাকাল্লিমের সিফাত বলে ব্যক্ত করেননি।

এখানে কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বালাগাতের ক্ষেত্রে তো মুতাকাল্লিমকে বালাগাত দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে مُتَكَلِّمٌ بَلِيْغٌ এর কারণ এই ছিল যে, মুতাকাল্লিম বা বক্তার দ্বারা অর্থাৎ তার যোগ্যতা দ্বারা বালাগাত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। অতএব, সেই কারণ তো এখানেও পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ মুতাকাল্লিম দ্বারা ইলমে বদী'-এর تَرْصِيْع تَجْنِيْس ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা পায়। অতএব, এখানেও এগুলো বক্তার সিফাত বলা সমীচীন ছিল। এর উত্তর ইতঃপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, পরিভাষায় এমন ব্যবহার পাওয়া যায় না, যদিও যুক্তির দাবি এমনই ব্যবহার হওয়ার ছিল। যেমন– ফাসাহাত ও বালাগাতের ক্ষেত্রে হয়েছে। যথা– مُتَكَلِّمٌ فَصِيْحٌ اَوْ بَلِيْغٌ

وَالْبَلَاغَةُ فِى الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلٰى تَالِيْفِ كَلَامٍ بَلِيْغٍ فَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ اَنَّ كُلَّ بَلِيْغٍ كَلَامًا كَانَ اَوْ مُتَكَلِّمًا عَلٰى اِسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرِكِ فِىْ مَعْنَيَيْهِ اَوْ عَلٰى تَاوِيْلِ كُلِّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْبَلِيْغِ فَصِيْحٌ لِاَنَّ الْفَصَاحَةَ مَاخُوْذَةٌ فِىْ تَعْرِيْفِ الْبَلَاغَةِ مُطْلَقًا وَلَا عَكْسَ اَىْ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِىِّ اَىْ لَيْسَ كُلُّ فَصِيْحٍ بَلِيْغًا لِجَوَازِ اَنْ يَّكُوْنَ كَلَامٌ فَصِيْحٌ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَكَذَا يَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ لِاَحَدٍ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيْرِ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِلَفْظٍ فَصِيْحٍ مِنْ غَيْرِ مُطَابَقَةٍ لِمُقْتَضَى الْحَالِ ـ

অনুবাদ : আর বালাগাতে মুতাকাল্লিম হলো এমন এক যোগ্যতা যার সাহায্যে বক্তা বালাগাতপূর্ণ কথা (বলতে ও) **লিখতে সক্ষম হয়। সুতরাং** পূর্ব আলোচনা দ্বারা **বুঝা গেল প্রত্যেক বালীগ** বা বালাগাতসমৃদ্ধ কথা বা বক্তা (এ অর্থ নেওয়া হয়েছে।) لَفْظ مُشْتَرَكْ দু' অর্থে (একই সাথে) ব্যবহার করার ভিত্তিতে। অথবা এ ব্যাখ্যায় যে, যাকে বালীগ বলা যায়, **তা ফসীহও বটে**। কেননা, ফাসাহাত সর্বাবস্থায় বালাগাতের সংজ্ঞার মধ্যে গৃহীত হয়, **কিন্তু তার বিপরীত হয় না**। তথা আভিধানিকভাবে অর্থাৎ প্রত্যেক ফসীহ বালীগ নয়। কারণ, এমনও হতে পারে যে, বাক্য ফাসাহাতপূর্ণ তো হলো; কিন্তু তা মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হলো না। এমনিভাবে এটাও সম্ভব যে, কোনো এক ব্যক্তির এমন যোগ্যতা আছে যার সাহায্যে তার মাকসাদকে ফাসাহাতপূর্ণ বাক্য দ্বারা বলে, যা মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْبَلَاغَةُ فِى الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا : এ ইবারত দ্বারা বালাগাতে মুতাকাল্লিম-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে। বালাগাতে মুতাকাল্লিম বলা হয় এমন এক যোগ্যতাকে যার দ্বারা বক্তা মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক বাক্য বলতে সক্ষম হয়। مَلَكَةٌ-এর ব্যাখ্যা ফাসাহাতে মুতাকাল্লিমের আলোচনায় গত হয়েছে। এ সংজ্ঞার দ্বারা বুঝা গেল, কোনো ব্যক্তির বালীগ হওয়ার জন্য যোগ্যতাই যথেষ্ট, চাই সে বালাগাতপূর্ণ কথা তথা মুকতাযায়ে হাল অনুযায়ী কথা বলুক বা না বলুক।

قَوْلُهُ فَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ اَنَّ كُلَّ بَلِيْغٍ : উক্ত ইবারত দ্বারা লেখক বালীগ এবং ফসীহ-এর মাঝে কি নিসবত আছে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, পূর্বের আলোচনা তথা ফাসাহাত ও বালাগাত সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল- প্রত্যেক বালীগ (কথার ক্ষেত্রে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে) অবশ্যই ফসীহ হবে; কিন্তু প্রত্যেক ফসীহ (কথা বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে) বালীগ হবে না। অর্থাৎ عام خاص مطلق-এর নিসবত। নিসবতের আলোচনা সামনে আরো আসছে।

قَوْلُهُ كَلَامًا كَانَ اَوْ مُتَكَلِّمًا عَلٰى اِسْتِعْمَالِ الخ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো- بَلِيْغ শব্দটি كَلَامْ بَلِيْغ এবং مُتَكَلِّمْ بَلِيْغ-এর মাঝে لَفْظ مُشْتَرَكْ অর্থাৎ একটি শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। তবে প্রত্যেকটি অর্থ বুঝানোর জন্য শব্দটিকে আলাদা করে প্রয়োগ করতে হয়। এক প্রয়োগে একাধিক অর্থ বুঝায় না। কিন্তু মুসান্নিফ তো এখানে এক প্রয়োগে একাধিক অর্থ (كَلَامٌ بَلِيْغٌ وَمُتَكَلِّمٌ بَلِيْغٌ) উদ্দেশ্য করলেন, তবে তিনি তা কিভাবে করলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই ইবারত বলছেন عَلٰى اِسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الخ, উত্তরটিকে বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের مشترك সম্পর্কে বিশদ ধারণা থাকতে হবে তাই প্রথমে জেনে রাখা দরকার مُشْتَرَكٌ দু'ধরনের-

১. اِشْتِرَاكٌ لَفْظِىٌّ ২. اِشْتِرَاكٌ مَعْنَوِىٌّ

اِشْتِرَاكٌ لَفْظِىٌّ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, اِشْتِرَاكٌ لَفْظِىٌّ বলা হয়- একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকা। তবে শব্দটি এক প্রয়োগে একাধিক অর্থ বুঝাতে পারে না। প্রতিটি অর্থ বুঝানোর জন্য ভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে

হয়। যেমন– عَيْنٌ শব্দের অর্থ চোখ এবং ঝরনা। অর্থাৎ عَيْنٌ শব্দটি চোখ এবং ঝরনার অর্থের মধ্যে مُشْتَرَكٌ কিন্তু عَيْنٌ বলে এক সাথে দুটো অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না; বরং দু'টি অর্থের জন্য দুবার আলাদা প্রয়োগ করতে হবে।

اِشْتِرَاكٌ مَعْنَوِيٌّ : اِشْتِرَاكٌ مَعْنَوِيٌّ বলা হয় একটি শব্দের এমন একটি مفهوم كلى বা সার্বিক অর্থ হওয়া, যার অধীনে একাধিক فرد রয়েছে। যেমন– اِنْسَانٌ শব্দের অর্থ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ, এর অধীনে অনেক সদস্য রয়েছে যার প্রত্যেকটিকে اِنْسَانٌ বলা হয়। সুতরাং اِنْسَانٌ শব্দটি এসবগুলো সদস্যের ক্ষেত্রে مُشْتَرَكٌ مَعْنَوِيٌّ। উপরোক্ত আলোচনার পর আমরা প্রশ্নের উত্তরের দিকে ফিরে আসছি। মুসান্নিফ (র.) বলেন, بَلِيْغٌ শব্দটি كَلَامٌ بَلِيْغٌ وَمُتَكَلِّمٌ بَلِيْغٌ-এর ক্ষেত্রে مشترك لفظى আর এখানে بليغ শব্দটি ব্যবহার করে এক সাথে দু'টি অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে এ হিসেবে যে, কারো কারো মতে مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ-এর একাধিক অর্থ এক প্রয়োগে উদ্দেশ্য হতে পারে। যদিও অনেকের মতে এটি সঠিক নয়, যারা মনে করেন এটি সঠিক নয় তাদের জন্য মুসান্নিফের উত্তর হলো بليغ শব্দটি مُشْتَرَكٌ مَعْنَوِيٌّ অর্থাৎ بَلِيْغٌ দ্বারা এখানে كُلُّ مَا يَطْلُقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْبَلِيْغِ উদ্দেশ্য। আর كُلُّ مَا يَطْلُقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْبَلِيْغِ হলো একটি مَفْهُوْمٌ كُلِّيٌّ বা সার্বিক অর্থ, যার অধীনে দু'টি فرد রয়েছে। আমরা জানি, مشترك معنوى-এর প্রত্যেক অর্থ এক সাথে উদ্দেশ্য হতে পারে।

লেখক বলেন, প্রত্যেক بَلِيْغٌ অবশ্যই فَصِيْحٌ হবে। কারণ, সর্বাবস্থায় বালাগাতের সংজ্ঞার মধ্যে ফাসাহাত শর্ত অর্থাৎ বালাগাতে কালাম হলেও ফাসাহাত শর্ত, এমনিভাবে বালাগাতে মুতাকাল্লিম হলেও তা শর্ত। বালাগাতে কালামের জন্য ফাসাহাতের শর্ত স্পষ্ট এবং মাধ্যম ছাড়া বা সরাসরি। আর বালাগাতে মুতাকাল্লিমের ক্ষেত্রে বালাগাতে কালামের মাধ্যমে ফাসাহাতকে শর্ত করা হয়েছে। কেননা, বালাগাতে মুতাকাল্লিমের মধ্যে বলা হয়েছে مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلٰى تَالِيْفِ كَلَامٍ بَلِيْغٍ আর كَلَامٌ بَلِيْغٌ হওয়ার জন্য ফাসাহাত শর্ত।

মোটকথা, প্রত্যেক بَلِيْغٌ অবশ্যই فَصِيْحٌ হবে; কিন্তু তার বিপরীত হবে না। অর্থাৎ প্রত্যেক فَصِيْحٌ বালীগ হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। কেননা, এমনও হতে পারে যে, একটি বাক্য ফসীহ হলো অর্থাৎ ফাসাহাতের জন্যে ক্ষতিকর কিছু তাতে নেই; কিন্তু বাক্যটি মুকতাযায়ে হালের বিপরীত হলো। এমতাবস্থায় বাক্যটি ফসীহ হলেও বালীগ হয়নি। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তির বিশুদ্ধ কথা বলার যোগ্যতা আছে; কিন্তু তার কথা মুকতাযায়ে হালের অনুযায়ী হয় না বা সে মুকতাযায়ে হালের অনুযায়ী বক্তব্য দানে সক্ষম নয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে مُتَكَلِّمٌ فَصِيْحٌ বলা হবে; কিন্তু مُتَكَلِّمٌ بَلِيْغٌ বলা যাবে না।

قَوْلُهُ وَلَا عَكْسَ اَیْ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ : এখানে মুসান্নিফ (র.) وَلَا عَكْسَ বলার পর بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ-এর দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে عَكْس দ্বারা পরিভাষাগত عَكْس বা তর্কশাস্ত্রবিদদের عَكْس উদ্দেশ্য নয়। তর্কশাস্ত্রবিদদের পরিভাষা অনুসারে كُلُّ بَلِيْغٍ فَصِيْحٌ হলো موجبه كليه এর عَكْس হলো موجبه جزئيه অর্থাৎ بَعْضُ فَصِيْحٍ بَلِيْغٌ অর্থাৎ কতক ফসীহ বালীগ হয়ে থাকে। আর لَا عَكْس-এর অর্থ হলো لَيْسَ بَعْضُ فَصِيْحٍ بَلِيْغًا অর্থাৎ কতেক ফসীহ বালীগ নয়। তার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, আরো কতেক ফসীহ অবশ্যই বালীগ। অথচ এই অর্থ সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, কোনো ফসীহ-এর বালীগ হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। আর যদি আভিধানিক عَكْس উদ্দেশ্য হয়, যেমনটি মুসান্নিফ বলেছেন, তাহলে موجبة كلية-এর আক্স موجبة كلية-ই আসে। সুতরাং لَا عَكْس-এর অর্থ হবে لَيْسَ كُلُّ فَصِيْحٍ بَلِيْغًا অর্থাৎ প্রত্যেক ফসীহ بَلِيْغٌ হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। এই অর্থই সঠিক এবং এ স্থানে এটাই উদ্দেশ্য।

সার-সংক্ষেপ :

ক. اَلْبَلَاغَةُ فِى الْمُتَكَلِّمِ-এর সংজ্ঞা : কোনো মুতাকাল্লিমের মাঝে যখন মনের ভাব ও উদ্দিষ্ট বিষয় كَلَامٌ بَلِيْغٌ (বালাগাতপূর্ণ বাক্য) দ্বারা ব্যক্ত করার স্বভাবগত যোগ্যতা সৃষ্টি হবে, তখন তাকে مُتَكَلِّمٌ بَلِيْغٌ বলা হবে।

খ. بَلِيْغٌ শব্দ বাক্য ও বক্তা উভয়ের বিশেষণ হতে পারে। অতএব, যখন বলা হবে كُلُّ بَلِيْغٍ তখন এর দ্বারা বক্তা ও বাক্য উভয়কে উদ্দেশ্য করা যাবে। কেননা, কারো কারো মতে لَفْظ مُشْتَرَكٌ দ্বারা একাধিক বিষয় একসাথে উদ্দেশ্য করা যায়। অথবা এভাবে উদ্দেশ্য করা হবে যে, بَلِيْغٌ শব্দটি একটি كلى (কুল্লী), যার দু'টি فرد রয়েছে– ১. কালাম, ২. মুতাকাল্লিম। অথবা বক্তা যখনই بَلِيْغٌ হবে তখন সে فَصِيْحٌও অবশ্যই হবে; কিন্তু فَصِيْحٌ হলেই بَلِيْغٌ হবে এমনটি নয়।

وَ عُلِمَ اَيْضًا اَنَّ الْبَلَاغَةَ فِى الْكَلَامِ مَرْجِعُهَا اَىْ مَا يَجِبُ اَنْ يَحْصُلَ حَتّٰى يُمْكِنَ حُصُوْلُهَا كَمَا يُقَالُ مَرْجِعُ الْجُوْدِ اِلَى الْغِنٰى اِلَى الْاِحْتِرَازِ عَنِ الْخَطَأِ فِىْ تَادِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ وَاِلَّا لَرُبَّمَا اَدّٰى الْمَعْنَى الْمُرَادَ بِلَفْظٍ غَيْرِ مُطَابِقٍ لِمُقْتَضَى الْحَالِ فَلَايَكُوْنُ بَلِيْغًا وَاِلٰى تَمْيِيْزِ الْكَلَامِ الْفَصِيْحِ عَنْ غَيْرِهٖ وَاِلَّا لَرُبَّمَا اَوْرَدَ الْكَلَامَ الْمُطَابِقَ لِمُقْتَضَى الْحَالِ غَيْرَ فَصِيْحٍ فَلَايَكُوْنُ بَلِيْغًا لِوُجُوْبِ الْفَصَاحَةِ فِى الْبَلَاغَةِ وَيَدْخُلُ فِىْ تَمْيِيْزِ الْكَلَامِ الْفَصِيْحِ مِنْ غَيْرِهٖ تَمْيِيْزُ الْكَلِمَاتِ الْفَصِيْحَةِ مِنْ غَيْرِهَا لِتَوَقُّفِهٖ عَلَيْهَا ـ

অনুবাদ : আর এ কথাও জানা গেল যে, **বালাগাতে কালামের উৎস হলো** অর্থাৎ যা শিক্ষা করা অত্যাবশ্যকীয়, যাতে বালাগাতে কালাম অর্জন করা সম্ভব হয়। যেমন বলা হয়, বদান্যতার উৎস হলো ধনাঢ্যতা। (বালাগাতে কালামের প্রথম উৎস হলো) কাঙ্ক্ষিত অর্থ আদায়ে ভুল থেকে বেঁচে থাকা। অন্যথায় সে কখনো তার উদ্দিষ্ট অর্থ এমন শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করবে, যা মুকতাযায়ে হালের অনুযায়ী হয় না। ফলে তা বালাগাতপূর্ণ হবে না।

(আর দ্বিতীয় উৎস হলো) ফাসাহাতপূর্ণ বাক্যকে ফাসাহাতমুক্ত বাক্য থেকে পৃথক করা। অন্যথায় সে ফাসাহাতবিহীন মুকতাযায়ে হালের অনুযায়ী বাক্য পেশ করে দিবে, ফলে তাও বালীগ হবে না। কেননা, বালাগাতের জন্য ফাসাহাত অত্যাবশ্যকীয়। ফাসাহাতপূর্ণ বাক্যকে ফাসাহাতমুক্ত বাক্য থেকে পৃথক করার শর্তের মধ্যে ফাসাহাতপূর্ণ শব্দসমূহকে ফাসাহাতবিহীন শব্দসমূহ থেকে পৃথক করার কথাটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা, কালাম বা বাক্য শব্দসমূহের উপর নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَعُلِمَ اَيْضًا اَنَّ الْبَلَاغَةَ : উল্লিখিত ইবারতে বালাগাতের উৎস বা বালাগাত কোন কোন জিনিসের উপর নির্ভরশীল, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বলেন, ফাসাহাত এবং বালাগাতের উৎস অর্থাৎ যার উপর বালাগাত নির্ভরশীল এবং যা হাসিল করলে বালাগাত হাসিল করা সম্ভব তা হলো মোটামুটিভাবে দু'টো।

মুসান্নিফ (র.) مَرْجِعٌ শব্দের বা উৎসের ব্যবহার দেখাচ্ছেন এভাবে যেমন– مَرْجِعُ الْجُوْدِ اِلَى الْغِنٰى অর্থাৎ দানশীলতার উৎস ধনাঢ্যতা।

উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.) এখানে শুধুমাত্র বালাগাতের উৎস বলেছেন, বালাগাত এবং ফাসাহাতের উৎস বলেননি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বালাগাতের উৎস বলে যে দু'টি বিষয়কে পেশ করেছেন, এর একটি হলো বালাগাতের উৎস আরেকটি ফাসাহাতের উৎস ফাসাহাতের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ না করার কারণ হলো, বালাগাতের জন্য ফাসাহাত শর্ত এবং বালাগাত পাওয়ার জন্য ফাসাহাতের উপস্থিতি জরুরি। তাই বলা যায় যে, বালাগাত বলার দ্বারা ফাসাহাত-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

মোটকথা, বালাগাতের উৎস দু'টি– ১. উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল থেকে বাঁচা। ২. ঐ সকল কারণ থেকে বাঁচা যা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর। এমন কারণ সাতটি– ১. تَنَافُرُ حُرُوْف ২. غَرَابَتْ ৩. مُخَالَفَةُ قِيَاسْ لُغَوِىْ ৪. تَنَافُرْ كَلِمَاتْ ৫. ضُعْف تَالِيْف ৬. تَعْقِيْد لَفْظِىْ ৭. تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ

مُخِلْ بِالْفَصَاحَةِ থেকে বেঁচে থাকাকে লেখক এক কথায় এভাবে বলেছেন, ফাসাহাতপূর্ণ বাক্যকে ফাসাহাতবিহীন বাক্য থেকে পৃথক করা। অতএব, যখন এ সাতটি বিষয়ের কোনো একটি বাক্যে পাওয়া যাবে, তখন আর ফাসাহাতপূর্ণ বাক্যকে ফাসাহাতমুক্ত বাক্য থেকে পৃথক করার বিষয়টি পাওয়া গেল না। আবার যখন এ বিষয়টি পাওয়া গেল না, তখন

ফাসাহাতও পাওয়া যাবে না। আর ফাসাহাত না পাওয়া গেলে বালাগাত পাওয়া যাবে না। কেননা, বালাগাত পাওয়া যাওয়ার জন্য ফাসাহাত পাওয়া যাওয়া শর্ত।

প্রথম উৎস হলো– اَلْاِحْتِرَازُ عَنِ الْخَطَإِ فِىْ تَادِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল থেকে বাঁচা। এর জন্য বাক্যকে মুকতাযায়ে হালের অনুযায়ী ব্যবহার করা জরুরি। সুতরাং যদি কেউ মুকতাযায়ে হালের অনুযায়ী বাক্য ব্যবহার না করে, তবে তার বাক্য بَلِيْغ হবে না।

দ্বিতীয় উৎস হলো– تَمْيِيْزُ الْفَصِيْحِ عَنْ غَيْرِهٖ অর্থাৎ ফাসাহাতপূর্ণ বাক্যকে ফাসাহাতমুক্ত বাক্য থেকে পৃথক করা। এর জন্য তাকে পূর্বে ফাসাহাতের ক্ষতিকারক সাতটি বিষয় থেকে মুক্ত থাকা জরুরি। সুতরাং যদি কারো বাক্য মুকতাযায়ে হাল অনুযায়ী হলো; কিন্তু ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর কোনো একটি বা একাধিক বিষয় তাতে রয়ে গেল, তাতেও বাক্যটি বালাগাতপূর্ণ বা بَلِيْغ হলো।

قَوْلُهٗ وَيَدْخُلُ فِىْ تَمْيِيْزِ الْكَلَامِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো– বালাগাতে কালামের মধ্যে ফাসাহাতবিহীন কালামকে বাদ দিতে হয় এবং শুধুমাত্র ফসীহ কালামকে নিতে হয়; কিন্তু বালাগাতে কালামের মধ্যে ফাসাহাতবিহীন শব্দসমূহের বাদ দেওয়ার কথা তো নেই? অথচ আমরা জানি, ফাসাহাতবিহীন শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটলে বালাগাতে কালামের ক্ষতি হয় এবং বালাগাতে কালামের সংজ্ঞার মধ্যেও শব্দসমূহের ফসীহ হওয়ার শর্ত রয়েছে।

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, يَدْخُلُ فِىْ تَمْيِيْزِ الْكَلَامِ الْفَصِيْحِ-এর অর্থ হলো ফসীহ বাক্যকে ফাসাহাতবিহীন বাক্য থেকে পৃথক করার মধ্যেই ফসীহ শব্দসমূহকে অফসীহ শব্দসমূহ থেকে পৃথক করার বিষয়টি নিহিত রয়েছে। কেননা, বাক্য বা কালামের ফাসাহাত শব্দসমূহের ফাসাহাতের উপর নির্ভরশীল। অতএব, কালাম তখনই ফাসাহাতযুক্ত হবে, যখন কালামের অন্তর্ভুক্ত সবগুলো কালিমা ফাসাহাতযুক্ত হবে। তাই মুসান্নিফ (র.) শব্দসমূহের ফাসাহাতযুক্ত হওয়ার বিষয়টি আলাদা করে উল্লেখ করেননি।

সার-সংক্ষেপ :

বালাগাতের উৎস দু'টি– ১. উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে স্থান-কাল-পাত্রের বিপরীত কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

২. শুদ্ধ-সাবলীল বাক্য (كَلَامٌ فَصِيْحٌ)-কে অশুদ্ধ-অসাবলীল বাক্য থেকে পৃথক করা।

وَ الثَّانِىْ اَىْ تَمْيِيْزُ الْفَصِيْحِ مِنْ غَيْرِهٖ مِنْهُ اَىْ بَعْضُهٗ مَا يُبَيَّنُ اَىْ يُوْضَحُ فِىْ عِلْمِ مَتْنِ اللُّغَةِ كَالْغَرَابَةِ وَاِنَّمَا قَالَ مَتْنَ اللُّغَةِ اَىْ مَعْرِفَةَ اَوْضَاعِ الْمُفْرَدَاتِ لِاَنَّ اللُّغَةَ اَعَمُّ مِنْ ذٰلِكَ يَعْنِىْ بِهٖ يُعْرَفُ تَمْيِيْزُ السَّالِمِ مِنَ الْغَرَابَةِ عَنْ غَيْرِهٖ بِمَعْنٰى اَنَّ مَنْ تَتَبَّعَ الْكُتُبَ الْمُتَدَاوَلَةَ وَاَحَاطَ بِمَعَانِى الْمُفْرَدَاتِ الْمَاْنُوْسَةِ عَلِمَ اَنَّ مَا عَدَاهَا عَمَّا يَفْتَقِرُ اِلٰى تَنْقِيْرٍ اَوْ تَخْرِيْجٍ فَهُوَ غَيْرُ سَالِمٍ مِنَ الْغَرَابَةِ وَبِهٰذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ مَا قِيْلَ اِنَّهٗ لَيْسَ فِىْ عِلْمِ مَتْنِ اللُّغَةِ اَنَّ بَعْضَ الْاَلْفَاظِ يَحْتَاجُ فِىْ مَعْرِفَتِهٖ اِلٰى اَنْ يُبْحَثَ عَنْهُ فِى الْكُتُبِ الْمَبْسُوْطَةِ فِى اللُّغَةِ اَوْ فِىْ عِلْمِ التَّصْرِيْفِ كَمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ اِذْ بِهٖ يُعْرَفُ اَنَّ الْاَجْلَلَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ دُوْنَ الْاَجَلِّ اَوْ فِىْ عِلْمِ النَّحْوِ كَضُعْفِ التَّالِيْفِ وَالتَّعْقِيْدِ اللَّفْظِىِّ اَوْ يُدْرَكُ بِالْحِسِّ كَالتَّنَافُرِ اِذْ بِهٖ يُعْرَفُ اَنَّ الْمُسْتَشْزِرَ مُتَنَافِرٌ دُوْنَ مُرْتَفِعٍ وَكَذَا تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ ـ

অনুবাদ : **এবং দ্বিতীয় প্রকার** অর্থাৎ ফসীহ বাক্যকে অফসীহ বাক্য থেকে পৃথক করা, এর থেকে অর্থাৎ এর কতকগুলো (এমন যে, এগুলোকে) **ইলমে মতনে লুগাত** (অভিধানশাস্ত্র)- **এ আলোচনা করা হয়।** যেমন– গারাবাত লেখক (ইলমে লুগাত না বলে) ইলমে মাতনে লুগাত অর্থাৎ অর্থবোধক একক শব্দসমূহ জানা বলেছেন। কেননা, ইলমে লুগাত এর থেকে ব্যাপকতর। অর্থাৎ এর দ্বারা জানা যায় গারাবাতমুক্ত শব্দকে গারাবাতযুক্ত থেকে পৃথক করার প্রক্রিয়া। এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি প্রচলিত-প্রসিদ্ধ (অভিধান) গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করল এবং প্রচলিত ব্যবহৃত শব্দসমূহ জানল, তার একথা জানা হয়ে যাবে যে এ ছাড়া যা রয়েছে তা (এমন যে, এগুলো) জানার জন্য (ব্যাপক) অনুসন্ধান এবং গবেষণার প্রয়োজন হবে এবং সেগুলো গারাবাতমুক্ত নয়। এর দ্বারা এ ব্যাপারে যে (ভিন্ন) মত বর্ণিত আছে তার ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়ে গেল, অর্থাৎ ইলমে মতনে লুগাতের মধ্যে এমন কতক শব্দ নেই, যা জানার জন্য অভিধানের বড় বড় বই অনুসন্ধান করতে হয়, **অথবা ইলমে তাসরীফে** (বা শব্দপ্রকরণ সংক্রান্ত জ্ঞানে) আলোচনা করা হয়। যেমন– মুখালাফাতে কিয়াস। এ ইলম দ্বারা জানা যায় اَجْلَلَ শব্দটি নিয়ম বহির্ভূত; কিন্তু اَجَلَّ শব্দটি নয়। **অথবা ইলমে নাহু বা ব্যাকরণশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়।** যেমন– ضُعْفُ التَّالِيْفِ এবং تَعْقِيْدْ لَفْظِىْ অথবা অনুভূতি দ্বারা বুঝা যায়, যেমন– তানাফুর। কেননা, (অনুভূতি) এর দ্বারা জানা যায় যে, مُسْتَشْزَرْ শব্দটি তানাফুরযুক্ত; কিন্তু مُرْتَفِعْ নয়, এমনিভাবে (অনুভূতি দ্বারা) শব্দসমূহের তানাফুর জানা যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَالثَّانِىْ اَىْ تَمْيِيْزُ الْفَصِيْحِ : ইতঃপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি যে, বালাগাতের উৎস দু'টি বিষয়। দ্বিতীয় প্রকার হলো, ফসীহবাক্য অফসীহবাক্য থেকে পৃথক করা। অর্থাৎ ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়সমূহকে জানা। এগুলো জানলেই ফসীহ এবং ফাসাহাতবিহীন বাক্যসমূহের মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতা অর্জন হবে। এখানে লেখক সংক্ষেপে ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়সমূহের কোনটি কিভাবে জানা যাবে তার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, গারাবাত জানা যাবে অভিধানশাস্ত্রে। মুখালফাতে কিয়াস ইলমে সরফে যু'ফে তালীফ এবং তা'কীদে লফযী জানা যাবে ইলমে নাহুতে এবং অনুভূতির দ্বারা তানাফুর জানা যাবে।

وَمِنْهُ اَىْ بَعْضُهٗ مَا يُبَيَّنُ : مِنْهُ-এর সর্বনামের مَرْجِعْ হলো تَمْيِيْزُ الْفَصِيْحِ আর مِنْهُ দ্বারা উদ্দেশ্য بَعْضُهٗ আর يُبَيَّنُ দ্বারা উদ্দেশ্য يُوْضَحُ অর্থাৎ স্পষ্ট করে বলা বা আলোচনা করা।

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا قَالَ مَتْنُ اللُّغَةِ : এর দ্বারা মুসান্নিফ একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো লেখক عِلْمُ اللُّغَةِ না বলে عِلْمُ مَتْنِ اللُّغَةِ কেন বললেন? এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, اَللُّغَةُ শব্দটি مَتْنُ اللُّغَةِ থেকে ব্যাপক। কেননা, عِلْمُ اللُّغَةِ বললে এর মধ্যে বারোটি ইলম শামিল হয়ে যায়। এক কবি তার কবিতায় এ বারোটি ইলমকে শামিল করেছেন–

لُغَاتُ الْمَعَانِىْ نَحْوُ صَرْفُ اِشْتِقَاقُهُمْ * بَيَانٌ قَوَافٍ قُلْ عَرُوْضٌ وَقَرْضُهُمْ

اِنْشَاءٌ وَتَارِيْخٌ وَخَطٌّ وَاَسْقَطُوْا * بَدِيْعًا وَوَضْعًا فُزْتَ بِالْعِلْمِ بَعْدَهُمْ

অর্থাৎ ইলমে লুগাত বলা হলে নিম্নে বর্ণিত বারটি ইলমকে বুঝায় যথা–

১. নাহু, ২. সরফ, ৩. اِشْتِقَاقٌ, ৪. বয়ান, ৫. শব্দার্থ বা অভিধান, ৬. عَرُوْض, ৭. قَرْض, ৮. تَارِيْخٌ বা ইতিহাস ৯. خَطٌ, ১০. ইনশা, ১১. قَوَاف বা কবিতার অন্তঃমিল সংক্রান্ত জ্ঞান ও ১২. ইলমে বদী'। কিন্তু যদি বলা হয় مَتْنُ اللُّغَةِ তাহলে শুধুমাত্র শব্দ অর্থ এবং অর্থসংক্রান্ত জ্ঞানকে বুঝাবে। مَتْن শব্দের অর্থ পিঠ। এখানে مَتْن অর্থ اَصْل সুতরাং اَصْلُ اللُّغَةِ অর্থ– শুধুমাত্র অভিধান সংক্রান্ত জ্ঞান।

قَوْلُهٗ اَىْ مَعْرِفَةُ اَوْضَاعِ الْمُفْرَدَاتِ : এ বাক্যে عِلْم শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে مَعْرِفَةٌ দ্বারা। তবে জেনে রাখা দরকার عِلْم শব্দটি যেমন– مَعْرِفَةٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি عِلْم অর্থ مَسَائِلُ বা বিধানসমূহ। ইলম অর্থ مَلَكَةٌ বা যোগ্যতা। মুসান্নিফ যদি عِلْم-এর অর্থ এখানে مَسَائِلُ বলতেন, তাহলে উত্তম হতো। পুরো বাক্যটি এমন হতো– وَمِنْهُ مَا يُبَيَّنُ فِىْ مَسَائِلِ اَوْضَاعِ الْمُفْرَدَاتِ الخ কতকগুলো বর্ণনা করা হয় একক অর্থবোধক শব্দের বিধিবিধানে اَوْضَاعُ الْمُفْرَدَاتْ-এর মধ্যে اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে। এটি مَتْنُ اللُّغَةِ-এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা।

قَوْلُهٗ يَعْنِىْ بِهٖ يُعْرَفُ تَمْيِيْزُ الخ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ একটি সন্দেহের খণ্ডন করেছেন। সন্দেহটি হলো يُبَيَّنُ فِىْ عِلْمِ লেখকের এ বাক্য দ্বারা বাহ্যত মনে হয় যে, عِلْمُ مَتْنِ اللُّغَةِ-এর মধ্যে গারাবাতযুক্ত শব্দগুলোর আলোচনা করা হয়েছে; অথচ এই ইলমে এ জাতীয় শব্দ মোটেও নেই। এর খণ্ডন করতে গিয়ে মুসান্নিফ বলেন, يُبَيَّنُ فِىْ عِلْمِ مَتْنِ اللُّغَةِ এটা দ্বারা লেখকের মোটেও উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এ ইলমের মধ্যে غَرَابَتْ-এর আলোচনা থাকবে; বরং উদ্দেশ্য হলো এ ইলমের সাহায্যে এ কথা জানা যাবে যে, কোন শব্দটি গারাবাতযুক্ত এবং কোন শব্দটি ফসীহ। এটা এভাবে হবে যে, যে ব্যক্তি অভিধানের বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি যথা কামুস, আসাস, মিসবাহ ও মুখতাসার ইত্যাদি কিতাব গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে এবং ব্যবহৃত শব্দের ভাণ্ডার আয়ত্ত করবে, সে বুঝতে পারবে উপরোক্ত বিশিষ্ট গ্রন্থাবলির মধ্যে যে সকল শব্দাবলি নেই এবং এগুলো জানতে হলে বিশেষ তত্ত্ব-তালাশের প্রয়োজন। যেমন– تَكَأْكَأْتُمْ، اِفْرَنْقَعُوْا ইত্যাদি। এগুলো গারাবাতমুক্ত নয়।

قَوْلُهٗ وَبِهٰذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ مَا قِيْلَ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের উল্লিখিত বক্তব্য (اَنَّ مَنْ تَتَبَّعَ الْكُتُبَ الْمُتَدَاوَلَةَ) দ্বারা একটি আপত্তির জবাব হয়ে গেছে, যা আল্লামা যাওযানীর পক্ষ থেকে মুসান্নিফের উপর করা হয়েছিল। আপত্তি সৃষ্টি হয়েছিল লেখকের বাহ্যিক বক্তব্যের উপর। কেননা, লেখকের বক্তব্য مِنْهُ مَا يُبَيَّنُ فِىْ عِلْمِ مَتْنِ اللُّغَةِ كَالْغَرَابَةِ দ্বারা বুঝা যায় যে, অভিধানগ্রন্থগুলোর মধ্যে কতেক গারাবাতযুক্ত শব্দসমূহ রয়েছে এবং সেগুলোকে জানার জন্য সুবিশাল অভিধানগ্রন্থসমূহতে তত্ত্ব-তালাশের প্রয়োজন, অথচ বড় বড় অভিধানগ্রন্থগুলোতে গারাবাতের শব্দসমূহ নেই। তাহলে লেখকের কথা কি ভুল? এর উত্তর আমরা পিছনে বর্ণনা করেছি যে, লেখকের বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য সেটা নয় যা আল্লামা যাওযানী বুঝেছেন বা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়।

قَوْلُهٗ اَوْ فِىْ عِلْمِ التَّصْرِيْفِ : মূল লেখক বলেন, ফসীহ বাক্যকে অফসীহ বাক্য থেকে পৃথক করা বা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদির কতগুলোর আলোচনা ইলমে সরফের মধ্যে করা হয়েছে। যেমন– মুখালাফাতে কিয়াস। কেননা, কোনো ব্যক্তির ইলমে সরফ জানা থাকলে সে বুঝতে পারে কোনটি কিয়াস মোতাবেক, আর কোনটি কিয়াসের বা নিয়মের ব্যতিক্রম। ইলমে সরফ জানা থাকলে সে বুঝতে পারে اَجْلَلُ শব্দটি নিয়মের বিপরীত ব্যবহার হয়েছে; কিন্তু اَجَلُّ শব্দটি নিয়ম মোতাবেক ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوْ فِىْ عِلْمِ النَّحْوِ : মূল লেখক বলেন, ফসীহ বাক্যকে অফসীহ বাক্য থেকে পৃথক করা বা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদির কতগুলোর আলোচনা ইলমে নাহুতে করা হয়। যেমন– ضُعْفُ التَّالِيْف এবং تَعْقِيْد لَفْظِىْ অর্থাৎ যে ব্যক্তির ইলমে নাহু বা আরবি ব্যাকরণ জানা আছে, সে বুঝতে পারবে যে, কোন বাক্যটি নাহুর প্রসিদ্ধ নিয়মের অনুযায়ী হয়েছে, আর কোনটি নাহু প্রসিদ্ধ নিয়মের বিরুদ্ধ তথা ضُعْفُ التَّالِيْف বা تَعْقِيْد لَفْظِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوْ يُدْرَكُ بِالْحِسِّ كَالتَّنَافُرِ : ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদির কোনোটি অনুভূতি দ্বারা বুঝা যায়। যেমন– তানাফুর। কেননা, অনুভূতির সাহায্যে একটি লোক বলে দিতে পারে যে, مُسْتَشْزِرٌ শব্দটি তানাফুরযুক্ত; কিন্তু مُرْتَفَعٌ শব্দটি তানাফুরযুক্ত নয়। এমনি তানাফুরে কালিমাত বা একাধিক শব্দের মিলনে যে তানাফুর সৃষ্টি হয় তাও অনুভূতি ও বিশুদ্ধ রুচির সাহায্যে বুঝা যায়। যেমন– لَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ বাক্যটি শোনা মাত্র অনুভূতি বলে দিবে বাক্যটিতে তানাফুরে কালিমাত হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. বালাগাতের দ্বিতীয় উৎস তথা ত্রুটিপূর্ণ শব্দ ও বাক্য পরিহার করার জন্য আমাদের প্রথমে জানতে হবে মৌলিকভাবে কি কি বিষয় বাক্যকে ত্রুটিপূর্ণ করে।

সাতটি বিষয় বাক্যকে ত্রুটিপূর্ণ করে– ১. تَنَافُرْحُرُوْف ২. غَرَابَتْ ৩. مُخَالَفَةُ قِيَاسْ لُغْوِىْ ৪. تَنَافُرُ كُلِمَاتْ ৫. ضُعْفُ تَالِيفْ ৬ تَعْقِيْد لَفْظِىْ ৭. تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ

খ. প্রকাশ থাকে যে, ১. সাহিত্য ও বালাগাতের মননের সাহায্যে তানাফুর থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। ২. অভিধানশাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা غَرَابَةٌ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ৩. مُخَالَفَةُ قِيَاسْ لَغْوِىْ থেকে বাঁচার জন্য ইলমুস সরফ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। ৪. ضُعْفُ التَّالِيْف وَتَعْقِيْد لَفْظِىْ এ দু'টি বিষয়কে ইলমে নাহুর সাহায্যে পরিহার করা সম্ভব।

وَهُوَ اَىْ مَا يُبَيَّنُ فِى الْعُلُوْمِ الْمَذْكُوْرَةِ اَوْ يُدْرَكُ بِالْحِسِّ فَالضَّمِيْرُ عَائِدٌ اِلٰى مَا وَمَنْ زَعَمَ اَنَّهُ عَائِدٌ اِلٰى مَا يُدْرَكُ بِالْحِسِّ فَقَدْ سَهَا سَهْوًا ظَاهِرًا مَا عَدَا التَّعْقِيْدِ الْمَعْنَوِىْ اِذْ لَا يُعْرَفُ بِتِلْكَ الْعُلُوْمِ وَلَا بِالْحِسِّ تَمْيِيْزُ السَّالِمِ مِنَ التَّعْقِيْدِ الْمَعْنَوِىْ عَنْ غَيْرِهٖ فَعُلِمَ اَنَّ مَرْجِعَ الْبَلَاغَةِ بَعْضُهٗ مُبَيَّنٌ فِى الْعُلُوْمِ الْمَذْكُوْرَةِ وَبَعْضُهٗ مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ وَبَقِىَ الْاِحْتِرَازُ عَنِ الْخَطَاِ فِىْ تَاْدِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ وَالْاِحْتِرَازُ عَنِ التَّعْقِيْدِ الْمَعْنَوِىْ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ اِلٰى عِلْمَيْنِ مُفِيْدَيْنِ لِذٰلِكَ فَوَضَعُوْا عِلْمَ الْمَعْنٰى لِلْاَوَّلِ وَعِلْمَ الْبَيَانِ لِلثَّانِىْ وَاِلَيْهِ اَشَارَ بِقَوْلِهٖ وَمَا يَحْتَرِزُ بِهٖ عَنِ الْاَوَّلِ اَىِ الْخَطَاُ فِىْ تَاْدِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ عِلْمُ الْمَعَانِىْ وَمَا يُحْتَرَزُ بِهٖ عَنِ التَّعْقِيْدِ الْمَعْنَوِىْ عِلْمُ الْبَيَانِ وَسَمَّوْا هٰذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ عِلْمَ الْبَلَاغَةِ لِمَكَانِ مَزِيْدِ اِخْتِصَاصٍ لَهُمَا بِالْبَلَاغَةِ وَاِنْ كَانَتِ الْبَلَاغَةُ تَتَوَقَّفُ عَلٰى غَيْرِهِمَا مِنَ الْعُلُوْمِ ـ

অনুবাদ : **আর যা** অর্থাৎ যা কিছু উল্লিখিত জ্ঞানসমূহে আলোচনা করা হয়, অথবা অনুভূতি দ্বারা জানা যায়। সুতরাং সর্বনাম مَا-এর দিকে ফিরেছে। আর যারা ধারণা করে সর্বনাম مَا يُدْرَكُ بِالْحِسِّ-এর দিকে ফিরেছে তারা স্পষ্টভাবে ভুল করেছে। **তবে تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ ছাড়া**। কেননা, উল্লিখিত জ্ঞানসমূহ এবং অনুভূতি দ্বারা تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ থেকে মুক্ত বাক্যটিকে تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ যুক্ত বাক্য থেকে পৃথক করা যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, বালাগাতের কতিপয় উৎস বিবৃত হয়েছে উল্লিখিত জ্ঞানসমূহে আর কতকগুলো অনুভব করা যায় অনুভূতি দ্বারা। আর রয়ে গেল উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল থেকে বিরত থাকা এবং تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ থেকে বেঁচে থাকার বিষয়টি। ফলে এমন দু'টি জ্ঞানের প্রয়োজন দেখা দিল যা উপরোক্ত দু'টি বিষয়ের জন্য উপকারী। সুতরাং জ্ঞানীজন প্রথমটির জন্য ইলমে মা'আনী এবং দ্বিতীয়টির জন্য ইলমে বয়ানকে সংকলন বা আবিষ্কার করলেন, এ কথার প্রতি লেখক তার (সামনের) বক্তব্য দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। **আর যে জ্ঞান দ্বারা প্রথম প্রকার** অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল থেকে বিরত থাকা যায়, **তা হলো ইলমে মা'আনী**। **আর যে জ্ঞান দ্বারা تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ থেকে বিরত থাকা যায়, তা হলো ইলমে বয়ান**। বালাগাত বিশারদগণ এ দু'টি ইলমকে ইলমে বালাগাত করে নাম রেখেছেন। কেননা, এ দু'টি ইলমের সাথে বালাগাতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যদিও বালাগাত এ দু'টি ছাড়া আরো অন্যান্য ইলমের উপরও নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَهُوَ اَىْ مَا يُبَيَّنُ الخ : ইতঃপূর্বে বালাগাতের দ্বিতীয় উৎস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর অবশিষ্টাংশ এখানে আলোচনা করা হলো, দ্বিতীয় উৎস অর্থাৎ ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর সাতটি বিষয় থেকে ছয় বিষয় নাহু, সরফ, অভিধানশাস্ত্র ও সাহিত্য প্রতিভা দ্বারা জানা যায়। এখন রয়ে গেছে একটি বিষয় অর্থাৎ تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ এ বিষয়টি কিভাবে জানা যাবে? যার দ্বারা ফসীহ বাক্যকে অফসীহ বাক্য থেকে পৃথক করা যাবে। এ নিয়ে উপরোক্ত ইবারতের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে মুসান্নিফ লেখকের ইবারত هُوَ مَاعَدَا التَّعْقِيْدُ الْمَعْنَوِىْ-এর هُوَ সর্বনামের مَرْجِعْ নিয়ে তাঁর মন্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, هُوَ-এর مَرْجِعْ হলো مَا يُبَيَّنُ فِى الْعُلُوْمِ-এর ما (ইসমে মাওসূল) এ হিসেবে পুরো বাক্যের অর্থ হবে, উল্লিখিত ইলমসমূহে বর্ণিত বিষয় এবং অনুভূতি দ্বারা জানা বিষয়গুলো تَعْقِيْد مَعْنَوِىْ ছাড়া।

قَوْلُهُ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَائِدٌ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ هُوَ সর্বনাম-এর مَرْجِعْ-এর ব্যাপারে কতিপয় লোকের একটি ভিন্নমতকে তুলে ধরে তা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, অনেকে ধারণা করেন, هُوَ সর্বনামের مَرْجِعْ হলো مَا يُدْرَكُ بِالْحِسِّ মুসান্নিফ বলেন, তাদের ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ, তাদের মতানুযায়ী বাক্যের অর্থ অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। তখন বাক্যের অর্থ হবে, যা অনুভূতি দ্বারা জানা যায় তা تَعْقِيْد مَعْنَوِيْ-এর বিপরীত। অর্থাৎ تَعْقِيْد مَعْنَوِيْ ছাড়া আর যত ফাসাহাতের ক্ষতিকর বিষয়াদি আছে, সবই অনুভূতির সাহায্যে জানা যায়। কিন্তু এ কথাটি বাস্তবসম্মত নয়। কারণ, تَعْقِيْد مَعْنَوِيْ ছাড়া ছয়টির একটি অর্থাৎ তানাফুর শুধুমাত্র অনুভূতির সাহায্যে জানা যায়। এ ছাড়া যা আছে যেমন- গারাবাত, যু'ফে তালীফ, মুখালাফাতে কিয়াস এবং تَعْقِيْد لَفْظِيْ-এর কোনোটাই অনুভূতি দ্বারা জানা যায় না। সুতরাং هُوَ সর্বনামের مَرْجِعْ তাই হবে যা আমাদের মুসান্নিফ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ কথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, تَعْقِيْد مَعْنَوِيْ ছাড়া অন্যান্যগুলো উল্লিখিত জ্ঞানসমূহ এবং অনুভূতির মাধ্যমে জানা সম্ভব; কিন্তু تَعْقِيْد مَعْنَوِيْ এগুলোর দ্বারা জানা সম্ভব নয়।

সারকথা এই যে, বালাগাতের দ্বিতীয় উৎস তথা ফসীহ বাক্যকে অফসীহ বাক্য থেকে পৃথক করার কতকগুলো নাহু, সরফ, অভিধানগ্রন্থে জানা যাবে আর কতকগুলো সাহিত্য-প্রতিভা দ্বারা জানা যাবে; কিন্তু تَعْقِيْد مَعْنَوِيْ তো এগুলো দ্বারা জানা যায় না। আর বালাগাতের প্রথম উৎস তথা উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল থেকে বাঁচা। এ দু'টি বিষয় এমন যে, এগুলো না জানলেই নয়। তাই এগুলো জানার জন্য দু'টি ইলমের প্রয়োজন, যাতে এ দু'টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে এবং এ দু'টি বিষয়ের জন্য বিশেষ উপকারী হবে। আর এ দু'টি ইলম জানা থাকলে এ দু'টি বিষয় থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। অতএব, বালাগাত শাস্ত্রবিদগণ প্রথমটি অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল থেকে বাঁচার জন্য ইলমে মা'আনীকে আবিষ্কার করেছেন এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ تَعْقِيْد مَعْنَوِيْ থেকে বাঁচার জন্য ইলমে বয়ানকে আবিষ্কার করেছেন।

قَوْلُهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَمَا يُحْتَرَزُ بِهِ : ইতঃপূর্বে মুসান্নিফ ইলমে বয়ান এবং ইলমে মা'আনীর প্রয়োজনীয়তা এবং তার আবিষ্কার সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, মূল লেখকের ইবারতেও এ কথাগুলো রয়েছে, যা তিনি তার রীতিমতো সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। লেখক বলেন, مَا يَحْتَرِزُ بِهِ عَنِ الْأَوَّلِ عِلْمَ الْمَعَانِيْ অর্থ- যে ইলম দ্বারা প্রথম প্রকার অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে কোনো ভুল করা থেকে বিরত থাকা যায়। তা হলো ইলমে মা'আনী।

আর (ইলমে বয়ান সম্পর্কে বলেন,) مَا يُحْتَرَزُ بِهِ عَنِ التَّعْقِيْدِ الْمَعْنَوِيْ عِلْمُ الْبَيَانِ অর্থ- যে ইলম দ্বারা تَعْقِيْد مَعْنَوِيْ থেকে বিরত থাকা যায়, তা হলো ইলমে বয়ান।

قَوْلُهُ وَسَمُّوْا هٰذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইলমে বালাগাত-এর তিনটি শাখা যথা- ইলমে বয়ান, মা'আনী ও বদী'-এর নামকরণ এবং এর হেতু সম্পর্কে বালাগাত বিশারদদের মতামত তুলে ধরেন। মুসান্নিফ বলেন, বালাগাত শাস্ত্রবিদগণ ইলমে বয়ান এবং ইলমে মা'আনীকে একত্রে ইলমে বালাগাত নামে নামকরণ করেন। এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, لِمَكَانِ مَزِيْدِ اِخْتِصَاصِ لَهُمَا بِالْبَلَاغَةِ আমরা প্রথমে বাক্যের এ অংশের ব্যাখ্যা করব, এরপর অর্থ বর্ণনা করব,

مَكَانٌ শব্দটি مصدر এর অর্থ- বিদ্যমান হওয়া, পাওয়া যাওয়া। مَزِيْدٌ শব্দটিও মাসদার। অর্থাৎ مصدر ميمى, আর اِخْتِصَاصٍ অর্থাৎ (এখানে) تعلق বা সম্পর্ক। এখানে اِخْتِصَاص-এর অর্থ تعلق করার কারণ হলো اِخْتِصَاصْ শব্দটি এমন একক যার মধ্যে কমবেশি হতে পারে না; কিন্তু تعلق বা সম্পর্ক এর মধ্যে কমবেশি হয়ে থাকে। সুতরাং পুরো বাক্যের অর্থগত আরবি এরূপ হবে لِوُجُوْدِ زِيَادَةِ تَعَلُّقٍ لَهُمَا بِالْبَلَاغَةِ অর্থাৎ এ দুটি ইলমের বালাগাতের সাথে বেশি সম্পর্কের কারণে এ দু'টি ইলমকে বালাগাত করে নাম করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বালাগাতের সাথে এ দু'টি ইলমের বেশি সম্পর্ক কিভাবে হলো। এর উত্তর হলো- বালাগাতের দু'টি উৎসের প্রথমটি সম্পূর্ণভাবে ইলমে মা'আনী-এর উপর নির্ভরশীল, আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কালামে ফসীহকে কালামে গাইরে ফসীহ থেকে মুক্ত করা বা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে কালামকে মুক্ত করা যদিও ইলমে বয়ানের সাথে নাহু, সরফ, অভিধান ইত্যাদির জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, তবুও বালাগাতের উদ্দেশ্য হিসেবে ইলমে বয়ানের সাথেই এর সম্পর্ক বেশি।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتِ الْبَلَاغَةُ تَتَوَقَّفُ عَلٰى غَيْرِهِمَا مِنَ الْعُلُوْمِ : অর্থাৎ যদিও বালাগাত অন্যান্য ইলমের উপরও নির্ভরশীল। এর দ্বারা নাহু, সরফ এবং লুগাত বা অভিধানশাস্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ثُمَّ احْتَاجُوْا لِمَعْرِفَةِ تَوَابِعِ الْبَلَاغَةِ اِلٰى عِلْمٍ اُخَرَ فَوَضَعُوْا لِذٰلِكَ عِلْمَ الْبَدِيْعِ وَاِلَيْهِ اَشَارَ بِقَوْلِهِ وَمَا يُعْرَفُ بِهِ وُجُوْهُ التَّحْسِيْنِ عِلْمُ الْبَدِيْعِ وَلَمَّا كَانَ هٰذَا الْمُخْتَصَرُ فِىْ عِلْمِ الْبَلَاغَةِ وَتَوَابِعِهَا اِنْحَصَرَ مَقْصُوْدُهُ فِىْ ثَلَاثَةِ فُنُوْنٍ وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ يُسَمِّى الْجَمِيْعَ عِلْمَ الْبَيَانِ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّى الْاَوَّلَ عِلْمَ الْمَعَانِىْ وَالْاَخِيْرَيْنِ يَعْنِى الْبَيَانَ وَالْبَدِيْعَ عِلْمَ الْبَيَانِ وَالثَّلَاثَةَ عِلْمَ الْبَدِيْعِ وَلَايَخْفٰى وُجُوْهُ الْمُنَاسَبَةِ ـ

অনুবাদ : এরপর তারা বালাগাতের অনুগামী বিষয়াদির জন্য আরেকটি ইলমের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। অতএব, এর জন্য ইলমে বদী'কে সংকলন করলেন। এর প্রতিই লেখক তার এ উক্তি দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন "এবং যার দ্বারা (বাক্যের) সৌন্দর্যের পদ্ধতি জানা যায় তা হলো ইলমে বদী'" যখন এ সংক্ষিপ্ত (মুখতাসারুল মা'আনী) কিতাব ইলমে বালাগাত এবং এর অনুগামী ইলমের ব্যাপারে, তখন এর মূল উদ্দেশ্য আলোচনা তিন বিষয়েই সীমাবদ্ধ হয়েছে। অনেকে এ সবগুলোকে ইলমে বয়ান করে নাম রেখেছেন। আবার অনেকে প্রথমটিকে ইলমে মা'আনী করে এবং শেষ দু'টি তথা বয়ান এবং বদী'কে ইলমে বয়ান করে নাম রেখেছেন। (আবার কেউ) তিনটিকেই ইলমে বদী' করে নাম রেখেছেন। এসব (এ নামকরণের) কারণ অস্পষ্ট নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ ثُمَّ احْتَاجُوْا لِمَعْرِفَةِ تَوَابِعِ الخ : ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) ইলমে বদী'-এর প্রয়োজনীয়তা এবং নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। মুসান্নিফ বলেন, বালাগাতের تَوَابِعُ বা অনুগামী বিষয় জানার জন্য বালাগাত বিশারদগণ আরেকটি ইলমের প্রয়োজন মনে করলেন এবং তারা সেই প্রয়োজন পূরণের জন্য ইলমে বদী' রচনা করলেন, লেখক তার ভাষায় বলেন, আর যে ইলমের দ্বারা বাক্যের সৌন্দর্য বর্ধনকারী পদ্ধতিগুলো জানা যায়, তাকে ইলমে বদী' বলা হয়। এরপর মুসান্নিফ বলেন, যেহেতু ভূমিকার আলোচনার দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণ হলো যে, এই কিতাবের মধ্যে বালাগাত (অর্থাৎ ইলমে মা'আনী ও বয়ান) এবং বালাগাতের অনুগামী ইলম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ কিতাবের মধ্যে যে বিষয়গুলো আলোচনা হবে তা তিনটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ اَلْفَنُّ الْاَوَّلُ عِلْمُ الْمَعَانِىْ অর্থাৎ প্রথম বিষয় ইলমে মা'আনী اَلْفَنُّ الثَّانِىْ عِلْمُ الْبَيَانِ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিষয় ইলমুল বয়ান, اَلْفَنُّ الثَّالِثُ عِلْمُ الْبَدِيْعِ অর্থাৎ তৃতীয় বিষয় ইলমুল বদী'।

প্রকাশ থাকে যে, এ তিনটি বিষয়ের নামকরণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে–

প্রথম মত : ১ম বিষয়ের নাম ইলমুল মা'আনী, দ্বিতীয় বিষয়ের নাম বয়ান এবং তৃতীয় বিষয়ের নাম ইলমুল বদী'।

দ্বিতীয় মত : তিনটি বিষয়ের নাম একত্রে ইলমুল বয়ান।

তৃতীয় মত : ১ম বিষয়ের নাম ইলমুল মা'আনী,২য় এবং ৩য় বিষয়ের নাম ইলমুল বয়ান।

চতুর্থ মত : তিনটি বিষয়ের নাম ইলমুল বদী'।

নামকরণের কারণ : প্রথম মতানুসারে প্রথম বিষয়কে ইলমুল মা'আনী, বলা হয়। কারণ, এর দ্বারা বাক্যের কাঙ্ক্ষিত অর্থ এবং বৈশিষ্ট্যকে জানা যায়, যার জন্য বাক্যটির প্রয়োগ হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়কে ইলমুল বয়ান বলা হয়– কারণ এ ইলমের দ্বারা একটি অর্থকে একাধিক পদ্ধতিতে (অর্থ স্পষ্ট এবং ইঙ্গিতবহ হিসেবে) প্রকাশ করার বয়ান জানা যায়। আর তৃতীয় বিষয়কে ইলমুল বদী' বলা হয়– কারণ এ ইলমের বিষয়গুলো বিশেষ সৌন্দর্য এবং অলঙ্কারপূর্ণ হয়। بَدِيْعٌ শব্দটি بَدَاعَةٌ মাসদার থেকে নির্গত, অর্থ– সৌন্দর্য বা অলঙ্করণ।

দ্বিতীয় মতানুসারে তিনটি বিষয়কে ইলমুল বয়ান বলার কারণ এই যে, বয়ান বলা হয় ঐ বিশুদ্ধ কথাকে যা মনের ভাবকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। যেহেতু এ তিনটি বিষয় দ্বারাই মনের ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়, (এ কারণে এ তিনটিকেই ইলমুল বয়ান বলা হয়)।

তৃতীয় মতানুসারে ১ম বিষয়কে ইলমুল মা'আনী বলা হয়– এর কারণ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। ২য় এবং ৩য় বিষয়কে ইলমুল বয়ান বলা হয়। যেহেতু এ দু'টি ইলমের বয়ানের সাথে বা মনের ভাব প্রকাশকারী বিশুদ্ধ বাক্যের সাথে সম্পর্ক আছে।

চতুর্থ মতানুসারে তিনটি বিষয়কে ইলমুল বদী' বলা হয়। কারণ, এ বিষয়গুলোর আলোচ্য বিষয়গুলো অত্যন্ত অভিনব এবং চমৎকার সুন্দর। আমরা ইতঃপূর্বে بَدِيْع শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছি। যার সাথে এ ব্যাখা মিলে যায়। তাই এ তিনটি বিষয়কে ইলমুল বদী' বলারও যৌক্তিকতা রয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. উপরে উল্লিখিত জ্ঞানসমূহ যথা– নাহব, সরফ ও অভিধানশাস্ত্র এবং সাহিত্য প্রতিভা দ্বারা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর সাতটি বিষয়ের প্রায় সববিষয় থেকে বাঁচা সম্ভব, তবে تَعْقِيْد থেকে এসব জ্ঞানের সাহায্যে রক্ষা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া বালাগাতের প্রথম উৎস তথা উদ্দিষ্ট অর্থ আদায়ে ভুল থেকে বাঁচাও এসব জ্ঞানের সাহায্যে সম্ভব নয়।

খ. এ দু'টি বিষয় থেকে বাঁচার জন্য বালাগাত বিশারদগণ ইলমুল বয়ান ও ইলমুল মা'আনীকে আবিষ্কার করেছেন।

গ. ইলমুল মা'আনী ও ইলমুল বয়ানে বালাগাতের প্রধান বিষয় হওয়ার কারণে এ দু'টি ইলমকে একত্রে ইলমুল বালাগাত বলা হয়।

বালাগাত হাসিল হওয়ার পর শব্দগত ও অর্থগত সৌন্দর্য যে ইলমের দ্বারা হাসিল হয়, তাকে ইলমুল বদী' বলা হয়। নামকরণের ব্যাপারে আরো ভিন্ন মতও রয়েছে।

اَلْفَنُّ الْاَوَّلُ عِلْمُ الْمَعَانِيْ قَدَّمَهُ عَلٰى عِلْمِ الْبَيَانِ لِكَوْنِهِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُفْرَدِ مِنَ الْمُرَكَّبِ لِاَنَّ رِعَايَةَ الْمُطَابَقَةِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَهُوَ مَرْجِعُ عِلْمِ الْمَعَانِيْ مُعْتَبَرَةٌ فِيْ عِلْمِ الْبَيَانِ مَعَ زِيَادَةِ شَيْءٍ اٰخَرَ وَهُوَ اِيْرَادُ الْمَعْنَى الْوَاحِدِ فِيْ طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ ـ

অনুবাদ : প্রথম বিষয় : ইলমুল মা'আনী। এটিকে লেখক ইলমুল বয়ানের আগে এনেছেন, কেননা, এটি বয়ানের তুলনায় এমন স্থানে রয়েছে (যে স্থানটিতে রয়েছে) মুফরাদ মুরাক্কাবের তুলনায়। কেননা, মুকতাযায়ে হালের অনুযায়ী হওয়াকে বিবেচনা করা হচ্ছে ইলমুল মা'আনীর মূল উদ্দেশ্য। এটি (আবার) ইলমুল বয়ানের মধ্যেও ধর্তব্য, সাথে আরো বিষয়ও রয়েছে (ইলমুল বয়ানের মধ্যে) আর তা হচ্ছে একটি অর্থকে একাধিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اَلْفَنُّ الْاَوَّلُ الخ : ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এ কিতাবটি মূলত তিনটি বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ। উপরোল্লিখিত ইবারতে প্রথম বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হলো ইলমুল মা'আনী।

قَوْلُهُ قَدَّمَهُ عَلٰى عِلْمِ الْبَيَانِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইলমুল মা'আনীকে ইলমুল বয়ানের আগে আনার কারণ বর্ণনা করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইলমুল মা'আনী মুফরাদের সাথে তুলনীয়, আর ইলমুল বয়ানের তুলনা মুরাক্কাবের সাথে। আমরা জানি, মুফরাদ সবসময় মুরাক্কাবের আগে আসে। তাই এখানে ইলমুল মা'আনীর আলোচনা প্রথমে করেছেন, তারপর ইলমুল বয়ানের আলোচনা করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হলো– মুফরাদ মুরাক্কাবের সাথে যথাক্রমে ইলমুল মা'আনী এবং ইলমুল বয়ানের তুলনা কিভাবে করা হলো?

এর উত্তর হলো– ইলমুল মা'আনীর ফলাফল হলো বিশুদ্ধবাক্য মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়া। এ ফলাফলটির উপর ইলমুল বয়ানের ফলাফল নির্ভরশীল। আর ইলমুল বয়ানের ফলাফল হলো– একটি অর্থকে একাধিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা। যার প্রত্যেকটি পদ্ধতির মর্ম স্পষ্ট এবং ইঙ্গিতবহ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের। তবে এ সবই মুকতাযায়ে হালের অনুযায়ী হওয়ার পর প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যখন ইলমুল বয়ানের ফলাফল ইলমুল মা'আনীর ফলাফলের উপর নির্ভরশীল এবং খোদ ইলমুল বয়ান তার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল, তখন ইলমুল বয়ান দু'টি জিনিসের উপর নির্ভরশীল হলো– আর ইলমুল মা'আনী শুধুমাত্র তার ফলাফলের উপরই নির্ভরশীল। অতএব, ইলমুল মা'আনী নির্ভরশীল হলো একটি জিনিসের উপর।

সারকথা : ইলমুল বয়ান হলো দু'টি অংশ নিয়ে একটি বস্তু বা كل আর ইলমুল মা'আনী সেই বস্তু বা كل-এর একটি অংশ বা جزء যেমন– مركب একটি كل আর مفرد সেই كل-এর جزء। আর جزء সবসময় كل-এর উপর مقدم হয় বা আগে আসে অথবা বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, ইলমুল মা'আনীতে একটি বিষয়ের اعتبار করা হয়েছে। এ হিসেবে এটি مفرد বা একক। আর ইলমুল বয়ানের মধ্যে দু'টি বিষয়ের ধর্তব্য করা হয়েছে। এ হিসেবে এটি مركب বা একাধিক এককযুক্ত। আর আমরা জানি, مفرد বা একক مركب-এর আগে আসে। উভয় ব্যাখ্যানুসারে ইলমুল মা'আনী ইলমুল বয়ানের আগে আসা উচিত; তাই লেখক ইলমুল মা'আনীকে ইলমুল বয়ানের আগে এনেছেন।

বি. দ্র. ইলমুল বয়ানের একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো– যায়েদ নামের এক ব্যক্তির দানশীলতাকে আমরা কয়েকভাবে ব্যক্ত করতে পারি– ১. যায়েদ দানশীল, ২. যায়েদের বাড়ির পেছনে অনেক ছাই, ৩. যায়েদের বাড়িতে গরিব-দুঃখী মানুষ জড়ো হয়, ৪. যায়েদ দু' হাতে বিতরণ করে, ৫. গোসল খানায় সাগর দেখতে পেলাম, যে দান করে যাচ্ছে (এটা তখন বলা হয়, যখন যায়েদ গোসল খানায় অবস্থান করে)।

সার-সংক্ষেপ : ইলমুল বয়ানের আগে ইলমুল মা'আনীর আলোচনা এনেছেন দু'টি কারণে– ১. ইলমুল মা'আনী মুফরাদের পর্যায়ে, আর ইলমুল বয়ান মুরাক্কাবের পর্যায়ে। যেহেতু মুফরাদ মুরাক্কাবের আগে, তাই ইলমুল মা'আনীর বহছ আগে আনা হয়েছে। ২. মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়ার পর ইলমুল বয়ানের বিষয়গুলো বাক্যে আসে, আর মুকতাযায়ে হাল পাওয়া যায় ইলমুল মা'আনীতে।

وَهُوَ عِلْمٌ اَىْ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلٰى اِدْرَاكَاتٍ جُزْئِيَّةٍ وَيَجُوْزُ اَنْ يُّرَادَ بِهٖ نَفْسُ الْاُصُوْلِ وَالْقَوَاعِدِ الْمَعْلُوْمَةِ وَلِاسْتِعْمَالِهِمُ الْمَعْرِفَةَ فِى الْجُزْئِيَّاتِ قَالَ يُعْرَفُ بِهٖ اَحْوَالُ اللَّفْظِ الْعَرَبِىْ اَىْ هُوَ عِلْمٌ يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ اِدْرَاكَاتٌ جُزْئِيَّةٌ هِىَ مَعْرِفَةُ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْاَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ بِمَعْنٰى اَنَّ اَىَّ فَرْدٍ يُوْجَدُ مِنْهَا اَمْكَنَنَا اَنْ نَعْرِفَهُ بِذٰلِكَ الْعِلْمِ وَقَوْلُهُ اَلَّتِىْ بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْاَحْوَالِ الَّتِىْ لَيْسَتْ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ مِثْلُ الْاِعْلَالِ وَالْاِدْغَامِ وَالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَمَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ مِمَّا لَابُدَّ مِنْهُ فِىْ تَأْدِيَةِ اَصْلِ الْمَعْنٰى وَكَذَا الْمُحَسِّنَاتُ الْبَدِيْعِيَّةُ مِنَ التَّجْنِيْسِ وَالتَّرْصِيْعِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَكُوْنُ بَعْدَ رِعَايَةِ الْمُطَابَقَةِ ـ

অনুবাদ : এটি এমন এক ইলম অর্থাৎ যোগ্যতা যার সাহায্যে কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন جُزْئِىْ বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম হয়। তবে (عِلْم)-এর দ্বারা নিয়মাবলি এবং প্রসিদ্ধ কায়েদার অর্থও উদ্দেশ্য করা যায়। مَعْرِفَةٌ শব্দটি তাদের ব্যবহারে جُزْئِيَّاتٌ সম্পর্কে হওয়ার কারণে তিনি يُعْرَفُ بِهِ اللَّفْظُ الْعَرَبِىْ বলেছেন। **অর্থ যার দ্বারা অবগত হওয়া যায় আরবি শব্দের অবস্থাসমূহ**। অর্থাৎ এটি এমন একটি ইলম যার সাহায্যে হাসিল হয় جُزْئِىْ বিষয়সমূহের উপলব্ধি। এটি হচ্ছে উল্লিখিত অবস্থাসমূহের جُزْئِيَّاتْ-এর প্রত্যেকটি فَرْدْ কে জানা। এর অর্থ হচ্ছে এর যে فَرْدْ-ই পাওয়া যাক, আমরা সেই فَرْدْ-কে এই ইলমের দ্বারা জানতে সক্ষম হব। লেখকের উক্তি, اَلَّتِىْ بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ (অর্থ– যার দ্বারা শব্দটি মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক বা অনুযায়ী হয়) পরিহার করে সেই সব অবস্থাসমূহকে, যা এমন নয়, যেমন– শব্দের ইলাল (হরফে ইল্লত বিশিষ্ট শব্দের পরিবর্তন করা)। ইদগাম (একাক্ষরকে অন্যাক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়া) رَفْع ,نَصْب (এবং جَرْ) হওয়া এ জাতীয় যা কিছু আছে যা শব্দের আসল অর্থ প্রদানে জরুরি বলে সাব্যস্ত হয়। এমনিভাবে ইলমে বদী'-এর مُحَسِّنَةٌ গুলো যেমন– তাজনীস, তারসী' ইত্যাদি যা লক্ষণীয় হয় বাক্যটি মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়ার পর।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَهُوَ عِلْمٌ اَىْ مَلَكَةٌ الخ : এ ইবারতে লেখক ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন–

وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهٖ اَحْوَالُ اللَّفْظِ الْعَرَبِىْ الَّتِىْ بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ

অর্থাৎ ইলমে মা'আনী ঐ ইলমকে বলা হয়, যার দ্বারা আরবি শব্দের এমন অবস্থাসমূহ জানা যায় যার সাহায্যে বাক্যটি মুকাতাযায়ে হালের মোতাবেক হয়।

এ সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর সামনে ইলমে মা'আনী বিষয়াদির বিস্তারিত আলোচনা করবেন। লেখকের সংজ্ঞার عِلْم শব্দটির ব্যাখ্যা মুসান্নিফের মতে দু' ধরনের হতে পারে– ১. عِلْم অর্থাৎ مَلَكَةٌ বা যোগ্যতা, ২. عِلْم অর্থাৎ اَلْاُصُوْل, মুসান্নিফ ১ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, هُوَ عِلْمٌ اَىْ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلٰى اِدْرَاكَاتٍ جُزْئِيَّةٍ অর্থ– ইলমে মা'আনী এমন একটি যোগ্যতা বা মনের বদ্ধমূল অবস্থা যার দ্বারা ব্যক্তি جُزْئِىْ বিষয়ের উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তির ইলমে মা'আনীর যোগ্যতা আছে সে বিভিন্ন جُزْئِىْ বিষয় আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। এখানে اِدْرَاكَاتٌ جُزْئِيَّةٌ-এর উপর একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়, আপত্তিটি হলো– اِدْرَاك তো এমন বিষয় যা جُزْئِىْ বা كُلِّىْ দ্বারা বিশেষিত হয় না; বরং مُدْرَك-এর صِفَتْ কখনো كُلِّىْ আবার কখনো جُزْئِىْ হয়ে থাকে। যেমন– اِنْسَانٌ (مُدْرَكْ) كُلِّىْ ، زَيْدٌ (مُدْرَكْ) جُزْئِىْ সুতরাং ইবারত হওয়ার দরকার ছিল يَقْتَدِرُ بِهَا عَلٰى مُدْرَاكَاتٍ جُزْئِيَّاتٍ এ আপত্তি নিরসন করার জন্য কেউ কেউ উত্তর দেন যে, ইবারতে একটি مُضَافْ উহ্য আছে। তখন ইবারত হবে– يُقْدِرُ بِهَا عَلٰى اِدْرَاكِ مُدْرَكَاتٍ جُزْئِيَّاتٍ এরপর আমাদের জানতে

হবে اَلْاِدْرَاكَاتُ الْجُزْئِيَّةُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? اَلْاِدْرَاكَاتُ الْجُزْئِيَّةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব মাসআলা, যা সে যোগ্যতা দ্বারা হাসিল হয় বা মৌলিক নিয়ম থেকে বের হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ একটি নিয়ম- كُلُّ كَلَامٍ يُلْقٰى اِلَى الْمُنْكِرِ يَجِبُ تَوْكِيْدُهٗ অর্থাৎ যে সকল বাক্য অস্বীকারকারীর সামনে পেশ করা হয় তাতে তাকিদ থাকা জরুরি। এর অধীন جُزْئِىٌّ যেমন এ কথাটি অস্বীকারকারীর সামনে পেশ করা হচ্ছে, তাই এর তাকিদ আনতে হবে। এ জাতীয় আরো নিয়ম আছে। যেমন-

كُلُّ كَلَامٍ يُلْقٰى اِلٰى مَحْبُوْبٍ يَجِبُ فِيْهِ الْاِطْنَابُ وَكُلُّ كَلَامٍ يُلْقٰى اِلَى الْمَرِيْضِ يَجِبُ فِيْهِ الْاِيْجَازُ ـ

অর্থাৎ যে সকল বাক্য প্রিয়জনকে বলা হয় তা দীর্ঘ হয়ে থাকে। আর যে সকল বাক্য অসুস্থ ব্যক্তির সামনে বলা হয় তা সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক।

ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি عِلْم শব্দটি اُصُوْل বা নিয়মাবলির অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- মুসান্নিফ তাঁর কথার দ্বারা সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন- وَيَجُوْزُ اَنْ يُرَادَ بِهٖ نَفْسُ الْاُصُوْلِ وَالْقَوَاعِدِ الْمَعْلُوْمَةِ অর্থাৎ عِلْم দ্বারা নিয়ম-রীতিও উদ্দেশ্য হতে পারে। তখন সংজ্ঞার অর্থ হবে এরূপ- ইলমুল মা'আনী এমন কতক নিয়মাবলিকে বলা হয় যার সাহায্যে আরবি শব্দের এমন অবস্থাসমূহ জানা যায় যা দ্বারা বাক্য মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হয়।

এখানে মূল লেখকের উপর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রশ্নটি হলো মুসান্নিফের ব্যাখ্যা দ্বারা জানা গেল ইলমের দু'টি অর্থ, অন্যভাবে বললে عِلْم শব্দটি এখানে لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ আর আমরা জানি, সংজ্ঞার মধ্যে لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ-এর ব্যবহার শোভন নয়। তাহলে তিনি এ কাজটি কেন করলেন? এর উত্তর হলো- সংজ্ঞার মধ্যে لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ-এর ব্যবহার সাধারণভাবে অবৈধ নয়; বরং যখন لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ-এর প্রত্যেকটি অর্থ উদ্দেশ্য করা যায় না তখন لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ-এর ব্যবহার অবৈধ। আর যখন لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ-এর সবগুলো অর্থ উদ্দেশ্য করা যায়, তখন সংজ্ঞার মধ্যে لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ-এর ব্যবহার অবৈধ বা অশোভন নয়। আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনায় যেহেতু عِلْم-এর উভয় অর্থ উদ্দেশ্য হওয়াতে কোনো বাধা নেই, তাই লেখকের সংজ্ঞার মধ্যে عِلْم শব্দটি لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যবহার বৈধ বা শোভন হবে।

উল্লেখ্য যে, اَلْقَوَاعِدُ الْمَعْلُوْمَةُ শব্দটি نَفْسُ الْاُصُوْلِ-এর عَطْف تَفْسِيْرِىْ অর্থাৎ اُصُوْل এবং قَوَاعِدْ দ্বারা উদ্দেশ্য একই। এখানে আরেকটি প্রশ্ন উঠতে পারে যা মুসান্নিফ বা ব্যাখ্যাকারের বক্তব্যের ভিত্তিতে উঠেছে। প্রশ্নটি হচ্ছে- মুসান্নিফ عِلْم-এর দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। ২য় অর্থ- (قَوَاعِد ও اُصُوْل) বর্ণনা করতে তিনি يَجُوْزُ শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা তার দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ তার বক্তব্য দ্বারা ধারণা হয় عِلْم-এর ১ম অর্থটি গ্রহণযোগ্য বা প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আর দ্বিতীয় অর্থ সে রকম নয়; অথচ اُصُوْل-এর অর্থে عِلْم শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয় এবং مَلَكَةٌ-এর অর্থে কম ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া সামান্য পরে যখন يَنْحَصِرُ فِىْ ثَمَانِيَةِ اَبْوَابٍ বলা হবে তখন عِلْم-এর অর্থ اُصُوْل নেওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে। কেননা, যোগ্যতা আটটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ হতে পারে না।

এর উত্তর দু'টি : ১. আল্লামা আব্দুল হাকীমের মতে عِلْمٌ-এর ব্যবহার مَلَكَةٌ-এর ক্ষেত্রেই বেশি, اُصُوْل-এর ক্ষেত্রে কম। তাই মুসান্নিফ اُصُوْل-এর অর্থকে يَجُوْزُ-এর সাথে বর্ণনা করেছেন। ২. এখানে عِلْم-কে اُصُوْل-এর অর্থে গ্রহণ করলে يُعْرَفُ بِهٖ-এর মধ্যে এক مُضَافٌ উহ্য রাখতে হয়। তখন বলতে হবে يُعْرَفُ بِعِلْمِهٖ, কেননা اُصُوْل শব্দের অবস্থা জানার কারণ হয় না; বরং اُصُوْل-এর مَعْرِفَةٌ বা عِلْم শব্দের অবস্থা জানার কারণ হয়।

অতএব, مُضَافٌ উহ্য রাখার চেয়ে উহ্য না রাখা উত্তম অথবা এভাবে বলা যায় যেহেতু مَلَكَةٌ উদ্দেশ্য করলে مضاف উহ্য মানতে হয় না, তাই مَلَكَةٌ-এর অর্থ اُصُوْل-এর অর্থের চেয়ে উত্তম হবে। সুতরাং اُصُوْل-এর অর্থ বর্ণনার শুরুতে يَجُوْزُ শব্দের ব্যবহার (যা অনাগ্রাধিকার সম্পন্ন বা কম প্রাধান্যপ্রাপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।) সঠিক হয়েছে, সঠিক ব্যবহার আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

قَوْلُهٗ وَلِاسْتِعْمَالِهِمِ الْمَعْرِفَةِ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে- মূল লেখক তার সংজ্ঞার মধ্যে يُعْرَفُ بِهٖ শব্দটি ব্যবহার করলেন, يُعْلَمُ শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন না? এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, আরব ভাষাভাষীগণ مَعْرِفَةٌ শব্দটিকে جُزْئِيَّاتٌ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, আর عِلْم-কে كُلِّيَّاتٌ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। আর এখানে اَحْوَالُ اللَّفْظِ বা শব্দের অবস্থাসমূহ বলে যা বুঝানো হচ্ছে যথা- تَاكِيْد، اِطْنَاب، تَقْدِيْمُ الْمُسْنَد ইত্যাদি হলো جُزْئِيَّاتٌ অতএব, এখানে مَعْرِفَةٌ শব্দটিকে ব্যবহার করাই সমীচীন, তাই মূল লেখক مَعْرِفَةٌ-কে ব্যবহার করেছেন, عِلْم-কে ব্যবহার করেননি। মূল লেখকের সংজ্ঞার মধ্যে আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে।

প্রশ্নটি হলো– লেখকের সংজ্ঞাতে دُوْر সৃষ্টি হয় যার দ্বারা একই বিষয় একসাথে مَوْقُوْف এবং مَوْقُوْف عَلَيْه হয়ে যায় যা বৈধ নয়। বিষয়টির ব্যাখ্যা হলো এরূপ– ইলমে মা'আনীর সংজ্ঞার মধ্যে اَحْوَالُ اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ এ অংশটুকু আছে। সুতরাং عِلْمُ الْمَعَانِيْ হলো مُعَرَّفْ (যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়) আর اَحْوَالُ اللَّفْظِ الخ হলো مُعَرِّفْ (যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়) যেহেতু مُعَرَّفْ (راء-এর উপর যবর) مُعَرِّفْ (راء-এর নিচে যের)-এর উপর নির্ভরশীল, সেহেতু عِلْمُ الْمَعَانِيْ নির্ভরশীল হবে اَحْوَالُ اللَّفْظِ-এর উপর। এরপর আরো জানা দরকার যে, اَحْوَالُ اللَّفْظِ জানা যায় عِلْمُ الْمَعَانِيْ দ্বারা। তাই এটি عِلْمُ الْمَعَانِيْ-এর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে عِلْمُ الْمَعَانِيْ এক সময় مَوْقُوْف অন্য সময় مَوْقُوْف عَلَيْه আর একই জিনিস مَوْقُوْف (নির্ভরশীল) مَوْقُوْف عَلَيْه (যার উপর নির্ভরশীল) হওয়া অসম্ভব। তাই এটা প্রমাণ হলো লেখকের সংজ্ঞার মধ্যে دُوْر রয়েছে। যেহেতু دور বাতিল তাই লেখকের সংজ্ঞা বাতিল বলে গণ্য হবে। এর জবাব হলো, এখানে دُوْر হয়নি। কারণ, دُوْر তখনই হতো যখন عِلْمُ الْمَعَانِيْ যে হিসেবে مَوْقُوْف হয়েছে একই হিসেবে যদি مَوْقُوْف عَلَيْه হতো। কিন্তু এখানে একই হিসেবে مَوْقُوْف এবং مَوْقُوْف عَلَيْه হয়নি। এখানে ইলমে মা'আনী اَحْوَالُ اللَّفْظِ-এর উপর তার مَاهِيَّتْ-এর تَصَوُّرْ হিসেবে مَوْقُوْف হয়েছে। আর اَحْوَالُ اللَّفْظِ তার حُصُوْلُ فِي الْخَارِجِ হিসেবে مَوْقُوْف হয়েছে ইলমুল মা'আনীর উপর। তাই এখানে دُوْر হয়নি। অতএব, সংজ্ঞা ঠিকই আছে।

قَوْلُهُ اَيْ هُوَ عِلْمٌ يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ : অর্থ– এটি এমন একটি ইলম যার দ্বারা جُزْئِيَّاتْ-এর উপলব্ধি হাসিল হয়। বাক্যে عِلْم দ্বারা যদি مَلَكَةٌ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে "مِنْ" হরফটি "بِ"-এর অর্থে হবে। কেননা, مَلَكَةٌ দ্বারা اِسْتِنْبَاطْ হয়, مَلَكَةٌ থেকে اِسْتِنْبَاطْ হয় না। আর যদি عِلْم দ্বারা اُصُوْل উদ্দেশ্য হয়, তাহলে مِنْ তার আপন অর্থে বহাল থাকবে। جُزْئِيَّاتٌ-এর اِدْرَاك দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উল্লেখিত جُزْئِيَّاتْ-এর প্রত্যেকটি فَرْدْ সম্পর্কে জানা সম্ভব হবে। এখানে প্রত্যেকটি فَرْدْ-কে بِالْفِعْلِ জানা জরুরি নয়; বরং সে কোনো فرد পাওয়া যাবে, তার সম্পর্কে ইলমুল মা'আনীর সাহায্যে জানা সম্ভব হবে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, اَحْوَالُ اللَّفْظِ দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক, مُفْرَدْ এবং جُمْلَهْ সবার اَحْوَال এখানে শামিল مُفْرَدْ-এর اَحْوَال যেমন مُسْنَدْ-এর অবস্থা, مُسْنَدْ اِلَيْهِ-এর অবস্থা ইত্যাদি। جُمْلَةٌ-এর অবস্থা যেমন فَصْل و وَصْل-এর অবস্থা, اِيْجَازْ ، اِطْنَابْ এবং مُسَاوَاتْ-এর অবস্থা ইত্যাদি।

নিম্নে সংজ্ঞার فَوَائِدْ قُيُوْدْ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো– ১. اَحْوَالُ اللَّفْظِ এ قَيْدْ দ্বারা اَحْوَالُ عِلْمِ الْحِكْمَةِ বের হয়ে গেছে। কেননা, عِلْمِ حِكْمَةْ-এর মধ্যে لَفْظْ-এর অবস্থা আলোচনা করা হয় না। এমনিভাবে عِلْمُ الْمَنْطِقِও বের হয়ে গেছে। কারণ, مَنْطِقْ-এর মধ্যে لَفْظْ নিয়ে আলোচনা করা হয় না; বরং مَعْنٰى বা অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয় এমনিভাবে عِلْمُ الْفِقْهِও বের হয়ে গেছে। কারণ, ইলমুল ফিকহ্-এ আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

২. قَوْلُهُ الَّتِيْ بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ : এ قَيْدْ দ্বারা ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞা থেকে لَفْظْ-এর ঐসব অবস্থাসমূহ বের হয়ে গেছে, যা এমন নয়। যেমন– لَفْظْ-এর বিভিন্ন অবস্থা– اِعْلَالْ (হরফ ইল্লত বিশিষ্ট শব্দের মধ্যে পরিবর্তন), اِدْغَامْ (একই ধরনের বা কাছাকাছি جِنْس-এর দু'টি অক্ষর এক সাথে মিলিয়ে পড়া) যবর, যের এবং পেশ ইত্যাদি অবস্থা বের হয়ে গেছে। যা আসল অর্থ প্রদানের জন্য জরুরি; কিন্তু এগুলো মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখতে পারে না। এমনিভাবে এ قَيْدْ দ্বারা ইলমে বদী'-এর مُحَسِّنَاتْ বের হয়ে গেছে। কেননা مُحَسِّنَاتْ হয় বাক্য মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়ার পর। সুতরাং এগুলোও বাক্যকে মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক করার ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখতে পারে না। مُحَسِّنَاتْ بَدِيْعَةٌ যেমন– تَجْنِيْس، تَرْصِيْع ইত্যাদি।

সার-সংক্ষেপ :

ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞা : هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِه اَحْوَالُ اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الَّتِيْ بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ

অর্থাৎ ইলমুল মা'আনী এমন এক শাস্ত্রকে বলা হয় যে শাস্ত্রের সাহায্যে আরবি বাক্যের এমন অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়, যার দ্বারা বাক্য মুকতাযায়ে হাল অনুযায়ী হয়।

বাক্যের যেসব অবস্থা মূল অর্থ আদায়ের জন্য অপরিহার্য যথা– اِدْغَامْ ,اِعْلَالْ ও اِعْرَابْ ইত্যাদি এবং ইলমে বদী'-এর محسنات এখানে উদ্দেশ্য নয়।

وَالْمُرَادُ اَنَّهُ عِلْمٌ بِهٖ يُعْرَفُ هٰذِهِ الْاَحْوَالُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا يُطَابِقُ بِهَا اللَّفْظُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ لِظُهُوْرِ اَنَّ لَيْسَ عِلْمُ الْمَعَانِىْ عِبَارَةً عَنْ تَصَوُّرِ مَعَانِى التَّعْرِيْفِ وَالتَّنْكِيْرِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ وَالْاِثْبَاتِ وَالْحَذْفِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَبِهٰذَا يَخْرُجُ عَنِ التَّعْرِيْفِ عِلْمُ الْبَيَانِ اِذْ لَيْسَ الْبَحْثُ فِيْهِ عَنْ اَحْوَالِ اللَّفْظِ مِنْ هٰذِهِ الْحَيْثِيَةِ ـ

অনুবাদ : আর উদ্দেশ্য হলো এই যে, ইলমুল মা'আনী ঐ عِلْم-কে বলা হয়, যার দ্বারা এ সকল অবস্থা জানা যায় এ হিসেবে যে, এসব অবস্থা দ্বারা বাক্য মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হবে। কেননা, এ বিষয় তো সুস্পষ্টই যে, ইলমুল মা'আনী مَعْرِفَةٌ (নির্দিষ্ট জ্ঞাপক), نكرة (অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক), تَقْدِيْمٌ (আগে আনা), تَاخِيْر (পরে আনা), اِثْبَاتٌ (বাক্যে উল্লেখ রাখা) ও حَذْفٌ (উহ্য রাখা) ইত্যাদি বিষয়ের تَصَوُّرٌ বা ধারণাকে বলা হয় না। এর দ্বারা ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞা থেকে ইলমে বয়ান বের হয়ে গেছে। কেননা, ইলমুল বয়ানের মধ্যে বাক্যের এ জাতীয় অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয় না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَالْمُرَادُ اَنَّهُ عِلْمٌ بِهٖ يُعْرَفُ الخ : ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখকের উক্তি يُعْرَفُ بِهٖ اَحْوَالُ اللَّفْظِ الْعَرَبِىْ এই قيد দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, এখানে معرفة দ্বারা مَعْرِفَةٌ تَصَوُّرِيَّةٌ উদ্দেশ্য। কেননা, এখানে معرفة-কে اسناد করা হয়েছে مُفْرَدَاتٌ তথা اَحْوَالٌ-এর দিকে। সুতরাং সংজ্ঞার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, ইলমুল মা'আনী ঐ ইলমকে বলা হয়, যার لفظ-এর বিভিন্ন অবস্থা تَصَوُّرٌ বা কল্পনা করা যায়। যেমন– تَاكِيْد ، نكرة ، معرفة ও لام تاكيد ইত্যাদি। অথচ ইলমুল মা'আনী দ্বারা এসব জিনিসকে تَصَوُّرٌ করা যায় না। এর উত্তর হলো, এখানে معرفة দ্বারা উদ্দেশ্য مَعْرِفَةٌ تَصْدِيْقِيَّةٌ। কেননা, ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞার মধ্যে حَيْثُ-এর قَيْد আছে। সে কথার প্রতি মুসান্নিফ (র.) তার বাক্য দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন–

اَنَّهُ عِلْمٌ بِهٖ يُعْرَفُ هٰذِهِ الْاَحْوَالُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا يُطَابِقُ بِهَا اللَّفْظُ

অর্থাৎ 'ইলমুল মা'আনী ঐ ইলমকে বলা হয়, যার দ্বারা এ সকল অবস্থা জানা যায় এ হিসেবে যে, এগুলো মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হবে।' আর এটা জানা কথা যে, اَحْوَالٌ-এর حَيْثِيَتْ দ্বারা تَصْدِيْق হয় تَصَوُّرٌ হয় না। সুতরাং مَعْرِفَةٌ، نَكِرَةٌ ، تَاكِيْد ، تَقْدِيْم، تَاخِيْر ইত্যাদির تَصَوُّرٌ-কে ইলমুল মা'আনী বলা হবে না; বরং এ সকল অবস্থার দ্বারা যদি مُقْتَضٰى حَالٌ-এর মোতাবেক হয়, তাহলে ইলমুল মা'আনী হবে। মুসান্নিফ বলেন, এই حَيْثُ-এর قَيْد-এর দ্বারা ইলমুল বয়ান এ সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেছে। কেননা, ইলমুল বয়ানে যদিও শব্দ ও বাক্যের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়; কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয়; বরং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

وَالْمُرَادُ بِاَحْوَالِ اللَّفْظِ الْاُمُوْرُ الْعَارِضَةُ لَهُ مِنَ التَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ وَالْاِثْبَاتِ وَالْحَذْفِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَمُقْتَضَى الْحَالِ فِى التَّحْقِيْقِ هُوَ الْكَلَامُ الْكُلِّىُّ الْمُتَكَيِّفُ بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوْصَةٍ عَلٰى مَا اُشِيْرَ اِلَيْهِ فِى الْمِفْتَاحِ وَصَرَّحَ بِهٖ فِىْ شَرْحِهٖ لَا نَفْسُ الْكَيْفِيَّاتِ مِنَ التَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ وَالتَّعْرِيْفِ وَالتَّنْكِيْرِ عَلٰى مَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمِفْتَاحِ وَغَيْرِهٖ وَاِلَّا لَمَا صَحَّ الْقَوْلُ بِاَنَّهَا اَحْوَالٌ بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ لِاَنَّهَا عَيْنُ مُقْتَضَى الْحَالِ وَقَدْ حَقَّقْنَا ذٰلِكَ فِى الشَّرْحِ وَ اَحْوَالُ الْاِسْنَادِ اَيْضًا مِنْ اَحْوَالِ اللَّفْظِ بِاِعْتِبَارِ اَنَّ التَّاكِيْدَ وَتَرْكَهُ مَثَلًا مِنَ الْاِعْتِبَارَاتِ الرَّاجِعَةِ اِلٰى نَفْسِ الْجُمْلَةِ وَتَخْصِيْصُ اللَّفْظِ بِالْعَرَبِىْ مُجَرَّدُ اِصْطِلَاحٍ لِاَنَّ الصَّنَاعَةَ اِنَّمَا وُضِعَتْ لِذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : আর اَحْوَالُ اللَّفْظِ (বাক্যের অবস্থাসমূহ)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সব বিষয়, যা বাক্যের মাঝে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অর্থাৎ (বাক্যস্থিত কোনো অংশকে নিজ স্থানের) আগে আনা এবং পরে আনা, (কোনো অংশকে) বাক্যে বহাল রাখা এবং উহ্য রাখা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে মুকতাযায়ে হাল হলো ঐ সার্বিক কালাম, যা কোনো বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। এটি মিফতাহ গ্রন্থের ইঙ্গিত অনুসারে (ব্যাখ্যা) এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। মিফতাহ এবং অন্যান্য গ্রন্থের বাহ্যিক ইবারত দ্বারা যা বুঝা যায় অগ্রবর্তী করা, পশ্চাৎবর্তী করা, নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক করা, অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক করা ইত্যাদি অবস্থা (মুকতাযায়ে হাল) নয়। অন্যথায় এ কথা সহীহ হবে না যে, এটি এমন অবস্থাসমূহ, যার দ্বারা বাক্যটি মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হয়। কেননা, এটাতো মুকাতাযায়ে হাল। এ বিষয়টি ব্যাখ্যাগ্রন্থে (মুতাওয়ালে) বিশ্লেষণ করেছি। ইসনাদের অবস্থাসমূহও বাক্যের অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এ হিসেবে যে, তাকিদ হওয়া বা না হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের সম্পর্ক জুমলার সাথে। লফয বা বাক্যকে আরবি ভাষার সাথে খাস করা একটি পরিভাষা মাত্র। কেননা, এ শাস্ত্র আরবি ভাষার শব্দ ও বাক্যের জন্যই আবিষ্কার করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَالْمُرَادُ بِاَحْوَالِ اللَّفْظِ الخ : ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞার মধ্যে اَحْوَالُ اللَّفْظِ শব্দটির দ্বারা কি উদ্দেশ্য, মুসান্নিফ (র.) তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, اَحْوَالُ اللَّفْظِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল বিষয় বা অবস্থা, যা শব্দের মধ্যে বিভিন্ন সময় দেখা দেয়। যেমন– تَقْدِيْم ، تَاخِيْر ، اِثْبَات ، حَذْف ইত্যাদি বা বাক্যের মধ্যে শ্রোতার চাহিদানুপাতে যেসব বৈশিষ্ট্যকে নেওয়া হয়।

قَوْلُهٗ وَمُقْتَضَى الْحَالِ : (বাহ্যিক অবস্থার দাবি) বলা হয় (শ্রোতার চাতিদানুপাতে) কোনো বৈশিষ্ট্যধারী كلى বাক্যকে। উদাহরণ স্বরূপ শ্রোতার اِنْكَارٌ হলো حَالٌ, আর এ مُقْتَضٰى হলো তাকীদযুক্ত একটি كلى বাক্য। আর لَفْظ হলো একটি বিশেষ বাক্য, যাতে বিশেষ তাকীদ রয়েছে, যা كُلِّىٌّ বাক্যের মোতাবেক হয়। শুধুমাত্র كَيْفِيَاتٌ বা অবস্থাসমূহকে মুকতাযায়ে হাল বলা হয় না। লেখকের সংজ্ঞার মধ্যে যে اَحْوَالٌ শব্দটি রয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كَيْفِيَاتٌ বা অবস্থাসমূহ।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত ব্যাখ্যা মিফতাহুল উলূমের ইবারতের ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায়। তালখীসুল মিফতাহের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুতাওয়ালের মধ্যে এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে রয়েছে। মুসান্নিফ বলেন, মিফতাহুল উলূমের বাহ্যিক ইবারত দ্বারা অবশ্য اَحْوَالْ বা كَيْفِيَاتٌ-কেই মুকতাযায়ে হাল বুঝা যায়। কিন্তু যদি مُقْتَضَى الْحَالِ দ্বারা বৈশিষ্ট্য এবং كَيْفِيَاتٌ মনে করা হয়, তাহলে সংজ্ঞা ভুল হয়ে যাবে। কারণ, তখন اَحْوَالٌ দ্বারা উদ্দেশ্য كَيْفِيَاتٌ বা বৈশিষ্ট্য এবং مُقْتَضَى الْحَالِ দ্বারাও উদ্দেশ্য كَيْفِيَاتٌ বা বৈশিষ্ট্য। এমতাবস্থায় পুরো সংজ্ঞাটির অর্থ এরূপ হবে, ইলমে মা'আনী ঐ ইলমকে বলা হয়, যার দ্বারা আরবি বাক্যের ঐ সব বৈশিষ্ট্যাবলিকে জানা যায়, যে বৈশিষ্ট্যাবলি দ্বারা বাক্য বৈশিষ্ট্যাবলির মোতাবেক হয়।

এ ব্যাখ্যানুসারে مُطَابِقٌ (باء-এর নিচে যের) হলো كَيْفِيَاتٌ বা বৈশিষ্ট্য এবং مُطَابَقٌ (باء-এর উপর যবর) ও كَيْفِيَاتٌ বা বৈশিষ্ট্য। সুতরাং مُطَابِقٌ এবং مُطَابَقٌ এক হওয়া লাযেম আসছে। অথচ উভয়টা এক হওয়া বাতিল। অতএব, উভয়টাই كَيْفِيَاتٌ হবে না; বরং মুসান্নিফের মতানুসারে مُقْتَضَى حَالْ-কে একটি كلى বাক্য ধরতে হবে।

সারকথা হলো এই যে, লেখকের সংজ্ঞায় বর্ণিত اَحْوَالٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كَيْفِيَاتٌ বা বৈশিষ্ট্য। আর مُقْتَضَى حَالْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি كلى বাক্য, যার মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

قَوْلُهُ وَاَحْوَالُ الْاِسْنَادِ اَيْضًا : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রশ্নটি হলো, ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞায় اَحْوَالُ اللَّفْظِ শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় ইলমুল মা'আনীর মধ্যে আরবি শব্দের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, اَلْاِسْنَادُ যেহেতু لَفْظ নয়, তাই এ সংজ্ঞার মধ্যে اَحْوَالُ الْاِسْنَادِ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আর যখন اَحْوَالُ الْاِسْنَادِ সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তাই ইলমুল মা'আনীর আলোচনার মধ্যে اَحْوَالُ الْاِسْنَادِ না আসা উচিত ছিল। অথচ লেখক اَحْوَالُ الْاِسْنَادِ-এর আলোচনা তার কিতাবে অবতারণা করেছেন। এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, যেসব বিষয়কে ইসনাদের অবস্থা মনে করা হয়, যেমন– تَاكِيد ، عَدَمْ تَاكِيدْ ، حَقِيقَتْ ও مَجَازْ ইত্যাদি। এগুলো এ হিসেবে جُمْلَة বা বাক্যের অবস্থার মধ্যে গণ্য হবে যে, ইসনাদ جملة বা বাক্যের جُزْء বা অংশ। আর جُزْء-এর অবস্থাসমূহ جُزْء-এর মাধ্যমে كُلْ-এর অবস্থার মধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং اِسْنَادْ-এর অবস্থাসমূহ اِسْنَادْ-এর মাধ্যমে جُمْلَةْ-এর অবস্থা বলে গণ্য হবে। আর جُمْلَة বা বাক্য হলো لَفْظ। সুতরাং ইসনাদের অবস্থাসমূহ جُمْلَة-এর মাধ্যমে لَفْظ-এর অবস্থা বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ وَتَخْصِيصُ اللَّفْظِ بِالْعَرَبِيِّ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, ইলমুল মা'আনী দ্বারা যেমন আরবি শব্দের বিভিন্ন অবস্থা জানা যায়, তেমনি অনারবি শব্দের বিভিন্ন অবস্থাও জানা যায়। তাহলে মুসান্নিফ সংজ্ঞাটিকে আরবি শব্দের সাথে কেন নির্দিষ্ট করলেন?

এর উত্তর হলো, সংজ্ঞাতে আরবি শব্দ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য অনারবি শব্দকে বাদ দেওয়া নয়; বরং এটি একটি পরিভাষারূপে উল্লিখিত হয়েছে। কারণ, ইলমুল মা'আনীকে সাধারণভাবে আরবি শব্দের অবস্থা জানার জন্যই সংকলন করা হয়েছে। আমরা জানি, ইলমুল মা'আনীসহ পুরো বালাগাতশাস্ত্রকে পবিত্র কুরআনের মু'জিযা প্রমাণের জন্য এবং এর হিকমত ও সূক্ষ্ম বিষয় জানার জন্য সংকলন করা হয়েছে। আর কুরআনের শব্দ আরবি, এ কারণে আরবি শব্দের কথা সংজ্ঞার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথা ইলমুল মা'আনী আরবি শব্দের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং অন্যান্য ভাষার শব্দাবলির অবস্থাও ইলমুল মা'আনী দ্বারা জানা সম্ভব।

وَيَنْحَصِرُ الْمَقْصُوْدُ مِنْ عِلْمِ الْمَعَانِىْ فِىْ ثَمَانِيَةِ اَبْوَابٍ اِنْحِصَارَ الْكُلِّ فِى الْاَجْزَاءِ لَا الْكُلِّىِّ فِى الْجُزْئِيَّاتِ وَاِلَّا لَصَدَقَ عِلْمُ الْمَعَانِىْ عَلٰى كُلِّ بَابٍ اَحْوَالُ الْاِسْنَادِ الْخَبَرِىْ وَاَحْوَالُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ وَاَحْوَالُ الْمُسْنَدِ وَاَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ وَالْقَصْرُ وَالْاِنْشَاءُ وَالْفَصْلُ وَالْوَصْلُ وَالْاِيْجَازُ وَالْاِطْنَابُ وَالْمُسَاوَاةُ وَاِنَّمَا اِنْحَصَرَ فِيْهَا لِاَنَّ الْكَلَامَ اِمَّا خَبَرٌ اَوْ اِنْشَاءٌ لِاَنَّهُ لَامُحَالَةَ يَشْتَمِلُ عَلٰى نِسْبَةٍ تَامَّةٍ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ قَائِمَةٍ بِنَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ وَهُوَ تَعَلُّقُ اَحَدِ الشَّيْئَيْنِ بِالْاٰخَرِ بِحَيْثُ يَصِحُّ السُّكُوْتُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ اِيْجَابًا اَوْ سَلْبًا اَوْ غَيْرَهُمَا كَمَا فِى الْاِنْشَائِيَّاتِ وَتَفْسِيْرُهُمَا بِاِيْقَاعِ الْمَحْكُوْمِ بِهٖ عَلَى الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ اَوْ سَلْبِهٖ عَنْهُ خَطَأٌ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ لِاَنَّهُ لَايَشْتَمِلُ النِّسْبَةَ الَّتِىْ فِى الْكَلَامِ الْاِنْشَائِىْ فَلَايَصِحُّ التَّقْسِيْمُ ـ

অনুবাদ : ইলমুল মা'আনীর মূল বিষয় **আটটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ** (এই সীমাবদ্ধকরণ) একটি كُلْ বা পূর্ণাঙ্গবস্তু বিভিন্ন অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার মতো। একটি كُلِّىْ তার অধীন বিভিন্ন فَرْدْ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার মতো নয়। অন্যথায় প্রত্যেকটি অধ্যায়কে ইলমুল মা'আনী বলা যেত। ১. ইসানদে খবরী-এর বিভিন্ন অবস্থা, ২. মুসনাদ ইলাইহ-এর বিভিন্ন অবস্থা, ৩. মুসনাদের বিভিন্ন অবস্থা, ৪. ফে'লের মুতা'আল্লিকের বিভিন্ন অবস্থা, ৫. কসর, ৬. ইনশা, ৭. ওয়াস্‌ল এবং ফসল, ৮. ই'জায, ইতনাব ও মুসাওয়াত। এগুলোর মধ্যেই ইলমুল মা'আনী সীমাবদ্ধ। **কারণ বাক্য** (সাধারণভাবে) **হয় বর্ণনামূলক অথবা আদেশ-নিষেধমূলক।** কেননা, বাক্য অবশ্যই পরিপূর্ণ একটি নিসবত (সম্পর্ক)-কে শামিল করবে যা মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ-এর মাঝে বিদ্যমান এবং বক্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। (নিসবত বলা হয়) দু'টি বস্তুর একটির সম্পর্ক আরেকটির সাথে হওয়া এমনভাবে যে, এর উপর চুপ থাকা সহীহ, চাই সে সম্পর্ক না-বাচক হোক অথবা হ্যাঁ-বাচক হোক বা এ দু'টি ছাড়া অন্য কিছু হোক। যেমন– ইনশায়ী বাক্যের মধ্যে হয়ে থাকে।

নিসবতের সংজ্ঞা মুসনাদকে মুসনাদ ইলাইহর সাথে যুক্ত করা বা মুসনাদকে মুসনাদ ইলাইহ থেকে নফীকরণ দ্বারা করা এ স্থানে ভুল। কেননা, এ সংজ্ঞা ইনশায়ী বাক্যের নিসবতকে শামিল করে না। সুতরাং (এ সংজ্ঞার পর) প্রকারভেদ করা ঠিক হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَيَنْحَصِرُ الْمَقْصُوْدُ الخ : মূল লেখক বলেন, ইলমুল মা'আনীর মূল আলোচনা আটটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ। বিষয়টি এরূপে যে, ইলমুল মা'আনী একটি كُلْ, আর তার আটটি جُزْءْ রয়েছে অর্থাৎ একটি كُلْ আটটি جُزْءْ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিষয়টি এমন নয় যে, ইলমুল মা'আনী একটি كُلِّىْ তার جُزْئِىْ হলো আটটি।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, كُلِّىْ এবং كُلْ-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। كُلِّىْ তার جُزْئِىْ-এর উপর প্রয়োগ হয়। যেমন– اِنْسَانْ (মানুষ) একটি كُلِّىْ তার جُزْئِىْ (যেমন রাশেদ)-এর উপর اِنْسَانْ (মানুষ) কথাটি প্রয়োগ হবে; কিন্তু كُلْ তার جُزْءْ-এর উপর প্রয়োগ হয় না। যেমন– রাশেদ একটি كُلْ তার হাত পা ইত্যাদি তার جُزْءْ। সুতরাং হাত, পা, ইত্যাদিকে কখনো রাশেদ বলা যাবে না। সুতরাং ইলমুল মা'আনী যদি كُلِّىْ হতো, তাহলে তার প্রত্যেকটি অধ্যায়কে ইলমুল মা'আনী বলা যেত, অথচ তা বলা যায় না।

সুতরাং ইলমুল মা'আনী একটি كُلٌ আর আটটি অধ্যায় তার বিভিন্ন جُزْء। সেই আটটি جُزْء বা অধ্যায় হলো- ১. أَحْوَالُ إِسْنَادٌ خَبَرِى ২. أَحْوَالُ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ ৩. أَحْوَالُ مُسْنَدٌ ৪. أَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ فِعْل ৫. قَصْر ৬. اِنْشَاء ৭. وَصْل وَفَصْل ৮. اِيْجَازْ، اِطْنَابْ وَمُسَاوَاتْ

প্রকাশ থাকে যে, চতুর্থ অধ্যায়ে أَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ فِعْل এবং أَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ شِبْه فِعْل উভয়টার আলোচনা এসেছে। فِعْل আসল, شِبْهُ فِعْل তার অনুগামী। এখানে أَصْل-কে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু উভয়টিই উদ্দেশ্য।

মূল লেখকের ইবারত থেকে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তিনি اِسْنَادْ ، مُسْنَدْ ইত্যাদির আগে أَحْوَالُ শব্দটিকে সম্বন্ধপদ হিসেবে আনলেন, কিন্তু قَصْر এবং পরবর্তীগুলোর আগে أَحْوَالُ শব্দটিকে আনলেন না কেন? এর উত্তর হলো- قَصْر এবং পরবর্তীগুলো স্বয়ং أَحْوَالُ-এর মধ্যে গণ্য। সুতরাং যদি এগুলোর আগে أَحْوَالُ শব্দটিকে সম্বন্ধ স্বরূপ রাখা হতো, তাহলে اِضَافَةُ الشَّئِ اِلَى نَفْسِه হয়ে যেত। আর اِضَافَةُ الشَّئِ اِلَى نَفْسِه অবৈধ। তাই এগুলোর আগে أَحْوَالُ শব্দটিকে আনা হয়নি।

কিন্তু اِنْشَاءْ যেহেতু أَحْوَالُ-এর মধ্যে গণ্য নয়, তাই اِنْشَاءْ-এর আগে أَحْوَالُ শব্দটি সম্বন্ধ হিসেবে রাখা দরকার ছিল।

এরপর মুসান্নিফ (র.) আটটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করছেন।

دَلِيْلُ الْحَصْر : তিনি বলেন, বাক্য দু' ধরনের- ১. خَبَرْ বা বর্ণনামূলক বাক্য, ২. اِنْشَاءْ বা আদেশ-নিষেধ, প্রশ্নবোধক ইত্যাদি বাক্য।

দু' ধরনের হওয়ার কারণ বাক্যের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী অংশ হলো বাক্যের মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহের মাঝে একটি পূর্ণাঙ্গ নিসবত বা সম্পর্ক থাকবে এবং তা মুতাকাল্লিমের সাথে সম্পর্কিত হবে।

মুসান্নিফের বাক্য قَائِمَةٌ بِنَفْسِ الْمُتَكَلِّم-এর উপর একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। মূল প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমাদের কিছু বিষয় জেনে নেওয়া দরকার। আর তা হলো, বাক্যের সাথে তিন ধরনের নিসবত সম্পর্কিত- ১. نِسْبَةٌ كَلَامِيَّةٌ ২. نِسْبَتْ ذِهْنِيَّةٌ ৩. نِسْبَتْ خَارِجِيَّةٌ বাক্যের দু'টি প্রধান অংশ যথা মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহের মাঝে যে সম্পর্ক কালাম বা বাক্য থেকে পাওয়া যায়, তাকে নিসবতে কালামিয়্যাহ বলা হয়।

আবার এ সম্পর্কই যখন বক্তার মেধা বা মস্তিষ্কে অবস্থান করে, তখন তাকে নিসবতে ذِهْنِيَّةٌ বলা হয়।

এ সম্পর্ক বাস্তব বা বাহ্যিক অবস্থায় পাওয়া যাওয়াকে নিসবতে খারিজিয়্যাহ বলা হয়। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ -যায়েদ দণ্ডায়মান। যায়েদের দাঁড়ানো বিষয়টি উক্ত বাক্য থেকে প্রাপ্ত হিসেবে এটি নিসবতে কালামিয়্যাহ; আবার যায়েদের দাঁড়ানোর বিষয়টি বক্তার মস্তিষ্কে উপস্থিত হওয়া বা কল্পনায় আসার দ্বারা সেটি নিসবতে যাহনিয়্যাহ হয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে যায়েদের দাঁড়ানোর বিষয়টি যখন বাহ্যিক জগতে বা বাস্তবে হয়, তখন সেটা নিসবতে খারিজিয়্যাহ হয়ে যাচ্ছে।

অতঃপর নিসবতে কালামিয়্যাহ এবং খারিজিয়্যাহ মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ-এর একটির সাথে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; কিন্তু নিসবতে যাহনিয়্যাহ বক্তার মনোজগতের সাথে প্রতিষ্ঠা পায়।

বিস্তারিত ব্যাখ্যার পর এখানে পূববর্তী প্রশ্নের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, মুসান্নিফের বক্তব্য দ্বারা মনে হচ্ছে নিসবতে কালামিয়্যাহ-এর সম্পর্ক মনোজগতের সাথে প্রতিষ্ঠিত। অথচ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, নিসবতে কালামিয়্যাহ মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ-এর কোনো একটির সাথে প্রতিষ্ঠা পায়, বক্তার মনোজগতের মাঝে প্রতিষ্ঠা পায় না। সুতরাং মুসান্নিফ قَائِمَةٌ بِنَفْسِ الْمُتَكَلِّم যে বললেন এর কি ব্যাখ্যা?

উত্তর : قَائِمَةٌ بِنَفْسِ الْمُتَكَلِّم দ্বারা নিসবতে কালামিয়্যাহ نَفْس-এর সিফাত বা نَفْس-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায় তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো বক্তার نَفْس এ নিসবতকে বুঝতে পারে। তাহলে পুরো বাক্যের অর্থ এই দাঁড়ায়, নিসবতে কালামিয়্যাহ মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ-এর কোনো একটির সাথে প্রতিষ্ঠিত, যাকে বক্তার মনোজগত অনুধাবন করতে পারে। সুতরাং বুঝা গেল যে, নিসবতে কালামিয়্যাহ মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহের কোনো একটি এবং বক্তার মনোজগতের সাথে বিশেষ অর্থে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং মুসান্নিফের ইবারত قَائِمَةٌ بِنَفْسِ الْمُتَكَلِّم বলা অশুদ্ধ নয়।

অতঃপর মুসান্নিফ (র.) নিসবতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

هُوَ تَعَلُّقُ اَحَدِ الشَّيْئَيْنِ بِالْاٰخَرِ بِحَيْثُ يَصِحُّ السُّكُوْتُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ اِيْجَابًا اَوْ سَلْبًا اَوْ غَيْرَهُمَا

অর্থাৎ নিসবত বলা হয় দু'টি বিষয়ের একটি অপরটির সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত হওয়া যে, বক্তার জন্য বাক্যটি বলেই ক্ষান্ত হওয়া সহীহ হয় এবং শ্রোতা তার কথা বুঝার জন্য অতিরিক্ত কথা শোনার প্রয়োজন মনে করে না। এ সম্পর্ক ইতিবাচক হতে পারে, যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান) অথবা নেতিবাচকও হতে পারে, যেমন– زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ (যায়েদ দণ্ডায়মান নয়) অথবা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক কোনোটাই নয়, যেমন– ইন্‌শা-এর বিভিন্ন প্রকার। যথা, আমর বা আদেশসূচক বাক্য– إِفْعَلْ (তুমি করো), নিষেধসূচক বাক্য– لَاتَفْعَلْ (তুমি করো না) ইত্যাদি।

قَوْلُهُ وَتَفْسِيرُهُمَا بِإِيقَاعِ الْمَحْكُوْمِ بِهِ عَلَى الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ : মুসান্নিফ বলেন, কতিপয় লোক নিসবতের সংজ্ঞা প্রদান করেন এভাবে যে, নিসবত বলা হয় মুসনাদ ইলাইহ বা বাক্যের উদ্দেশ্যের জন্য বিধেয়কে সাব্যস্ত করা অথবা উদ্দেশ্য থেকে বিধেয়কে না-বাচক করে দেওয়া।

মুসান্নিফ বলেন, তাদের এ সংজ্ঞা ক্ষেত্রবিশেষে (বর্ণনামূলক বাক্য) সঠিক হলেও এ স্থানের জন্য (অর্থাৎ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ এবং جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ প্রকারভেদ করার ক্ষেত্রে) এ সংজ্ঞা ভুল বা অগ্রহণযোগ্য। কেননা, তাদের এ সংজ্ঞা جُمْلَة إِنْشَائِيَّةٌ-এর নিসবতকে অন্তর্ভুক্ত করে না। (কারণ, جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ-এর মধ্যে উদ্দেশ্যের জন্য বিধেয়কে প্রমাণ বা বিধেয়কে না-বাচক করা হয় না) অতএব, এখানে নিসবতের এমন একটি সংজ্ঞা আনতে হবে, যা خَبَرِيَّةٌ ও إِنْشَائِيَّةٌ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে এরপর উভয়ের প্রকারভেদ করা সঠিক হবে। এ হিসেবে মুসান্নিফের বর্ণিত সংজ্ঞাটিই সঠিক।

فَالْكَلَامُ إِنْ كَانَ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ فِيْ أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ أَيْ يَكُوْنُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ فِي الْخَارِجِ نِسْبَةٌ ثُبُوْتِيَّةٌ أَوْ سَلْبِيَّةٌ تُطَابِقُهُ أَيْ تُطَابِقُ تِلْكَ النِّسْبَةُ ذٰلِكَ الْخَارِجَ بِأَنْ يَكُوْنَا ثُبُوْتِيَّيْنِ أَوْ سَلْبِيَّيْنِ أَوْ لَا تُطَابِقُهُ بِأَنْ تَكُوْنَ النِّسْبَةُ الْمَفْهُوْمَةُ مِنَ الْكَلَامِ ثُبُوْتِيَّةً وَالَّتِيْ بَيْنَهُمَا فِي الْخَارِجِ وَالْوَاقِعِ سَلْبِيَّةً أَوْ بِالْعَكْسِ فَخَبَرٌ أَيْ فَالْكَلَامُ خَبَرٌ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ كَذٰلِكَ فَإِنْشَاءٌ وَتَحْقِيْقُ ذٰلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ لَهُ نِسْبَةٌ بِحَيْثُ تَحْصُلُ مِنَ اللَّفْظِ وَيَكُوْنُ اللَّفْظُ مُوْجِدًا لَهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلٰى كَوْنِهِ دَالًّا عَلٰى نِسْبَةٍ حَاصِلَةٍ فِي الْوَاقِعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَهُوَ الْإِنْشَاءُ أَوْ يَكُوْنُ نِسْبَتُهُ بِحَيْثُ يُقْصَدُ أَنَّ لَهَا نِسْبَةً خَارِجِيَّةً تُطَابِقُهَا أَوْ لَا تُطَابِقُهَا فَهُوَ الْخَبَرُ لِأَنَّ النِّسْبَةَ الْمَفْهُوْمَةَ مِنَ الْكَلَامِ الْحَاصِلَةَ فِي الذِّهْنِ لَابُدَّ وَأَنْ تَكُوْنَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَمَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنِ الذِّهْنِ لَابُدَّ أَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَ هٰذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ فِي الْوَاقِعِ نِسْبَةٌ ثُبُوْتِيَّةٌ بِأَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا ذَاكَ أَوْ سَلْبِيَّةٌ بِأَنْ لَّا يَكُوْنَ هٰذَا ذَاكَ أَلَا تَرٰى أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ فَإِنَّ نِسْبَةَ الْقِيَامِ مَثَلًا حَاصِلَةٌ لِزَيْدٍ قَطْعًا سَوَاءٌ قُلْنَا إِنَّ النِّسْبَةَ مِنَ الْأُمُوْرِ الْخَارِجِيَّةِ أَوْ لَيْسَتْ مِنْهَا وَهٰذَا مَعْنٰى وُجُوْدِ النِّسْبَةِ الْخَارِجِيَّةِ ـ

অনুবাদ : সুতরাং বাক্যের (থেকে প্রাপ্ত) **নিসবতের যদি একটি বাস্তবতা থাকে** তিন কালের কোনো একটি কালে। অর্থাৎ বাক্যের প্রধান দু'টি অংশের মাঝে বাস্তবে যদি একটি ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক নিসবত থাকে (আর) **সেই নিসবতটি বাস্তবে তার মোতাবেক হবে** অর্থাৎ বাক্যের নিসবত ও বাস্তব উভয়টা ইতিবাচক হয় অথবা নেতিবাচক হয়। **অথবা মোতাবেক হবে না**। অর্থাৎ বাক্য থেকে প্রাপ্ত নিসবতটি ইতিবাচক, আর বাক্যের দুই প্রধান অংশের মাঝের বাস্তব বা বাহ্যিক অবস্থার সম্পর্কটি নেতিবাচক হয় অথবা এর বিপরীত হয়, **তাহলে তা খবর** তথা বর্ণনামূলক বাক্য। **অন্যথায়** অর্থাৎ যদি সেই (বাক্যের) নিসবতটির কোনো রকম বাস্তবতা নেই, **তাহলে তা ইনশা**। এর বিশ্লেষণ হচ্ছে, কালাম বা বাক্যের একটি নিসবত বা সম্পর্ক থাকবে যা (বাক্যস্থিত) শব্দ থেকে অর্জিত হয় এবং শব্দটিই সেই নিসবতের জন্মদাতা হয়। এটি বাস্তবের দু'টি বস্তুর মাঝে কোনো নিসবতের প্রতি ইঙ্গিতবহ- এরকম ইচ্ছা করা ছাড়াই (এমন হলে) এটি ইন্‌শা। অথবা, বাক্য থেকে প্রাপ্ত নিসবতটি এমন যে, এর জন্য বাস্তব জগতের একটি সম্পর্কের ইচ্ছা করা হয় যা বাস্তবের নিসবতের মোতাবেক হবে, অথবা হবে না। (এমন হলে) এটি খবর বা বর্ণনাজ্ঞাপক বাক্য। কেননা, বাক্য থেকে প্রাপ্ত নিসবত যা (বক্তার) মনোজগতে অর্জিত হয়েছে, অবশ্যই তা দু'টি জিনিসের মাঝে হতে হবে এবং মনোজগতের কথা বাদ দেওয়া অবস্থায়ও অবশ্যই এ দু'টি জিনিসের মাঝে বাস্তবে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক হয়ে থাকে অর্থাৎ এটি এমনই, অথবা নেতিবাচক অর্থাৎ এটি এমন নয়। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন না যে, আপনি যখন উদাহরণ স্বরূপ বললেন, زَيْدٌ قَائِمٌ (এর থেকে) নিশ্চিতভাবে দাঁড়ানোর সম্পর্ক যায়েদের সাথে পাওয়া গেল। তাই আমরা সে নিসবতটিকে বাস্তব জগতের বলে থাকি। অথবা বাস্তব জগতের নাই হোক, এটাই হচ্ছে নিসবতে খারিজিয়্যাহ-এর অস্তিত্বের অর্থ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ فَالْكَلَامُ إِنْ كَانَ لِنِسْبَتِهِ الخ : মূল লেখক অর্থাৎ তালখীসুল মিফতাহের রচয়িতা جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ এবং جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ এ দু' ধরনের বাক্যের সংজ্ঞা দিচ্ছেন। মুসান্নিফ (র.) তাঁর সংজ্ঞাটিকে নিজস্ব গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণে উপস্থাপন করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাধারণভাবে কালাম বা বাক্য (খবরিয়্যাহ অথবা ইন্‌শাইয়্যাহ)-এর নিসবত অর্থাৎ 'নিসবতে কালামিয়্যাহ' যদি তিনকাল (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ)-এর কোনো এক কালে নিসবতে খারিজীরূপে পাওয়া যায়। অর্থাৎ বাক্যের দুই প্রধান অংশ উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মাঝে বাস্তবে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক সম্পর্ক পাওয়া যায়। এরপর বাক্য থেকে প্রাপ্ত নিসবত তথা নিসবতে কালামিয়্যাহ সেই বাস্তবতার নিসবতের মোতাবেক বা অনুযায়ী হয়। অর্থাৎ নিসবতে কালামিয়্যাহ হ্যাঁ-বাচক এবং নিসবতে খারিজিয়্যা ও হ্যাঁ-বাচক। নিসবতে কালামিয়্যাহ না-বাচক এবং নিসবতে খারিজীও না-বাচক। অথবা নিসবতে কালামিয়্যাহ নিসবতে খারিজিয়্যাহ-এর মোতাবেক হয় না। অর্থাৎ নিসবতে কালামিয়্যাহ ইতিবাচক এবং নিসবতে খারিজিয়্যাহ নেতিবাচক অথবা এর উল্টো। যাই হোক মোতাবেক হোক বা না হোক, উভয় অবস্থায় এটি جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ বা বর্ণনাজ্ঞাপক বাক্য এবং এর মধ্যে সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পক্ষান্তরে যে বাক্যের নিসবতে কালামিয়্যাহ-এর এমন কোনো বাস্তবতা নেই, যার মোতাবেক নিসবতে কালামিয়্যাহ হতে পারে অথবা হতে পারে না। সে বাক্যকে কালামে ইনশাইয়্যাহ বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, ইনশায়ী বাক্যে বাস্তবে নিসবত না থাকার কারণে এটি সত্য বা মিথ্যা কোনোটাই হতে পারে না।

قَوْلُهُ تَحْقِيقُ ذٰلِكَ : এখান থেকে মুসান্নিফ উপরে উল্লিখিত দু ধরনের বাক্য (ইনশা ও খবর)-এর মাঝে কি পার্থক্য তা বর্ণনা করেছেন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূল লেখকের বক্তব্য দ্বারা মনে হয়েছে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ-এর নিসবতে কালামিয়্যাহ যেমন আছে তেমনি সেই নিসবতে কালামিয়্যাহ-এর একটি নিসবতে খারিজী আছে। কিন্তু جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ-এর নিসবতে কালামিয়্যাহ আছে বটে, তবে তার নিসবতে খারেজী নেই। কিন্তু আমার তাহকীক হলো جملة خبرية ও جملة انشائية উভয় ধরনের বাক্যের নিসবতে কালামিয়্যাহ এবং নিসবতে খারিজিয়্যাহ (উভয়টাই) আছে। তবে جملة خبرية-এর মধ্যে নিসবতে কালামিয়্যাহ-এর নিসবতে খারিজীর সাথে মোতাবেক হওয়া বা না হওয়ার ইচ্ছা করা হয়। কিন্তু ইনশায়ী বাক্যের মধ্যে নিসবতে কালামিয়্যাহ-এর নিসবতে খারিজীর সাথে মোতাবেক হওয়া বা না হওয়ার ইচ্ছা করা হয় না।

মুসান্নিফের ভাষায় সাধারণ বাক্য (খবর এবং ইনশা)-এর একটি নিসবত থাকে, যা বাক্যের শব্দ থেকে উৎপত্তি হয় এবং শব্দগুলো সেই নিসবতের জন্মদাতা। এরপর যদি এ ইচ্ছা না করা হয় যে, এ নিসবত বাস্তবে দু'টি জিনিসের মাঝে যে নিসবত আছে তার উপর ইঙ্গিত করে; তাহলে তা ইনশা, (সুতরাং তার ব্যাখ্যামতে ইনশার জন্য নিসবতে খারিজী প্রমাণ হলো)।

আর বাক্যের নিসবত থেকে বাস্তবের নিসবতের যেখানে ইচ্ছা করা হয় যে, এটি বাস্তবের মোতাবেক হবে বা হবে না; তাহলে একে جملة خبرية বলা হয়।

قَوْلُهُ لَا النِّسْبَةُ الْمَفْهُومَةُ مِنَ الْكَلَامِ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) জুমলায়ে খবরিয়ার দু' নিসবত এবং এক নিসবতের সাথে আরেক নিসবতের মোতাবেক হওয়া এবং না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, বাক্য থেকে যে নিসবতটি বুঝা যায় এবং বক্তার মনোজগতে যা স্থান লাভ করে এর জন্য অবশ্যই দু'টি বস্তুর দরকার যে দু'টি বস্তুর মাঝে উক্ত নিসবতটি হবে। এ দু'টি বস্তু হচ্ছে মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ।

আবার মনোজগতের কথা বাদ দিয়ে উক্ত দু'টি বস্তুর মাঝে বাস্তব বা বাহ্যিক জগতে যে নিসবত বা সম্পর্ক তৈরি হয় তা অবশ্যই দু'ভাবে হবে। ইতিবাচক হবে যেমন- (কেউ বলল) هٰذَا ذَاكَ এটা হলো তা। এতে هٰذَا হলো মুসনাদ ইলাইহ বা উদ্দেশ্য। অথবা শব্দ দু'টির মাঝে সম্পর্ক হবে নেতিবাচক যেমন- (কেউ বলল,) لَيْسَ هٰذَا ذَاكَ এটা তা নয়। এখানে هذا বা এটা হলো উদ্দেশ্য, আর ذاك বা তা হলো বিধেয়।

কথাটি আরো স্পষ্টভাবে বুঝানোর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, আপনি যখন বলবেন زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান) তখন অবশ্যম্ভাবীভাবে যায়েদের জন্য قِيَامٌ বা দাঁড়ানোর নিসবত বাস্তব বা বাহ্যিক জগতে সৃষ্টি হবে। চাই সে নিসবতকে أُمُوْر خَارِجِيَّة (বাহ্যিক বিষয়বলির) অন্তর্ভুক্ত মনে করা হোক। যেমন– حُكَمَاء দের মাযহাব। অথবা সেই নিসবতটি বাহ্যিক বিষয়বলির অন্তর্ভুক্ত না হোক; বরং তা إِعْتِبَارِىْ (ধরে নেওয়া বা মনে করার) বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হোক। এ মতটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের।

সুতরাং নিসবতে খারিজীর অর্থ এটাই দাঁড়াল যে, এ নিসবতটি বাস্তবে এবং প্রকৃতপক্ষে দু'টি জিনিসের মধ্যে হবে বা দু'টি জিনিসের মাঝে তা বিদ্যমান থাকবে।

قَوْلُهُ سَوَاءٌ قُلْنَا إِنَّ النِّسْبَةَ الخ : এ কথার দ্বারা মুসান্নিফ উক্ত নিসবত (যা أَعْرَاض نَسَبِيَّة-এর অন্তর্ভুক্ত) সম্পর্কে দু'টি মাযহাব উল্লেখ করেছেন। মূলত এ মতবিরোধ যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত (আকিদাগতভাবে যথা আশায়েরা মাতুরীদিয়্যাহ) এবং حُكَمَاء-এর মাঝে হয়েছে। আর أَعْرَاض نَسَبِيَّة (এর আলোচনা فَصَاحَة مُتَكَلِّم-এর মধ্যে গেছে) নিয়ে হয়েছে। মতবিরোধটা হচ্ছে এই– حُكَمَاء মনে করেন أَعْرَاض نَسَبِيَّة-এর অস্তিত্ব বাস্তব জগতে এমনভাবে হয়ে থাকে, যা চোখে দেখা সম্ভব। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে মনে করেন اعراض نسبية-এর অস্তিত্ব إِعْتِبَارِىْ (বা যার অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়) অর্থাৎ বাস্তব জগতে এর অস্তিত্ব এমন নয় যা দেখা যাওয়া সম্ভব। তারা বলেন, أَعْرَاض نِسْبِيَّة-এর অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু তা এতটুকু নয় যে, তা দেখা যেতে পারে; বরং তার অস্তিত্ব অনুভবে বা মস্তিষ্কে রয়েছে। উভয় মতানুসারে বাস্তব জগতে قِيَامٌ বা দাঁড়ানোর নিসবত বা সম্পর্ক অবশ্যই যায়েদের সাথে হয়েছে। (এতে কারো দ্বিমত নেই) এটাই নিসবতে খারিজী বা নিস্‌বতে খারিজীর অস্তিত্বের অর্থ এটাই (চাই সেটা দেখা সম্ভব হোক বা না হোক)। উল্লেখ্য যে, কারো কারো মতে أَعْرَاض نَسَبِيَّة-এর কোনো অস্তিত্ব মনোজগতেও নেই; বরং তা মনোগত বিষয়। এ মতানুসারে প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে যে, আপনারা যখন বললেন, এটি أُمُوْر إِعْتِبَارِيَّة, এর অস্তিত্ব বাহ্যিক জগতেও নেই এবং মনোজগতেও নেই, তাহলে এর সত্য বা মিথ্যা হওয়ার কি অর্থ? এর উত্তর হলো, এ মতে كِذْب বা মিথ্যার জন্য কোনো বিষয়ের প্রতি নির্ভর করতে হবে না; বরং বিষয়টি এমন হবে যে, মস্তিষ্ক তাকে পৃথক করবে এবং এতেই كِذْب বা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে। যেমন– كَرَمُ الْبَخِيْلِ কৃপণের দানশীলতা, অথবা بُخْلُ الْكَرِيْمِ দানশীল ব্যক্তির কৃপণতা। প্রথম উদাহরণে কৃপণ থেকে কৃপণতা এবং দ্বিতীয় উদাহরণে দানশীল থেকে দানশীলতাকে পৃথক করা হয়েছে। আর صَادِق বা সত্য বলা হবে যার মধ্যে কোনো বাস্তব বিষয়ের প্রতি নির্ভরশীলতা থাকবে। যেমন– যায়েদের পিতৃত্ব আমরের জন্য। [আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন।]

সার-সংক্ষেপ :

বাক্য প্রধানত দু'প্রকার : ১. সংবাদ বা বর্ণনাজ্ঞাপক বাক্য, ২. ইনশামূলক বাক্য। আট প্রকারের দলিলে হসর এই যে, যদি বাক্যের একটি نِسْبَة خَارِجِيَّة থাকে এবং نِسْبَة كَلَامِيَّة তার মোতাবেক হয়, তাহলে বাক্যটি বর্ণনামূলক। আর যদি বাক্যের نِسْبَة خَارِجِيَّة না থাকে, তাহলে তা ইনশামূলক বাক্য বা جُمْلَة إِنْشَائِيَّة; বর্ণনামূলক বাক্যে মুসনাদ, মুসনাদ ইলাইহ ও ইসনাদ থাকা আবশ্যক। মুসনাদ যদি শাব্দিক অথবা অর্থগতভাবে ফে'ল হয়, তাহলে তার مُتَعَلِّقَات হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি ইসনাদ مَقْصُوْر (সীমাবদ্ধ) হবে অথবা হবে না। প্রত্যেকটি বাক্য অন্যের সাথে মিলে আসবে (وَصْل) অথবা ভিন্ন-স্বতন্ত্ররূপে (فَصْل) আসবে।

বালাগাতসম্পন্ন বাক্য কখনো আসল অর্থ থেকে বেশি শব্দে বর্ণিত হবে, অথবা আসল অর্থ আদায় করা হবে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে, কিংবা মধ্যমপন্থায় বাক্যের আসল অর্থ বিবৃত হবে। প্রথম প্রকারকে إِطْنَاب দ্বিতীয় প্রকারকে إِيْجَاز আর তৃতীয় প্রকারকে مُسَاوَات বলা হয়।

وَالْخَبَرُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ مُسْنَدٍ إِلَيْهِ وَمُسْنَدٍ وَإِسْنَادٍ وَالْمُسْنَدُ قَدْ يَكُوْنُ لَهُ مُتَعَلِّقَاتٌ إِذَا كَانَ فِعْلًا أَوْ مَا فِيْ مَعْنَاهُ كَالْمَصْدَرِ وَاسْمَيِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيْصِ هٰذَا الْكَلَامِ بِالْخَبَرِ وَكُلٌّ مِنَ الْإِسْنَادِ وَالتَّعَلُّقِ إِمَّا بِقَصْرٍ أَوْ بِغَيْرِ قَصْرٍ وَكُلُّ جُمْلَةٍ قُرِنَتْ بِأُخْرَى إِمَّا مَعْطُوْفَةٌ عَلَيْهَا أَوْ غَيْرُ مَعْطُوْفَةٍ وَالْكَلَامُ الْبَلِيْغُ إِمَّا زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الْمُرَادِ لِفَائِدَةٍ إِحْتَرَزَ بِهِ عَنِ التَّطْوِيْلِ عَلَى أَنَّهُ لَاحَاجَةَ إِلَيْهِ بَعْدَ تَقْيِيْدِ الْكَلَامِ بِالْبَلِيْغِ أَوْ غَيْرُ زَائِدٍ هٰذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ لٰكِنْ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ لِأَنَّ جَمِيْعَ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْقَصْرِ وَالْفَصْلِ وَالْوَصْلِ وَالْإِيْجَازِ وَمُقَابِلَيْهِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَحْوَالِ الْجُمْلَةِ أَوِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَوِ الْمُسْنَدِ مِثْلُ التَّاكِيْدِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ فَالْوَاجِبُ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ بَيَانُ سَبَبِ أَفْرَادِ هَا وَجَعْلِهَا أَبْوَابًا بِرَأْسِهَا وَقَدْ لَخَّصْنَا ذٰلِكَ فِي الشَّرْحِ ـ

অনুবাদ : আর সংবাদমূলক বাক্যের জন্য অবশ্যই একটি মুসনাদ ইলাইহ (উদ্দেশ্য), একটি মুসনাদ (বিধেয়) এবং একটি ইসনাদ জরুরি। মুসনাদ যখন ফে'ল অথবা যা ফে'লের অর্থে যেমন, মাসদার, ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউল এ জাতীয় কিছু হয়, তখন তার জন্য مُتَعَلِّقَاتٌ (সম্পর্কিত আরো কিছু) হয়। এ কালামকে সংবাদমূলক বাক্যের সাথে খাস করার কোনো বিশেষ যুক্তি নেই; (বরং এটি সংবাদমূলক বাক্য এবং ইনশা উভয়ই হতে পারে) **ইসনাদ এবং তা'আল্লুক প্রত্যেকটি কসরের সাথে হবে অথবা কসর ছাড়া হবে। প্রত্যেকটি বাক্য আরেকটি বাক্যের সাথে মিলে আসবে, হয়তো অপরটির উপর আতৃফ হবে অথবা আতৃফ হবে না। আর বালাগাতপূর্ণ বাক্য হয়তো কোনো বিশেষ উপকারিতার জন্য আসল অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত হবে।** فَائِدَةٌ-এর (قَيْد) দ্বারা تَطْوِيْل থেকে বাক্যকে মুক্ত করা হয়েছে। তবে বাক্যকে বালাগাতপূর্ণ হতে হবে (এ শর্ত দ্বারা) সীমাবদ্ধ করার পর (فَائِدَةٌ) এই قَيْد টির প্রয়োজন পড়ে না। **অথবা** (বালাগাতপূর্ণ বাক্য) **অতিরিক্ত হবে না**। এসব তো প্রকাশ্য বিষয়। ভিন্নভাবে এর আলোচনাতে কোনো বিশেষ উপকারিতা নেই। কেননা, এসব কিছু যা তিনি উল্লেখ করলেন অর্থাৎ কসর, ফস্‌ল ও ওয়াস্‌ল, ঈজায এবং তার বিপরীতগুলো। এগুলো তো বাক্য অথবা মুসনাদ ইলাইহ বা মুসনাদেরই বিভিন্ন অবস্থা। এগুলো তাকীদ, তাকদীম ও তাখীর ইত্যাদির মতো (মুসনাদ ইলাইহ, মুসনাদ ও ইসনাদের বিভিন্ন অবস্থা, যা তিনি পৃথকভাবে বর্ণনা করেননি) এ স্থানে যা বর্ণনা করার দরকার (ছিল, তা হলো) এগুলোকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার এবং এগুলোর জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ অধ্যায় নির্ধারণ করার কারণ উল্লেখ করা। এ বিষয়টি আমি ব্যাখ্যাগ্রন্থ (মুতাওয়াল)-এ সংক্ষেপে তুলে ধরেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ لَابُدَّ لَهُ الخ মূল লেখক উল্লিখিত ইবারতে ইতঃপূর্বে دَلِيْل حَصْر তথা আট অধ্যায়ে ইলমুল মা'আনী সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছিলেন, তারই অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করে দলিলে হসরের সমাপ্তি টানেন।

তিনি বলেছিলেন, বাক্য থেকে প্রাপ্ত নিসবতে কালামিয়্যার জন্য হয়তো একটি নিসবতে খারিজী থাকবে এবং নিসবতে কালামিয়্যাহ নিসবতে খারিজীর মোতাবেক হবে অথবা হবে না। এমন হলে এ ধরনের বাক্যকে خَبَرٌ বা সংবাদমূলক বাক্য বলা হবে।

আর যদি নিসবতে কালামিয়্যাহর নিসবতে খারিজী না থাকে, তবে তাকে إِنْشَاءٌ বলা হবে। إِنْشَاءٌ-এর আলোচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে করা হয়েছে। আর যদি خَبَرٌ বা সংবাদ বর্ণনামূলক বাক্য হয় তাহলে তার তিনটি অংশ থাকবে– ১. ইসনাদ, ২. মুসনাদ ইলাইহ ও ৩. মুসনাদ।

ইসনাদের বিভিন্ন অবস্থা ও তার আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে, মুসনাদ ইলাইহের বিভিন্ন অবস্থার আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে এবং মুসনাদের বিভিন্ন অবস্থার আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে। এরপর মুসনাদ যদি ফে'ল অথবা ফে'লের অর্থবোধক কোনো ইসম হয় যথা মাসদার, ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউল ইত্যাদি– এগুলোর যে مُتَعَلِّقَاتٌ যথা– পাঁচ প্রকার মাফউল, হাল, তামঈয ইত্যাদি রয়েছে, সেগুলোর আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। ইসনাদ এবং তা'আল্লুক দু' ধরনের হতে পারে– قَصْر-এর সাথে অথবা قَصْر ছাড়া। যদি قَصْر-এর সাথে হয়, তাহলে এর আলোচনা খুঁজতে হবে পঞ্চম অধ্যায়ে। প্রত্যেকটি বাক্য তার লাগোয়া বাক্যের সাথে হয়তো عَطف-এর সাথে উল্লিখিত হবে অথবা عطف ছাড়া উল্লিখিত হবে। পরস্পর দু'টি বাক্যের عطف-এর সাথে উল্লেখ হওয়াকে وَصْل বলা হয়, আর পরস্পর দু'টি বাক্যের عطف ছাড়া পৃথকভাবে উল্লেখ হওয়াকে فَصْل বলা হয়। وَصْل এবং فَصْل-এর আলোচনা রয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। যে কোনো বালাগাতপূর্ণ বাক্য তিন ধরনের হতে পারে– ১. আসল উদ্দেশ্য এতে খুবই সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে, একে ايجاز বলা হয়, ২. আসল উদ্দেশ্য যথাযথ শব্দে বিবৃত হয়েছে, একে مُسَاوَاتٌ বলা হয় ও ৩. আসল উদ্দেশ্যের চেয়ে এতে অতিরিক্ত কথা আছে, একে اِطْنَابٌ বলা হয়। এ اِيْجَازٌ، مُسَاوَاتٌ ও اِطْنَابٌ-এর আলোচনা করা হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ে।

قَوْلُهُ وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيْصِ هٰذَا الْكَلَامِ بِالْخَبَرِ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের ইবারতের একটি শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে আপত্তি করছেন। তিনি বলেন, মুসনাদ, মুসনাদ ইলাইহ এবং ইসনাদ এ বিষয়ে যেমনিভাবে– جملة خَبَرِية-এর মধ্যে আছে, তেমনি এ তিনটি جملة انشائية-এর মধ্যেও আছে। তাই মূল লেখকের ইবারত كُلٌّ مِنَ الْخَبَرِ وَالْاِنْشَاءِ لَابُدَّ لَهُ مِنْ مُسْنَدٍ الخ হওয়া দরকার ছিল; অথচ তিনি তা না করে এ তিন প্রকারকে শুধুমাত্র جملة خبرية-এর সাথে খাস করলেন, এমনটি করা তার জন্য সমীচীন হয়নি। ব্যাখ্যাগ্রন্থ দুসুকীর লেখক মূল লেখকের ইবারত এমন হওয়ার একটি কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র جملة خبرية-এর আলোচনা করার কারণ খবর-এর মর্যাদা 'ইনশা'র তুলনায় বেশি, এর উপকারিতা অনেক, এতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও নতুনত্ব রয়েছে এবং বাক্যের মধ্যে এটিই আসল ইত্যাদি। সুতরাং বুঝা গেল, মর্যাদার বিবেচনা করে جملة خبرية-এর সাথে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলেও উদ্দেশ্য উভয়টি। এখানে আমাদের جملة خبرية-এর উপর انشائية-কে কিয়াস করে নিতে হবে।

قَوْلُهُ اِحْتَرَزَ بِهٖ عَنِ التَّطْوِيْلِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের ইবারত–

وَالْكَلَامُ الْبَلِيْغُ اِمَّا زَائِدٌ عَلٰى اَصْلِ الْمُرَادِ لِفَائِدَةٍ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ

উল্লিখিত فَائِدَةٌ এই قَيْد নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, فَائِدَةٌ-এর قَيْد দ্বারা তিনি كَلَامٌ بَلِيْغ-কে تَطْوِيْل থেকে বের করতে চাচ্ছেন। কারণ, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে تَطْوِيْل বলা হয় এমন বাক্যকে যার মধ্যে فَائِدَةٌ বা উপকারিতা থাকে না। এরপর فَائِدَةٌ-এর قَيْد দ্বারা حَشْو থেকে কালামকে মুক্ত করেছেন। কেননা, حَشْو-এর মধ্যেও কোনো উপকারিতা থাকে না। কিন্তু এর পরেই তিনি عَلٰى اَنَّهُ لَا حَاجَةَ اِلَيْهِ বলে মূল লেখকের ইবারতের উপর একটি আপত্তি তুলেছেন। তিনি বলেন, কালামে বালীগ বা বালাগাতপূর্ণ বাক্য বলার পর فَائِدَةٌ-এর قَيْد লাগানোর প্রয়োজন নেই; বরং فَائِدَةٌ-এর قَيْد টি বাহুল্য দোষে দুষ্ট। কেননা, বালাগাতপূর্ণ বলা হয় এমন বাক্যকে যা মুকতাযায়ে হাল অনুযায়ী হয়। আর মুকতাযায়ে হাল মোতাবেক বাক্য হলে তো এতে উপকারিতা অবশ্যই থাকবে। অতএব, কালামে বালীগের মধ্যে কোনো অতিরিক্ত কথাই অনুপকারী নয়। সুতরাং কালামে বালীগ বলার পর একে فَائِدَةٌ-এর قَيْد যুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ هٰذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এতক্ষণ যে দলিল বর্ণনা করা হলো তার বিশেষ কোনো উপকারিতা নেই। কেননা, যে বিষয়গুলো আটটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে আরো কমসংখ্যক অধ্যায়ে বর্ণনা করা যেত, কারণ, اِيْجَازٌ اِطْنَابٌ مُسَاوَاتٌ وَصْل وَفَصْل وَقَصْر এ সবগুলোই মুসনাদ অথবা মুসনাদ ইলাইহ অথবা জুমলা বা বাক্যের বিভিন্ন অবস্থা। অতএব, এগুলোকে মুসনাদ, মুসনাদ ইলাইহ এবং ইসনাদের অধ্যায়ে আলোচনা করা যেত। যেমন– تَاكِيْد, تَقْدِيْم ও تَاخِيْر ইত্যাদির বেলায় করা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলোর জন্য আলাদা অধ্যায় নির্ধারণ করা হয়নি। মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখক যদি আট অধ্যায় ও তার দলিল বর্ণনা না করে উল্লিখিত বিষয়গুলো পৃথক পৃথক অধ্যায়ে কেন বর্ণনা করেছেন, তার কারণ বর্ণনা করলে বরং বিষয়টি আরো আকর্ষণীয় হতো। তিনি বলেন, আমি মুতাওওয়ালে এ বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি।

সার-সংক্ষেপ : দলিলে হসরের পূর্ণ বিবরণ পূর্ববর্তী সার-সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ মূল লেখকের উপর আপত্তি করেন যে, قَصْر, وَصْل, فَصْل এবং اِيْجَازٌ. اِطْنَابٌ ইত্যাদি জুমলা, মুসনাদ ইলাইহ কিংবা মুসনাদের অবস্থার মধ্যে গণ্য হয়। অতএব, ভিন্ন ভিন্নভাবে এর আলোচনা না করলেও চলত। যেহেতু লেখক ভিন্ন ভিন্ন এগুলো আলোচনা করেছেন তাই এখানে লেখকের পৃথককরণের কারণ বর্ণনা করা উচিত ছিল।

تَنْبِيْهٌ عَلٰى تَفْسِيْرِ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ الَّذِىْ قَدْ سَبَقَ اِشَارَةٌ مَا اِلَيْهِ فِىْ قَوْلِهٖ تُطَابِقُهٗ اَوْ لَا تُطَابِقُهٗ اِخْتَلَفَ الْقَائِلُوْنَ بِاِنْحِصَارِ الْخَبَرِ فِى الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ فِىْ تَفْسِيْرِهِمَا فَقِيْلَ صِدْقُ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُهٗ اَىْ مُطَابَقَةُ حُكْمِهٖ لِلْوَاقِعِ وَهُوَ الْخَارِجُ الَّذِىْ يَكُوْنُ لِنِسْبَةِ الْكَلَامِ الْخَبَرِىْ وَكِذْبُهٗ اَىْ كِذْبُ الْخَبَرِ عَدَمُهَا اَىْ عَدَمُ مُطَابَقَتِهٖ لِلْوَاقِعِ يَعْنِىْ اَنَّ الشَّيْئَيْنِ الَّذَيْنِ اَوْقَعَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ فِى الْخَبَرِ لَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ فِى الْوَاقِعِ اَىْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا فِى الذِّهْنِ وَعَمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ فَمُطَابَقَةُ تِلْكَ النِّسْبَةِ الْمَفْهُوْمَةِ مِنَ الْكَلَامِ لِلنِّسْبَةِ الَّتِىْ فِى الْخَارِجِ بِاَنْ تَكُوْنَا ثُبُوْتِيَتَيْنِ اَوْ سَلْبِيَتَيْنِ صِدْقٌ وَعَدَمُهَا بِاَنْ تَكُوْنَ اِحْدٰهُمَا ثُبُوْتِيَةً وَالْاُخْرٰى سَلْبِيَةً كِذْبٌ ـ

অনুবাদ : জ্ঞাতব্য : صِدْق (সত্য) এবং كِذْب (মিথ্যা)-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে। লেখকের ইবারত تُطَابِقُهٗ اَوْ لَا تُطَابِقُهٗ-এর মধ্যে এর প্রতি কিছুটা ইঙ্গিত রয়েছে। যারা খবরকে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করেন তারা صِدْق (সত্য) كِذْب (মিথ্যা)-এর সংজ্ঞার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, صِدْقُ خَبَرْ **বলা** হয় খবরের হুকুম বাস্তবের মোতাবেক হওয়াকে। وَاقِعْ বলা হয় বর্ণনামূলক বাক্যের নিসবতের বাস্তব অবস্থাকে। আর كِذْبُ خَبَرْ বলা হয় (খবরের হুকুম) **বাস্তবের** মোতাবেক না হওয়াকে। অর্থাৎ যে দু'টি বস্তুর মাঝে খবরের ক্ষেত্রে একটি নিসবত করা হয় তার জন্য বাস্তবে একটি নিসবত থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ মনের মধ্যে যা আছে এবং বাক্য যে নিসবতের উপর নির্দেশনা করে তার প্রতি লক্ষ্য না করে। সুতরাং বাক্য বা কালাম থেকে অর্জিত নিসবতটি বাস্তবের নিসবতের মোতাবেক হওয়া অর্থাৎ উভয়টি হ্যাঁ-বাচক হওয়া অথবা না-বাচক হওয়া হলো সিদ্ক বা সত্য। আর মোতাবেক না হওয়া অর্থাৎ (কালামের বা বাস্তবের) দু'টি নিসবতের একটি নাবাচক হওয়া এবং অপরটি হ্যাঁ-বাচক হওয়াকে কিযব বা মিথ্যা বলা হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ تَنْبِيْهٌ عَلٰى تَفْسِيْرِ الخ : تَنْبِيْه শব্দের অর্থ– সতর্কতা, বিশেষ দ্রষ্টব্য, টীকা, জ্ঞাতব্য ইত্যাদি। পরিভাষায় تَنْبِيْه বলা হয় কোনো কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলার পর تَنْبِيْه-এর মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বলা। ইতঃপূর্বে মূল লেখক ইলমুল মা'আনী আটটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে خَبَرْ-এর আলোচনা করেছেন। সেখানে খবরের নিসবতে কালামী নিসবতে খারেজীর মোতাবেক হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে বলেছেন تُطَابِقُهٗ وَلَاتُطَابِقُهٗ সুতরাং উক্ত বাক্যের এ অংশের মধ্যে صِدْق এবং كِذْب-এর আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে চলে গেছে। সেই আলোচনাটি বিস্তারিতভাবে করার জন্য এখানে تَنْبِيْه শব্দটি আনা হয়েছে।

تَرْكِيْب : এখানে تَنْبِيْه শব্দটি মুবতাদার খবর হয়েছে। সুতরাং মূল ইবারত হবে এরূপ– هٰذَا تَنْبِيْهٌ عَلٰى تَفْسِيْرِ الخ

قَوْلُهٗ اِخْتَلَفَ الْقَائِلُوْنَ بِاِنْحِصَارِ الْخَبَرِ : মুসান্নিফ বলেন, خَبَرْ বা বর্ণনামূলক বাক্য সত্য ও মিথ্যা এ দু' প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিনা এ ব্যাপারে বালাগাত বিশারদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। জমহুর ওলামায়ে কেরাম এবং নিযাম মু'তাযেলীর মতে خَبَرْ সত্য ও মিথ্যা এ দু' প্রকারে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ একটি جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ বা বর্ণনামূলক বাক্য হয়তো সত্য হবে অথবা মিথ্যা হবে। এ দু'য়ের বাইরে আর কিছু হবে না।

আল্লামা জাহিযের মতে, খবর বা বর্ণনামূলক বাক্য এ দু' প্রকারেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ দু'য়ের বাইরে এমন সব বাক্যও রয়েছে, যা সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়। জমহুর ওলামা এবং নিযাম মু'তাযেলী صِدْق (সত্য) এবং كِذْبٌ (মিথ্যা)-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে আবার দু'টি মতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য যে, এখানে صِدْق এবং كِذْب দ্বারা صَادِقٌ এবং كَاذِبٌ উদ্দেশ্য। কারণ, خبر যে দু'প্রকারে বিভক্ত তা হচ্ছে صَادِقٌ এবং كَاذِبٌ, صِدْق এবং كِذْبٌ নয়।

قَوْلُهُ فَقِيْلَ صِدْقُ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُهُ : এখান থেকে জমহুরের বর্ণিত সংজ্ঞা শুরু হয়েছে। জমহুর বলেন- صِدْقُ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ অর্থাৎ সত্য খবর বলা হয়- খবরটি বাস্তবের সাথে মিলে যাওয়াকে। এখানে মুসান্নিফ مُطَابَقَتُهُ-এর ব্যাখ্যায় বলেন اَىْ مُطَابَقَةُ حُكْمِهِ অর্থাৎ খবরের حُكْم বাস্তবের অনুরূপ হওয়া। তার এরূপে ব্যাখ্যা করার কারণ হলো মূলত خَبَرٌ বলা হয় لَفْظ-কে, যা বাস্তবের অনুযায়ী বা বিপরীত হয়। বাস্তবের অনুযায়ী বা বিপরীত হয় নিসবতে কালামী বা وُقُوْعٌ ও لَاوُقُوْعٌ। এটাকেই মুসান্নিফ حُكْم বলেছেন। وَاقِعٌ-এর ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ বলেন, هُوَ الْخَارِجُ الَّذِىْ يَكُوْنُ لِنِسْبَةِ الْكَلَامِ الْخَبَرِىْ অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্যের নিসবতের বাস্তবতাকে وَاقِعٌ বলা হয়। كِذْبُ الْخَبَرِ-এর ব্যাপারে জমহুর বলেন, كِذْبُ الْخَبَرِ عَدَمُهَا اَىْ عَدَمُ مُطَابَقَتِهِ لِلْوَاقِعِ অর্থাৎ মিথ্যা খবর বলা হয়, খবরটি বাস্তবতার সাথে না মিলাকে। এ বিষয়টিকে বিশদভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) বলেন, সে দু'টি জিনিস অর্থাৎ মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ বা উদ্দেশ্য ও বিধেয় এদের মধ্যে বাস্তবে বা বাহ্যিক জগতে একটি নিসবত থাকবে, যা নিসবতে যাহ্নী এবং নিসবতে কালামী থেকে ভিন্ন হবে। সুতরাং এ বাস্তবের নিসবতকেই নিসবতে খারিজী বলা হয়। অতএব বর্ণনামূলক বাক্য থেকে যে নিসবত অর্জিত হয় তা বাস্তবের নিসবতের সাথে মিলে যাওয়াকে صِدْق বা সত্য বলা হয়। যেমন- কোনো বর্ণনামূলক বাক্যের অর্থ হ্যাঁ-বাচক এর বাস্তবের নিসবত বা সম্পর্কও হ্যাঁ-বাচক; অথবা এর উল্টো অর্থাৎ উভয় নিসবত না-বাচক তাহলে একে صِدْق বা সত্য বলা হবে। আর এর বিপরীত অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্যের নিসবত হ্যাঁ-বাচক আর বাস্তবের নিসবত নাবাচক অথবা এর বিপরীত (অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্যের নিসবত না-বাচক আর বাস্তবের নিসবত হ্যাঁ-বাচক) হলে তা كِذْب বা মিথ্যা।

সার-সংক্ষেপ :

বালাগাত বিশারদগণের মধ্যে প্রথমত جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ (বর্ণনামূলক বাক্য) সত্য ও মিথ্যা দু'প্রকারে সীমাবদ্ধ কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ।

জমহুর ও নিজাম মু'তাযেলীর মতে বর্ণনামূলক বাক্য সত্য ও মিথ্যা এ দু' প্রকারেই সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে আল্লামা জাহিযের মতে, বর্ণনামূলক বাক্য এ দু' প্রকারে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর আরেকটি প্রকার রয়েছে যা সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়।

وَقِيْلَ صِدْقُ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُهُ لِاعْتِقَادِ الْمُخْبِرِ وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ الْاِعْتِقَادُ خَطَأً غَيْرَ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ وَكِذْبُ الْخَبَرِ عَدَمُهَا اَىْ عَدَمُ مُطَابَقَتِهٖ لِاعْتِقَادِ الْمُخْبِرِ وَ لَوْ كَانَ خَطَأً فَقَوْلُ الْقَائِلِ اَلسَّمَاءُ تَحْتَنَا مُعْتَقِدًا ذٰلِكَ صِدْقٌ وَقَوْلُهُ اَلسَّمَاءُ فَوْقَنَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِذٰلِكَ كِذْبٌ وَالْمُرَادُ بِالْاِعْتِقَادِ الْحُكْمُ الذِّهْنِىُّ الْجَازِمُ اَوِ الرَّاجِحُ فَيَعُمُّ الْعِلْمَ وَالظَّنَّ وَهٰذَا يُشْكَلُ بِخَبَرِ الشَّاكِّ لِعَدَمِ الْاِعْتِقَادِ فِيْهِ فَيَلْزَمُ الْوَاسِطَةُ وَلَا يَتَحَقَّقُ الْاِنْحِصَارُ اَللّٰهُمَّ اِلَّا اَنْ يُقَالَ اِنَّهُ كَاذِبٌ لِاَنَّهُ اِذَا انْتَفَى الْاِعْتِقَادُ صَدَقَ عَدَمُ مُطَابَقَةِ الْاِعْتِقَادِ وَالْكَلَامُ فِىْ اَنَّ الْمَشْكُوْكَ خَبَرٌ اَوْ لَيْسَ بِخَبَرٍ مَذْكُوْرٌ فِى الشَّرْحِ فَلْيُطَالِعْ ثَمَّةَ ـ

অনুবাদ : **আর কেউ কেউ বলেন,** সত্য খবর হলো− **সংবাদটি সংবাদদাতার বিশ্বাস অনুযায়ী হওয়াকে। যদিও** (সংবাদদাতার) বিশ্বাস **ভুল বা বাস্তবতা বিবর্জিত হোক।** আর মিথ্যা খবর হলো সংবাদটি সংবাদদাতার অনুকূল বিশ্বাসের না হওয়াকে, যদিও তার বিশ্বাস ভুল হোক। সুতরাং কারো উক্তি اَلسَّمَاءُ تَحْتَنَا (আকাশ আমাদের নিচে) তার বিশ্বাস সহকারে সত্য সংবাদ। আবার তারই উক্তি اَلسَّمَاءُ فَوْقَنَا (আকাশ আমাদের উপর) অবিশ্বাসের সাথে হলে মিথ্যা সংবাদ। এখানে اِعْتِقَادْ শব্দের অর্থ হলো মনোগত বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস অথবা প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিশ্বাস। সুতরাং এতে عِلْم এবং ظَنْ উভয় বিষয়ই শামিল থাকবে। কিন্তু এ মতটিতে সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান ব্যক্তির সংবাদ দ্বারা আপত্তি সৃষ্টি হয় যে, তার সংবাদে কোনো বিশ্বাস না থাকার কারণে এর ফলে (সত্য ও মিথ্যার মাঝে) একটি স্তর প্রমাণিত হয় এবং খবরটি (সত্য ও মিথ্যার মাঝে) সীমাবদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয় না। হে আল্লাহ! (সঠিক পথ দেখাও) তবে একথা বলা যেতে পারে যে, তার সংবাদ মিথ্যা। কেননা, যখন বিশ্বাস অনুপস্থিত তখন তো বিশ্বাসের মোতাবেক না হওয়ার বিষয়টি (প্রকারান্তরে) প্রযোজ্য হলো। (আর বিশ্বাসের মোতাবেক না হওয়াকে যেহেতু মিথ্যা বলা হয়, সে হিসেবে এটা মিথ্যা) আর সন্দেহপূর্ণ বাক্য খবর নাকি খবর না এ আলোচনা ব্যাখ্যাগ্রন্থ তথা মুতাওয়ালে রয়েছে। সেখানে (বিষয়টি) দ্রষ্টব্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقِيْلَ صِدْقُ الْخَبَرِ الخ : এখান থেকে লেখক সত্য সংবাদ এবং মিথ্যা সংবাদ কাকে বলা হয় এবং এ ব্যাপারে আল্লামা নিযাম মু'তাযেলীর সংজ্ঞা কি? তার আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে আমরা জমহুর ওলামায়ে কেরামের সংজ্ঞা আলোচনা করেছি। নিযাম মু'তাযেলীর মতে− صِدْقُ الْخَبَرِ বলা হয়, সংবাদটি সংবাদদাতার বিশ্বাসের অনুকূলে হওয়া। যদিও সংবাদদাতার বিশ্বাস ভুল হয়ে থাকে এবং বাস্তবতার সাথে বিরোধপূর্ণ হয় যেমন, সংবাদদাতা বলল− اَلسَّمَاءُ تَحْتَنَا তথা আকাশ আমাদের নিচে। আর তার বিশ্বাসও এরূপ। তাহলে তার সংবাদটি সত্য হবে। কেননা, তার সংবাদ তার বিশ্বাসের সাথে মিলে গেছে, যদিও সংবাদটি বাস্তবতা বিবর্জিত।

كِذْبُ الْخَبَرِ বলা হয়− সংবাদটি সংবাদদাতার বিশ্বাসের অনুকূল না হওয়াকে, যদিও তার বিশ্বাস ভুল এবং বাস্তবতা বিবর্জিত হয়। যেমন, কেউ বলল− اَلسَّمَاءُ فَوْقَنَا (আকাশ আমাদের উপর) কিন্তু তার বিশ্বাস এর বিপরীত। তাহলে তার এ সংবাদটি মিথ্যা বলে গণ্য হবে। কেননা, তার খবর তার বিশ্বাসের বিরোধী।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْاِعْتِبَارِ الْحُكْمُ الذِّهْنِىُّ : এ ইবারতে মুসান্নিফ একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মূল প্রশ্নে যাওয়ার আগে ইলম, এ'তেকাদ ظَنْ বা ধারণা এর সংজ্ঞা জেনে নেওয়া দরকার।

عِلْم বলা হয়, দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত ঐ নিশ্চিত হুকুমকে যা সন্দেহকে গ্রহণ করে না। কারো সন্দেহ সৃষ্টি করার দ্বারা সেই عِلْم দূর হয়ে যায় না।

اِعْتِقَادْ বলা হয়, ঐ দলিলবিহীন নিশ্চিত বিশ্বাসকে, যাতে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে এবং কারো সন্দেহ সৃষ্টি করার দ্বারা সে বিশ্বাস নষ্টও হয়ে যায়।

ظَنْ বলা হয়, কোনো বিষয়ের প্রাধান্যপ্রাপ্ত দিককে। সুতরাং নিযাম মু'তাযেলীর সংজ্ঞায় বর্ণিত اِعْتِقَادْ-কে যদি তার প্রসিদ্ধ অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে اِعْتِقَادْ থেকে عِلْم এবং ظَنْ উভয়টা বের হয়ে যায়। আর عِلْم এবং ظَنْ বের হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে এ দু'টিকে صِدْق এবং كِذْب দ্বারা বিশেষিত করা যাবে না। এর ফলে صِدْق এবং كِذْب-এর মাঝে একটি মধ্যবর্তী স্তর প্রমাণ হয়ে যায়। অথচ নিযাম মু'তাযেলী صِدْق এবং كِذْب-এর মাঝে কোনো মধ্যবর্তী স্তরকে স্বীকার করেন না। এর সমাধান কি?

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْاِعْتِقَادِ الْحُكْمُ الذِّهْنِيُّ الْجَازِمُ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) উপরে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, اِعْتِقَادْ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো একটি মানসিক হুকুম বা বিষয়, চাই সে বিষয়টি নিশ্চিত হোক অথবা ধারণায় ভরপুর হোক। চাই সেটা সন্দেহকে গ্রহণ করুক বা না করুক। এ ব্যাখ্যার পর বিষয়টি ব্যাপক হয়ে গেল, যার ফলে এতে عِلْم এবং ظَنْ উভয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এখন যেহেতু এ দু'টি বিষয় اِعْتِقَادْ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, সেহেতু صِدْق এবং كِذْب-এর মাঝে কোনো মধ্যবর্তী স্তর রইল না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا يَشْكُلُ بِخَبَرِ الشَّاكِّ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মতটির উপর সন্দেহ পোষণকারী বা দ্বিধাগ্রস্ত (যে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি)-এর সংবাদ দ্বারা প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, সন্দেহ পোষণকারীর যেহেতু কোনো বিশ্বাস নেই, তাই তার সংবাদ বিশ্বাসের মোতাবেক হওয়া বা না হওয়ার দ্বারা সত্য বা মিথ্যার কিছুই হবে না। সুতরাং আবারো সত্য ও মিথ্যার মাঝে একটি স্তর সৃষ্টি হলো এবং খবর সত্য মিথ্যার মাঝে সীমাবদ্ধ রইল না।

قَوْلُهُ اَللّٰهُمَّ اِلَّا اَنْ يُّقَالَ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) সন্দেহ পোষণকারীর সংবাদ দ্বারা যে আপত্তি সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। اَللّٰهُمَّ বলে তিনি তার উত্তরটি শুরু করেন। প্রকাশ থাকে যে, জবাবের মধ্যে দুর্বলতা আছে, তাই যেন اَللّٰهُمَّ বলে আল্লাহ থেকে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে।

জবাবের সারকথা হলো− সন্দেহ-পোষণকারীর সংবাদ মিথ্যা সংবাদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সন্দেহের ক্ষেত্রে যখন বিশ্বাস অনুপস্থিত বা বিশ্বাস নেই, তখন এ কথা বলা যায় যে, সংবাদটি সংবাদদাতার বিশ্বাসের মোতাবেক হয়নি। অর্থাৎ তার তো বিশ্বাসই নেই যে, সংবাদ বিশ্বাসের মোতাবেক হবে। আর তার মতে সংবাদ যে কোনোভাবে বিশ্বাসের মোতাবেক না হওয়াকে خَبَر كَاذِبْ বা মিথ্যা সংবাদ বলা হয়। অতএব যখন সন্দেহ-পোষণকারীর সংবাদ মিথ্যা সংবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, এখন خَبَر সত্য এবং মিথ্যা এ দু প্রকারেই সীমাবদ্ধ রইল এবং সত্যও মিথ্যার মাঝে কোনো মধ্যবর্তী স্তর প্রমাণ হলো না।

قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ فِيْ اَنَّ الْمَشْكُوْكَ خَبَرٌ اَوْ لَيْسَ الخ : মুসান্নিফ বলেন, সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তির সংবাদ যাকে خبر مَشْكُوْكٌ (সন্দেহযুক্ত সংবাদ) বলা হয়, তা খবর বলে গণ্য হবে কিনা এ আলোচনা থেকে উপরোল্লিখিত প্রশ্নের উৎপত্তি। তাই আমাদের আগে জানতে হবে خَبَر مَشْكُوْك সংবাদ কিনা? এ ব্যাপারে সাধারণভাবে তিনটি মত পাওয়া যায়− ক. مَشْكُوْكٌ সংবাদ, খ. مَشْكُوْك সংবাদ নয়, গ. مَشْكُوْك এক হিসেবে সংবাদ অন্য হিসেবে সংবাদ নয়।

প্রথম মতানুসারে উল্লিখিত প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, যার আলোচনা ইতঃপূর্বে করা হয়েছে। দ্বিতীয় মতানুসারে যেহেতু مَشْكُوْك সংবাদই নয়, তাই এটি সত্য নাকি মিথ্যা, না অন্যকিছু তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় মতানুসারে যে হিসেবে مَشْكُوْك-কে সংবাদ বলা যায় সে মতে আমাদের বক্তব্য হলো مَشْكُوْك মিথ্যা সংবাদের অন্তর্ভুক্ত। আর যে মতে সংবাদ নয়, সে মতে সত্য বা মিথ্যা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

উপরে مَشْكُوْك বা সন্দেহযুক্ত সংবাদ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হলো, বিস্তারিত আলোচনা মুসান্নিফের সুদীর্ঘ ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুতাওয়ালে বিবৃত হয়েছে। ইলম পিপাসুদের সেটি দেখার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ : জমহুর এবং নিযাম মু'তাযেলীর মাঝে صِدْق ও كِذْب-এর সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। জমহুরের মতানুসারে صِدْق خَبَرْ বলা হয় বাক্যের نِسْبَتْ كَلَامِيَّةْ তার نِسْبَتْ خَارِجِيَّةْ-এর মোতাবেক হওয়া। আর বাক্যের نِسْبَتْ كَلَامِيَّةْ তার نِسْبَتْ خَارِجِيَّةْ-এর মোতাবেক না হওয়াকে كِذْب خَبَرْ বলা হয়।

নিযাম মু'তাযেলীর মতানুযায়ী صِدْق خَبَرْ বলা হয় বাক্যের نِسْبَتْ كَلَامِيَّةْ মুতাকাল্লিমের বিশ্বাস অনুযায়ী হওয়াকে, চাই যে বিশ্বাস ভ্রান্তই হোক না কেন। আর كِذْب خَبَرْ বলা হয় বাক্যের نِسْبَتْ كَلَامِيَّةْ মুতাকাল্লিমের বিশ্বাসের বিপরীত হওয়া, চাই সে বিশ্বাস অবাস্তব হোক না কেন?

بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالٰى اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ فَاِنَّهٗ تَعَالٰى جَعَلَهُمْ كَاذِبِيْنَ فِىْ قَوْلِهِمْ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ لِعَدَمِ مُطَابَقَتِهٖ لِاِعْتِقَادِهِمْ وَاِنْ كَانَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ ـ

অনুবাদ : (নিযাম মু'তাযেলীর) **বক্তব্যের দলিল** আল্লাহ তা'আলার বাণী (যার অর্থ) যখন মুনাফিকগণ আপনার কাছে আসে, তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ তো জানেনেই আপনি তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, **মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী**, (এখানে) আল্লাহ তা'আলা তাদের বক্তব্য "নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল"-এর ক্ষেত্রে তাদের মিথ্যাবাদীরূপে উপস্থাপন করেছেন, তাদের বক্তব্য তাদের বিশ্বাসের অনুকূল না হওয়ার কারণে। যদিও (তাদের বক্তব্য) বাস্তবের মোতাবেক ছিল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ بِدَلِيْلِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى الخ : صِدْق এবং كِذْب-এর সংজ্ঞাতে ভিন্নমত পোষণকারী নিযাম মু'তাযেলী তার বক্তব্যের সমর্থনে আল-কুরআনুল কারীম থেকে দলিল পেশ করেন সূরা মুনাফিকের আয়াত দ্বারা। আয়াতটি হলো–

اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ ـ

"তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে তাদের বক্তব্য اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ (আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল)-এর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। যদিও তাদের বক্তব্য বাস্তবতার নিরিখে সঠিক। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন, وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ (আপনি যে অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এ কথা আল্লাহ জানেন)" এখানে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, তবে কেন আল্লাহ তাদের মিথ্যাবাদী বললেন? এর উত্তর হলো, তারা মুহাম্মদ ﷺ -কে আল্লাহর রাসূল স্বীকার করতো না। এ কারণে তাদের বক্তব্য তাদের বিশ্বাসের মোতাবেক হয়নি। আর এ মোতাবেক না হওয়ার কারণেই তাদের বক্তব্য বা সংবাদ মিথ্যা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, সংবাদ সত্য বা মিথ্যা হওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদদাতার বিশ্বাসের মোতাবেক হওয়া বা না হওয়াই গ্রহণযোগ্য। এখানে বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বা না হওয়ার কোনো দখল নেই।

সারকথা হলো, উপরোক্ত আয়াত দ্বারা নিযাম মু'তাযেলীর মতামতই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো।

وَرُدَّ هٰذَا الْاِسْتِدْلَالُ بِاَنَّ الْمَعْنٰى لَكَاذِبُوْنَ فِى الشَّهَادَةِ وَفِىْ اِدِّعَائِهِمُ الْمُوَاطَاةَ فَالتَّكْذِيْبُ رَاجِعٌ اِلَى الشَّهَادَةِ بِاعْتِبَارِ تَضَمُّنِهَا خَبَرًا كَاذِبًا غَيْرَ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ وَهُوَ اَنَّ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ مِنْ صَمِيْمِ الْقَلْبِ وَخُلُوْصِ الْاِعْتِقَادِ بِشَهَادَةِ اِنَّ وَاللَّامِ وَالْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ اَوِ الْمَعْنٰى اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ فِىْ تَسْمِيَتِهَا اَىْ فِىْ تَسْمِيَةِ هٰذَا الْاَخْبَارِ شَهَادَةً لِاَنَّ الشَّهَادَةَ مَا تَكُوْنُ عَلٰى وُفْقِ الْاِعْتِقَادِ فَقَوْلُهٗ تَسْمِيَتُهَا مَصْدَرٌ مُضَافٌ اِلَى الْمَفْعُوْلِ الثَّانِىْ وَالْاَوَّلُ مَحْذُوْفٌ اَوِ الْمَعْنٰى اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ فِى الْمَشْهُوْدِ بِهٖ اَعْنِىْ قَوْلَهُمْ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ لٰكِنْ لَا فِى الْوَاقِعِ بَلْ فِىْ زَعْمِهِمُ الْفَاسِدِ وَاعْتِقَادِهِمُ الْبَاطِلِ لِاَنَّهُمْ يَعْتَقِدُوْنَ اَنَّهٗ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ فَيَكُوْنُ كَاذِبًا فِىْ اِعْتِقَادِهِمْ وَاِنْ كَانَ صَادِقًا فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ فَكَاَنَّهٗ قِيْلَ اِنَّهُمْ يَزْعَمُوْنَ اَنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ الصَّادِقِ وَحِ لَايَكُوْنُ الْكِذْبُ اِلَّا بِمَعْنٰى عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ لِلْوَاقِعِ فَلْيَتَأَمَّلْ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ اَنَّ هٰذَا اِعْتِرَافٌ بِكَوْنِ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ رَاجِعَيْنَ اِلَى الْاِعْتِقَادِ ـ

অনুবাদ : (তার) এ প্রমাণ **প্রত্যাখ্যানযোগ্য এভাবে যে, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তারা সাক্ষ্যদান এবং তাদের সততার দাবি** (আমাদের কথা আমাদের অন্তরের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ)-**এর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী,** সুতরাং মিথ্যার বিষয়টি শাহাদতের সাথেই সংশ্লিষ্ট। এ হিসেবে যে, এটি মিথ্যা এবং বাস্তবতার পরিপন্থি একটি সংবাদকে শামিল করেছে। (আর এখানে বাস্তবতার হচ্ছে) এই যে, এই সাক্ষ্য অন্তরের ভিতর এবং একান্ত বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয়েছে (বলে মনে হয়, কারণ এখানে) সাক্ষ্য হয়েছে اِنَّ ، لَامْ এবং জুমলাতুল ইসমিয়্যাহ দ্বারা, (যা বক্তব্যকে তাকিদ করে, আর তাকিদ তার বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করে) **অথবা** (আয়াতের) **অর্থ হচ্ছে তারা নামকরণের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী** অর্থাৎ এ খবরটি শাহাদত করে নামকরণের ক্ষেত্রে। কেননা, শাহাদত বা সাক্ষ্য বলা হয় এমন জিনিসকে, যা বিশ্বাসের অনুকূল হয়। তার বাক্যাংশ تَسْمِيَتِهَا (এর মধ্যে) মাসদার সম্বন্ধ হয়েছে দ্বিতীয় মাফউলের দিকে, প্রথম মাফঊলটি উহ্য আছে। অথবা আয়াতের অর্থ হচ্ছে তারা সাক্ষ্যদানের বিষয়বস্তুর অর্থাৎ তাদের বক্তব্য اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ-এর ক্ষেত্রেই মিথ্যাবাদী, তবে তা বাস্তবতার ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের ভ্রান্ত ধারণা বাতিল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। কেননা, তারা বিশ্বাস করে, এটি বাস্তবতা অনুযায়ী নয়। সুতরাং সংবাদটি তাদের বিশ্বাসে মিথ্যা, যদিও প্রকৃতপক্ষে সংবাদটি সত্য। সুতরাং যেন এ কথাই বলা হচ্ছে, তারা ধারণা করে তারা সত্য সংবাদটির বেলায় মিথ্যাবাদী। (এভাবে অর্থ করলে) তখন সংবাদ মিথ্যা হচ্ছে কেবল বাস্তবতার মোতাবেক না হওয়ার কারণেই। সুতরাং যেন (বিষয়টি পাঠক) চিন্তা করে। যেন এ ধারণা না করে বসে যে, সত্য-মিথ্যার সম্পর্ক বিশ্বাসের সাথেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَرُدَّ هٰذَا الْاِسْتِدْلَالُ الخ : উল্লিখিত ইবারতে নিযাম মু'তাযেলীর মতবাদ-এর স্বপক্ষে ইতঃপূর্বে যে প্রমাণ দেওয়া হয়েছিল তার জবাব দেওয়া হয়েছে। তার দলিলের জবাব প্রথমত দু' প্রকার ১. جَوَابْ اِنْكَارِىْ ২. جَوَابْ تَسْلِيْمِىْ

جَوَابْ اِنْكَارِىْ আবার দু' প্রকারে বিভক্ত, সুতরাং জবাব তিনটি।

উল্লেখ্য যে, جَوَابْ اِنْكَارِىْ বলা হয় প্রতিপক্ষের দলিলকে স্বীকার না করে যে জবাব দেওয়া হয়।

جَوَابْ تَسْلِيْمِىْ : প্রতিপক্ষের দলিলকে স্বীকার করে সে দলিলের যে জবাব দেওয়া হয়, তাকে جَوَابْ تَسْلِيْمِىْ বলা হয়। প্রথমত جَوَابْ اِنْكَارِىْ দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের مَشْهُوْد بِهٖ তথা তাদের উক্তি اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ-এর ব্যাপারে তাদের মিথ্যাবাদী বলেননি; বরং তাদেরকে شَهَادَةٌ-এর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলেছেন। অর্থাৎ তারা যে বলেছে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং আমাদের বক্তব্য আমাদের অন্তরের কথা, এ বিষয়ে তারা মিথ্যাবাদী। অথচ তাদের অন্তর তাদের বক্তব্যের সাথে একমত ছিল না। তারা তাদের বক্তব্যকে 'অন্তরের কথা' বলে বুঝানোর জন্য لَامْ تَاكِيْد ، اِنَّ، جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ দ্বারা তাদের বক্তব্যকে মজবুত করেছে। আর এসব তাকিদ দিক নির্দেশ করে যে, তাদের এ সাক্ষ্য একান্ত অন্তর থেকে এবং বিশুদ্ধ বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয়েছে; অথচ তাদের বিষয়টি এরূপ ছিল না। সুতরাং شَهَادَةٌ যা তাদের বাক্য نَشْهَدُ-এর মধ্যে রয়েছে, তা বাস্তবের সাথে মিলেনি। এ কারণে আল্লাহ তাদের شَهَادَةٌ-কে মিথ্যা বলেছেন তথা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে তাদের মিথ্যাবাদী বলেছেন। অতএব, আয়াতের মধ্যে তাদের খবর তথা مَشْهُوْد بِهٖ-এর কারণে তাদের মিথ্যাবাদী বলা হয়নি; বরং তাদের সাক্ষ্যের কারণে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে।

قَوْلُهٗ بِاعْتِبَارِ تَضَمُّنِهَا خَبَرًا كَاذِبًا غَيْرَ مُطَابِقٍ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো– شَهَادَةٌ তো اِنْشَاءٌ-এর মধ্যে গণ্য হবে, তাহলে শাহাদতকে কিভাবে (সত্য বা) মিথ্যার দ্বারা বিশেষিত করা হচ্ছে?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে শাহাদতকে তার সত্তাগতভাবে মিথ্যা বলা হচ্ছে না; বরং শাহাদত যে সংবাদকে তার মধ্যে ধারণ করেছে সে সংবাদ ধারণ করার কারণে শাহাদতকে মিথ্যা বলা হয়েছে। কারণ, সংবাদটি মিথ্যা, যা বাস্তবতার মোতাবেক হয়নি। এখন প্রশ্ন আসবে তবে সে সংবাদটি কি? যা বাস্তবতার মোতাবেক হয়নি। এর উত্তর হলো– মুনাফিকগণ তাদের مَشْهُوْد بِهٖ (যে বিষয়ে শাহাদত দান করা হয়েছে)-এর মধ্যে اِنَّ ، لَامْ এবং جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ ইত্যাদি (যা বক্তব্যকে জোরালো করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়)-কে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এগুলো প্রমাণ করে, বক্তা যা বলেছে তা তার অন্তর থেকে বলছে এবং তার বক্তব্য অন্তরের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং তারা যেন বলছে আমরা যা বলছি তা আমাদের মনের কথা এবং আমাদের এ সাক্ষ্য অন্তরের অন্তস্তল থেকে বের হয়েছে, আর এটিই আমাদের বিশ্বাস। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের এ দাবি এবং সংবাদ যে, এই শাহাদত অন্তর থেকে উৎসারিত তা মিথ্যা এবং বাস্তবতার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ বাস্তবতা হচ্ছে– এ সাক্ষ্য অন্তর থেকে বের হয়নি এবং তাদের কথার সাথে অন্তরের মিল নেই। সুতরাং তাদের দাবি এবং সংবাদের কারণে তাদের সাক্ষ্যকে মিথ্যা বলা হচ্ছে।

মোটকথা, আয়াতের দ্বারা জমহুর ওলামায়ে কেরামের মাযহাবই প্রমাণিত হলো। তা হচ্ছে وَاقِعْ বা বাস্তবের সাথে মিল না হলে كِذْبٌ আর وَاقِعْ বা বাস্তবের সাথে মিল হলে صِدْقٌ সুতরাং খবর বা সংবাদ সত্য ও মিথ্যা হওয়ার জন্য বাস্তবতার মিল-অমিলের বিষয়টিই গ্রহণযোগ্য, اِعْتِقَادْ-এর এতে কোনো দখল নেই।

দ্বিতীয় জবাব : (جَوَابْ اِنْكَارِىْ) আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকদেরকে مَشْهُوْد بِهٖ অর্থাৎ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ-এর ব্যাপারে তাদের মিথ্যাবাদী বলেননি; বরং তারা اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ (সংবাদ)-কে যে সাক্ষ্য বলে নামকরণ করেছে এবং বলেছে نَشْهَدُ اَنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ একে মিথ্যা বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, তারা এই সংবাদকে সাক্ষ্য বলে নামকরণের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী। কারণ, সাক্ষ্য বলা হয় যা সাক্ষ্যদাতার মন থেকে বের হয় এবং বিশ্বাসের সাথে মিলে যায়। কিন্তু তাদের এই সংবাদ তাদের বিশ্বাসের সাথে মিলেনি। সুতরাং তারা এ সংবাদটিকে সাক্ষ্য করে নামকরণের কারণে মিথ্যাবাদী। সুতরাং আয়াতের এ অর্থানুসারে নিযাম মু'তাযেলীর মাযহাব প্রমাণিত হলো না।

قَوْلُهٗ تَسْمِيَتِهَا مَصْدَرٌ مُضَافٌ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বাক্যের تَسْمِيَتِهَا শব্দের তারকীব বলছেন। তিনি বলেন تَسْمِيَةٌ শব্দটি মাসদার, এটি مُضَافٌ হয়েছে هَا-এর দিকে (যা شَهَادَةٌ-এর দিকে ফিরেছে) هَا হলো تَسْمِيَةٌ মাসদারের দ্বিতীয় মাফউল। এর প্রথম মাফউল উহ্য আছে। ১ম মাফউল হলো هٰذَا الْاِخْبَارَ পুরো উহ্য বাক্যটি এরূপ– تَسْمِيَةُ هٰذَا الْاِخْبَارِ شَهَادَةً

তৃতীয় জবাব : (جَوَابٌ تَسْلِيْمِيْ) মুসান্নিফ (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকগণকে যে মিথ্যাবাদী বলেছেন, তা مَشْهُوْدٌ بِهٖ তথা إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে তারা مَشْهُوْدٌ بِهٖ তথা إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ-এর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী। কিন্তু তাদের এ কারণে মিথ্যাবাদী বলা হচ্ছে না যে, তাদের সংবাদ বাস্তবতার মোতাবেক হয়নি। (এবং তাদের দাবি মতে এ কারণেও মিথ্যাবাদী বলা হয়নি যে, সংবাদটি তাদের বিশ্বাসের মোতাবেক হয়নি।) বরং এ কারণে মিথ্যাবাদী বলা হচ্ছে যে, তাদের সংবাদ তাদের ভ্রান্ত ধারণা এবং অসত্য বিশ্বাসের মাঝে যে وَاقِعْ বা বাস্তবতা আছে তার মোতাবেক হয়নি। কেননা, তাদের বিশ্বাস এরূপ ছিল যে, বাস্তবে মুহাম্মদ ﷺ নবী নন। অতএব, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এ কথা মিথ্যা হয়ে যাবে। যদিও বাস্তবে এ কথাটি অটুট সত্য। সুতরাং যেন আল্লাহ বলছেন, এরা ধারণা করে তারা এ খবরের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী। কেননা, তাদের বিশ্বাসে এ সংবাদ বাস্তবের মোতাবেক নয়; অথচ সংবাদটি বাস্তব সম্মত এবং বাস্তব অনুযায়ী সত্য; যদিও তাদের বিশ্বাসে এটি বাস্তব অনুযায়ী হয়নি।

মোটকথা, উক্ত আয়াতে মুনাফিকদের মিথ্যাবাদী বলার কারণ তাদের সংবাদ তাদের বিশ্বাসের বিপরীত হওয়ার জন্য নয়, যেমনটি নিযাম মু'তাযেলী মনে করে থাকেন; বরং তাদের ধারণা ও বিশ্বাসের বাস্তবতার মোতাবেক না হওয়ার কারণে সংবাদটি মিথ্যা বলা হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এভাবে বিষয়টি আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো পাঠকের যাতে এ কথা মনে না হয় যে, فِيْ زَعْمِهِمْ وَاعْتِقَادِهِمْ বলার দ্বারা নিযাম মু'তাযেলীর মতবাদকেই সমর্থন করা হচ্ছে; বরং তাদের ধারণা ও বিশ্বাসের মোতাবেক না হওয়ার অর্থ হলো তাদের ধারণার মধ্যে যে বিশ্বাস আছে তার মোতাবেক না হওয়া।

সার-সংক্ষেপ :

নিযাম মু'তাযেলীর পেশকৃত আয়াতের বা দলিলের তিনটি জবাব দেওয়া হয়–

১. আল্লাহ তাদেরকে শাহাদতের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলেছেন।

২. সংবাদ বা খবরকে শাহাদত করে নামকরণের কারণে মিথ্যাবাদী।

৩. مَشْهُوْدٌ بِهٖ-এর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী।

وَالْجَاحِظُ اَنْكَرَ اِنْحِصَارَ الْخَبَرِ فِى الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ وَاَثْبَتَ الْوَاسِطَةَ وَ زَعَمَ اَنَّ صِدْقَ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ مَعَ الْاِعْتِقَادِ بِاَنَّهُ مُطَابِقٌ وَ كِذْبُ الْخَبَرِ عَدَمُهَا اَىْ عَدَمُ مُطَابَقَتِهِ لِلْوَاقِعِ مَعَهُ اَىْ مَعَ اِعْتِقَادِ اَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ وَغَيْرُهُمَا اَىْ غَيْرُ هٰذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ وَهُوَ اَرْبَعَةٌ اَعْنِىْ الْمُطَابَقَةَ مَعَ اِعْتِقَادِ عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ اَوْ بِدُوْنِ الْاِعْتِقَادِ اَصْلًا وَعَدَمَ الْمُطَابَقَةِ مَعَ اِعْتِقَادِ الْمُطَابَقَةِ اَوْ بِدُوْنِ الْاِعْتِقَادِ اَصْلًا لَيْسَ بِصِدْقٍ وَلَاكِذْبٍ فَكُلٌّ مِنَ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ بِتَفْسِيْرِهِ اَخَصُّ مِنْهُ بِالتَّفْسِيْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ لِاَنَّهُ اِعْتَبَرَ فِى الصِّدْقِ مُطَابَقَةَ الْوَاقِعِ وَالْاِعْتِقَادِ جَمِيْعًا وَفِى الْكِذْبِ عَدَمُ مُطَابَقَتِهِمَا جَمِيْعًا بِنَاءً عَلٰى اَنَّ اِعْتِقَادَ الْمُطَابَقَةِ يَسْتَلْزِمُ مُطَابَقَةَ الْاِعْتِقَادِ ضَرُوْرَةَ تَوَافُقِ الْوَاقِعِ وَالْاِعْتِقَادِ حِيْنَئِذٍ وَكَذَا اِعْتِقَادُ عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ مُطَابَقَةِ الْاِعْتِقَادِ وَقَدْ اُقْتُصِرَ فِى التَّفْسِيْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ عَلٰى اَحَدِهِمَا ـ

অনুবাদ : **ইমাম জাহিয** খবর বা বর্ণনামূলক বাক্য সত্য মিথ্যা (এ দু' প্রকার)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন এবং একটি স্তর আবিষ্কার করেন। তিনি মনে করেন, صِدْق خَبَرْ বা সত্য সংবাদ বলা হয়- **সংবাদটি** বাস্তবের **মোতাবেক হওয়া এ বিশ্বাসের সাথে** যে, সংবাদটি বাস্তবের অনুযায়ী হয়েছে। **আর** كِذْب خَبَرْ বা মিথ্যা সংবাদ বলা হয়- **খবরটি বাস্তবের মোতাবেক না হওয়া এ বিশ্বাসের সাথে** যে, সংবাদটি বাস্তব অনুযায়ী হয়নি এবং এ দু'টি ব্যতীত অর্থাৎ এ দু' প্রকার ব্যতীত তার আরো চার প্রকার- ১. খবর বাস্তব অনুযায়ী না হওয়ার বিশ্বাসের সাথে (আসলেই) বাস্তবের মোতাবেক না হওয়া। ২. কোনো ধরনের বিশ্বাস ছাড়া বাস্তব অনুযায়ী হওয়া। ৩. বাস্তব অনুযায়ী হওয়ার বিশ্বাসের সাথে বাস্তব অনুযায়ী না হওয়া। ৪. কোনো ধরনের বিশ্বাস ছাড়া বাস্তব অনুযায়ী না হওয়া। (এ চার প্রকার) **সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়**। সুতরাং সত্য এবং মিথ্যা তার ব্যাখ্যা মতে পূর্বের দু'টি তাফসীরের চেয়ে সংকীর্ণ হয়ে গেল। কেননা, তিনি صِدْق-এর সংজ্ঞাতে বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক হওয়ার শর্ত করেছেন। আর كِذْب-এর সংজ্ঞায় উভয়ের মোতাবেক না হওয়ার শর্ত করেছেন, এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস বিশ্বাসের অনুযায়ী হওয়াকে আবশ্যক করে, বিশ্বাস এবং বাস্তবতার মাঝে ঐক্য থাকার কারণে, এমনিভাবে বাস্তবতার মোতাবেক না হওয়ার বিশ্বাস বিশ্বাসের মোতাবেক না হওয়াকে আবশ্যিক করে। বিগত ব্যাখ্যাগুলো একটি শর্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْجَاحِظُ اَنْكَرَ الخ : ইমাম জাহিয বর্ণনামূলক বাক্যে সত্য ও মিথ্যা এ দু' প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বর্ণনামূলক বাক্যের সত্য ও মিথ্যার মাঝে একটি স্তর রয়েছে যা সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়।

জাহিযের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : জাহিয তাঁর উপাধি, তার মূল নাম আমর ইবনে বাহর আল-ইস্পাহানী। তাঁর উপনাম আবু ওসমান। জাহিয শব্দের অর্থ- অক্ষিগোলক বা চোখের ভিতরের গোল অংশ। তার উপাধি জাহিয হওয়ার কারণ তার চোখের গোলক অনেকটা কোটরের বাইরে এসে গিয়েছিল। তিনি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের একজন পণ্ডিত এবং বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ছিলেন নিযাম মু'তাযিলীর একজন বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি ছিলেন সমকালীন যুগের সবচেয়ে বড় মু'তাযিলী আলেম। ইলমের প্রতিটি শাখায় তাঁর রচনা পাওয়া যায়। তিনি দেখতে কদাকার ও কুশ্রী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়-

لَوْ يُمْسَخُ الْخِنْزِيْرُ مَسْخًا ثَانِيًا * مَا كَانَ اِلَّا دُوْنَ مَسْخِ الْجَاحِظِ

অর্থাৎ যদি শূকরের পূর্ণবার বিকৃত ঘটানো হয় তবু সে জাহিযের চেয়ে কম কদাকার হবে।

ইন্তেকাল : ইমাম জাহিয ২৫৫ হিজরিতে কিতাবের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

জাহিয صِدْقُ الْخَبَرِ-এর সংজ্ঞা দেন এভাবে صِدْقُ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ مَعَ الْاِعْتِقَادِ بِاَنَّهُ مُطَابِقٌ অর্থাৎ সত্য খবর বলা হয় সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক হওয়া এবং সংবাদদাতার সংবাদ সম্পর্কে এ বিশ্বাস থাকা যে, সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক হয়েছে।

তিনি كِذْبُ الْخَبَرِ-এর সংজ্ঞা দেন এই বলে كِذْبُ الْخَبَرِ عَدَمُ مُطَابَقَتِهِ لِلْوَاقِعِ مَعَ الْاِعْتِقَادِ بِاَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ অর্থাৎ মিথ্যা খবর বলা হয় সংবাদটি বাস্তব অনুযায়ী না হওয়া এবং সংবাদদাতার সংবাদ সম্পর্কে এই বিশ্বাস থাকা যে, সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক হয়নি। তিনি বলেন, এ দু'প্রকার ছাড়া সংবাদের আরো চারটি অবস্থা এমন রয়েছে যা সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়। সেই চারটি অবস্থা হচ্ছে–

১. সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হয়েছে; কিন্তু সংবাদদাতার বিশ্বাসে তা বাস্তব অনুযায়ী হয়নি।

২. সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হয়েছে; কিন্তু সংবাদদাতার সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হওয়া বা না হওয়া কোনো ধরনের বিশ্বাস নেই।

৩. সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হয়নি; কিন্তু সংবাদদাতার বিশ্বাসে সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হয়েছে।

৪. সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হয়নি; কিন্তু সংবাদদাতার সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হওয়ায় বা বাস্তব অনুযায়ী না হওয়ার কোনো বিশ্বাস নেই।

জাহিয বলেন, এ চার অবস্থার সংবাদ সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। প্রথম দু' অবস্থায় সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হলেও সংবাদদাতার সেই বাস্তবতার মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস নেই। অথচ সংবাদ সত্য হওয়ার জন্য বাস্তবতার মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস থাকা অত্যাবশ্যকীয়। আবার মিথ্যাও নয় এ জন্য যে, তা বাস্তবতার মোতাবেক হয়েছে। অথচ সংবাদ মিথ্যা হওয়ার জন্য বাস্তবতার বিপরীত হওয়া প্রয়োজন। শেষ দু অবস্থার সংবাদ সত্য নয়, কারণ সংবাদ বাস্তবতার মোতাবেক হয়নি। অথচ সংবাদ সত্য হওয়ার জন্য বাস্তবতার মোতাবেক হওয়া জরুরি। আবার সংবাদ মিথ্যাও নয়, কারণ সংবাদ মিথ্যা হওয়ার জন্য বাস্তবতার মোতাবেক না হওয়ার বিশ্বাস থাকতে হয়, কিন্তু এখানে তা নেই।

মোটকথা, উপরোক্ত চারটি অবস্থায় সংবাদ সত্য ও মিথ্যার মাঝে দোদুল্যমান।

قَوْلُهُ فَكُلٌّ مِنَ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ بِتَفْسِيْرِهِ اَخَصُّ مِنْهُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আল্লামা জাহিযের বর্ণিত صِدْق ও كِذْب-এর সংজ্ঞাটি সংকীর্ণ। পূর্বে বর্ণিত (আল্লামা নিযাম মু'তাযেলী এবং জমহুরের) সংজ্ঞা দু'টির তুলনায়। কেননা, জাহিয তার صِدْق-এর সংজ্ঞায় বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের অনুযায়ী হওয়ার শর্তারোপ করেছেন, আর كِذْب-এর সংজ্ঞায় বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের অনুযায়ী না হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। অথচ পূর্বে বর্ণিত দুটি সংজ্ঞার মধ্যে বাস্তবতা (জমহুরের সংজ্ঞায়) অথবা বিশ্বাস (নিযামের সংজ্ঞায়) যে কোনো একটির শর্তারোপ করা হয়েছিল সংবাদ সত্য বা মিথ্যা হওয়ার জন্য। সুতরাং জাহিযের সংজ্ঞায় দুটি শর্ত থাকার কারণে সংজ্ঞাটি اَخَصّ বা সংকীর্ণ হলো।

قَوْلُهُ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ اِعْتِقَادَ الْمُطَابَقَةِ يَسْتَلْزِمُ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, আল্লামা জাহিয সংবাদ সত্য হওয়ার জন্য শর্ত করেছেন দুটি– ১. বাস্তবের মোতাবেক হওয়া, ২. বাস্তবতার মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস থাকা। এমনই বলেছেন তালখীসুল মিফতাহের লেখক; অথচ মুসান্নিফ এখানে জাহিযের দ্বিতীয় শর্তের ব্যাপারে বললেন যে, তিনি বিশ্বাসের মোতাবেক হওয়াকে শর্ত করেছেন। সুতরাং صِدْق-এর সংজ্ঞার ব্যাপারে মুসান্নিফ এবং মূল লেখকের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেল।

তদ্রূপ (মূল লেখকের বর্ণনানুসারে) كِذْب বলা হয় সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক হবে না এবং সংবাদদাতার বাস্তবের মোতাবেক না হওয়ার বিশ্বাসও থাকবে। কিন্তু মুসান্নিফ (র.) জাহিযের كِذْب-এর সংজ্ঞা দিলেন এভাবে যে, كِذْب বলা হয় সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক হবে না এবং বিশ্বাসের মোতাবেক হবে না।

মোটকথা হলো, জাহিযের সংজ্ঞা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তালখীসুল মিফাতাহের লেখক এবং মুসান্নিফের বর্ণনা ভিন্ন। মুসান্নিফের বর্ণনা ভিন্ন হওয়ার যে আপত্তি তার উপর হয়েছে মুসান্নিফ তার জবাব দিতে গিয়ে বলেন। اِعْتِقَادْ مُطَابَقَتْ (মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস) مُطَابَقَتْ اِعْتِقَادْ (বিশ্বাসের মোতাবেক হওয়া)-কে লাযেম করে। এর ব্যাখ্যা এরূপ যে, যখন কোনো সংবাদ বাস্তবতার অনুযায়ী হবে এবং সংবাদদাতা বাস্তবতার মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস করবে তথা اِعْتِقَادْ مُطَابَقَتْ (বাস্তবতার মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস) করবে, তখন বাস্তবতা এবং বিশ্বাস দু'টো পরস্পরের অনুযায়ী হয়ে যাবে বা অভিন্ন হয়ে যাবে। অর্থাৎ وَاقِعْ বা বাস্তবতা اِعْتِقَادْ বা বিশ্বাসের মোতাবেক হবে এবং اِعْتِقَادْ ও وَاقِعْ-এর মোতাবেক হয়ে যাবে। সুতরাং এ দুটো এক ও অভিন্ন হয়ে গেল। কোনো জিনিস যদি এ দু'টোর একটির মোতাবেক হয় তাহলে অপরটির মোতাবেক থাকবে। সুতরাং যে সংবাদ বাস্তব সম্মত হবে তা বিশ্বাস অনুযায়ীও হবে। সুতরাং صِدْق خَبَرْ বা সত্য সংবাদের মধ্যে সংবাদ বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক হবে। যখন বিষয়টি এমন, তখন তো এ কথা প্রমাণিত হলো যে, اِعْتِقَادْ مُطَابَقَتْ আবশ্যিক করে مُطَابَقَتْ اِعْتِقَادْ-কে। অতএব, মুসান্নিফ (র.)-এর জাহিযের (صِدْق خَبَرْ-এর) সংজ্ঞা বর্ণনাতে مُطَابَقَتْ اِعْتِقَادْ বলাটা সঠিক। কেননা, তার مُطَابَقَتْ اِعْتِقَادْ কথাটি তালখীসের লেখকের বর্ণিত জাহিযের সংজ্ঞার اِعْتِقَادْ مُطَابَقَتْ কথারই সমার্থক। এমনিভাবে তার বর্ণিত জাহিযের (كِذْب خَبَرْ-এর) সংজ্ঞার اِعْتِقَادْ عَدَمْ مُطَابَقَتْ কথাটিও সঠিক। কেননা, اِعْتِقَادْ عَدَمْ مُطَابَقَتْ সমার্থক হয় عَدَمْ مُطَابَقَتْ اِعْتِقَادْ-এর। সুতরাং মুসান্নিফ (র.) বর্ণিত জাহিযের সংজ্ঞা এবং তালখীসের লেখক বর্ণিত জাহিযের সংজ্ঞার মধ্যে মৌলিকভাবে কোনো পার্থক্য না থাকাটাই প্রমাণিত হলো।

بِدَلِيْلِ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ لِاَنَّ الْكُفَّارَ حَصَرُوْا اِخْبَارَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَشْرِ وَالنَّشْرِ عَلٰى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ فِى الْاِفْتِرَاءِ وَالْاِخْبَارِ حَالَ الْجِنَّةِ عَلٰى سَبِيْلِ مَنْعِ الْخُلُوِّ وَلَا شَكَّ اَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّانِىْ اَىِ الْاِخْبَارِ حَالَ الْجِنَّةِ لَا قَوْلُهٗ اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ عَلٰى مَا سَبَقَ اِلٰى بَعْضِ الْاَوْهَامِ غَيْرُ الْكِذْبِ لِاَنَّهٗ قَسِيْمُهٗ اَىْ لِاَنَّ الثَّانِىَ قَسِيْمُ الْكِذْبِ اِذِ الْمَعْنٰى اَكَذَبَ اَمْ اَخْبَرَ حَالَ الْجِنَّةِ وَقَسِيْمُ الشَّيْءِ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ غَيْرَهٗ وَغَيْرُ الصِّدْقِ لِاَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوْهُ اَىْ لِاَنَّ الْكُفَّارَ لَمْ يَعْتَقِدُوْا صِدْقَهٗ فَلَا يُرِيْدُوْنَ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ الصِّدْقَ الَّذِىْ هُوَ بَعِيْدٌ بِمَرَاحِلَ عَنْ اِعْتِقَادِهِمْ وَلَوْ قَالَ لِاَنَّهُمْ اِعْتَقَدُوْا عَدَمَ صِدْقِهٖ لَكَانَ اَظْهَرَ فَمُرَادُهُمْ بِكَوْنِهٖ خَبَرَ حَالَ الْجِنَّةِ غَيْرُ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ وَهُمْ عُقَلَاءُ مِنْ اَهْلِ اللِّسَانِ عَارِفُوْنَ بِاللُّغَةِ فَيَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْخَبَرِ مَا لَيْسَ بِصَادِقٍ وَلَا كَاذِبٍ حَتّٰى يَكُوْنَ هٰذَا مِنْهُ بِزَعْمِهِمْ وَعَلٰى هٰذَا لَا يَتَوَجَّهُ مَا قِيْلَ اِنَّهٗ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اِعْتِقَادِ الصِّدْقِ عَدَمُ الصِّدْقِ لِاَنَّهٗ لَمْ يَجْعَلْهُ دَلِيْلًا عَلٰى عَدَمِ الصِّدْقِ بَلْ عَلٰى عَدَمِ اِرَادَةِ الصِّدْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ ـ

অনুবাদ : (জাহিযের) **দলিল হলো** (কুরআনের আয়াত, যার অর্থ) **সে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছে নাকি তার মধ্যে উন্মাদনা আছে?** কেননা, কাফিররা রাসূল ﷺ-এর পুনরুত্থান এবং (কিয়ামতের ময়দানে) জমায়েত হওয়া সংক্রান্ত সংবাদ যার প্রতি আল্লাহ তা'আলার বাণী ইঙ্গিত করে "যখন তোমরা পরিপূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তবুও কি তোমরা নতুন করে সৃজিত হবে"। (উক্ত সংবাদ)-কে مَانِعَةُ الْخُلُوْ হিসেবে সীমাবদ্ধ করেছে মিথ্যারোপ করা এবং উন্মাদনা থাকা অবস্থায় সংবাদ দানের মধ্যে। নিঃসন্দেহে **দ্বিতীয় অবস্থা** অর্থাৎ উন্মাদ অবস্থায় সংবাদ দান **দ্বারা উদ্দেশ্য**– اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য নয়, যেমনটি ধারণা করে কতিপয় লোক **মিথ্যা ব্যতীত** (অন্য কিছু)। **কেননা, এটি মিথ্যার বিপরীত প্রকার**। অর্থাৎ কেননা, দ্বিতীয়টি (উন্মাদ অবস্থার সংবাদ) মিথ্যার বিপরীত প্রকার (তাহলে তো কিছুতেই মিথ্যা হতে পারে না) সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, সে মিথ্যা বলেছে, অথবা উন্মাদ অবস্থায় সংবাদ দিয়েছে। (এটা জানা কথা যে,) কোনো বিষয়ের বিপরীত প্রকার অবশ্যই সেই বিষয় থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। (দ্বিতীয়টি) **সত্যও নয়। কেননা, তারা এটি সত্য হওয়াকে বিশ্বাস করেনি**। অর্থাৎ তারা এ স্থানে সত্য সংবাদের ইচ্ছাই করেনি, যা তাদের বিশ্বাস থেকে বহুদূরে। তবে মূল লেখক যদি বলতেন "কেননা, তারা অসত্যের ইচ্ছা করেছিল" তাহলে বিষয়টি স্পষ্টতর হতো।

সুতরাং তাদের উদ্দেশ্য উন্মাদ অবস্থার সংবাদ সত্যও নয়, আবার মিথ্যাও নয়; অথচ তারা স্বজাতির ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তারা ভাষা সম্পর্কে ভালো জানতেন। সুতরাং বর্ণনামূলক বাক্যের একটি প্রকার এমন হলো, 'যা সত্য নয়; কিন্তু আবার মিথ্যাও নয়। ফলে এ (উন্মাদ অবস্থার) সংবাদটি তাদের ধারণা মতে এ (নতুন প্রকার) থেকেই। এ মতানুসারে যা বলা হয়েছে (তাতে) সে কথার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না যে, সত্য হওয়ার বিশ্বাস না থাকা তো সত্য না হওয়াকে লাযেম করে। কেননা, তিনি তার কথাটি (তারা এ স্থানে সত্য হওয়ার বিশ্বাস করে না) সত্য না হওয়ার দলিলরূপে পেশ করেননি; বরং সত্য হওয়ার ইচ্ছা না করার দলিলরূপে পেশ করেছেন। সুতরাং তুমি বিষয়টি ভালোভাবে চিন্তা করা উচিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ بِدَلِيْلِ اَفْتَرٰى الخ : উল্লিখিত ইবারতে আল্লামা জাহিযের বক্তব্যের স্বপক্ষে দলিল পেশ করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত দ্বারা সম্পূর্ণ আয়াতটি হলো–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ .

অর্থাৎ কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে তোমাদেরকে বলে, তোমরা পরিপূর্ণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও তোমরা নতুনভাবে সৃজিত হবে। সে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছে; নয়তো সে একজন উন্মাদ।

এ আয়াত দ্বারা জাহিয صِدْق এবং كِذْب-এর মাঝে একটি স্তর প্রমাণ করেন, যা সত্যও নয়, আবার মিথ্যাও নয়। আর যখন আয়াত দ্বারা উক্ত স্তরটি প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন সত্য ও মিথ্যার মাঝে একটি মধ্যবর্তী স্তর প্রমাণিত হবে।

তিনি এভাবে (তার বক্তব্যের) দলিল পেশ করেন যে, রাসূল ﷺ কিয়ামত, পরকাল ও পুনরুত্থান সম্পর্কে যে খবর দিয়েছেন মক্কার কাফিররা তাকে مَانِعَةُ الْخُلُوْ-এর ভিত্তিতে দু' প্রকারে সীমাবদ্ধ করেছেন– ১. রাসূল (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যা বলেছেন, ২. রাসূল উন্মাদ অবস্থায় খবর দিয়েছেন।

مَانِعَةُ الْخُلُوْ-এর অর্থ হচ্ছে, উক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বিষয় অবশ্যই হয়েছে। অর্থাৎ হয় মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করেছেন; নয়তো রাসূল ﷺ উন্মাদ অবস্থায় উক্ত সংবাদটি দিয়েছেন। এ দু'টোর কোনোটাই হবে না এমন নয়। অর্থাৎ এ দু'টোর বাইরে কিছু হবে না।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো, দলিল প্রমাণের জন্য শুধুমাত্র مَانِعَةُ الْخُلُوْ বলা হলে লেখকের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না; বরং সত্য ও মিথ্যার মাঝে একটি স্তর প্রমাণের জন্য এ দু'টিকে مَانِعَةُ الْجَمْعِ ও বলতে হবে

مَانِعَةُ الْجَمْعِ বলা হয় এ দু'টি বিষয় একসাথে একত্রিত হতে পারবে না। কেননা, যদি এ দু'টিকে শুধুমাত্র مَانِعَةُ الْخُلُوْ বলা হয় (এবং مَانِعَةُ الْجَمْعِ না বলা হয়) তাহলে যদিও মিথ্যা ও উন্মাদ অবস্থার সংবাদ এ দু'টির কোনো একটির থেকে খালি হওয়া অসম্ভব, কিন্তু তখন এ দু'টি একত্রিত হওয়া অসম্ভব হবে না। তখন আয়াতের মিথ্যা এবং উন্মাদ অবস্থার সংবাদ একসাথে একত্রিত হতে পারবে। আর দু'টি একসাথে একত্রিত হলে উন্মাদ অবস্থার সংবাদ মিথ্যা বলেই গণ্য হবে। আর উন্মাদ অবস্থার সংবাদ মিথ্যার মধ্যে গণ্য হলে সত্য ও মিথ্যার মাঝে একটি স্তর প্রমাণিত হলো না; অথচ মুসান্নিফের ইচ্ছা হলো মধ্যবর্তী স্তর প্রমাণ করা– যা সত্যও নয় এবং মিথ্যাও নয়।

তাই আয়াতের দু'টি বিষয় তথা اَفْتَرٰى এবং اِخْبَارُ حَالِ الْجِنَّةِ-এর মধ্যে مَانِعَةُ الْخُلُوْ এবং مَانِعَةُ الْجَمْعِ উভয়টি ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ দু'টি বিষয় এক সাথে একত্রিত হতে যেমন পারবে না তেমনি দু'টি বিষয় একত্রে উঠেও যেতে পারবে না।

অতএব, মুসান্নিফ (র.) যদিও বাক্যের মধ্যে একটিকে (مَانِعَةُ الْخُلُوْ) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য (مَانِعَةُ الْخُلُوْ ও مَانِعَةُ الْجَمْعِ) উভয়টি। সুতরাং কাফিরগণ রাসূল ﷺ-এর পরকাল সংক্রান্ত সংবাদকে مَانِعَةُ الْخُلُوْ এবং مَانِعَةُ الْجَمْعِ-এর ভিত্তিতে দু'টি অবস্থা তথা মিথ্যা এবং উন্মাদ অবস্থার সংবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। সুতরাং রাসূলের সংবাদ হয়তো মিথ্যা হবে, নয়তো উন্মাদ অবস্থার সংবাদ হবে।

قَوْلُهُ وَلَا شَكَّ اَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّانِيْ : মুসান্নিফ বলেন, দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ উন্মাদ অবস্থার সংবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য মিথ্যা নয়। এর কারণ তিনি একটু পরেই বর্ণনা করবেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ اِخْبَارُ حَالَ الْجِنَّةِ (উন্মাদ অবস্থার সংবাদ) দ্বিতীয়টি অর্থাৎ اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ নয়। মোটকথা, তিনি দ্বিতীয়টি বলে اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ-এর مَفْهُوْم বা ভাবার্থে اِخْبَارُ حَالَ الْجِنَّةِ উদ্দেশ্য করেছেন। তিনি আয়াতের اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ শব্দটিকে উদ্দেশ্য করেননি, যা কতিপয় লোক মনে করেন। এর কারণ হলো, اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ শব্দটিতে اَمْ হলো اِسْتِفْهَام আর اِسْتِفْهَام বা প্রশ্নবোধক বাক্য হলো اِنْشَاءٌ-এর প্রকার। আমরা জানি, اِنْشَاءٌ সত্য মিথ্যা দ্বারা বিশেষিত হতে পারে না। সুতরাং যদি দ্বিতীয়টি অর্থাৎ اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ শব্দটি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বাক্যের অর্থ হবে اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ غَيْرُ كِذْبٍ (اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ মিথ্যা নয়) তাহলে তো اِسْتِفْهَام-কে সত্য বা মিথ্যা দ্বারা বিশেষিত করাই হলো। অথচ আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি استفهام-কে সত্য বা মিথ্যার দ্বারা বিশেষিত করা যাবে না। সুতরাং ثَانِيْ দ্বারা উদ্দেশ্য اِخْبَارُ حَالَ الْجِنَّةِ অর্থাৎ উন্মাদ অবস্থার সংবাদ।

মুসান্নিফ বলেন, দ্বিতীয়টি মিথ্যা নয়। এর দলিল হলো, দ্বিতীয়টিকে মিথ্যার قَسِيْم বানানো হয়েছে। কেননা, আয়াতের ভাবার্থ হলো اَكَذَبَ اَمْ اَخْبَرَ حَالَ الْجِنَّةِ সে মিথ্যা বলেছে অথবা উন্মাদ অবস্থায় সংবাদ দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কোনো জিনিসের অধীন বিভিন্ন প্রকারকে قِسْم বা প্রকার বলা হয়। আর প্রত্যেক প্রকারের সাথে অপর প্রকারের সম্পর্ককে قَسِيْم বলা হয়। যেমন– এখানে خَبَرٌ বা সংবাদ-এর অধীন প্রকার তিনটি– মিথ্যা খবর; সত্য খবর এবং উন্মাদ অবস্থার খবর। এ তিন প্রকার পরস্পর বিপরীত হবে বা قَسِيْم হবে।

মিথ্যা খবর বিপরীত হবে সত্য খবর এবং উন্মাদ অবস্থার খবরের। সুতরাং যেহেতু মিথ্যার قَسِيْم উন্মাদ অবস্থার খবর, অতএব, উন্মাদ অবস্থার খবর মিথ্যা নয়; কিন্তু উন্মাদ অবস্থার খবর সত্যও নয়। কেননা, কাফিররা শত্রুতাবশত রাসূল ﷺ -কে সত্যবাদী মনে করত না, যার ফলে তার খবরকেও সত্য মনে করত না। তাই এখানে (পুনরুত্থান সংক্রান্ত সংবাদ, যা মূলত তাদের অস্বীকারের বিষয়) তারা রাসূলের সংবাদকে সত্য মনে করবে না। সুতরাং তাদের ধারণা মতে اِخْبَارُ حَالِ الْجِنَّةِ সত্য নয় এবং মিথ্যাও নয়। তাহলে তো এটি সত্য ও মিথ্যার মাঝের একটি স্তর হলো। তাই আল্লামা জাহিয বলেন, সংবাদমূলক বাক্য সত্য ও মিথ্যা দু' প্রকারে সীমাবদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لِاَنَّهُمْ اِعْتَقَدُوْا عَدَمَ صِدْقِهِ لَكَانَ الخ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের ইবারতের একটি সংশোধনী দিচ্ছেন। মূল লেখক উন্মাদ অবস্থার সংবাদ সত্য নয়-এর দলিল পেশ করেন এই বলে যে, لِاَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوْهُ (অর্থাৎ কেননা তারা সত্য হওয়ার বিশ্বাস করে না) কিন্তু মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখক যদি এভাবে বলতেন যে, لِاَنَّهُمْ اِعْتَقَدُوْا عَدَمَ صِدْقِهِ كَانَ اَظْهَرُ (অর্থাৎ কেননা তারা সত্য না হওয়ার বিশ্বাস করে) তাহলে বিষয়টির মর্ম বুঝতে আরো উৎকৃষ্ট হতো। এর কারণ এই যে, মূল লেখকের বক্তব্য অনুসারে অর্থাৎ তারা সত্য হওয়ার বিশ্বাস করে না এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তারা এ সংবাদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ -কে সত্যবাদী জানে বটে; কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করে না। এ ব্যাখ্যানুসারে সংবাদটি তো সত্যই হয়ে গেল। যদিও তাদের বিশ্বাস এরূপ নয়। আর যেহেতু এ সংবাদ সত্য হয়ে গেল, সুতরাং সত্য এবং মিথ্যার মাঝে কোনো মধ্যবর্তী স্তর রইল না। কাজেই উপরোক্ত আয়াত জাহিযের পক্ষে দলিল বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি বলা হয় اِعْتَقَدُوْا عَدَمَ صِدْقِهِ তারা সত্য না হওয়ার বিশ্বাস করে, তবে পূর্বোক্ত অর্থের সম্ভাবনা আর থাকে না। অর্থাৎ কাফিররা সত্য না হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করে, আবার এ বিষয়ে তাকে সত্যবাদী মনে করে এটা অসম্ভব।

যখন বিষয়টি এরূপ হবে তখন এ সংবাদ নিঃসন্দেহে সত্য হবে না। আর সত্য না হওয়ার অর্থ হলো উন্মাদ অবস্থার সংবাদ সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়। অতএব, সত্য ও মিথ্যার মাঝামাঝি একটি স্তর প্রমাণিত হলো।

قَوْلُهُ وَهُمْ عُقَلَاءُ مِنْ اَهْلِ اللِّسَانِ : এ বাক্যটি দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, আমরা মেনে নিলাম উক্ত আয়াত দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মাঝামাঝি এক ধরনের খবর প্রমাণিত হলো। কিন্তু যাদের বক্তব্য দ্বারা হলো তারা তো কাফির, আর কাফিরদের কথা যেহেতু অগ্রহণযোগ্য তাই তাদের কথার দ্বারা প্রমাণিত সংবাদ অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যবর্তী সংবাদও অগ্রহণযোগ্য। এর উত্তর হলো, ভাষা ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রে ভাষাভাষী এবং সাহিত্যিকদের কথা গ্রহণযোগ্য। এখানে সে কোন ধর্মের অনুসারী সে বিষয়টি গৌণ। সুতরাং কুরাইশ কাফিরগণও যেহেতু আরবি ভাষাভাষী এবং সে ভাষার সাহিত্য রসিকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন, তাই সংবাদমূলক বাক্য সত্য ও মিথ্যা হওয়ার পাশাপাশি সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়, এমন একটি প্রকার হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব, তাদের উক্তি মোতাবেক রাসূল ﷺ এর উন্মাদ অবস্থার সংবাদ দ্বারা যেহেতু কাফিরদের উদ্দেশ্য সত্যও নয় এবং মিথ্যাও নয়, তখন এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, কতক সংবাদ এমন রয়েছে যা সত্যও নয় এবং মিথ্যাও নয়। আর এ উন্মাদ অবস্থার সংবাদ তাদের ধারণা মতে সে প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا لَايَتَوَجَّهُ مَا قِيْلَ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলছেন যে, আমাদের ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লামা খালখালীর পক্ষ থেকে যে আপত্তিটি তোলা হয়েছিল তার নিরসন হয়ে গেছে।

আল্লামা খালখালী বলেন, মূল লেখকের বাক্য وَغَيْرُ الصِّدْقِ لِاَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوْهُ দ্বারা উন্মাদ অবস্থার খবর সত্য না হওয়ার যে দলিল দিয়েছেন তা সঠিক নয়, কেননা, সত্য না হওয়ার বিশ্বাস দ্বারা বিষয়টি সত্য নয় এটা কিন্তু প্রমাণ হয় না, অথচ মূল লেখক তাই বললেন যে, সত্য নয়। কারণ, তারা সত্য না হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করে।

তার এ আপত্তির জবাব হচ্ছে, মূল লেখক তার বাক্য لِاَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوْهُ-কে 'সত্য নয়' এ কথার দলিলরূপে পেশ করেননি; বরং তিনি তার এ বাক্য 'সত্যটিকে হওয়ার ইচ্ছা করেনি' এ কথার দলিল বানিয়েছেন। সে কথার প্রতি মুসান্নিফ ইঙ্গিত প্রদান করেছেন– তার ইবারতের মধ্যে فَلَا يُرِيْدُوْنَ এবং فَمُرَادُهُمْ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে।

পুরো বাক্যটির অর্থ এরূপ হবে যে, কাফিররা উন্মাদ অবস্থার সংবাদ দ্বারা রাসূল ﷺ -এর সংবাদ সত্য হওয়ার ইচ্ছা করেনি, এর দলিল হলো তারা রাসূল-এর সত্যতাকে বিশ্বাস করে না। সুতরাং যখন তারা রাসূল ﷺ -কে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেই না তখন তারা রাসূলের সংবাদকে কি করে সত্য মনে করবে!

মোটকথা, মুসান্নিফ (র.)-এর বাক্য لِاَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوْهُ সত্য না হওয়ার দলিল নয়; বরং 'তারা সত্যের ইচ্ছা করেনি' এর দলিল। সুতরাং এরপর আল্লামা খালখালীর আপত্তি এ ব্যাপারে আসতে পারে না।

সার-সংক্ষেপ :

আল্লামা জাহিযের বক্তব্যের দলিল– اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ এ আয়াতে اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ অংশটুকু সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এটি সত্যও নয়, আবার মিথ্যাও নয়। অতএব, সত্য ও মিথ্যার মাঝে একটি মধ্যবর্তী স্তর প্রমাণিত হলো।

وَرُدَّ هٰذَا الْاِسْتِدْلَالُ بِاَنَّ الْمَعْنٰى اَىْ مَعْنٰى اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ اَمْ لَمْ يَفْتَرِ فَعُبِّرَ عَنْهُ اَىْ عَنْ عَدَمِ الْاِفْتِرَاءِ بِالْجِنَّةِ لِاَنَّ الْمَجْنُوْنَ لَا اِفْتِرَاءَ لَهٗ لِاَنَّهُ الْكِذْبُ عَنْ عَمْدٍ وَلَا عَمَدَ لِلْمَجْنُوْنِ فَالثَّانِىْ لَيْسَ قَسِيْمًا لِلْكِذْبِ مُطْلَقًا بَلْ لِمَا هُوَ اَخَصُّ مِنْهُ اَعْنِى الْاِفْتِرَاءَ فَيَكُوْنُ هٰذَا حَصْرًا لِلْخَبَرِ الْكَاذِبِ بِزَعْمِهِمْ فِىْ نَوْعَيْهِ اَعْنِى الْكِذْبَ عَنْ عَمْدٍ وَالْكِذْبَ لَا عَنْ عَمْدٍ ـ

অনুবাদ : এ দলিলের প্রক্রিয়াটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এ বলে যে, اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ-এর অর্থ হচ্ছে اَمْ لَمْ يَفْتَرِ (অথবা তিনি মিথ্যা আরোপ করেননি) সুতরাং এখানে اِفْتِرَاءٌ (মিথ্যা আরোপ) না করাকে جِنَّةٌ বা উন্মাদনা বলে ব্যক্ত করা হলো। কেননা, উন্মাদের ইফতিরা নেই। কারণ, ইফতিরা বলা হয় ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করাকে। উন্মাদের তো কোনো ইচ্ছাই নেই।

সুতরাং (আয়াতের) দ্বিতীয় অংশটি সাধারণ মিথ্যার বিপরীত প্রকার নয়; বরং তার চেয়ে সংকীর্ণ অর্থবিশিষ্ট অর্থাৎ ইফতিরা-এর বিপরীত প্রকার। অতএব, এ আয়াত তাদের ধারণা মতে মিথ্যা সংবাদকে দু'প্রকারে সীমাবদ্ধ করেছে, অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত মিথ্যা এবং অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَرُدَّ هٰذَا الْاِسْتِدْلَالُ الخ : উপরোক্ত ইবারতে আল্লামা জাহিযের বর্ণিত দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লামা জাহিযের দলিলের সারকথা ছিল এই যে, কুরআনের আয়াত اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ আয়াতের প্রথমাংশে রাসূল ﷺ -এর সংবাদকে মিথ্যা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে উন্মাদ অবস্থার সংবাদ বলা হয়েছে। উন্মাদ অবস্থার সংবাদ মিথ্যা নয়। (কারণ, এটি মিথ্যার বিপরীত) আবার সত্যও নয়। কিন্তু আমরা বলি, আয়াতের দ্বিতীয়াংশের উন্মাদ অবস্থার সংবাদ মিথ্যার বিপরীত বিষয় এ বক্তব্য আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে আয়াতের দ্বিতীয়াংশ মিথ্যা নয়। এ কথাও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা বলি, আয়াতের দ্বিতীয়াংশও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়াংশটি সাধারণ মিথ্যার বিপরীত প্রকার নয়; বরং ইচ্ছাকৃত মিথ্যার বিপরীত প্রকার, এ মতে اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, তিনি আল্লাহর উপর ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেছেন অথবা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেননি। عَدَمُ اِفْتِرَاءٍ বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বলাকেই مَجَازٌ مُرْسَلٌ হিসেবে جِنَّةٌ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, উন্মাদ অবস্থার সংবাদের জন্য عَدَمُ اِفْتِرَاءٍ (ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ না করা) লাযেম এবং উন্মাদ অবস্থার সংবাদ হলো মালযূম। এখানে مَلْزُوْمٌ বলা হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা لازم উদ্দেশ্য।

মোটকথা আয়াতের মধ্যে اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ اَىْ اِخْبَارُ حَالِ الْجِنَّةِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عَدَمُ اِفْتِرَاءٍ কারণ مَجْنُوْنٌ বা উন্মাদের পক্ষে اِفْتِرَاءٌ বা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করা সম্ভব নয়। এর কারণ হলো, اِفْتِرَاءٌ বলা হয় كِذْبٌ عَمَدٌ বা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করাকে। আর আমরা জানি, উন্মাদ বা পাগলের কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই নেই। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, কাফিরগণ মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারে বলছে যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর উপর اِفْتِرَاءٌ তথা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করেছেন। অথবা উন্মাদ অবস্থায় সংবাদ দিয়েছেন তথা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করেছেন।

এ হিসেবে কাফেরগণ মুহাম্মদ ﷺ -এর সংবাদকে দু'প্রকারে বিভক্ত করেছে– ১. ইচ্ছাকৃত মিথ্যা, ২. অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা। তারা রাসূল ﷺ -এর সংবাদকে মিথ্যা এবং মিথ্যা নয় এ দু'প্রকারে মোটেও বিভক্ত করেনি। সুতরাং اِخْبَارُ حَالِ الْجِنَّةِ-কে غَيْرُ كِذْبٍ বা মিথ্যা নয়, এ কথা বলা যাবে না; বরং এটি এক প্রকারের অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা। যখন এটি প্রমাণ হয়ে গেল যে, উন্মাদ অবস্থার সংবাদ মিথ্যারই প্রকার, তখন এ আয়াত দ্বারা সত্য এবং মিথ্যার মাঝামাঝি একটি মধ্যবর্তী স্তর প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

সার-সংক্ষেপ : আল্লামা জাহিযের দলিলের জবাব : জমহুর বলেন, তার পেশকৃত আয়াতটিতে দু'প্রকার كِذْبٌ (মিথ্যা)-এর আলোচনা করা হয়েছে। اَفْتَرٰى অংশে كِذْبٌ عَمَدِىْ আর اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ অংশে كِذْبٌ غَيْرُ عَمَدِىْ-এর আলোচনা করা হয়েছে।

أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيِّ وَهُوَ ضَمُّ كَلِمَةٍ أَوْ مَا يَجْرِيْ مَجْرَهَا إِلَى أُخْرَى بِحَيْثُ يُفِيْدُ الْمُخَاطَبَ أَنَّ مَفْهُوْمَ أَحَدِهِمَا ثَابِتٌ لِمَفْهُوْمِ الْأُخْرَى أَوْ مَنْفِيٌّ عَنْهُ وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَحْثَ الْخَبَرِ لِعَظْمِ شَانِهِ وَكَثْرَةِ مَبَاحِثِهِ ثُمَّ قَدَّمَ أَحْوَالَ الْإِسْنَادِ عَلَى أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ مَعَ تَأَخُّرِ النِّسْبَةِ عَنِ الطَّرْفَيْنِ لِأَنَّ الْبَحْثَ هُنَا إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَحْوَالِ اللَّفْظِ الْمَوْصُوْفِ بِكَوْنِهِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ أَوْ مُسْنَدًا وَهٰذَا الْوَصْفُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِسْنَادِ وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَى النِّسْبَةِ إِنَّمَا هُوَ ذَاتُ الطَّرْفَيْنِ وَلَا بَحْثَ لَنَا عَنْهَا ـ

অনুবাদ : إِسْنَادْ خَبَرِيْ-**এর বিভিন্ন অবস্থা।** (ইসনাদ বলা হয়) একটি কালিমা বা তার সমপর্যায়ের কিছুকে অন্য শব্দের সাথে এমনভাবে যুক্ত করা, যাতে এটি শ্রোতাকে এ ফায়দা দিবে যে, একটির বিষয়বস্তু অপরটির বিষয়বস্তুর জন্য প্রমাণিত হবে, অথবা প্রমাণিত হবে না। তিনি সংবাদমূলক বাক্যের বিষয়াবলিকে (রচনায়) আগে এনেছেন এর সুউচ্চ মর্যাদা এবং বিষয়বস্তুর বিস্তৃতির কারণে, এরপর ইসনাদের বিষয়াবলিকে মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহের আগে এনেছেন, নিসবত বাক্যের দু' প্রধান অংশের পরে হওয়া সত্ত্বেও। কেননা, এখানে আলোচনা চলছে শব্দের মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ হওয়ার ভিত্তিতে। আর (শব্দের) এ গুণটি ইসনাদ পাওয়া যাওয়ার পরই পাওয়া যায়। নিসবতের আগে যা আসে তা তো বাক্যের দু' প্রধান অংশ। আর তা নিয়ে আলোচনা তো এখানে নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الخ : ইলমুল মা'আনী যে আট প্রকারে সীমাবদ্ধ এর প্রথম প্রকার হলো أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيْ তারকীব হিসেবে أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيْ একটি উহ্য মুবতাদার খবর। উহ্য মুবতাদা হলো اَلْبَابُ الْأَوَّلُ সে মতে পুরো বাক্যটি এরূপ হবে- اَلْبَابُ الْأَوَّلُ أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيْ

أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইসনাদের মধ্যে যেসব অবস্থা বিভিন্ন সময়ে দেখা যায়। যেমন- ইসনাদ حَقِيْقَةْ عَقْلِيْ হবে অথবা مَجَازْ عَقْلِيْ হবে। এমনিভাবে ইসনাদে তাকিদ থাকবে অথবা তাকিদ থাকবে না ইত্যাদি।

وَهُوَ ضَمُّ كَلِمَةٍ أَوْ مَا يَجْرِيْ مَجْرَهَا : এ বাক্য দ্বারা ইসনাদের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসনাদ বলা হয়- একটি কালিমা অথবা তার স্থলাভিষিক্ত (অর্থাৎ জুমলা, যা মুফরাদের হুকুম লাভ করে) শব্দকে (মুসনাদকে) অপর আরেকটি কালিমার (মুসনাদ ইলাইহের) সাথে যুক্ত করা এমনিভাবে যে, শ্রোতাগণ এ সংবাদ দ্বারা একটি উপকার লাভ করে অর্থাৎ একটি বিষয় অনুধাবন করতে পারে। সে উপকারটি হচ্ছে) সে বুঝতে পারে যে, দু'টি কালিমার একটি (অর্থাৎ مَحْكُوْم بِهِ) অপরটি (অর্থাৎ مَحْكُوْم عَلَيْهِ)-এর জন্য প্রমাণিত অথবা একটি অপরটি থেকে অপ্রমাণিত।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, মূল লেখক বলেছেন أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيْ অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্যের ইসনাদের বিভিন্ন অবস্থা। এ বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসনাদ বর্ণনামূলক বাক্যের সাথে খাস। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, ইসনাদ শুধুমাত্র বর্ণনামূলক বাক্যের সাথেই হয় না; বরং বিভিন্ন ইনশাইয়্যাহ-এর সাথে ইসনাদ হয় এবং সেই ইসনাদের মধ্যেও বিভিন্ন অবস্থা দেখা যায়। যেমন- مَجَازْ عَقْلِيْ ، حَقِيْقَتْ عَقْلِيَةْ، عَدَمْ تَاكِيْد ، تَاكِيْد ইত্যাদি। এর উদাহরণ কেউ বলল, اِبْنِ لِيْ قَصْرًا (আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করো) সুতরাং যদি নির্দেশিত ব্যক্তি উক্ত কাজ করার যোগ্য হয়, তাহলে তাকে مَجَازْ عَقْلِيْ বলা হবে।

এমনিভাবে কেউ যদি সহজে কাজ করে তাকে (তাকিদ ছাড়া) اِضْرِبْ (তুমি মারো) বললেই হয়। আর যদি নির্দেশিত ব্যক্তি সহজে কাজ না করে; বরং তাকিদ করে বললে তাকে তাকিদযুক্ত করে নির্দেশ দিতে হয়। যেমন- اِضْرِبَنَّ

মোটকথা, যে সকল বিষয় বর্ণনামূলক বাক্যে দেখা যায় তা ইনশাইয়্যাহ-এর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। তাই মূল লেখকের জন্য إِسْنَادْ-কে বর্ণনামূলক বাক্যের সাথে নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা কি সমীচীন হয়েছে?

এর উত্তর হলো, খবর বা বর্ণনামূলক বাক্য ইনশার জন্য أَصْل বা মূল। তদ্রূপ বালাগাত বিশারদদের জন্য উল্লিখিত বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনামূলক বাক্যে ইনশার চেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

তা ছাড়া বর্ণনামূলক বাক্য বালাগাত শাস্ত্রবিদদের কাছে মূল এবং প্রধান উদ্দেশ্য, তাই إِسْنَادْ-কে خَبَرْ বা বর্ণনামূলক বাক্যের সাথে খাস করা হয়েছে। এমন অধিক ব্যবহৃত বিষয়ের সাথে খাস করা বিধিসম্মত, তাই এটি দূষণীয় নয়। অতএব, خَبَرْ-এর সাথে নির্দিষ্ট করা ইনশার মধ্যে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَحْثَ الْخَبَرِ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, মূল লেখক বর্ণনামূলক বাক্যের আলোচনাকে সর্বাগ্রে কেন বর্ণনা করলেন? এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, خَبَرْ বা বর্ণনামূলক বাক্যের মর্যাদা (ইনশার চেয়ে) বেশি এবং এর আলোচ্য সূচিও অনেক বিস্তৃত। বর্ণনামূলক বাক্যের মর্যাদা বেশি হওয়ার কারণ হলো, আক্বিদা-বিশ্বাসের বিষয়গুলো বর্ণনামূলক এবং ভাষা সংক্রান্ত বিষয়াবলিও বর্ণনামূলক। এর বিষয়বস্তু বিস্তৃত হওয়ার কারণ হলো বালাগাতশাস্ত্রবিদগণ যে সকল বৈশিষ্ট্য ও সূক্ষ্ম বিষয়াবলি প্রমাণ করেন, এর সবই প্রায় বর্ণনামূলক বাক্যে।

মোটকথা, মর্যাদা ও আলোচ্য সূচি উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বর্ণনামূলক বাক্যের আলোচনা সর্বাগ্রে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ قَدَّمَ اَحْوَالَ الْاِسْنَادِ عَلٰى الخ : এ বাক্যটি দ্বারাও একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, মর্যাদা বা অস্তিত্ব হিসেবে إِسْنَادْ বাক্যের প্রধান দু' অংশ তথা মুসনাদ ইলাইহ এবং মুসনাদ-এর পিছনে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসনাদের অবস্থাসমূহের আলোচনা মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহর অবস্থাসমূহের আগে কেন আনা হলো?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইলমুল মা'আনীর মধ্যে এখানে আলোচনা হচ্ছে ঐ শব্দাবলি সম্পর্কে যে শব্দাবলি মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে।

অথবা, বাক্যের দু'অংশ ইসনাদ দ্বারা বিশেষিত হিসেবে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এ দু'অংশ ইসনাদ দ্বারা বিশেষিত হওয়ার জন্য নিশ্চিতভাবে সর্বাগ্রে ইসনাদ হতে হবে। অর্থাৎ ইসনাদ হওয়ার পর এগুলো মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ হবে। ইসনাদ না হলে এগুলোকে মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ বলা যাবে না। এ কারণেই ইসনাদ ও তার অবস্থাসমূহের আলোচনা প্রথমে এসেছে। এরপর পর্যায়ক্রমে মুসনাদ ইলাইহ এবং মুসনাদের আলোচনা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, বাক্যের প্রধান দু'অংশ সত্তাগতভাবে বা অস্তিত্বের দিক থেকে অবশ্য নিসবতের আগে; কিন্তু সত্তা বা অস্তিত্বের বিষয়ে ইলমুল মা'আনীতে আলোচনা হয় না। তাই সত্তাগতভাবে অগ্রগামী হওয়াটা এখানে লক্ষণীয় নয়।

সার-সংক্ষেপ :

ক. জুমলায়ে খবরিয়্যাহ-এর আলোচনা প্রথমে আনার কারণ দু'টি– ১. ইনশার তুলনায় খবরের গুরুত্ব বেশি এবং খবরের জন্য ইনশা হচ্ছে মূল। ২. সংবাদমূলক বাক্যের আলোচনার পরিধি বড় ও বিস্তৃত।

খ. 'ইসনাদের অবস্থাসমূহ'কে মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহর অবস্থাসমূহের আগে আনা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে ইসনাদ সবার আগে, ইসনাদ ছাড়া মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্ক হতে পারে না।

لَاشَكَّ اَنَّ قَصْدَ الْمُخْبِرِ اَىْ مَنْ يَّكُوْنُ بِصَدَدِ الْاِخْبَارِ وَالْاِعْلَامِ وَاِلَّا فَالْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ كَثِيْرًا مَّا تُوْرَدُ لِاَغْرَاضٍ اُخَرَ غَيْرَ اِفَادَةِ الْحُكْمِ اَوْ لَازِمِهٖ مِثْلُ التَّحَزُّنِ وَالتَّحَسُّرِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى حِكَايَةً عَنِ امْرَأَةِ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَمَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ بِخَبَرِهٖ مُتَعَلِّقٌ بِقَصْدِ اِفَادَةُ الْمُخَاطَبِ خَبَرُ اِنَّ اِمَّا الْحُكْمَ مَفْعُوْلُ الْاِفَادَةِ اَوْ كَوْنَهٗ اَىْ كَوْنَ الْمُخْبِرِ عَالِمًا بِهٖ اَىْ بِالْحُكْمِ وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ هٰهُنَا وُقُوْعُ النِّسْبَةِ اَوْ لَا وُقُوْعُهَا وَكَوْنُهٗ مَقْصُوْدًا لِلْمُخْبِرِ بِخَبَرِهٖ لَايَسْتَلْزِمُ تَحَقُّقَهٗ فِى الْوَاقِعِ وَهٰذَا مُرَادُ مَنْ قَالَ اِنَّ الْخَبَرَ لَايَدُلُّ عَلٰى ثُبُوْتِ الْمَعْنٰى وَانْتِفَائِهٖ وَاِلَّا فَلَا يَخْفٰى اَنَّ مَدْلُوْلَ قَوْلِنَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَمَفْهُوْمَهٗ اَنَّ الْقِيَامَ ثَابِتٌ لِزَيْدٍ وَعَدَمُ ثُبُوْتِهٖ لَهٗ اِحْتِمَالٌ عَقْلِيٌّ لَا مَدْلُوْلُ اللَّفْظِ وَلَا مَفْهُوْمُهٗ فَلْيُفْهَمْ ـ

অনুবাদ : নিঃসন্দেহে সংবাদদাতার ইচ্ছা অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যে (কোনো সংবাদ) জানানোর বা ঘোষণা দেওয়ার ইচ্ছা করে। অন্যথায় (যে সংবাদ দেওয়ার ইচ্ছা করে না; বরং বর্ণনামূলক বাক্য বলে) সংবাদমূলক বাক্যগুলো অনেক সময় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। যাতে হুকুম বা লাযেমে হুকুম (উভয়ের সংজ্ঞা সামনে আসবে)-এর ফায়দা দেওয়া হয় না। যেমন– দুঃখ প্রকাশ ও অনুতাপ প্রকাশ করা। (এর উদ্দেশ্যে বর্ণনামূলক বাক্য ব্যবহৃত হয়) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী যা তিনি ইমরানের (মারইয়ামের বাবা) স্ত্রী (মারইয়ামের মা)-এর পক্ষে বর্ণনা করেন। আয়াত : 'হে আমার প্রভু! আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।' এবং এ জাতীয় আরো উদাহরণ রয়েছে। بِخَبَرِهٖ এটি قَصْدَ-এর সাথে মুতাআল্লিক। اِفَادَةُ الْمُخَاطَبِ **শ্রোতাকে উপকার** পৌঁছানো তথা এটি اِنَّ-এর খবর। হয়তো (الْحُكْمَ হলো) اِفَادَةٌ মাসদার-এর মাফঊল অথবা (উপকার পৌঁছানো এ ব্যাপারে যে) সংবাদদাতা **হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত**। এখানে হুকুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহের মাঝে নিসবত ঘটবে অথবা নিসবত ঘটবে না। সংবাদদাতার উদ্দেশ্য (সেই সংবাদ)-এর দ্বারা এটি বাস্তবে সংঘটিত হওয়াকে লাযেম করে না। যারা বলে, সংবাদমূলক বাক্য কোনো বিষয় হওয়া বা না হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে না। তাদের উদ্দেশ্য তাই, যা পূর্বে বর্ণনা করা হলো। অন্যথায় এটি অস্পষ্ট নয় যে, আমাদের উক্তি زَيْدٌ قَائِمٌ-এর অর্থ এবং দাবি দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়টি যায়েদের জন্যে প্রমাণিত এবং (সেই সাথে) যায়েদের জন্য দণ্ডায়মান না হওয়ার একটি যৌক্তিক সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে এটি বাক্যের অর্থ বা দাবি মোটেও নয়। সুতরাং বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া চাই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ لَاشَكَّ اَنَّ قَصْدَ الْمُخْبِرِ الخ : মূল লেখকের ইবারত لَاشَكَّ থেকে শুরু করে فَيَنْبَغِىْ পর্যন্ত اَحْوَالُ الْاِسْنَادِ বা ইসনাদের বিভিন্ন অবস্থাসমূহের আলোচনার একটি ভূমিকা। এখানে لَاشَكَّ-এর ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা হলো مُخْبِرٌ অর্থ সংবাদ দাতা হতে পারে অথবা এর অর্থ হবে যে জুমলায়ে খবরিয়্যাহ বলে। এ কথাটিকে এভাবে বলা যায় যে, এক ব্যক্তি زَيْدٌ قَائِمٌ বলল, তার এ বাক্য দ্বারা কোনো সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য হবে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য হবে। উভয় অবস্থায় একে مُخْبِرٌ -ই বলা হবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, خَبَرٌ দ্বারা মূল লেখকের প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে জুমলায়ে খবরিয়াহ বলে সংবাদ দেওয়ার ইচ্ছা করে।

মুসান্নিফ বলেন, এখানে خَبَرٌ দ্বারা দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য নয়। কেননা, জুমলায়ে খবরিয়্যাহ বা বর্ণনামূলক বাক্যের অনেক অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন– দুঃখ প্রকাশ করা, অনুতাপ প্রকাশ করা ও হতাশা প্রকাশ করা ইত্যাদি। এর উদাহরণ আল্লাহর কালামের একটি আয়াত (যে আয়াতে তিনি হযরত মারইয়ামের জননী তথা ইমরানের স্ত্রীর বক্তব্য তুলে ধরেছেন)

নিম্নে আয়াতটি দেওয়া হলো–

رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى অর্থ– হে আমার প্রভু! আমি একজন কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। এ বাক্যটি যদিও সংবাদমূলক বাক্য, কিন্তু এতে কোনো সংবাদ দেওয়া হচ্ছে না; বরং এতে হতাশা প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে সংবাদমূলক বাক্যের যে দু'টি উদ্দেশ্য তথা হুকুমের ফায়দা দেওয়া অথবা লাযেম হুকুমের ফায়দা দেওয়া (এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা অচিরেই আসছে)-এর কোনোটাই উদ্দেশ্য নয়। এরপর مُخْبِرْ (দ্বারা যদি সংবাদদাতা উদ্দেশ্য হয়) তার সংবাদ দ্বারা সে দু'টি ইচ্ছা করতে পারে– ১. তার শ্রোতাকে বাক্যের হুকুম বা বিষয়টি জানাবে, ২. অথবা তার শ্রোতাকে একথা জানাবে যে, সে বাক্যের হুকুম সম্পর্কে জানে। (প্রথমটি فَائِدَةُ الْخَبَرِ এবং দ্বিতীয়টিকে لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ বলা হয়।) সংবাদদাতার প্রথম উদ্দেশ্য তখন হয়ে থাকে যখন তার শ্রোতা হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। যেমন– আপনি খালেদকে বললেন ذَهَبَ رَاشِدٌ (রাশেদ চলে গেছে) খালেদ ইতঃপূর্বে রাশেদের যাওয়ার বিষয় অবহিত ছিল। সংবাদদাতার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তখন হয় যখন শ্রোতা বাক্যের হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে। কিন্তু সংবাদদাতা যে খবরটি জানে তা জানে না। এমতাবস্থায় সংবাদদাতা সংবাদটি দ্বারা শ্রোতাকে বুঝায় যে, সেও হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত। যেমন– কোনো ব্যক্তি কুরআনের হাফেজকে বলল اَنْتَ حَفِظْتَ الْقُرْاٰنَ অর্থাৎ তুমি কুরআন মুখস্থ করেছ।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ الخ : আর এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের ইবারতে (اِفَادَةُ الْمُخَاطَبِ اِمَّا الْحُكْمَ اَوْ كَوْنَهُ) যে حُكْم শব্দটি এসেছে এর ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, حُكْم শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ক. حُكْم শব্দটি নিসবতে কালামিয়াহ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কালাম বা বাক্য থেকে যে নিসবতটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে বাক্যের মুসনাদ বা বিধেয় তার মুসনাদ ইলাইহের জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অথবা বিধেয় উদ্দেশ্য থেকে বিদূরীত হওয়া– একেই মুসান্নিফ وُقُوْعُ النِّسْبَةِ এবং لَا وُقُوْعُ النِّسْبَةِ বলে ব্যক্ত করেছেন। حُكْم দ্বারা এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য।

খ. মানতিকশাস্ত্রবিদদের মতে حُكْم অর্থ اِذْعَانُ النِّسْبَةِ অর্থাৎ নিসবতকে অনুভব করা। একে তারা اِيْقَاعٌ এবং اِنْتِزَاعٌ বলে ব্যক্ত করে থাকেন।

গ. নীতিশাস্ত্রবিদদের মতে আল্লাহর আদেশ নির্দেশ, যা বান্দাদের আমলের ক্ষেত্রে করে থাকেন, তাকে حُكْم বলা হয়।

ঘ. ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের মতে حُكْم বলা হয় আল্লাহর নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়াদিকে। যেমন– ওয়াজিব ও ফরজ ইত্যাদি। এগুলো আল্লাহর নির্দেশে প্রমাণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ مَقْصُوْدًا لِلْمُخْبِرِ الخ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ বলতে চাচ্ছেন যে, সংবাদদাতা তার সংবাদ তথা وُقُوْعُ النِّسْبَةِ এবং عَدَمُ وُقُوْعِ النِّسْبَةِ-এর ইচ্ছা করার কারণে এর বাস্তবতা জরুরি নয়।

এর ব্যাখ্যা এই যে, কোনো সংবাদদাতা যদি তার বাক্য (যথা– زَيْدٌ قَائِمٌ -এর) নিসবত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার (তথা যায়েদের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া প্রতিষ্ঠিত করার সংবাদের) ইচ্ছা করে, তাহলে বাস্তবে নিসবতটি হতেই হবে (অর্থাৎ যায়েদ দণ্ডায়মান অবশ্যই হয়েছে) এটা আবশ্যক নয়; বরং তার বাক্য দ্বারা যায়েদের জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়টি শ্রোতাকে জানানোই যথেষ্ট। বাস্তবতা এমনই হোক বা না হোক। বাস্তবতা এমন হতে পারে, আবার এর বিপরীতও হতে পারে; এ অর্থেই বলা হয় বর্ণনামূলক বাক্য সত্য এবং মিথ্যার সম্ভাবনা রাখে। প্রসঙ্গক্রমে মুসান্নিফ বলেন, যারা বলেন– বর্ণনামূলক কোনো হুকুম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বা হুকুম বিদূরীত হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না, তারা উপরোক্ত অর্থানুসারেই এ কথা বলেন অর্থাৎ সংবাদদাতার হুকুমের ইচ্ছা হুকুমের বাস্তবতাকে আবশ্যক করে না।

তাদের বক্তব্যের অর্থ মোটেই এটা না যে, ইতিবাচক বাক্য যথা زَيْدٌ قَائِمٌ-এর মধ্যে বাক্যটি قِيَامٌ-এর অর্থ যায়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে না। এমনিভাবে নেতিবাচক বাক্য যথা– زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ-এর মধ্যে বাক্যটি (عَدَمُ قِيَامٍ-এর অর্থ) দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ যায়েদ থেকে পৃথক করে না এমন নয়; বরং এর অর্থ হচ্ছে প্রথম বাক্যে এর অর্থ বাস্তবে যায়েদের দণ্ডায়মান হওয়া আবশ্যক নয়; এবং দ্বিতীয় বাক্যে এর অর্থ হচ্ছে বাস্তবে যায়েদের না দাঁড়ানো আবশ্যক নয়। মুসান্নিফ বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা যখন বলি– زَيْدٌ قَائِمٌ-এর শব্দের দাবি এবং অর্থ হচ্ছে قِيَامٌ (দাঁড়ানো) যায়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত, তবে তাতে দণ্ডায়মান না হওয়ার একটি যৌক্তিক সম্ভাবনা রয়েছে। এটি শব্দের অর্থ বা দাবি হিসেবে নয়।

মোটকথা, যারা বলেন, বর্ণনামূলক বাক্য ثُبُوْت এবং عَدَمُ ثُبُوْت-এর ফায়দা দেয় না তাদের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে সংবাদদাতার সংবাদ দেওয়ার ইচ্ছা সেই সংবাদের বাস্তবায়নকে আবশ্যক করে না। আল্লাহ আমাদের বিষয়টি বুঝার তৌফিক দিন।

সার-সংক্ষেপ : সংবাদমূলক বাক্য (جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ)-এর দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য সাধারণত দু'টি হয়ে থাকে। ক. শ্রোতাকে কোনো খবর-সংবাদ জানানো। খ. শ্রোতাকে এ কথা জানানো যে, সংবাদদাতা সংবাদটি জানে।

وَيُسَمَّى الْاَوَّلُ اَيِ الْحُكْمُ الَّذِى يُقْصَدُ بِالْخَبَرِ اِفَادَتُهُ فَائِدَةَ الْخَبَرِ وَالثَّانِى اَىْ كَوْنُ الْمُخْبِرِ عَالِمًا بِهٖ لَازِمَهَا اَىْ لَازِمَ فَائِدَةِ الْخَبَرِ لِاَنَّهُ كُلَّمَا اَفَادَ الْحُكْمَ اَفَادَ اَنَّهُ عَالِمٌ بِهٖ وَلَيْسَ كُلَّمَا اَفَادَ اَنَّهُ عَالِمٌ بِالْحُكْمِ اَفَادَ نَفْسَ الْحُكْمِ لِجَوَازِ اَنْ يَّكُوْنَ الْحُكْمُ مَعْلُوْمًا قَبْلَ الْاِخْبَارِ كَمَا فِىْ قَوْلِنَا لِمَنْ حَفِظَ التَّوْرَاةَ قَدْ حَفِظْتَ التَّوْرَاةَ وَتَسْمِيَةُ مِثْلِ هٰذَا الْحُكْمِ فَائِدَةُ الْخَبَرِ بِنَاءً عَلٰى اَنَّهُ مِنْ شَانِهٖ اَنْ يُقْصَدَ بِالْخَبَرِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهٖ عَالِمًا بِالْحُكْمِ حُصُوْلُ صُوْرَةِ الْحُكْمِ فِىْ ذِهْنِهٖ وَهٰهُنَا اَبْحَاثٌ شَرِيْفَةٌ سَمَحْنَا بِهَا فِى الشَّرْحِ ـ

অনুবাদ : **প্রথমটি** অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্য দ্বারা যে হুকুমের ফায়দা (শ্রোতাকে) দেওয়ার ইচ্ছা করা হয় তার **নামকরণ করা হয়েছে** فَائِدَةُ الْخَبَرِ **বলে। আর দ্বিতীয়টি** অর্থাৎ সংবাদদাতা সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া– এর নামকরণ করা হয়েছে لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ **বলে**। কেননা, যখন কোনো বাক্য হুকুমের ফায়দা দেবে তখন এরও ফায়দা দেবে যে, সে হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত। কিন্তু যখনই বাক্য এই ফায়দা দিবে যে, (সংবাদদাতা) হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত তখন হুকুমের ফায়দা দেওয়ার বিষয়টি আবশ্যক নয়। কেননা, এটা সম্ভব যে, সংবাদ দানের আগেই হুকুমটি জানা আছে। যেমন– তাওরাত মুখস্থকারী ব্যক্তিকে আমরা বলি, তুমি তাওরাত মুখস্থ করেছ। এর মধ্যে (হুকুমটি সংবাদ দানের আগেই জানা আছে।) এ জাতীয় সংবাদকে فَائِدَةُ الْخَبَرِ বলে নামকরণ করা হয়েছে এ ভিত্তিতে যে, এটাই সংবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য এবং এ থেকে সংবাদ লাভের ফায়দাটুকু নেওয়া হয়। হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার অর্থ হলো হুকুমের একটি অবয়ব মনোজগতে স্থান পাওয়া।

এ স্থলে কতিপয় উৎকৃষ্ট আলোচনা রয়েছে, ব্যাখ্যাগ্রন্থে (মুতাওয়ালে) এ বিষয়গুলো আমি উপস্থাপন করেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَيُسَمَّى الْاَوَّلُ الخ : বিগত আলোচনায় আমরা সংবাদদাতার সংবাদ দ্বারা দু'ধরনের ইচ্ছার কথা জানতে পেরেছি। এ দু'টি বিষয়ের নামকরণ সম্পর্কে উপরোক্ত ইবারতে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে প্রথম প্রকার অর্থাৎ সংবাদদাতার যদি সংবাদমূলক বাক্য দ্বারা শ্রোতার কাছে সংবাদ পৌছানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এর নাম হবে فَائِدَةُ الْخَبَرِ (সংবাদমূলক বাক্যের উপকারিতা)। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সংবাদদাতা যখন সংবাদ দ্বারা শ্রোতাকে এ কথা জানানো উদ্দেশ্য করে যে, (সংবাদদাতা) সংবাদটি জানে, তখন একে لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ (সংবাদমূলক বাক্যের ফায়দার জন্য যা লাযেম) বলা হবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ كُلَّمَا اَفَادَ الْحُكْمَ اَفَادَ اَنَّهُ عَالِمٌ بِهٖ الخ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ সংবাদদাতা عَالِمٌ بِالْخَبَرِ (সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত) এ কথা জানানোকে لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ বলে নামকরণ করার যুক্তি এই দেখিয়েছেন যে, সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত এ খবরটি فَائِدَةُ الْخَبَرِ-এর জন্য লাযেম। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, সংবাদদাতা যখনই শ্রোতাকে বর্ণনামূলক বাক্য বলবে অর্থাৎ শ্রোতাকে সংবাদ দিবে তখন এ সংবাদও দেওয়া হয়ে যাবে যে, সে (সংবাদদাতা) খবরটি জানে। তাই এটিকে فَائِدَةُ الْخَبَرِ-এর জন্য লাযেম বলা হয়েছে।

অবশ্য এর বিপরীত বিষয়টি হয় না। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, সংবাদদাতা যখন শ্রোতাকে এ কথা জানাতে চায় যে, সে সংবাদটি জানে তখন সংবাদ জানানোর কাজ সব সময় হয় না। কারণ, সে শ্রোতাকে যে নিজের عَالِمٌ بِالْخَبَرِ হওয়ার কথা জানাচ্ছে– হতে পারে সে সংবাদটি আগ থেকেই জানে। যেমন– কুরআনের হাফেজকে কেউ বলল, তুমি কুরআনের হাফেজ। এখানে কুরআনের হাফেজ তো আগ থেকেই জানে যে, সে হাফেজ। তাই তার এ সংবাদ দ্বারা কোনো জ্ঞান অর্জিত হয়নি।

মোটকথা, সংবাদদাতার প্রথম উদ্দেশ্যটির জন্য দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি লাযেম; কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য প্রথমটি লাযেম নয়, তাই দ্বিতীয়টিকে لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ বলা হয়।

قَوْلُهُ وَتَسْمِيَةُ مِثْلِ هٰذَا الْحُكْمِ الخ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, উপরে لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ-এর যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ اَنْتَ حَفِظْتَ الْقُرْاٰنَ-এর মধ্যে হুকুমকে فَائِدَةُ الْخَبَرِ বলা হবে। এরপর যখন শ্রোতাকে عَالِمٌ بِالْخَبَرِ-এর কথা জানানো উদ্দেশ্য, তখন তা لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ হলো। কিন্তু এখানে যেহেতু শ্রোতা আগ থেকেই হুকুম সম্পর্কে জানে তখন তো এ বাক্য শ্রোতাকে কোনো সংবাদ বা হুকুমের ফায়দা দিল না। যখন এটি ফায়দা দিল না তখন একে فَائِدَةُ الْخَبَرِ বলা যাবে কি?

এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, এ জাতীয় সংবাদকে فَائِدَةُ الْخَبَرِ বলার অর্থ হচ্ছে এর দ্বারা খবর দেওয়া উদ্দেশ্য হয় এবং সংবাদ এগুলো থেকে লাভ করা সম্ভব। فَائِدَةُ الْخَبَرِ অর্থ এই নয় যে, তা সব সময় খবরের ফায়দা দিবে এবং সব সময় এসব বাক্য দ্বারা খবরই উদ্দেশ্য হবে; বরং এর অর্থ হচ্ছে তা সংবাদ বহন করে। তাই যখন ইচ্ছা এ জাতীয় শব্দ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। এ হিসেবেই একে فَائِدَةُ الْخَبَرِ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهٖ عَالِمًا : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আমরা মুসান্নিফের বক্তব্যের সাথে একমত নই যে, فَائِدَةُ الْخَبَرِ হওয়া মাত্রই তা لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ হয়। যেমন– কোনো সংবাদদাতা শ্রোতাকে একটি خَبَرٌ জানাল, কিন্তু উক্ত সংবাদদের ব্যাপারে সংবাদদাতা নিজে নিশ্চিত জ্ঞান রাখে না; বরং তিনি সংবাদের ব্যাপারে সন্দিহান অথবা বিভ্রান্তির শিকার। এমতাবস্থায় সংবাদদাতার সংবাদ তো فَائِدَةُ الْخَبَرِ হলো, কিন্তু لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ হলো না। অথচ আপনি দাবি করেছেন যে, فَائِدَةُ الْخَبَرِ হওয়া মাত্রই তা لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِও হয়ে যায়। এর উত্তর হলো, প্রশ্ন উত্থাপনকারীর প্রশ্নটি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন عَالِمٌ بِالْخَبَرِ-এর মধ্যে عِلْمٌ আছে। তাকে যদি এই অর্থে নেওয়া হয় যে, عِلْم بِمَعْنٰى اِعْتِقَادٍ جَازِمٍ لَايَقْبَلُ التَّشْكِيْكَ (নিশ্চিত বিশ্বাস, যা কোনো ধরনের সন্দেহকে আশ্রয় দেয় না) অথচ আমাদের এখানে عِلْم শব্দ দ্বারা উপরোক্ত মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে عِلْم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সংবাদদাতার মনোজগতে সংবাদের একটি অবয়ব তৈরি হওয়া। হুকুম সংবাদদাতার মনোজগতে যেমনিভাবে اِعْتِقَادْ নিশ্চিত বিশ্বাস আকারে হাসিল হয়– তেমনি شَكٌّ (সন্দেহ), ظَنٌّ (অনিশ্চিত ধারণা) এবং وَهْمٌ (সাধারণ অপ্রাধান্য ধারণা) ইত্যাদি আকারেও হুকুম মনোজগতে হাসিল হতে পারে। সুতরাং যখন عِلْم দ্বারা এখানেও এ অর্থ উদ্দেশ্য তখন সংবাদমূলক বাক্য সবসময়ই সংবাদদাতার عَالِمٌ بِالْخَبَرِ (সংবাদ সম্পর্কে অবগত) হওয়ার ফায়দা দিবে, যাকে لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ বলা হয়। আর فَائِدَةُ الْخَبَرِ-এর সাথে সাথে এমনিতেই পাওয়া যায়। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে আরো উৎকৃষ্ট কিছু আলোচনা আছে, যা আমি ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুতাওয়ালে উপস্থাপন করেছি।

وَقَدْ يُنَزَّلُ الْمُخَاطَبُ الْعَالِمُ بِهِمَا اَىْ بِفَائِدَةِ الْخَبَرِ وَلَازِمِهَا مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ فَيُلْقَى اِلَيْهِ الْخَبَرُ وَاِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْفَائِدَتَيْنِ لِعَدَمِ جَرْيِهِ عَلٰى مُوْجَبِ الْعِلْمِ فَاِنَّ مَنْ لَّايَجْرِىْ عَلٰى مُقْتَضٰى عِلْمِهٖ هُوَ وَالْجَاهِلُ سَوَاءٌ كَمَا تَقُوْلُ لِلْعَالِمِ التَّارِكِ لِلصَّلٰوةِ اَلصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ وَتَنْزِيْلُ الْعَالِمِ بِالشَّئِ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ بِهٖ لِاِعْتِبَارَاتٍ خِطَابِيَّةٍ كَثِيْرَةٌ فِى الْكَلَامِ مِنْهُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى "وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ" بَلْ تَنْزِيْلُ وُجُوْدِ الشَّئِ مَنْزِلَةَ عَدَمِهٖ كَثِيْرٌ مِنْهُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى : "وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ" ـ

অনুবাদ : কখনো উভয় বিষয় তথা لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ ও فَائِدَةُ الْخَبَرِ **সম্পর্কে অবগত শ্রোতাকে অজ্ঞ ব্যক্তির স্তরে রাখা হয়।** অতঃপর তার কাছে সংবাদ পেশ করা হয়; যদিও সে উভয় ফায়দা সম্পর্কে অবগত। **তার জ্ঞানুসারে না চলার কারণে।** কেননা, যে ব্যক্তি তার জ্ঞানের দাবি মতো চলে না, সে এবং অজ্ঞ সমান। যেমন তুমি বেনামাজি জ্ঞানীকে বল, নামাজ অত্যাবশ্যকীয়। কোনো বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিকে সে বিষয়ের অজ্ঞের স্থানে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় লক্ষ্য রাখার নীতি রচনাবলিতে প্রচুর দেখা যায়। এর একটি উদাহরণ আল্লাহর বাণী : 'তারা (ইহুদিরা) অবশ্যই জানে যে, যারা এগুলো (অর্থাৎ যাদুকে) গ্রহণ করেছে, তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রয় করেছে তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানত'; বরং কোনো বিদ্যমান জিনিসকে অস্তিত্বহীন জিনিসের স্থানে রাখার বিষয়টিও অনেক। এর উদাহরণ, আল্লাহর কালাম : (হে মুহাম্মদ!) যখন আপনি পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন আপনি তো নিক্ষেপ করেননি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَقَدْ يُنَزَّلُ الْمُخَاطَبُ الخ : মুসান্নিফ (র.) সাধারণভাবে বর্ণনামূলক বাক্যের ব্যবহারের মূল দু'টি ক্ষেত্র আলোচনা করার পর এখানে আরো দু'টি ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এর একটি হচ্ছে সংবাদদাতা এমন শ্রোতার কাছে সংবাদ পেশ করে, যে فَائِدَةُ الْخَبَرِ এবং لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ উভয়টি সম্পর্কে জানে; কিন্তু সে সংবাদ মোতাবেক আমল করে না। তাই সংবাদদাতা তাকে উভয় ধরনের ফায়িদা সম্পর্কে অজ্ঞ মনে করে তার সামনে বর্ণনামূলক বাক্যটি পেশ করে, যেমন– প্রকৃত অজ্ঞদের সামনে পেশ করা হয়। কেননা, যে ব্যক্তি তার জ্ঞান মোতাবেক আমল করে না, সে এবং অজ্ঞ উভয় সমান। কারণ, জ্ঞানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে জ্ঞাত বিষয়ের উপর আমল করা। এখানে যেহেতু আমল উভয় (অজ্ঞ এবং জ্ঞানী) থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই উভয় একই স্তরের। এর উদাহরণ হলো, বেনামাজিকে বলা اَلصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ নামাজ ফরজ। اَلصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ বাক্যটি ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে فَائِدَةُ الْخَبَرِ সম্পর্কে জানে, কিন্তু সে জ্ঞান মোতাবেক আমল করছে না। তাই তাকে সে নামজের ফরজ হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির স্তরে রেখে তাকে বলা হচ্ছে– 'নামাজ ফরজ'। উল্লেখ্য যে, عَالِمٌ-কে جَاهِلٌ-এর স্তরে রাখার ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে–

১. শুধুমাত্র فَائِدَةُ الْخَبَرِ সম্পর্কে عَالِمٌ (অবগত) ব্যক্তি।

২. শুধুমাত্র لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি।

৩. فَائِدَةُ الْخَبَرِ এবং لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ উভয়টা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি।

উল্লিখিত উদাহরণটি প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অথবা শুধুমাত্র প্রথম প্রকারের উদাহরণও বলা যায়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো– এক ব্যক্তি জানে যে, সে যায়েদকে মেরেছে– এ কথা তুমি জান, তুমি সেই ব্যক্তিকে বললে ضَرَبْتَ زَيْدًا। শুধুমাত্র তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো– যেমন তুমি কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে বললে, যে একথা জানে যে, তুমি জান সে মু'মিন; কিন্তু সে তোমাকে এমন কষ্ট দিয়েছে যা কোনো মু'মিনের পক্ষে সম্ভব নয়, আল্লাহ আমাদের প্রভু, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের রাসূল। এ উদাহরণে শ্রোতা فَائِدَةُ الْخَبَرِ এবং لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ উভয় সম্পর্কে অবগত ছিল; কিন্তু তাকে অজ্ঞ মনে করে বাক্যটি বলা হয়েছে।

এখানে একটি আপত্তি দেখা দিতে পারে যে, عَالِمٌ-কে جَاهِلٌ-এর স্তরে রাখার তিনটি অবস্থা হতে পারে; কিন্তু মুসান্নিফ সর্বনাম ব্যবহার করলেন দ্বিবচনের এবং বললেন عَالِمٌ بِهِمَا-এর কারণ কি? এর জবাব হলো, هُمَا সর্বনামের مَرْجِعْ হলো مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ তাহলে বাক্যের অর্থ হবে এরূপ– কখনো উভয়ের সমষ্টির অবগত ব্যক্তিকে অজ্ঞের স্থানে রাখা হয়। অতএব, উক্ত (ব্যাখ্যাকৃত) সর্বনাম (فَائِدَةُ الْخَبَرِ এবং لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ) উভয়টি এবং (فَائِدَةُ الْخَبَرِ অথবা لَازِمُ فَائِدَةِ الْخَبَرِ) কোনো একটি দু'টোর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

মুসান্নিফ বলেন, কখনো সম্বোধনের বিভিন্ন বিষয়গুলো লক্ষ্য করে কোনো বিষয়ে অবগত ব্যক্তিকে সে বিষয়ের অনবহিত ব্যক্তির স্থানে রাখা হয় এবং এ ধরনের ব্যবহার আরবি রচনাতে প্রচুর। এর একটি উদাহরণ হলো, পবিত্র কুরআনের আয়াত– وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ তারা ভালোভাবেই জানে যে, যে ব্যক্তি যাদু অবলম্বন করে তার জন্য পরকালের কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মা বিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ; যদি তারা জানত। এ আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, আয়াতের প্রথমাংশে ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ভালোভাবে জানে (وَلَقَدْ عَلِمُوْا) কিন্তু তারা তাদের অবগতি অনুসারে কাজ করেনি। তাই তাদের অজ্ঞদের স্তরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জ্ঞানকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে– لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ "যদি তারা জানত"।

সারকথা হলো এই যে, কখনো জ্ঞানীকে মূর্খের স্থানে রাখা হয়।

এরপর মুসান্নিফ আরো বলেন, কখনো কোনো বিষয়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করত অনস্তিত্বের স্থানে রাখা হয়। যেমন– কুরআনে রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ (যখন আপনি কাফিরদের প্রতি কঙ্কর ও বালু নিক্ষেপ করেছেন তখন আপনি তা নিক্ষেপ করেননি।) এ আয়াতে আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর কঙ্কর নিক্ষেপকে অস্বীকার করেছেন এবং নিক্ষেপ করার অস্তিত্বকে অনস্তিত্বে পরিণত করেছেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, কঙ্কর নিক্ষেপ একটি কাজ কোনো জ্ঞান নয়। অতএব, এ কথা প্রমাণিত হলো যে, কোনো অস্তিত্ববান জিনিসকে অস্তিত্বহীন মনে করা হয়। এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কঙ্কর রাসূল ﷺ নিক্ষেপ করলেও তার আসল কার্যকারিতা আল্লাহ্ তা'আলা সাধন করেছেন। আয়াতের শেষভাগে আল্লাহ তা'আলা বলেন وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى অর্থাৎ তবে আল্লাহ কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন।

সার-সংক্ষেপ :

ক. কখনো বর্ণনামূলক বাক্যের উভয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিকে অজ্ঞাত ব্যক্তির স্তরে রাখা হয় এবং সেই অনুযায়ী বাক্য পেশ করা হয়। যেমন– وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

খ. কখনো অস্তিত্বশীল বিষয়কে অস্তিত্বহীনের স্থানে রাখা হয়। যেমন– وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ

فَيَنْبَغِيْ اَيْ اِذَا كَانَ قَصْدُ الْمُخْبِرِ بِخَبَرِهٖ اِفَادَةَ الْمُخَاطَبِ فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَّقْتَصِرَ مِنَ التَّرْكِيْبِ عَلٰى قَدْرِ الْحَاجَةِ حَذْرًا عَنِ اللَّغْوِ فَاِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِيْهِ اَيْ لَايَكُوْنُ عَالِمًا بِوُقُوْعِ النِّسْبَةِ اَوْ لَا وُقُوْعِهَا وَلَا مُتَرَدِّدًا فِيْ اَنَّ النِّسْبَةَ هَلْ هِيَ وَاقِعَةٌ اَمْ لَا وَبِهٰذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ مَا قِيْلَ اَنَّ الْخُلُوَّ عَنِ الْحُكْمِ يَسْتَلْزِمُ الْخُلُوَّ عَنِ التَّرَدُّدِ فِيْهِ فَلَاحَاجَةَ اِلٰى ذِكْرِهٖ بَلِ التَّحْقِيْقُ اَنَّ الْحُكْمَ وَالتَّرَدُّدَ فِيْهِ مُتَنَافِيَانِ اُسْتُغْنِيَ عَلٰى لَفْظِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُوْلِ عَنْ مُؤَكِّدَاتِ الْحُكْمِ لِيَتَمَكَّنَ الْحُكْمُ فِي الذِّهْنِ حَيْثُ وَجَدَهٗ خَالِيًا وَاِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُتَرَدِّدًا فِيْهِ اَيْ فِي الْحُكْمِ طَالِبًا لَهٗ بِاَنْ حَضَرَ فِيْ ذِهْنِهٖ طَرْفَا الْحُكْمِ وَتَحَيَّرَ فِيْ اَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا وُقُوْعُ النِّسْبَةِ اَوْ لَا وُقُوْعُهَا حَسُنَ تَقْوِيَتُهٗ اَيْ تَقْوِيَةُ الْحُكْمِ بِمُؤَكِّدٍ لِيُزِيْلَ ذٰلِكَ الْمُؤَكِّدُ تَرَدُّدَهٗ وَيَتَمَكَّنَ الْحُكْمُ ـ

অনুবাদ : সুতরাং সমীচীন হবে অর্থাৎ যখন সংবাদদাতার সংবাদ দ্বারা শ্রোতাকে ফায়দা দেওয়ার ইচ্ছা হবে তখন সমীচীন হবে **বাক্যকে প্রয়োজন মোতাবেক সংক্ষিপ্ত করা, অনর্থক কথা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে। অতএব যখন শ্রোতা মুক্ত মনের হবে কোনো সংবাদ বিষয়ে এবং সংবাদে সন্দেহ করা থেকে।** অর্থাৎ সে নিসবত সংঘটিত হওয়া বা না হওয়া (কোনো বিষয়েই) অবহিত হবে না এবং সন্দেহ পোষণকারীও হবে না যে, নিসবতটি হলো বা না হলো। সুতরাং এর দ্বারা কথিত মতের ভ্রান্তি প্রমাণিত হলো তথা সংবাদ বিষয়ে মুক্ত মন হওয়া সংবাদ বিষয়ে সন্দেহ প্রবণতা না করাকে আবশ্যিক করে। সুতরাং (সন্দেহপ্রবণতামুক্ত হওয়া)-এর আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে গবেষণালব্ধ কথা এই যে, হুকুম বা সংবাদ এবং এতে সন্দেহ প্রবণতা এ দু'য়ের মাঝে বৈপরীত্য) রয়েছে। (বর্ণনামূলক বাক্যটিকে) অমুখাপেক্ষী করা হবে হুকুমের তাকীদকারী শব্দাবলি থেকে। اُسْتُغْنِيَ **শব্দটি** মাফউল-এর সীগাহ। **যাতে হুকুমটি** মুক্ত মস্তিষ্ক পাওয়া মাত্রই তাতে স্থান করে নিতে পারে। **আর যদি** শ্রোতা **হুকুমের ব্যাপারে সন্দিহান হয় এবং হুকুমকে অনুসন্ধান করে।** অর্থাৎ তার মনোজগতে হুকুমের দু' প্রধান অংশ (তথা মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ) থাকে কিন্তু শ্রোতা এ দু'য়ের মাঝে ইতিবাচক হুকুম নাকি নেতিবাচক হুকুম এ ব্যাপারে সন্দিহান, এমতাবস্থায় হুকুমকে তাকিদকারী দ্বারা জোরালো করা উত্তম; যাতে সেই তাকিদকারী বিষয়টি তার সন্দেহকে দূর করে দেয় এবং হুকুম স্থিরভাবে বসে যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ فَيَنْبَغِيْ : এখান থেকে পূর্ববর্তী আলোচনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে অর্থাৎ সংবাদদাতার বর্ণনামূলক বাক্য দ্বারা যখন সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য হবে তখন শ্রোতার অবস্থানুপাতে বাক্যটি কিরূপ হবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। মূল লেখক বলেন, সংবাদদাতার যখন সংবাদমূলক বাক্য দ্বারা সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তখন যথাসম্ভব বাক্যটিকে সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা উচিত। যেন বাক্যটিতে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথার সমাবেশ না ঘটে। সেই সাথে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, বাক্যটি যেন বেশি সংক্ষিপ্ত না হয়ে যায়– যার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। বাক্যের শ্রোতা মোট তিন প্রকার–

১. সাধারণ শ্রোতা, যে বর্ণনামূলক বাক্যটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত।

২. দ্বিধাগ্রস্থ শ্রোতা, যে বর্ণনামূলক বাক্যটি সম্পর্কে ধারণা রাখে সন্দেহের সাথে, কিন্তু তার নিশ্চিত বিশ্বাস নেই।

৩. অস্বীকারকারী শ্রোতা, যে বর্ণনামূলক বাক্যটিকে অস্বীকার করে।

এ তিন অবস্থায় বাক্যের অবস্থা তিন ধরনের হয়ে থাকে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি শ্রোতার মনে কোনো সংবাদ না থাকে বা সংবাদ সম্পর্কে কোনো ধরনের সংশয় না থাকে অর্থাৎ মুসনাদটি মুসনাদ ইলাইহের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নাকি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এ ধরনের কোনো সংবাদ জানে না এবং এ ব্যাপারে তার কোনো সংশয়-সন্দেহও নেই, তাহলে শ্রোতার সামনে যে বর্ণনামূলক বাক্যটি পেশ করা হবে তা তাকিদমুক্ত হবে।

قَوْلُهُ وَبِهٰذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ مَا قِيْلَ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, কেউ কেউ মনে করেন, যখন শ্রোতার মনে কোনো সংবাদ থাকে না, তখন তার মনে সংবাদসংক্রান্ত কোনো ধরনের সংশয়-সন্দেহও থাকে না। অর্থাৎ শ্রোতার মন সংবাদ না জানাটাই একথা বুঝায় যে, তার মনে সংবাদ সম্পর্কিত কোনো সংশয় নেই। অতএব, যখন বলা হলো শ্রোতার মনোজগতে কোনো সংবাদ নেই, তখন একথা বলা হয়ে গেল যে, তার মনে কোনো সংবাদ সংক্রান্ত সংশয়ও নেই।

মোটকথা, যেহেতু সংবাদ না জানা সংবাদের ব্যাপারে দ্বিধা না থাকাকে বুঝায় সেহেতু সংবাদ না জানার সাথে সংবাদের ব্যাপারে দ্বিধা না থাকার শর্তারোপ করা ঠিক হয়নি।

অতএব, মুসান্নিফ (র.)-এর এ কথা বললেই হতো, যখন শ্রোতার মন হুকুম থেকে মুক্ত হয়।

এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, শ্রোতার মনে সংবাদ বা হুকুম না থাকা শ্রোতার মনে সংবাদ সম্পর্কে সংশয় না থাকাকে তখনই লাযেম করবে যখন এ দু'টোর মাঝে تَلَازُمٌ বা لَازِمْ وَمَلْزُوْمْ-এর সম্পর্ক থাকবে; অথচ এ দু'টোর মাঝে تَلَازُمٌ-এর সম্পর্ক নেই; বরং এ দু'টোর মাঝে পরস্পর বৈপরীত্যের সম্পর্ক এবং এ দু'টো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। সুতরাং যখন এ দু'টোর মাঝে বৈপরীত্য বিদ্যমান এবং এগুলো পরস্পর ভিন্ন তখন একটি অপরটিকে লাযেম করতে পারে না এবং একটিকে উল্লেখ করলে অপরটির কথা বলা হয়ে যায় না। সুতরাং خَالٍ عَنِ الْحُكْمِ বলার পর خَالٍ عَنِ التَّرَدُّدِ فِى الْحُكْمِ বলা সঠিক হয়েছে বলেই গণ্য হবে। اُسْتُغْنِىَ শব্দটি مَجْهُوْل-এর صيغه। এর নায়েবে ফায়েল হলো تَرْكِيْبْ বা ইবারত।

দ্বিতীয় প্রকারের শ্রোতা অর্থাৎ যাদের মনে সংবাদ সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় আছে এবং তারা সংবাদ (শোনার) প্রত্যাশী অর্থাৎ তার মনে কোনো সংবাদ সংক্রান্ত মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ রয়েছে, কিন্তু সে এ বিষয়ে সন্দিহান যে, এ দু'টি বিষয়ের মাঝে কি ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে, নাকি নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। এমতাবস্থায় হুকুম বা সংবাদটি জোরালো করার জন্য তাকিদ ব্যবহার করা উত্তম। যাতে এ তাকিদটি সন্দেহপোষণকারীর সন্দেহটি দূর করে দেয় এবং তার মনে হুকুমটি স্থান লাভ করে।

لٰكِنَّ الْمَذْكُوْرَ فِيْ دَلَائِلِ الْاِعْجَازِ اَنَّهٗ اِنَّمَا يُحْسِنُ التَّاكِيْدُ اِذَا كَانَ لِلْمُخَاطَبِ ظَنٌّ فِيْ خِلَافِ حُكْمِكَ وَاِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُنْكِرًا لِلْحُكْمِ وَجَبَ تَوْكِيْدُهٗ اَيْ تَوْكِيْدُ الْحُكْمِ بِحَسْبِ الْاِنْكَارِ اَيْ بِقَدْرِهٖ قُوَّةً وَضُعْفًا يَعْنِيْ يَجِبُ زِيَادَةُ التَّاكِيْدِ بِحَسْبِ اِزْدِيَادِ الْاِنْكَارِ اِزَالَةً لَهٗ ـ

অনুবাদ : কিন্তু 'দালাইলুল ই'জায নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তাকিদ ব্যবহার তখনই উত্তম যখন তোমার (মুতাকাল্লিমের) হুকুমের বিপরীতে শ্রোতার প্রবল ধারণা থাকে। **আর যদি শ্রোতা হুকুমের অস্বীকারকারী হয়, তাহলে হুকুমের তাকিদ ব্যবহার ওয়াজিব অস্বীকারের মাত্রানুপাতে।** অর্থাৎ অস্বীকারের পরিমাণ তথা শক্তিশালী ও দুর্বলতা অনুপাতে অর্থাৎ অস্বীকার বেশি হওয়ার অনুপাতে বেশি তাকিদ ব্যবহার ওয়াজিব, অস্বীকার দূরীকরণের জন্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ لٰكِنَّ الْمَذْكُوْرَ فِيْ دَلَائِلِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'দালাইলুল ই'জায' গ্রন্থে এ ব্যাপারে শায়খ আব্দুল কাহের জুরজানী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, শ্রোতা যখন সংবাদদাতা বা বক্তার সংবাদের বিপরীত ধারণা করে, যেমন– সংবাদদাতা বলল, যায়েদ দণ্ডায়মান, কিন্তু শ্রোতা ধারণা করছে যায়েদ দণ্ডায়মান নয়। এমতাবস্থায় তাকিদ ব্যবহার করা উত্তম। তাঁর মতে শ্রোতা যখন সংবাদদাতার বক্তব্যের ব্যাপারে সন্দিহান হয় অর্থাৎ তার কথার সত্যতা ও অসত্যতা উভয়টাই শ্রোতার কাছে সমান হয়, তখন শ্রোতার সামনে সংবাদকে তাকিদমুক্ত অবস্থায় পেশ করা বাঞ্ছনীয়; তাকিদযুক্তভাবে উপস্থাপন অবৈধ। যেমনটি শ্রোতা সংবাদ সম্পর্কে না জানলে তাকিদযুক্তভাবে উপস্থাপন করা অবৈধ।

উপরের আলোচনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রোতার সংবাদের ব্যাপারে সাধারণ সন্দেহ হলে শায়খ জুরজানীর কাছে সেই সংবাদে তাকিদ ব্যবহার অবৈধ।

আর তালখীসুল মিফতাহের লেখকের মতে, এমতাবস্থায় তাকিদ ব্যবহার করা শুধু বৈধই নয়; বরং উত্তম।

আর যখন শ্রোতা সংবাদদাতার সংবাদকে অস্বীকার করে, তখন শ্রোতার অস্বীকারের মাত্রানুপাতে তাকিদ আনা ওয়াজিব। অর্থাৎ অস্বীকার যদি বেশি শক্তিশালী হয় তাহলে তাকিদও বেশি শক্তিশালী হতে হবে, অস্বীকার যদি সাধারণ মানের হয় তাহলে তাকিদও সাধারণ মানের হবে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. শ্রোতা যদি সংবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ ও সংশয়হীন হয়, তাহলে বক্তার সংক্ষিপ্তভাবে তাকিদমুক্ত সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

খ. যদি শ্রোতা সংবাদের ব্যাপারে সন্দিহান হয় এবং সে সংবাদ জানার ব্যাপারে আগ্রহী হয়, তাহলে বর্ণনামূলক বাক্যে তাকিদ ব্যবহার করা উত্তম।

গ. আর যদি শ্রোতা সংবাদ অস্বীকার করে, তাহলে তার অস্বীকারের মাত্রানুযায়ী তাকিদ ব্যবহার করা আবশ্যক।

كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حِكَايَةً عَنْ رُسُلِ عِيْسٰى عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ حِيْنَ اَرْسَلَهُمْ اِلٰى اَهْلِ اِنْطَاكِيَّةَ اِذْ كُذِّبُوْا فِى الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ مُؤَكَّدًا بِاَنَّ وَاِسْمِيَّةِ الْجُمْلَةِ وَفِى الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ مُؤَكَّدًا بِالْقَسَمِ وَاِنَّ وَاللَّامِ وَاِسْمِيَّةِ الْجُمْلَةِ لِمُبَالَغَةِ الْمُخَاطَبِيْنَ فِى الْاِنْكَارِ حَيْثُ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَىْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ وَقَوْلُهُ اِذْ كُذِّبُوْا مَبْنِىٌّ عَلٰى اَنَّ تَكْذِيْبَ الْاِثْنَيْنِ تَكْذِيْبُ الثَّلَاثَةِ وَاِلَّا فَالْمُكَذَّبُ اَوَّلًا اِثْنَانِ ـ

অনুবাদ : (অস্বীকারকারীর সংবাদ সম্পর্কে) **যেমনটি আল্লাহ হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতিনিধিগণ** (তাদের এবং আমাদের নবীর উপর দরূদ ও সালাম) **সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,** যখন তাদের ইন্তাকিয়াবাসীদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন **এবং তাদের প্রথমবার মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়।** (তারা বলেন,) **নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের কাছে নবীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।** اِنَّآ اِلَيْكُمْ বাক্যটিকে ان (حرف مشبه بالفعل) এবং জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ দ্বারা জোরালো করা হয়েছে। **আর দ্বিতীয়বার** (যখন তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হলো) **তারা বলল, আমাদের প্রভু অবগত আছেন যে, নিশ্চয়ই আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।** বাক্যটিকে قَسَم , اِنْ (حرف مشبه بالفعل) , لَامْ تَاكِيْد এবং جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ দ্বারা তাকিদযুক্ত করে (পেশ করা হয়েছে) শ্রোতাদের অস্বীকারের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের কারণে, কেননা, তারা বলেছিল, তোমরা তো আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। পরম মেহেরবান আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পক্ষে কোনো দলিল নাজিল করেননি। তোমরা নিরেট মিথ্যাবাদী। মূল লেখক اِذْ كُذِّبُوْا (বহুবচন) বলেছেন, এ ভিত্তিতে যে, দু'জনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তিনজন (বহুবচন)-কেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর। অন্যথায় প্রথমত মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে দু'জনকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حِكَايَةً الخ : উল্লিখিত ইবারতে বর্ণনামূলক বাক্যের তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। মূল লেখক প্রথম দু' প্রকারের উদাহরণ এ কারণে দেননি যে, সেগুলো সকলের কাছেই পরিচিত। এ উদাহরণটি পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা পেশ করেছেন। আয়াতের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগের একটি কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ঘটনাটি এরূপ যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তাকিয়াবাসীদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বাওলাশ এবং ইয়াহইয়া নামক দু'জন প্রতিনিধি পাঠান। যখন তারা ইন্তাকিয়াবাসীদের সামনে আল্লাহর বাণী প্রচার করলেন এবং আসমানী কিতাব ইনজীল পেশ করলেন, তখন তারা প্রতিনিধি দলকে অস্বীকার করল এবং তাদের দাওয়াতের আহ্বানকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল। এ কারণে প্রতিনিধিগণ তাদের বক্তব্যকে اِنَّ (حرف مشبه بالفعل) এবং জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ-এর তাকিদ দ্বারা পেশ করলেন। তারা বললেন, اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। এরপর তাদের দু'জনের সহযোগিতা করার জন্য হযরত শামউন (আ.)-কে পাঠালেন। কিন্তু এবার ইন্তাকিয়াবাসীগণ আরো জোরালোভাবে তাদেরকে অস্বীকার করল। তারা বলল– قَالُوْا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَىْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ

অর্থাৎ তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতো মানুষ, তোমাদের পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণাদি অবতীর্ণ করেননি, তোমরা কেবলই মিথ্যাবাদী।

তাদের এ জোরালো প্রত্যাখ্যানের জবাবে প্রতিনিধিগণ قَسَمْ (কসম), إِنَّ (حرف مشبه بالفعل) , لَامْ تَاكِيْد এবং জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ– এ চারটি তাকিদ দ্বারা তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যানকারীদের সামনে পেশ করেন। তারা বলেন, رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ আমাদের প্রভু জানেন, অবশ্যই অবশ্যই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। এ বাক্যে رَبُّنَا শব্দটি বিধানগতভাবে কসম, আর إِنَّ (حرف مشبه بالفعل) একটি তাকিদ, لَمُرْسَلُوْنَ-এর لَامْ হলো لَامْ تَاكِيْد আর জুমলাতুল ইসমিয়্যাহ একটি তাকিদ।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কাফিররা তিনভাবে তাদের বক্তব্যকে অস্বীকার করেছে বা প্রত্যাখ্যান করেছে। যথা– ১. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ২. مَآ أَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ৩. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُوْنَ এর জবাবে প্রতিনিধিগণের বক্তব্যে চারটি তাকিদ এসেছে। অথচ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, অস্বীকারের মাত্রানুসারের তাকিদ আসবে। সে মতে এখানে তিনটি তাকিদ আনাই সমীচীন ছিল; কিন্তু চারটি কেন আনা হলো?

এর জবাব হলো, অস্বীকারের মাত্রা বলতে বুঝানো হয়েছে, শক্ত বা নরম হিসেবে তাকিদ আনা হবে। অস্বীকারের মাত্রা বলতে সংখ্যার হিসাব উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ অস্বীকারের সংখ্যা পাঁচ হলে তাকিদ পাঁচটি হবে– এমন উদ্দেশ্য নয়; বরং এমনও হতে পারে অস্বীকারের বাক্যটি তিনটি কিন্তু তাকিদ পাঁচটি। এর উল্টোও হতে পারে। অর্থাৎ অস্বীকার তিনটি, কিন্তু তাকিদ দু'টি।

এখানে ইন্তাকিয়াবাসীদের তিনটি অস্বীকারের বাক্য চারটি তাকিদের সমান সমান হয়েছে। অতএব আর কোনো আপত্তি রইল না। অবশ্য কেউ কেউ বলে থাকেন, এখানে অস্বীকারের সংখ্যাও চারটি। চতুর্থ নাম্বার অস্বীকারটি হচ্ছে مَآ أَنْتُمْ إِلَّا এবং إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا বাক্যদ্বয়ে যে حصر বা সীমাবদ্ধকরণটি হয়েছে তাই চতুর্থ অস্বীকার।

قَوْلُهُ إِذْ كُذِّبُوْا مَبْنِيٌّ : এ বাক্যটির সাহায্যে মুসান্নিফ একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, প্রথমে ইন্তাকিয়াবাসীদের কাছে প্রতিনিধি গিয়েছিলেন দু'জন; কিন্তু তাদের সম্পর্কে মূল লেখক كُذِّبُوْا বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার করলেন না কেন?

এর উত্তর হলো, দ্বিতীয়বার যখন হযরত শামঊন (আ.) পরবর্তী দু'জন প্রতিনিধির সাথে যোগ দিলেন তখন তিনি পূর্বের দু'জনের অনুরূপ আহ্বান করলেন বা আহ্বান জানালেন। তাই সকলের বক্তব্য এক হওয়াতে দু'জনকে অস্বীকার করার অর্থ সকলকে অস্বীকার করা । এ কারণে বহুবচন (তিনজন)-এর সীগাহ ব্যবহার করা অনুচিত হয়নি।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত প্রশ্ন তখনই আরোপিত হয় যখন فِى الْمَرَّةِ الْأُوْلٰى-এর تعلق হবে كُذِّبُوْا-এর সাথে। তবে ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ঈযাহ'-এর বক্তব্য হচ্ছে فِى الْمَرَّةِ الْأُوْلٰى-এর تعلق আমরা حِكَايَةٌ-এর সাথে করবো। আর তখন উক্ত প্রশ্নটি আরোপিত হবে না।

وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ إِبْتِدَائِيًّا وَالثَّانِي طَلَبِيًّا وَالثَّالِثُ إِنْكَارِيًّا وَيُسَمَّى إِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا اَيْ عَلَى الْوُجُوْهِ الْمَذْكُوْرَةِ وَهِيَ الْخُلُوُّ عَنِ التَّاكِيْدِ فِي الْأَوَّلِ وَالتَّقْوِيَةُ بِمُؤَكِّدٍ إِسْتِحْسَانًا فِي الثَّانِي وَ وُجُوْبُ التَّاكِيْدِ بِحَسْبِ الْإِنْكَارِ فِي الثَّالِثِ إِخْرَاجًا عَلٰى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ وَهُوَ اَخَصُّ مُطْلَقًا مِنْ مُقْتَضَى الْحَالِ لِاَنَّ مَعْنَاهُ مُقْتَضٰى ظَاهِرِ الْحَالِ فَكُلُّ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ مُقْتَضَى الْحَالِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ كَمَا فِيْ صُوْرَةِ إِخْرَاجِ الْكَلَامِ عَلٰى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ فَإِنَّهُ يَكُوْنُ عَلٰى مُقْتَضَى الْحَالِ وَلَا يَكُوْنُ عَلٰى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ ـ

অনুবাদ : **প্রথম প্রকারের নাম রাখা হয়েছে ইবতেদায়ী, দ্বিতীয় প্রকারের নাম তালাবী এবং তৃতীয় প্রকারের নাম ইনকারী। উল্লিখিত পদ্ধতিতে বাক্য ব্যবহারকে** (মুকতাযায়ে যাহির অনুসারে কালাম ব্যবহার করা বলা হয়) অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় তাকিদমুক্ত বাক্য, দ্বিতীয় অবস্থায় কোনো তাকিদকারী দ্বারা উত্তম হিসেবে কালামকে জোরালো করা এবং অস্বীকারের মাত্রানুসারে তাকিদ অত্যাবশ্যকীয় হওয়াকে মুকতাযায়ে জাহির অনুসারে বাক্য ব্যবহার করা বলা হয়। এটি (মুকতাযায়ে যাহির) মুকতাযায়ে হালের চেয়ে সংকীর্ণ। কেননা, এর অর্থ হচ্ছে মুকতাযায়ে যাহির হাল, সুতরাং যা মুকাতাযায়ে যাহির তা অবশ্যই মুকতাযায়ে হাল; কিন্তু এর বিপরীতক্রমে নয়। যেমন– মুকাতাযায়ে যাহিরের বিপরীত বাক্য ব্যবহার করা সত্ত্বেও তা মুকাতাযায়ে হাল মোতাবেক হতে পারে; কিন্তু তা মুকতাযায়ে জাহির মোতাবেক হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ الخ : ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, শ্রোতার অবস্থানুসারে বাক্য তিন ধরনের হয়ে থাকে। **এক.** শ্রোতা সংবাদ সম্পর্কে কিছুই জানে না। এমতাবস্থায় তার সামনে তাকিদমুক্ত বাক্য পেশ করা হয়। **দুই.** শ্রোতা সংবাদ সম্পর্কে কিছুটা জানে অর্থাৎ মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ জানে; কিন্তু সে নিসবতের ব্যাপারে সন্দিহান। এমতবস্থায় তার সামনে তাকিদযুক্ত বাক্য পেশ করা উত্তম। **তিন.** শ্রোতা সংবাদকে অস্বীকার করে এমতাবস্থায় তার সামনে তাকিদযুক্ত বাক্য ব্যবহার করা ওয়াজিব।

মূল লেখক বলেন, প্রথম প্রকারের বাক্যকে ইবতেদায়ী বাক্য বলা হয়। এর কারণ এ বাক্যটি শ্রোতার কোনো আগ্রহ বা অস্বীকারের বিপরীতে বলা হয়নি; বরং এটি প্রাথমিকভাবে শ্রোতার সামনে বলা হয়েছে তাই এটিকে ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) বাক্য বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের বাক্যকে طَلَبِيْ (তালাবী) বাক্য বলা হয়, কারণ এটি শ্রোতার তলব অর্থাৎ আগ্রহ অনুসন্ধানের পর তার সামনে পেশ করা হয়েছে। তৃতীয় প্রকারের বাক্যকে إِنْكَارِيْ (অস্বীকারকারী) বাক্য বলা হয়। কারণ এ ধরনের বাক্য শ্রোতার অস্বীকারের পর বলা হয়ে থাকে। মুসান্নিফ বলেন, উল্লিখিত তিন পদ্ধতিতে বাক্য ব্যবহারকে إِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلٰى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ (যাহির বা বাহ্যিক অবস্থার দাবি অনুসারে কালাম ব্যবহার করা) বলা হয়। এরপর مُقْتَضَى الظَّاهِرِ এবং مُقْتَضَى الْحَالِ-এর মাঝে নিসবত বয়ান করেন। মুসান্নিফ বলেন, এ দু'টির মাঝে عام خاص مطلق-এর নিসবত বিদ্যমান। তার মতে مُقْتَضَى الْحَالِ হলো عَام مُطْلَق আর مُقْتَضَى الظَّاهِرِ হচ্ছে خاص مطلق। কেননা, যে বাক্যটি مُقْتَضٰى ظَاهِرِ الْحَالِ অনুসারে হবে তা অবশ্যই مُقْتَضَى الْحَالِ অনুযায়ী হবে; কিন্তু যে বাক্য مُقْتَضَى الْحَالِ অনুযায়ী হবে তা নিশ্চিতভাবে مُقْتَضٰى ظَاهِرِ الْحَالِ অনুসারে হবে তা বলা যায় না। তা مُقْتَضٰى ظَاهِرِ অনুযায়ী হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। কারণ, حال দু' ধরনের– ১. ظاهر ২. خفى অতএব যখন আমরা مُقْتَضَى الْحَالِ বলবো, তখন এ দু'প্রকার শামিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যখন আমরা مُقْتَضٰى ظَاهِرِ الْحَالِ বলবো তখন শুধুমাত্র এক প্রকার শামিল হবে। তাই مُقْتَضَى الْحَالِ হচ্ছে عام مطلق এবং مُقْتَضٰى ظَاهِرِ الْحَالِ হচ্ছে خاص مطلق।

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ : উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.) এখানে عكس শব্দটি দ্বারা عَكْس لُغَوِىْ উদ্দেশ্য করেছেন, মানতিকীদের عكس উদ্দেশ্য নয়। কেননা, عَكْس مَنْطِقِيْ এখানে অসম্ভব। যথা–بَعْضُ مُقْتَضَى الْحَالِ مُقْتَضٰى ظَاهِرِ الْحَالِ

সার-সংক্ষেপ : পূর্বে উল্লিখিত তিন অবস্থায় তিন ধরনের সংবাদের প্রথম প্রকারকে إِبْتِدَائِيْ দ্বিতীয় প্রকারকে طَلَبِيْ আর তৃতীয় প্রকারকে إِنْكَارِيْ বলা হয়। সংবাদ দানের ক্ষেত্রে যদি বাক্যেকে এ তিন প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলে তাকে إِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلٰى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ বলা হয়।

وَكَثِيْرًا مَّا يُخْرَجُ الْكَلَامُ عَلٰى خِلَافِهٖ اَىْ خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ فَيُجْعَلُ غَيْرُ السَّائِلِ كَالسَّائِلِ اِذَا قُدِّمَ اِلَيْهِ اَىْ اِلٰى غَيْرِ السَّائِلِ مَا يَلُوْحُ اَىْ مَا يُشِيْرُ لَهٗ اَىْ لِغَيْرِ السَّائِلِ بِالْخَبَرِ فَيَسْتَشْرِفُ غَيْرُ السَّائِلِ لَهٗ اَىْ لِلْخَبَرِ يَعْنِىْ يَنْظُرُ اِلَيْهِ يُقَالُ اِسْتَشْرَفَ الشَّىْءَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ يَنْظُرُ اِلَيْهِ وَيَبْسُطُ كَفَّهٗ فَوْقَ الْحَاجِبِ كَالْمُسْتَظِلِّ مِنَ الشَّمْسِ اِسْتِشْرَافَ الطَّالِبِ الْمُتَرَدِّدِ نَحْوُ وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىْ لَاتَدْعُنِىْ يَا نُوْحُ فِىْ شَانِ قَوْمِكَ وَاسْتِدْفَاعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ بِشَفَاعَتِكَ فَهٰذَا الْكَلَامُ يَلُوْحُ بِالْخَبَرِ تَلْوِيْحًا وَيُشْعِرُ بِاَنَّهٗ قَدْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ فَصَارَ الْمَقَامُ مَقَامَ اَنْ يَتَرَدَّدَ الْمُخَاطَبُ فِىْ اَنَّهُمْ هَلْ صَارُوْا مَحْكُوْمًا عَلَيْهِمْ بِالْاِغْرَاقِ اَمْ لَا فَقِيْلَ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ مُؤَكَّدًا اَىْ هُمْ مَحْكُوْمًا عَلَيْهِمْ بِالْاِغْرَاقِ ـ

অনুবাদ : **অনেক সময় মুকতাযায়ে যাহিরের বিপরীত বাক্য আনা হয়। সুতরাং** (সে মতে) **বাক্যের ব্যাপারে আগ্রহী নয় এমন ব্যক্তিকে আগ্রহীর স্থানে রাখা হয়** (এটা তখন করা হয়) যখন আগ্রহী নয় এমন ব্যক্তির সামনে তার খবরের ইঙ্গিতবহ কিছু প্রকাশ করা হয়। **ফলে অনাগ্রহী ব্যক্তি খবরের জন্য উদগ্রীব হয়** অর্থাৎ তার দিকে দৃষ্টিপাত করে। اِسْتَشْرَفَ الشَّىْءَ বলা হয় যখন কোনো ব্যক্তি তার মাথাকে উঁচু করে কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং তার হাত ভ্রূ-এর উপর বিছিয়ে দেয় সূর্যতাপ থেকে ছায়া গ্রহণকারীর ন্যায়- **সন্দেহ পোষণকারী আগ্রহী ব্যক্তির অপেক্ষার ন্যায়। যেমন- (হে নূহ) তুমি আমাকে ডেকো না অত্যাচারীদের ব্যাপারে।** অর্থাৎ হে নূহ! তোমার জাতি সম্পর্কে দোয়া করবে না এবং তাদের থেকে তোমার সুপারিশের মাধ্যমে আজাব দূর করার আহ্বান জানাবে না। এ বাক্যটি একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং দিক নির্দেশ করেছে এ ব্যাপারে যে, তাদের উপর আজাব অবধারিত হয়েছে। ফলে এ স্থানটি হয়ে গেছে শ্রোতার সন্দেহ করার স্থান যে, তাদের কি সলিল-সমাধি হবে নাকি হবে না? অতএব বলা হলো **নিশ্চয়ই তারা ডুববে,** তাদের সলিল-সমাধিস্থ হবে। বাক্যটি তাকিদযুক্ত করে অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে ডুবে মরার হুকুম করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَكَثِيْرًا مَّا يُخْرَجُ الخ : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে- শ্রোতার অবস্থানুপাতে তিনভাবে বাক্য উপস্থাপন করাকে اِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلٰى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ বলা হয়। উপরোল্লিখিত ইবারতে বলা হচ্ছে যে, কখনো শ্রোতার অবস্থানুপাতে বাক্য পেশ করা হলো না। অর্থাৎ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ -এর বিপরীত বাক্য পেশ করা হয়। যেমন- কোনো শ্রোতা বাক্যের হুকুম জানতে আগ্রহী নয় এবং হুকুমের ব্যাপারে সন্দিহানও নয়, এতদসত্ত্বেও তাকে হুকুমের ব্যাপারে আগ্রহী এবং সন্দিহান মনে করে তার সামনে এমন (তাকিদযুক্ত বাক্য) পেশ করা হয় যেমনটি করা হয় প্রকৃত সন্দিহান ব্যক্তির সামনে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন হুকুমের ব্যাপারে আগ্রহী নয় এমন ব্যক্তিকে আগ্রহীর স্থানে রাখা হয়? এর উত্তরে মূল লেখক বলেন- اِذَا قُدِّمَ اِلَيْهِ مَا يَلُوْحُ لَهٗ بِالْخَبَرِ فَيَسْتَشْرِفُ الخ অর্থাৎ যখন প্রকৃত সন্দেহ পোষণকারী নয় এমন ব্যক্তির সামনে সংবাদ বিষয়ক কোনো কিছু উল্লেখ করা হয় যা সংবাদের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে, তা শুনে জ্ঞানী ব্যক্তি মূল সংবাদের ব্যাপারে সন্দেহ করতে থাকে এবং সংবাদের প্রত্যাশায় উদগ্রীব হয়।

فَيَسْتَشْرِفُ শব্দটি إِسْتِشْرَافٌ মাসদার থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে– ভ্রূর উপর হাত রেখে কোনো কিছু অবলোকন করা। এখানে অপেক্ষায় থাকা বা উদগ্রীব হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু এখানে উদগ্রীব হওয়ার দ্বারা প্রকৃত উদগ্রীব হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে উদগ্রীবের মতো হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। এর উদাহরণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে লক্ষ্য করে বললেন– وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অর্থাৎ যারা জুলুম-অবিচার করেছে তাদের ব্যাপারে আমার সাথে কোনো কথা বলবে না। অর্থাৎ তাদের উপর আজাব অবধারিত হয়েছে, এ ব্যাপারে কোনো সুপারিশ করবে না। মোটকথা, এ বাক্যটিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির উপর কোনো আজাব আসছে। এরপর আল্লাহ বলেছেন– وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا (আমার তত্ত্বাবধানে নৌযান তৈরি করো) আল্লাহ তা'আলার এ কথাটি ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতিকে পানিতে ডুবিয়ে মারার শাস্তি দেওয়া হবে। এ দু'টি বাক্য শুনে হযরত নূহ (আ.)-এর মনে এ সন্দেহ সৃষ্টি হলো যে, আমার সম্প্রদায়ের পাপী লোকদের ডুবিয়ে মারার কথা বলা হলো? নাকি অন্যভাবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে? সুতরাং হযরত নূহ (আ.) যিনি কোনো সংবাদ শোনার প্রার্থী ছিলেন না, তাঁকে সংবাদ শোনার প্রার্থী এবং দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তির স্থানে রাখা হলো– সে মতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সামনে তাকিদযুক্ত বাক্য পেশ করলেন। আল্লাহ বললেন إِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ নিশ্চয় তারা ডুবে মরবে।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো خِلَافُ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ বাক্য ব্যবহার করা হয়। যেমন সাধারণ শ্রোতাকে প্রশ্নকারী এবং সংবাদে সন্দেহ পোষণকারীর স্থানে রাখা হয়। (আর এরূপ তখনই করা হয়, যখন শ্রোতার সামনে মূল সংবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় প্রথমে পেশ করা হয়) এবং তার সামনে সন্দিহান ব্যক্তির অনুরূপ সংবাদ পেশ করা হয়। যেমন, হযরত নূহ (আ.)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ নিশ্চয় তারা ডুবে মরবে। এখানে হযরত নূহ (আ.) তাঁর স্বজাতির উপর আজাব আসা সংক্রান্ত সংবাদের ব্যাপারে প্রশ্নকারী বা আগ্রহী ছিলেন না।

وَيُجْعَلُ غَيْرُ الْمُنْكِرِ كَالْمُنْكِرِ إِذَا لَاحَ اَىْ ظَهَرَ عَلَيْهِ اَىْ عَلٰى غَيْرِ الْمُنْكِرِ شَئٌ مِنْ اَمَارَاتِ الْاِنْكَارِ نَحْوُ قَوْلِ حَجْلِ بْنِ نَضْلَةَ **شِعْرٌ** جَاءَ شَقِيْقٌ اِسْمُ رَجُلٍ عَارِضًا رُمْحَهُ * اَىْ وَاضِعًا عَلَى الْعَرْضِ فَهُوَ لَايُنْكِرُ اَنَّ فِىْ بَنِىْ عَمِّهٖ رِمَاحًا لٰكِنَّ مَجِيْئَهٗ وَاضِعًا لِلرُّمْحِ عَلَى الْعَرْضِ مِنْ غَيْرِ اِلْتِفَاتٍ وَتَهَيُّؤٍ آمَارَةٌ اَنَّهٗ يَعْتَقِدُ اَنْ لَارُمْحَ فِيْهِمْ بَلْ كُلُّهُمْ عُزْلٌ لَا سِلَاحَ مَعَهُمْ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْمُنْكِرِ وَخُوْطِبَ خِطَابَ اِلْتِفَاتٍ بِقَوْلِهٖ اِنَّ بَنِىْ عَمِّكَ فِيْهِمْ رِمَاحٌ مُؤَكَّدًا بِاِنَّ وَفِى الْبَيْتِ عَلٰى مَا اَشَارَ اِلَيْهِ الْاِمَامُ الْمَرْزُوْقِىُّ تَهَكُّمٌ وَاِسْتِهْزَاءٌ كَاَنَّهٗ يَرْمِيْهِ بِاَنَّهٗ مِنَ الضُّعْفِ وَالْجُبْنِ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ اَنَّ فِيْهِمْ رِمَاحًا لَمَا اِلْتَفَتَ لِفْتَ الْكِفَاحِ وَلَمْ تَقْوِيَدُهٗ عَلٰى حَمْلِ الرِّمَاحِ عَلٰى طَرِيْقَةِ قَوْلِهٖ **شِعْرٌ** فَقُلْتُ لِمُحْرِزٍ لَمَّا الْتَقَيْنَا * تَنَكَّبْ لَا يُقَطِّرُكَ الزِّحَامُ * يَرْمِيْهِ بِاَنَّهٗ لَمْ يُبَاشِرِ الشَّدَائِدَ وَلَمْ يَدْفَعْ اِلٰى مَضَائِقِ الْمَجَامِعِ كَاَنَّهٗ يُخَافُ عَلَيْهِ اَنْ يُدَاسَ بِالْقَوَائِمِ كَمَا يُخَافُ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ لِقِلَّةِ غَنَائِهٖ وَضُعْفِ بَنَائِهٖ ـ

অনুবাদ : এবং (সংবাদ) **অস্বীকারকারী নয় এমন ব্যক্তিকে অস্বীকারকারীর স্থানে রাখা হয়, যখন** অস্বীকারকারী নয় **এমন ব্যক্তির নিকট অস্বীকারের কোনো নিদর্শন প্রকাশ পায়।** যেমন– কবি হাজ্‌ল ইবনে নাযলার **কবিতা চরণ : শাকীক** নামীয় এক ব্যক্তি **স্বীয় বর্শা আড়াআড়ি রেখে আগমন করল।** অর্থাৎ বর্শাটিকে (লম্বালম্বি না ধরে শত্রুপক্ষের সামনে) প্রস্থে ধরে রাখল। সে তার চাচার বংশের মধ্যে বর্শা থাকার বিষয়টি অস্বীকার করছে না বটে, কিন্তু বর্শাকে আড়াআড়িভাবে ধরে রেখে ভ্রূক্ষেপহীন এবং প্রস্তুতিবিহীন তার আগমনটাই ইঙ্গিত করে, সে তাদের মধ্যে কোনো বর্শা না থাকা বিশ্বাস করে; বরং (তার ধারণা) তারা সকলেই নিরস্ত্র, তাদের হাতে অস্ত্র নেই। সুতরাং তাকে অস্বীকারকারীর স্থানে রাখা হলো এবং তার প্রতি উপস্থিত ব্যক্তির সম্বোধন করা হলো (তারই উক্তি দ্বারা) **নিশ্চয়ই তোমার চাচার বংশে অনেক বর্শা রয়েছে** (তার এই বাক্যটিকে) (حَرْف اِنَّ مُشَبَّه بِالْفِعْل) দ্বারা তাকিদযুক্ত করা হয়েছে। ইমাম মারযূকীর মতানুসারে এ পঙ্‌ক্তিটিতে এক ধরনের বিদ্রূপ ও উপহাস রয়েছে। যেন কবি তার প্রতি শক্তিহীনতা এবং কাপুরুষত্বের ইঙ্গিত করেছেন যে, সে যদি জানত তাদের মধ্যে বর্শাদি আছে তবু যুদ্ধের মতো প্রস্তুতি নিত না এবং অস্ত্র ধারণে তার হাত মজবুত হতো না। এটি ঐ কবির উক্তির মতোই যিনি বলেছেন (কবিতার চরণ) আমি মুহরিজকে বললাম, যখন আমরা শত্রুর মুখোমুখি হবো, তুমি সরে দাঁড়াবে। যেন জনসমাগম তোমাকে পদপিষ্ট না করে। এখানে কবি তাচ্ছিল্যের সাথে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, সে কষ্ট-ক্লেশের মুখোমুখি হয়নি এবং যুদ্ধের বিভীষিকাময় অবস্থা সহ্য করেনি। তার ব্যাপারে পদপিষ্ট হওয়ার ভয় করা হচ্ছে, যেমনটি ভয় করা হয়ে থাকে শিশু ও মহিলাদের ব্যাপারে, তা‌দের সক্ষমতার স্বল্পতা এবং শারীরিক দুর্বলতার কারণে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَيُجْعَلُ غَيْرُ الْمُنْكِرِ الخ : পূর্বের আলোচনায় মুকতাযায়ে যাহিরের বিপরীত একটি অবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে। তা ছিল সংবাদের ব্যাপারে সন্দিহান নয় এমন ব্যক্তিকে সন্দিহানের স্থানে রেখে তার সামনে অনুরূপে বাক্য পেশ করা।

এখানে আরেকটি বিপরীত ব্যবহার দেখানো হচ্ছে– তা হলো বাক্যের হুকুম বা সংবাদ অস্বীকারকারী নয় এমন ব্যক্তিকে অস্বীকারকারীর স্থানে রেখে সে মতে বাক্য পেশ করা। এটা তখন করা হয় যখন অস্বীকারকারী নয় এমন ব্যক্তি থেকে অস্বীকারের কোনো আলামত পাওয়া যায়। একটি উদহারণ মূল লেখক হাজ্‌ল ইবনে নাদলার কবিতার একটি শে'র দ্বারা পেশ করেছেন:

হাজল ইবনে নাদলার পরিচয় :

কবির নাম আহমদ, তার উপাধি হাজ্‌ল, তার বংশ পরিক্রমা নিম্নে দেওয়া হলো أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ بْنِ مَعْنٍ তার মায়ের নাম নাদলাহ। কবি ছিলেন কবিতায় উল্লিখিত শাকীকের চাচার বংশের এক ব্যক্তি। কবিতাটি নিম্নরূপ–

جَاءَ شَقِيْقٌ عَارِضًا رُمْحَهُ * إِنَّ بَنِي عَمِّكَ فِيْهِمْ رِمَاحٌ

هَلْ أَحْدَثَ الدَّهْرُ لَنَا نَكْبَةً * أَمْ هَلْ رَقَتْ أُمُّ شَقِيْقٍ سِلَاحٌ

কবিতার প্রথম লাইনে শাকীক নামক এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে যুদ্ধের পোশাক পরে বর্শা আড়াআড়িভাবে ধরে আসছিল তার চাচাতো ভাইদের দিকে (চাচাতো ভাইদের সাথে তার বিরোধ ছিল তাই) তার এভাবে আগমন চাচাতো ভাইদের মাঝে যুদ্ধাস্ত্র না থাকার ইঙ্গিত বহন করে। (কারণ যদি তাদের মাঝে যুদ্ধাস্ত্র থাকার স্বীকৃতি তার থাকত তাহলে সে এভাবে আগমন করত না) তার এ অবস্থা দেখে কবি তাকিদের সাথে বলছেন, إِنَّ بَنِي عَمِّكَ فِيْهِمْ رِمَاحٌ "অবশ্যই তোমার চাচাতো ভাইদের কাছে অনেক বর্শা আছে।" উল্লিখিত কবিতায় শাকীক তার চাচাতো ভাইদের মাঝে যুদ্ধাস্ত্র থাকার প্রকৃত অস্বীকারকারী নয়। যদি প্রকৃত অস্বীকারকারী হতো, তাহলে তাকিদযুক্ত বাক্য ব্যবহার করা মুকতাযায়ে হালের বা যাহিরের মোতাবেক হতো। কিন্তু তার মাঝে অস্বীকারের নিদর্শন পরিলক্ষিত হওয়ায় এবং প্রকৃত অস্বীকারকারীর স্থানে রেখে সে অনুযায়ী বাক্য পেশ করার কারণে একে মুকতাযায়ে জাহিরের বিপরীত বলা হবে। কেননা, প্রকৃত অস্বীকারকারীর সামনে তাকিদযুক্ত বাক্য ব্যবহার করাকেই মুকতাযায়ে যাহিরের মোতাবেক বলা হয়।

কবিতার মর্মার্থ : মুসান্নিফ বলেন, উক্ত কবিতায় শাকীক নামক ব্যক্তিকে কবি উপহাস ও বিদ্রূপ করেছেন।

তিনি বলতে চাচ্ছেন শাকীক একজন ভীরু-কাপুরুষ। সে তার চাচাতো ভাইদের দিকে এ কারণে রওয়ানা হয়েছে যে, সে মনে করেছে তাদের কাছে যুদ্ধাস্ত্র নেই। অর্থাৎ তাদের নিরস্ত্র মনে করার কারণে তাদের দিকে সে রওয়ানা হয়েছে। সে যদি জানত তারা অস্ত্রধারী তাহলে সে কিছুতেই তাদের অভিমুখে রওয়ানা করত না এবং বর্শা নিতে সাহস করত না। মুসান্নিফ বলেন, কবিতাটিতে এমনি বিদ্রূপ করা হয়েছে যেমন বিদ্রূপ করেছিলেন আবূ ছুমামা বারা ইবনে আযেব আল-আনসারী। তিনি বনূ যাব্বাহ-এর মুহরিয নামক এক ব্যক্তির সাথে বিদ্রূপ করেছিলেন। আবূ ছুমামা বলেন–

فَقُلْتُ لِمُحْرِزٍ لَمَّا الْتَقَيْنَا * تَنَكَّبْ لَا يُقَطِّرَكَ الزِّحَامُ

অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হলাম তখন মুহরিযকে বললাম, তুমি সরে দাঁড়াও, নয়তো তোমাকে লোকসমাগম অর্থাৎ যোদ্ধারা পায়ে পিষে ফেলবে। কবি বলতে চাচ্ছেন যে, মুহরিয কষ্ট-ক্লেশে পরীক্ষিত নয়, সে যুদ্ধের ময়দানের কঠিন অবস্থা সহ্য করেনি। তাই তার উচিত যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে অর্থাৎ নিজগৃহে অবস্থান করা। অন্যথায় সে মহিলা ও শিশুদের মতো যুদ্ধের ময়দানে পদপিষ্ট হতে পারে।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো সংবাদ অস্বীকারকারী নয় এমন ব্যক্তিকে সংবাদ অস্বীকারকারীর স্থানে রাখা হয় (উক্ত ব্যক্তি থেকে অস্বীকারের আলামত প্রকাশ হওয়ার কারণে)। এরপর তার সামনে অস্বীকারকারী হিসেবে خَبَرِ إِنْكَارِيْ পেশ করা হয়, যেমন–

جَاءَ شَقِيْقٌ عَارِضًا رُمْحَهُ * إِنَّ بَنِي عَمِّكَ فِيْهِمْ رِمَاحٌ

وَ يُجْعَلُ الْمُنْكِرُ كَغَيْرِ الْمُنْكِرِ اِذَا كَانَ مَعَهُ اَىْ مَعَ الْمُنْكِرِ مَا اِنْ تَأَمَّلَهُ اَىْ شَىْءٌ مِنَ الدَّلَائِلِ وَالشَّوَاهِدِ اِنْ تَأَمَّلَ الْمُنْكِرُ ذٰلِكَ الشَّىْءَ اِرْتَدَعَ عَنْ اِنْكَارِهِ وَمَعْنٰى كَوْنِهِ مَعَهُ اَنْ يَكُوْنَ مَعْلُوْمًا لَهُ مُشَاهَدًا عِنْدَهُ كَمَا تَقُوْلُ لِمُنْكِرِ الْاِسْلَامِ اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ مِنْ غَيْرِ تَاكِيْدٍ لِاَنَّ مَعَ ذٰلِكَ الْمُنْكِرِ دَلَائِلَ دَالَّةٌ عَلٰى حَقِّيَّةِ الْاِسْلَامِ وَقِيْلَ مَعْنٰى كَوْنِهِ مَعَهُ اَنْ يَكُوْنَ مَوْجُوْدًا فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ مُجَرَّدَ وُجُوْدِهِ لَايَكْفِىْ فِى الْاِرْتِدَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا عِنْدَهُ وَقِيْلَ مَعْنٰى مَا اِنْ تَأَمَّلَهُ شَىْءٌ مِنَ الْعَقْلِ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ الْمُنَاسِبَ حِيْنَئِذٍ اَنْ يُقَالَ مَا اِنْ تَأَمَّلَ بِهِ لِاَنَّهُ لَايَتَأَمَّلُ الْعَقْلَ بَلْ يَتَأَمَّلُ بِهِ ـ

অনুবাদ : **এবং অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর মতো করা হয়। যখন অস্বীকারকারীর সাথে এমন প্রমাণাদি ও প্রত্যক্ষ দলিল থাকে, যাতে সে যদি দলিল চিন্তা-ভাবনা করে** অর্থাৎ অস্বীকারকারী যদি তাতে চিন্তা করে, তাহলে সে তার অস্বীকার থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। 'তার সাথে' এ কথার অর্থ হলো, তার জ্ঞানে থাকে এবং তার কাছে প্রত্যক্ষ হয়। যেমন– তুমি ইসলাম ধর্ম অস্বীকারকারীকে বললে 'ইসলাম সত্য' তাকিদ ছাড়া। কেননা, সেই অস্বীকারকারীর সাথে এমন প্রমাণাদি আছে, যা ইসলামের সত্যতার প্রতি দিকনির্দেশ করে। বলা হয়ে থাকে 'তার সাথে' এ কথার অর্থ হলো– বাস্তবে এর প্রমাণ আছে; কিন্তু এ মতটি আপত্তির ঊর্ধ্বে নয়। কারণ, বাস্তবে কোনো প্রমাণ থাকাটা মানুষকে অস্বীকার থেকে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করে না, যে পর্যন্ত না দলিল-প্রমাণ তার কাছে অর্জিত থাকে, কেউ কেউ বলেন, مَا اِنْ تَأَمَّلَهُ-এর অর্থ আকল বা জ্ঞান। (মুসান্নিফ (র.) বলেন,) এ মতটিতে আপত্তি রয়েছে। কেননা, এমতাবস্থায় مَا اِنْ تَأَمَّلَ بِهِ বলা সমীচীন হতো। কারণ, আকল-এর মধ্যে চিন্তা করা হয় না; বরং আকলের সাহায্যে চিন্তা করা হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَيُجْعَلُ الْمُنْكِرُ كَغَيْرِ الْمُنْكِرِ الخ : উপরোক্ত ইবারতে লেখক মুকতাযায়ে যাহিরের বিপরীত আরেকটি সুরত নিয়ে আলোচনা করেছেন। সুরতটি এই যে, কখনো অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখা হয় এবং সে মোতাবেক তার সামনে বাক্য পেশ করা হয়। অর্থাৎ অস্বীকারকারী ব্যক্তিকে অনস্বীকারকারী বা সাধারণ মানুষ মনে করা হয় এবং তার সামনে তাকিদমুক্ত সাধারণ বর্ণনামূলক বাক্য পেশ করা হয়। এরূপ বাক্য পেশ করা মুকতাযায়ে যাহিরের বিপরীত কাজ। কারণ, অস্বীকারকারী হিসেবে তার সামনে তাকিদযুক্ত বাক্য পেশ করা মুকতাযায়ে যাহিরের দাবি। কিন্তু যেহেতু অস্বীকারকারীকে এখানে অস্বীকারকারী ধরা হয়নি, তাই তাকিদমুক্ত সাধারণ বাক্য তার সামনে পেশ করা হচ্ছে।

এ পর্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্ন আসবে যে, অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর পর্যায়ে কখন ধরা যাবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে মূল লেখক বলেন, اِذَا كَانَ مَعَهُ مَا اِنْ تَأَمَّلَهُ অর্থাৎ যখন অস্বীকারকারীর সাথে এমন দলিল-প্রমাণ থাকে যাতে সে চিন্তা-ভাবনা করলে তার অস্বীকৃতি দূর হয়ে যায়, তখন তাকে অনস্বীকার কারীর পর্যায়ে ধরা হবে।

উল্লেখ্য যে, اِذَا كَانَ مَعَهُ مَا-এর মধ্যে "مَا"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য দলিল-প্রমাণ। আর "ه" সর্বনামের مَرْجِعْ হলো অস্বীকারকারী। এ হিসেবে বাক্যের অর্থ হচ্ছে যখন অস্বীকারকারীর কাছে দলিল-প্রমাণ থাকে। কেননা, যদি সে এতে চিন্তা করে তাহলে অস্বীকার থেকে ফিরে আসবে। মুসান্নিফের মতে, অস্বীকারকারীর কাছে দলিল-প্রমাণ থাকার অর্থ হচ্ছে দলিল তার জানা থাকে। যেমন ইসলাম অস্বীকারকারীর সামনে বলা হলো ইসলাম সত্য বা "اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ" অর্থাৎ শ্রোতার কাছে ইসলামের সত্যতার দলিল থাকার কারণে অস্বীকারকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকিদবিহীন বাক্য পেশ করা হলো মুকতাযায়ে যাহিরের বিপরীত বাক্য করার নীতি অনুযায়ী।

قَوْلُهٗ وَقِيْلَ مَعْنٰى كَوْنِهٖ مَعَهٗ اَنْ يَكُوْنَ : এ বাক্য দ্বারা লেখক কতিপয় লোকদের মতামত উল্লেখ করেছেন। কতিপয় লোক মনে করেন, অস্বীকারকারীর কাছে দলিল-প্রমাণ থাকার অর্থ হচ্ছে দলিল-প্রমাণ বাস্তবে থাকা, যদিও তা অস্বীকারকারীর জানা না থাকে। তাদের মতে, দলিল-প্রমাণ থাকার অর্থ অস্বীকারকারীর জানা থাকা নয়। তাদের মতের বিপক্ষে মুসান্নিফ (র.) বলেন, فِيْهِ نَظَرٌ। অর্থাৎ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, যদি দলিল-প্রমাণ বাস্তবে থাকে, কিন্তু অস্বীকারকারীর জানা না থাকে, তাহলে অস্বীকারকারী তার অস্বীকার থেকে ফিরে আসবে না। অস্বীকারকারীর অস্বীকার থেকে ফিরে আসার জন্য অবশ্যই দলিল-প্রমাণ জানতে ও বুঝতে হবে। সে যখন দলিল-প্রমাণগুলো সম্পর্কে জানবে তখনই তো তার অবস্থান থেকে ফিরে আসার কথা ভাববে।

কেউ কেউ অবশ্য তাদের উপর আরোপিত উক্ত প্রশ্নের জবাব দেন এই বলে যে, মুসান্নিফ (র.) যে مَا اِنْ تَاَمَّلَهٗ বলেছেন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে– এমন দলিল-প্রমাণ যাতে চিন্তা-ভাবনা করা সম্ভব, বাস্তবিক চিন্তা-ভাবনা উদ্দেশ্য নয়। এ মতে যেসব প্রমাণাদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান তা বর্তমানে জানা না থাকলেও এতে চিন্তা-ভাবনা করাও এক পর্যায়ে সম্ভব। তৎক্ষণাৎ চিন্তা-ভাবনার জন্য অবশ্য দলিল জানা থাকা প্রয়োজন।

মোটকথা, অস্বীকারকারীকে অস্বীকারকারীর স্থানে রাখার জন্য মূল লেখকের মতে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য দলিল জানা প্রয়োজন। আর ভিন্নমত পোষণকারীদের মতে দলিলের বিদ্যমান হওয়াটা জরুরি, যদিও বা তার জানা না থাকে।

قَوْلُهٗ قِيْلَ مَعْنٰى مَا اِنْ تَاَمَّلَهٗ شَيْءٌ مِنَ الْعَقْلِ : মুসান্নিফ এ বাক্যটি দ্বারা মূল লেখকের ইবারতে তার ব্যাখ্যার বিপরীত আরেকটি ভিন্নমত উল্লেখ করে তার জবাব দিচ্ছেন। ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, مَا اِنْ تَاَمَّلَهٗ-এর ما এবং "ه" সর্বনামের مرجع হলো দলিল-প্রমাণ। সে মতে আমরা এ বাক্যের অর্থ করেছি, তার জানা এমন প্রমাণাদি রয়েছে, যাতে সে চিন্তা করলে অস্বীকার থেকে ফিরে আসবে; কিন্তু ভিন্নমত পোষণকারী বলেন, ما এবং "ه"-এর مرجع হলো عقل বা জ্ঞান। তার ব্যাখ্যা মতে ইবারতের অর্থ হবে এরূপ– যখন অস্বীকারকারীর কাছে আকল বা জ্ঞান থাকে, সে তাতে চিন্তা করলে তার থেকে ফিরে আসবে। অর্থাৎ আকলের মধ্যে চিন্তা করলে ফিরে আসবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, যদি 'ما'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য আকল হতো, তাহলে মূল লেখক مَا اِنْ تَاَمَّلَهٗ বলতেন না; বরং مَا اِنْ تَاَمَّلَ بِهٖ বলতেন। কারণ, মানুষ আকলের মধ্যে চিন্তা করে না; বরং আকলের বা জ্ঞানের সাহায্যে চিন্তা করে।

نَحْوُ لَارَيْبَ فِيْهِ ظَاهِرُ هٰذَا الْكَلَامِ اَنَّهُ مِثَالٌ لِجَعْلِ مُنْكِرِ الْحُكْمِ كَغَيْرِهٖ وَتَرْكِ التَّاكِيْدِ لِذٰلِكَ وَبَيَانُهُ اَنَّ مَعْنٰى لَا رَيْبَ فِيْهِ لَيْسَ الْقُرْاٰنُ بِمَظَنَّةٍ لِلرَّيْبِ وَلَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَرْتَابَ فِيْهِ وَهٰذَا الْحُكْمُ مِمَّا يُنْكِرُهُ كَثِيْرٌ مِنَ الْمُخَاطَبِيْنَ لٰكِنْ نُزِّلَ اِنْكَارُهُمْ مَنْزِلَةَ عَدَمِهٖ لِمَا مَعَهُمْ مِنَ الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلٰى اَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَنْبَغِيْ اَنْ يَرْتَابَ فِيْهِ وَالْاَحْسَنُ اَنْ يُقَالَ اِنَّهُ نَظِيْرٌ لِتَنْزِيْلِ وُجُوْدِ الشَّيْءِ مَنْزِلَةَ عَدَمِهٖ بِنَاءً عَلٰى وُجُوْدِ مَا يُزِيْلُهُ فَاِنَّهُ نُزِّلَ رَيْبُ الْمُرْتَابِيْنَ مَنْزِلَةَ عَدَمِهٖ تَعْوِيْلًا عَلٰى مَا يُزِيْلُهُ حَتّٰى نُفِيَ الرَّيْبُ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِغْرَاقِ كَمَا نُزِّلَ الْاِنْكَارُ مَنْزِلَةَ عَدَمِهٖ لِذٰلِكَ حَتّٰى صَحَّ تَرْكُ التَّاكِيْدِ ـ

অনুবাদ : **যেমন– لَارَيْبَ فِيْهِ (এতে কোনো সন্দেহ নেই)**। এ বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা প্রমাণ করে, এটি হুকুমের অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর মতো করার উদাহরণ। এ কারণেই তাকিদ পরিহার করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, কুরআন সন্দেহের স্থানই নয় এবং এতে সন্দেহ করা উচিত নয়। এ হুকুমটি অনেক সম্বোধিত ব্যক্তিই অস্বীকার করে। কিন্তু তাদের সে অস্বীকারকে অনস্বীকারের স্থানে রাখা হয়েছে। এ কারণে যে, তাদের সাথে এমন প্রমাণাদি রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, তাতে সন্দেহ করা সমীচীন নয়। তবে সর্বোত্তম কথা হলো, এটি কোনো অস্তিত্বশীল জিনিসকে অনস্তিত্বের স্থানে রাখার উদাহরণ, ঐ দলিল প্রমাণের উপস্থিতির কারণে, যা সে অস্তিত্বকে দূর করে দেয়। নিশ্চয় (এখানে) সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহকে রাখা হয়েছে সন্দেহহীনতার স্থানে সন্দেহ দূরকারী দলিলের (উপস্থিতির) ভিত্তিতে, এমনকি সন্দেহকে পরিপূর্ণভাবে তিরোহিত করা হয়েছে, যেমন– একই কারণে অস্বীকারকে অনস্বীকারের স্থানে রাখা হয়েছে। যার ফলে তাকিদকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ نَحْوُ لَارَيْبَ فِيْهِ الخ : ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, হুকুমের অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারীর স্থানে রাখা হয়– এখানে এরই একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ হলো لَارَيْبَ فِيْهِ অর্থ কুরআনে কোনো সন্দেহ– দ্বিধা নেই। মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখকের ইবারত দ্বারা বাহ্যত মনে হচ্ছে, এটি হুকুমের অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখার উদাহরণ نظير নয়।

مِثَال এবং نَظِيْر-এর মাঝে পার্থক্য :

مثال তার مُمَثَّل لَهٗ-এর افراد-এর মধ্যে গণ্য হয়; কিন্তু نظير তার مُمَثَّل لَهٗ-এর افراد এর মধ্যে গণ্য হয় না। মুসান্নিফ এটিকে مثال বলার কারণ হচ্ছে মূল লেখক ইতঃপূর্বে যে নিয়মটির কথা আলোচনা করেছেন অর্থাৎ হুকুমের অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখা, এর পর পরই نحو-এর মধ্যে সে উক্ত উদাহরণটি এনেছেন। এভাবেই উদাহরণ বা مثال আনা হয়। আর তা ছাড়া نحو দ্বারাও مثال বর্ণনা করা হয়, نظير বর্ণনা করা হয় না। অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখার কারণে তাকিদকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় মুকতাযায়ে যাহির অনুসারে এখানে তাকিদ আনার দরকার ছিল, তখন বাক্যটি হতো– اِنَّهُ لَارَيْبَ فِيْهِ।

قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ مَعْنٰى لَا رَيْبَ فِيْهِ لَيْسَ الْقُرْاٰنُ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখা'-এর উদাহরণ হওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, কুরআন সন্দেহ করার স্থান নয় এবং তাতে কোনো ধরনের সংশয়-দ্বিধা করা সমীচীন নয়, এটাই বাস্তব অবস্থা। কিন্তু তারপরেও এটিকে অনেকে অস্বীকার করে, তাই এ বাক্যটি তাকিদযুক্ত করে ব্যবহার করা উচিত ছিল। কেননা, তাদের কাছে কুরআনকে বিশ্বাস করার মতো প্রচুর প্রমাণ

রয়েছে। যেগুলোর উপর চিন্তা করলে তারা অস্বীকার থেকে ফিরে আসবে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে তাকিদ ছাড়া বাক্য পেশ করেছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মুসান্নিফ لَارَيْبَ فِيْهِ -এর প্রকৃত অর্থ– "এতে কোনো সন্দেহ নেই" না নিয়ে এর মধ্যে কেন تاويل করলেন এবং বললেন যে, এটি সন্দেহ করার স্থান নয়। এর জবাব হলো– বাক্যের প্রকৃত অর্থের উপর যদি আমরা বাক্যটি ব্যবহার করি, তাহলে এ অর্থ বাস্তবসম্মত হয় না। কেননা, আসলে কুরআনের মধ্যে অনেক সন্দেহকারীর সন্দেহ রয়েছে। তখন অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখার বিষয়টি হয় না। কেননা, তখন আয়াত দ্বারা অস্বীকারকারী আছে তাই প্রমাণিত হয় না। কারণ, বাহ্যত আয়াতে তো ريب-কে সম্পূর্ণ রূপে استغراق-এর ভিত্তিতে নফী করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا الْحُكْمُ مِمَّا يُنْكِرُهُ كَثِيْرٌ مِنَ الخ : এ বাক্যে هٰذَا الْحُكْمُ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন مَظَنَّةُ الرَّيْبِ না হওয়া।

قَوْلُهُ وَالْاَحْسَنُ اَنْ يُقَالَ اِنَّهُ نَظِيْرٌ لِتَنْزِيْلِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটিকে تَنْزِيْلُ وُجُوْدِ شَيْئٍ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِهِ -এর نظير বলাটাই শ্রেয়, অর্থাৎ لَارَيْبَ فِيْهِ-কে مثال না বলে نظير বলা শ্রেয়। তাহলে এমনভাবে বলার দরকার ছিল لاريب فيهহলো কোনো বিদ্যমান বিষয়কে অবিদ্যমান বিষয়ের স্থানে রাখার نظير, এ কারণে যে, এতে উক্ত অস্তিত্বকে দূরকারী দলিল রয়েছে। এখানে সন্দেহকারীদের সন্দেহকে সন্দেহ না হওয়ার স্থানে রাখা হয়েছে, এ ভিত্তিতে যে, কুরআনে এমন দলিল আছে, যা তাদের সন্দেহকে দূর করে দেয়। দলিলসমূহ এতটা শক্তিশালী যে, তাদের সন্দেহকে সম্পূর্ণ রূপে মুছে দেয়। এমনকি তা অনস্তিত্বের পর্যায়ে চলে যায়। তাই তো কুরআনে তাদের ريب বা সন্দেহকে استغراق বা পরিপূর্ণ রূপে খণ্ডন করা হয়েছে।

মোটকথা, এটিকে نظير বলা হলে ريب-কে সম্পূর্ণভাবে না-সূচক করা হয়। কিন্তু مثال বলা হলে এটি ريب-কে নফী করে না; বরং কুরআন مَحَلَّ رَيْبٍ হওয়াকে নফী করা হয়। আর আমাদের এখানে ريب-কে পরিপূর্ণভাবে নফী করা হচ্ছে উদ্দেশ্য।

উক্ত ব্যাখ্যার উপর আপত্তি হয় এই বলে যে, এটিকে نظير বলা উচিত নয়, কারণ نظير তার مُمَثَّلٌ لَهٗ-এর افراد-এর বাইরে হয়, مُمَثَّلٌ لَهٗ-এর افراد-এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। অর্থাৎ অস্বীকারকারীদের সন্দেহকে সন্দেহহীনতার স্থানে রাখা وجود شيئ-কে عدم شيئ-এর স্থানে রাখার একটি فرد বা অন্তর্গত বিষয়। এটি مثال-এর বৈশিষ্ট্য। অতএব, এটি نظير হয়নি; বরং مثال-ই রয়ে গেছে।

সবচেয়ে উত্তম হতো– এটি অস্বীকারকে অনস্বীকারের স্থানে রাখার نظير বলে দেওয়া। কেননা, সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহকে অসন্দেহের স্থানে রাখা অস্বীকারকে অনস্বীকারের স্থানে রাখার افراد-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এ نظير হবে, مثال হবে না। এর জবাব এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, মুসান্নিফের ইবারতের মধ্যে সামান্য অংশ উহ্য আছে। তার ইবারতটি এরূপ হবে– اِنَّهُ نَظِيْرٌ لِتَنْزِيْلِ الْاِنْكَارِ مَنْزِلَةَ عَدَمِهِ لِاَجْلِ وُجُوْدِ الشَّيْئِ مَنْزِلَةَ عَدَمِهِ অর্থাৎ সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহকে সন্দেহ না হওয়ার স্থানে রাখা অস্তিত্বশীল বিষয়কে অনস্তিত্বশীল বিষয়ের স্থানে রাখার কারণে এটি অস্বীকারকে অনস্বীকার -এর স্থানে রাখার نظير। এটিকে نظير বলা এ কারণে উত্তম যে, এ অবস্থায় কাউকে শ্রোতা না বানিয়েই ريب-কে সম্পূর্ণভাবে না-সূচক করা সম্ভব। অর্থাৎ কুরআনের মধ্যে কোনো সংশয়-সন্দেহ নেই। এ কারণেই কুরআনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। আর যদি এটিকে (مثال) উদাহরণ বলা হয়, তখন অস্বীকারকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে কুরআনকে সন্দেহের স্থান হওয়াকে না-সূচক করা হবে। তখন অর্থ হবে, কুরআন সন্দেহের স্থান নয়, তাই এতে সন্দেহ করা অনুচিত। আর এটাতো সম্ভব যে, একটি বিষয় সন্দেহের স্থান নয়, তাই এতে সন্দেহ করা উচিত নয়। এতদ্সত্ত্বেও এতে সন্দেহকারীদের সন্দেহ রয়েছে।

মোটকথা, نظير বলার ক্ষেত্রে এতে নফীর অর্থ পরিপূর্ণ; কিন্তু مثال বলার ক্ষেত্রে ততটা নয়। তাই نظير বলাটাই শ্রেয়।

সার-সংক্ষেপ : কখনো সংবাদ অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখা হয় এবং সে মতে তার সামনে তাকিদমুক্ত সংবাদ দেওয়া হয়। আর এটা তখনই করা হয় যখন অস্বীকারকারীর আয়ত্তে এমন প্রমাণাদি থাকে, যাতে চিন্তা করলে সে অস্বীকার থেকে ফিরে আসতে পারে। যেমন لَارَيْبَ فِيْهِ (কুরআনে কোনো সন্দেহ নেই)। এ আয়াত ঐসব ব্যক্তিদের সামনে পেশ করা হচ্ছে, যারা এটাকে (অর্থাৎ কুরআনে সন্দেহ না থাকাকে) অস্বীকার করে। যেহেতু তাদের সামনে অস্বীকার দূর হওয়ার দলিল আছে তাই তাদের সামনে তাকিদমুক্ত বাক্য পেশ করা হয়েছে। কারো কারো মতে, এটা অস্তিত্ববান বস্তুকে অস্তিত্বহীনের স্থানে রাখার উদাহরণ হলে ভালো হতো।

وَهٰكَذَا اَىْ مِثْلُ اِعْتِبَارَاتِ الْاِثْبَاتِ اِعْتِبَارَاتُ النَّفْيِ مِنَ التَّجْرِيْدِ عَنِ الْمُؤَكِّدَاتِ فِى الْاِبْتِدَائِىْ وَتَقْوِيَتِهٖ بِمُؤَكِّدٍ اِسْتِحْسَانًا فِى الطَّلَبِىْ وَ وُجُوْبِ التَّاكِيْدِ بِحَسْبِ الْاِنْكَارِ فِى الْاِنْكَارِىْ تَقُوْلُ لِخَالِى الذِّهْنِ مَا زَيْدٌ قَائِمًا اَوْ لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا وَلِلطَّالِبِ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ وَلِلْمُنْكِرِ وَاللّٰهِ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **এমন করে** অর্থাৎ ইতিবাচক দিকগুলোর মতো **নেতিবাচকের দিকগুলো** অর্থাৎ প্রাথমিক বাক্য তাকিদযুক্ত হওয়া থেকে তালাবী বাক্য তাকিদ দ্বারা শক্তিশালী হওয়া উত্তম এবং ইনকারী বাক্যে অস্বীকারের মাত্রানুপাতে তাকিদ আবশ্যক হওয়া। অতএব, আপনি সংবাদ সম্পর্কে ধারণাহীন ব্যক্তিকে বলবেন مَا زَيْدٌ قَائِمًا অথবা لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দণ্ডায়মান নয়)। সংবাদপ্রত্যাশী ব্যক্তিকে বলবেন مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ (নিশ্চয় যায়েদ দন্ডায়মান নয়) এবং সংবাদ অস্বীকারকারীকে বলবেন وَاللّٰهِ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ (আল্লাহর শপথ অবশ্যই যায়েদ দণ্ডায়মান নয়)। এরই উপরে অন্যান্য উদাহরণ অনুমেয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَهٰكَذَا اَىْ مِثْلُ الخ : লেখক বলেন, শ্রোতার অবস্থানুপাতে বাক্যের বিভিন্ন অবস্থা যথা ইবতেদায়ী, তালাবী, ইনকারী যেমনটি اثبات বা ইতিবাচকের মধ্যে হয়েছে, তেমনি نفى বা নেতিবাচকের মধ্যেও হবে। সুতরাং ১. শ্রোতারা যদি সংবাদ বা বাক্যের হুকুম সম্পর্কে অনবহিত হয় তাহলে বাক্যটি হবে তাকিদমুক্ত, যেমন- مَازَيْدٌ قَائِمًا لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا ২. শ্রোতা যদি সংবাদ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী হয়, তাহলে বাক্যটিকে কিছুটা তাকিদযুক্ত করে পেশ করা উত্তম । যথা- لَيْسَ زَيْدٌ بِقَائِمٍ ৩. শ্রোতা যদি সংবাদকে অস্বীকার করে, তাহলে তার অস্বীকারের মাত্রানুপাতে বাক্যটিকে তাকিদযুক্ত করা অত্যাবশ্যকীয়। যথা- وَاللّٰهِ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ

সার-সংক্ষেপ :

ইতিবাচক ক্ষেত্রে শ্রোতার অবস্থানুপাতে যেমন বাক্য তিন ধরনের হয়ে থাকে তদ্রূপ নেতিবাচক ক্ষেত্রেও বাক্য তিন ধরনের হবে। অর্থাৎ اِبْتِدَائِىْ, طَلَبِىْ ও اِنْكَارِىْ।

ثُمَّ الْإِسْنَادُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ اِنْشَائِيًّا اَوْ اِخْبَارِيًّا مِنْهُ حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ وَلَمْ يَقُلْ اِمَّا حَقِيْقَةٌ وَاِمَّا مَجَازٌ لِاَنَّ بَعْضَ الْإِسْنَادِ عِنْدَهُ لَيْسَ بِحَقِيْقَةٍ وَلَا مَجَازٍ كَقَوْلِنَا اَلْحَيَوَانُ جِسْمٌ وَالْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ وَجَعَلَ الْحَقِيْقَةَ وَالْمَجَازَ صِفَةَ الْإِسْنَادِ دُوْنَ الْكَلَامِ لِاَنَّ اِتِّصَافَ الْكَلَامِ بِهِمَا اِنَّمَا هُوَ بِاِعْتِبَارِ الْإِسْنَادِ وَاَوْرَدَهُمَا فِىْ عِلْمِ الْمَعَانِىْ لِاَنَّهُمَا مِنْ اَحْوَالِ اللَّفْظِ فَيَدْخُلَانِ فِىْ عِلْمِ الْمَعَانِىْ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **অতঃপর সাধারণ ইসনাদ** চাই ইনশায়ী হোক অথবা বর্ণনামূলক হোক। **এর কতকগুলো** حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ হয়েছে। মূল লেখক اِمَّا حَقِيْقَةٌ (হয়তো প্রকৃতার্থে) وَاِمَّا مَجَازٌ (অথবা মাজায) বলেননি। কেননা, তার মতে এমন কতিপয় ইসনাদ রয়েছে, যা হাকীকত নয় এবং মাজাযও নয়। যেমন, আমাদের উক্তি– اَلْحَيَوَانُ جِسْمٌ (প্রাণীকুল দেহধারী) এবং اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ (মানুষ প্রাণী)।

মূল লেখক হাকীকত এবং মাজাযকে ইসনাদের বিশেষণ করেছেন, কালামের বিশেষণ করেননি। কেননা, কালামের এ দু'টির সাথে সম্পর্ক ইসনাদের ভিত্তিতে। এ দু'টিকে ইলমুল মা'আনীর (আলোচনা)-এর মধ্যে এনেছেন। কেননা, এ দু'টি শব্দের অবস্থার অন্তর্গত। সুতরাং এগুলো ইলমুল মা'আনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ ثُمَّ الْإِسْنَادُ مُطْلَقًا الخ : মূল লেখক বলেন, মুতলাক বা সাধারণ ইসনাদ ইনশায়ী হোক অথবা খবরী হোক, দু' প্রকার–১. حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ ২. مَجَاز عَقْلِى ।

এখানে ইসনাদ দ্বারা শুধুমাত্র বর্ণনামূলক বাক্যের ইসনাদ নয়; বরং তার ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য মুসান্নিফ سَوَاءٌ كَانَ اِنْشَائِيًّا اَوْ خَبَرِيًّا বলেছেন।

এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য মূল লেখক ইসনাদকে اِسْم ظَاهِر হিসেবে এনেছেন। কেননা, ضمير ব্যবহার করা হলে اِسْنَاد خَبَرِى-এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করত। তবে ইসনাদ ব্যাপক হলেও মুসান্নিফ-এর انشائيا এবং خبريا-এর দ্বারা اسناد-এর ব্যাখ্যা করার কারণে এখানে শুধুমাত্র ইসনাদে তামই বুঝা যায়। অথচ হাকীকত ও মাজায শুধুমাত্র اسناد تام-এর সাথেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইসনাদে নাকেস তথা মাসদারের ক্ষেত্রেও হাকীকত ও মাজায হয়ে থাকে। যেমন– اَعْجَبَنِىْ ضَرْبُ زَيْدٍ وَجَرْىُ النَّهَارِ

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, এখানে اِسْنَاد نَاقِص ও শামিল হবে। অতএব, خبريا এবং انشائيا দ্বারা এখানে তাই উদ্দেশ্য, যা জুমলায়ে খবরিয়্যাহ এবং ইনশাইয়্যাহ-এর মধ্যে হয়। চাই সেটা ইসনাদে তাম হোক অথবা নাকেস হোক। যেহেতু مُرَكَّب نَاقِص জুমলার মাঝে হয়, তাই উপরোক্ত আপত্তি প্রযোজ্য নয়।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَقُلْ اِمَّا حَقِيْقَةٌ وَاِمَّا مَجَازٌ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, ইসনাদ যখন দু' প্রকার তখন মূল লেখক اِمَّا حَقِيْقَةٌ এবং اِمَّا مَجَازٌ বলতেন, তাহলে ইসনাদ এ প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যেত।

এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখক اِمَّا حَقِيْقَةٌ وَاِمَّا مَجَازٌ এরূপ বলেননি, কারণ মূল লেখকের কাছে ইসনাদ হাকীকত এবং মাজায এ দু' প্রকারেই সীমাবদ্ধ নয়। তার মতে ইসনাদের আরেকটি প্রকার আছে, যা হাকীকতও নয় এবং মাজাযও নয়। যেমন– اَلْحَيَوَانُ جِسْمٌ ، اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ এ দু'টি উদাহরণ এবং যে সকল উদাহরণে মুসনাদ فعل অথবা

مَعْنَى فِعْل হয় না। তাই তিনি إِمَّا حَقِيْقَةٌ، إِمَّا مَجَازٌ বলেননি। কারণ, সেভাবে বললে ইসনাদ এ দু'প্রকারে সীমাবদ্ধ হয়ে যেত এবং উল্লিখিত উদাহরণদ্বয় সহ অন্যান্য مثال যার মধ্যে মুসনাদ فعل অথবা مَعْنَى فِعْل হয়নি, সেগুলোর সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যেত না।

আল্লামা সাক্কাকীর মতে ইসনাদ উপরের দু' প্রকারেই সীমাবদ্ধ।

قَوْلُهُ وَجَعَلَ الْحَقِيْقَةَ وَالْمَجَازَ صِفَةَ الْإِسْنَادِ : মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখক حقيقة এবং مجاز-কে ইসনাদের সিফাত বা বিশেষণ বলেছেন। (এখানে সিফাত দ্বারা অর্থগত সিফাত উদ্দেশ্য, কেননা خبر তার মুসনাদ ইলাইহের অর্থগত সিফাত হয়) কিন্তু কালাম বা বাক্যের সিফাত বলেননি (যেমনটি আল্লামা সাক্কাকী বলেছেন, তার ইবারত হলো ثُمَّ الْكَلَامُ مِنْهُ حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ وَمِنْهُ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ) এর কারণ কি?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, বাস্তবে حقيقة এবং مجاز দ্বারা বিশেষিত হয় ইসনাদ, অর্থাৎ حقيقة ও مجاز ইসনাদের সিফাত হয়। আর কালাম বা বাক্যের সাথে حقيقة এবং مجاز সম্পর্ক ইসনাদের মাধ্যমেই হয়। তাই মূল লেখক حقيقةএবং مجاز-কে ইসনাদের সিফাত বানিয়েছেন, কালামের সিফাত বানাননি। আর মূল লেখকের পদ্ধতিটিই উত্তম। কেননা, এতে সরাসরি মাওসূফের সাথে সিফাতের সম্পর্ক বর্ণনা করা হচ্ছে। আর সাক্কাকীর মতানুসারে সিফাতের সম্পর্ক মাওসূফের সাথে সরাসরি হচ্ছে না।

قَوْلُهُ وَأَوْرَدَهُمَا فِيْ عِلْمِ الْمَعَانِيْ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) حَقِيْقَة عَقْلِيَّة এবং مَجَاز عَقْلِي-কে ইলমুল মা'আনীর আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে বলেছেন। তিনি এগুলো ইলমুল বয়ানের অন্তর্ভুক্ত করেননি; বরং ইলমুল মা'আনীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর কারণ হচ্ছে এগুলো ইসনাদের মধ্যে لفظ-এর অবস্থাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর لفظ-এর বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে ইলমুল মা'আনীতে আলোচনা করা হয়, ইলমুল বয়ানে আলোচনা করা হয় না। তাই ইলমুল মা'আনীতে এর আলোচনা সমীচীন হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

খবর ও ইনশা উভয় প্রকারের ইসনাদ সাধারণত দু' প্রকার। ১. حَقِيْقَة عَقْلِيَّة ও ২. مَجَاز عَقْلِي

লেখক হয়তো حَقِيْقَه عَقْلِيَّة , নয়তো مَجَاز عَقْلِي এভাবে বলেননি। কারণ, তাঁর মতে এ দু' প্রকার ছাড়াও আরেক প্রকারের ইসনাদ রয়েছে, যা এ দু'প্রকারের বাইরে।

وَهِيَ اَيْ اَلْحَقِيْقَةُ الْعَقْلِيَّةُ اِسْنَادُ الْفِعْلِ اَوْ مَعْنَاهُ كَالْمَصْدَرِ وَاِسْمِي الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ وَاِسْمِ التَّفْضِيْلِ وَالظَّرْفِ اِلٰى مَا اَيْ اِلٰى شَئٍ هُوَ اَيْ اَلْفِعْلُ اَوْ مَعْنَاهُ لَهُ اَيْ لِذٰلِكَ الشَّئِ كَالْفَاعِلِ فِيْمَا بُنِيَ لَهُ نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا وَالْمَفْعُوْلِ بِهِ فِيْمَا بُنِيَ لَهُ نَحْوُ ضُرِبَ عَمْرٌو فَاِنَّ الضَّارِبِيَّةَ لِزَيْدٍ وَالْمَضْرُوْبِيَّةَ لِعَمْرٍو عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ لَهُ وَبِهٰذَا دَخَلَ فِيْهِ مَا يُطَابِقُ الْاِعْتِقَادَ دُوْنَ الْوَاقِعِ فِي الظَّاهِرِ وَهُوَ اَيْضًا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ لَهُ وَبِهٖ يَدْخُلُ فِيْهِ مَا لَايُطَابِقُ الْاِعْتِقَادَ وَ الْمَعْنٰى اِسْنَادُ الْفِعْلِ اَوْ مَعْنَاهُ اِلٰى مَا يَكُوْنُ هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِيْمَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ حَالِهٖ وَ ذٰلِكَ بِاَنْ لَايُنْصَبَ قَرِيْنَةٌ دَالَّةٌ عَلٰى اَنَّهُ غَيْرُ مَا هُوَ لَهُ فِيْ اِعْتِقَادِهٖ وَمَعْنٰى كَوْنِهٖ لَهُ اَنَّ مَعْنَاهُ قَائِمٌ بِهٖ وَ وَصْفٌ لَهُ وَحَقُّهُ اَنْ يُسْنَدَ اِلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مَخْلُوْقًا لِلّٰهِ تَعَالٰى اَوْ لِغَيْرِهٖ وَسَوَاءٌ كَانَ صَادِرًا عَنْهُ بِاِخْتِيَارِهٖ كَضَرَبَ اَوْ لَا كَمَرِضَ وَمَاتَ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **আর তা** অর্থাৎ হাকীকতে আকলিয়্যাহ হচ্ছে **ফে'ল অথবা তার অর্থবোধক শব্দ** যথা মাসদার, ইসমে ফায়েল, ইসমে মাফঊল, সিফাতে মুশাব্বাহ, ইসমে তাফযীল ও ইসমে যরফ-এর নিসবত বা সম্পর্ক করা এমন বিষয়ের প্রতি যার জন্য ফে'ল অথবা তার অর্থবোধক শব্দ যেমন- ফে'লে মা'রূফের মধ্যে ফায়েল। যথা- ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا (যায়েদ আমরকে মারল) অথবা ফে'লে মাজহুলের মধ্যে মাফঊল। যথা- ضُرِبَ عَمْرٌو নিশ্চয়ই (এখানে) প্রহার করার কর্মটি যায়েদের জন্য এবং প্রহারিত হওয়ার কর্মটি আমরের জন্য, **মুতাকাল্লিমের নিকট** (عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ) এটি তার শব্দ لَهُ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই (عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ) قيد দ্বারা যা বাস্তবের মোতাবেক হয় না, কিন্তু বিশ্বাসের অনুকূলে হয়, তা সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। বাহ্যিক অবস্থানুপাতে (فِي الظَّاهِرِ) কথাটিও لَهُ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই (فِي الظَّاهِرِ) قيد দ্বারা যা বিশ্বাসের অনুকূলে হয় না তাও সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। পুরো সংজ্ঞার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, ফে'লকে অথবা মা'নায়ে ফে'লকে (প্রকৃতপক্ষে) মুতাকাল্লিমের মতে তার বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা যার জন্য ফে'ল তার দিকেই নিসবত করা' (বাহ্যিক অবস্থা থেকে যা বুঝা যায়) এর অর্থ হচ্ছে এমন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া- যা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, এটি তার বিশ্বাসে যার জন্য ফে'ল তার জন্য নয়। لَهُ-এর অর্থ হলো ফে'ল অথবা ফে'লের অর্থবোধক শব্দ তার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এবং এগুলো তার বিশেষণ। আর তার প্রতি ইসনাদ করাটাই তার হক। চাই সেই ফে'লটি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট হোক অথবা অন্যের হোক। চাই সেটা (যার জন্য ফে'ল) তার থেকে তার ইচ্ছায় প্রকাশ পেয়েছে, যেমন- ضَرَبَ (সে প্রহার করল) অথবা অনিচ্ছায় প্রকাশ পেয়েছে, যেমন- مَرِضَ (সে অসুস্থ হলো), مَاتَ (সে মৃত্যুবরণ করল)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَهِيَ اَيْ اَلْحَقِيْقَةُ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখক حَقِيْقَة عَقْلِيَّة-এর সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞাস্থিত বিভিন্ন قيد-এর উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। মূল লেখকের সংজ্ঞাটি হলো اِسْنَادُ الْفِعْلِ اَوْ مَعْنَاهُ اِلٰى مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ অর্থাৎ حَقِيْقَة عَقْلِيَّة বলা হয়, ফে'ল অথবা معنى فعل-কে মুতাকাল্লিমের মতে তার বাহ্যিক

অবস্থানুপাতে যার জন্য ফে'ল তার দিকে নিসবত করা। বাক্যস্থিত مَعْنَى فِعْل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَصْدَر، إِسْم فَاعِل، إِسْم تَفْضِيل، صِفَة مُشَبَّه، إِسْم مَفْعُول এবং إِسْم ظَرْف ইত্যাদি।

إِلَى مَاهُوَ لَهُ এখানে ما ইসমে মাওসূল, অর্থ شيئ কোনো বস্তু বা বিষয়, هو-এর مرجع হলো معنى فعل অথবা فعل। له-এর مرجع হলো ما অর্থাৎ সেই বিষয়বস্তুর জন্য যে বিষয়বস্তুটি হচ্ছে فِعْل مَعْرُوْف-এর মধ্যে فاعل এবং فعل مجهول-এর মধ্যে مفعول।

প্রথমটির উদাহরণ- ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا এ উদাহরণে زيد হচ্ছে (فاعل) যার কারণে ফে'ল সংঘটিত হয়েছে। দ্বিতীয়টির উদাহরণ- ضُرِبَ عَمْرٌو-এর উদাহরণে عمرو হচ্ছে (مفعول), যার জন্য ফে'ল বানানো হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, প্রথমটির উদাহরণে প্রহার করার কাজটি যায়েদের দ্বারা আর প্রহৃত হওয়ার বিষয়টি আমরের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। তাই প্রথম ফে'লটি যায়েদের আর ২য় ফে'লটি আমরের জন্য হয়েছে। উভয়ের দিকে ফে'লের ইসনাদ حقيقى হয়েছে। অতএব, এটি حَقِيْقَة عَقْلِيَّة।

قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَهُ : মুতাকাল্লিমের নিকট অর্থাৎ মুতাকাল্লিমের ধারণা বা বিশ্বাসানুসারে। মুসান্নিফ বলেন, عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ শব্দটি متعلق হবে له-এর সাথে, অর্থাৎ له-এর عَامِل مُقَدَّر-এর সাথে। উহ্য আমেল হচ্ছে استقر। তাহলে এই اشكال হবে না যে, اَلظَّرْفُ لَايَتَعَلَّقُ بِمِثْلِهِ (ظرف-এর সম্পর্ক অনুরূপ ظرف -এর সাথে হয় না)।

মোটকথা, عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ ঐ ফে'লের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা له-এর আমেল এবং যার সাথে له সম্পর্কযুক্ত।

قَوْلُهُ وَبِهٰذَا دَخَلَ فِيْهِ مَا يُطَابِقُ الْاِعْتِقَادَ دُوْنَ الْوَاقِعِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ এই قيد দ্বারা সংজ্ঞার মধ্যে এমন ইসনাদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা বিশ্বাসের মোতাবেক; কিন্তু বাস্তবের মোতাবেক নয়।

قَوْلُهُ فِي الظَّاهِرِ وَهُوَ اَيْضًا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : মুসান্নিফ (র.) فِي الظَّاهِرِ তারকীবের মধ্যে حرف جر এবং مجرور মিলে متعلق (সম্পর্কযুক্ত) হবে له-এর আমেলের সাথে। তাহলে পুরো সংজ্ঞার ভাবার্থ এই যে, হাকীকতে আকলিয়া বলা হয় ফে'ল অথবা ফে'লের অর্থবোধক শব্দকে এমন বিষয়বস্তুর প্রতি সম্পর্কযুক্ত করা, মুতাকাল্লিমের বিশ্বাস অনুসারে যার জন্য ফে'ল বা ফে'লের শব্দগুলো হয়েছে এবং মুতাকাল্লিমের বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা বুঝা যায় যে, ফে'লের নিসবত যথাস্থানেই হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, فِي الظَّاهِرِ-এর দ্বারা হাকীকতে আকলিয়ার মধ্যে এমন ইসনাদও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যা বাস্তবের মোতাবেক; কিন্তু বিশ্বাসের মোতাবেক নয়।

فَوَائِد قُيُوْد : মূল লেখকের শব্দ مَا هُوَ لَهُ-এর দ্বারা বাহ্যিকভাবে মনে হয় مَا هُوَ لَهُ بِحَسْبِ الْوَاقِعِ অর্থাৎ যার জন্য ফে'ল বাস্তবতা অনুসারে এ দু'ধরনের ইসনাদকে শামিল করে- ১. যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক এবং ২. যা শুধুমাত্র বাস্তবতার মোতাবেক; কিন্তু বিশ্বাসের মোতাবেক নয়। এতটুকু দ্বারা এমন ইসনাদ শামিল হয় না, যা শুধুমাত্র বিশ্বাসের মোতাবেক; কিন্তু বাস্তবতার মোতাবেক নয় এবং যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস কোনোটার মোতাবেক নয়। এরপর যখন عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ-এর قيد টি বৃদ্ধি করা হলো এর দ্বারা সংজ্ঞার আওতায় এমন ইসনাদ অন্তর্ভুক্ত হলো যা শুধুমাত্র বিশ্বাসের মোতাবেক। পূর্ব থেকে অন্তর্ভুক্ত উভয়ের মোতাবেক ইসনাদটি বহাল রইল, কিন্তু عِنْدَالْمُتَكَلِّمِ-এর قيد দ্বারা, যা শুধুমাত্র বাস্তবতার মোতাবেক তা অন্তর্ভুক্ত থাকার পরও বের হয়ে গেল। এরপর فِي الظَّاهِرِ-এর قيد টি বৃদ্ধি করার পর যে ইসনাদ শুধুমাত্র বাস্তবতার মোতাবেক তা অন্তর্ভুক্ত হলো এবং এমন ইসনাদও শামিল হলো, যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস কোনোটার-ই মোতাবেক নয়। ফলে সংজ্ঞার মধ্যে মোট চার ধরনের ইসনাদ অন্তর্ভুক্ত হলো- ১. مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ وَالْاِعْتِقَادَ যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক। ২. مَا لَايُطَابِقُ شَيْئًا مِنْهُمَا যা কোনোটারই মোতাবেক নয়, ৩. مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ دُوْنَ الْاِعْتِقَادِ যা বাস্তবতার মোতাবেক, কিন্তু বিশ্বাসের মোতাবেক নয়, ৪. مَا يُطَابِقُ الْاِعْتِقَادَ دُوْنَ الْوَاقِعِ যা বিশ্বাসের মোতাবেক কিন্তু বাস্তবতার মোতাবেক নয়।

قَوْلُهُ مَعْنَى الْفِعْلِ : দ্বারা উদ্দেশ্য যে সকল اسم। ফে'লের অর্থ ধারণ করে। فِى الظَّاهِرِ দ্বারা উদ্দেশ্য مَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ حَالِهِ তার যাহেরী অবস্থা দ্বারা যা বুঝা যায়। অর্থাৎ মুতাকাল্লিমের বিশ্বাসে مَا هُوَ لَهُ-এর غير আছে এমন কোনো قرينه বা দলিল প্রতিষ্ঠিত না হওয়া।

قَوْلُهُ مَعْنَى كَوْنِهِ لَهُ : মুসান্নিফ বলেন, যার জন্য ফে'ল অথবা مَعْنَى فِعْل হয়- এ কথার অর্থ হচ্ছে- ফে'ল যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠা পায় এবং এর জন্য ফে'ল وصف হয়। যেমন- ফে'লে মা'রূফের মধ্যে ফে'ল ফায়েল দ্বারা এবং মাজহুলের মধ্যে মাফউল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় স্থানে ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলের وصف বা সম্পর্কিত হয়।

ফে'ল তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং وصف হওয়ার অর্থ এই নয় যে, فعل অথবা مَعْنَى فِعْل-এর উপর محمول হবে; বরং এর অর্থ হচ্ছে এগুলো সেই জিনিসের প্রতি منسوب বা সম্পর্কিত হবে এবং এগুলোকে সেই জিনিসের প্রতি নিসবত করা যাবে। চাই সেই ফে'লটি আল্লাহর সরাসরি সৃষ্টি হোক যথা- جُنَّ زَيْدٌ (যায়েদ উন্মাদ হয়েছে) এখানে উন্মাদ করার কাজটি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। অথবা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি নয়। এটি আবার দু'ধরনের হতে পারে- ১. এটি বান্দা থেকে তার ইচ্ছায় প্রকাশ পাবে, যেমন- ضرب ২. অথবা বান্দা থেকে কাজটি তার ইচ্ছায় প্রকাশ পাবে না। যেমন- مَرِضَ وَ مَاتَ। উল্লিখিত দু'টি উদাহরণ থেকে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, তবে মৃত্যু ও অসুস্থতা আল্লাহ ভিন্ন অন্য থেকে তার অনিচ্ছায় প্রকাশ পেয়েছে? বরং বাস্তবতা তো এটাই যে, তা আল্লাহ ভিন্ন কারো থেকে প্রকাশ পায়নি। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো- تَحَرَّكَ الْمُرْتَعِشُ।

মুসান্নিফের কথার ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্যের থেকে কাজ তার ইচ্ছার বিপরীত বের হবে না। এর দু'টি অর্থ- ১. তার থেকে কাজ তার অনিচ্ছায় প্রকাশ পাবে, যেমন- تَحَرَّكَ الْمُرْتَعِشُ ২. তার থেকে কাজটি প্রকাশ পাবে না বটে; কিন্তু তার দিকেই কাজটির নিসবত করা হবে। যেমন- مَرِضَ وَ مَاتَ।

সার-সংক্ষেপ :

حَقِيْقَة عَقْلِيَّة-এর সংজ্ঞা : وَهِىَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِى الظَّاهِرِ অর্থাৎ حَقِيْقَت عَقْلِيَّة বলা হয়, মুতাকাল্লিমের যাহেরী অবস্থা অনুযায়ী মুতাকাল্লিমের দৃষ্টিতে ফে'ল যার দ্বারা সংঘটিত, তার দিকে فعل অথবা مَعْنَى فِعْل-কে নিসবত করা।

فَاَقْسَامُ الْحَقِيْقَةِ الْعَقْلِيَّةِ عَلٰى مَا يَشْمَلُهُ التَّعْرِيْفُ اَرْبَعَةٌ اَلْاَوَّلُ مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ وَالْاِعْتِقَادَ جَمِيْعًا كَقَوْلِ الْمُؤْمِنِ اَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ وَالثَّانِىْ مَا يُطَابِقُ الْاِعْتِقَادَ فَقَطْ نَحْوُ قَوْلِ الْجَاهِلِ اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ وَالثَّالِثُ مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ فَقَطْ كَقَوْلِ الْمُعْتَزِلِىْ لِمَنْ لَايَعْرِفُ حَالَهُ وَهُوَ يُخْفِيْهَا مِنْهُ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْاَفْعَالَ كُلَّهَا وَهٰذَا الْمِثَالُ مَتْرُوْكٌ فِى الْمَتْنِ وَالرَّابِعُ مَا لَايُطَابِقُ الْوَاقِعَ وَلَا الْاِعْتِقَادَ جَمِيْعًا نَحْوُ قَوْلِكَ جَاءَ زَيْدٌ وَاَنْتَ اَىْ وَالْحَالُ اَنَّكَ خَاصَّةً تَعْلَمُ اَنَّهُ لَمْ يَجِئْ دُوْنَ الْمُخَاطَبِ اِذْ لَوْ عَلِمَهُ الْمُخَاطَبُ اَيْضًا لَمَا تَعَيَّنَ كَوْنُهُ حَقِيْقَةً لِجَوَازِ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُتَكَلِّمُ قَدْ جَعَلَ عِلْمَ السَّامِعِ بِاَنَّهُ لَمْ يَجِئْ قَرِيْنَةً عَلٰى اَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ظَاهِرَهُ فَلَا يَكُوْنُ الْاِسْنَادُ اِلٰى مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِى الظَّاهِرِ ـ

অনুবাদ : সংজ্ঞার ব্যাপকতায় 'হাকীকতে আকলিয়্যাহ' চার প্রকার। প্রথম প্রকার যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক হয়, যেমন, মু'মিনের উক্তি– اَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ (আল্লাহ তা'আলা তরি-তরকারি সৃষ্টি করেছেন)। দ্বিতীয় প্রকার যা শুধুমাত্র বিশ্বাসের মোতাবেক হয়, যেমন, নাস্তিকের উক্তি– اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ **(বসন্তকাল তরি-তরকারি সৃষ্টি করেছে)**। তৃতীয় প্রকার যা শুধুমাত্র বাস্তবতার মোতাবেক হয়, যেমন– মু'তাযিলাপন্থি লোক তার সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি (শ্রোতা) যার থেকে নিজ অবস্থা গোপন করছে এমন ব্যক্তিকে বলল– خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْاَفْعَالَ كُلَّهَا (আল্লাহ সব ধরনের কাজ সৃষ্টি করছেন, মু'তাযিলাপন্থিরা মানুষের কাজের স্রষ্টা মানুষকেই মনে করে, আল্লাহকে নয়।) এ উদাহরণটি মূল লেখকের ইবারতে বাদ পড়েছে। চতুর্থ প্রকার, যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস কোনোটারই মোতাবেক নয়। **যেমন, তুমি বললে–** جَاءَ زَيْدٌ **(যায়েদ এসেছে); অথচ** অবস্থা হলো এই যে, **শুধু তুমি জান, সে আসেনি;** শ্রোতা নয়, (অর্থাৎ সে জানে না যে, যায়েদ আসেনি) কেননা, তা যদি শ্রোতা জেনে যায়, তাহলে হাকীকত হওয়া নিশ্চিত হবে না। (তখন) এ সম্ভাবনা থাকে যে, বক্তা শ্রোতার জানা কথা 'সে আসেনি'-কে দলিল বানাবে যে, বাক্যের প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য করেনি। সুতরাং তখন ইসনাদটা যার জন্য ফে'ল তার দিকে বক্তার প্রকাশ্য অবস্থানুসারে হচ্ছে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ فَاَقْسَامُ الْحَقِيْقَةِ الْعَقْلِيَّةِ الخ **:** উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) হাকীকতে আকলিয়া-এর সংজ্ঞার ভিত্তিতে তাকে চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন। এর প্রথম প্রকার হলো– مَا هُوَ لَهُ-এর দিকে ইসনাদ বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক হবে। যেমন, মু'মিন বলল– اَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ (আল্লাহ তা'আলা সবজি উৎপাদন করেছেন)। এ উদাহরণে انبات-এর নিসবাত আল্লাহ তা'আলার (مَا هُوَ لَهُ)-এর দিকে করা হয়েছে, যা বাস্তবতা এবং (মু'মিনের) বিশ্বাস উভয়ের অনুযায়ী হয়েছে।

২য় প্রকার : ইসনাদটি বক্তার বিশ্বাসের মোতাবেক হবে, কিন্তু বাস্তবতার বিপরীত হবে। যেমন– (নাস্তিক বলল) اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ (বসন্তকাল সবজি উৎপাদন করেছে)। এ উদাহরণে انبات-এর নিসবত বসন্তকালের দিকে করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে انبات আল্লাহ তা'আলার কাজ। কিন্তু এটি নাস্তিকের বিশ্বাস মোতাবেক হয়েছে। কেননা, নাস্তিকেরা মনে করে বসন্তকালই সবজি উৎপাদন করে।

৩য় প্রকার : ইসনাদটি বাস্তবের মোতাবেক হবে তবে বক্তার বিশ্বাসের মোতাবেক হবে না। যেমন– মু'তাযিলা সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তি তার শ্রোতাকে বলল, (যে তার সম্পর্কে জানে না এবং সে নিজের মু'তাযিলাপন্থি হওয়ার বিষয়টি শ্রোতা থেকে গোপন করছে) خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى الْاَفْعَالَ كُلَّهَا আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কর্মের স্রষ্টা ।

মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখকের লেখায় এ উদাহরণটি নেই।

বি. দ্র. মু'তাযিলা সম্প্রদায় একটি পথভ্রষ্ট দল, যারা ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তাদের প্রধান নেতা হলো ওয়াসেল ইবনে আতা– সে হাসান বসরী (র.)-এর ছাত্র ছিল। সে তার কতিপয় অনুসারীসহ হাসান বসরীর মজলিস ত্যাগ করে। সেই থেকে তাদের নাম হয় মু'তাযিলা। নিম্নে তাদের কয়েকটি ভ্রান্ত আকিদা দেওয়া হলো।

১. কবীরাহ গুনাহ মানুষকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে দেয়।

২. মানুষের কর্মের স্রষ্টা মানুষ।

৩. আল্লাহ তা'আলা কোনো মন্দ বিষয়ের স্রষ্টা হতে পারেন না।

৪র্থ প্রকার : ইসনাদটি বাস্তবতা এবং বক্তার বিশ্বাস কোনোটিরই মোতাবেক নয়। যেমন– তুমি বললে جَاءَ زَيْدٌ (যায়েদ এসেছে) অথচ তুমি জান যে, সে আসেনি; কিন্তু শ্রোতা জানে না। শ্রোতা তোমার প্রকাশ্য অবস্থা দ্বারা ধারণা করছে, তুমি যা বলেছ তা সত্য। কেননা, যদি শ্রোতা জানে যে, তুমি সত্য বলছ না, তাহলে তা حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ হওয়া নিশ্চিত নয়। তখন বক্তা শ্রোতার বিপরীত জানাকে দলিল বানাবে যে, সে যাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য করেনি। ফলে এটি حَقِيْقَتْ عَقْلِيَّةٌ থাকবে না। অতএব এ উদাহরণে শ্রোতার প্রকৃত অবস্থা না জানা জরুরি।

উল্লিখিত উদাহরণটি বাস্তবতা এবং বক্তার বিশ্বাস কোনোটির মোতাবেক হয়নি। কিন্তু বক্তার প্রকাশ্য অবস্থা অনুযায়ী মনে হয়েছে যে, ইসনাদটি مَا هُوَ لَهٗ-এর দিকেই হয়েছে। এ কারণেই এটিকে حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ-এর সংজ্ঞা দ্বারা এর চারটি প্রকার বের হয়ে আসে– ১. যা বাস্তবতা ও বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক হয়, যেমন– (মু'মিনের উক্তি) أَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ ২. যা শুধুমাত্র বিশ্বাসের মোতাবেক হয়। যেমন (নাস্তিকের উক্তি) أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ। ৩. যা শুধুমাত্র বাস্তবতার মোতাবেক হয়। যেমন (মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের কেউ বলল) خَلَقَ اللّٰهُ الْاَفْعَالَ كُلَّهَا ৪. যা বাস্তবতা ও বিশ্বাস কোনোটার মোতাবেক নয়। যেমন– (মিথ্যা কথায় কেউ বলল,) جَاءَ زَيْدٌ অথচ সে জানে যে, যায়েদ আসেনি। কিন্তু শ্রোতা জানে না যে, মুতাকাল্লিম মিথ্যা বলেছে।

وَمِنْهُ اَىْ مِنَ الْاِسْنَادِ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ وَيُسَمّٰى مَجَازًا حُكْمِيًّا وَمَجَازًا فِى الْاِثْبَاتِ وَاِسْنَادًا مَجَازِيًّا وَهُوَ اِسْنَادُهٗ اَىْ اِسْنَادُ الْفِعْلِ اَوْ مَعْنَاهُ اِلٰى مُلَابِسٍ لَهٗ اَىْ لِلْفِعْلِ اَوْ مَعْنَاهُ غَيْرِ مَا هُوَ لَهٗ اَىْ غَيْرِ الْمُلَابِسِ الَّذِىْ ذٰلِكَ الْفِعْلِ اَوْ مَعْنَاهُ مَبْنِيٌّ لَهٗ يَعْنِىْ غَيْرَ الْفَاعِلِ فِى الْمَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ وَغَيْرَ الْمَفْعُوْلِ بِهٖ فِى الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُوْلِ سَوَاءٌ كَانَ ذٰلِكَ الْغَيْرُ غَيْرًا فِى الْوَاقِعِ اَوْ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِى الظَّاهِرِ وَبِهٰذَا سَقَطَ مَا قِيْلَ اِنَّهٗ اِنْ اَرَادَ غَيْرَ مَا هُوَ لَهٗ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِى الظَّاهِرِ فَلَا حَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ بِتَاَوُّلٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاِنْ اَرَادَ غَيْرَ مَا هُوَ لَهٗ فِى الْوَاقِعِ خَرَجَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ الْجَاهِلِ اَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ مَجَازًا عَقْلِيًّا بِاعْتِبَارِ الْاِسْنَادِ اِلَى السَّبَبِ بِتَاَوُّلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَى التَّاَوُّلِ اَنَّكَ تَطْلُبُ مَا يَؤُوْلُ اِلَيْهِ مِنَ الْحَقِيْقَةِ اَوِ الْمَوْضِعُ الَّذِىْ يَؤُوْلُ اِلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ وَحَاصِلُهٗ اَنْ تُنْصَبَ قَرِيْنَةٌ صَارِفَةٌ عَنْ اَنْ يَكُوْنَ الْاِسْنَادُ اِلٰى مَا هُوَ لَهٗ ـ

অনুবাদ : ইসনাদের **আরেকটি প্রকার হলো মাজাযে আকলী**। এর আরো নাম রয়েছে। (যথা–) মাজাযে হুকমী, মাজায ফিল ইছবাত এবং ইসনাদে মাজাযী। **তা** (ইসনাদে মাজাযী) **এই যে, ফে'ল অথবা ফে'লের অর্থবোধক শব্দকে ফে'লের সাথে সম্পর্কিত কোনো ইসমের প্রতি নিসবত করা, যা** مَا هُوَ لَهٗ **থেকে ভিন্ন** অর্থাৎ ফে'ল অথবা ফে'লের অর্থবোধক শব্দকে যার জন্য বানানো হয়েছে তা সেই সম্পৃক্ত জিনিসের ভিন্ন। অর্থাৎ ফে'লে মা'রূফের মধ্যে ফায়েল ভিন্ন অন্যের দিকে এবং ফে'লে মাজহুলের মধ্যে মাফউল ভিন্ন অন্য ইসমের প্রতি নিসবত করা। এ ভিন্নতা বাস্তবতার নিরিখে হতে পারে অথবা বক্তার প্রকাশ্য অবস্থার ভিত্তিতেও হতে পারে। এর দ্বারা খণ্ডন হয়ে গেল (এ ব্যাপারে বর্ণিত ভিন্নমত) অর্থাৎ যদি তিনি বক্তার প্রকাশ্য অবস্থা বিবেচনা করত ভিন্নতা ইচ্ছা করেন, তাহলে بِتَاَوُّلٍ কথাটির প্রয়োজন নেই। এটা তো স্পষ্ট। আর যদি তিনি বাস্তবে مَا هُوَ لَهٗ-এর ভিন্ন কিছু মনে করেন, তাহলে এর দ্বারা নাস্তিকের উক্তি اَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ কার্যকারণের দিকে নিসবত হিসেবে মাজায থেকে বের হয়ে যায়। بِتَاَوُّلٍ এটি اِسْنَادِهٖ-এর সাথে متعلق আর تَاَوُّلٌ অর্থ হচ্ছে তুমি এমন বিষয়কে অনুসন্ধান করছ যার দিকে মাজায প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ হাকীকত। অথবা এমন স্থান অনুসন্ধান করছ, যার প্রতি মাজায প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ জ্ঞান বা আকল (এর মাধ্যমে) (এটি এমন স্থানে হয় যেখানে মাজাযের জন্য কোনো হাকীকত থাকে না) সারকথা এই যে, এমন লক্ষণ বিদ্যমান থাকবে, যা ইসনাদকে مَا هُوَ لَهٗ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করাবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَمِنْهُ اَىْ مِنَ الْاِسْنَادِ الخ : ইতঃপূর্বে হাকীকতে আকলিয়্যাহ-এর সংজ্ঞা আলোচনা করা হয়েছে। এখান থেকে مَجَاز عَقْلِى-এর আলোচনা শুরু হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইসনাদের ২য় প্রকার হলো مَجَاز عَقْلِى আর مَجَاز عَقْلِى বেশ কয়েকটি নামে অবহিত হয়, যথা– مَجَازٌ فِى الْاِثْبَاتِ، مَجَاز حُكْمِى ও ইসনাদে মাজাযী।

مَجَاز عَقْلِي শব্দের বিশ্লেষণ : مجاز শব্দের অর্থ– আসল স্থান পরিত্যাগ করত অন্যস্থান দখল করা। যে ইসনাদ তার আসল ফায়েল ও মাফউল ছেড়ে অন্য কোনো ইসমের দিকে ধাবিত হয়, তাকে مجاز বলা হয়। যেহেতু উক্ত ইসনাদটি কোনো যুক্তির আশ্রয়ে হয়ে থাকে এ কারণে একে مَجَاز عَقْلِي বলা হয়। পক্ষান্তরে مَجَاز لُغَوِي বলা হয় এমন مجاز কে, যা نقلى বিষয়ের মধ্যে হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো শব্দের মধ্যে একথা বলা হয় যে, এটি মাজায হয়েছে। কারণ, শব্দটি এ অর্থে রচিত হয়নি বা এর এ অর্থ বর্ণিত আছে।

مَجَاز حُكْمِي : মাজাযে আকলীকে مَجَاز حُكْمِي ও বলা হয়, কারণ এর মধ্যে যে মাজায পাওয়া যায়, তা হুকুম বা নিসবতের মধ্যে হয়ে থাকে। অথবা, একে حكمى বলার কারণ হচ্ছে এ ধরনের মাজায হুকুম অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা অনুভব করা যায়।

مَجَازٌ فِي الْاِثْبَاتِ : মাজাযে আকলীকে مَجَازٌ فِي الْاِثْبَاتِ ও বলা হয়, যদিও এটি نفى এবং اثبات উভয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে। اثبات যেহেতু نفى-এর তুলনায় অধিক মর্যাদা সম্পন্ন এবং اثبات হলো اصل আর نفى তার فرع, এ কারণে مجاز-কে اثبات-এর সাথে কয়েদযুক্ত করা হয়েছে। তবে কেউ কেউ বলেন, এখানে اثبات দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اسناد বা اتصاف (সম্পর্ক এবং বিশেষিত হওয়া) যা (اثبات-এর অর্থে) হ্যাঁ-বাচক এবং না-বাচক উভয়কে শামিল করে।

إِسْنَاد مَجَازِي : একে ইসনাদে মাজাযীও বলা হয়। কারণ, উক্ত ইসনাদ মাজাযের প্রতি নিসবত হয়ে থাকে। মূল লেখক مجاز-এর যে সংজ্ঞাটি পেশ করেছেন তা হলো–

مَجَازٌ عَقْلِيٌّ هُوَ اِسْنَادُ الْفِعْلِ اَوْ مَعْنَى الْفِعْلِ اِلٰى مُلَابِسٍ لَهُ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ بِتَاَوُّلٍ

অর্থাৎ مَجَاز عَقْلِي বলা হয় فعل অথবা مَعْنٰى فِعْل-কে تَاَوُّل বা কোনো বিষয়ের লক্ষণের ভিত্তিতে এমন مُلَابِس(ফে'লের সাথে সম্পর্কিত কোনো ইসম)-এর দিকে নিসবত করা, যা غَيْرُ مَا هُوَ لَهُ অর্থাৎ فعل অথবা معنى فعل যার জন্য গঠিত তার থেকে ভিন্ন অন্য কোনো ইসম। مُلَابِس শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে ইসমটির প্রতি নিসবত করা হবে, তার মাঝে এবং فعل অথবা مَعْنى فِعْل-এর মাঝে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা, مُلَابِس অর্থ সম্পর্কিত। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি فِعْل مَعْرُوْف-এর জন্য فاعل জরুরি। যে ফায়েলটি উক্ত ফে'লটির অস্তিত্ব দান করেছে এবং তাকে প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই ফায়েলের দিকে উক্ত ফে'লটির নিসবত হলো ইসনাদে হাকীকী।

আর যদি উক্ত ফায়েল ছাড়া অন্য ইসম– যা ফে'লটির সাথে কোনো একভাবে জড়িত, তার দিকে নিসবত করা হয়, তাকে বলা হয় ইসনাদে মাজাযী। এমনিভাবে فِعْل مَجْهُوْل-এর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। তবে فِعْل مَجْهُوْل মাফউল-এর জন্য গঠিত হয়, সুতরাং যে মাফউলটির জন্য ফে'ল গঠিত হয়েছে তার দিকে নিসবত করা হলে হাকীকত, সেটা ভিন্ন অন্য ইসমের দিকে নিসবত হলে মাজায।

قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ ذٰلِكَ الْغَيْرُ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ غَيْرُ مَا هُوَ لَهُ -এর মধ্যে مَا هُوَ لَهُ-এর غير দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট করেছেন। মুসান্নিফ বলেন, غير দ্বারা এখানে واقع-এর غير হতে পারে, আবার বক্তার যাহেরী অবস্থার غير ও হতে পারে, অর্থাৎ উভয়ের غير-ই এখানে উদ্দেশ্য। এ ব্যাপকতার দ্বারা مجاز-এর মধ্যে حَقِيْقَة عَقْلِيَّة -এর মতো চার প্রকার শামিল হয়ে যাবে। حَقِيْقَة عَقْلِيَّة-এর মধ্যে যে চারটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল সেগুলো শ্রোতার অবস্থাভেদে مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ হতে পারে। যেমন– হাকীকতে আকলিয়ার মধ্যে প্রথম প্রকার ছিল– যা বাস্তবতা এবং বক্তার বিশ্বাস উভয়ের মুতাবেক হবে, এর উদাহরণ মু'মিনের উক্তি–اَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ – এটাই مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ হবে, যখন এটি এমন শ্রোতাকে বলা হবে যে বিশ্বাস করে বক্তা انبات-এর নিসবত ربيع-এর দিকে বিশ্বাসগতভাবেই করে এবং মুতাকাল্লিম ও শ্রোতা সেই বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত আছে। এখানে উদাহরণটি বাস্তব সম্মত হওয়া সত্ত্বেও মুতাকাল্লিমের কারণে مجاز হবে– শ্রোতার বিশ্বাস সম্পর্কে জানাটাই লক্ষণ ধরা হবে যে, ইসনাদটি যাহেরী অর্থে হয়নি। এভাবে আরো তিনটি উদাহরণ হবে।

قَوْلُهُ وَبِهٰذَا سَقَطَ مَا قِيْلَ : মুসান্নিফ বলেন, سواء বলে غير-এর ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছি এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব হয়ে গেছে। প্রশ্নটি হলো, مَجَاز عَقْلِي-এর সংজ্ঞাতে যে غَيْرُ مَا هُوَ لَهُ কথাটি রয়েছে, এর দ্বারা হয়তো غَيْرٌ فِي الْوَاقِعِ (বাস্তবতার ভিন্ন) উদ্দেশ্য হবে, নয়তো غَيْرٌ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ উদ্দেশ্য হবে। যদি

غَيْرٌ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তো মূল লেখকের সংজ্ঞায় বর্ণিত تأول কথাটির দরকার নেই, কেননা تَأَوُّل কথার অর্থ হলো قرينه। আর আমরা জানি غَيْرٌ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ তখনই উদ্দেশ্য, যখন قرينه থাকে, তাই تَأَوُّل কথাটির প্রয়োজন নেই। আর যদি غَيْرٌ فِي الْوَاقِعِ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কাফিরের উক্তি أَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ - মাজাযের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কেননা, উক্ত উদাহরণে انبات বাস্তবে অন্য কারো জন্য জানা নেই। সুতরাং যখন বাস্তবে এর غير নেই, তাই এটি مَجَاز عَقْلِي হতে পারছে না; অথচ এটি مجاز-এর উদাহরণ। সুতরাং এখন প্রশ্ন হলো غير-এর দ্বারা কোন غير আপনার উদ্দেশ্য। এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে غير-এর অর্থ ব্যাপক, এর মধ্যে সীমাবদ্ধতা নেই। মুসান্নিফের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, غير এখানে ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, চাই সেটা বাস্তবতার غير হোক, অথবা মুতাকাল্লিমের প্রকাশ্য অবস্থার غير হোক। এ ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলে উল্লিখিত আপত্তি বাতিল হয়ে যায়। কেননা, বক্তার প্রকাশ্য অবস্থার غير মনে করা হলে যদিও تَأَوُّل শব্দের প্রয়োজন নেই; কিন্তু বাস্তবতার غير মনে করা হলে অবশ্যই تَأَوُّل শব্দের প্রয়োজন আছে, এমনিভাবে বাস্তবতার غير মনে করা হলে যদিও কাফিরের উক্তি أَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ মাজায হয় না বা মাজাযের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যায়; কিন্তু বক্তার প্রকাশ্য অবস্থার غير মনে করা হলে এটি মাজাযের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অতএব, বুঝা গেল غير শব্দটি দ্বারা যদি ব্যাপকার্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কোনো আপত্তি থাকে না।

قَوْلُهُ بِتَأَوُّلٍ مُتَعَلِّقٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَى التَّأَوُّلِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ بِتَأَوُّلٍ শব্দের ব্যাকরণগত তারকীব এবং تَأَوُّل শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছেন। মুসান্নিফ বলেন, بِتَأَوُّلٍ হরফে জার এবং মাজরূর মিলে اسناد মাসদারের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

تَأَوُّل শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) বলেন, تَأَوُّل শব্দটি (باب تفعل-এর) মাসদার, ال থেকে শব্দটি উদ্ভূত, ال অর্থ ফিরে আসা। تَأَوُّل শব্দের অর্থ, কোনো জিনিসকে তালাশ করা, তার প্রতি লক্ষ্য করা, এখানে تَأَوُّل শব্দের অর্থ হলো ঐ হাকীকতকে খুঁজে ফেরা, যার দিকে مجاز প্রত্যাবর্তন করবে, এ কথায় مَجَاز عَقْلِي থেকে حقيقة-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকেই تأول বলা হয়। তবে تَأَوُّل-এর এ অর্থ তখনই পাওয়া যায়, যখন مجاز-এর হাকীকত থাকবে, যেমন- أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ-এর মধ্যে انبات -এর নিসবত ربيع-এর দিকে مجاز হিসেবে হয়েছে। এর মধ্যে تَأَوُّل হলো এর হাকীকত তথা إِسْنَادٌ إِلَى مَا هُوَ لَهُ-কে অনুসন্ধান করা এবং অনুসন্ধানের পর বলা انبات-এর নিসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে হওয়া হলো হাকীকত। যেমন- أَنْبَتَ اللّٰهُ الْبَقْلَ।

تَأَوُّل-এর আরেকটি ব্যাখ্যা হলো- تأول বলা হয় এমন স্থান খুঁজে বের করা, যার প্রতি জ্ঞানের ভিত্তিতে مجاز-এর নিসবত প্রত্যাবর্তিত হয়। এটি তখন হয় যখন مجاز-এর জন্য কোনো হাকীকত থাকে না। যেমন- কেউ বলল, أَقْدَمَنِي بَلَدَكَ حَقٌّ لِي عَلَيْكَ (তোমার কাছে আমার পাওনাই আমাকে তোমার শহরে এনেছে) এ উদাহরণে حق لى হচ্ছে اقدم-এর فَاعِل مَجَازِي কেননা, حق-ই হচ্ছে আসার জন্য সবব, সে মতে মূলবাক্য হবে এরূপ- قَدِمْتُ بَلَدَكَ لِحَقٍّ لِي عَلَيْكَ আমি তোমার শহরে আমার পাওনা (নেওয়ার) জন্য এসেছি। أَقْدَمَنِي حَقٌّ (إِسْنَاد مَجَازِي)-এর জন্য মূলত فَاعِل حَقِيقِي নেই, যার দিকে এটি প্রত্যাবর্তন করবে। কারণ, এখানে কেউ إِقْدَام করায়নি, তবে عقل বা জ্ঞান একটি স্থানের প্রতি দিক নির্দেশ করছে, তা হচ্ছে قُدُومٌ لِحَقٍّ (হকের কারণে আগমন)। এর প্রতি مجاز-টি প্রত্যাবর্তন করছে।

সারকথা হলো, تأول বলা হয় مجاز থেকে হাকীকতের প্রতি প্রত্যাবর্তন, চাই সে হাকীকত বাস্তবে থাকুক অথবা বাস্তবে না থাকুক; বরং ধরে নেওয়ার পর্যায়ে হোক। এ কথাকে আরো সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, বক্তা তার রূপক কথার মধ্যে এমন একটি লক্ষণ বা প্রমাণ দাঁড় করাবে যা দ্বারা اسناد যে যথাযথ স্থানের দিকে হয়নি তা বুঝা যাবে এবং এটাও বুঝা যাবে যে, এখানে اسناد হয়েছে مَا هُوَ لَهُ-এর غير-এর দিকে।

সার-সংক্ষেপ :

مَجَاز عَقْلِي-এর বলা হয় ফে'ল/ফে'লের অর্থবোধক কোনো ইসমকে যার থেকে সংঘটিত ফে'ল তা ছাড়া ফে'লের সাথে সম্পর্কিত কোনো কিছুর দিকে দলিলের সাহায্যে সম্বন্ধ করা।

مَجَاز عَقْلِي-এর আরো কতিপয় নাম হলো- ক. مَجَاز حُكْمِي খ. مَجَازٌ فِي الْإِثْبَاتِ গ. إِسْنَاد مَجَازِي -مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ- ১. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ২. بَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ

وَلَهُ اَىْ لِلْفِعْلِ وَهٰذَا اِشَارَةٌ اِلٰى تَفْصِيْلٍ وَتَحْقِيْقٍ لِلتَّعْرِيْفَيْنِ مُلَابِسَاتٌ شَتّٰى اَىْ مُخْتَلِفَةٌ جَمْعُ شَتِيْتٍ كَمَرِيْضٍ وَمَرْضٰى يُلَابِسُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهٖ وَالْمَصْدَرَ وَالزَّمَانَ وَالْمَكَانَ وَالسَّبَبَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمَفْعُوْلِ مَعَهُ وَالْحَالِ وَنَحْوِهِمَا لِاَنَّ الْفِعْلَ لَايُسْنَدُ اِلَيْهَا فَاِسْنَادُهُ اِلَى الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُوْلِ بِهٖ اِذَا كَانَ مَبْنِيًّا لَهُ اَىْ لِلْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُوْلِ بِهٖ يَعْنِىْ اِنَّ اِسْنَادَهُ اِلَى الْفَاعِلِ اِذَا كَانَ مَبْنِيًّا لَهُ اَوْ اِلَى الْمَفْعُوْلِ بِهٖ اِذَا كَانَ مَبْنِيًّا لَهُ حَقِيْقَةٌ كَمَا مَرَّ مِنَ الْاَمْثِلَةِ وَاِسْنَادُهُ اِلٰى غَيْرِهِمَا اَىْ غَيْرِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ بِهٖ يَعْنِىْ غَيْرَ الْفَاعِلِ فِى الْمَبْنِىْ لِلْفَاعِلِ وَغَيْرَ الْمَفْعُوْلِ بِهٖ فِى الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُوْلِ لِلْمُلَابَسَةِ يَعْنِىْ لِاَجْلِ اَنَّ ذٰلِكَ الْغَيْرَ يُشَابِهُ مَا هُوَ لَهُ فِىْ مُلَابَسَةِ الْفِعْلِ مَجَازٌ ـ

অনুবাদ : **এবং তার জন্য** অর্থাৎ ফে'লের জন্য– এটি হাকীকত এবং মাজাযের সংজ্ঞার বিশ্লেষণ এবং বিস্তারিত আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত। বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কিত ইসম রয়েছে। شَتّٰى অর্থ– বিভিন্ন, এটি شَتِيْتٌ-এর বহুবচন। যেমন– مَرِيْضٌ-এর বহুবচন مَرْضٰى **যা সম্পর্ক রাখে ফায়েলের সাথে, মাফউলে বিহীর সাথে, মাসদারের সাথে, কালের সাথে, স্থানের সাথে এবং কার্যকারণের সাথে।** তিনি মাফউলে মা'আহু এবং হাল ইত্যাদির আলোচনা আনেননি, এর কারণ ফে'লকে এগুলোর প্রতি ইসনাদ করা হয় না। **সুতরাং ফায়েল এবং মাফউলের প্রতি ফে'লের ইসনাদ যখন যথাক্রমে ফায়েল এবং মাফউলের জন্য ফায়েল গঠিত হয়** (তখন এটি হাকীকত হয়) অর্থাৎ ফে'লের নিসবত ফায়েলের দিকে যখন ফে'লটি ফায়েলের জন্য গঠিত। আর মাফউলের নিসবত ফে'লের দিকে যখন ফে'লটিকে মাফউলের বানানো হয়– **হাকীকত। যেমনটি এর উদাহরণ অতীত হয়েছে। আর ফে'লের নিসবত ফায়েল এবং মাফউলে বিহী ছাড়া অন্য দিকে** অর্থাৎ ফায়েলের জন্য গঠিত ফে'লের মধ্যে ফায়েল ছাড়া অন্য দিকে এবং মাফউলের জন্য গঠিত ফে'লের মধ্যে মাফউল ছাড়া অন্য দিকে (করা হয়) **বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে।** অথচ সেই ভিন্ন ইসমটি যার জন্য ফে'ল তার সাথে সামঞ্জস্য রাখে ফে'লের সম্পর্কের ভিত্তিতে হয়– তখন তা মাজায বলে গণ্য হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَلَهُ اَىْ لِلْفِعْلِ الخ : এখান থেকে হাকীকত এবং মাজাযের সংজ্ঞার বিস্তারিত বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। মূল লেখক বলেন, ফে'লের সাথে অনেক ইসমের সম্পর্ক থাকে। একেকটি ইসমের একেকভাবে সম্পর্ক। যেমন– কোনো ইসম ফে'লের মাসদার, সেই হিসেবে তার ফে'লের সাথে সম্পর্ক। কোনো ইসম ফে'লের স্থান অথবা কাল সে হিসেবে ইসমটির সাথে ফে'লের সম্পর্ক। কোনো ইসম ফে'লের জন্য سبب বা কার্যকারণ সেই হিসেবে ইসমটির সাথে ফে'লের সম্পর্ক। কোনো ইসম ফে'লের মাফউল হয়, সেই হিসেবে ইসমটির সাথে ফে'লের সম্পর্ক। সুতরাং ফে'লে মারূফের মধ্যে ফায়েলের দিকে যদি ফে'লটি নিসবত করা হয়, তাহলে ইসনাদটি হাকীকী হলো। এমনি ফে'লে মাজহুলের মধ্যে ফে'লের নিসবত যদি মাফউলে বিহীর দিকে করা হয়, তাহলে এটিও হাকীকী হবে। কিন্তু যদি কোনো সম্পর্কের ভিত্তিতে উপরোল্লিখিত ইসমসমূহের কোনো ইসমের দিকে ফে'লের নিসবত করা হয়, যা ফে'লে মা'রূফের মধ্যে ফায়েল ছাড়া এবং ফে'লে মাজহুলের মধ্যে মাফউল ছাড়া হয় তাহলে সেই নিসবতটিকে مَجَاز عَقْلِى বলা হবে।

উল্লেখ্য যে, لِلْفِعْلِ (ফে'লের জন্য) বলা হলেও مَعْنٰى فِعْل ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে ফে'লের تابع হিসেবে।

মুসান্নিফ مُلَابِسَاتٌ شَتّٰى এ ইবারতের شَتّٰى শব্দটির তাহকীক করেন যে, شَتّٰى শব্দটি شَتِيْتٌ-এর বহুবচন। এ ধরনের একবচন ও বহুবচন অন্যস্থানেও পাওয়া যায়। যেমন- مَرِيْضٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো مَرْضٰى। মূল লেখক এখানে فعل-এর মোট ছয়টি مُلَابِس-কে উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর দিকে ফে'লকে নিসবত করা হয়। ফে'লের আরো مُلَابِس রয়েছে। যথা- মাফউলে মা'আহু, হাল ও তামঈয ইত্যাদি। মূল লেখক সেগুলোর আলোচনা করেননি। কারণ এগুলোর দিকে ফে'লকে নিসবত করা হয় না।

قَوْلُهُ فَإِسْنَادُهُ إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُوْلِ بِهِ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا لَهُ : মূল লেখক বলেন, ফে'লকে যখন معروف-এর মধ্যে ফায়েলের দিকে নিসবত করা হয় এবং مجهول-এর মধ্যে مفعول-এর দিকে নিসবত করা হয়, তখন তা حَقِيْقَة-এর মধ্যে গণ্য হয়। আর যদি এর ব্যতিক্রম করা হয় অর্থাৎ معروف-এর মধ্যে ফায়েলের দিকে নিসবত না করে অন্য কোনো مُلَابِس-এর দিকে নিসবত করা হয়, এমনিভাবে فِعْل مَجْهُوْل-এর মধ্যে মাফউলে বিহীর দিকে নিসবত না করে অন্য কোনো مُلَابِس-এর দিকে নিসবত করা হলে, তাকে مَجَاز عَقْلِي বলা হবে। আর অন্য مُلَابِس-এর নিসবত করার কারণ হচ্ছে ফে'লের সাথে সম্পর্ক। অর্থাৎ مُسْنَد إِلَيْه مَجَازِي-এর সাথে ফে'লের একটি সম্পর্ক থাকে, যেমন সম্পর্ক থাকে مُسْنَد إِلَيْه حَقِيْقِي-এর সাথে। ফে'লের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে مُسْنَد إِلَيْه مَجَازِي যেন مُسْنَد إِلَيْه حَقِيْقِي-এর مشابه-এর অনুরূপ হয়ে যায়। আর সে ভিত্তিতে ফে'লের নিসবতটি তার দিকে করা হয়। যদিও উভয়ের সম্পর্ক একই ধরনের না থাকে।

উদাহরণ : جَرَى الْمَاءُ পানি প্রবাহিত হলো। এখানে الماء হলো مُسْنَد إِلَيْه حَقِيْقِي আর جَرَى النَّهْرُ নদী প্রবাহিত হয়েছে। এখানে النهر হলো مُسْنَد إِلَيْه مَجَازِي। এখানে مجاز এবং حقيقة-এর মাঝে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা, جرى ফে'লটির সাথে ماء-এর যেমন সম্পর্ক আছে, তেমনি نهر-এর সম্পর্ক আছে। ماء ফে'লটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর نهر হলো ফে'লটি সংঘটিত হওয়ার স্থান, উল্লিখিত এ স্থানের ভিত্তিতে ফে'লটিকে ماء (حقيقة)-এর দিকে নিসবত না করে نهر (مجاز)-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. مُلَابِسَات فِعْل বা ফে'লের সাথে সম্পর্কিত বিষয় কয়েকটি। যথা- ১. ফায়েল, ২. মাফউলে বিহী, ৩. মাসদার, ৪. ফে'লের কাল, ৫. ফে'লের স্থান, ৬. ফে'লের সবব।

খ. فِعْل مَعْرُوْف-এর মধ্যে ফে'লকে তার ফায়েলের দিকে নিসবত করা হলে তা حَقِيْقَة عَقْلِيَّة হবে। এ ছাড়া অন্য দিকে নিসবত করা হলে তা مَجَاز عَقْلِي হবে। তদ্রূপ فِعْل مَجْهُوْل-এর ফে'লকে তার مَفْعُوْل بِه-এর দিকে নিসবত করা হলে حَقِيْقَة عَقْلِيَّة হবে, আর অন্যথায় তা مَجَاز عَقْلِي হবে।

كَقَوْلِهِمْ عِيْشَةٌ رَّاضِيَةٌ فِيْمَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ وَأُسْنِدَ اِلَى الْمَفْعُوْلِ بِهٖ اِذِ الْعِيْشُ مَرْضِيَّةٌ وَسَيْلٌ مُفْعَمٌ فِيْ عَكْسِهٖ اَعْنِيْ فِيْمَا بُنِيَ لِلْمَفْعُوْلِ وَاُسْنِدَ اِلَى الْفَاعِلِ لِاَنَّ السَّيْلَ هُوَ الَّذِيْ يُفْعِمُ اَيْ يَمْلَأُ مِنْ اَفْعَمْتُ الْاِنَاءَ اِذَا مَلَأْتَهٗ وَشِعْرٌ شَاعِرٌ فِي الْمَصْدَرِ وَالْاَوْلَى التَّمْثِيْلُ بِنَحْوِ جَدَّ جِدُّهٗ لِاَنَّ الشِّعْرَ هٰهُنَا بِمَعْنَى الْمَفْعُوْلِ وَنَهَارُهٗ صَائِمٌ فِي الزَّمَانِ وَنَهْرٌ جَارٍ فِي الْمَكَانِ لِاَنَّ الشَّخْصَ صَائِمٌ فِي النَّهَارِ وَالْمَاءُ جَارٍ فِي النَّهْرِ وَبَنَى الْاَمِيْرُ الْمَدِيْنَةَ فِي السَّبَبِ وَيَنْبَغِيْ اَنْ يُعْلَمَ اَنَّ الْمَجَازَ الْعَقْلِيَّ يَجْرِيْ فِي النِّسْبَةِ الْغَيْرِ الْاِسْنَادِيَّةِ اَيْضًا مِنَ الْاِضَافِيَّةِ وَالْاِيْقَاعِيَّةِ نَحْوُ اَعْجَبَنِيْ اِنْبَاتُ الرَّبِيْعِ وَجَرْيُ الْاَنْهَارِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا وَمَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَنَحْوُ نَوَّمْتُ اللَّيْلَ وَاَجْرَيْتُ النَّهْرَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ وَالتَّعْرِيْفُ الْمَذْكُوْرُ اِنَّمَا هُوَ لِلْاِسْنَادِيْ اَللّٰهُمَّ اِلَّا اَنْ يُرَادَ بِالْاِسْنَادِ مُطْلَقُ النِّسْبَةِ وَهٰهُنَا مَبَاحِثُ نَفِيْسَةٌ وَشَّحْنَا بِهَا الشَّرْحَ ـ

অনুবাদ : যেমন, তাদের উক্তি– عِيْشَةٌ رَاضِيَةٌ **(মনোমুগ্ধকর জীবন)** (رَاضِيَةٌ) এটি ফায়েলের জন্য বানানো; অথচ নিসবত করা হয়েছে মাফউলে বিহীর দিকে, কেননা, (মূলবাক্য এরূপ) عِيْشَةٌ مَرْضِيَّةٌ এবং سَيْلٌ مُفْعَمٌ **(পরিব্যাপ্ত প্লাবন) এর উল্টো**। অর্থাৎ এটি (مُفْعَمٌ)-কে বানানো হয়েছে মাফউলের জন্য, কিন্তু একে ফায়েলের দিকে নিসবত করা হয়েছে। কেননা, প্লাবন বা বন্যাই ভরে– পরিপূর্ণ করে দেয়। এটি اَفْعَمْتُ الْاِنَاءَ থেকে নেওয়া হয়েছে। (যার অর্থ আমি পাত্র ভরে দিলাম) اَفْعَمْتُ الْاِنَاءَ তুমি তখন বল, যখন তুমি পাত্র ভরে দাও এবং شِعْرٌ شَاعِرٌ **(সারগর্ভ কবিতা)** মাসদারের দিকে ইসনাদ হয়েছে, তবে এখানে جَدَّ جِدُّهٗ দ্বারা উদাহরণ দেওয়া উত্তম হতো। কেননা, এখানে شِعْر (মাসদারটি) ইসমে মাফউলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং نَهَارُهٗ صَائِمٌ **(তার দিবস রোজাদার)** এতে কালের প্রতি ইসনাদ হয়েছে এবং نَهْرٌ جَارٍ **(প্রবাহিত নদী)** এতে স্থানের প্রতি ইসনাদ হয়েছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে দিনের বেলায় ব্যক্তি রোজাদার হয় এবং পানি প্রবাহিত হয় নদীর মধ্যে। **এবং** (আরেকটি مجاز-এর উদাহরণ হলো) بَنَى الْاَمِيْرُ الْمَدِيْنَةَ **(রাজা শহরটি নির্মাণ করলেন)** এতে ইসনাদ কার্যকারণের দিকে হয়েছে।

জানা উচিত যে, مَجَاز عَقْلِي ইসনাদ ছাড়া অন্যান্য নিসবত তথা ইযাফত এবং ইকাইয়্যাহ (ايقاعيه)-এর ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। যেমন– اَعْجَبَنِيْ اِنْبَاتُ الرَّبِيْعِ وَجَرْيُ الْاَنْهَارِ (আমাকে বসন্তকালের উৎপাদন এবং নদ-নদীর প্রবাহ মুগ্ধ করেছে)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا (যদি তুমি তাদের মধ্যকার মতবিরোধকে ভয় কর) এবং مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (দিন-রাতের ষড়যন্ত্র) এ সকলই হলো اضافت-এর ক্ষেত্রে مجاز-এর উদাহরণ। এবং যেমন– نَوَّمْتُ اللَّيْلَ (আমি রাতকে ঘুম পাড়িয়েছি), وَاَجْرَيْتُ النَّهْرَ (আমি নদীকে প্রবাহিত করেছি) এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَاتُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ (তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের নির্দেশের আনুগত্য করো না) এগুলো نِسْبَت اِيْقَاعِي-এর উদাহরণ। অথচ উল্লিখিত সংজ্ঞাটি শুধুমাত্র ইসনাদীর জন্য। اَللّٰهُمَّ (হে আল্লাহ! তোমার সাহায্য কামনা করছি) তবে যদি ইসনাদ দ্বারা সাধারণ নিসবত উদ্দেশ্য করা হয়, তাহলে (উল্লিখিত আপত্তি থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।) এ প্রসঙ্গে কিছু উৎকৃষ্ট আলোচনা রয়েছে, যা দ্বারা আমি ব্যাখ্যাগ্রন্থ (মুতাওওয়াল)-কে অলঙ্কৃত করেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ كَقَوْلِهِمْ عِيْشَةٌ رَاضِيَةٌ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) مَجَاز عَقْلِي-এর বেশ কয়েকটি উদাহরণ এনেছেন, উদাহরণগুলোতে ফে'লের নিসবত مَا هُوَ لَهُ -এর দিকে না হয়ে কোথাও সবব, কোথাও স্থান বা কাল, আবার কোথাও ফায়েল বা মাফউলের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

প্রথম উদাহরণ : عِيْشَةٌ رَاضِيَةٌ এখানে عيشة শব্দের অর্থ– জীবনের অবস্থা। راضية হলো واحد اسم فاعل-এর مؤنث। ইসমে ফায়েলের জন্য ফায়েলের প্রয়োজন বা ইসমে ফায়েলকে গঠন করা হয়েছে ফায়েলের জন্য। এ উদাহরণে راضية-কে এর সর্বনাম-এর দিকে اسناد করা হয়েছে, যার مرجع হলো عيشة । عيشة প্রকৃতপক্ষে مَفْعُول بِهِ। এর কারণ হলো, জীবন সন্তুষ্ট হতে পারে না; বরং মানুষ জীবনের উপর সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং عِيْشَةٌ رَاضِيَةٌ না হয়ে عِيْشَةٌ مَرْضِيَّةٌ হওয়া উচিত। উক্ত উদাহরণে ফায়েলের জন্য গঠিত ইসমে ফায়েলকে যেহেতু مَفْعُول بِهِ-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে বা مَا هُوَ لَهُ-এর غير-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে, এটাকে مَجَاز عَقْلِي বলা হবে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, راضية-কে যে সর্বনামের দিকে নিসবত করা হয়েছে তা تركيب-এর মধ্যে যদিও فاعل হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা مفعول به, কেননা, এটি مفعول-এর সর্বনাম এবং عيشة রাজি হয় না; বরং عيشة-এর উপর জীবনধারী ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো راضية-এর ইসনাদ عيشة সর্বনামের দিকে করা হয়েছে। সরাসরি عيشة-এর দিকে করা হয়নি। যদিও উভয়ের ইসনাদের বক্তব্য একই। তারপরও عيشة-এর দিকে ফিরেছে একথা বলা হয়নি। কারণ, عيشة তারকীবের মধ্যে মুবতাদা হয়েছে। আর মূল লেখকের মতানুসারে مبتدأ-এর দিকে সর্বনাম-এর ইসনাদ করা হলে সেটি حقيقة এবং مجاز কোনোটারই অন্তর্ভুক্ত হয় না; বরং মুবতাদার দিকে ইসনাদ করা হলে তা হাকীকত এবং مجاز-এর মাঝামাঝি অবস্থান করে।

অতএব, যদি বলা হয় راضية-এর مرجع সরাসরি عشية তাহলে এটি مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ হতে পারবে না। এ দু'টি বিষয় আগত সব উদাহরণের বেলায়ও প্রজোয্য হবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ : سَيْلٌ مُفْعَمٌ ، سيل শব্দের অর্থ– বন্যা, প্লাবন এবং বৃষ্টির পানির ঢল। مُفْعَمٌ এটি أَفْعَمَ (باب افعال) থেকে এসেছে। এটি اسم مفعول-এর সীগাহ। اَلْإِفْعَامُ-এর অর্থ– ভরে দেওয়া, পূর্তি করা। যেমন, বলা হয়– افعمت الاناء আমি পাত্র ভরে দিলাম। বলা হয় أَفْعَمَ السَّيْلُ الْوَادِيَ আলোচ্য উদাহরণে مُفْعَمٌ শব্দটি اسم مفعول, যা গঠিত হয়েছে مفعول-এর জন্য। কিন্তু مفعول-এর দিকে ইসনাদ না করে فاعل-এর দিকে ইসনাদ করা হয়েছে। কেননা, এখানে مفعم-এর উহ্য সর্বনামের مرجع হলো سيل, যা প্রকৃতপক্ষে إِفْعَامٌ-এর ফায়েল। مُفْعَمٌ (اسم مفعول) গঠিত হয়েছে مفعول-এর জন্য; কিন্তু তাকে مفعول-এর দিকে নিসবত না করে ফায়েলের দিকে নিসবত করা হয়েছে। অতএব, এখানে নিসবত مَا هُوَ لَهُ-এর غير-এর দিকে হলো। এ কারণে এটি مَجَاز عَقْلِي।

তৃতীয় উদাহরণ : شِعْرٌ شَاعِرٌ، شِعْر শব্দের অর্থ– কবিতা, কবিতার চরণ, এর বহুবচন أَشْعَارٌ ; শব্দটি مصدر ; شَاعِرٌ অর্থ– কবি, এটি اسم فاعل-এর সীগাহ। এটিকে গঠন করা হয়েছে فاعل-এর জন্যে। এর ইসনাদ সর্বনামের দিকে হয়েছে, যা এর মধ্যে উহ্য আছে। তবে সর্বনামের مرجع হলো شعر মাসদার। আমরা জানি, কবি কোনো ব্যক্তি হবে। কাজটি কবি হতে পারে না। অতএব, এখানে فاعل-এর দিকে নিসবত না করে মাসদারের দিকে করা হয়েছে। কাজেই ইসনাদ مَا هُوَ لَهُ-এর দিকে হয়নি। এ কারণে এটি مجاز عقلى হবে। আরবরা ইসনাদকে مصدر-এর দিকে করে مبالغة বুঝানোর জন্য।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মাসদারের দিকে ইসনাদের জন্য উত্তম উদাহরণ হলো جَدَّ جِدُّهُ (তার চেষ্টা সফল হয়েছে) এখানে جَدَّ ফে'লটি معروف বা ফায়েলের জন্য বানানো, কিন্তু এটি এখানে ফায়েলের (صَاحِب جَدّ বা চেষ্টাকারীর) দিকে নিসবত হয়নি; বরং এটি মাসদারের দিকে নিসবত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো যে, এটিকে পূর্বের উদাহরণ থেকে উত্তম বলার কারণ কি? এর উত্তর হলো, এখানে شِعْر (মাসদার) اسم مفعول-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে মতে شَاعِر-এর সর্বনাম

যার مرجع হলো شعر (মাসদার) বাহ্যত হলেও তা ইসমে মাফউলের দিকে হয়েছে। অতএব, এখানে إِسْنَادٌ إِلَى الْمَصْدَرِ হলো না; বরং إِسْنَادٌ إِلَى الْمَفْعُوْلِ হয়ে গেল। তাই جد جده উদাহরণটি উত্তম। কারণ, এতে إِسْنَادٌ إِلَى الْمَصْدَرِ হওয়ার মধ্যে কোনোরূপ সন্দেহ নেই।

চতুর্থ উদাহরণ : نَهَارُهُ صَائِمٌ এখানে نَهَارٌ শব্দের অর্থ– দিবস, "ہ" সর্বনামের مرجع হলো রোজাদার ব্যক্তি, صَائِمٌ হলো اسم فاعل-এর সীগাহ। এ উদাহরণে صائم যা ফায়েলের জন্য বানানো হয়েছে; তার ইসনাদ উহ্য সর্বনামের দিকে করা হয়েছে। সেই সর্বনামটির مرجع হলো نهار (ظرف زمان) শব্দটি। অতএব, ফায়েলের জন্য গঠিত شبه فعل-এর ইসনাদ ظرف-এর দিকে হওয়ার কারণে إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ হয়েছে। কেননা, ব্যক্তি রোজাদার হয়, কোনো দিবস রোজাদার হয় না। আর إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ হলে তা مَجَاز عَقْلِي-এর মধ্যে গণ্য হয়।

পঞ্চম উদাহরণ : نَهْرٌ جَارٍ অর্থাৎ নহর প্রবাহিত। এখানে نَهْرٌ শব্দের অর্থ নদী এর বহুবচন أَنْهَارٌ, جَارٍ এটি جَرَى-يَجْرِيْ-এর إِسْم فَاعِل-এর সীগাহ। এ উদাহরণে جار যা ফায়েলের জন্য বানানো হয়েছে, তাকে এখানে উহ্য সর্বনামের দিকে ইসনাদ করা হয়েছে। সর্বনামটির مرجع হলো نهر যা মূল ফায়েল ماء-এর জন্য ظَرْف مَكَان কেননা, পানি প্রবাহিত হয় নদীর মাঝে, নদী প্রবাহিত হয় না। তাই এখানে إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ হয়েছে। আর إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ হলে তা مَجَاز عَقْلِي বলে গণ্য হয়।

ষষ্ঠ উদাহরণ : بَنَى الْأَمِيْرُ الْمَدِيْنَةَ (রাজা শহরটি নির্মাণ করলেন) بَنٰى - فِعْل مَعْرُوْف-এর অর্থ– নির্মাণ করা اَلْمَدِيْنَةَ বা শহর নির্মাণ করে নির্মাণ শ্রমিকরা। أَمِيْرٌ বা রাজা সেই নির্মাণ শ্রমিকদের নির্দেশ দিয়ে থাকে। অতএব, এখানে بنى-এর নিসবত তার মূল ফায়েল– নির্মাণ শ্রমিকদের প্রতি না করে নির্দেশদাতা যিনি নির্মাণের سبب তার প্রতি নিসবত করা হয়েছে। আর এ কারণে এটি مَجَاز عَقْلِي বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ وَيَنْبَغِيْ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمَجَازَ الْعَقْلِيَ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, حَقِيْقَة عَقْلِيَّة এবং مَجَاز عَقْلِي শুধুমাত্র نِسْبَةُ الْإِسْنَادِيَّة-এর মধ্যেই হয় না; বরং اسنادى-এর মতো غَيْر إِسْنَادِي-এর ক্ষেত্রেও مَجَاز عَقْلِي হয়ে থাকে। এখানে نِسْبَت غَيْر إِسْنَادِي বলতে اضافى এবং ايقاعيه-কে বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নিসবতে ইসনাদী বলা হয় نِسْبَت تَامَّه-কে, আর نِسْبَت غَيْر إِسْنَادِيْ বলা হয় নিসবতে নাকেসাকে।

এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের উপর আপত্তি তুলছেন যে, তিনি مَجَاز عَقْلِي-এর সংজ্ঞার মধ্যে শুধুমাত্র اسناد-কে শামিল করলেন; অথচ আমরা দেখি نِسْبَت غَيْر تَامَّة-এর ক্ষেত্রেও مَجَاز عَقْلِي হয়ে থাকে।

এরপর মুসান্নিফ নিসবতে ইযাফী এবং ইকাইয়্যা-এর কতগুলো উদাহরণ পেশ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে مَجَاز عَقْلِي পাওয়া গেছে। প্রথমত তিনি ইযাফীর উদাহরণ দিয়েছেন।

প্রথম উদাহরণ : أَعْجَبَنِيْ إِنْبَاتُ الرَّبِيْعِ وَجَرْيُ الْأَنْهَارِ অর্থাৎ আমাকে বসন্ত কালের শস্য উৎপাদন এবং নদ-নদীর প্রবাহ মুগ্ধ করেছে। এখানে انبات-এর نسبة اضافى হয়েছে اَلرَّبِيْعُ-এর দিকে। এমনিভাবে جَرْي-এর نِسْبَة إِضَافِي হয়েছে اَلْأَنْهَارُ-এর দিকে। উভয়স্থানে মাসদারের اضافت হয়েছে; কিন্তু إِنْبَات-এর জন্য رَبِيْع এবং جَرْي-এর জন্যে اَلْأَنْهَارُ প্রকৃত مضاف اليه (ফায়েল) নয়; বরং উভয়স্থানে نِسْبَة إِضَافِي তার مُضَاف إِلَيْه مَجَازِي (ফায়েল)-এর দিকে হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا (আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তোমরা ভয় কর তাদের মাঝের মতবিরোধের) এ আয়াতে شقاق মাসদার-এর اضافت বাহ্যত হয়েছে ظرف-এর দিকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর مضاف اليه হবে الزوجين কারণ আয়াতের মূল তারকীব হলো এভাবে إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ الزَّوْجَيْنِ فِي الْحَالَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَهُمَا তাই এখানে إِلَى مَا هُوَ لَهُ-এর দিকে নিসবত করা হয়নি; বরং এখানে إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ-এর দিকে হয়েছে। এ কারণে এটি مَجَاز عَقْلِي বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় উদাহরণ : مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ অর্থ– রাত ও দিনের ষড়যন্ত্র। এ উদাহরণে مكر মাসদারের اضافت হয়েছে ليل এবং نهار-এর দিকে, এ اضافت টি مجاز হয়েছে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ইবারত হবে مَكْرُ النَّاسِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ লোকদের ষড়যন্ত্র রাত এবং দিনে।

نِسْبَتْ اِيْقَاعِى-এর উদাহরণ : نَوَّمْتُ اللَّيْلَ وَاَجْرَيْتَ النَّهْرَ অর্থাৎ আমি রাতকে ঘুম পাড়িয়েছি এবং নদীকে প্রবাহিত করেছি। উভয় বাক্যতে مجاز হয়েছে। কারণ, আমরা জানি, রাতকে ঘুম পাড়ানো যায় না। যেমনটি নদীকে প্রবাহিত করা যায় না। মূল ইবারত হবে نَوَّمْتُ الشَّخْصَ فِى اللَّيْلِ আমি লোকটিকে রাতে ঘুম পাড়িয়েছি এবং اَجْرَيْتُ الْمَاءَ فِى النَّهَارِ আমি নদীতে পানি প্রবাহিত করেছি। সুতরাং এখানে ঘুম পাড়ানো রাতকে এবং প্রবাহিত করা নদীকে নিসবতে ইকায়ী, যার মধ্যে মাজায পাওয়া গেল।

نِسْبَتْ اِيْقَاعِى-এর আরেকটি উদাহরণ : وَلَا تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ তথা তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের নির্দেশের আনুগত্য করো না। এখানে اطاعت (আনুগত্য)-কে নির্দেশের উপর ايقاع করা হচ্ছে। তাই এটি نِسْبَتْ اِيْقَاعِى-এর মাঝে مجاز হয়েছে, এরূপে যে, আনুগত্যকে নির্দেশদাতার উপর ايقاع করা হয়। امر বা নির্দেশের উপর ايقاع করা হয় না। তাই এখানে ايقاع-এর নিসবত مَا هُوَ لَهٗ-এর দিকে হয়নি। আর এ কারণে এটি مَجَازْ عَقْلِى-এর মধ্যে গণ্য হবে।

قَوْلُهٗ اَللّٰهُمَّ اِلَّا اَنْ يُرَادَ بِالْاِسْنَادِ مُطْلَقُ الخ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের সংজ্ঞার উপর যে আপত্তি করেছিলেন, তার একটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যার দ্বারা মূল লেখকের সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূল লেখকের সংজ্ঞার اسناد শব্দটি যদিও نسبت تامه-কে বুঝায়, কিন্তু এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাধারণ নিসবত, যা تامه এবং غَيْر تَامَّه-কে শামিল করে। مَجَازْ مُرْسَلْ হিসেবে এ ধরনের উদ্দেশ্য নেওয়া যায়। যেমন- اِطْلَاقُ الْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ (কায়েদযুক্ত শব্দকে কয়েদবিহীন শব্দের উপর প্রয়োগ করা) সাধারণ নিসবত উদ্দেশ্য হলে উপরোক্ত আপত্তি আর থাকে না। কেননা, তখন نِسْبَتْ تَامَّه এবং نِسْبَتْ غَيْر تَامَّه উভয়ে শামিল হয়ে যাবে। نِسْبَتْ غَيْر تَامَّه-এর মধ্যে نِسْبَتْ اِضَافِىْ وَاِيْقَاعِىْ উভয়টি অন্তর্ভুক্ত।

এখানে প্রশ্ন হলো, মুসান্নিফ (র.) আপত্তির জবাবটির মধ্যে اللهم শব্দটি কেন আনলেন? কেননা, اللهم শব্দটি জবাবের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে। এর উত্তর হলো জবাবটি আসলেই দুর্বল। কারণ, এখানে যে প্রক্রিয়ায় জবাব দেওয়া হয়েছে তা হলো- اِطْلَاقُ الْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ আর এটি হলো এক ধরনের مجاز । আর সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে مجاز-এর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। কেউ কেউ আপত্তির জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, এ مجاز টি তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ। তাই এর ব্যবহারে ব্যাপকতা রয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

লেখক উপরোক্ত ইবারত مَجَازْ عَقْلِى-এর কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন-

১. عِيْشَةٌ رَاضِيَةٌ এ উদাহরণে ফে'লকে ফায়েলের দিকে নিসবত না করে مفعول به-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে।

২. سَيْلٌ مُفْعَمٌ এ উদাহরণে ফে'লকে মাফউলের দিকে নিসবত না করে ফায়েলের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

৩. شِعْرٌ شَاعِرٌ এ উদাহরণ ফে'লকে মাসদারের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

৪. نَهَارُهٗ صَائِمٌ এ উদাহরণে ফে'লকে কালের প্রতি নিসবত করা হয়েছে।

৫. نَهْرٌ جَارٍ এ উদাহরণে ফে'লকে স্থানের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

৬. بَنَى الْاَمِيْرُ الْمَدِيْنَةَ এ উদাহরণে ফে'লকে سبب-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, اسناد-এর মাঝে যেমন مَجَازْ عَقْلِى হয়, তদ্রূপ اضافت ও ايقاع-এর মাঝেও مجاز হয়। যেমন-

১. اَعْجَبَنِىْ اِنْبَاتُ الرَّبِيْعِ وَجَرْىُ الْاَنْهَارِ

২. وَلَا تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ

وَقَوْلُنَا فِى التَّعْرِيْفِ بِتَاوُّلٍ يُخْرِجُ نَحْوَ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِ أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ رَائِيًا الْاِنْبَاتَ مِنَ الرَّبِيْعِ فَإِنَّ هٰذَا الْإِسْنَادَ وَإِنْ كَانَ إِلٰى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ فِى الْوَاقِعِ لٰكِنْ لَا تَاوُّلَ فِيْهِ لِأَنَّهُ مُرَادُهُ وَمُعْتَقَدُهُ وَكَذَا شَفَى الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ وَنَحْوُ ذٰلِكَ مِمَّا يُطَابِقُ الْاِعْتِقَادَ دُوْنَ الْوَاقِعِ فَقَوْلُهُ بِتَاوُّلٍ يُخْرِجُ ذٰلِكَ كَمَا يُخْرِجُ الْأَقْوَالَ الْكَاذِبَةَ وَهٰذَا تَعْرِيْضٌ بِالسَّكَّاكِىْ حَيْثُ جَعَلَ التَّاوُّلَ لِإِخْرَاجِ الْأَقْوَالِ الْكَاذِبَةِ فَقَطْ وَلِلتَّنْبِيْهِ عَلٰى هٰذَا تَعَرَّضَ الْمُصَنِّفُ فِى الْمَتْنِ لِبَيَانِ فَائِدَةِ هٰذَا الْقَيْدِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ ذٰلِكَ مِنْ دَأْبِهِ فِى هٰذَا الْكِتَابِ وَاقْتَصَرَ عَلٰى بَيَانِ إِخْرَاجِهِ بِنَحْوِ قَوْلِ الْجَاهِلِ مَعَ أَنَّهُ يُخْرِجُ الْأَقْوَالَ الْكَاذِبَةَ أَيْضًا ـ

অনুবাদ : (মূল লেখক বলেন,) সংজ্ঞার মধ্যে **আমাদের** تَاوُّلٌ **কথাটি ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হওয়া নাস্তিকের** উক্তি أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ (এমতাবস্থায় যে, সে সবজি উৎপাদনকারী হিসেবে বসন্তকালকেই বিশ্বাস করে)-কে সংজ্ঞা থেকে বের করে দেয়। এ ইসনাদ যদিও غَيْرُ مَا هُوَ لَهُ-এর দিকে হয়েছে, কিন্তু এর জন্য তো কোনো দলিল নেই। কেননা, এটি উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাস অনুযায়ী হয়েছে। এমনিভাবে চিকিৎসক রোগীকে আরোগ্য দান করেছে এবং এ জাতীয় উদাহরণ যা বিশ্বাসের মোতাবেক; কিন্তু বাস্তবতার মোতাবেক নয় (সেগুলোকে বের করে দেয়)। সুতরাং তার উক্তি تَاوُّلٌ সেগুলোকে বের করে দেয় যেমনিভাবে সাধারণ মিথ্যা কথাকে বের করে দেয়। এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য মূল লেখক মূল ইবারতে এ قَيد-এর উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। অথচ এটি (فَوَائِد قُيُوْد বর্ণনা করা) এ কিতাবে তার স্বভাবগত বিষয় নয়। আর তিনি কাফিরের উক্তি বের করার উপর বিষয়টি সীমাবদ্ধ করেছেন; অথচ এটি মিথ্যা কথাকে বের করে দেয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقَوْلُنَا فِى التَّعْرِيْفِ الخ **:** উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখক তাঁর সংজ্ঞায় বর্ণিত শব্দ تَاوُّلٌ কয়েদটির উপকারিতা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, مَجَاز عَقْلِى-এর সংজ্ঞায় বর্ণিত تَاوُّلٌ (দলিল-লক্ষণ)-এর قَيد দ্বারা নাস্তিকের উক্তি أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ-কে مَجَاز عَقْلِى থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এটা তখনই হবে যখন নাস্তিক একথা বিশ্বাস করবে যে, বসন্তকালই সবজির উৎপাদন ঘটায়, আল্লাহ তা'আলা উৎপাদনকারী নন। এ উদাহরণটি مَجَاز عَقْلِى থেকে বের হয়ে যাবে। এর কারণ হচ্ছে, নাস্তিকের বক্তব্য যদিও বাস্তবতা বিবর্জিত হয়েছে এবং উদাহরণে إِسْنَادٌ إِلٰى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ হয়েছে; কিন্তু এখানে এমন কোনো দলিল বা লক্ষণ নেই, যা একথা প্রমাণ করবে যে, إِسْنَادٌ إِلٰى مَا هُوَ لَهُ হয়নি; বরং إِسْنَادٌ إِلٰى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ-এর দিকে হয়েছে।

এখানে দলিল বা লক্ষণ না থাকার কারণ হচ্ছে, নাস্তিকের বিশ্বাস, নাস্তিক বিশ্বাস করে বসন্তকালই শষ্যাদি উৎপাদন করে। মুসান্নিফ (র.) বলেন– شَفَى الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ (ডাক্তার রোগী ভালো করেছেন) এটি যখন কাফির বলবে তখন এটিও مَجَاز عَقْلِى-এর সংজ্ঞার আওতায় আসবে না। কেননা, এখানে কোনো দলিল-লক্ষণ নেই। এমনিভাবে ঐ সকল উদাহরণ مَجَاز عَقْلِى থেকে বের হয়ে যাবে, যার মধ্যে ইসনাদ বক্তার বিশ্বাসের মোতাবেক হয়; কিন্তু বাস্তবের মোতাবেক হয় না। যেমন– নাস্তিকের উক্তি اَحْرَقَتِ النَّارُ الْحَطَبَ (আগুন লাকড়ি জ্বালিয়েছে) এবং قَطَعَ السِّكِّيْنُ الْحَبْلَ (চাকু রশি কেটে দিয়েছে।)

মুসান্নিফ (র.) বলেন, تَاوُّلٌ-এর قَيد যেমনটি اَقْوَال كَاذِبَة (মিথ্যা কথা)-কে দলিল বা লক্ষণ না থাকায় مَجَاز عَقْلِى থেকে বের করে দেয় তেমনি বাস্তবতার মোতাবেক নয়, এমন উদাহরণগুলোকে বের করে দেয়।

মিথ্যা কথার উদাহরণ : যেমন কেউ বলল ذَهَبَ خَالِدٌ (খালেদ চলে গেল) অথচ সে জানে খালেদ যায়নি। এ উদাহরণে ذَهَبَ ফে'লটির ইসনাদ مَا هُوَ لَهٗ-এর দিকে হয়নি; বরং غَيْرِ مَا هُوَ لَهٗ-এর দিকে হয়েছে। এতদসত্ত্বেও যেহেতু غَيْرِ مَا هُوَ لَهٗ-এর দিকে হওয়ার কোনো দলিল নেই, তাই এটি مَجَاز عَقْلِى-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং এটি حَقِيْقَة عَقْلِيَّة-এর মধ্যেই পড়বে, যেমনটি ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, মুসান্নিফ মিথ্যা কথা এবং নাস্তিকের উক্তিকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তার মতে নাস্তিকের উক্তি মিথ্যা কথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

বাস্তবতার বিপরীত কথাকে যদিও মিথ্যা বলা হয়, কিন্তু এখানে নাস্তিকের কথা যেহেতু তার বিশ্বাস মোতাবেক হয়েছে এবং সে এটি সত্য হওয়ার বিশ্বাস করে তাই এটিকে মিথ্যা কথার অন্তর্ভুক্ত না করায় মুসান্নিফের মতটিই যুক্তিযুক্ত।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূল লেখক قَوْلُنَا بِتَأَوُّلٍ يُخْرِجُ الخ এ ইবারত দ্বারা আল্লামা সাক্কাকীর বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। উল্লেখ্য যে, আল্লামা সাক্কাকী تَأَوُّل-এর قيد দ্বারা مَجَاز عَقْلِى-এর সংজ্ঞা থেকে শুধুমাত্র মিথ্যা কথাকে বের করেছেন। তিনি নাস্তিকের উক্তি أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ-কে বের করেননি। মূল লেখক তার উপরোক্ত ইবারত দ্বারা এটাই প্রমাণ করেছেন যে, تَأَوُّل-এর কয়েদ দ্বারা যেমন মিথ্যা কথা বের হয়ে যায়, তেমনি নাস্তিকের উক্তিও বের হয়ে যায়। মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখক এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই তার স্বভাববিরুদ্ধভাবে এখানে فَوَائِد قُيُوْد বর্ণনা করেছেন। অথচ এ কিতাবে فَوَائِد قُيُوْد বর্ণনা করতে তাকে দেখা যায় না। আর এ কয়েদ দ্বারা শুধুমাত্র নাস্তিকের উক্তিকে বের করেছেন। অথচ এ قيد দ্বারা নাস্তিকের উক্তির মতো মিথ্যা কথাও مَجَاز عَقْلِى থেকে বের হয়ে যায়।

সার-সংক্ষেপ :

লেখক তার ইবারতে উল্লিখিত تَأَوُّل শব্দটির উপযোগিতা বর্ণনা করছেন। লেখক বলেন, مجاز প্রমাণের জন্য দলিলের প্রয়োজন। যেমন ইতঃপূর্বে নাস্তিকের সে উক্তি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে- أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ-এর মধ্যে إِسْنَادٌ إِلٰى غَيْرِ مَا هُوَ لَهٗ হওয়া সত্ত্বেও একে مجاز বলা যাচ্ছে দলিলের অভাবে যে, মুতাকাল্লিমের যাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

লেখকের মতে تَأَوُّل এ জাতীয় উক্তিকে (যেমন مَجَاز عَقْلِى-কে, বের করে দেয়) তদ্রূপ اَلْاَقْوَالُ الْكَاذِبَةُ-কেও বের করে দেয়। পক্ষান্তরে আল্লামা সাক্কাকীর মতে تأول শুধুমাত্র اَقْوَال كَاذِبَة-কে বের করে।

وَلِهٰذَا اَىْ وَلِاَنَّ مِثْلَ قَوْلِ الْجَاهِلِ خَارِجٌ عَنِ الْمَجَازِ لِاِشْتِرَاطِ التَّاَوُّلِ فِيْهِ لَمْ يُحْمَلْ نَحْوُ قَوْلِهِ شِعْرٌ اَشَابَ الصَّغِيْرَ وَ اَفْنَى الْكَبِيْـ * ـرَ كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ ـ عَلَى الْمَجَازِ اَىْ عَلٰى اَنَّ اِسْنَادَ اَشَابَ وَ اَفْنٰى اِلٰى كَرِّ الْغَدَاةِ وَ مَرِّ الْعَشِيِّ مَجَازٌ مَا دَامَ لَمْ يُعْلَمْ اَوْ لَمْ يُظَنَّ اَنَّ قَائِلَهُ اَىْ قَائِلَ هٰذَا الْقَوْلِ لَمْ يَعْتَقِدْ ظَاهِرَهُ اَىْ ظَاهِرَ الْاِسْنَادِ لِاِنْتِفَاءِ التَّاَوُّلِ ج لِاِحْتِمَالِ اَنْ يَكُوْنَ هُوَ مُعْتَقِدًا لِلظَّاهِرِ فَيَكُوْنُ مِنْ قَبِيْلِ قَوْلِ الْجَاهِلِ اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ كَمَا اُسْتُدِلَّ يَعْنِىْ مَا لَمْ يُعْلَمْ وَلَمْ يُسْتَدَلَّ بِشَيْءٍ عَلٰى اَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ظَاهِرَهُ مِثْلَ الْاِسْتِدْلَالِ عَلٰى اَنَّ اِسْنَادَ مَيَّزَ اِلٰى جَذْبِ اللَّيَالِىْ فِىْ قَوْلِ اَبِى النَّجْمِ شِعْرٌ مَيَّزَ عَنْهُ اَىْ عَنِ الرَّاْسِ قُنْزَعًا عَنْ قُنْزَعٍ * هُوَ الشَّعْرُ الْمُجْتَمِعُ فِىْ نَوَاحِى الرَّاْسِ جَذْبُ اللَّيَالِىْ اَىْ مُضِيُّهَا وَاخْتِلَافُهَا اِبْطِئِىْ اَوْ اِسْرَعِىْ حَالٌ مِنَ اللَّيَالِىْ عَلٰى تَقْدِيْرِ الْمَقُوْلِ اَىْ مَقُوْلًا فِيْهَا وَيَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ الْاَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ مَجَازٌ خَبَرُ اِنَّ اَىْ اُسْتُدِلَّ عَلٰى اَنَّ اِسْنَادَ مَيَّزَ اِلٰى جَذْبِ اللَّيَالِىْ مَجَازٌ بِقَوْلِهِ مُتَعَلِّقٌ بِاُسْتُدِلَّ اَىْ بِقَوْلِ اَبِى النَّجْمِ عَقِيْبَهُ اَىْ عَقِيْبَ قَوْلِهِ مَيَّزَ عَنْهُ قُنْزَعًا عَنْ قُنْزَعٍ اَفْنَاهُ اَىْ اَبَا النَّجْمِ اَوْ شَعْرَ رَاْسِهِ قِيْلُ اللّٰهِ اَىْ اَمْرُهُ وَاِرَادَتُهُ لِلشَّمْسِ اُطْلُعِىْ فَاِنَّهُ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ فِعْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَنَّهُ الْمُبْدِئُ وَالْمُعِيْدُ وَالْمُنْشِئُ وَالْمُفْنِىْ فَيَكُوْنُ الْاِسْنَادُ اِلٰى جَذْبِ اللَّيَالِىْ بِتَاَوُّلٍ عَلٰى اَنَّهُ زَمَانٌ اَوْ سَبَبٌ ـ

অনুবাদ : **আর এ কারণে** অর্থাৎ এতে تَاَوُّلْ-এর শর্তের কারণে যেহেতু নাস্তিকের উক্তি মাজাযের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যায় একই কারণে **কবির কবিতাটিকে মাজাযের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কবিতার চরণ : সকাল এবং সন্ধ্যার আবর্তন শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করেছে এবং বয়স্ক ব্যক্তিকে মৃত্যুমুখে পতিত করেছে।** অর্থাৎ اَشَابَ ও اَفْنٰى (ফে'লদ্বয়)-এর ইসনাদ যথাক্রমে كَرُّ الْغَدَاةِ এবং مَرُّ الْعَشِيِّ-এর দিকে মাজায হবে না **যে পর্যন্ত না জানা যাবে অথবা প্রবল ধারণা করা যাবে যে, এর রচয়িতা** অর্থাৎ এ কবিতার রচয়িতা **কবিতার প্রকাশ্য অর্থকে বিশ্বাস করে না,** অর্থাৎ প্রকাশ্য ইসনাদ। কেননা, তখন দলিল-লক্ষণ না থাকার কারণে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, রচয়িতা যাহিরী ইসনাদকেই বিশ্বাস করে, তবে এটা নাস্তিকের উক্তির মতোই হবে। **যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে** অর্থাৎ যে পর্যন্ত জানা না যাবে এবং কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণ করা না যাবে যে, সে প্রকাশ্য ইসনাদের ইচ্ছা করেনি। যেমন প্রমাণ করা হয়েছে যে, مَيَّزَ-**এর নিসবত** جَذْبُ اللَّيَالِىْ-এর মধ্যে **আবুন নাজ্মের কবিতায় কবিতার চরণ : তার মাথার একটি চুলের গোছা আরেকটি গোছা থেকে পৃথক করেছে** قُنْزَعًا শব্দের অর্থ মাথার পার্শ্বদেশে জমানো চুল। **রাতের আবর্তন** অর্থাৎ অতিক্রম ও পালাবদল। (হে রাত) তুমি দ্রুত অতিক্রম কর অথবা ধীরে অতিক্রম কর। **এ দু'টি** (অর্থাৎ اِبْطِئِىْ অথবা اِسْرَعِىْ) اَللَّيَالِىْ থেকে حال হয়েছে, উহ্য مَقُوْل-এর সহযোগিতায়। অর্থাৎ مَقُوْلًا فِيْهَا اِبْطِئِىْ وَ اِسْرَعِىْ এখানে امر বর্ণনামূলক বাক্যের অর্থেও হতে পারে। **এটি**

মাজায مجاز শব্দটি إن-এর خبر। অর্থাৎ ইবারত أُسْتُدِلَّ عَلَى أَنَّ إِسْنَادَ مَيَّزَ إِلَى جَذْبِ اللَّيَالِيْ অর্থাৎ রাতের আবর্তন এ কথার প্রতি ميز-এর ইসনাদ যে مجازى হয়েছে এর উপর তারই কবিতা দ্বারা প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। بقوله শব্দটি استدل-এর সাথে متعلق। ه-এর مرجع হলো আবুন নাজম। আবুন নাজমের কবিতা দ্বারা যা (পূর্ববর্তী পঙ্ক্তির) পরে এসেছে। অর্থাৎ তার কবিতাংশ مَيَّزَ عَنْهُ قُنْزَعًا عَنْ قُنْزَعٍ-এর পরে। **তাকে** অর্থাৎ আবুন নাজমকে অথবা তার মাথার চুলকে নিঃশেষ করে দিয়েছে **আল্লাহর তা'আলার নির্দেশ** অথবা তাঁর ইচ্ছা– (যা তিনি করেছেন) **সূর্যকে, তুমি উদয় হও**। তার কবিতার এ অংশটি প্রমাণ করে নিঃশেষ করা আল্লাহর কাজ। আর তিনিই প্রথম সূচনাকারী পুনুরুত্থানকারী, সৃষ্টিকর্তা এবং মৃত্যুদাতা। সুতরাং রাতের পালাবদলের দিকে নিসবতটি দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ হলো যে, এটি (ফে'ল সংঘটিত হওয়ার) সময় বা কারণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا اَىْ وَلِأَنَّ الخ : মূল লেখক বলেন, কাফরের উক্তি أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ মাজায থেকে এ কারণে বের হয়ে গেছে যে, এতে বাহ্যিক ইসনাদ উদ্দেশ্য নয়, এ কথার উপর কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। অথচ মাজায হওয়ার জন্য দলিল প্রমাণ থাকা জরুরি। সে একই কারণে কবি (صَلَتَان) সালাতান আল-আবদী আল-হামাসীর কবিতা (اَشَابَ الصَّغِيْرَ...)-এ ইসনাদ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ-এর দিকে হওয়া সত্ত্বেও মাজায হয়নি। কারণ তার কবিতায় এমন কোনো প্রমাণ নেই, যার সাহায্যে মাজায হওয়া সাব্যস্ত হবে। কবি আবদে কায়েস গোত্রের অধিবাসী ছিলেন (সূত্র মুতাওয়াল) আল্লামা জাহিয কিতাবুল হাইওয়ানে এ কবিতার কবি হিসেবে সালাতান আদ-দাব্বী-এর নাম উল্লেখ করেন এবং তিনি বলেন, সালাতান আদ-দাব্বী আর সালাতান আল-আবদী ও সালাতান আল-ফাহসা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। সালাতান আল-আবদীর নাম হচ্ছে কুছাম ইবনে খাবিয়্যাহ ইবনে আবদুল কাইস। কবিতাটি এরূপ–

اَشَابَ الصَّغِيْرَ وَ اَفْنَى الْكَبِيْـ * ـرَ كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ

এর পরের পঙ্ক্তিগুলো হলো–

اِذِ اللَّيْلَةُ اَهْرَمَتْ يَوْمَهَا * اَتَى بَعْدَ ذَالِكَ يَوْمٌ فَتِى

نَرُوْحُ وَنَغْدُوْ لِحَاجَاتِنَا * وَحَاجَةِ مَنْ عَاشَ لَاتَنْقَضِى

تَمُوْتُ مَعَ الْمَرْءِ حَاجَاتُهُ * وَتَبْقَى لَهُ حَاجَةٌ مَا بَقِى

কবিতার অর্থ– সকাল ও সন্ধ্যার আবর্তন **যুবককে** বৃদ্ধে পরিণত **করেছে আর বয়স্ক ব্যক্তিকে** মৃত্যুমুখে পতিত করেছে।

اَشَابَ এবং اَفْنَى দু'টি ফে'ল। এগুলোকে كَرُّ الْغَدَاةِ এবং مَرُّ الْعَشِيِّ-**এর প্রতি** নিসবত করা হয়েছে। এ ইসনাদকে مجاز বলা যাচ্ছে না। যে পর্যন্ত জানা না যায় যে, কবি এর যাহিরী অর্থ উদ্দেশ্য করেননি। এ কথা জানার আগ পর্যন্ত قرينه বা দলিল অবিদ্যমান। কেননা, এমনও হতে পারে যে, কবি বাক্যের যাহিরী ইসনাদে বিশ্বাসী ছিল এবং এটাই তার উদ্দেশ্য। তখন তো ইসনাদ مجازى হবে না; বরং حقيقى বলে গণ্য হবে।

এ কারণে কবির কবিতা নাস্তিকের উক্তি أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ-এর মতো হয়ে গেল। তবে যদি কোনোভাবে জানা যায় যে, কবি আল্লাহকে বিশ্বাস করত, তাহলে এটি مَجَاز عَقْلِى-এর মধ্যে গণ্য হবে। কারণ, কবির মু'মিন হওয়াটাই দলিল যে, সে যাহিরী ইসনাদ বিশ্বাস করে না এবং এটা তার উদ্দেশ্যও নয়। তখন اَشَابَ এবং اَفْنَى-এর ইসনাদ كَرُّ الْغَدَاةِ এবং مَرُّ الْعَشِيِّ-এর দিকে إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ হবে।

মোটকথা, এখানে যাহিরী ইসনাদ উদ্দেশ্য না হওয়ার কোনো দলিল যেহেতু নেই, তাই এটি مَجَاز عَقْلِى-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। এরপর মূল লেখক আরেকটি কবিতা পেশ করেন, যার মধ্যে প্রকাশ্য ইসনাদ উদ্দেশ্য না হওয়ার দলিল পাওয়া যায়। মুসলিম কবি আবুন নাজমের উক্তি– مَيَّزَ عَنْهُ قُنْزَعًا عَنْ قُنْزَعٍ * جَذْبُ اللَّيَالِىْ اِبْطِئِىْ وَاَسْرِعِىْ

কবিতায় ميز ফে'লটিকে ইসনাদ করা হয়েছে جَذْبُ اللَّيَالِيْ-এর দিকে। আর ইসনাদটি اِسْنَادٌ اِلٰى غَيْرِ مَا هُوَ لَهٗ হওয়ার কারণে মাজায-এর দলিল হচ্ছে, এরপর আবুন নাজম বলছেন اَفْنَاهُ قِيْلُ اللّٰهِ لِلشَّمْسِ اُطْلُعِيْ এ পঙ্ক্তিটি প্রমাণ করে আবুন নাজম একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল এবং সব কিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহকে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। অতএব, আবুন নাজম ميز-এর যে নিসবত جَذْبُ اللَّيَالِيْ-এর দিকে করেছে এর যাহিরী ইসনাদ, তার বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তাই যাহিরী ইসনাদ তার উদ্দেশ্যও নয়; বরং সে جَذْبُ اللَّيَالِيْ-এর দিকে নিসবত করেছে ফে'লের নিসবত সময়-কালের দিকে করা হিসেবে। অথবা সে সাধারণভাবে কালের পালাবদলকে মানুষের বার্ধক্যের কারণ মনে করে। সে মতে কারণের দিকে ফে'লের নিসবত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বার্ধক্যকালে মানুষের মাথায় টাক পড়ে। টাক পড়ার কারণে মাথার দু'পাশে চুল থাকে বটে; কিন্তু মাঝে চুল থাকে না। সে অবস্থাটাকে মুসান্নিফ কবিতার দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন। قُنْزُعٌ শব্দের অর্থ– চুলের গোছা বা সমষ্টি। جَذْبٌ শব্দের অর্থ– অতিক্রম এবং পালাবদল। الليالى দ্বারা এখানে জমানা উদ্দেশ্য। জমানার মধ্যে যেহেতু রাত আছে। তাই রাত বলে জমানাকে বুঝানো হয়েছে।

ইবারতের তারকীব প্রসঙ্গে কিছু কথা :

মুসান্নিফ (র.) বলেন, مجاز শব্দটি ان (حرف مشبه بفعل)-এর خبر আর ان-এর اسم হলো اِسْنَادُ مَيَّزَ পুরো বাক্যটি একত্রে এরূপ হবে। اُسْتُدِلَّ عَلٰى اَنَّ اِسْنَادَ مَيَّزَ اِلٰى جَذْبِ اللَّيَالِيْ مَجَازٌ।

بقوله-এর মধ্যে باء হলো حَرْف جَار-এর مجرور হলো قوله এখন جار مجرور মিলে متعلق হবে اسناد-এর সাথে।

কবিতায় اِبْطِئِيْ وَاسْرَعِيْ শব্দ দু'টি امر-এর وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِر-এর সীগাহ। মুসান্নিফ (র.) এ দু'টিকে لَيَالِي থেকে حال হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেহেতু اِنْشَاء হাল হতে পারে না, তাই তিনি বলেন اِبْطِئِيْ وَ اِسْرَعِيْ-এর পূর্বে مَقُوْلًا فِيْهَا শব্দটি উহ্য আছে। অথবা সীগাহ দু'টি শাব্দিকভাবে امر। হলেও অর্থগতভাবে এগুলো خبر বা বর্ণনামূলক বাক্য। আর বর্ণনামূলক বাক্য حال হতে কোনো সমস্যা নেই।

সার-সংক্ষেপ :

লেখক তার ইবারতে দু'টি কবিতা উল্লেখ করেছেন, প্রথম কবিতাটিতে দলিল (تَاَوُّل) না থাকাতে তা حَقِيْقَة عَقْلِيَّة হয়েছে। কবিতা اَشَابَ الصَّغِيْرَ وَ اَفْنَى الْكَبِيْرَ * كَرُّ الْغَدَاةِ وَ مَرُّ الْعَشِيِّ এ কবিতায় اَشَابَ ও اَفْنٰى-এর ইসনাদ غَيْر مَا هُوَ لَهٗ (তথা كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ)-এর দিকে হওয়া সত্ত্বেও মাজায বলা যাচ্ছে না কবির ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে না জানার কারণে। অন্যদিকে দ্বিতীয় কবিতা (مَيَّزَ عَنْهُ قُنْزُعًا عَنْ قُنْزُعٍ * جَذْبُ اللَّيَالِيْ اِبْطِئِيْ اَوْ اِسْرَعِيْ)-এর মধ্যে ميز-এর নিসবত جَذْبُ اللَّيَالِيْ-এর দিকে مجاز হিসেবে হয়েছে। কেননা, এর দলিল এ কবির কবিতাতেই বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে পরবর্তী পঙ্ক্তি اَفْنَاهُ قِيْلُ اللّٰهِ পরবর্তী এ পঙ্ক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবি মু'মিন ছিলেন। অতএব, তার কবিতায় ميز-এর নিসবত جَذْبُ اللَّيَالِيْ -এর দিকে মাজায রূপেই হয়েছে।

وَاَقْسَامُهُ اَىْ اَقْسَامُ الْمَجَازِ الْعَقْلِىْ بِاِعْتِبَارِ حَقِيْقَةِ الطَّرْفَيْنِ وَمَجَازِيَّتِهِمَا اَرْبَعَةٌ لِاَنَّ طَرْفَيْهِ وَهُمَا الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ وَالْمُسْنَدُ اِمَّا حَقِيْقَتَانِ لُغَوِيَّتَانِ نَحْوُ اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ اَوْ مَجَازَانِ لُغَوِيَّانِ نَحْوُ اَحْىَ الْاَرْضَ شَبَابُ الزَّمَانِ فَاِنَّ الْمُرَادَ بِاِحْيَاءِ الْاَرْضِ تَهَيُّجُ الْقُوَى النَّامِيَةِ فِيْهَا وَاِحْدَاثُ نَضَارَتِهَا بِاَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ وَالْاِحْيَاءُ فِى الْحَقِيْقَةِ اِعْطَاءُ الْحَيٰوةِ وَهِىَ صِفَةٌ تَقْتَضِى الْحِسَّ وَالْحَرَكَةَ وَكَذَا الْمُرَادُ بِشَبَابِ الزَّمَانِ اِزْدِيَادُ قُوَّتِهَا النَّامِيَةِ وَهُوَ فِى الْحَقِيْقَةِ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ الْحَيَوَانِ فِىْ زَمَانٍ يَكُوْنُ حَرَارَتُهُ الْغَرِيْزِيَّةُ مَشْبُوْبَةً اَىْ قَوِيَّةً مُشْتَعِلَةً اَوْ مُخْتَلِفَتَانِ بِاَنْ يَكُوْنَ اَحَدُ الطَّرْفَيْنِ حَقِيْقَةً وَالْاٰخَرُ مَجَازًا نَحْوُ اَنْبَتَ الْبَقْلَ شَبَابُ الزَّمَانِ فِيْمَا الْمُسْنَدُ حَقِيْقَةٌ وَالْمُسْنَدُ اِلَيْهِ مَجَازٌ اَوْ اَحْىَ الْاَرْضَ الرَّبِيْعُ فِىْ عَكْسِهِ وَ وَجْهُ الْاِنْحِصَارِ فِى الْاَرْبَعَةِ عَلٰى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ظَاهِرٌ لِاَنَّهُ اِشْتَرَطَ فِى الْمُسْنَدِ اَنْ يَكُوْنَ فِعْلًا اَوْ مَا فِىْ مَعْنَاهُ فَيَكُوْنُ مُفْرَدًا وَكُلُّ مُفْرَدٍ مُسْتَعْمَلٍ اِمَّا حَقِيْقَةٌ اَوْ مَجَازٌ ـ

<u>অনুবাদ :</u> বাক্যের দুই প্রধান অংশ (মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ) প্রকৃতার্থে এবং রূপকার্থে ব্যবহৃত হওয়ার বিবেচনায় مَجَاز عَقْلِى-**এর প্রকার চারটি। কেননা, এর** (দু' প্রধান অংশ) তথা মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ **হয়তো** আভিধানিক অর্থে **হাকীকী হবে। যেমন–** اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ **অথবা উভয়টি** আভিধানিক অর্থে **রূপক হবে। যেমন–** اَحْىَ الْاَرْضَ شَبَابُ الزَّمَانِ কেননা, ভূমিকে জীবিত করার অর্থ হলো, ভূমির উর্বরাশক্তিকে বৃদ্ধি করে দেওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ-এর মাধ্যমে এর শ্যামলতা-সজীবতা তৈরি করা। اِحْيَاء শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো জীবন দান করা। এটাতো এমন বিশেষণ যা অনুভূতি এবং গতিময়তাকে চায়। এমনিভাবে কালের যৌবন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভূমির উর্বরাশক্তির মধ্যে প্রবৃদ্ধি ঘটা। আর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কোনো প্রাণী তার জীবনের এমন সময়ে উপনীত হওয়া, যখন তার স্বভাবজাত উষ্ণতা শক্তিশালী এবং উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে থাকে।

অথবা, পরস্পর বিপরীত হবে অর্থাৎ বাক্যের দু' প্রধান অংশের একটি হাকীকত অপরটি মাজায। **যেমন–** اَحْىَ الْاَرْضَ الرَّبِيْعُ **(বসন্তকাল ভূমিকে জীবন দিয়েছে।)** অথবা এর বিপরীত (অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ হাকীকত এবং মুসনাদ মাজায)। মূল লেখকের মতানুসারে চার প্রকারে সীমাবদ্ধ করার বিষয়টি স্পষ্ট। কেননা, তিনি মুসনাদের জন্য ফে'ল অথবা ফে'লের অর্থবোধক শব্দকে শর্ত করেছেন। সুতরাং এটি মুফরাদ হবে। প্রত্যেক একক শব্দ হয়তো প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হবে অথবা রূপকার্থে ব্যবহৃত হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاَقْسَامُهُ اَىْ اَقْسَامُ الخ : মূল লেখক বলেন, মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ (حقيقت) প্রকৃত অর্থে এবং (مجاز) রূপকার্থে ব্যবহার হওয়ার দিক থেকে مجاز চার প্রকার। এক. মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ উভয়টি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হবে। যেমন– কোনো তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বলল, اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ এই উদাহরণে اِنْبَات শব্দটি তার প্রকৃত অর্থ (উৎপন্ন করা)-এর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে الربيع শব্দটিও প্রকৃত অর্থ (বসন্তকাল)-এর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে

দুই. মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ উভয়টি রূপকার্থে ব্যবহার হবে। যেমন কোনো তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বলল– أَحْيَى الْأَرْضَ شَبَابُ الزَّمَانِ এ উদাহরণে মুসনাদ হলো احى। যা তার প্রকৃতার্থে এখানে ব্যবহার হয়নি। কারণ, احى-এর অর্থ হলো প্রাণ দান করা। প্রাণ তো এমন একটি বিষয় যা অনুভূতি, নড়াচড়া এবং গতিময়তা তৈরি করে। অর্থাৎ যার মধ্যে প্রাণ আছে সে নড়বে এবং তার অনুভূতি থাকবে। মাটি বা ভূমির ক্ষেত্রে এ অর্থের বাস্তবায়ন মোটেও সম্ভব নয়। ভূমির ক্ষেত্রে احى। -এর (রূপক) অর্থ হলো– ভূমির উর্বরাশক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মানোর মাধ্যমে এতে শ্যামলতা দান করা। شَبَابُ الزَّمَانِ হলো মুসনাদ ইলাইহ, যা এখানে প্রকৃতার্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ شباب-এর অর্থ যৌবন, যা প্রাণী জীবনের একটি বিশেষ কাল। যখন সে প্রাণীর জৈবিক চাহিদা সবচেয়ে বেশি হয় এবং তার উত্তেজনা বেশি থাকে। এখানে প্রকৃতার্থ উদ্দেশ্য করা সম্ভব নয়। এর রূপকার্থ হলো ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি।

তিন. মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহের একটি প্রকৃতার্থে অপরটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হওয়া। যেমন– তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বলল– أَنْبَتَ الْبَقْلَ شَبَابُ الزَّمَانِ – এ উদাহরণে মুসনাদ– انبات। প্রকৃত অর্থ (উৎপাদন করা)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু شَبَابُ الزَّمَانِ মুসনাদ ইলাইহ রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

চার. মুসনাদ ইলাইহ প্রকৃতার্থে আর মুসনাদ রূপকার্থে ব্যবহৃত হবে। যেমন– একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বলল– أَحْيَى الْأَرْضَ الرَّبِيْعُ : এ বাক্যে মুসনাদ ইলাইহ (বসন্তকাল) প্রকৃতার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মুসনাদ احى। (জীবনদান করা) প্রকৃতার্থে ব্যবহৃত হয়নি।

قَوْلُهُ وَجْهُ الْإِنْحِصَارِ فِي الْأَرْبَعَةِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ চার প্রকারে সীমাবদ্ধ করার কারণ তো স্পষ্ট। কেননা, মূল লেখকের মতে মুসনাদ হওয়ার জন্য فعل অথবা مَعْنَى فِعْلٍ হওয়া জরুরি। আর এ শর্তের কারণে মুসনাদ অবশ্যই মুফরাদ হবে। আর মুসনাদ ইলাইহ তো আগে থেকে মুফরাদ বা একক (যা অন্যের সাথে যুক্ত হয়নি)। প্রত্যেকটি مفرد হয় প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হবে অথবা ব্যবহৃত হবে না। দু'টির মধ্যে প্রকৃত অর্থ এবং রূপকার্থ হিসেবে মোট চার প্রকার হবে।

বি. দ্র. মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ প্রকৃতার্থ এবং রূপকার্থ হিসেবে যেমন مجاز عقلى-এর মধ্যে চার প্রকার হয় তেমনি حَقِيْقَة عَقْلِيَّة-এর মধ্যেও চার প্রকার হবে। উল্লিখিত مَجَاز عَقْلِيَّة-এর উদাহরণগুলোই حَقِيْقَة عَقْلِيَّة-এর উদাহরণ হবে, যখন উদাহরণগুলোর মুতাকাল্লিম নাস্তিক হবে।

وَهُوَ اَىْ اَلْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ فِى الْقُرْاٰنِ كَثِيْرٌ اَىْ كَثِيْرٌ فِىْ نَفْسِهٖ لَا بِالْاِضَافَةِ اِلٰى مُقَابِلِهٖ حَتّٰى يَكُوْنَ الْحَقِيْقَةُ الْعَقْلِيَّةُ قَلِيْلَةً وَتَقْدِيْمُ "فِى الْقُرْاٰنِ" عَلٰى "كَثِيْرٍ" لِمُجَرَّدِ الْاِهْتِمَامِ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ اَىْ اٰيَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا اُسْنِدَ الزِّيَادَةُ وَهِىَ فِعْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلَى الْاٰيَاتِ لِكَوْنِهَا سَبَبًا لَهَا يُذَبِّحُ اَبْنَائَهُمْ نُسِبَ التَّذْبِيْحُ الَّذِىْ هُوَ فِعْلُ الْجَيْشِ اِلٰى فِرْعَوْنَ لِاَنَّهٗ سَبَبٌ اٰمِرٌ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا نُسِبَ نَزْعُ اللِّبَاسِ عَنْ اٰدَمَ وَحَوَّاءَ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَهُوَ فِعْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلٰى اِبْلِيْسَ لِاَنَّ سَبَبَهُ الْاَكْلُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَسَبَبُ الْاَكْلِ وَسْوَسَتُهٗ وَمُقَاسَمَتُهٗ اِيَّاهُمَا بِاَنَّهٗ لَهُمَا مِنَ النَّاصِحِيْنَ يَوْمًا نُصِبَ عَلٰى اَنَّهٗ مَفْعُوْلٌ بِهٖ لِتَتَّقُوْنَ اَىْ كَيْفَ تَتَّقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنْ بَقِيْتُمْ عَلَى الْكُفْرِ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا نُسِبَ الْفِعْلُ اِلَى الزَّمَانِ وَهُوَ فِعْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى حَقِيْقَةً وَهٰذَا كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّتِهٖ وَكَثْرَةِ الْهُمُوْمِ وَالْاَحْزَانِ فِيْهِ لِاَنَّ الشَّيْبَ مِمَّا يَتَسَارَعُ عِنْدَ تَفَاقُمِ الشَّدَائِدِ وَالْمِحَنِ اَوْ عَنْ طُوْلِهٖ لِاَنَّ الْاَطْفَالَ يَبْلُغُوْنَ فِيْهِ اَوَانَ الشَّيْخُوْخَةِ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا اَىْ مَا فِيْهَا مِنَ الدَّفَائِنِ وَالْخَزَائِنِ نُسِبَ الْاِخْرَاجُ اِلٰى مَكَانِهٖ وَهُوَ فِعْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى حَقِيْقَةً ـ

অনুবাদ : আর এটি অর্থাৎ مَجَازِ عَقْلِى পবিত্র কুরআন মাজীদে অনেক অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যা বিবেচনায় প্রচুর। তার প্রতিপক্ষ (হাকীকতের) তুলনায় বেশি নয়। তাহলে তো হাকীকতে আকলিয়া কম হয়ে যায়। (তারকীবের মধ্যে) فِى الْقُرْاٰنِ অংশটিকে كَثِيْر-এর আগে আনা শুধুমাত্র (কুরআনের প্রতি) বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য।

১ম উদাহরণ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ **(যখন তাদের উপর আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করা হয়)** زادتهم ايمانا এই আয়াতসমূহ তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেয়। এখানে زيادة বা বৃদ্ধি করার কাজটি আয়াতের দিকে ইসনাদ করা হয়েছে; অথচ এটি আল্লাহর কাজ। অতএব, اِسْنَاد اِلٰى مَا هُوَ لَهٗ না হওয়ার কারণে এটা مجاز। কেননা, তা (বৃদ্ধি করা) কারণ বা সবব।

২য় উদাহরণ : يُذَبِّحُ اَبْنَائَهُمْ **(সে জবাই করে তাদের পুত্র সন্তানদের)** এখানে জবাই করার কাজটিকে ফেরাউনের দিকে নিসবত করা হয়েছে, অথচ এটি তার সেনাবাহিনীর কাজ। কেননা, সে হচ্ছে কার্যকারণ অর্থাৎ নির্দেশদাতা।

৩য় উদাহরণ : يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا অর্থাৎ **সে তাদের থেকে তাদের পোশাক খুলে ফেলে।** এখানে হযরত আদম হাওয়া (আ.) থেকে পোশাক খুলে ফেলার নিসবত ইবলিসের প্রতি করা হয়েছে। অথচ এটি আল্লাহ তা'আলার কাজ। কেননা, পোশাক খোলার কারণ হলো নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া। আর খাওয়ার কারণ হলো তার (শয়তানের) প্ররোচনা, আর তাদের কাছে তার শপথ করা এই বলে যে, সে তাদের কল্যাণকামী। (يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ) يَوْمًا মানসূব হয়েছে يَتَّقُوْنَ-এর مفعول হিসেবে। পুরোবাক্য এরূপ হবে– كَيْفَ تَتَّقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنْ بَقِيْتُمْ عَلَى الْكُفْرِ। (তোমরা কিয়ামতের দিবস থেকে কিভাবে বাঁচবে, যদি তোমরা কুফরির উপর

অটল থাক) يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا – (يجعل) ফে'লটিকে জমানার দিকে নিসবত করা হয়েছে; অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে ইঙ্গিত রয়েছে সেদিনে ভয়াবহতার প্রতি এবং সেদিন যে অনেক দুঃখ-দুর্দশা হবে তার প্রতি। কেননা, ধারাবাহিক দুঃখ-কষ্ট, যাতনার দ্বারা বার্ধক্য দ্রুত এসে যায়। অথবা ইঙ্গিত বহন করছে দিনটির দীর্ঘতার প্রতি। কেননা, সে দিনটি (এত লম্বা হবে যে,) শিশুরা বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সময়ে পৌঁছে যাবে।

৪র্থ উদাহরণ : وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (এবং জমিন তার ভূগর্ভস্থ বোঝাকে বের করে দিবে) অর্থাৎ তার মধ্যস্থ দ্রব্যাদি যা আছে তা বের করে দেবে। এখানে 'বের করা'কে নিসবত করা হয়েছে তার স্থানের দিকে; অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহ তা'আলার কাজ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَهُوَ أَيِ الْمَجَازُ الخ : মূল লেখক বলেন, مَجَاز عَقْلِي-এর ব্যবহার পবিত্র কুরআন কারীমে প্রচুর; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, حقيقة عقلية-এর তুলনায় অনেক। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো مَجَاز عَقْلِي-এর ব্যবহার নেহায়েত কম নয়; বরং বেশিই আছে। এর উদাহরণ আমাদের কথাতেও পাওয়া যায়। যেমন– আমরা বলি, আমাদের এলাকায় অনেক আলেম-ওলামা আছেন। এর অর্থ এই নয় যে, সাধারণ শিক্ষিতদের তুলনায় আলিম বেশি।

"قَوْلُهُ تَقْدِيمُ "فِي الْقُرْآنِ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো– فِي الْقُرْآنِ এটি معمول।-এর عامل হলো كثير, যাকে পরে আনা হয়েছে। এখানে এরূপ কেন করা হলো? এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য فِي الْقُرْآنِ (মা'মূল হওয়া সত্ত্বেও) আগে আনা হয়েছে।

মূল লেখক পবিত্র কুরআন থেকে مَجَاز عَقْلِي-এর কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন–

১. قَوْلُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا : অর্থাৎ যখন তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলার আয়াত পড়া হয়– তখন তা তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে দেয়। আয়াতের زادت ফে'লটির সর্বনাম ফায়েল হয়েছে। এটির مرجع হলো ايات। সুতরাং এ অংশটির অর্থ হলো, আয়াত তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে। এতে زيادة-এর ফায়েল হলো ايات, অথচ এর প্রকৃত ফায়েল আল্লাহ। সুতরাং আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দিকে ফে'লের নিসবত না করার কারণে إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ হয়েছে। সুতরাং زادت-এর মধ্যে مَجَاز عَقْلِي হয়েছে।

২. قَوْلُهُ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ : অর্থাৎ ফেরাউন বনী ইসরাইলের শিশু পুত্রদের জবাই করে। আয়াতে জবাই করার নিসবত ফেরাউনের দিকে করা হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ফেরাউনের সেনাবাহিনীর লোকেরা জবাই করেছে। আর ফেরাউন সে জবাইয়ের নির্দেশ দিয়েছে। অতএব, বাক্যে مَا هُوَ لَهُ-এর দিকে নিসবত না করে غَيْر مَا هُوَ لَهُ-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। সুতরাং এতে مجاز عقلي হয়েছে।

৩. قَوْلُهُ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا অর্থাৎ শয়তান তাদের দু'জনের (আদম ও হাওয়ার) কাপড় খুলে ফেলে। এ আয়াতে হযরত আদম এবং হযরত হাওয়া (আ.)-এর কাপড় খুলে নেওয়ার নিসবত শয়তানের দিকে করা হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এর ফায়েল আল্লাহ তা'আলা। ইবলিসের দিকে নিসবতের কারণ হচ্ছে সে উক্ত কাজে জড়িত ছিল সবব হিসেবে।

অর্থাৎ' কাপড় খোলার বাহ্যিক কারণ হলো নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়া। আর ফল খাওয়ার কারণ হলো ইবলিসের ওসওয়াসা। সুতরাং ইবলিস কাপড় খুলে নেওয়ার কারণ হলো. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাপড় খুলে নিলেন আল্লাহ তা'আলা। তার দিকে নিসবত না করে ইবলিসের প্রতি নিসবত করায় তা مَجَاز عَقْلِي হয়েছে।

৪. قَوْلُهُ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا অর্থাৎ সেদিন থেকে কিভাবে বাঁচবে, যেদিন শিশুদের বৃদ্ধতে পরিণত করবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, يوما তারকীবের মধ্যে تَتَّقُونَ-এর মাফঊলে বিহী হিসেবে মানসূব হয়েছে। এটি يجعل-এর মাফঊলে ফীহি নয়। মূল ইবারত এরূপ হবে– كَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا إِنْ بَقِيتُمْ عَلَى الْكُفْرِ – আয়াতের মধ্যে يجعل ফে'লের নিসবত করা হয়েছে সর্বনামের দিকে। সর্বনামের مرجع হলো يوما। সুতরাং ফে'লের নিসবত ফায়েল তথা আল্লাহর দিকে না হয়ে জমানার দিকে হয়েছে। এ কারণে এটি مَجَاز عَقْلِي-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

আয়াতের মর্মার্থ : মুসান্নিফ (রা.) বলেন, সেদিন বাচ্চাদের বৃদ্ধ করে দেবে– এ কথার দ্বারা সেদিনের ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে। সেদিন মানুষের অনেক দুঃখ-কষ্ট হবে। আর ধারাবাহিক কষ্ট-মসিবতে মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায়। অথবা, এ কথার অর্থ হচ্ছে– সেদিনের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি হবে। এত বেশি যে, এ সময়ের মধ্যে শিশুরাও বার্ধক্যে উপনীত হয়। এর প্রমাণ পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে– وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ অর্থাৎ তোমার প্রভুর নিকটের (পুনরুত্থানের পরবর্তী) দিনগুলো তোমাদের গণনার হিসেবে হাজার বছরের সমান।

৫. قَوْلُهُ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا : অর্থাৎ জমিন তার মধ্যস্থ লোকগুলো এবং সঞ্চিত ধনভাণ্ডার বের করে দেবে। এ আয়াতে اخرجت। ফে'লটির নিসবত জমিনের দিকে করা হয়েছে, যা তার প্রকৃত ফায়েল নয়; বরং প্রকৃত ফায়েল হলেন আল্লাহ তা'আলা। আর জমিন হচ্ছে ফে'ল সংঘটিত হওয়ার স্থান । যেহেতু এখানে ফায়েলের দিকে নিসবত না করে ফে'লটিকে স্থানের দিকে নিসবত করা হয়েছে, তাই এটি مَجَاز عَقْلِى-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

সার-সংক্ষেপ :

مَجَاز عَقْلِى-এর উদাহরণ পবিত্র কুরআনে অনেক রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

১. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا এ আয়াতে زيادہ-এর নিসবত আল্লাহর দিকে না করে ايات-এর দিকে করার কারণে مجاز হয়েছে।

২. يُذَبِّحُ اَبْنَاءَهُمْ এ আয়াতে فرعون -এর দিকে নিসবত مجاز রূপে করা হয়েছে।

৩. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا এ আয়াতে পোশাক খোলার নিসবত শয়তানের দিকে مجاز রূপে করা হয়েছে।

وَغَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْخَبَرِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ وَهُوَ كَثِيْرٌ وَاِنَّمَا قَالَ ذٰلِكَ لِاَنَّ تَسْمِيَتَهٗ بِالْمَجَازِ فِى الْاِثْبَاتِ وَاِيْرَادَهٗ فِىْ اَحْوَالِ الْاِسْنَادِ الْخَبَرِىْ يُوْهِمُ اِخْتِصَاصَهٗ بِالْخَبَرِ بَلْ يَجْرِىْ فِى الْاِنْشَاءِ نَحْوُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا فَاِنَّ الْبِنَاءَ فِعْلُ الْعَمَلَةِ وَهَامَانُ سَبَبٌ اٰمِرٌ وَكَذَا قَوْلُكَ فَلْيُنْبِتِ الرَّبِيْعُ مَا شَاءَ وَلْيَصُمْ نَهَارُكَ وَلْيَجِدَّ جِدُّكَ وَمَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ مِمَّا اُسْنِدَ فِيْهِ الْاَمْرُ اَوِ النَّهْىُ اِلٰى مَا لَيْسَ الْمَطْلُوْبُ مِنْهُ صُدُوْرُ الْفِعْلِ اَوِ التَّرْكُ عَنْهُ وَكَذَا قَوْلُكَ لَيْتَ النَّهْرَ جَارٍ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ ـ

অনুবাদ : আর مجاز **বর্ণনামূলক বাক্যের সাথে খাস নয়।** বাক্যটি وَهُوَ كَثِيْرٌ-এর উপর আতফ হয়েছে। তিনি (خبر-এর সাথে খাস নয়) এ কথাটি বলেছেন– এ কারণে যে, مجاز-কে (ইতঃপূর্বে) مَجَازٌ فِى الْاِثْبَاتِ করে নামকরণ করা এবং এটিকে 'ইসনাদে খবরী'-এর অবস্থাসমূহের মধ্যে আনয়ন করা– খবর বা বর্ণনামূলক বাক্যের সাথে খাস হওয়ার ধারণা জন্ম দেয়। বরং এটি 'ইনশা'বাক্যের মধ্যেও ব্যবহৃত হয়। যেমন– يَا هَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا (হে হামান! আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করো।) নির্মাণ করা শ্রমিকদের কাজ। হামান হলো নির্দেশদাতা– সবব। এমনিভাবে তোমার উক্তি لِيُنْبِتِ الرَّبِيْعُ مَا شَاءَ ও لِيَصُمْ نَهَارُكَ এবং لِيَجِدَّ جِدُّكَ ইত্যাদি যার মধ্যে আমর (আদেশসূচক বাক্য) অথবা নাহী (নিষেধসূচক বাক্য)-কে নিসবত করা হয় এমন জিনিসের প্রতি, যার থেকে ফে'লটির বাস্তবায়ন বা ফে'লটির পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নয়। এমনিভাবে (মাজায হয়েছে) لَيْتَ النَّهْرَ جَارٍ এবং আল্লাহর বাণী اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ-এর মধ্যে ।

ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ

উল্লিখিত ইবারতে বলা হয়েছে, مَجَازْ عَقْلِى শুধুমাত্র জুমলায়ে খবরিয়ার সাথে খাস নয়; বরং জুমলায়ে ইনশাইয়্যার মধ্যেও এর ব্যবহার প্রচুর। মূল লেখক পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা তার দাবির স্বপক্ষে দলিল পেশ করেন।

قَوْلُهٗ وَغَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْخَبَرِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْخَبَرِ বাক্যাংশটি পূর্ববর্তী বাক্য وَهُوَ فِى الْقُرْاٰنِ كَثِيْرٌ-এর كثير-এর উপর عطف হয়েছে। তাহলে এ বাক্যটির উহ্য ইবারত হবে এরূপ وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْخَبَرِ এখানে مَعْطُوْف عَلَيْه ও معطوف মিলে অর্থ হবে مَجَازْ عَقْلِى (এর ব্যবহার) কুরআনে অনেক এবং তা জুমলায়ে খবরিয়ার সাথে খাস নয়।

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا قَالَ ذٰلِكَ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে এ কথাটি বলার প্রয়োজন এ কারণে দেখা দিয়েছে যে, অনেকে مَجَاز عَقْلِى-এর অপর নাম مَجَازٌ فِى الْاِثْبَاتِ বলেছেন। আবার মূল লেখক اِسْنَاد خَبَرِى-এর احوال-এর মধ্যে এর আলোচনা এনেছেন। এ দু'টি কারণে কারো সন্দেহ হতে পারে যে, مَجَاز عَقْلِى শুধুমাত্র জুমলায়ে খবরিয়ার সাথে খাস।

অতএব, মূল লেখক বয়ান করে দিলেন তা জুমলায়ে খবরিয়ার সাথে খাস নয়। এতে কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এরপর তিনি 'ইনশা'-এর মধ্যে থেকে مجاز-এর উদাহরণ দিয়েছেন।

উদাহরণ : ১. يَاهَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا অর্থাৎ হে হামান! আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করো। আয়াতে নির্মাণ করার امر টিকে হামানের প্রতি নিসবত করা হয়েছে। কিন্তু امر টি প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের প্রতি। কেননা, শ্রমিকরাই বাড়ি-প্রাসাদ নির্মাণ করে। হামান (মন্ত্রী) বাড়ি-প্রাসাদ নির্মাণ করে না। যেহেতু হামান এখানে শ্রমিকদের নির্দেশদাতা বা সবব, তাই হামানের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে مَجَازِىْ ভাবে। এটি ইনশার উদাহরণ, কারণ امر তথা আদেশসূচক বাক্য ইনশার অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণ : ২. মূল লেখকের অনুসরণ করে মুসান্নিফ কয়েকটি ইনশার উদাহরণ দিয়েছেন। তার উদাহরণগুলো মূলত ইতঃপূর্বে বর্ণনামূলক বাক্যের مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণগুলোকেই ইনশা বানানো হয়েছে। যেমন– لِيُنْبِتِ الرَّبِيْعُ مَاشَاءَ এতে لينبت (আমর)-এর নিসবত আল্লাহ পাকের (প্রকৃত ফায়েল)-এর দিকে না করে سبب (الربيع)-এর দিকে করা হয়েছে। এমনিভাবে لِيَصُمْ نَهَارُكَ-এর মধ্যে 'আমর'-এর নিসবত প্রকৃত ফায়েল (ব্যক্তি)-এর দিকে না করে সময়ের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

وَلْيَجِدْ جِدُّكَ এ উদাহরণের মধ্যে 'আমর'-এর নিসবত প্রকৃত ফায়েল (ব্যক্তি)-এর দিকে না করে মাসদারের দিকে করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে (আমর) আদেশসূচক বাক্য ইনশার প্রকার। অতএব, এসবই এমন ইনশার উদাহরণ যার মধ্যে مَجَاز عَقْلِي পাওয়া যায়।

نهى-এর মধ্যে مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ : لَا يَقُمْ لَيْلُكَ অর্থাৎ তোমার রাত যেন না দাঁড়ায়। نهى অর্থ– ترك চাওয়া। এখানে কিয়াম বা রাত জাগরণ না করাকে চাওয়া হচ্ছে রাত থেকে। অথচ রাতের পক্ষে উক্ত কাজ করা সম্ভব নয়। বরং এর ফায়েল ব্যক্তি। এখানে ব্যক্তির দিকে নিসবত না করে রাতের দিকে নিসবত করা হচ্ছে, তাই এটি مَجَاز عَقْلِي হবে।

تمنى-এর মধ্যে مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ–

لَيْتَ النَّهَرَ جَارٍ অর্থ– আহা! নদী যদি প্রবাহিত হতো। এখানে নদী প্রবাহিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা হচ্ছে। অথচ নদী প্রবাহিত হয় না, নদীর পানি প্রবাহিত হয়।

استفهام-এর মধ্যে مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ : اَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ অর্থাৎ তোমার নামাজ কি তোমাকে আদেশ করে? এখানে প্রশ্নযুক্ত ফে'ল (تأمر)-এর নিসবত– নামাজের দিকে করা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতার্থে এর নিসবত হবে আল্লাহ তা'আলার দিকে। যেহেতু ما هو له-এর দিকে নিসবত হয়নি, তাই এটি مجاز عقلى-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, نهى (নিষেধসূচক বাক্য), تمنى (আকাঙ্ক্ষাসূচক বাক্য) এবং استفهام (প্রশ্নবোধক বাক্য) সবই ইনশার উদাহরণ। তাই এ সবই ইনশার মধ্যে مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ রূপে গণ্য হবে।

বি. দ্র. মুসান্নিফ (র.) ইনশার প্রকার– استفهام-এর যে উদাহরণ দিয়েছেন, এটিকে مَجَاز عَقْلِي-এর অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক নয়। কারণ এটি হযরত হযরত শুয়াইব (আ.)-কে লক্ষ্য করে তৎকালীন কাফিররা বলেছিল।

কাফিরদের উক্ত উক্তি তাদের ধারণা মতে اِسْنَادٌ اِلٰى مَا هُوَ لَهٗ-এর দিকেই হয়েছে, তাই এটি مَجَاز عَقْلِي না হয়ে حَقِيْقَة عَقْلِيَّة-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

সার-সংক্ষেপ :

مَجَاز عَقْلِي জুমলায়ে খবরিয়্যাহ-এর সাথে খাস নয়; বরং খবরিয়্যাহের মতো ইনশা-এর মধ্যে مجاز ব্যবহার হয়। যেমন– يَا هَامَانُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا এ আয়াতে হামানের দিকে بناء-এর নিসবত করা হয়েছে রূপকভাবে। কারণ, নির্মাণকারী হচ্ছে নির্মাণ শ্রমিকগণ।

وَلَابُدَّ لَهُ اَىْ لِلْمَجَازِ الْعَقْلِىْ مِنْ قَرِيْنَةٍ صَارِفَةٍ عَنْ اِرَادَةِ ظَاهِرِهٖ لِاَنَّ الْمُتَبَادِرَ اِلَى الْفَهْمِ عِنْدَ اِنْتِفَاءِ الْقَرِيْنَةِ هُوَ الْحَقِيْقَةُ لَفْظِيَّةٍ كَمَا مَرَّ فِىْ قَوْلِ اَبِى النَّجْمِ مِنْ قَوْلِهٖ اَفْنَاهُ قِيْلُ اللّٰهِ اَوْ مَعْنَوِيَّةٍ كَاسْتِحَالَةِ قِيَامِ الْمُسْنَدِ بِالْمَذْكُوْرِ اَىْ بِالْمُسْنَدِ اِلَيْهِ الْمَذْكُوْرِ مَعَ الْمُسْنَدِ عَقْلًا اَىْ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ يَعْنِىْ يَكُوْنُ بِحَيْثُ لَا يَدَّعِىْ اَحَدٌ مِنَ الْمُحِقِّيْنَ وَالْمُبْطِلِيْنَ اَنَّهُ يَجُوْزُ قِيَامُهُ بِهٖ لِاَنَّ الْعَقْلَ اِذَا خُلِّىَ وَنَفْسُهُ يَعُدُّهُ مُحَالًا كَقَوْلِكَ مَحَبَّتُكَ جَاءَتْ بِىْ اِلَيْكَ لِظُهُوْرِ اِسْتِحَالَةِ قِيَامِ الْمَجِىْءِ بِالْمَحَبَّةِ اَوْ عَادَةً اَىْ مِنْ جِهَةِ الْعَادَةِ نَحْوُ هَزَمَ الْاَمِيْرُ الْجُنْدَ لِاسْتِحَالَةِ قِيَامِ هَزْمِ الْجُنْدِ بِالْاَمِيْرِ وَحْدَهُ عَادَةً وَاِنْ كَانَ مُمْكِنًا عَقْلًا وَاِنَّمَا قَالَ قِيَامُهُ بِهٖ لِيَعُمَّ الصُّدُوْرَ عَنْهُ مِثْلُ ضَرَبَ وَهَزَمَ وَغَيْرَهُ كَقَرُبَ وَبَعُدَ وَصُدُوْرِهٖ عَطْفٌ عَلَى اِسْتِحَالَةِ اَىْ اَوْكَصُدُوْرِ الْكَلَامِ عَنِ الْمُوَحِّدِ مِثْلُ اَشَابَ الصَّغِيْرَ اَلْبَيْتَ فَاِنَّهُ يَكُوْنُ قَرِيْنَةً مَعْنَوِيَّةً عَلَى اَنَّ اِسْنَادَ اَشَابَ وَاَفْنٰى اِلٰى كَرِّ الْغَدَاةِ وَمَرِّ الْعَشِىِّ مَجَازٌ لَا يُقَالُ هٰذَا دَاخِلٌ فِى الْاِسْتِحَالَةِ لِاَنَّا نَقُوْلُ لَا نُسَلِّمُ ذٰلِكَ كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَ اِلَيْهِ كَثِيْرٌ مِنْ ذَوِى الْعُقُوْلِ وَاحْتَجْنَا فِىْ اِبْطَالِهٖ اِلٰى دَلِيْلٍ ـ

অনুবাদ : **এবং** مَجَاز عَقْلِى-এর **জন্য করীনা থাকা জরুরি,** যা বাক্যের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে বাধা দেয়। **কেননা,** করীনার অনুপস্থিতিতে **বিবেক মতে হাকীকত হওয়াটাই স্বাভাবিক**। (সেই দলিলটি) **শব্দগত হবে– যেমন ইতঃপূর্বে** আবুন নাজমের কবিতায় اَفْنَاهُ قِيْلُ اللّٰهِ **হয়েছে। অথবা অর্থগত হবে। যেমন– মুসনাদ উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহের দ্বারা বাস্তবায়ন অসম্ভব।** (এ অসম্ভবতা) **বিবেকের দৃষ্টিতে** অর্থাৎ এমন হওয়া যে, হকপন্থি কিংবা বাতিলপন্থি কেউ মুসনাদটি উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহের সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব বলে দাবি করেন না। কেননা, এতে বিবেককে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে সে তাকে অসম্ভব মনে করে। **যেমন– তুমি বললে, তোমার ভালোবাসা আমাকে তোমার দ্বারে নিয়ে এসেছে।** (এটি মাজায) কারণ, আগমন করার বিষয়টি ভালোবাসা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অসম্ভবতা সুস্পষ্ট হওয়াতে। **অথবা** (অসম্ভব হবে) **স্বভাবত**। অর্থাৎ সাধারণ অভ্যাস মতে (এটি অসম্ভব) **যেমন– আমির একাই** (শত্রুপক্ষের) **সেনাবাহিনী পরাস্ত করেছে।** (এটি মাজায) সেনাবাহিনীর পরাজয় আমিরের একার দ্বারা সংঘটিত হওয়া স্বভাবত অসম্ভব হওয়ার কারণে। **যদিও যুক্তিগতভাবে এটি সম্ভব।** তিনি তার দ্বারা কায়েম হওয়ার কথা বলেছেন, যাতে মুসনাদ ইলাইহ থেকে প্রকাশিত ফে'লকে শামিল করে। যেমন– ضَرَبَ ও هَزَمَ (মুসনাদ ইলাইহ থেকে প্রকাশিত হওয়া) এবং ভিন্ন ফে'লকে শামিল করে। যেমন– قَرُبَ ও بَعُدَ তার প্রকাশ পাওয়া (দলিল হবে মাজাযের জন্য) صُدُوْرِهٖ এটি আত্ফ হয়েছে اِسْتِحَالَةِ-এর উপর। **অথবা বাক্যটি প্রকাশ পাওয়া তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে। যেমন–** اَشَابَ الصَّغِيْرَ থেকে নিয়ে সম্পূর্ণ কবিতা (একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তির কথা) অর্থগত দলিল হবে যে, اَشَابَ এবং اَفْنٰى-এর ইসনাদ كَرُّ الْغَدَاةِ এবং مَرُّ الْعَشِىِّ-এর দিকে হওয়াটা মাজায। এ কথা বলে আপত্তি তোলা যাবে না যে, এটি অসম্ভবের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ মু'মিন থেকে এ ধরনের কথা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব।) কেননা, (এর উত্তরে) আমরা বলি, এই বক্তব্য আমরা মানি না। আর কিভাবেই বা এ বক্তব্য (মু'মিন থেকে এ ধরনের কথা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব) সমর্থন করা যায়? কেননা, অনেক (বিশ্বাসী) জ্ঞানী লোকেরা এ জাতীয় কথা বলেছেন এবং আমরা তাদের বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَلَابُدَّ لَهُ اَىْ لِلْمَجَازِ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মাজাযে আকলীর দলিলের প্রয়োজনীয়তা এবং দলিলের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত তিনি বলেন, مَجَاز عَقْلِى এর জন্য এমন একটি করীনা থাকা আবশ্যক, যা বাক্যের যাহেরী অর্থ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। কেননা, সে রকম কোনো قرينة না থাকলে যাহেরী অর্থকেই হাকীকত বলে ধরে নেওয়া হয়।

তিনি বলেন, قرينة প্রথমত দু' প্রকার। ক. لَفْظِيَّة বা শব্দগত। খ. مَعْنَوِيَّة বা অর্থগত।

قَرِيْنَة لَفْظِيَّة-এর উদাহরণ : আবুন নাজমের কবিতার পঙ্ক্তি- مَيَّزَ عَنْهُ قُنْزَعًا عَنْ قُنْزَعٍ * جَذْبُ اللَّيَالِىْ اِبْطَئِى اَوْ اِسْرَعِىْ এ পঙ্ক্তিটিতে ميز-এর নিসবত جَذْبُ اللَّيَالِىْ-এর দিকে যে মাজাযরূপে হয়েছে, এর শব্দগত দলিল হলো কবির পরবর্তী উক্তি اَفْنَاهُ قِيْلُ اللهِ পরবর্তী উক্তিটি কবির একত্ববাদী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি প্রথম পঙ্ক্তিটিতে প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য করেননি।

قَرِيْنَة مَعْنَوِيَة কয়েকভাবে হতে পারে- ক. মুসনাদের যাহিরী নিসবত মুসনাদ ইলাইহের সাথে যুক্তির নিরিখে অসম্ভব হওয়া। খ. উল্লিখিত নিসবত স্বভাবগতভাবে অসম্ভব হওয়া। গ. একত্ববাদে বিশ্বাসী থেকে এ ধরনের নিসবত হওয়া।

قَرِيْنَة مَعْنَوِيَة -এর প্রথম প্রকার : অর্থাৎ মুসনাদের যাহিরী নিসবত মুসনাদ ইলাইহের সাথে যুক্তির আলোকে অসম্ভব। এ কথার ব্যাখ্যা এই যে, হকপন্থি তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং নাস্তিক/নিরশ্বরবাদী কেউই মুসনাদ ইলাইহের সাথে মুসনাদের সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি মেনে নেন না। এর কারণ হচ্ছে, যদি উক্ত নিসবতটির বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করতে দেওয়া হয়, তাহলে বিবেক একে অসম্ভব মনে করে। যেমন- (কেউ বলল) مَحَبَّتُكَ جَائَتْ بِىْ اِلَيْكَ অর্থাৎ তোমার ভালোবাসা আমাকে তোমার কাছে এনেছে। এ বাক্যে মুসনাদ হলো جَائَتْ (ফে'ল) আর মুসনাদ ইলাইহ হলো مَحَبَّتُكَ। এ মুসনাদটি মুসনাদ ইলাইহ (مَحَبَّتْ)-এর সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। কোনো ব্যক্তিই এ কথা বলেন না যে, مَحَبَّتْ দ্বারা 'আনয়ন'-এর কাজটি সংঘটিত হওয়া সম্ভব। আর এই অসম্ভবতাই প্রমাণ করে যে, আনয়নের নিসবত 'মহব্বত'-এর দিকে হাকীকী হয়নি; বরং মাজায হয়েছে। হাকীকী নিসবতটি এরূপ- نَفْسِىْ جَائَتْ بِىْ اِلَيْكَ لِاَجْلِ مَحَبَّتِكَ আমার মন তোমার ভালোবাসার কারণে তোমার কাছে আমাকে এনেছে।

قَرِيْنَة مَعْنَوِيَة -এর ২য় প্রকার : মুসনাদের প্রকাশ্য নিসবত মুসনাদ ইলাইহের সাথে হওয়া স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। যেমন- هَزَمَ الْاَمِيْرُ الْجُنْدَ সেনাপ্রধান প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেছে। এ বাক্যে هزم হলো মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ হলো الامير। যুক্তির আলোকে যদিও আমিরের একার পক্ষে সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব; কিন্তু সাধারণ রেওয়াজ অনুযায়ী তা অসম্ভব। কেননা, একার পক্ষে শতশত মানুষকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই অসম্ভব হওয়াটা দলিল হবে যে, বাক্যের প্রকাশ্য ইসনাদ এখানে উদ্দেশ্য নয়। হাকীকী ইসনাদ হয়েছে আমিরের সেনাবাহিনীর দিকে। অর্থাৎ তারা শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছে, আমিরের নির্দেশে কিংবা আমিরের নেতৃত্বে হওয়ার কারণে আমীরের প্রতি مجاز হিসেবে নিসবত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا قَالَ قِيَامُهُ بِهِ قِيَامُ الْمُسْنَدِ بِالْمُسْنَدِ اِلَيْهِ : মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখক قِيَامُهُ بِهِ বলেছেন অর্থাৎ তার এভাবে বলার উদ্দেশ্য হলো ঐ মুসনাদকে শামিল করা, যা মুসনাদ ইলাইহ থেকে বের হয় বা প্রকাশ পায় এবং যা প্রকাশ পায় না।

১ম প্রকারের উদাহরণ হলো- هَزَمَ ও ضَرَبَ মারল এবং পরাজিত করল।

ضَرَبَ এবং هَزَمَ মুসনাদ ইলাইহ তথা ফায়েল থেকে প্রকাশ পায়।

২য় প্রকারের উদাহরণ হলো- بَعُدَ ও قَرُبَ নিকটবর্তী হলো এবং দূরবর্তী হলো, এ দু'টি ফে'ল বা মুসনাদ মুসনাদ ইলাইহ বা ফায়েল থেকে বের হয় না; কিন্তু এ দু'টি ফে'ল তার মুসনাদ ইলাইহের সাথে যুক্ত হয় এবং কায়েম হয় মোটকথা, উভয় প্রকারকে শামিল করার জন্য মুসান্নিফ (র.) قِيَامُهُ بِهِ বলেছেন।

দলিলের ৩য় প্রকার : মুসান্নিফ বলেন, صدوره-এর আতফ হয়েছে استحالة-এর উপর, তাহলে معطوف এবং معنوى مَعْطُوْف عَلَيْه মিলে বাক্যটি এরূপ হবে أَوْ كَصُدُوْرِهِ عَنِ الْمُوَحِّدِ الخ অর্থাৎ অথবা করীনাটি অর্থগত হবে, যেমন- বাক্যটি একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পাওয়া। সারকথা হলো معنوى দলিলের এক প্রকার হলো বাক্যটি একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পাওয়া, যে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই مؤثر حقيقى মনে করে এবং যাহিরী কারণকে مؤثر মনে করে না। যেমন- কোনো মু'মিন বলল أَشَابَ الصَّغِيْرَ وَأَفْنَى الْكَبِيْرَ كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ এ বাক্যটিতে যুবককে বৃদ্ধে পরিণত করা এবং বৃদ্ধকে মৃত্যু দেওয়ার ফায়েল বানানো হয়েছে জমানাকে। অথচ মু'মিনের বিশ্বাস আল্লাহ তা'আলাই এরূপ করেন। তাই বাক্যটি মু'মিন বললে মাজায হিসেবেই বলেছে মনে করতে হবে। এ কথা বলা যাবে না যে, এটি অসম্ভবের অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ মু'মিন থেকে এ ধরনের কথা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব) কেননা আমরা বলবো আমরা এটি সমর্থ করি না, আর কিভাবেই বা একথা সমর্থন করা যায়, অথচ অনেক (মু'মিন) জ্ঞানী লোকেরা এ ধরনের কথা বলেছেন এবং আমরা এগুলোকে বাতিল করার জন্য দলিল উপস্থাপন করছি।

قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ هٰذَا دَاخِلٌ الخ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, প্রশ্নটি হলো أَشَابَ الصَّغِيْرَ। এ জাতীয় উদাহরণ যুক্তির বিচারে একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের থেকে প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব, তাই এটি যুক্তির বিচারে অসম্ভব সেই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, এটিকে যুক্তির বিচারে অসম্ভব-এর প্রকারে না এনে পৃথকভাবে কেন আনা হলো?

এর উত্তর হচ্ছে, أَشَابَ الصَّغِيْرَ ইত্যাদি বাক্য মু'মিন থেকে প্রকাশ পাওয়া আমরা অসম্ভব মনে করি না। কেননা, যুক্তির বিচারে অসম্ভব বলা হয় এমন বিষয়কে, যাকে জ্ঞান বা বিবেক অসম্ভব মনে করে এবং জ্ঞানী লোকেরা কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাকে অসম্ভব মনে করে, তা ছাড়া আস্তিক বা নাস্তিক কেউই তার সম্ভাব্যতা স্বীকার করে না। কিন্তু উল্লিখিত উদাহরণটি সেরকম নয়; বরং অনেক জ্ঞানী লোকেরা মনে করে যে, শিশু বৃদ্ধ হওয়া এবং বৃদ্ধ মারা যাওয়া কালের আবর্তনের কারণে হয়। আল্লাহ তা'আলা এরূপ করেন না। তারা সংখ্যায় এত যে, তাদের মতবাদকে খণ্ডন করার জন্য আমরা দলিল-প্রমাণের মুখাপেক্ষী, তাই দলিল প্রমাণ বের করতে আমরা সচেষ্টও হয়েছি। অতএব, এ ধরনের উদাহরণকে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের একদল লোক অসম্ভব না মনে করা এবং তাদের মতবাদ বাতিল করার মুখাপেক্ষী হওয়া এ কথা প্রমাণ করে যে, এটি যুক্তির বিচারে অসম্ভব নয়। সুতরাং এটিকে যুক্তির বিচারে অসম্ভবের প্রকারে না ফেলে পৃথক আনাটা সঠিক সিদ্ধান্ত মোতাবেকই হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

مَجَاز عَقْلِي-এর জন্য এমন একটি করীনা থাকা আবশ্যক যা তার যাহিরী অর্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এ ধরনের করীনা প্রথমত দু' ধরনের لَفْظِيَّة ও مَعْنَوِيَّة।

قَرِيْنَة مَعْنَوِيَّة আবার দু'ভাবে হতে পারে। (এক) যুক্তির বিচারে মুসনাদ তার মুসনাদ ইলাইহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব হওয়া। যেমন- مَحَبَّتُكَ جَائَتْ بِيْ إِلَيْكَ (দুই) মুসনাদ তার মুসনাদ ইলাইহের সাথে স্বভাবগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব হওয়া। যেমন- هَزَمَ الْأَمِيْرُ الْجُنْدَ

وَمَعْرِفَةُ حَقِيْقَتِهِ يَعْنِى اَنَّ الْفِعْلَ فِى الْمَجَازِ الْعَقْلِيْ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ فَاعِلٌ اَوْ مَفْعُوْلٌ بِهِ اِذَا اُسْنِدَ اِلَيْهِ يَكُوْنُ الْاِسْنَادُ حَقِيْقَةً فَمَعْرِفَةُ فَاعِلِهِ اَوْ مَفْعُوْلِهِ الَّذِىْ اِذَا اُسْنِدَ اِلَيْهِ يَكُوْنُ الْاِسْنَادُ حَقِيْقَةً اِمَّا ظَاهِرَةٌ كَمَا فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ اَىْ فَمَا رَبِحُوْا فِىْ تِجَارَتِهِمْ وَاِمَّا خَفِيَّةٌ لَاتَظْهَرُ اِلَّا بَعْدَ نَظَرٍ وَتَاَمُّلٍ كَمَا فِىْ قَوْلِكَ سَرَّتْنِىْ رُؤْيَتُكَ اَىْ سَرَّنِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عِنْدَ رُؤْيَتِكَ وَقَوْلُهُ شِعْرٌ يَزِيْدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا اِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَرًا اَىْ يَزِيْدُكَ اللّٰهُ حُسْنًا فِىْ وَجْهِهِ لِمَا اَوْدَعَهُ مِنْ دَقَائِقِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ يَظْهَرُ بَعْدَ التَّاَمُّلِ وَالْاِمْعَانِ ـ

অনুবাদ : এবং তার (মাজাযের) **হাকীকতের পরিচয়**। অর্থাৎ মাজাযে আকলীর মধ্যে ফে'লের ফায়েল অথবা মাফউলে বিহী হওয়া জরুরি। যখন তার দিকে ইসনাদ হবে, ইসনাদটি হাকীকত হবে। সুতরাং তার ফায়েল এবং মাফউলের যার দিকে ইসনাদ করা হয়েছে– ইসনাদ হবে তখন হাকীকী। **সেটার পরিচয় হয়তো প্রকাশ্য হবে, যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী–** فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ (এর হাকীকী ফায়েল হলো تجارة-এর مضاف اليه সে মতে বাক্যটি হবে এরূপ) فَمَا رَبِحُوْا فِىْ تِجَارَتِهِمْ **অর্থ বা পরিচয় অস্পষ্ট হবে** অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া প্রকাশ পায় না। **যেমন– তোমার উক্তিতে** سَرَّتْنِىْ رُؤْيَتُكَ **অর্থাৎ তোমার সাক্ষাৎ আমাকে উৎফুল্ল করেছে** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমার সাক্ষাতের সময় উৎফুল্ল করেছেন **এবং কবিতার চরণ : তার চেহারা তোমার মাঝে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে, যখন তুমি তার প্রতি অধিক পরিমাণে দৃষ্টিপাত করবে**। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার চেহারার মাঝে তোমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করুন, কেননা তার চেহারাতে আল্লাহ সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও কমনীয়তা লুক্কায়িত রেখেছেন সেটা প্রকাশ পায় চিন্তা ও গভীর দৃষ্টির পর।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَمَعْرِفَةُ حَقِيْقَتِهِ الخ : মূল লেখক বলেন, مَجَاز عَقْلِى-এর حقيقت-এর পরিচয় জানা সহজ হবে অথবা হবে না। অর্থাৎ مَجَاز عَقْلِى-এর ফে'ল অথবা مَعْنٰى فِعْل-এর ইসনাদ যদিও غَيْر مَا هُوَ لَهُ-এর দিকে হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ فعل অথবা مَعْنٰى فِعْل-এর জন্য একটি مَا هُوَ لَهُ অর্থাৎ এমন এক فاعل অথবা مَفْعُوْل بِهٖ হওয়া প্রয়োজন যার দিকে ইসনাদ করা হলে ইসনাদটি হাকীকত হয়। সুতরাং যেই فاعل অথবা مَفْعُوْل به-এর দিকে ইসনাদ করাটা হাকীকী ইসনাদ হয় ঐ فاعل অথবা مفعول به-এর পরিচয়টি শ্রোতার কাছে হয়তো স্পষ্ট হবে অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বুঝা যাবে অথবা অস্পষ্ট হবে– যা চিন্তা-ভাবনা করার পর প্রতিভাত হয়। আর অস্পষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, ফে'লের নিসবত (ব্যবহার) কখনো মাজাযী ফায়েল অথবা মাফউলের দিকে বেশি হয় এবং হাকীকী ফায়েল অথবা মাফউলের প্রতি ইসনাদ প্রায় লোপ পেয়ে যায়। এ কারণেই পাঠকের ধারণা হাকীকতের দিকে যায় না এবং হাকীকতের পরিচয় লাভ করার জন্য চিন্তা-ভাবনার আশ্রয় নিতে হয়।

হাকীকতের পরিচয় স্পষ্ট হওয়ার উদাহরণ : যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ। এর অর্থ হচ্ছে– فَمَا رَبِحُوْا فِىْ تِجَارَتِهِمْ তারা তাদের ব্যবসায় লাভবান হয়নি। ব্যবসা মুনাফা পাওয়ার সবব বা কারণ। এ কারণে رِبْح-কে تِجَارَة-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুনাফা লাভকারী হলো ব্যবসায়ীরা। আর তা সুস্পষ্ট। সুস্পষ্ট

হওয়ার কারণ হচ্ছে, আরবি ভাষাভাষীদের পরিভাষা এরূপ যে, তারা তাদের মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এরূপ বলে থাকে 'ব্যবসায়ী ব্যবসাতে মুনাফা অর্জন করেছে' তখন তারা ব্যবসার প্রতি লাভবান হওয়ার বিষয়টি নিসবত করে না। সুতরাং এদের এ পরিভাষা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, এ আয়াতটিতে إِسْنَاد مَجَازِى হয়েছে।

অথবা, হাকীকী ফায়েল অথবা মাফঊলের পরিচয় স্পষ্ট থাকে না। অথবা, এমন যা চিন্তা-ভাবনার পর হাসিল হয়। যেমন– سَرَّتْنِى رُؤْيَتُكَ তোমার সাক্ষাৎ আমাকে আনন্দিত করেছে। এ বাক্যে سرت ফে'লের নিসবত رؤيت-এর দিকে মাজায হিসেবে হয়েছে। কেননা, আনন্দ দানের হাকীকী ফায়েল হলো আল্লাহ। তখন বাক্যটি এরূপ হবে سَرَّنِى اللّٰهُ عِنْدَ رُؤْيَتِكَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আনন্দিত করেছেন তোমার সাক্ষাতের সময়। এ মতে رؤيت হলো ظرف زمان বা আনন্দ লাভ করার কাল। আমরা জানি, ফে'লের নিসবত যদি তার ফায়েলের দিক না করে কাল বা সময়ের দিকে করা হয় তখন এটি মাজায হয়। সুতরাং رؤيت এখানে ফায়েলে মাজাযী। উদাহরণটিতে ফায়েলে হাকীকী স্পষ্ট নয়। কারণ, হাকীকী ফায়েলের দিকে নিসবত করে ভাষাভাষীদের ব্যবহার পাওয়া যায় না। তারা মাজাযটিকে এমনভাবে ব্যবহার করে যেন এর হাকীকী ফায়েলই নেই। আর এ কারণেই পাঠক ও শ্রোতাদের কারো মন হাকীকী ফায়েল-এর প্রতি যায় না। ফলে এর হাকীকী ফায়েলের পরিচয় অস্পষ্ট থেকে যায়।

এ ধরনের আরো একটি উদাহরণ হলো– يَزِيدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَرًا অর্থাৎ তোমার নিকটতার চেহরার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে তুমি যত বেশি তাকে দেখবে। অর্থাৎ তুমি গভীরভাবে যত বেশি তাকে দেখবে তোমার কাছে তার চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

কবিতার রচয়িতা কে? এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়। ঈযাহ গ্রন্থের লেখকের মতে, এটি আবূ নুওয়াসের কবিতা। আর আল্লামা তাফতাযানীর মতে, এটি ইবনুল মুআয্যালের কবিতা। কেউ কেউ এ দু'টি মতকে সমন্বিত করে বলেন, আবূ নুওয়াস হলো ইবনুল মুআয্যালের উপনাম। এ ব্যাখ্যানুসারে তারা দুই ব্যক্তি নয়; বরং একই ব্যক্তি। তবে সমন্বয় সাধনের এ অভিমত সঠিক নয়; বরং ঈযাহের অভিমতই সঠিক। অতএব, মতানৈক্য আর রইল না। এ কবিতাটিতে হাকীকী ফায়েলের পরিচয় স্পষ্ট নয়; এর কারণ তাই যা আমরা سَرَّتْنِى رُؤْيَتُكَ-এর মধ্যে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ সাধারণ ব্যবহারে এর হাকীকতকে উদ্দেশ্য করা হয় না এবং হাকীকতের প্রতি ইসনাদ করে ফে'লকে ব্যবহার করা হয় না।

وَفِي هٰذَا تَعْرِيْضٌ بِالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَاهِرِ وَرَدٌّ عَلَيْهِ حَيْثُ زَعَمَ اَنَّهُ لَايَجِبُ فِي الْمَجَازِ الْعَقْلِيْ اَنْ يَكُوْنَ لِلْفِعْلِ فَاعِلٌ يَكُوْنُ الْاِسْنَادُ اِلَيْهِ حَقِيْقَةً فَاِنَّهُ لَيْسَ لِسَرَّتْنِيْ فِيْ سَرَّتْنِيْ رُؤْيَتُكَ وَلِيَزِيْدُكَ فِيْ يَزِيْدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا فَاعِلٌ يَكُوْنُ الْاِسْنَادُ اِلَيْهِ حَقِيْقَةً وَكَذَا اَقْدَمَنِيْ بَلَدَكَ حَقٌّ لِيْ عَلٰى فُلَانٍ بَلِ الْمَوْجُوْدُ هٰهُنَا هُوَ السُّرُوْرُ وَالزِّيَادَةُ وَالْقُدُوْمُ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْاِمَامُ فَخْرُ الدِّيْنِ الرَّازِيُّ بِاَنَّ الْفِعْلَ لَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ فَاعِلٌ حَقِيْقَةً لِاِمْتِنَاعِ صُدُوْرِ الْفِعْلِ لَا عَنْ فَاعِلٍ فَهُوَ اِنْ كَانَ مَا اُسْنِدَ اِلَيْهِ الْفِعْلُ فَلَا مَجَازَ وَاِلَّا فَيُمْكِنُ تَقْدِيْرُهُ وَ زَعَمَ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ اَنَّ اِعْتِرَاضَ الْاِمَامِ حَقٌّ وَاَنَّ فَاعِلَ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَنَّ الشَّيْخَ لَمْ يَعْرِفْ حَقِيْقَتَهَا لِخَفَائِهَا فَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ وَظَنِّيْ اَنَّ هٰذَا تَكَلُّفٌ وَالْحَقُّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ـ

<u>অনুবাদ :</u> এতে শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে এবং তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, তিনি মনে করেন مَجَازٌ عَقْلِيْ-এর মধ্যে ফে'লের জন্য এমন কোনো ফায়েলের দরকার নেই। যার প্রতি ফে'লের ইসনাদটি হাকীকী হবে। তিনি বলেন, سَرَّتْنِيْ رُؤْيَتُكَ-এর মধ্যে سرتني-এর জন্য আর يَزِيْدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا-এর মধ্যে يزيدك-এর জন্যে কোনো ফায়েল নেই, যার প্রতি ফে'লের ইসনাদটি হাকীকী হয়েছে। ঠিক এরূপই হলো اَقْدَمَنِيْ بَلَدَكَ حَقٌّ لِيْ عَلٰى فُلَانٍ (এতে কোনো হাকীকী ফায়েল নেই) বরং এখানে ফে'লগুলো হলো আনন্দ পাওয়া, বেশি হওয়া এবং আগমন করা (অর্থাৎ এগুলো হলো ফে'লে লাযেম, ফে'লে মুতা'আদ্দী নয়)। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) তাঁর উপর আপত্তি করে বলেন, ফে'লের জন্য অবশ্যই প্রকৃত ফায়েলের প্রয়োজন, ফায়েল ছাড়া ফে'ল সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ফায়েলটি যদি এমন বস্তু হয় যার প্রতি ফে'লের নিসবত করা হয়েছে তাহলে তো তা مجاز হলো না, অন্যথায় فاعل-কে উহ্য মানা সম্ভব। মিফতাহ গ্রন্থের লেখক (আল্লামা ইউসুফ সাক্কাকী) বলেন, ইমাম ফখরুদ্দিন রাযীর মতামত সঠিক এবং এসব ফে'লের ফায়েল হলেন আল্লাহ। আর শায়খ বিষয়টির মূলতত্ত্ব অনুধাবন করেননি। অতএব, তার (সাক্কাকীর) অনুসরণ করলেন মূল লেখক। আমার মতে, এসবই হলো এক ধরনের অতিরঞ্জন। শায়েখ (আব্দুল কাহির) যা উল্লেখ করেছেন তা-ই সঠিক।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَفِيْ هٰذَا تَعْرِيْضٌ بِالشَّيْخِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের ইবারত مَعْرِفَتُهُ حَقِيْقَةً إِمَّا ظَاهِرَةً إِمَّا خَفِيَّةً-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মূল লেখক এ ইবারত দ্বারা শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর মাযহাবের প্রতি কটাক্ষ করেছেন এবং তার মাযহাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মূল লেখকের দাবি হলো, مَجَازٌ عَقْلِي-এর মধ্যে ফে'লের জন্য ফায়েলে হাকীকী থাকা জরুরি। চাই সে ফায়েলের পরিচয় প্রকাশ্য হোক অথবা অস্পষ্ট হোক। আর শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর মত হলো, مَجَازٌ عَقْلِي-এর মধ্যে ফে'লের জন্য বাস্তবে ফায়েলে হাকীকী এবং مَا هُوَ لَهُ থাকা অত্যাবশ্যক নয়।

তাদের মতবিরোধকৃত বিষয়টি হচ্ছে, مَجَازٌ عَقْلِي হওয়ার জন্যে শর্ত হলো তার ফে'লের (মুসনাদের) জন্য বাস্তবিক একটি ফায়েল থাকা, যার প্রতি ফে'লের ইসনাদ করা হয়েছে, মাজায হওয়ার আগে عرف হিসেবে অথবা ব্যবহার হিসেবে। অথবা এ ধরনের কোনো শর্ত মাজাযের নেই।

মিফতাহের লেখক আল্লামা সাক্কাকী এবং তালখীসের লেখক আল্লামা মুহাম্মদ আবূ আব্দুল্লাহ কাযবিনীর কাছে মাজায হওয়ার এরূপ শর্ত রয়েছে। আর আল্লামা শায়খ আব্দুল কাহিরের মতে, এরূপ শর্ত অত্যাবশ্যকীয় নয়। তাঁর মতে سَرَّتْنِيْ رُؤْيَتُكَ-এর মধ্যে سَرَّتْنِيْ-এর জন্য এবং يَزِيْدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا-এর মধ্যে يَزِيْدُكَ-এর জন্য সাধারণের কাছে এবং ব্যবহারিকভাবে এমন কোনো ফায়েল নেই, যার প্রতি ইসনাদটি হাকীকী হয়। এমনিভাবে أَقْدَمَنِيْ بَلَدَكَ حَقٌّ لِيْ عَلٰى فُلَانٍ-এর মধ্যে أَقْدَمَنِيْ-এর জন্য এমন কোনো হাকীকী ফায়েল নেই, যার প্রতি ফে'লের ইসনাদ হাকিকী হয়। তাঁর মতে এ তিনটি উদাহরণের ফে'লগুলো যদিও متعدى ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো ফে'লে লাযিম।

سَرَّتْنِيْ-এর অর্থ আমি মুগ্ধ হলাম, يَزِيْدُكَ-এর অর্থ– বেশি হলো এবং أَقْدَمَنِيْ-এর অর্থ আগমন করলাম।

কিন্তু মূল লেখক এবং সাক্কাকী (র.)-এর মতে এই ফায়েলগুলোর প্রকৃত ফায়েল হলো আল্লাহ তা'আলা। এর থেকে যখন ইসনাদকে সরিয়ে وجهه , رؤيت ও حق-এর দিকে ইসনাদ করা হয়েছে, তখন তা মাজায হয়েছে। আল্লামা আব্দুল কাহির জুরজানির মতে, এগুলোর প্রকৃত কোনো ফায়েল এই অর্থে নেই যে, প্রথমে প্রকৃত ফায়েলের দিকে নিসবত করে তা থেকে সরিয়ে (বর্তমান) মাজাযী ফায়েলের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) শায়খ জুরজানির এ মতের উপর আপত্তি করে বলেন, ফে'লের জন্য হাকীকী ফায়েল থাকতেই হবে। যদি ফে'লের হাকীকী ফায়েল না থাকে, তাহলে ফায়েল ছাড়া ফে'লের সংঘটিত হওয়া আবশ্যক হয়; অথচ ফায়েল ছাড়া ফে'লের অস্তিত্ব অসম্ভব।

অতএব, বর্তমানে ফে'লকে যার দিকে ইসনাদ করা হয়েছে, যদি সেটাই হাকীকী ফায়েল হয়, তাহলে তো এটি মাজায হলো না। আর যদি তা হাকীকী ফায়েল না হয়, তাহলে তো একটি হাকীকী ফায়েল উহ্য মানা আবশ্যকীয়।

আল্লামা সাক্কাকী (র.) বলেন, ইমাম ফখরুদ্দিন রাযীর প্রশ্নটি যথার্থ এবং উল্লিখিত তিনটি ফে'লের হাকীকী ফায়েল অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা। তিনি বলেন, শায়খ জুরজানির কাছে ফায়েলগুলো অস্পষ্ট হওয়ার কারণে এর হাকীকী ফায়েলগুলো চিনতে পারেননি এবং এগুলোর হাকীকী ফায়েল থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

আল্লামা তাফতাযানী বলেন, মূল লেখক এক্ষেত্রে আল্লামা সাক্কাকীর অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, আমার ব্যক্তিগত মত হলো– শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানির মতটি সঠিক। তারা যা বলেছেন তা এক ধরনের অবাস্তব ব্যাখ্যা। কেননা, তারা যে বলেছেন উল্লিখিত ফে'লের ফায়েল আল্লাহ তা'আলা এ কথাটি সঠিক নয়। যদি আল্লাহ ফায়েল হন তবে এ হিসেবে যে, আল্লাহ সব জিনিসের উদ্ভাবক এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী। আর এ কথাতো শায়খ জুরজানিও অস্বীকার করেন না। তবে এখানে ফায়েল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– যার দ্বারা ফে'ল সংঘটিত হয়। এখানে উল্লিখিত ফে'লগুলো আল্লাহ কর্তৃক সংঘটিত নয়। যখন এগুলো আল্লাহ তা'আলা দ্বারা সংঘটিত নয়, তখন এগুলোর হাকীকী ফায়েল আল্লাহ তা'আলা হবেন না। অতএব, এসব ফে'লের হাকীকী ফায়েল না থাকাই প্রমাণিত হলো।

সার-সংক্ষেপ :

مَجَاز عَقْلِي-এর হাকীকী ইসনাদের পরিচয় কখনো সুস্পষ্ট হবে, আবার কখনো হাকীকী ইসনাদের পরিচয় অস্পষ্ট হবে।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে– فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ (এটি مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ) এর প্রকৃত বা হাকীকী ইসনাদযুক্ত বাক্যটি হলো– فَمَا رَبِحُوْا فِيْ تِجَارَتِهِمْ

مَجَاز عَقْلِي-এর হাকীকী ইসনাদের পরিচয় অস্পষ্ট হওয়ার উদাহরণ سَرَّتْنِيْ رُؤْيَتُكَ (এটি مجاز-এর উদাহরণ)-এর প্রকৃত ইসনাদযুক্ত বাক্যটি হচ্ছে سَرَّنِي اللّٰهُ عِنْدَ رُؤْيَتِكَ দ্বিতীয় উদাহরণের মাঝে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, তার প্রকৃত ইসনাদটি এমন যে, তা এমনিতে বুঝা যায় না; বরং অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তা স্পষ্ট হয়।

তালখীসুল মিফতাহের লেখক আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ জালালুদ্দীন কাযবীনী, মিফতাহ গ্রন্থের লেখক ইউসুফ সাক্কাকী ও আল্লামা রাযীর মতে مَجَاز عَقْلِي-এর জন্য ফায়েলে হাকীকী/মাফউলে হাকীকী থাকা আবশ্যক। পক্ষান্তরে আল্লামা আব্দুল কাহির জুরজানী ও সা'দ উদ্দীন তাফতাযানীর মতে مَجَاز عَقْلِي-এর জন্য এরূপ ফায়েল/মাফউলে বিহীর আবশ্যকতা নেই।

وَاَنْكَرَهُ اَىْ اَلْمَجَازَ الْعَقْلِىَّ السَّكَّاكِىُّ وَقَالَ الَّذِىْ عِنْدِىْ نَظْمُهُ فِىْ سِلْكِ الْاِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ بِجَعْلِ الرَّبِيْعِ اِسْتِعَارَةً بِالْكِنَايَةِ عَنِ الْفَاعِلِ الْحَقِيْقِىْ بِوَاسِطَةِ الْمُبَالَغَةِ فِى التَّشْبِيْهِ وَجَعْلِ نِسْبَةِ الْاِنْبَاتِ اِلَيْهِ قَرِيْنَةً لِلْاِسْتِعَارَةِ وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهٖ ذَاهِبًا اِلٰى اَنَّ مَا مَرَّ مِنَ الْاَمْثِلَةِ وَنَحْوِهٖ اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ وَهُوَ عِنْدَ السَّكَّاكِىْ اَنْ تَذْكُرَ الْمُشَبَّهَ وَتُرِيْدُ الْمُشَبَّهَ بِهٖ بِوَاسِطَةِ قَرِيْنَةٍ وَهِىَ اَنْ تَنْسِبَ اِلَيْهِ شَيْئًا مِنَ اللَّوَازِمِ الْمُسَاوِيَةِ لِلْمُشَبَّهِ بِهٖ مِثْلُ اَنْ تُشَبِّهَ الْمَنِيَّةَ بِالسَّبُعِ ثُمَّ تُفْرِدُهَا بِالذِّكْرِ وَتُضِيْفُ اِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ لَوَازِمِ السَّبُعِ فَتَقُوْلُ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ نَشَبَتْ بِفُلَانٍ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّبِيْعِ الْفَاعِلُ الْحَقِيْقِىُّ لِلْاِنْبَاتِ يَعْنِىْ اَلْقَادِرَ الْمُخْتَارَ بِقَرِيْنَةِ نِسْبَةِ الْاِنْبَاتِ الَّذِىْ هُوَ مِنَ اللَّوَازِمِ الْمُسَاوِيَةِ لِلْفَاعِلِ الْحَقِيْقِىْ اِلَيْهِ اَىْ اِلَى الرَّبِيْعِ وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ غَيْرُهُ اَىْ غَيْرُ هٰذَا الْمِثَالِ وَحَاصِلُهُ اَنْ يُشَبَّهَ الْفَاعِلُ الْمَجَازِىْ بِالْفَاعِلِ الْحَقِيْقِىْ فِىْ تَعَلُّقِ وُجُوْدِ الْفِعْلِ بِهٖ ثُمَّ يُفْرَدُ الْفَاعِلُ الْمَجَازِىْ بِالذِّكْرِ وَيُنْسَبُ اِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ لَوَازِمِ الْفَاعِلِ الْحَقِيْقِىْ ـ

অনুবাদ : সাক্কাকী (র.) মাজাযে আকলী (-এর অস্তিত্ব)-কে **অস্বীকার করেন**। তিনি বলেন, আমার মতে একে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ-এর সুতোয় গাঁথা চাই (اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ-এর উদাহরণ) ربيع-কে হাকীকী ফায়েল থেকে مُبَالَغه فِى التَّشْبِيْهِ-এর মাধ্যমে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ হিসেবে। আর اِنْبَات-এর নিসবত ربيع-এর দিকে استعارة-এর দলিল বানিয়ে। **তার সামনের বাক্যে এই অর্থ রয়েছে পেছনের উদাহরণগুলোতে** اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ-**এর মত গ্রহণ করে**। আর সাক্কাকীর মতে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ হলো مشبه-কে উল্লেখ করা হবে এবং করীনার মাধ্যমে مُشَبَّه بِهٖ-কে উদ্দেশ্য করা হবে। আর করীনা হলো مُشَبَّه بِهٖ-এর لَوَازِم مُسَاوِيَه থেকে একটিকে مشبه-এর দিকে নিসবত করা হবে। যেমন– আপনি মৃত্যুকে উপমা দিলেন হিংস্র পশুর সাথে। অতঃপর শুধুমাত্র مشبه-কে উল্লেখ করলেন এবং এর প্রতি হিংস্রপশুর কোনো লাযেমকে নিসবত করে দিয়ে বললেন, مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ نَشَبَتْ بِفُلَانٍ। অর্থাৎ মৃত্যুর থাবা অমুকের উপর গেঁথে গেছে। **এ ভিত্তিতে যে,** ربيع **দ্বারা উদ্দেশ্য উৎপন্ন করার প্রকৃত ফায়েল**। অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা। **দলিল হলো** انبات-**এর নিসবত** ربيع-**এর দিকে** যার প্রকৃত ফায়েল (আল্লাহ)-এর জন্য لَازِم مُسَاوِى।

এর উপর অন্যান্যগুলোকে কিয়াস (তুলনা) **করা হবে**। অর্থাৎ এ উদাহরণ ছাড়া। মোটকথা হলো, ফায়েলে মাজাযীকে ফায়েলে হাকীকীর সাথে تشبيه দেওয়া হবে, ফে'লের অস্তিত্ব তার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে। এরপর শুধুমাত্র ফায়েলে মাজাযীকে উল্লেখ করা হবে এবং ফায়েলে হাকিকীর কোনো লাযেমী জিনিসকে তার প্রতি নিসবত করা হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَنْكَرَهُ أَيِ الْمَجَازَ الخ : মূল লেখক বলেন, আল্লামা সাক্কাকী مَجَاز عَقْلِي-কে অস্বীকার করেন– তিনি বলেন, مَجَاز عَقْلِي বলে কিছু নেই। এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন مَجَاز عَقْلِي হলো বাস্তববিরোধী কথা। আর বাস্তববিরোধী কথা আরবি ভাষায় অগ্রহণযোগ্য। অতএব, مَجَاز عَقْلِيও অগ্রহণযোগ্য; কিন্তু তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় ইতঃপূর্বে أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ। সহ আরো যতগুলো উদাহরণ গেল, সেগুলোর ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

এর উত্তরে তিনি বলেন, সেগুলো সব إِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ তার মতে أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ-এর মধ্যে ربيع হলো مشبه আর مُشَبَّه بِه হলেন আল্লাহ তা'আলা (হাকীকী ফায়েল)। এখানে ربيع-কে مُبَالَغَةٌ فِي التَّشْبِيْهِ-এর মাধ্যমে উপমা দেওয়া হয়েছে। مُشَبَّه بِه উহ্য আছে। এই استعارة-এর উপর দলিল হলো انبات-কে ربيع-এর নিসবত করা হয়েছে। যা আল্লাহ তা'আলার জন্য لَازِم مُسَاوِي উল্লেখ্য যে, আল্লামা সাক্কাকী ইতঃপূর্বে বর্ণিত যতগুলো مجاز عقلى-এর উদাহরণ গেছে সবগুলোকে إِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বলেছেন। তাই উদাহরণগুলোর নতুন ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানার আগে আমাদের জানতে হবে তার মতে إِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ কাকে বলে?

উত্তর : একটি বিষয়কে (مشبه) অপর আরেকটি বিষয় (مُشَبَّه بِه)-এর সাথে মনে মনে উপমা দেওয়া হবে। অতঃপর مشبه-কে উল্লেখ করা হবে দলিলের মাধ্যমে مُشَبَّه بِه-কে মনে মনে ধরে নেওয়া হবে। দলিল হলো– مشبه به-এর لَازِم مُسَاوِي-এর মধ্য থেকে যে কোনো لَازِم مُسَاوِي-কে مشبه-এর দিকে নিসবত করা হবে।

لَازِم مُسَاوِي বলা হয়– এমন সব গুণাবলিকে, যা مُشَبَّه بِه-এর সাথে খাস। مشبه به পাওয়া গেলে এসব গুণাবলিও পাওয়া যাবে, আবার مشبه به না পাওয়া গেলে এসব গুণাবলিও পাওয়া যাবে না। যেমন– انبات (অর্থ উদ্গত করা) আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন একটি গুণ যা আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের সাথে انباتও প্রমাণিত হয়ে যায়। মুসান্নিফ (র.) সাক্কাকীর إِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করে তার অলোকে একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন– منية (মৃত্যু)-কে উপমা দেওয়া হলো হিংস্রজন্তুর সাথে। এরপর مشبه-কে উল্লেখ করা হলো (এবং مشبه به-কে উহ্য রাখা হলো) এবং مشبه به (হিংস্র জন্তু) لازم مسايه (অত্যাবশ্যকীয় বিষয়) مخالب (থাবা)-কে مشبه (মৃত্যু)-এর দিকে নিসবত করা হলো। অতএব, إِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ হলো, যেমন তুমি বললে مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ نَشَبَتْ بِفُلَانٍ অর্থাৎ মৃত্যুর থাবা তাকে আঁকড়ে ধরেছে। মূল লেখক বলেন, উদাহরণের মধ্যে (مشبه) ربيع-কে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো انبات-এর হাকীকী ফায়েল তথা আল্লাহ তা'আলা, যিনি তার ইচ্ছার ব্যাপারে স্বাধীন এবং সর্বশক্তিমান।

হাকীকী ফায়েল যে উদ্দেশ্যের দলিল হলো انبات যা আল্লাহ্ তা'আলার লাযিমে মুসাবী তাকে নিসবত করা হয়েছে– ربيع-এর দিকে। মুসান্নিফ বলেন, এ উদাহরণের উপর অন্যান্য উদাহরণগুলোকে কিয়াস করা হবে। এটির মধ্যে যেমন استعارة হয়েছে তেমনি অন্যান্য উদাহরণেও استعارة হয়েছে। অর্থাৎ فَاعِل مَجَازِي উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য করা হয়েছে فَاعِل حَقِيْقِي-কে। আর এটা করা হয়েছে উভয় ফায়েলের সাথে ফে'লের সম্পর্কের ভিত্তিতে। তবে সব কিছুর আগে فَاعِل مَجَازِي-কে فَاعِل حَقِيْقِي-এর সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

আল্লামা আবূ ইয়াকূব ইউসুফ সাক্কাকী (র.) مَجَاز عَقْلِي-এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে ইতঃপূর্বে বর্ণিত مجاز عقلى-এর উদাহরণগুলোতে إِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। তাঁর মতে إِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ।

সংজ্ঞা : কোনো একটি বিষয় (مشبه)-কে অন্য আরেকটি বিষয় (مُشَبَّه بِه)-এর সাথে মনে মনে উপমা দেওয়া হবে, তারপর مشبه-কে উল্লেখ করে مُشَبَّه بِه-কে ধরে নেওয়া হবে। আর مشبه-কে মনে মনে ধরে নেওয়ার দলিল হিসেবে مُشَبَّه بِه-এর لَازِم مُسَاوِي-কে বাক্যের মধ্যে উল্লেখ করা হবে। যেমন– أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ এ উদাহরণে ربيع দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ, আর তার لازم مساوى হচ্ছে انبات।

وَفِيْهِ اَىْ فِيْمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ السَّكَّاكِىْ نَظَرٌ لِاَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ اَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ بِالْعِيْشَةِ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ صَاحِبَهَا كَمَا سَيَاْتِىْ فِى الْكِتَابِ مِنْ تَفْسِيْرِ الْاِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ عَلٰى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ السَّكَّاكِىُّ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ يَقْتَضِىْ اَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ بِالْفَاعِلِ الْمَجَازِىْ هُوَ الْفَاعِلُ الْحَقِيْقِىُّ فَيَلْزَمُ اَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ بِعِيْشَةٍ صَاحِبَهَا وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ اِذْ لَا مَعْنٰى لِقَوْلِنَا هُوَ فِىْ صَاحِبِ عِيْشَةٍ وَهٰذَا مَبْنِىٌّ عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَ بِعِيْشَةٍ وَضَمِيْرِ رَاضِيَةٍ وَاحِدٌ وَيَسْتَلْزِمُ اَنْ لَا يَصِحَّ الْاِضَافَةُ فِىْ كُلِّ مَا اُضِيْفَ اِلَيْهِ الْفَاعِلُ الْمَجَازِىُّ اِلَى الْفَاعِلِ الْحَقِيْقِيِّ نَحْوُ نَهَارُهُ صَائِمٌ لِبُطْلَانِ اِضَافَةِ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهِ اللَّازِمَةِ مِنْ مَذْهَبِهِ لِاَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهَارِ فُلَانٌ نَفْسُهُ وَلَاشَكَّ فِىْ صِحَّةِ هٰذِهِ الْاِضَافَةِ وَ وُقُوْعِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالٰى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَهٰذَا اَوْلٰى بِالتَّمْثِيْلِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **কিন্তু তাতে** অর্থাৎ সাক্কাকী যে মত গ্রহণ করেছেন তাতে **আপত্তি আছে। কেননা, এ অভিমত আল্লাহ তা'আলার বাণী–** فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ**-এর** عِيْشَة **জীবন দ্বারা জীবনের অধিকারী উদ্দেশ্য হওয়াকে আবশ্যক করে।** যেমনটি কিতাবে আসবে অর্থাৎ সাক্কাকীর মতানুসারে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী। আমরা অবশ্য এটি (অর্থাৎ তার اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ-এর ব্যাখ্যা) আলোচনা করেছি, যা فَاعِل مَجَازِى দ্বারা فاعل حقيقى উদ্দেশ্য হওয়াকে দাবি করে। ফলে عِيْشَة (জীবন) দ্বারা জীবনের অধিকারী ব্যক্তি উদ্দেশ্য হওয়া অনিবার্য হবে। আর এ ধরনের (একটা শব্দ দ্বারা অন্য অর্থের) আবশ্যকতা অগ্রহণযোগ্য। কেননা, আমাদের উক্তি هُوَ فِىْ صَاحِبِ عِيْشَةٍ (সে জীবনের অধিকারী ব্যক্তির মধ্যে)-এর কোনো অর্থ নেই। এ অর্থ তখনই হবে যখন عيشة এবং راضية-এর সর্বনাম এক হবে **এবং** (তার মাযহাব দ্বারা) **ইযাফত সহীহ না হওয়া** লাযেম আসে প্রত্যেক ঐ সব উদাহরণে যাতে ফায়েলে মাজাযীকে হাকীকী ফায়েলের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। **যেমন–** نَهَارُهُ صَائِمٌ **(তার দিবস রোজাদার এটি সহীহ নয়)** اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهِ **বাতিল হওয়ার কারণে।** এ ধরনের লাযেম সাক্কাকীর মাযহাবের কারণে হয়। কেননা, نهار দ্বারা সেই (রোজাদার) ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। অথচ এ ইযাফতগুলো সঠিক হওয়ার ব্যাপারে এবং এর ব্যবহার আল্লাহ তা'আলার কালামে ব্যবহার হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন– فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ এ আয়াতে فَاعِل مَجَازِى-কে فَاعِل حَقِيْقِى-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটিই উদাহরণ হিসেবে বেশি উত্তম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَفِيْهِ اَىْ فِيْمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الخ **:** মূল লেখক বলেন, মিফতাহুল উলূমের লেখক আল্লামা সাক্কাকীর মাযহাব বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়; বরং তার মাযহাব মতে مَجَاز عَقْلِى-এর উদাহরণগুলোকে যদি اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বলা হয়– তাহলে অনেকগুলো আপত্তি দেখা দেয়, যা এসব উদাহরণের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি সৃষ্টি করে। সাক্কাকীর মতানুসারে যে সমস্যা দেখা দেয়, তা উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

১ম উদাহরণ : فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ অর্থাৎ সে তার পছন্দনীয় জীবন লাভ করবে। আমাদের মতে এটি مَجَاز عَقْلِيْ-এর উদাহরণ, যেমনটি ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লামা সাক্কাকীর মতানুসারে যদি এটিকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বলা হয়, তাহলে ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ দেখা দেবে। ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ-এর ব্যাখ্যা : ظرف বলা হয় কোনো বস্তু রাখার পাত্র বা স্থানকে। যেমন– আম রাখার টুকরিকে আমের ظرف বলা হবে। আর ظرف-এর মধ্যে যা রাখা হয় তাকে مظروف বলা হয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, ظرف এবং مظروف ভিন্ন জিনিস ও পরস্পর বিপরীত। ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ-এর অর্থ হচ্ছে– مظروف এবং ظرف এক হয়ে যাওয়া, যা অসম্ভব।

এ উদাহরণের মধ্যে راضية-এর সর্বনামের مرجع হলো عيشة যা فَاعِل مَجَازِيْ আর এর হাকীকী ফায়েল হলো صَاحِب عِيْشَة বা ব্যক্তি। اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ-এর মধ্যে যেহেতু ফায়েলে মাজাযী বলে ফায়েলে হাকীকী উদ্দেশ্য করা হয়। তাই مشبه দ্বারা উদ্দেশ্য হবে صَاحِب عِيْشَة বা ব্যক্তি। فهو-এর মধ্যে هو সর্বনামের مرجع হলো من যা এর আগের বাক্য فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ-এর মধ্যে রয়েছে من দ্বারা উদ্দেশ্য হলো صَاحِب عِيْشَة বা ব্যক্তি। অতএব, বাক্যের অর্থ হবে ব্যক্তি তার সন্তুষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আছে। অর্থাৎ ظرف জীবনের অধিকারী এবং مظروف ও জীবনের অধিকারী। সুতরাং এখানে ظرف এবং مظروف হওয়ার দ্বারা ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ হলো। যেহেতু ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ বাতিল, অতএব যার দ্বারা এ বাতিল হওয়া লাযেম হলো তাও বাতিল। অর্থাৎ استعارة بالكناية দ্বারা যেহেতু এই বাতিল হওয়ার প্রক্রিয়া হয়েছে, তাই اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَه বাতিল হবে এবং তা مجاز عقلى-এর উদাহরণ হিসেবেই গণ্য হবে।

২য় উদাহরণ : نَهَارُهُ صَائِمٌ এটি মূল লেখকের মতে مجاز عقلى-এর উদাহরণ। ইতঃপূর্বে এর বিশদ বর্ণনা আমরা দিয়েছি। যদি সাক্কাকী (র.)-এর মতানুসারে তাকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَة বলা হয়, তাহলে اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهِ লাযেম হবে। আর তা এভাবে যে, صائم-এর সর্বনাম فَاعِل مَجَازِى-এর দিকে ফিরেছে। যার مرجع হলো نهار এখানে استعارة بِالْكِنَايَةِ হিসেবে فَاعِل مَجَازِى উল্লেখ করা হবে; কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে فَاعِل حَقِيْقِى আবার نهار-কে সম্বন্ধ করা হয়েছে فَاعِل حَقِيْقِى-এর সর্বনাম "ه"-এর দিকে অতএব, এখানে نهار দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فَاعِل حَقِيْقِى যাকে সম্বন্ধ করা হয়েছে হাকীকী ফায়েলের দিকে অর্থাৎ ফায়েলে হাকীকীর সম্বন্ধ ফায়েলে হাকীকীর দিকে। সুতরাং اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهِ হলো, আর এ ধরনের সম্বন্ধ বাতিল। কিন্তু এ সম্বন্ধটি লাযেম হয়েছে এ উদাহরণটিকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বলার কারণে। আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি যে, যা বাতিল হওয়াকে লাযেম করে তাও বাতিল বলে গণ্য হয়। অতএব, উদাহরণটিকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বলা ঠিক হবে না। উপরের আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ ধরনের উদাহরণ যার মধ্যে فَاعِل مَجَازِى-কে ফায়েলে হাকীকীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে সেগুলোকে সাক্কাকীর মতানুসারে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বলা হলে এর দ্বারা অনুরূপ সমস্যা হবে। অর্থাৎ اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهِ লাযেম হবে।

এখানে যদি কেউ এ কথা বলেন, মুসান্নিফ (র.) ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهِ এবং اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهِ ইত্যাদির কারণে মূল লেখকের اِسْتِعَارَةُ بِالْكِنَايَةِ-এর দাবিকে বাতিল করলেন; অথচ উদাহরণগুলোকে বহাল রাখলেন কেন? এর উত্তর হলো উদাহরণগুলো সঠিক। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তা ছাড়া এ উদাহরণগুলো থেকে কতকগুলো পবিত্র কুরআন কারীমেও রয়েছে। যদি এগুলো সঠিক না হতো তাহলে কুরআন কারীমে এর ব্যবহার পাওয়া যেত না। যেমন– পবিত্র কুরআনে فَاعِل مَجَازِى-কে فَاعِل حَقِيْقِى-এর প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে। উদাহরণ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ এ উদাহরণে تجارة হলো فَاعِل مَجَازِى যার সম্বন্ধ করা হয় فَاعِل حَقِيْقِى তথা هم সর্বনামের দিকে। অতএব, উদাহরণগুলো সঠিক আর সঠিক উদাহরণগুলোকে যে কারণে বাতিল বলতে হয়, সেই কারণগুলো বরঞ্চ বাতিল।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, نَهَارُهُ صَائِمٌ (যে উদাহরণ মূল লেখক উল্লেখ করেছেন)-এর চেয়ে فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ উত্তম হতো। কেননা, এটি কুরআনের আয়াত হওয়ার কারণে এর সম্বন্ধ সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকত না। যার কারণে সাক্কাকী (র.)-এর মাযহাব যে বাতিল তা আরো বেশি প্রতিভাত হতো।

وَ يَسْتَلْزِمُ اَنْ لَايَكُوْنَ الْاَمْرُ بِالْبِنَاءِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى يَا هَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لِهَامَانَ لِاَنَّ الْمُرَادَ بِهٖ حِيْنَئِذٍ هُوَ الْعَمَلَةُ اَنْفُسُهُمْ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِاَنَّ النِّدَاءَ لَهٗ وَالْخِطَابَ مَعَهٗ وَ يَسْتَلْزِمُ اَنْ يَتَوَقَّفَ نَحْوُ اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ وَشَفَى الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ وَسَرَّتْنِىْ رُؤْيَتُكَ مِمَّا يَكُوْنُ الْفَاعِلُ الْحَقِيْقِىُّ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى السَّمْعِ مِنَ الشَّارِعِ لِاَنَّ اَسْمَاءَ اللّٰهِ تَعَالٰى تَوْقِيْفِيَّةٌ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِاَنَّ مِثْلَ هٰذَا التَّرْكِيْبِ صَحِيْحٌ شَائِعٌ ذَائِعٌ عِنْدَ الْقَائِلِيْنَ بِاَنَّ اَسْمَاءَ اللّٰهِ تَعَالٰى تَوْقِيْفِيَّةٌ وَغَيْرِهِمْ سُمِعَ مِنَ الشَّارِعِ اَوْ لَمْ يُسْمَعْ ـ

অনুবাদ : এবং লাযেম হবে আল্লাহ তা'আলার বাণী– হে হামান! আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করো-এর মধ্যে **নির্মাণের নির্দেশ হামানের প্রতি না হওয়া**। কেননা, তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র নির্মাণ শ্রমিকগণ। কিন্তু এ ধরনের লাযেম বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা, আহ্বান হামানকেই করা হয়েছে এবং তার সাথেই কথোপকথন হয়েছে এবং লাযেম হবে اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ , شَفَى الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ এবং سَرَّتْنِىْ رُؤْيَتُكَ অর্থাৎ যার মধ্যে ফায়েলে হাকীকী আল্লাহ তা'আলা। এগুলোর বিশুদ্ধতা ধর্মবেত্তা থেকে শোনার উপর নির্ভরশীল। কেননা আল্লাহ তা'আলার নাম **শোনার উপর নির্ভরশীল**। এ ধরনের লাযেম বাতিল। কারণ, এ জাতীয় তারকীব সঠিক। সর্বজনবিদিত এবং বহুল ব্যবহৃত তাদের নিকট যারা বলে আল্লাহ্ তা'আলার নাম শোনার উপর নির্ভরশীল এবং যারা বলে না, চাই সেটা ধর্মপ্রবর্তকের পক্ষ থেকে শোনা যাক অথবা শোনা না যাক।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

৩য় উদাহরণ : يَا هَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا হে হামান! আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করো। মূল লেখক এই উদাহরণটির মাধ্যমে পূর্বের দু' উদাহরণ থেকে ভিন্নভাবে সাক্কাকীর মাযহাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আয়াতের মধ্যে ফেরাউন তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে প্রাসাদ নির্মাণের হুকুম করছে, আমাদের মতে এটি مَجَازِ عَقْلِى-এর উদাহরণ। কারণ হামানের প্রতি নির্দেশ মূলত হামানের প্রতি নির্দেশ নয়; বরং নির্মাণ শ্রমিকদের প্রতি নির্দেশ। হামান নির্দেশদাতা (সবব) হিসেবে তার প্রতি مجازا ইসনাদ করা হয়েছে।

আল্লামা সাক্কাকীর মতে, আয়াতে اِسْتِعَارَةْ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। অর্থাৎ হামান فَاعِل مَجَازِىْ-এর প্রতি নির্মাণ করার নির্দেশ উদ্দেশ্য নয়; বরং নির্মাণ শ্রমিকরা (فاعل حقيقى) নির্দেশ দ্বারা উদ্দেশ্য। এখন এই ব্যাখ্যা অর্থাৎ হামানকে নির্মাণের নির্দেশ না করা বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য। এ ব্যাখ্যা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হলো আয়াতে يَا هَامَانُ বলে আহ্বান করা হয়েছে হামানকে এবং কথোপকথন হয়েছে হামানের সাথেই। অতএব, এটা কি করে সম্ভব যে, আহ্বান করা হলো এবং কথা বলা হলো হামানের সাথে; অথচ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নির্মাণ শ্রমিকদের। মোটকথা, যদি এ বাক্যটিকে اِسْتِعَارَةْ بِالْكِنَايَةِ বলা হয় তাহলে কাজটি একটি অগ্রহণযোগ্য বিষয়কে মেনে নেওয়ার নামান্তর হলো। যেহেতু اِسْتِعَارَةْ بِالْكِنَايَةِ দ্বারাই সেই অগ্রহণযোগ্য কাজে লিপ্ত হতে হয়, তাই আমরা اِسْتِعَارَةْ بِالْكِنَايَةِ-কে বাতিল বলবো এবং উক্ত বাক্য যে কোনো বাতিল থেকে মুক্ত, এ কথা মেনে নেব।

৪র্থ উদাহরণ : মূল লেখক এখানে বেশ কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন, সেসবগুলোর হাকীকী ফায়েল হলেন আল্লাহ তা'আলা। এ উদাহরণগুলোকে اِسْتِعَارَةْ بِالْكِنَايَةِ বলা হলে উদাহরণগুলোর مَجَازِى فَاعِل-কে আল্লাহ তা'আলার নাম বলতে হয়। কারণ, ওগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ

شَفَى ، اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ تَوْفِيْقِى অর্থাৎ ধর্ম প্রবর্তক তথা রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে অবগতি সূত্রে প্রাপ্ত। উল্লেখ্য যে, سَرَّتْنِى رُؤْيَتُكَ ও الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ-এর মধ্যে যথাক্রমে رُؤْيَتْ ও طَبِيْب، رَبِيْع ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে; অথচ এগুলো আল্লাহ তা'আলার নাম হওয়ার কোনো দলিলই রাসূলের পক্ষ থেকে জানা নেই। এসব শব্দ আল্লাহ তা'আলার উপর প্রয়োগ অগ্রহণযোগ্য। যেহেতু اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ দ্বারা এ উদাহরণগুলো বাতিল হচ্ছে। অতএব, اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বাতিল। উদাহরণগুলো নিঃসন্দেহে সঠিক এবং ভাষা-সাহিত্যে প্রচলিত। এ উদাহরণগুলো অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা কেউ বলেন না। যারা বলেন, আল্লাহ তা'আলার নাম রাসূলের মাধ্যমে অবগত হতে হবে– তারা এবং যারা বলেন, রাসূলের মাধ্যমে জানা অত্যাবশ্যক নয় তারাও মোটকথা উল্লিখিত চার ধরনের উদাহরণের মাধ্যমে সাক্কাকীর মতানুসারে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ হওয়া সম্ভব নয়। যদি তার কথা মতো اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বলা হয় তাহলে বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যা দেখা দেয়, যার দ্বারা উদাহরণগুলো বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। যেহেতু উদাহরণগুলো সঠিক এবং এর গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, তাই এগুলোকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বলা যায় না।

সার-সংক্ষেপ : مَجَاز عَقْلِى-এর ব্যাপারে আল্লামা সাক্কাকী (র.)-এর মতটি সঠিক নয়। কেননা, তাঁর মতটি সঠিক বলা হলে পূর্বোক্ত উদাহরণগুলোতে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। যেমন– فِى عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ-এর মধ্যে ظَرْفِيَّةُ الشَّئِ لِنَفْسِهِ লাযেম আসে। তদ্রূপ نَهَارُهُ صَائِمٌ জাতীয় উদাহরণে اِضَافَةُ الشَّئِ اِلَى نَفْسِهِ লাযেম আসে। আর এ দু'টি বিষয় অসম্ভব। অতএব, যার কারণে এ দু'টি বিষয় লাযেম হয়েছে সে বিষয়টিই বাতিল বলে গণ্য হবে। লেখক বলেন, যদি সাক্কাকী (র.)-এর মত গ্রহণ করা হয়, তাহলে যেসব উদাহরণের হাকিকী ফায়েল আল্লাহ সেসব উদাহরণের মাজাযী ফায়েলগুলো আল্লাহর নাম হওয়া লাযেম হবে। অথচ এগুলো আল্লাহর নাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলিল নেই।

وَاللَّوَازِمُ كُلُّهَا مُنْتَفِيَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا فَيَنْتَفِى كَوْنُهُ مِنْ بَابِ الْاِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ لِاَنَّ اِنْتِفَاءَ اللَّازِمِ يُوْجِبُ اِنْتِفَاءَ الْمَلْزُوْمِ وَالْجَوابُ اَنَّ مَبْنٰى هٰذِهِ الْاِعْتِرَاضَاتِ عَلٰى اَنَّ مَذْهَبَهُ فِى الْاِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ اَنْ يُذْكَرَ الْمُشَبَّهُ وَيُرَادُ الْمُشَبَّهُ بِهِ حَقِيْقَةً وَلَيْسَ كَذٰلِكَ بَلْ يُرَادُ الْمُشَبَّهُ بِهِ اِدِّعَاءً اَوْ مُبَالَغَةً لِظُهُوْرِ اَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَنِيَّةِ فِىْ قَوْلِنَا مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ نَشَبَتْ بِفُلَانٍ هُوَ السَّبُعُ حَقِيْقَةً وَالسَّكَّاكِىُّ مُصَرِّحٌ بِذٰلِكَ فِىْ كِتَابِهٖ وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> সব লাযেমই বাতিল যেমনটি আমরা আলোচনা করলাম। সুতরাং এগুলো اِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ হওয়াও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, লাযেমের বাতিল হওয়া মালযূমের বাতিল হওয়াকে আবশ্যক করে। এর জবাব হলো, এসব আপত্তিগুলোর ভিত্তি একথার উপর যে, اِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ-এর মধ্যে তার মাযহাব হলো মুশাব্বাহকে উল্লেখ করে মুশাব্বাহ বিহীকে হাকীকীভাবে উদ্দেশ্য করার ক্ষেত্রে; কিন্তু বিষয়টি এরূপ নয় (যা বলা হলো); বরং এতে মুশাব্বাহ বিহীকে (হাকীকীভাবে উদ্দেশ্য করা হবে না) উদ্দেশ্য করা হবে দাবি স্বরূপ এবং মুবালাগার ভিত্তিতে। কেননা, এটা স্পষ্ট যে, আমাদের উক্তি مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ نَشَبَتْ بِفُلَانٍ-এর মধ্যে منية দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হিংস্র জন্তু উদ্দেশ্য নয়। সাক্কাকী তার কিতাব (মিফতাহুল উলূমে) এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলেছেন, মূল লেখক এ বিষয়টি জানেন না। তাই সাক্কাকী (র.)-এর মাহযাবের উপর নানাভাবে আপত্তি তুলেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاللَّوَازِمُ كُلُّهَا مُنْتَفِيَةٌ الخ : মূল লেখক বলেন, পূর্বের আলোচনায় مَجَاز عَقْلِى-এর উদাহরণগুলোতে সাক্কাকীর মাযহাব অনুসারে اِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ বললে যেসব বিষয় লাযেম আসে সবগুলোই বাতিল, অতএব اِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, নিয়ম হলো যদি লাযেম বাতিল হয়, তাহলে مَلْزُوْمও বাতিল হয়। ঐ সব আপত্তিগুলো হলো اِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ-এর লাযেম এবং তা হলো مَلْزُوْم। অতএব, সবগুলো লাযেম বাতিল হলে اِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِও বাতিল হবে। অতএব, এগুলো مَجَاز عَقْلِى-এর উদাহরণ সাব্যস্ত হলো।

وَالْجَوَابُ اَنَّ مَبْنٰى هٰذِهِ الخ : মুসান্নিফ (র.) সাক্কাকী (র.)-এর পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, সাক্কাকী (র.)-এর উপর উল্লিখিত আপত্তিগুলোর ভিত্তি হলো সাক্কাকী (র.)-এর اِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ-এর সংজ্ঞার উপর। কেননা, সংজ্ঞাটি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, ইবারতের মধ্যে فَاعِل مَجَازِىْ-কে উল্লেখ করা হবে এবং এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হাকীকী ফায়েল উদ্দেশ্য করা হবে। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়; বরং তার সংজ্ঞা হলো ইবারতের মধ্যে মুশাব্বাহ তথা فَاعِل مَجَازِى-কে উল্লেখ করা হবে এবং এর দ্বারা দাবি স্বরূপ অথবা مبالغة হিসেবে মুশাব্বাহ বিহী তথা فَاعِل حَقِيْقِى-কে উদ্দেশ্য করা হবে।

উল্লিখিত উদাহরণ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ نَشَبَتْ بِفُلَانٍ-এর মধ্যে مَنِيَّة বা মৃত্যু দ্বারা হাকীকীভাবে سَبُعٌ তথা হিংস্রপ্রাণী উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং দাবি স্বরূপ একথা বলা হচ্ছে যে, مَنِيَّة যেন হিংস্রপ্রাণীর গোত্রীয় কোনো কিছু। মুসান্নিফ বলেন, আল্লামা সাক্কাকী তার মতের কথা তার নিজ কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়; কিন্তু তালখীসুল মিফতাহ গ্রন্থের লেখক সাক্কাকী (র.)-এর লেখাটির সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাই তিনি সাক্কাকীর উপর বিভিন্ন ধরনের আপত্তি তুলেছেন।

মোটকথা, যদি فَاعِل مَجَازِىْ দ্বারা হাকীকীভাবে فَاعِل حَقِيْقِى উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে সেসব আপত্তিগুলো আর থাকে না। কেননা, সেসব আপত্তির মূল কারণ ছিল فَاعِل حَقِيْقِى-কে পৃথকভাবে উদ্দেশ্য করা।

সার-সংক্ষেপ :

লেখক বলেন, সাক্কাকী (র.) مَجَاز عَقْلِى-এর উদাহরণগুলো اِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ বলার কারণে যে সমস্যাগুলো লাযেম আসে সবগুলোই বাতিল। অতএব اِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ-এর দাবিও বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, লাযেম বাতিল হলে মালযূমও বাতিল হয় আল্লামা তাফতাযানী (র.) সাক্কাকীর পক্ষে জবাব দিতে গিয়ে বলেন, সাক্কাকী (র.)-এর উপর আপত্তিগুলো এসেছে তার প্রদত্ত اِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ-এর সংজ্ঞার ভুল ব্যাখ্যা করার কারণে। اِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, বাক্যের মধ্যে ফায়েলে মাজাযীকে উল্লেখ করা হবে এবং দাবিস্বরূপ বা مبالغة হিসেবে فَاعِل حَقِيْقِى-কে উদ্দেশ্য করা হবে। প্রকৃতপক্ষে فَاعِل حَقِيْقِى-কে উদ্দেশ্য করা হবে এমন নয়। উল্লেখ্য, এভাবে ব্যাখ্যা করা হলে কোনো আপত্তি বাকি থাকে না।

وَلِأَنَّهُ اَىْ مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ السَّكَّاكِىُّ يَنْتَقِضُ بِنَحْوِ نَهَارُهُ صَائِمٌ وَلَيْلُهُ قَائِمٌ وَمَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلٰى ذِكْرِ الْفَاعِلِ الْحَقِيْقِىْ لِاِشْتِمَالِهِ عَلٰى ذِكْرِ طَرَفَيِ التَّشْبِيْهِ وَهُوَ مَانِعٌ مِنْ حَمْلِ الْكَلَامِ عَلَى الْاِسْتِعَارَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ السَّكَّاكِىُّ وَالْجَوَابُ اَنَّهُ اِنَّمَا يَكُوْنُ مَانِعًا اِذَا كَانَ ذِكْرُهُمَا عَلٰى وَجْهٍ يُنْبِئُ عَنِ التَّشْبِيْهِ بِدَلِيْلِ اَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَهُ ع قَدْ زُرَّ اَزْرَارُهُ عَلَى الْقَمَرِ مِنْ بَابِ الْاِسْتِعَارَةِ مَعَ ذِكْرِ الطَّرَفَيْنِ وَبَعْضُهُمْ لَمَّا لَمْ يَقِفْ عَلٰى مُرَادِ السَّكَّاكِىْ بِالْاِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ اَجَابَ عَنْ هٰذِهِ الْاِعْتِرَاضَاتِ بِمَا هُوَ بَرِئٌ مِّنْهُ وَ رَأَيْنَا تَرْكَهُ اَوْلٰى ـ

অনুবাদ : **আর এ কারণে তা** অর্থাৎ সাক্কাকী (র.) যে মাযহাব গ্রহণ করেছেন– **তা বাতিল হয়ে যায়** لَيْلُهُ قَائِمٌ نَهَارُهُ صَائِمٌ **এবং এ জাতীয় উদাহরণ দ্বারা।** অর্থাৎ যার মধ্যে فَاعِل حَقِيْقِى রয়েছে। **কেননা, উদাহরণটি তাশবীহের উভয় দিককে শামিল করেছে।** আর এটি বাক্যকে استعارة বলতে বাধা প্রদান করে। যেমন– সাক্কাকী স্পষ্টভাবেই বলেছেন। এর জবাব হচ্ছে, এ ধরনের (মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহীর একই সাথে উল্লেখ) তখনই استعارة-এর জন্য প্রতিবন্ধক হয় যখন উভয়টা এমনভাবে উল্লেখ করা হয়, যা তাশবীহ বুঝায়। এর দলিল এই যে, তিনি কবির উক্তি قَدْ زُرَّ اَزْرَارُهُ عَلَى الْقَمَرِ (অর্থ– তাদের কাপড়ের বাঁধনটি চাঁদের উপরে বাঁধা)-কে মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহী উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও استعارة-এর মধ্যে গণ্য করেছেন। কতিপয় লোক যখন সাক্কাকী (র.)-এর اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা অনুধাবন করতে পারেনি, তখন তারা এসব আপত্তিসমূহের জবাব দিয়েছেন, যার সাথে সাক্কাকীর কোনো সম্পর্ক নেই। এসবের অনুল্লেখকে আমরা উত্তম মনে করেছি (তাই উল্লেখ করিনি)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَلِاَنَّهُ اَىْ مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الخ : এ ইবারতে মূল লেখক সাক্কাকী (র.)-এর মাযহাবের উপর আরেকটি প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নটি হলো, যেসব বাক্যের মধ্যে فَاعِل حَقِيْقِى এবং فَاعِل مَجَازِى উভয় উল্লেখ থাকে, তাকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বলা যায় না। যেমন– لَيْلُهُ قَائِمٌ، نَهَارُهُ صَائِمٌ এ বাক্যগুলোকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বলা না যাওয়ার কারণ হলো– একটি নিয়ম (যা আমরা الاستعارة-এর অধ্যায়ে বলে এসেছি) তা হলো যে বাক্যের মধ্যে تشبيه-এর মূল দু'অংশ তথা মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহী উভয়টি উল্লেখ থাকে সে বাক্যকে استعارة বলা যায় না। উল্লিখিত উদাহরণ نَهَارُهُ صَائِمٌ-এর মধ্যে نهار হলো মুশাব্বাহ তথা– فَاعِل مَجَازِى-এর مُضَاف اِلَيْه হলো মুশাব্বাহ বিহী বা فَاعِل حَقِيْقِى যা দ্বারা রোজাদারকে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, এ জাতীয় উদাহরণগুলোতে উভয়টি উল্লেখ করার কারণে এগুলোকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বলা যাবে না। তাহলে প্রশ্ন আসে যে, সাক্কাকী (র.) কিভাবে এগুলোকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বললেন এবং مَجَاز عَقْلِى হওয়াকে অস্বীকার করলেন?

সাক্কাকী (র.)-এর পক্ষ থেকে মুসান্নিফ জবাব দিচ্ছেন তিনি বলেন, 'তাশবীহ'-এর দু'দিক তথা মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহী উল্লেখ হলেই যে, اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ হতে পারবে না এমন নয়; বরং استعارة তখনই নিষিদ্ধ হবে যখন উভয়টিকে তাশবীহ হিসেবে আনা হবে। অর্থাৎ এমন ইবারত যার অর্থ তাশবীহ-এর সংকল্প করা ব্যতীত সহীহ হবে না। যেমন– মুশাব্বাহ বিহীটা মুশাব্বাহের খবর হলো। যেমন– زَيْدٌ اَسَدٌ (যায়েদ সিংহ) অথবা মুশাব্বাহ থেকে হাল হবে যেমন–

رَأَيْتُ زَيْدًا اَسَدًا এ উদাহরণগুলোতে প্রকৃত সিংহকে যায়েদ এবং ব্যক্তির প্রতি (তাশবীহ ছাড়া) সরাসরি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ এবং সিংহের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। তদ্রূপ যায়েদ এবং সিংহের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। তাই اسد-কে رجل বা زيد-এর বেলায় প্রয়োগ সম্ভব নয়। এ কারণে এখানে اداة تشبيه উহ্য মেনে বাক্যটিকে তাশবীহের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। তখন ইবারত এরূপ হবে زَيْدٌ كَالْاَسَدِ এখানে লক্ষণীয় এই যে, উদাহরণগুলোতে মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহী উভয়টাকে তাশবীহ-এর ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাশবীহের অর্থ নেওয়া ছাড়া বাক্যগুলোর কোনো বিশুদ্ধ অর্থ থাকে না। অতএব, এগুলোকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বলা যাবে না।

কিন্তু যদি মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহীকে একটি বাক্যে উল্লেখ করা হয়, যাদের অর্থের মাঝে তাশবীহ-এর বিষয়টি না থাকে তাহলে তাকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ উভয়টি উল্লেখ করার পরও বাক্যটি اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন, কবি বলেন– لَاتَعْجَبُوْا مِنْ بِلٰى غِلَالَتِهٖ * قَدْ زُرَّ اَزْرَارُهٗ عَلَى الْقَمَرِ অর্থাৎ তোমরা তার কাপড় পুরান হওয়াতে আশ্চর্য হয়ো না। (কারণ) তার কাপড়ের বাঁধন তো চাঁদের উপর। কবি তার দ্বিতীয় লাইনে মুশাব্বাহ বিহী (القمر) এবং মুশাব্বাহ ازراره-এর "ه" সর্বনাম (যা কবির প্রিয়জনের প্রতি ফিরেছে) উভয়টি উল্লেখ আছে এতদ্সত্তেও আল্লামা সাক্কাকী, তাকে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বলেছেন। কারণ, এ কবিতায় উভয়টির উল্লেখ তাশবীহ হিসেবে হয়নি।

এমনিভাবে لَيْلُهٗ قَائِمٌ - نَهَارُهٗ صَائِمٌ ইত্যাদি উদাহরণ-এর মধ্যে মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহী উভয়টি উল্লেখ আছে কিন্তু তা তাশবীহের ভিত্তিতে না হওয়ার কারণে এগুলোকে استعارة হিসেবে ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই।

মুসান্নিফ বলেন, অনেকে সাক্কাকী (র.)-এর اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ দ্বারা কি বুঝাতে চান তা বুঝতে সক্ষম হননি, তাই তারা বিভিন্নভাবে উক্ত আপত্তিগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের জবাবগুলোও এমন, যার সাথে সাক্কাকীর মতের দূরতম সম্পর্ক নেই এবং তিনি সেসব জবাবকে পছন্দ করতেন না। তাই সেসব জবাবকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে বাদ দিয়েছি।

সার-সংক্ষেপ :

আল্লামা সাক্কাকী (র.)-এর উপর মূল লেখক আরেকটি উদাহরণের মাধ্যমে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, نَهَارُهٗ صَائِمٌ জাতীয় উদাহরণে فَاعِل حَقِيْقِى ও فَاعِل مَجَازِى উভয়টিই উল্লেখ আছে। যদি সাক্কাকীর মতানুযায়ী একে اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বলা হয়, তাহলে তাতে তাশবীহ-এর উভয় রুকন তথা مشبه ও مُشَبَّه بِهٖ উল্লিখিত হয়েছে বলতে হবে। আর যে বাক্যে مشبه ও مُشَبَّه بِهٖ উভয়টি থাকে সে বাক্যকে استعارة-এর বাক্য বলা যায় না।

এর উত্তরে আল্লামা তাফতাযানী (র.) বলেন, কোনো বাক্যে مشبه ও مُشَبَّه بِهٖ উল্লেখ হলেই উদ্দেশ্য করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না; বরং এমন তা اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ বাক্য তখনই اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ-এর জন্য প্রতিবন্ধক হয় যখন সেই বাক্যের তাশবীহ-এর রোকনদ্বয়ের উল্লেখ তাশবীহের অর্থ প্রদান করে। যেমন– زَيْدٌ اَسَدٌ

এরপর মুসান্নিফ এমন একটি কবিতা দ্বারা তার বক্তব্যকে প্রমাণিত করেন, যাতে مشبه ও مُشَبَّه به উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও اِسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। কবিতাটি হচ্ছে– لَا تَعْجَبُوْا مِنْ بِلٰى غِلَالَتِهٖ * قَدْ زُرَّ اَزْرَارُهٗ عَلَى الْقَمَرِ

اَحْوَالُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ اَىِ الْاُمُوْرُ الْعَارِضَةُ لَهٗ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ وَقَدَّمَ الْمُسْنَدَ اِلَيْهِ عَلَى الْمُسْنَدِ لِمَا سَيَأْتِىْ اَمَّا حَذْفُهٗ قَدَّمَهٗ عَلٰى سَائِرِ الْاَحْوَالِ لِكَوْنِهٖ عِبَارَةً عَنْ عَدَمِ الْاِتْيَانِ بِهٖ وَعَدَمُ الْحَادِثِ سَابِقٌ عَلٰى وُجُوْدِهٖ وَ ذَكَرَهٗ هٰهُنَا بِلَفْظِ الْحَذْفِ وَفِى الْمُسْنَدِ بِلَفْظِ التَّرْكِ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ الْمُسْنَدَ اِلَيْهِ هُوَ الرُّكْنُ الْاَعْظَمُ شَدِيْدُ الْحَاجَةِ اِلَيْهِ حَتّٰى اَنَّهٗ اِذَا لَمْ يُذْكَرْ فَكَاَنَّهٗ اُتِىَ بِهٖ ثُمَّ حُذِفَ بِخِلَافِ الْمُسْنَدِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بِهٰذِهِ الْمَثَابَةِ فَكَاَنَّهٗ تُرِكَ عَنْ اَصْلِهٖ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **মুসনাদ ইলাইহ** (উদ্দেশ্য) **-এর বিভিন্ন অবস্থা** অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ হিসেবে তার উপর যে সকল বিষয়ে আসে। তিনি মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের আগে এনেছেন। যে কারণে তার আলোচনা অচিরেই আসবে। (আর মুসনাদ ইলাইহের একটি অবস্থা হলো) **মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা**। এটিকে তিনি অন্য সকল অবস্থার (আলোচনার) আগে এনেছেন। কেননা, (حذف) -এর অর্থ আনয়ন না করা।

আর ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের অনস্তিত্ব তার অস্তিত্বের আগে (হয়)। তিনি এখানে حذف বা উহ্য শব্দটি ব্যবহার করলেন অথচ মুসনাদের মধ্যে ترك বা বাদ দেওয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন একথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য যে, মুসনাদ ইলাইহ হলো প্রধান স্তম্ভ যার প্রয়োজন খুব বেশি। এমনকি যখন তা উল্লেখ করা হয় না তখন যেন তাকে এনে পরে উহ্য করা হয়েছে। কিন্তু মুসনাদ তার ব্যতিক্রম। কেননা, তার মর্যাদা এরূপ নয়, যেন তা মূল থেকেই বাদ দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ اَحْوَالُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ الخ : ইসনাদের বিভিন্ন অবস্থার আলোচনার পর মূল লেখক বাক্যের প্রধান অংশ মুসনাদ ইলাইহের অবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। اَحْوَالُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন, مُسْنَدَ اِلَيْهِ (মুসনাদ ইলাইহ) হওয়া হিসেবে তার মধ্যে যে সকল অবস্থা হয়- সেগুলো উদ্দেশ্য। مُسْنَدَ اِلَيْهِ উৎপত্তিগতভাবে কি হয়েছে অর্থাৎ হাকীকত নাকি মাজায সেসব অবস্থা এখানে আলোচনা হবে না। এমনিভাবে শব্দ হিসেবে মুসনাদ ইলাইহ جزئى হলো নাকি كلى সেসব অবস্থাও এখানে আলোচিত হবে না। এমনিভাবে মুসনাদ ইলাইহ সত্তাগতভাবে কি হলো অর্থাৎ جوهر না عرض সেসব অবস্থাও এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। এরূপভাবে আসল অক্ষরের দিক থেকে মুসনাদ ইলাইহ তিন অক্ষর বিশিষ্ট নাকি তিনের অধিক ইত্যাদি কোনো কিছুই এখানে আলোচনা করা হবে না।

কেননা, উল্লিখিত অবস্থাগুলো মুসনাদ ইলাইহের মুসনাদ ইলাইহ হওয়া হিসেবে অবস্থা নয়। অতএব, এসবের আলোচনা এখানে করা হবে না। মুসনাদ ইলাইহ হিসেবে যেসব অবস্থা আসে, যথা- মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ করাও উহ্য রাখা, নির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা, অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা, মুসনাদ ইলাইহের সংজ্ঞা আনা ইত্যাদি নিয়েই اَحْوَالُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ-এর মধ্যে আলোচনা করা হবে।

قَوْلُهٗ وَقَدَّمَ الْمُسْنَدَ اِلَيْهِ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের আগে কেন আনলেন তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের আগে আনার কারণ অচিরেই আলোচনার মধ্যে আসবে। যা সামনে আসছে তা হলো বাক্যের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ প্রধান অংশ। তার কারণ হলো, মুসনাদ ইলাইহ দ্বারা যে কোনো সত্তাকে বুঝানো হয়। আর মুসনাদ হলো সে সত্তার একটি গুণ বা বিশেষ অবস্থা। অতএব, এ কথা বলা যায় যে, প্রধান অংশ অপ্রধান অংশের আগে আসা বাঞ্ছনীয় বা সত্তার আলোচনা তার গুণাবলির আলোচনার আগে আসে। সে কারণেই মুসনাদ ইলাইহের আলোচনা আগে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَمَّا حَذْفُهُ : মূল লেখক মুসনাদ ইলাইহের احوال-এর আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি সর্বাগ্রে যে حال টি বয়ান করলেন তা হলো– حَذْفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ না করা। এখানে প্রসঙ্গক্রমে জানা দরকার যে, মূল লেখক রীতি অনুসারে اما-এর পরে যে কথাটি উল্লেখ করে থাকেন তা হলো مُقْتَضٰى حَالْ আর এরপর لَامِ تَعْلِيْل (কারণ দর্শানো লাম)-এর পরে যা উল্লেখ করেন তা হলো حال। সুতরাং সামনের ইবারত فَلِلْاِحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ এবং এরপর যা আসছে তা হবে احوال যা مسند اليه-এর حذف-কে চায়। এ মতে حذف এবং এরপর যা আসছে তা হলো مُقْتَضٰى حَالْ অতএব اَحْوَالُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ-এর উহ্য ইবারত হলো مُقْتَضِيَاتُ اَحْوَالِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের احوال-এর মুকতাযাগুলোর বর্ণনা। এর মধ্যে প্রথম হলো– মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা। তবে এ উহ্য মুসনাদ ইলাইহের উপর قرينة (লক্ষণ) অবশ্যই থাকবে।

قَوْلُهُ قَدَّمَهُ عَلٰى سَائِرِ الْاَحْوَالِ : ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মুসনাদ ইলাইহের এ অবস্থাটিকে অন্যান্য অবস্থার আগে আনার কারণ দর্শাচ্ছেন। তিনি বলেন, যে কোনো আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত জিনিসের মধ্যে عدم আগে, তারপর وجود। সে ভিত্তিতে তিনি حذف-কে আগে এনেছেন। কেননা, حذف-এর অর্থ হলো عَدَمُ الْوُجُوْدِ যেহেতু عَدَمُ الْوُجُوْدِ (حذف) আগে আসে তাই মূল লেখক حذف-কে ذِكْرُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ (وُجُوْد حَادِث)-এর আগে এনেছেন।

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, মুসান্নিফ (র.) উপরের প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছেন এতে বুঝা গেল حذف-কে ذكر-এর আগে কেন আনা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য احوال যথা নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট, تابع ব্যবহার করা ইত্যাদির উপর حذف-কে কেন আগে আনা হলো, তাতো তিনি বর্ণনা করেননি। এর জবাব হলো, মুসনাদ ইলাইহের অন্যান্য অবস্থাসমূহের প্রায় সবগুলোই ذِكْر مُسْنَد اِلَيْه-এর অনুগামী, সুতরাং কোনো বস্তু যদি অন্য বস্তুর অনুগামী হয়ে যায় তাহলে অনুগামীকে সেই বস্তুর অধীন করা হয়। আসল বস্তুর যে হুকুম অনুগামীরও সেই হুকুম সাব্যস্ত হয়। অতএব, ذِكْر مُسْنَد اِلَيْه-এর উপর حذف কে প্রাধান্য দেওয়ার সাথে সাথে অন্যগুলোর উপর প্রাধান্য দেওয়া হলো।

قَوْلُهُ وَ ذَكَرَهُ هٰهُنَا بِلَفْظِ الخ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। আপত্তিটি হলো, মূল লেখক মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখার বিষয়টি حذف শব্দ দ্বারা, আর (মুসনাদের আলোচনায়) মুসনাদকে উহ্য রাখার কথাটি ترك শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

প্রশ্ন হলো তিনি দু'স্থানে দু'ধরনের শব্দ ব্যবহার করার পেছনে কি কোনো বিশেষ কারণ রয়েছে? নাকি তা এমনিই করেছেন?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ না করাকে حذف শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা যায় যে, মুসনাদ ইলাইহ হলো বাক্যের মূল এবং প্রধান অংশ। আর বক্তা এটির প্রতি খুব বেশি মুখাপেক্ষী। তাই যেখানে এটিকে উল্লেখ করা হয়নি, সেখানে যেন এমন হয়েছে যে, তা আনা হয়েছিল বটে, তবে حذف করা হয়েছে। (কেননা, حذف অর্থ– উল্লেখ করার পর সেটিকে বাদ দেওয়া) পক্ষান্তরে মুসনাদের অবস্থা সেরূপ নয়, অর্থাৎ সেটি বাক্যের প্রধান অংশ নয় এবং এর প্রতি বক্তা (মুসনাদ ইলাইহের মতো) বেশি মুখাপেক্ষী নয়। তাই তার উল্লেখ না করা যেন ترك বা বাদ দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ প্রথম থেকেই যেন তাকে উল্লেখ করা হয়নি।

সারকথা হলো, মুসনাদ ইলাইহের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহের অবস্থাসমূহের মধ্য থেকে লেখক প্রথমে حَذْفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ-কে উল্লেখ করেছেন। মুসান্নিফ বলেন, عدم ও وجود-এর মধ্যে عدم আগে, তারপর وجود। আর حذف অর্থ হচ্ছে عَدَمُ الذِّكْرِ এ জন্য প্রথমে حذف-এর আলোচনা করা হয়েছে, তারপর ذكر ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অবস্থার আলোচনা করা হয়েছে।

فَلِلْاِحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ لِدَلَالَةِ الْقَرِيْنَةِ عَلَيْهِ وَاِنْ كَانَ فِى الْحَقِيْقَةِ رُكْنًا مِنَ الْكَلَامِ اَوْ تَخْيِيْلِ الْعُدُوْلِ اِلَى اَقْوَى الدَّلِيْلَيْنِ مِنَ الْعَقْلِ وَاللَّفْظِ فَاِنَّ الْاِعْتِمَادَ عِنْدَ الذِّكْرِ عَلَى دَلَالَةِ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَعِنْدَ الْحَذْفِ عَلَى دَلَالَةِ الْعَقْلِ وَهُوَ اَقْوٰى لِافْتِقَارِ اللَّفْظِ اِلَيْهِ وَاِنَّمَا قَالَ تَخْيِيْلَ لِاَنَّ الدَّالَّ حَقِيْقَةً عِنْدَ الْحَذْفِ اَيْضًا هُوَ اللَّفْظُ الْمَدْلُوْلُ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ كَقَوْلِهِ ع قَالَ لِىْ كَيْفَ اَنْتَ قُلْتُ عَلِيْلٌ لَمْ يَقُلْ اَنَا عَلِيْلٌ لِلْاِحْتِرَازِ وَالتَّخْيِيْلِ الْمَذْكُوْرَيْنِ اَوْ اِخْتِبَارِ تَنَبُّهِ السَّامِعِ عِنْدَ الْقَرِيْنَةِ هَلْ يَتَنَبَّهُ اَمْ لَا اَوْ اِخْتِبَارِ مِقْدَارِ تَنَبُّهِهِ هَلْ يَتَنَبَّهُ بِالْقَرَائِنِ الْخَفِيَّةِ اَمْ لَا اَوْ اِيْهَامِ صَوْنِهِ اَىِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ عَنْ لِسَانِكَ تَعْظِيْمًا لَهُ اَوْ عَكْسِهِ اَىْ اِيْهَامِ صَوْنِ لِسَانِكَ عَنْهُ تَحْقِيْرًا لَهُ ـ

<u>অনুবাদ :</u> (মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়) **অনর্থক কথা থেকে বাঁচার জন্য যাহিরী অবস্থার উপর ভিত্তি করে।** কেননা, তখন قرينه-এর (মুসনাদ ইলাইহের অবস্থানের) প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। যদিও প্রকৃতপক্ষে এটি বাক্যের মূল অংশ (অথবা মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়) **জ্ঞান এবং শব্দ এ দু'দলিলের মধ্য থেকে শক্তিশালী দলিলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করার খেয়াল করার উদ্দেশ্যে।** কেননা, মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করার অবস্থায় প্রকাশ্যে শব্দের উপরই নির্ভরতা থাকে, আর উহ্য রাখার সময় নির্ভরতা থাকে জ্ঞান বা বুদ্ধির উপর। আর এটি (জ্ঞান) হচ্ছে বেশি শক্তিশালী। কেননা, শব্দ এর প্রতি মুখাপেক্ষী। আর তিনি বলেছেন, (প্রত্যাবর্তনের) খেয়াল করা। কেননা, উহ্য রাখার সময়ও (মুসনাদ ইলাইহের উপর) ইঙ্গিত প্রদানকারী শব্দই হয়ে থাকে। যার উপর দলিলের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন (উভয় অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখার উদাহরণ) **কবি বলেন,** قَالَ لِىْ كَيْفَ اَنْتَ قُلْتُ عَلِيْلٌ তিনি বলেননি اَنَا عَلِيْلٌ উল্লিখিত উদাহরণটি অনর্থক কথা থেকে বাঁচার জন্য এবং প্রত্যাবর্তনের খেয়ালের জন্য। **অথবা, করীনা থাকা অবস্থায় শ্রোতার সতর্কতা যাচাইয়ের জন্য** অর্থাৎ সে কি সতর্ক হলো, নাকি উদাসীন। **অথবা, তার সতর্কতার পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য** অর্থাৎ সে কি অস্পষ্ট লক্ষণের মাধ্যমে সতর্ক হলো কি, না হয়নি। **অথবা,** মুসনাদ ইলাইহের প্রতি **সম্মান প্রদানপূর্বক তাকে** (তোমার) **মুখ থেকে বাঁচানোর খেয়াল করে, অথবা এর উল্টো।** অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের প্রতি তাচ্ছিল্যের কারণে তোমার মুখকে বাঁচানোর খেয়ালে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ فَلِلْاِحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ الخ : ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা একটি مقتضى حال আর উপরের ইবারতের মধ্যে লেখক সেই মুকতাযায়ে হালের حالটি বর্ণনা করেছেন। মূল লেখক বলেন, মূলত দু'টি কারণে মুসনাদ ইলাইহকে حذف করা হয়। (এক) মুসনাদ ইলাইহ حذف হওয়ার কোনো লক্ষণ বা করীনা আছে যা উহ্য মুস্নাদ ইলাইহের প্রতি ইঙ্গিত করে বিধায় মুসনাদ ইলাইহকে حذف করা। (দুই) মুসনাদ ইলাইহের ذكر এবং حذف-এর মধ্যে حذف-এর দলিলটি শক্তিশালী হওয়া।

এ দু'টি কারণের প্রথম কারণটি ব্যাকরণের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মূল লেখক বলেন, দু'টি কারণে মুসনাদ ইলাইহকে حذف করা হয়। ১. অনর্থক কথা থেকে বাঁচার জন্য অর্থাৎ মুসনাদ

ইলাইহের ذكر যদি অনর্থক কথার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে ذكر-এর স্থলে حذف করা হয়। আর এটা তখনই করা হয় যখন শ্রোতার সামনে মুসনাদ ইলাইহের কোনো এমন লক্ষণ থাকে, যার দ্বারা শ্রোতা মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্কে অবগত হয়ে পড়ে। তাই শ্রোতা ও বক্তার অবগতির পর মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা অনর্থক কাজের মধ্যে পড়বে। তাই সে অনর্থক কথা থেকে বাঁচার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়।

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ فِى الْحَقِيْقَةِ : এ বাক্যটি দ্বারা মূল লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, মুসনাদ ইলাইহ হলো বাক্যের প্রধান রোকন। এ রোকনের উপর যদিও কোনো লক্ষণ বা দলিল থাকে তবু তাকে উল্লেখ করা সমীচীন। অথচ এখানে মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লেখকে অপ্রয়োজনীয় বা অনর্থক বলছেন? এর জবাব হলো, কোনো বাক্যাংশ রোকন হওয়া এবং সেটি বাক্যের জন্য অপ্রয়োজনীয় হওয়াতে কোনো বিরোধ নেই। অর্থাৎ একটি রোকন অনর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় হতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে, যদি একজন শ্রোতার জানা থাকে এবং বক্তাও জানে যে, শ্রোতা এ বাক্যটি সম্পর্কে অবহিত এমতাবস্থায় পুরো বাক্যটি উল্লেখ করাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। বাক্যাংশ তো অপ্রয়োজনীয় হবেই। সুতরাং বুঝা গেল যে, শ্রোতার বাক্য কিংবা বাক্যাংশ জানা থাকলে সেটার উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় বা অনর্থক হয়। শ্রোতার বাক্য কিংবা বাক্যাংশ সম্পর্কে জানা না থাকলে এর উল্লেখ কখনোই অপ্রয়োজনীয় বা অনর্থক হয় না।

তাহলে বুঝা গেল, মুসনাদ ইলাইহের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় কিংবা প্রয়োজনীয় হওয়ার সম্পর্ক শ্রোতার বাক্য কিংবা বাক্যাংশের জানার সাথে, মুসনাদ ইলাইহের রোকন হওয়া বা না হওয়ার সাথে নয়। তা ছাড়া আমরা সাধারণভাবে বুঝে থাকি, যে কথা বা শব্দ বলার প্রয়োজন নেই সেটি অনর্থক। এখানে সে কথাটি অনর্থক হওয়ার কারণ শুধুমাত্র অপ্রয়োজন, অন্য কিছু নয়।

قَوْلُهٗ اَوْ تَخْيِيْلِ الْعُدُوْلِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) حذف করার প্রাধান্য দানকারী দ্বিতীয় দলিলটির কথা আলোচনা করেছেন। আর তা হলো, বক্তা কখনো حذف করার মাধ্যমে শ্রোতাদের মনে এ ধারণা জন্মাতে চেষ্টা করে যে, বক্তা দু' দলিলের মধ্য থেকে শক্তিশালী দলিলের প্রতি অভিমুখী হয়েছেন।

দু'টি দলিল হলো عقل এবং لفظ, বিষয়টির ব্যাখ্যা এরূপ যে, মুসনাদ ইলাইহের উপর দালালতকারী দলিল হলো لفظ বা শব্দ এবং عقل বা জ্ঞান, এর মধ্যে জ্ঞান হলো শক্তিশালী। কারণ, জ্ঞান তার দলিল হওয়ার ক্ষেত্রে শব্দের মুখাপেক্ষী নয়। পক্ষান্তরে শব্দ দলিল হওয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানের মুখাপেক্ষী।

অতএব, মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ না করা হলে যেহেতু জ্ঞানের উপর নির্ভরশীলতা থাকে তাই শক্তিশালী দলিলের খেয়াল করে মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয় না।

قَوْلُهٗ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ : এ বাক্য দ্বারা একটি আপত্তির উত্তর দিয়েছেন। আপত্তি হলো, শুধুমাত্র শব্দের দ্বারা কিভাবে মুসনাদ ইলাইহকে বুঝানো যায়? কেননা, শব্দের সাথে জ্ঞানেরও প্রয়োজন রয়েছে। জ্ঞানের দ্বারা এটা জানবে যে, এ শব্দটি দ্বারা ঐ অর্থ বুঝানো হয়েছে। অতএব, মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ করার সময় শুধুমাত্র শব্দের উপর ভরসা করা যথেষ্ট হবে না। অথচ এখানে বলা হলো শব্দের উপর নির্ভর করবে। এটা কিভাবে বলা হলো?

এর জবাব প্রকৃতপক্ষে যদিও শব্দের সাথে জ্ঞানের সমন্বয় দালালত করবে; কিন্তু বাহ্যত তা শব্দের উপরই নির্ভর করবে।

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا قَالَ تَخْيِيْلَ : এ বাক্যটি দ্বারাও একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, মূল লেখক لِلْعُدُوْلِ اِلٰى اَقْوَى الدَّلِيْلَيْنِ না বলে। تَخْيِيْلُ الْعُدُوْلِ اِلٰى কেন বললেন? এর জবাব হলো, এখানে এক দলিল থেকে আরেক দলিলে যাওয়ার খেয়াল করা হয়েছে, এক দলিল বাদ দিয়ে আরেক দলিলে যাওয়া হয়নি। কারণ, এক দলিল সম্পূর্ণ ত্যাগ করে আরেক দলিল গ্রহণ করা তখনই সম্ভব হয় যখন প্রত্যেকটি দলিল স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। এখানে عقل এবং لفظ কোনোটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ দলিল নয়; বরং عقل এবং لفظ প্রত্যেকটি একটি অপরটির সাহায্য ছাড়া দলিল হতে পারে না। কেননা, আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, যখন বাক্যের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ থাকে তখন সেই মুসনাদ ইলাইহের উপর দালালতকারী যেমন শব্দ তেমনি মুসনাদ ইলাইহ উহ্য থাকা অবস্থায় তার উপর দালালতকারীও শব্দ (যা উহ্য আছে) যার প্রতি করীনা বা লক্ষণ দালালত করে। উভয় অবস্থায় (মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ্য/অনুল্লেখ্য) عقل বা জ্ঞানের সাহায্য ছাড়া উল্লিখিত দালালত সম্ভব

নয়। তাই আমরা দেখছি যে, শব্দ এবং জ্ঞান কোনোটাই পূর্ণাঙ্গ দলিল নয়; বরং একটির দলিল হওয়ার জন্য অপরটির সহযোগিতা যেমন দরকার, তেমনি উভয় অবস্থায় উভয় দলিলের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ্যভাবে প্রয়োজন। মোটকথা, উভয় অবস্থায় জ্ঞান এবং শব্দ উভয়ের সমন্বয়ে একটি মাত্র দলিল হচ্ছে, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দলিল নয়। তাই একটি ছেড়ে অপরটির দিকে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এখানে এক দলিল থেকে অপর দলিলের দিকে যাওয়ার খেয়ালের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বক্তা মুসনাদ ইলাইহ উহ্য থাকার সময় খেয়াল করবে যে, শব্দ থেকে عقل-এর দিকে যাচ্ছে। তদ্রূপ মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ থাকলে যেন সে আকল ছেড়ে শব্দের দিকে গেল। অতএব, মুসান্নিফ (র.)-এর تخييل বলা যথার্থ হয়েছে।

মূল লেখক উপরোক্ত যে দু'টি কারণে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা উত্তম মনে করেন। এর উদাহরণ দিচ্ছেন। কবিতার চরণ- قَالَ لِيْ كَيْفَ اَنْتَ قُلْتُ عَلِيْلٌ * سَهَرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيْلٌ

অর্থাৎ সে আমাকে বলল, তুমি কেমন আছো? আমি বললাম- অসুস্থ লাগাতার অনিদ্রা এবং দীর্ঘ দুঃখ (আমাকে অসুস্থ করেছে) এ কবিতায় অনর্থক কথা থেকে বাঁচার জন্য এবং শক্তিশালী দলিলের প্রতি গমনের খেয়ালে মুসনাদ ইলাইহ انا-কে উহ্য রাখা হয়েছে। কেননা, মূলবাক্য ছিল انا عليل এখানে মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখার ক্ষেত্রে দলিল হয়েছে পূর্বের বাক্য كيف انت-এর انت শ্রোতাকে বক্তা যখন জিজ্ঞাসা করল, তুমি কেমন আছো? এর জবাবে শ্রোতা নিজের সম্পর্কেই বলবে অসুস্থ বা সুস্থ।

মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয় শ্রোতার সচেতনতা যাচাই করার জন্য যখন উহ্য মুসনাদ ইলাইহের জন্য কোনো প্রমাণ থাকে অর্থাৎ শ্রোতা উহ্য মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্কে অবগত হতে পারল কি পারল না। যেমন- نُوْرُهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُوْرِ الشَّمْسِ অর্থাৎ এর আলো সূর্যের আলো থেকে অর্জিত। এ বাক্যের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ القمر উহ্য আছে। পুরো বাক্যটি এরূপ ছিল اَلْقَمَرُ نُوْرُهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُوْرِ الشَّمْسِ যেহেতু চাঁদের আলো সূর্যের আলো থেকেই অর্জিত হয়, তাই চাঁদ (মুসনাদ ইলাইহ) উহ্য রাখার দ্বারা শ্রোতা মুসনাদ ইলাইহকে বুঝতে পারছে কিনা তার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে এ বাক্য দ্বারা।

এরপর মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখা হয় শ্রোতা কি পরিমাণ সচেতন রয়েছে তা যাচাইয়ের জন্য অর্থাৎ শ্রোতা করীনা গোপন হলে মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্কে অবগত হতে পারে কিনা, মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রেখে তা যাচাই করা হচ্ছে। যেমন- هُوَ وَاسِطَةُ عَقْدِ الْكَوَاكِبِ "এটি তারকারাজির হারের লকেট", এখানে মুসনাদ ইলাইহ القمر উহ্য আছে। মূল ইবারতটি হবে- اَلْقَمَرُ هُوَ وَاسِطَةُ عَقْدِ الْكَوَاكِبِ উল্লেখ্য واسطة বলা হয় হারের লকেটকে, হারের মধ্যস্থিত মনিকে।

প্রকাশ থাকে যে, রাতের আকাশে যখন আমরা তারকারাজির দিকে তাকাই তখন চাঁদের চারপাশে হাজারো নক্ষত্র চমকাতে দেখা যায়। উক্ত নক্ষত্রসমূহের মধ্যে চাঁদ সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল। তাই একে واسطة বলা হয়েছে। এখানে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হলে সাধারণ শ্রোতাগণ মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্কে অবগত হতে পারে না বটে; কিন্তু খুব সচেতন ব্যক্তিরা ঠিকই বুঝতে পারে যে, এখানে মুসনাদ ইলাইহ (القمر) উহ্য আছে। এ প্রকার উহ্য মুসনাদ ইলাইহের প্রতি শ্রোতার মনোনিবেশ আগের উদাহরণ অপেক্ষা বিলম্বে ঘটে। কারণ, আগের মুসনাদ ইলাইহের দলিল এটির তুলনায় বেশি স্পষ্ট।

এ প্রসঙ্গে কিতাবের পার্শ্ব টীকায় একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। ঘটনাটি জনৈক আব্বাসীয় খলিফা ও তার একজন সফর সঙ্গীর। তারা দু'জন নৌবিহারে বের হলেন, খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন- কোন্ খাবার তোমার প্রিয়? সে বলল, আধা সিদ্ধ ডিম। কাকতালীয়ভাবে পরবর্তী বছর তাদের দু'জনের একই স্থান দিয়ে নৌযানে করে কোথাও যাওয়া হলো। পূর্বের স্থানে পৌঁছতেই খলিফা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি দিয়ে (অর্থাৎ কি দিয়ে তোমার সিদ্ধ ডিম খেতে ভালো লাগে) সঙ্গী বলল, লবণ দিয়ে। খলিফা তার মেধা, স্মৃতিশক্তি এবং পূর্ণ সচেতনতার প্রশংসা করলেন।

মূল লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহকে কখনো বাক্য থেকে উহ্য রাখা হয় মুসনাদ ইলাইহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। যেমন- مُقَرِّرٌ لِلشَّرَائِعِ مُوْضِحٌ لِلدَّلَائِلِ فَيَجِبُ اِتِّبَاعُهُ অর্থাৎ শরিয়তের প্রতিষ্ঠাতা এবং দলিলসমূহের সুস্পষ্ট বিবরণদানকারী, তাই তার অনুসরণ অত্যাবশ্যকীয়। এ বাক্যে مُقَرِّرٌ لِلشَّرَائِعِ এবং مُوْضِحٌ لِلدَّلَائِلِ হলো মুসনাদ, এর

মুসনাদ ইলাইহ হলো রাসূল ﷺ, যা বক্তা তার কথায় উহ্য রেখেছে রাসূলের নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। অর্থাৎ এ স্থানে তার (নাপাক) মুখকে রাসূল ﷺ-এর মতো সুমহান ব্যক্তির নাম উচ্চারণের জন্য অযোগ্য মনে করছে।

মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে বাক্য থেকে উহ্য রাখা হয় তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনপূর্বক। অর্থাৎ বক্তা মুসনাদ ইলাইহকে এতটা তুচ্ছ মনে করে যে, তার নাম মুখে নেওয়ার অযোগ্য। যেমন– কেউ বলল مُوَسْوِسٌ سَاعٍ فِى الْفَسَادِ فَتَجِبُ مُخَالَفَتُهُ। (কুমন্ত্রণা দানকারী, অরাজকতা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সুতরাং তার বিরোধিতা করা ওয়াজিব) এ বাক্যের মুসনাদ ইলাইহ হলো شيطان যা বাক্যের শুরুতে উহ্য আছে। এখানে বক্তা মুসনাদ ইলাইহকে উচ্চারণ করেনি মুসনাদ ইলাইহের প্রতি তাচ্ছিল্যের কারণে, অর্থাৎ শয়তানের নাম নেওয়া থেকে নিজেকে হেফাজত করার জন্য শয়তানের নাম নেয়নি।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহকে সাধারণভাবে দু'কারণে উহ্য রাখা হয়। ক. মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখার কোনো করীনা বাক্যে থাকা। খ. মুসনাদ ইলাইহের ذكر ও حذف-এর মধ্যে حذف-এর দলিল শক্তিশালী হওয়া। এ দু'টির ২য় কারণ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। ২য় কারণের অধীন কয়েকটি বিষয় নিয়ে লেখক এখানে আলোচনা করেছেন।

ক. মুসনাদ ইলাইহের উল্লেখকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা থেকে বাঁচার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে حذف করা হয়।

খ. عقل ও لفظ-এর মধ্যে শক্তিশালী দলিল হলো عقل। সুতরাং শক্তিশালী দলিল গ্রহণ করত শাব্দিকভাবে মুসনাদ ইলাইহ حذف করা হয়।

গ. করীনা থাকা অবস্থায় শ্রোতার সচেতনতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে মুসনাদ ইলাইহকে حذف করা।

ঘ. শ্রোতার সচেতনতার পরিমাণ পরীক্ষার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা।

ঙ. অতি উচ্চ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে মুসনাদ ইলাইহকে মুখে না আনা।

চ. অতি তুচ্ছ মনে করে মুসনাদ ইলাইহকে মুখে না আনা বা حذف করা।

اَوْ تَأْتِى الْاِنْكَارِ اَىْ تَيَسُّرِهٖ لَدَى الْحَاجَةِ نَحْوُ فَاجِرٌ فَاسِقٌ عِنْدَ قِيَامِ الْقَرِيْنَةِ عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَ زَيْدٌ لِيَتَاتّٰى لَكَ اَنْ تَقُوْلَ مَا اَرَدْتُ زَيْدًا بَلْ غَيْرَهٗ اَوْ تَعَيُّنِهٖ وَالظَّاهِرُ اَنَّ ذِكْرَ الْاِحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ يُغْنِىْ عَنْ ذٰلِكَ لٰكِنْ ذَكَرَهٗ لِاَمْرَيْنِ اَحَدُهُمَا الْاِحْتِرَازُ عَنْ سُوْءِ الْاَدَبِ فِيْمَا ذَكَرُوْا لَهٗ مِنَ الْمِثَالِ وَهُوَ خَالِقٌ لِمَا يَشَاءُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ اَيِ اللّٰهُ تَعَالٰى الثَّانِىْ اَلتَّوْطِيَةُ وَالتَّمْهِيْدُ لِقَوْلِهٖ اَوْ اِدِّعَائِهِ التَّعَيُّنَ نَحْوُ وَهَّابُ الْاُلُوْفِ اَيِ السُّلْطَانُ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ كَضَيِّقِ الْمَقَامِ عَنْ اِطَالَةِ الْكَلَامِ بِسَبَبِ ضَجْرٍ اَوْ سَامَةٍ اَوْ فَوَاتِ فُرْصَةٍ اَوْ مُحَافَظَةٍ عَلٰى وَزْنٍ اَوْ سَجْعٍ اَوْ قَافِيَةٍ اَوْ مَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ كَقَوْلِ الصَّيَّادِ غَزَالٌ اَىْ هٰذَا غَزَالٌ وَكَالْاِخْفَاءِ عَنْ غَيْرِ السَّامِعِ مِنَ الْحَاضِرِيْنَ مِثْلُ جَاءَ وَكَاتِّبَاعِ الْاِسْتِعْمَالِ الْوَارِدِ عَلٰى تَرْكِهٖ مِثْلُ رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ اَوْ تَرْكِ نَظَائِرِهٖ مِثْلُ الرَّفْعِ عَلَى الْمَدْحِ اَوِ الذَّمِّ اَوِ التَّرَحُّمِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **অথবা প্রয়োজনের সময় অস্বীকারের সুযোগ নেওয়ার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়।** যেমন– কেউ বলল فَاجِرٌ وَفَاسِقٌ (পাপী ও অপরাধী) যখন করীনা থাকে এ ব্যাপারে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো (উদাহরণ স্বরূপ) যায়েদ। যাতে তোমার এ কথা বলার সুযোগ থাকে যে, আমি যায়েদকে উদ্দেশ্য করিনি; বরং অন্যকে উদ্দেশ্য করেছি। **অথবা** (মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়) **সুনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে।** সাধারণভাবে বুঝা যায় অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা এর আলোচনার (সুনির্দিষ্ট হওয়া) উল্লেখকে অপ্রয়োজনীয় করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও এটিকে তিনি দু'টি কারণে উল্লেখ করেছেন। (এক) বেআদবি থেকে বিরত থাকা, এর যে উদাহরণ তারা পেশ করেছেন তথা هُوَ خَالِقٌ لِمَا يَشَاءُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ (তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা চান সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছা তাই করেন)। (দুই) তার বাক্য **"অথবা সুনির্দিষ্ট হওয়ার দাবির কারণে"** এর ভূমিকা হয়েছে যেমন– সহস্র জনের দাতা অর্থাৎ বাদশাহ। **অথবা এ জাতীয় অন্য কোনো কারণে।** যেমন– পরিস্থিতি দীর্ঘ কথা বলার অনুকূল নয়, বিষণ্ণতা এবং বিরক্তির কারণে। অথবা সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার কারণে অথবা ছন্দ বা অন্তর্মিল রক্ষার ইত্যাদির জন্য। যেমন– শিকারি বলল হরিণ। অর্থাৎ এই হরিণ এবং যেমন– শ্রোতা ছাড়া উপস্থিত অন্য ব্যক্তিদের থেকে মুসনাদ ইলাইহ গোপন রাখা (এর জন্য তাকে উহ্য রাখা হয়) যথা– সে আসল এবং যেমন মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখার ব্যবহার অনুসরণ করার জন্য (তাকে উহ্য রাখা হয়) যথা– رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ (এতে هذه মুবতাদা উহ্য রূপে উদাহরণটি প্রচলিত) অথবা মুসনাদ ইলাইহের অনুরূপ ইসম উহ্য হওয়ার ব্যবহারের অনুসরণ করত মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়। যেমন– প্রশংসা, নিন্দা, অথবা দয়া ইত্যাদির ভিত্তিতে মারফূ' পড়া।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ اَوْ تَأْتِى الْاِنْكَارِ الخ : মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখার আরেকটি বিষয় হলো প্রয়োজনের সময় অস্বীকারের সুযোগ নেওয়ার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা। যেমন– কোনো ব্যক্তি বলল فَاجِرٌ فَاسِقٌ (মুসনাদ ইলাইহ زَيْدٌ-কে উহ্য রেখে) যখন এ ব্যাপারে প্রমাণ থাকবে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যায়েদ। এরপর যায়েদ যদি লোকটিকে বলে– তুমি আমাকে فَاسِقٌ ও فَاجِرٌ কেন বলেছ? এর উত্তরে সে বলবে, জনাব! আমি তো আপনাকে বলিনি; বরং আমি আরেক ব্যক্তিকে এ কথা বলেছি। অথবা সে বলতে পারবে যে, আমি তো আপনার নাম উল্লেখ করিনি।

লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহকে কখনো উহ্য রাখা হয় মুসনাদ ইলাইহ সুনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে। যেমন– هُوَ خَالِقٌ لِمَا يَشَاءُ، فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ এ বাক্যের মুসনাদ ইলাইহ হলো الله। যাঁকে সুনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে উহ্য রাখা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইতঃপূর্বে আলোচিত মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখার একটি কারণ ছিল 'অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা'।

আমরা জানি, যদি কোনো শব্দ জানা থাকে অথবা সুনির্দিষ্ট হয় তাহলে তার উল্লেখ অনর্থক হয়, সে মতে এখানে মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখার যে কারণটি বলা হলো অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট হওয়া এবং পূর্বের অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা তো দু'টি একই হলো। তাই সেটা আলোচনা করার পর এখানে এটি নতুন করে আলোচনা না করলেও চলত; কিন্তু কেন এটিকে আলাদা করে বর্ণনা করা হলো?

এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. বালাগাতবিশারদগণ এই প্রকারের যে উদাহরণ পেশ করেছেন তাকে অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাহলে তা বেআদবির মধ্যে গণ্য হবে। কারণ, তখন বলতে হবে– এ উদাহরণের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ (আল্লাহ)-কে অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে উহ্য রাখা হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ শব্দটি উল্লেখ করা অনর্থক, এটা বেআদবি।

২. অথবা এ প্রকার তথা মুসনাদ ইলাইহ সুনির্দিষ্ট হওয়া সামনের প্রকার اِدِّعَاءُ تَعْيِيْن-এর ভূমিকা।

মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখার আরেকটি প্রকার হলো, মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয় তা সুনির্দিষ্ট হওয়ার দাবি করার জন্য। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট নয়; কিন্তু বক্তা তার বক্তব্যে মুসনাদ ইলাইহকে সুনির্দিষ্ট দাবি করে, সে মতে বাক্য পেশ করে। যেমন– কেউ বলল وَهَّابُ الْأُلُوْفِ হাজারজনকে যে দান করে। এখানে বক্তা তার বক্তব্যের মুসনাদ ইলাইহ السلطان বা বাদশাহকে উহ্য রেখেছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, এ কাজ একমাত্র বাদশাহের পক্ষেই করা সম্ভব, অন্য কারো পক্ষে নয়। মোটকথা, হাজারজনকে দান করা ধনী প্রজাদের দ্বারাও সম্ভব। কিন্তু এটাকে শুধুমাত্র বাদশাহের জন্য সুনির্দিষ্ট করা (কথাটি যিনি বলেছেন) শুধুমাত্র তার দাবি।

মুসান্নিফ বলেন, আরো বিভিন্ন কারণে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়। যেমন– দুঃখ-ভারাক্রান্ত বা ক্লান্ত-শ্রান্ত হলে কথা দীর্ঘ না করার জন্য কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য করে বাক্য বলা হয়।

এমনিভাবে দীর্ঘ কথা বললে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে এ কারণে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়, যেমন– শিকারি বলে– غزال অথচ তার পুরো বাক্যে হলো هذا غزال আবার কখনো মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখা হয়– বাক্যের শেষে অনুপ্রাস রক্ষা করার জন্য কিংবা আবার দু' বাক্যের সাথে ছন্দমিল রক্ষার জন্য। আবার কখনো বক্তা নির্দিষ্ট শ্রোতা ছাড়া উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখার জন্য তাকে উহ্য রাখে। যেমন সে বলল, جاء (এর ফায়েল উদাহরণস্বরূপ খালেদকে উহ্য করে।)

আবার কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয় ঐ প্রবাদকে অনুসরণ করার জন্য যাতে মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রয়েছে। যেমন– رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ-এর মূলবাক্য হলো هٰذِهِ رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ এ প্রবাদ বাক্যটি বলা হয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যার দ্বারা অভাবিত কোনো কাজ হয়ে যায়। যেমন– বাংলায় বলা হয় "ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে"।

কথিত আছে, এ প্রবাদটি জনৈক হাকাম ইবনে আবাদ ইয়াগুস প্রথমে বলেছিলেন, ঘটনাটি ছিল এরূপ যে, হাকাম মান্নত করল সে কয়েকটি বন্যগরু শিকার করে তা গাবগাব পাহাড়ে জবাই করবে। সে নিপুণ তীরন্দাজ হওয়া সত্ত্বেও তার তীর শিকার করতে ব্যর্থ হলো। তার এ ব্যর্থতা তাকে আত্মহত্যা করার পথে ধাবিত করল। এ অবস্থা দেখে তার সাথে থাকা তার ছেলে মুতআম পিতার হাত থেকে ধনুক নিয়ে যেই তীর মারল সাথে সাথেই তীর সফলতা পেল, শিকার হাতে আসল, তা দেখে পিতা হাকাম বলে উঠল رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ যেহেতু প্রবাদ প্রবচনে পরিবর্তন হয় না, তাই এ প্রবাদ মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রূপে প্রচলিত হয়ে গেল।

মুসান্নিফ বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে এমন প্রচলিত ব্যবহারের অনুসরণ করে উহ্য রাখা হয় যে, ব্যবহারে মুসনাদ ইলাইহের উহ্য করা তার নজির (অনুরূপ ইসম)-এর ক্ষেত্রে হয়েছে।

প্রশংসা-নিন্দা অথবা মমতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেই শব্দটি এ হিসেবে মারফূ' বিশিষ্ট পড়া যে, এটি মুসনাদ বা খবর। আর এর মুসনাদ ইলাইহ উহ্য আছে। যেমন– প্রশংসার ক্ষেত্রে বলা হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَهْلُ الْحَمْدِ এখানে اَهْلُ الْحَمْدِ-কে مدح-এর কারণে মারফূ' পড়া হলো, মূলবাক্য হবে এরূপ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ هُوَ اَهْلُ الْحَمْدِ মুসনাদ ইলাইহ هُوَ-কে উহ্য রাখা হয়েছে।

নিন্দার ক্ষেত্রে বলা হয়– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمُ এ বাক্যের رَجِيْم শব্দটিকে মারফূ' সহকারে পড়া হয়েছে নিন্দা বা ذم-এর কারণে। মূলবাক্যটি হলো اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ هُوَ الرَّجِيْمُ এ বাক্য থেকে اَلرَّجِيْمُ-এর আগের هُوَ মুবতাদা উহ্য রাখা হয়েছে।

অথবা অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয় এবং মুসনাদকে মারফূ' পড়া হয়। যেমন– اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ عَبْدَكَ اَلْمِسْكِيْنُ এ বাক্যের اَلْمِسْكِيْنُ শব্দটিকে অনুগ্রহবশত মারফূ' পড়া হয়েছে এবং মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়েছে। পুরো বাক্যটি এরূপ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ عَبْدَكَ هُوَ الْمِسْكِيْنُ

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত তিনটি মুসনাদ ইলাইহকে সেই ব্যবহারের অনুসরণ করত উহ্য রাখা হয়েছে, যে ব্যবহার উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহের অনুরূপ মুসনাদ ইলাইহের ক্ষেত্রে হয়েছে। যেমন– আরবরা اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ عَبْدَكَ الْفَقِيْرُ-এর মধ্যে اَلْفَقِيْرُ-কে পেশ সহকারে পড়ে এবং এর পূর্বের মুসনাদ ইলাহিকে উহ্য করে।

এমনিভাবে তারা مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْخَبِيْثُ-এর মধ্যে اَلْخَبِيْثُ-কে পেশ সহকারে এবং এর পূর্বের মুসনাদ ইলাইহ هُوَ-কে উহ্য রাখে। এমনিভাবে তারা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْكَرِيْمُ-এর মধ্যে اَلْكَرِيْمُ-কে পেশ দিয়ে পড়ে এবং এর পূর্বের মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখে।

এ উদাহরণগুলোর অনুসরণ করত আমাদের উপরে উদাহরণগুলোর মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়েছে।

মোটকথা, মুসনাদ ইলাইহকে ঐ ব্যবহারের অনুসরণ করত উহ্য রাখা হয় যে, ব্যবহার মুসনাদ ইলাইহের নজিরের মাঝে অর্থাৎ উহ্য রাখার ক্ষেত্রে হয়েছে। যার বর্ণনা এতক্ষণ দেওয়া হলো।

সার-সংক্ষেপ :

ক. মুসনাদ ইলাইহকে কখনো উহ্য রাখা হয় প্রয়োজনে অস্বীকারের সুযোগ নেওয়ার জন্য। যেমন– فَاسِقٌ فَاجِرٌ

খ. কখনো মুসনাদ ইলাইহ সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে উহ্য রাখা হয়। যেমন– خَالِقٌ لِمَنْ يَّشَاءُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ

গ. কখনো মুসনাদ ইলাইহ সুনির্দিষ্ট হওয়ার দাবি করত তা উহ্য রাখা হয়। যেমন– وَهَّابُ الْاُلُوْفِ

গ. সময়ের সঙ্কীর্ণতার কারণে বা বিরক্তির কারণে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে কিংবা কবিতার ছন্দমিল বা বাক্যের অনুপ্রাস রক্ষায় মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখা হয়।

وَاَمَّا ذِكْرُهٗ اَىْ ذِكْرُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فَلِكَوْنِهٖ اَىِ الذِّكْرِ الْاَصْلَ وَلَا مُقْتَضٰى لِلْعُدُوْلِ عَنْهُ اَوِ الْاِحْتِيَاطِ لِضُعْفِ التَّعْوِيْلِ اَىِ الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْقَرِيْنَةِ اَوِ التَّنْبِيْهِ عَلٰى غَبَاوَةِ السَّامِعِ اَوْ زِيَادَةِ الْاِيْضَاحِ وَالتَّقْرِيْرِ وَعَلَيْهِ قَوْلُهٗ تَعَالٰى اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ اَوْ اِظْهَارِ تَعْظِيْمِهٖ لِكَوْنِ اِسْمِهٖ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّعْظِيْمِ نَحْوُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ حَاضِرٌ اَوْ اِهَانَتِهٖ نَحْوُ السَّارِقُ اللَّئِيْمُ حَاضِرٌ اَوِ التَّبَرُّكِ بِذِكْرِهٖ مِثْلُ النَّبِىُّ ﷺ قَائِلُ هٰذَا الْقَوْلِ اَوْ اِسْتِلْذَاذِهٖ مِثْلُ اَلْحَبِيْبُ حَاضِرٌ اَوْ بَسْطِ الْكَلَامِ حَيْثُ الْاِصْغَاءُ مَطْلُوْبٌ اَىْ فِىْ مَقَامٍ يَكُوْنُ اِصْغَاءُ السَّامِعِ مَطْلُوْبًا لِلْمُتَكَلِّمِ لِعَظْمَتِهٖ وَشَرْفِهٖ وَلِهٰذَا يُطَالُ الْكَلَامُ مَعَ الْاَحِبَّاءِ نَحْوُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى حِكَايَةً عَنْ مُوْسٰى عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ هِىَ عَصَاىَ اَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَقَدْ يَكُوْنُ الذِّكْرُ لِلتَّهْوِيْلِ اَوِ التَّعَجُّبِ اَوِ الْاِشْهَادِ فِىْ قَضِيَّةٍ اَوِ التَّسْجِيْلِ عَلَى السَّامِعِ حَتّٰى لَايَكُوْنَ لَهٗ سَبِيْلٌ اِلَى الْاِنْكَارِ ـ

অনুবাদ : (মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থা হলো) **একে উল্লেখ করা** অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা। **কেননা, উল্লেখ করাই হলো আসল** এবং এ থেকে অন্য অবস্থাতে যাওয়ার কোনো মুকতাযাও নেই। **অথবা** (উহ্য রাখার) **প্রমাণের উপর নির্ভরতা দুর্বল হওয়ার কারণে। অথবা শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য।** (বিষয়টিকে) **অতিরিক্ত স্পষ্ট ও মজবুত করার জন্য।** আল্লাহ তা'আলার বাণী– اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (আয়াত اُولٰٓئِكَ-কে অতিরিক্ত স্পষ্ট করার জন্য আনা হয়েছে) **অথবা তার সম্মান প্রকাশের জন্য,** কেননা, মুসনাদ ইলাইহ এমন ইসম যা সম্মান প্রদর্শন করে। যেমন– اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ حَاضِرٌ (মু'মিনগণের নেতা উপস্থিত)। এখানে اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ এমন ইসম যা তার ব্যক্তির সম্মান প্রদর্শন করছে। **অথবা তার তুচ্ছতা প্রকাশের জন্য,** যেমন– اَلسَّارِقُ اللَّئِيْمُ حَاضِرٌ (নিকৃষ্ট চোর উপস্থিত) অথবা তার নাম উল্লেখ করত বরকত লাভ করা। যেমন– اَلنَّبِىُّ ﷺ قَائِلُ هٰذَا الْقَوْلِ (মহানবী ﷺ এই উক্তিটির প্রবক্তা)। **অথবা মুসনাদ ইলাইহ দ্বারা সুখ লাভ করার জন্য।** যেমন– اَلْحَبِيْبُ حَاضِرٌ (বন্ধু উপস্থিত)। **অথবা বাক্যকে দীর্ঘায়িত করা যেখানে প্রিয়জনকে কথা শোনানো উদ্দেশ্য** অর্থাৎ এমন স্থানে যেখানে শ্রোতাকে তার সম্মান ও মর্যাদার কারণে কথা শোনানো বক্তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর এ কারণে প্রিয়জনদের সাথে কথা দীর্ঘায়িত করা হয়। **যেমন–** আল্লাহ তা'আলার বাণী যা তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন (হযরত মূসা (আ.) বললেন) **এটি আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই,** এর দ্বারা আমার মেষপালের জন্য গাছ থেকে পাতা ঝরাই এবং এর দ্বারা আমার অনেক প্রয়োজন পূরণ হয়। কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয় ভয় দেখানোর জন্য অথবা বিস্ময় প্রকাশের জন্য কিংবা কোনো বিষয়ের সাক্ষাৎ দেওয়ার জন্য নতুবা শ্রোতার কাছে বিষয়টি পাকাপোক্ত করার জন্য যাতে তার কোনো ধরনের অস্বীকারের সুযোগ না থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاَمَّا ذِكْرُهُ اَىْ ذِكْرُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ الخ : মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থা হলো মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা। মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করার এমন অনেকগুলো কারণ রয়েছে যার কারণে উল্লেখের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। যেসব বিষয় উল্লেখ করার কারণ বলে গণ্য তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করাটাই নিয়ম। অর্থাৎ উল্লেখ করাই হলো স্বাভাবিক এবং নীতির দাবি। পক্ষান্তরে উহ্য রাখা হলো অস্বাভাবিকতা। অতএব, যখন তাকে উল্লেখ না করার মতো কোনো প্রমাণ না থাকে তখন উল্লেখ করাই স্বাভাবিক ব্যবহার বলে গণ্য হয়।

এরপর মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করার ২য় কারণ মুসান্নিফ (র.) আলোচনা করেন- ২য় কারণ হলো উহ্য রাখার প্রমাণ দুর্বল হওয়ার কারণে সাবধানতার জন্য তাকে উল্লেখ করা হয়। প্রমাণ দুর্বল হয় দু' কারণে- ১. প্রমাণ এমনিতে অপ্রকাশিত থাকে, ২. প্রমাণের মধ্যে দোদুল্যমানতা অথবা মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয় শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি উপস্থিত লোকদের ইঙ্গিত করার জন্য। অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ এমন যে, শ্রোতা তাকে উহ্য অবস্থায় প্রমাণের সাহায্যে বুঝতে পারে একথা জানার পরও শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করে।

অথবা, মুতাকাল্লিম মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করে তার বর্ণিত বিষয়কে শ্রোতার মনে বেশি শক্তিশালী করা এবং সুস্পষ্ট করার জন্য। زِيَادَةً শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, মুসনাদ ইলাইহ উহ্য থাকা অবস্থায় করীনা দ্বারা মুসনাদ ইলাইহ স্পষ্ট হয় বটে, তবে আরো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করার জন্য উল্লেখ করা হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ এ বাক্যের দ্বিতীয় أُولَٰئِكَ যা هُمُ الْمُفْلِحُونَ-এর মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয়েছে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট এবং শক্তিশালী করার জন্য। এটিকে উহ্য রাখলেও প্রথম أُولَٰئِكَ-এর ভিত্তিতে একে বুঝা যেত তবু অতিরিক্ত স্পষ্টকরণের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয় তার মর্যাদা প্রকাশের জন্য, আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন মুসনাদ ইলাইহকে এমন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হবে, যা তার মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যেমন কেউ বলল, اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ حَاضِرٌ, উল্লিখিত মুবতাদার (اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ) সাহায্যে মুসনাদ ইলাইহের মর্যাদা প্রকাশ করা হচ্ছে। বাক্যের এ মুসনাদ ইলাইহের উপর প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সম্মান প্রদর্শনের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এ বাক্যটি هَلْ حَضَرَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ-এর উত্তরে এসেছে। এখানে শুধুমাত্র حَاضِرٌ (মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রেখে) কিংবা نَعَمْ বলে দিলেই হতো।

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয় তার নাম উল্লেখ করত বরকত নেওয়ার জন্য। যেমন- هَلْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْقَوْلَ-এর উত্তরে আপনি বললেন النَّبِيُّ ﷺ قَائِلُ هٰذَا الْقَوْلِ। অথচ এখানে শুধুমাত্র نَعَمْ বলে দিলেই যথেষ্ট হতো।

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয় সুখ ও আনন্দ লাভ করার জন্য। যেমন- কেউ প্রশ্ন করল هَلْ حَضَرَ حَبِيْبُكَ-এর উত্তরে তুমি বললে اَلْحَبِيْبُ حَاضِرٌ। এখানে اَلْحَبِيْبُ। শব্দটিতে বিশেষ ধরনের স্বাদ ও প্রশান্তি রয়েছে যা লাভ করার জন্য মুতাকাল্লিম মুসনাদ ইলাইহকে হাবীব বলে স্মরণ করেছে। অথচ প্রশ্নের করীনা দ্বারা نَعَمْ কিংবা حَاضِرٌ বললেই যথেষ্ট হতো।

মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করার আরেক স্থান হলো মুতাকাল্লিম তার কাঙ্ক্ষিত শ্রোতার সাথে দীর্ঘ কথাবার্তা বলার উদ্দেশ্যে তা উল্লেখ করে। এ কারণেই লোকেরা তাদের বন্ধু ও প্রিয়জনদের সাথে দীর্ঘ সময় কথা বলে। যেমন- মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسٰى অর্থাৎ হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি? এর উত্তরে হযরত মূসা (আ.) যদি বলতেন عَصَايَ (আমার লাঠি) তাহলেই উত্তর হয়ে যেত। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) তাঁর প্রিয় রবের সাথে কথা বলার সুযোগটিকে গনিমত মনে করলেন এবং লম্বা কথা বলা শুরু করলেন। তিনি লম্বা কথা বলার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করত বলেন- هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى

মুসান্নিফ (র.) বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয় ভয় তার দেখানোর জন্য। যেমন- اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَاْمُرُكَ بِهٰذَا এখানে মুসনাদ ইলাইহ অর্থাৎ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ এর ভয় দেখানোর জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

কখনো বিস্ময় প্রকাশের জন্য মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয়। যেমন- صَبِيٌّ قَاوَمَ الْأَسَدَ অর্থাৎ একটি শিশু সিংহের সাথে লড়েছে। এখানে মুসনাদ ইলাইহ صَبِيٌّ-কে বিস্ময় প্রকাশের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয় সাক্ষী রাখার জন্য, যাতে পরবর্তীতে অস্বীকারের কোনো সুযোগ না থাকে। যেমন- ইমরান প্রশ্ন করল আদনানকে (যে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল) সে কি এ বস্তুটি এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে?

এর জবাবে আদনান বলল, খালেদ এত টাকার বিনিময় অমুকের কাছে বিক্রয় করেছে। এখানে মুসনাদ ইলাইহ খালেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে খালেদ বা অন্য কেউ তাতে অস্বীকার করতে না পারে।

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয় শ্রোতার মনে বিষয়টিকে গেঁথে দেওয়ার জন্য, যাতে সে শ্রোতা অস্বীকার করার সুযোগ না পায়। যেমন- বিচারক প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল هَلْ أَقَرَّ زَيْدٌ بِكَذَا-এর উত্তরে প্রত্যক্ষদর্শী বলল أَقَرَّ زَيْدٌ عَلَيْهِ بِكَذَا। এখানে মুসনাদ ইলাইহ زَيْدٌ-কে উল্লেখ করা হয়েছে শ্রোতার মনে মুসনাদ ইলাইহকে গেঁথে দেওয়ার জন্য।

সার-সংক্ষেপ :

উল্লিখিত ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে বাক্যে উল্লেখ করার কতিপয় কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ক. মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ করাই যেহেতু সাধারণ নিয়ম তাই মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয়;

খ. মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখার করীনা দুর্বল হওয়ার কারণে উল্লেখ করা হয়।

গ. শ্রোতাকে সতর্ক করা অতিরিক্ত স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ করা হয়।

ঘ. সম্মান প্রদর্শনের জন্য বা তুচ্ছতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয়।

ঙ. বরকত হাসিলের জন্য কিংবা সুখ লাভ করার জন্যও মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ করা হয়।

وَاَمَّا تَعْرِيْفُهُ اَىْ اِيْرَادُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ مَعْرِفَةً وَاِنَّمَا قَدَّمَ هٰهُنَا التَّعْرِيْفَ وَفِى الْمُسْنَدِ التَّنْكِيْرُ لِاَنَّ الْاَصْلَ فِى الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ التَّعْرِيْفُ وَفِى الْمُسْنَدِ التَّنْكِيْرُ فَبِالْاِضْمَارِ لِاَنَّ الْمَقَامَ لِلْمُتَكَلِّمِ نَحْوُ اَنَا ضَرَبْتُ اَوِ الْخِطَابِ نَحْوُ اَنْتَ ضَرَبْتَ اَوِ الْغَيْبَةِ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهٖ اِمَّا لَفْظًا تَحْقِيْقًا اَوْ تَقْدِيْرًا وَ اِمَّا مَعْنًى بِدَلَالَةِ لَفْظٍ عَلَيْهِ اَوْ قَرِيْنَةِ حَالٍ وَاِمَّا حُكْمًا وَاَصْلُ الْخِطَابِ اَنْ يَّكُوْنَ لِمُعَيَّنٍ وَاحِدًا كَانَ اَوْ كَثِيْرًا لِاَنَّ اَصْلَ وَضْعِ الْمَعَارِفِ عَلٰى اَنْ تُسْتَعْمَلَ لِمُعَيَّنٍ مَعَ اَنَّ الْخِطَابَ هُوَ تَوْجِيْهُ الْكَلَامِ اِلٰى حَاضِرٍ ـ

অনুবাদ : **মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টরূপে আনয়ন করা** (একটি অবস্থা)। এখানে তিনি معرفة এর আলোচনা আগে এনেছেন; অথচ মুসনাদের মধ্যে (نكره) অনির্দিষ্টকরণকে আগে এনেছেন। এর কারণ হলো মুসনাদ ইলাইহের আসল হলো নির্দিষ্ট হওয়া, আর মুসনাদের অনির্দিষ্ট হওয়া। (مسند اليه নির্দিষ্ট করা হয়) **সর্বনামের দ্বারা, কেননা** (কথাবার্তার মধ্যে) **স্থানটি হবে উত্তম পুরুষের,** যেমন– اَنَا ضَرَبْتُ (আমি প্রহার করলাম) **অথবা মধ্যম পুরুষের,** যেমন– اَنْتَ ضَرَبْتَ (তুমি প্রহার করলে) **অথবা নাম পুরুষের-এর** আলোচনা অতীত হওয়ার কারণে শাব্দিকভাবে, বাস্তবে অথবা উহ্যভাবে। অথবা অর্থগত শব্দ এর উপর ইঙ্গিত করার বা পরিস্থিতির প্রমাণের কারণে অথবা হুকুমের দিক থেকে। **আর মধ্যম পুরুষ মূলত নির্দিষ্ট জনের জন্যই হয়,** সেটা এক হোক অথবা অনেক। কেননা, মারেফাসমূহের উৎপত্তিই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য। সেই সাথে মধ্যম পুরুষতো উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি বাক্য ব্যবহার করাকেই বলা হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَاَمَّا تَعْرِيْفُهُ الخ : এখান থেকে মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থার আলোচনা শুরু হয়েছে। তা হচ্ছে– মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা। নির্দিষ্ট বিশেষ্য সাত প্রকার : ১. ضَمِيْر (সর্বনাম), ২. عَلَمْ (নামবাচক বিশেষ্য), ৩. ইসমে মাওসূল, ৪. ইসমে ইশারা ৫. আলিফ লাম দ্বারা নির্দিষ্টকরণ, ৬. اِضَافَةٌ (সম্বন্ধের সাহায্যে নির্দিষ্টকরণ) ও ৭. نِدَاءٌ আহ্বানের মাধ্যমে নির্দিষ্টকরণ। প্রথমে মূল লেখক সর্বনাম দ্বারা নির্দিষ্টজ্ঞাপক বিশেষ্যের আলোচনা শুরু করেছেন।

قَوْلُهٗ اِنَّمَا قَدَّمَ هٰهُنَا الخ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের অবসান ঘটাচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে নির্দিষ্টকরণের আলোচনা প্রথমে আনা হলো কেন? অথচ আমরা দেখি মুসনাদের মধ্যে অনির্দিষ্টকরণের আলোচনা প্রথমে আনা হয়েছে।

এর উত্তরে তিনি বলেন, মুসনাদের ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হওয়া নিয়মাবদ্ধ ও রীতিগত, পক্ষান্তরে মুসনাদ ইলাইহের জন্য নির্দিষ্ট হওয়াই নিয়ম ও বিধি সম্মত। তাই মূল নিয়মের অনুসরণ করত মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে নির্দিষ্টকরণ নিয়ে প্রথমে আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ فَبِالْاِضْمَارِ لِاَنَّ الخ : মুসানাদ ইলাইহের নির্দিষ্টকরণের একটি পন্থা হলো সর্বনাম ব্যবহার করা। অর্থাৎ সর্বনামকে মুসনাদ ইলাইহ বানিয়ে দেওয়া। সর্বনামকে মুসনাদ ইলাইহ বানানোর কারণ হচ্ছে– বাক্যের অবস্থা তিনটি, হয়তো উত্তম পুরুষের হবে কিংবা মধ্যম পুরুষের হবে অথবা নাম পুরুষের হবে। উদাহরণ স্বরূপ খালিদ আমরকে বলল– مَنْ اَكْرَمَ زَيْدًا (যায়েদকে কে সম্মান করেছে?) এখন যদি আমর স্বয়ং তাকে সম্মান করে থাকে, তাহলে সে (উত্তম পুরুষ) বলবে, আমি সম্মান করেছি। আর যদি অবস্থা এমন যে, প্রশ্নকারী নিজেই সম্মান করে থাকে, তাহলে আমর বলবে তুমি (মধ্যম পুরুষ) সম্মান করেছ। আর যদি অনুপস্থিত কোনো (নাম পুরুষ) ব্যক্তি সম্মান করে থাকে এবং সে ব্যক্তির নাম পূর্বে আলোচিত হয়ে থাকে, তাহলে আমর বলবে সে (নাম পুরুষ) সম্মান করেছে।

قَوْلُهُ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ اِمَّا لَفْظًا تَحْقِيْقًا : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) নাম পুরুষের আলোচনা বিস্তারিতভাবে শুরু করেছেন। তিনি বলেন, যদি বাক্যের ব্যবহার নাম পুরুষের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে একে অনুপস্থিত সর্বনামের দ্বারা নির্দিষ্ট করে বলা হবে। তার কারণ হচ্ছে, এর আলোচনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

উক্ত সর্বনামের বিশেষ্য পূর্বের আলোচনাতে যাওয়ার তিনটি পন্থা হতে পারে– ১. শাব্দিকভাবে (لَفْظِيْ) গেছে, ২. অর্থগতভাবে (مَعْنَوِيْ) গেছে. ৩. বিধিগত ভাবে (حُكْمِيْ) গেছে।

শাব্দিকভাবে যাওয়ার অবস্থা দু'ধরনের– ১. لَفْظِيْ تَحْقِيْقِيْ ২. لَفْظِيْ تَقْدِيْرِيْ

১ম প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে– زَيْدٌ يَضْرِبُ এ বাক্যের يَضْرِبُ-এর মধ্যে যে সর্বনাম রয়েছে এর বিশেষ্য (زَيْدٌ) শাব্দিকভাবে এবং বাস্তবিকপক্ষেই এর আগে উল্লেখ আছে।

২য় প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে– فِيْ دَارِهِ زَيْدٌ এ বাক্যে دَارِهِ-এর সর্বনামের বিশেষ্য (زَيْدٌ) যেহেতু মুবতাদা। আর মুবতাদা মর্যাদাগতভাবে অগ্রগামী হয়ে থাকে। তাই যদিও এটি শাব্দিকভাবে এবং বাস্তবে সর্বনামের আগে আসেনি; কিন্তু মর্যাদাগতভাবে আগে এসেছে. কেননা فِيْ دَارِهِ زَيْدٌ-এর মূল ইবারত زَيْدٌ فِيْ دَارِهِ, অতএব এটি لَفْظًا ـ تَقْدِيْرًا আগে এসেছে।

সর্বনামের বিশেষ্য অর্থগতভাবে পূর্বে যাওয়ারও দু'টি সুরত হতে পারে (ক) সে বিশেষ্যের উপর কোনো শব্দ দিক নির্দেশ করবে। অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এর প্রতি দিক নির্দেশ করবে।

১ম প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে– اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى এ বাক্যের هُوَ সর্বনামের বিশেষ্য হচ্ছে عَدْلٌ (যা শাব্দিকভাবে ভিন্ন করে তো যায়নি) যা اِعْدِلُوْا-এর মধ্যে অর্থগতভাবে গেছে এবং اِعْدِلُوْا তার প্রতি ইঙ্গিত করছে।

২য় প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে– وَلِاَبَوَيْهِ-এর সর্বনামের বিশেষ্য হচ্ছে মৃতব্যক্তি। এর বিশেষ্য অর্থগতভাবে আগে গেছে। কেননা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তথা মৃতব্যক্তির সম্পদ বা উত্তরাধিকারী সম্পদের আলোচনা এ কথার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তার পিতা বলতে এখানে মৃতব্যক্তির পিতাকেই বুঝানো হয়েছে।

সর্বনামের বিশেষ্য حُكْمِيْ বিধিগতভাবে আগে যাওয়ার উদাহরণ হচ্ছে رُبَّهُ رَجُلًا এবং هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ। প্রথম বাক্যের "ہ" এবং দ্বিতীয় বাক্যের هُوَ সর্বনামের বিশেষ্যদ্বয় যদিও শাব্দিকভাবে সর্বনামদ্বয়ের পরে এসেছে; কিন্তু বিধিগতভাবে আগেই এসেছে। এর কারণ হচ্ছে প্রকৃতভাবে সর্বনামের বিশেষ্য আগেই থাকে, কিন্তু কখনো কোনো পরিস্থিতির কারণে এর ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন– تَفْصِيْلٌ بَعْدَ الْاِجْمَالِ (সংক্ষেপের পর বিস্তারিত বর্ণনা) ইত্যাদির কারণে যদিওবা বিশেষ্যটি পরে আসছে, কিন্তু বিধিগতভাবে উক্ত বিশেষ্যকে অগ্রগামীই ধরা হবে।

قَوْلُهُ وَاَصْلُ الْخِطَابِ اَنْ يَّكُوْنَ لِمُعَيَّنٍ : বিধিগতভাবে خِطَابٌ (সম্বোধন) নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যই হয়ে থাকে, সেই নির্দিষ্ট সম্বোধিত একজনও হতে পারে, একাধিকও হতে পারে। সম্বোধিত ব্যক্তি বলে মধ্যম পুরুষকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, মধ্যম পুরুষের সর্বনাম সর্বদাই বিধিগতভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং বস্তু বা বস্তুসমূহের জন্যই হবে।

মূল লেখকের উক্ত দাবির পক্ষে মুসান্নিফ দু'টি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন– ১. اَصْلُ وَضْعِ الْمَعَارِفِ عَلٰى اَنْ تُسْتَعْمَلَ নীতি ও নিয়মানুসারে مَعْرِفَةٌ (নির্দিষ্ট বাক্যে বিশেষ্য) নির্দিষ্ট বস্তুর বা ব্যক্তির জন্যই হয়ে থাকে। মধ্যম পুরুষের সর্বনামও যেহেতু নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্য সেহেতু এটি নির্দিষ্ট বস্তু অথবা ব্যক্তির জন্যই হবে।

২. خِطَابٌ ـ اِنَّ الْخِطَابَ هُوَ تَوْجِيْهُ الْكَلَامِ اِلٰى حَاضِرٍ (সম্বোধন) বলা হয় কথক তার কথা উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি প্রেরণ করা অর্থাৎ উপস্থিত আছে এমন ব্যক্তির সামনে কথাকে উপস্থাপন করা। যে ব্যক্তি উপস্থিত সে নিশ্চিতভাবেই নির্দিষ্ট। অতএব এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মধ্যম পুরুষের সর্বনাম নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য হয়ে থাকে।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্টরূপে ব্যবহার হওয়া তার একটি অবস্থা। মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট হয় সর্বনাম ব্যবহার করার দ্বারা। সর্বনাম তিনভাবে ব্যবহৃত হয়, বাক্যের ব্যবহারের ক্ষেত্র যদি উত্তম পুরুষের হয় তখন মুতাকাল্লিমের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। আর যদি মধ্যম পুরুষের হয়, তাহলে حَاضِرٌ-এর সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। এছাড়া যদি বাক্যের ব্যবহার এমন নাম পুরুষের ক্ষেত্রে হয় যার আলোচনা কোনো একভাবে গত হয়ে থাকে, তাহলে নাম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। মধ্যম পুরুষের ব্যবহার সাধারণভাবে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জন্য হয়ে থাকে।

وَقَدْ يُتْرَكُ الْخِطَابُ مَعَ مُعَيَّنٍ اِلَى غَيْرِهِ اَىْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لِيَعُمَّ الْخِطَابُ كُلَّ مُخَاطَبٍ عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدَلِ نَحْوُ وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُؤُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَايُرِيْدُ بِقَوْلِهٖ وَلَوْ تَرٰى مُخَاطَبًا مُعَيَّنًا قَصْدًا اِلٰى تَفْظِيْعِ حَالِ الْمُجْرِمِيْنَ اَىْ تَنَاهَتْ حَالُهُمْ فِى الظُّهُوْرِ لِاَهْلِ الْمَحْشَرِ حَيْثُ يَمْتَنِعُ خِفَاؤُهَا فَلَايَخْتَصُّ بِهَا رُؤْيَةُ رَاءٍ دُوْنَ رَاءٍ وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَلَا يَخْتَصُّ بِهٖ اَىْ بِهٰذَا الْخِطَابِ مُخَاطَبٌ دُوْنَ مُخَاطَبٍ بَلْ كُلُّ مَنْ يَتَأَتّٰى مِنْهُ الرُّؤْيَةُ فَلَهٗ مَدْخَلٌ فِىْ هٰذَا الْخِطَابِ وَفِىْ بَعْضِ النُّسَخِ فَلَايُخْتَصُّ بِهَا اَىْ بِرُؤْيَةِ حَالِهِمْ مُخَاطَبٌ اَوْ بِحَالِهِمْ رُؤْيَةُ مُخَاطَبٍ عَلٰى حَذْفِ الْمُضَافِ ـ

অনুবাদ : **কখনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সম্বোধন না করে অনির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি করা হয় যাতে সম্বোধন প্রত্যেক শ্রোতাকে স্বতন্ত্রভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন– যখন তুমি অপরাধীদেরকে আপন প্রভুর সামনে অবনত মস্তক দেখতে পাবে।** তিনি (আল্লাহ) নিজ উক্তি لَوْ تَرٰى দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট শ্রোতাকে ইচ্ছা করেননি, অপরাধীদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। **অর্থাৎ** হাশরবাসীদের সামনে **এদের অবস্থা ভয়াবহ হবে,** যা গোপন করা অসম্ভব হবে। ফলে তাদের অবস্থা কতিপয় লোকদের দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে না **এবং** এ সম্বোধনের **কোনো শ্রোতা** বিশেষভাবে **খাস হবে না;** বরং যাদের পক্ষেই দেখা সম্ভব তারা (সকলেই) উক্ত সম্বোধনের আওতাভুক্ত থাকবে। অন্য নুসখায় (لَا يُخْتَصُّ بِهٖ-এর স্থলে) لَا يَخْتَصُّ بِهَا রয়েছে। অর্থাৎ بِرُؤْيَةِ حَالِهِمْ তাদের অবস্থা দেখার মাঝে কোনো শ্রোতা খাস নয় অথবা بِحَالِهِمْ رُؤْيَةُ مُخَاطَبٍ বা তাদের অবস্থার সাথে কোনো শ্রোতার দর্শন খাস নয়। উভয় সুরতে মুযাফ উহ্য থাকবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَقَدْ يُتْرَكُ الْخِطَابُ الخ : মধ্যম পুরুষের সর্বনাম তথা حاضر-এর সর্বনাম তো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য হয়ে থাকে। তবে কখনো কোনো উদ্দেশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটে। এমনই একটি ব্যতিক্রম নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, কখনো নির্দিষ্ট শ্রোতার সম্বোধনকে অনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি করা হয় মাজাযে মুরসাল হিসেবে। যাতে করে উক্ত সম্বোধন সকলের প্রতি এক একজন করে প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন– وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُؤُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতের "لَوْ" حرف شرط উল্লিখিত পুরো বাক্য শর্ত। এর জওয়াব উহ্য আছে। জওয়াব হলো لَرَاَيْتَ اَمْرًا فَظِيْعًا অর্থাৎ যদি তুমি অপরাধীদের অবনত মস্তক অবস্থায় তাদের প্রভুর সামনে দেখতে পাও তাহলে তুমি ভয়ানক অবস্থা দেখতে পাবে। আয়াতে تَرٰى ফে'লের ফায়েল হলো اَنْتَ উহ্য সর্বনাম। এখানে اَنْتَ দ্বারা সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়; বরং কিয়ামতের ময়দানের সব মানুষ এককে জন স্বতন্ত্রভাবে উক্ত সর্বনামের বিশেষ্য। আয়াতে সম্বোধিত ব্যক্তি ব্যাপক রাখার উদ্দেশ্য হলো অপরাধীদের সবার সামনে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করা। তাদের মন্দ ও অন্যায় কাজের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান সবার সামান প্রদর্শন করতে চান, যাতে উপস্থিত সব লোক তাদের দেখে এবং এতে করে তাদের লজ্জার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাদের এ অবস্থা হাশরের ময়দানের লোকদের সামনে গোপন থাকবে না; বরং যাদের চোখ আছে তারা সকলেই তাদের দেখতে পাবে। এমন হবে না যে, কতিপয় লোকতো দেখবে, কিন্তু অন্যরা তাদের দেখতে পাবে না; বরং সকলেই তাদের শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করবে। তাই আল্লাহ তা'আলা تَرٰى-কে ব্যাপক অর্থে এখানে ব্যবহার করেছেন, নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেননি।

قَوْلُهٗ فَلَا يَخْتَصُّ بِهٖ : এর মধ্যে بِهٖ-এর সর্বনামের বিশেষ্য হচ্ছে خِطَابٌ আর يَخْتَصُّ-এর ফায়েল হলো مُخَاطَبٌ অন্য অনুলিপিতে فَلَايَخْتَصُّ بِهَا আছে। بِهَا-এর বিশেষ্য হচ্ছে رُؤْيَةٌ অথবা حَالِهِمْ তখন ইবারত হবে فَلَايَخْتَصُّ بِرُؤْيَةِ حَالِهِمْ مُخَاطَبٌ অথবা فَلَا يَخْتَصُّ بِحَالِهِمْ رُؤْيَةُ مُخَاطَبٍ ১ম অবস্থায় ইবারতের মধ্যে حَالِهِمْ-এর আগে رُؤْيَةٌ (মুযাফ) উহ্য আছে আর ২য় অবস্থায় مُخَاطَبٌ-এর আগে رُؤْيَةٌ (মুযাফ) উহ্য আছে।

وَبِالْعَلَمِيَّةِ اَىْ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِاِيْرَادِهٖ عَلَمًا وَهُوَ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ مَعَ جَمِيْعِ مُشَخَّصَاتِهٖ لِاِحْضَارِهٖ اَىْ اَلْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِعَيْنِهٖ اَىْ بِشَخْصِهٖ بِحَيْثُ يَكُوْنُ مُتَمَيِّزًا عَنْ جَمِيْعِ مَا عَدَاهُ وَاحْتَرَزَ بِهٰذَا عَنْ اِحْضَارِهٖ بِاسْمِ جِنْسِهٖ نَحْوُ رَجُلٌ عَالِمٌ جَاءَنِىْ فِىْ ذِهْنِ السَّامِعِ اِبْتِدَاءً اَىْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَاحْتَرَزَ بِهٖ عَنْ نَحْوِ جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَهُوَ رَاكِبٌ بِاسْمٍ مُخْتَصٍّ بِهٖ اَىْ بِالْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُطْلَقُ بِاعْتِبَارِ هٰذَا الْوَضْعِ عَلٰى غَيْرِهٖ وَاحْتَرَزَ بِهٖ عَنْ اِحْضَارِهٖ بِضَمِيْرِ الْمُتَكَلِّمِ اَوِ الْمُخَاطَبِ وَاسْمِ الْاِشَارَةِ وَالْمَوْصُوْلِ وَالْمُعَرَّفِ بِلَامِ الْعَهْدِ وَالْاِضَافَةِ وَهٰذِهِ الْقُيُوْدُ لِتَحْقِيْقِ مَقَامِ الْعَلَمِيَّةِ وَاِلَّا فَالْقَيْدُ الْاَخِيْرُ مُغْنٍ عَمَّا سَبَقَ وَقِيْلَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهٖ اِبْتِدَاءً عَنِ الْاِحْضَارِ بِشَرْطِ تَقَدُّمِ ذِكْرِهٖ كَمَا فِى الْمُضْمَرِ الْغَائِبِ وَالْمُعَرَّفِ بِلَامِ الْعَهْدِ فَاِنَّهٗ يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ ذِكْرِهٖ وَالْمَوْصُوْلُ فَاِنَّهٗ يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الْعِلْمِ بِالصِّلَةِ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ جَمِيْعَ طُرُقِ التَّعْرِيْفِ كَذٰلِكَ حَتَّى الْعَلَمِ فَاِنَّهٗ مَشْرُوْطٌ بِتَقَدُّمِ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ ـ

অনুবাদ : **এবং নাম দ্বারা** অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয় নামবাচক বিশেষ্য দ্বারা। আর এটি (নামবাচক বিশেষ্য) হচ্ছে এমন শব্দ যাকে গঠন করা হয়েছে নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য, তার সার্বিক বৈশিষ্ট্যসহ **মুসনাদ ইলাইহকে সুনির্দিষ্টরূপে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে**। আর তা এমনভাবে যে, এটি তার বিপরীত সব কিছু থেকে যেন স্বতন্ত্র হয়ে যায়। এ (بِعَيْنِهٖ) কয়েদ দ্বারা ইসমে জিনস দ্বারা উপস্থিত করার বিষয়টি সংজ্ঞা থেকে খারিজ করে দিয়েছেন, যেমন– رَجُلٌ عَالِمٌ جَاءَنِىْ (একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আমার কাছে এসেছেন)। (মুসনাদ ইলাইহকে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থিত করা) **শ্রোতার মনে প্রাথমিকভাবে** অর্থাৎ প্রথমবার (اِبْتِدَاءً) এ কয়েদের দ্বারা جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَهُوَ رَاكِبٌ জাতীয় উদাহরণ থেকে সংজ্ঞাকে মুক্ত রেখেছেন, **এমন ইসম দ্বারা যা মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস**। এভাবে যে, উক্ত ব্যবহারে এটাকে অন্য কারোর উপর প্রয়োগ করা যায় না। اِسْمٍ مُخْتَصٍّ কায়েদ দ্বারা উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষের সর্বনাম দ্বারা উপস্থিত করা থেকে সংজ্ঞাটিকে মুক্ত করেছেন। তদ্রূপ ইসমে মাওসূল, ইসমে ইশারা, আলিফ লাম দ্বারা নির্দিষ্ট এবং ইযাফাত দ্বারা নির্দিষ্ট ইসম থেকেও। মুসান্নিফ বলেন, এসব কয়েদ নামবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রটিকে নিশ্চিত করার জন্য। অন্যথা শেষের কয়েদটি আগের যাবতীয় কয়েদকে অপ্রয়োজনীয় করে দিয়েছে। তার শব্দ اِبْتِدَاءً-কে (সংজ্ঞার মধ্যে) নেওয়া হয়েছে (যার আলোচনা অতীত হয়েছে) এমন সব ইসমকে উপস্থিত করা থেকে মুক্ত করার জন্য। যেমন– নাম পুরুষের সর্বনামের মধ্যে এবং আলিফ লাম বিশিষ্ট নির্দিষ্টবাচক শব্দের মধ্যে। কেননা, এর মধ্যেও এর আলোচনা হওয়া শর্ত এবং ইসমে মাওসূলের মধ্যে, কেননা, এর মধ্যেও সিলাহ সম্পর্কিত জ্ঞান পূর্বে থাকা শর্ত। কিন্তু এতে আপত্তি রয়েছে। কেননা, নির্দিষ্টজ্ঞাপক সব ইসমের মধ্যে এ শর্ত প্রযোজ্য হচ্ছে। এমনকি নামবাচক বিশেষ্যও। কেননা, এতেও নামের মনোনয়ন সম্পর্কে পূর্বে থেকে জানা শর্ত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَبِالْعَلَمِيَّةِ اَىْ تَعْرِيْفُ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখক মুসনাদ ইলাইহের নির্দিষ্ট হওয়ার একটি অবস্থা তথা নামবাচক বিশেষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট হওয়ার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক বিশেষ্য দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। এর কারণ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার সামনে তার পরিপূর্ণ পরিচয় সহ নির্দিষ্ট নামে উপস্থাপন করা।

عَلَمْ (নামবাচক বিশেষ্য) বলা হয় ঐ ইসমকে, যা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুকে তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ বুঝানোর জন্য মনোনীত হয়েছে। مُشَخَّصَاتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোনো জিনিসের ঐ সব বৈশিষ্ট্য যা তার জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে, যেমন কোনো প্রাণীর জীবন ও তার গায়েব রঙ ইত্যাদি।

এমন সব বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্য নয়, যা পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন কথা বলতে না পারা, ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে না পারা ইত্যাদি। কেননা, এগুলো যদিও শিশুদের মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু বড় হওয়ার পর তাদের মাঝে থাকে না।

قَوْلُهُ لِاِحْضَارِهِ بِعَيْنِهِ : মুসান্নিফ (র.) সংজ্ঞায় বর্ণিত فَوَائِدُ قُيُوْد-এর আলোচনা শুরু করেছেন। প্রথম কয়েদ بِعَيْنِهِ-এর عَيْن শব্দ দ্বারা কখনো সত্তা উদ্দেশ্য হয়, আবার কখনো ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি বা কোনো বস্তুর শরীর। মুসনাদ ইলাইহের ব্যক্তি বা শরীর উপস্থিত করার অর্থ হচ্ছে, তাকে অন্য সব কিছু থেকে পৃথক ও ভিন্ন করে হাজির করা।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ কয়েদটি দ্বারা লেখক সংজ্ঞা থেকে ইসমে জিনস দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে হাজির করার প্রক্রিয়াকে বের করে দিয়েছেন। যেমন- جَاءَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ এ উদাহরণ দ্বারা যদি যায়েদ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবু একে নামবাচক বিশেষ্য বলে গণ্য করা হবে না, কারণ এতে ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে হাজির করা পাওয়া যাচ্ছে না।

قَوْلُهُ فِىْ ذِهْنِ السَّامِعِ اِبْتِدَاءً : মুসান্নিফ (র.) اِبْتِدَاءً-এর ব্যাখ্যা করেছেন اَوَّلَ مَرَّةٍ দ্বারা। এর অর্থ হচ্ছে, প্রথমবার বা প্রাথমিকভাবে। এ কয়েদটি দ্বারা সংজ্ঞা থেকে جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَهُوَ رَاكِبٌ এ জাতীয় উদাহরণ বাদ পড়েছে। কারণ, উদাহরণের সর্বনাম দ্বারা যদিও মুসনাদ ইলাইহকে তার ব্যক্তিসহ শ্রোতার সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে, কিন্তু এটি প্রথমবার হয়নি; বরং এটি হচ্ছে দ্বিতীয় দফায়। প্রথম দফায় زَيْدٌ দ্বারা শ্রোতার মনে মুসনাদ ইলাইহকে উপস্থিত করা হয়েছে। তার পরে সর্বনাম দ্বারা দ্বিতীয় দফায় মুসনাদ ইলাইহকে উপস্থিত করা হয়েছে। অতএব, প্রথমবার বা প্রাথমিকভাবে এ কয়েদ দ্বারা নাম পুরুষের সর্বনাম খারিজ হয়ে যাবে। এটি ছিল ২য় কয়েদ। ইবারতের তৃতীয় কয়েদটি হচ্ছে بِاسْمٍ مُخْتَصٍّ بِهٖ তথা মুসনাদ ইলাইহকে উপস্থিত করা হবে তার সাথে খাস (ওতপ্রোতভাবে জড়িত) নাম দ্বারা। উল্লেখ্য যে, নাম ব্যক্তির সাথে তার নাম রাখার পর থেকে সব সময় জড়িয়ে থাকে এবং নামের এ মনোনয়নে অন্য কাউকে এ নাম দ্বারা বুঝানো যায় না। তবে ভিন্নভাবে অন্যের নাম এটি রাখলে তাকেও এ নাম দ্বারা ডাকা যাবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, اِسْمٌ مُخْتَصٌّ এ কয়েদ দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে নাম ছাড়া অন্যভাবে হাজির করার সব পদ্ধতিগুলো খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যভাবে হাজির করার পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-

১. উত্তম পুরুষের সর্বনাম যেমন- اَنَا ضَرَبْتُ এবং মধ্যম পুরুষের সর্বনাম যেমন- اَنْتَ ضَرَبْتَ , اَنْتَ এবং اَنَا দ্বারা যদিও মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে হাজির করা যায়। কিন্তু এ দু'টি এমন বিশেষ্য নয়, যা মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস; বরং اَنَا প্রত্যেক উত্তমপুরুষের জন্য এবং اَنْتَ প্রত্যেক মধ্যম পুরুষের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২. ইসমে ইশারাহ (ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য)। ইসমে ইশারা দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে উপস্থিত করা হয় বটে, কিন্তু ইসমে ইশারা মুসনাদ ইলাইহের জন্য খাস নয়। যেমন- هٰذَا ضَرَبَ زَيْدًا এখানে মুসনাদ ইলাইহকে هٰذَا দ্বারা উপস্থিত করা হয়েছে। কিন্তু এ هٰذَا এই মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস নয়; বরং প্রত্যেক ইসমে ইশারার জন্য هٰذَا শব্দটি ব্যবহৃত হবে।

৩. ইসমে মাওসূল, ইসমে মাওসূল দ্বারাও মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু ইসমে মাওসূল ও মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস নয়। যেমন- اَلَّذِىْ يَفُوْزُ فِى الْاِمْتِحَانِ حَاضِرٌ (যে পরীক্ষায় সফল হয় সে উপস্থিত) এ বাক্যে اَلَّذِىْ মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে প্রথমবারেই উপস্থিত করেছে। কিন্তু যেহেতু এটি এমন বিশেষ্য নয় যা মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস, তাই তা সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে; বরং اَلَّذِىْ প্রত্যেক একক পুরুষের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৪. আলিফ-লাম দ্বারা নির্দিষ্ট। আলিফ-লাম দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে, এমন বিশেষ্য যদিও মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে প্রথমবার উপস্থিত করে, কিন্তু এটি মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস না হওয়ার কারণে মুসনাদ ইলাইহের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে। যেমন- وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى এ উদাহরণের الذَّكَرُ (আলিফ-লাম দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে) যদিও মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে এবং তা শ্রোতার মনে নির্দিষ্টভাবে পৌঁছেছে, তথাপি এটি মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস নয়; বরং اَلِفْ وَلَامْ প্রত্যেক নির্দিষ্ট শব্দের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

৫. ইযাফাত (সম্বন্ধ)-এর দ্বারা নির্দিষ্ট জ্ঞাপক হওয়া। উল্লেখ্য যে, زَيْدًا ছাড়া যে কোনো নির্দিষ্ট বিশেষ্য-এর প্রতি সম্বন্ধ করা হলে সম্বন্ধকৃত অনির্দিষ্ট বিশেষ্যটি নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে প্রথমবার উপস্থিত করা হয়। যেমন- কেউ বলল, قَلَمِىْ كَاتِبٌ এ বাক্যের মুসনাদ ইলাইহকে ইযাফত প্রথমবার উপস্থিত করলেও এ ইযাফত যেহেতু এ মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস নয়, তাই একে নামবাচক বিশেষ্য বলা যাবে না। মুসান্নিফ (র.) বলেন, بِعَيْنِهٖ এবং اِبْتِدَاءً-এর কয়েদ মূলত আলম (নামবাচক বিশেষ্য)-এর অবস্থানকে সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। নামবাচক বিশেষ্যের জন্য তো بِاسْمٍ مُخْتَصٍّ بِهٖ এতটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট।

قَوْلُهٗ وَقِيْلَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهٖ اِبْتِدَاءً عَنِ الْاِحْضَارِ الخ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ اِبْتِدَاءً এ কয়েদটির ব্যাপারে কতিপয় লোকদের ব্যাখ্যা উল্লেখ করত তা খণ্ডন করেছেন। তারা বলেন, اِبْتِدَاءً, কয়েদটি দ্বারা ঐসব ইসমকে সংজ্ঞা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে যেগুলোর মধ্যে মুসনাদ ইলাইহের আলোচনা আগে যাওয়া শর্ত। অতএব, তাদের মতানুসারে اِبْتِدَاءً-এর অর্থ হলো কোনো শর্ত ছাড়া। তাহলে পুরো বাক্যের অর্থ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে উপস্থিত করা শর্তহীনভাবে। সুতরাং তাদের বক্তব্য অনুসারে সংজ্ঞা থেকে এমন ইসম বের হয়ে যাবে, যার মধ্যে তার আলোচনা পূর্বে যাওয়া শর্ত। যেমন- ১. নামপুরুষের সর্বনাম তা সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এর মধ্যে তার مَرْجِعْ আগে যাওয়া শর্ত ২. আলিফ লাম (عَهْد) দ্বারা যেসব ইসম নির্দিষ্ট হয়েছে। কেননা, এসব ইসমের আলোচনাও আগে অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত। ৩. ইসমে মাউসূল, এটিও সংজ্ঞার আওতায় আসবে না; বরং اِبْتِدَاءً-এর কয়েদ দ্বারা বের হয়ে যাবে। কেননা, এর মধ্যে সিলাহ সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান না থাকা অবস্থায় ইসমে মাওসূলের ব্যবহার সঠিক নয়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, কতিপয় লোকের اِبْتِدَاءً-এর এরূপ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। তা ছাড়া তাদের ব্যাখ্যা মতে কয়েকটি বিশেষ্যকে اِبْتِدَاءً-এর কয়েদ দ্বারা বাদ দেওয়া এবং কয়েকটিকে সংজ্ঞার আওতায় রাখাও সঠিক নয়। কেননা, তাদের ব্যাখ্যামতে নির্দিষ্টজ্ঞাপক প্রত্যেকটি ইসমই সমান অর্থাৎ প্রত্যেকটির মধ্যেই পূর্ব জ্ঞান থাকা জরুরি, এমনকি عَلَمٌ (নামবাচক বিশেষ্য)-এর মধ্যে নামের মনোনয়ন সম্পর্কে ব্যবহারের আগে অবগত হওয়া জরুরি। অতএব, পূর্বে অবগত হওয়ার শর্তারোপ করে কতককে বাদ দেওয়া, আর কতককে রাখা সঠিক নয়; বরং প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট জ্ঞাপক বিশেষ্যের মধ্যে পূর্বজ্ঞান থাকা জরুরি, এমনকি নামবাচক বিশেষ্যর মধ্যেও। সুতরাং তাদের ব্যাখ্যা মতে তো নামবাচক বিশেষ্যর সংজ্ঞা থেকে নামবাচক বিশেষ্য বের হয়ে যাচ্ছে। অতএব তাদের এ মতকে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। اِبْتِدَاءً দ্বারা উদ্দেশ্য প্রথমবারই হবে যা মুসান্নিফ (র.) বর্ণনা করেছেন।

সার-সংক্ষেপ :

কোনো মুসনাদ ইলাইহ যখন নামবাচক বিশেষ্যে পরিণত হয় তখন তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। عَلَمٌ বলা হয় মুসনাদ ইলাইহকে বিশেষ নামে তার সত্তাসহ প্রথমবারেই শ্রোতার মনে উপস্থিত করা।

মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের সংজ্ঞায় বর্ণিত কয়েদগুলোর فَوَائِدْ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, بِعَيْنِهٖ -এর কয়েদ দ্বা 'ইসমে জিন্স'-এর সাহায্যে উপস্থিত করার বিষয়টি খারিজ করা হয়েছে।

اِبْتِدَاءً-এর কয়েদ দ্বারা নাম পুরুষের সর্বনামকে খারিজ করা হয়েছে। اِسْمٌ مُخْتَصٌّ بِهٖ-এর কয়েদ দ্বারা উত্তম পুরুষের সর্বনাম ও মধ্যমপুরুষের সর্বনাম, ইসমে মাউসূল, ইসমে ইশারা, 'আলিফ-লাম'-এর সাহায্যে নির্দিষ্টজ্ঞাপক বিশেষ্য ও 'ইযাফাত' দ্বারা নির্দিষ্টজ্ঞাপক বিশেষ্য সবই খারিজ হয়ে গেছে।

نَحْوُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاللّٰهُ اَصْلُهُ اَلْاِلٰهُ حُذِفَتِ الْهَمْزَةُ وَعُوِّضَتْ عَنْهَا حَرْفُ التَّعْرِيْفِ ثُمَّ جُعِلَ عَلَمًا لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْخَالِقِ لِلْعَالَمِ وَ زَعَمَ بَعْضُهُمْ اَنَّهُ اِسْمٌ لِمَفْهُوْمِ الْوَاجِبِ لِذَاتِهِ اَوِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْعُبُوْدِيَّةِ لَهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا كُلِّيٌّ اِنْحَصَرَ فِيْ فَرْدٍ فَلَا يَكُوْنُ عَلَمًا لِاَنَّ مَفْهُوْمَ الْعَلَمِ جُزْئِيٌّ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّا لَانُسَلِّمُ اَنَّهُ اِسْمٌ لِهٰذَا الْمَفْهُوْمِ الْكُلِّيِّ كَيْفَ وَقَدْ اَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّ قَوْلَنَا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ وَلَوْ كَانَ اللّٰهُ اِسْمًا لِمَفْهُوْمٍ كُلِّيٍّ لَمَا اَفَادَتِ التَّوْحِيْدَ لِاَنَّ الْكُلِّيَّ مِنْ حَيْثُ هُوَ كُلِّيٌّ يَحْتَمِلُ الْكَثْرَةَ ـ

অনুবাদ : যেমন- قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ। এর মধ্যে اَللّٰهُ শব্দটির মূল হলো اَلْاِلٰهُ; হামযাকে বিলুপ্ত করত এর পরিবর্তে নির্দিষ্টজ্ঞাপক 'আলিফ লাম' আনা হয়েছে। এরপর এটিকে নামবাচক বিশেষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঐ সত্তার জন্য, যিনি জগতের স্রষ্টা এবং যার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। কতিপয় লোক মনে করেন এটি যার সত্তা অবশ্যম্ভাবী অথবা যিনি ইবাদতের উপযুক্ত এমন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতকারী বিশেষ্য বা اِسْم (এ অর্থে) এদের প্রত্যেকটি এমন كُلِّيٌّ যা একটি মাত্র فَرْد-এর মাঝে সীমাবদ্ধ। সুতরাং (এ অবস্থায়) এটি নামবাচক বিশেষ্য নয়। কেননা, নামবাচক বিশেষ্যের অর্থ جُزْئِيْ এ মতে আপত্তি রয়েছে, কারণ আমরা এ কথা সমর্থন করি না যে, এটি একটি كُلِّيٌّ-এর অর্থ প্রদানকারী বিশেষ্য। আর এ অভিমত কি করে (সমর্থন করা) সম্ভব, যেখানে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সকলেই এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, আমাদের উক্তি لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হচ্ছে তাওহীদের কালিমা (একত্ববাদ প্রমাণের বাক্য) যদি আল্লাহ শব্দটি কোনো كُلِّيْ-এর অর্থ প্রদানকারী হয়, তাহলে তো এ বাক্য একত্ববাদ প্রমাণ করবে না। কেননা, যে কোনো كُلِّيْ তার কুল্লী হওয়ার দাবি মতে তার অধীন অধিক فَرْد হওয়ার সম্ভবনা রাখে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

نَحْوُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখক নামবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণ হলো قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ, এ বাক্যের اَللّٰهُ শব্দটি নামবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ। এ বাক্যের هُوَ হলো প্রথম মুবতাদা, اَللّٰهُ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা। اَحَدٌ হলো দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে ১ম মুবতাদার খবর অথবা هُوَ হলো মুবতাদা اَللّٰهُ হলো مبدل منه আর اَحَدٌ হলো بدل। এখন بدل ও তার مبدل منه মিলে মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ فَاللّٰهُ اَصْلُهُ اَلْاِلٰهُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, اَللّٰهُ শব্দের মূল হচ্ছে اِلٰهٌ, এর হামযাটিকে নির্দিষ্টজ্ঞাপক আলিফ লাম দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতঃপর লামকে লামের মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ جُعِلَ عَلَمًا : এখান থেকে আল্লাহ শব্দের হাকীকত সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন, اَللّٰهُ শব্দটি নামবাচক বিশেষ্য, এটি সমস্ত জগতের স্রষ্টা ও অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের অধিকারী সত্তার নাম।

قَوْلُهُ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) আল্লাহ শব্দের হাকীকত সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মাযহাব উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন, কতিপয় লোক মনে করে আল্লাহ হচ্ছে একটি مَفْهُوْم كُلِّيْ যার একটি মাত্র فَرْد রয়েছে। তারা বলেন, ইবাদতের উপযুক্ত অথবা যার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী এমন সত্তাকে আল্লাহ বলা হয়। যে কোনো অর্থে গ্রহণ করা হোক না কেন এটি একটি مَفْهُوْم كُلِّيْ। মুসান্নিফসহ জমহুরের মতানুসারে আল্লাহ শব্দটি নামবাচক বিশেষ্য এবং এর অর্থ جُزْئِيْ।

ভিন্নমত পোষণকারীদের মতে আপত্তি :

মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমরা তাদের এ মতটিকে গ্রহণ করতে পারছি না। কারণ, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সকলেরই অভিমত হচ্ছে, কালিমায়ে তাওহীদ হলো لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই)। অর্থাৎ এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ প্রমাণিত হয়। আর এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ তখনই প্রমাণিত হবে, যখন আল্লাহ শব্দটিকে নামবাচক বিশেষ্য বলা হবে। যদি এর আল্লাহ শব্দটিকে مَفْهُوْم كُلِّيْ বলা হয়, তাহলে এ বাক্য দ্বারা একত্ববাদ প্রমাণ হয় না। কেননা, তখন বাক্যের অর্থ হবে "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই।" অথচ আল্লাহ কোনো সত্তার নাম নয়।

আল্লাহ যেহেতু كُلِّيْ সে হিসেবে اَللّٰـهُ-এর মধ্যে একাধিক فَرْد (সদস্য) হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেননা, যে কোনো كُلِّيْ-এর كُلِّيْ হওয়ার দাবি মতে তার একাধিক فَرْد হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ শব্দটিকে নামবাচক বলা হলে তখন সেটা جُزْئِيْ হবে। جُزْئِيْ-এর কোনো فَرْد নেই; বরং جُزْئِيْ টাই একমাত্র فرد। তাই আল্লাহ শব্দের অর্থের মধ্যে একাধিক সদস্য থাকার সম্ভাবনা নেই, থাকবে না, যার দ্বারা একত্ববাদ প্রমাণে কোনো সমস্যা হবে।

সারকথা হলো, আল্লাহ শব্দটিকে مَفْهُوْم كُلِّيْ বলা হলে কালিমায়ে তাওহীদ দ্বারা একত্ববাদ প্রমাণিত হয় না। যেহেতু কালিমায়ে তাওহীদ দ্বারা সবার মতে একত্ববাদ প্রমাণিত হয়, তাই مَفْهُوْم كُلِّيْ হওয়ার মতটি অগ্রহণযোগ্য।

সার-সংক্ষেপ :

মূল লেখক عَلَم বা নামবাচক বিশেষ্য মুসনাদ ইলাইহের উদাহরণ দিয়েছেন 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা। যেমন– قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এ আয়াতে আল্লাহ শব্দটি মুসনাদ ইলাইহ যা নামবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসান্নিফ বলেন, কতিপয় লোক اَللّٰهُ শব্দটিকে নামবাচক বিশেষ্য রূপে স্বীকার করেন না। তাদের মতে, এটি একটি مَفْهُوْم كُلِّيْ।

মুসান্নিফ বলেন, কতিপয় লোকের এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, যদি তাদের মত গ্রহণ করা হয়, তাহলে কালিমায়ে তাওহীদ দ্বারা একত্ববাদ বা তাওহীদ প্রমাণিত হয় না। সেহেতু সকল আলিমের মতে, কালিমায়ে তাওহীদ একত্ববাদ প্রমাণকারী, তাই তাদের মত অগ্রহণযোগ্য।

اَوْ تَعْظِيْمٍ اَوْ اِهَانَةٍ كَمَا فِى الْاَلْقَابِ الصَّالِحَةِ لِذٰلِكَ مِثْلُ رَكِبَ عَلِىٌّ وَهَرَبَ مُعَاوِيَةُ اَوْ كِنَايَةٍ عَنْ مَعْنًى يَصْلَحُ الْعَلَمُ لَهُ نَحْوُ اَبُوْ لَهَبٍ فَعَلَ كَذَا كِنَايَةٌ عَنْ كَوْنِهِ جَهَنَّمِيًّا بِالنَّظْرِ اِلَى الْوَضْعِ الْاَوَّلِ اَعْنِى الْاِضَافِىَّ لِاَنَّ مَعْنَاهُ مُلَازِمُ النَّارِ وَمُلَابِسُهَا وَيَلْزَمُهُ اَنَّهُ جَهَنَّمِىٌّ فَيَكُوْنُ اِنْتِقَالًا مِنَ الْمَلْزُوْمِ اِلَى اللَّازِمِ بِاِعْتِبَارِ الْوَضْعِ الْاَوَّلِ وَهٰذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِى الْكِنَايَةِ وَقِيْلَ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ اِنَّ الْكِنَايَةَ كَمَا يُقَالُ جَاءَ حَاتِمٌ وَ يُرَادُ مِنْهُ لَازِمُهُ اَىْ جَوَّادٌ لَا الشَّخْصُ الْمُسَمّٰى بِحَاتِمٍ وَيُقَالُ رَأَيْتُ اَبَا لَهَبٍ اَىْ جَهَنَّمِيًّا وَفِيْهِ نَظْرٌ لِاَنَّهُ حِ يَكُوْنُ اِسْتِعَارَةً لَا كِنَايَةً عَلٰى مَا سَيَجِئُ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا ذَكَرَهُ لَكَانَ قَوْلُنَا فَعَلَ كَذَا هٰذَا الرَّجُلُ مُشِيْرًا اِلَى الْكَافِرِ وَقَوْلُنَا اَبُوْ جَهْلٍ فَعَلَ كَذَا كِنَايَةٌ عَنِ الْجَهَنَّمِىِّ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ اَحَدٌ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلٰى فَسَادِ ذٰلِكَ اَنَّهُ مَثَّلَ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ وَغَيْرُهُ فِىْ هٰذِهِ الْكِنَايَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَلَا شَكَّ اَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الشَّخْصُ الْمُسَمّٰى بِاَبِىْ لَهَبٍ لَا كَافِرٌ اٰخَرُ اَوْ اِيْهَامِ اِسْتِلْذَاذِهِ اَىْ وِجْدَانِ الْعَلَمِ لَذِيْذًا نَحْوُ قَوْلِهِ بِاللّٰهِ يَا ظَبْيَاتُ الْقَاعِ قُلْنَ لَنَا * اَلَيْلَاىَ مِنْكُنَّ اَمْ لَيْلٰى مِنَ الْبَشَرِ اَوِ التَّبَرُّكِ بِهِ نَحْوُ اَللّٰهُ الْهَادِىْ وَمُحَمَّدُ الشَّفِيْعُ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ كَالتَّفَاؤُلِ وَالتَّطَيُّرِ وَالتَّسْجِيْلِ عَلَى السَّامِعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُنَاسِبُ اِعْتِبَارَهُ فِى الْاَعْلَامِ ـ

অনুবাদ : মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক আনা হয় **সম্মান অথবা তুচ্ছতা প্রদর্শন করার জন্য।** যেমন উল্লিখিত বিষয়দ্বয়ের উপযুক্ত উপাধিসমূহে হয়ে থাকে। যেমন– رَكِبَ عَلِىٌّ وَهَرَبَ مُعَاوِيَةُ 'আলী আরোহণ করল, আর মু'আবিয়া পালিয়ে গেল) অথবা নামবাচক শব্দ ইঙ্গিতপূর্ণ (كِنَائِىْ) অর্থ প্রদান করে– সে যার সম্ভাবনা রাখে তার মধ্যে সত্তাগতভাবে আছে। যেমন– اَبُوْ لَهَبٍ فَعَلَ كَذَا (আবূ লাহাব এমনটি করেছে) এটি দোজখী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হলো। (এ অর্থ) তার প্রথম وَضْع তথা ইযাফতের ভিত্তিতে, কেননা এর অর্থ হচ্ছে আগুনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী এবং সংশ্রব গ্রহণকারী। আর এটা দোজখী হওয়াকে আবশ্যক করে। (কারণ, দোজখীরা সবসময় আগুনের মধ্যে অবস্থান করে।) অতএব, এটি প্রথম ব্যবহার হিসেবে مَلْزُوْم থেকে لَازِمْ -এর প্রতি ইঙ্গিত হলো। আর কিনায়ার মধ্যে এতটুকুই (মালযূম বলে লাযিম উদ্দেশ্য করা) যথেষ্ট। এ ব্যাপারে কতিপয় লোক আপত্তি করে বলেন, (এ জাতীয় উদাহরণে দ্বিতীয় মনোনয়ন হিসেবে কিনায়া হয়েছে। তা এভাবে যে,) নিশ্চয়ই কিনায়া হয় এ উদাহরণে যেমন হলো جَاءَ حَاتِمٌ তথা হাতেম আসল এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হলো এর লাযিম অর্থাৎ দানশীল। এখানে হাতেম নামীয় নির্দিষ্ট ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয় না এবং বলা হলো رَأَيْتُ اَبَا لَهَبٍ (আমি আবূ লাহাবকে দেখলাম) অর্থাৎ দোজখী ব্যক্তিকে। কিন্তু এ মতে আপত্তি আছে। কেননা, এরূপ উদ্দেশ্য করা হলে বাক্যগুলো ইসতি'আরা হবে, কিনায়া হবে না। যার সম্পর্কে আলোচনা অচিরেই আসবে। (ভিন্নমতাবলম্বী) যা উল্লেখ করেছে তাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কাফিরের ইশারা করে আমাদের বাক্য فَعَلَ كَذَا هٰذَا الرَّجُلُ (এই লোকটি এমন করেছে) এবং اَبُوْ جَهْلٍ فَعَلَ كَذَا (আবূ জাহল এমন করেছে) দোজখী হওয়ার কিনায়া (ইঙ্গিত) হবে। অথচ এ অর্থ কেউ বলেননি, এ মতটি যে ভ্রান্ত তার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় এভাবে যে, মিফতাহ্ গ্রন্থের

লেখক ও অন্যরা এই কিনায়া-এর উদাহরণ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলার বাণী– تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ দ্বারা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, (এ আয়াতে) আবূ লাহাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট ব্যক্তি অন্য কোনো কাফির নয়। **অথবা নামবাচক শব্দ থেকে সুখ লাভ করার ধারণা সৃষ্টি করার জন্য** অর্থাৎ নামবাচক শব্দটিকে মনোমুগ্ধকর পাওয়া। যেমন কবির কবিতার চরণ : (অনুবাদ) আল্লাহর শপথ! হে বনের হরিণীরা, তোমরা আমাকে বল, আমার লায়লা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; না মানুষের অন্তর্ভুক্ত। **অথবা নামবাচক শব্দ দ্বারা বরকত হাসিলের জন্য,** যেমন– আল্লাহ পথপ্রদর্শক। মুহাম্মদ ﷺ সুপারিশকারী। **অথবা এ জাতীয় কোনো উদ্দেশ্যে** (মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক করে উল্লেখ করা হয়) যেমন সুলক্ষণের উদ্দেশ্য, কুলক্ষণের উদ্দেশ্য, শ্রোতার কাছে (মুসনাদ ইলাইহকে) পাকাপোক্ত করার জন্য ইত্যাদি যা নামবাচকের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য করা যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اَوْ تَعْظِيْمٍ اَوْ اِهَانَةٍ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট করে ব্যবহার করার কতিপয় কারণ সম্পর্কে আলোচনা করছেন। এর মধ্য থেকে একটি কারণ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য এবং মুসনাদ ইলাইহের প্রতি তুচ্ছতা প্রদর্শন করা। এ ধরনের সম্মান এবং অসম্মান প্রদর্শন করা যায় এমন উপাধি এবং নাম দ্বারা, যেগুলোর মধ্যে এমন অর্থ গ্রহণের সুযোগ থাকে। যেমন– মুহাম্মদ নামের মধ্যে প্রশংসার অর্থ বিদ্যমান এবং (كَلْبٌ) নামের মধ্যে হীনতার প্রকাশ রয়েছে। অথবা, নামের মধ্যে এসব অর্থ না থাকলেও কোনো নাম যদি গুণ বা দোষের দ্বারা প্রসিদ্ধ হয় তাহলে কিনায়া করা যায়। যেমন– حَاتِمْ দানশীলতায় প্রসিদ্ধ আর কারুন কৃপণতায় প্রসিদ্ধ। অথবা উপনাম বা ডাকনামের মধ্যে যদি এরূপ অর্থ থাকে, তাহলে সে অর্থের কিনায়া করা যায়, যেমন– আবুল খায়ের (কল্যাণের পিতা) ও আবুল ফযল (সম্মানের অধিকারী) ইত্যাদি।

যেসব নাম সম্মান ও অসম্মানের অর্থ ধারণ করে সেগুলোর যে উদাহরণ মুসান্নিফ (র.) দিয়েছেন তা হলো (সম্মানের) رَكِبَ عَلِيٌّ অর্থাৎ আলী আরোহণ করেছে, এতে عَلِيْ মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে সম্মানের অর্থ রয়েছে। কেননা عَلِيْ শব্দটি عُلُوٌّ (উচ্চতা) থেকে নির্গত।

অসম্মান বা তুচ্ছতার উদাহরণ হচ্ছে هَرَبَ مُعَاوِيَةُ এতে মু'আবিয়া মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে অসম্মানের অর্থ বিদ্যমান। কেননা, مُعَاوِيَةُ শব্দটি عُوَاءٌ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হলো কুকুর বা হিংস্র প্রাণীর আওয়াজ। উল্লেখ্য যে, আলী এবং মু'আবিয়া এ দু'টি শব্দ কারো নামও হতে পারে, আবার কারো উপাধি রূপেও ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে উপাধি ধরাই শ্রেয়। কেননা, এ দু'টি শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুই সাহাবীর নাম উদ্দেশ্য হলে দ্বিতীয় উদাহরণটি দ্বারা হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হয়, যা কোনো হকপন্থি মুসলমানের কাম্য নয়।

قَوْلُهُ اَوْ كِنَايَةٍ عَنْ مَعْنًى يَصْلَحُ الْعَلَمُ لَهُ : কখনো মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট করে ব্যবহার করা হয় কিনায়া করার জন্য। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এমন নাম দ্বারা কিনায়া (ইঙ্গিত) করা হয়, যার মধ্যে ইঙ্গিতের অর্থ রয়েছে। যেমন– কেউ বলল اَبُوْ لَهَبٍ فَعَلَ كَذَا। এতে اَبُوْ لَهَبٍ হচ্ছে এক ব্যক্তির নাম যা এখানে মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে এখানে আবূ লাহাব দ্বারা দোজখী হওয়ার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, اَبُوْ لَهَبٍ শব্দটির মধ্যে দু'ধরনের গঠন প্রক্রিয়া কাজ করেছে। প্রথমত اَبُوْ মুযাফ لَهَبٍ মুযাফ ইলাইহ মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ একত্রিত হয়ে একটি শব্দ হয়েছে। দ্বিতীয়ত اَبُوْ لَهَبٍ শব্দটি কারো নামের জন্য মনোনীত হয়েছে মুসান্নিফের দাবি হলো, এখানে প্রথম গঠন প্রক্রিয়া হিসেবে اَبُوْ لَهَبٍ-এর অর্থ হচ্ছে আগুনের সারাক্ষণের সঙ্গী, কেননা لَهَبٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে অগ্নিশিখা, আর اَبُوْ হচ্ছে পিতা। সুতরাং অগ্নিশিখার পিতা সেই হবে যে সবসময় অগ্নিশিখার সাথে থাকে আর একটা লোক সবসময় আগুনের সাথে থাকার জন্য লাযিম হচ্ছে জাহান্নামী হওয়া। সুতরাং এখানে اَبُوْ لَهَبٍ (মালযূম বলে লাযিম তথা দোজখীর অর্থ নেওয়া হচ্ছে। অতএব, আবূ লাহাব নামীয় কোনো কাফির সম্পর্কে যদি বলা হয় اَبُوْ لَهَبٍ فَعَلَ كَذَا তাহলে এর দ্বারা তার দোজখী হওয়ার প্রতি কিনায়া করা যায়। কেননা, মালযূম বলে লাযিম উদ্দেশ্য করা কিনায়ার নিয়ম। অতএব উক্ত উদাহরণের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ আবূ লাহাবকে নামবাচক শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে দোজখী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। সুতরাং আবূ লাহাব এটা করেছে, এর অর্থ হচ্ছে দোজখী লোকটি এটা করেছে

قَوْلُهُ وَقِيْلَ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ الخ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) কতিপয় লোকের ভিন্নমতকে উপস্থাপন করেছেন। তাদের মত হচ্ছে এ বাক্যের মধ্যে اَبُوْ لَهَبٍ বলে দোজখী হওয়ার ইঙ্গিত প্রথম গঠন বা মনোনয়ন হিসেবে নয়; বরং ২য় وَضْع (মনোনয়ন) তথা নামবাচক শব্দ হিসেবে কিনায়া করা হয়েছে। এটি جَاءَ حَاتِمٌ-এর মতো। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, হাতিম এক ব্যক্তির নাম, যিনি দানশীলতা ও বদান্যতায় এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, তার জন্য দানশীলতা আবশ্যক হয়ে গিয়েছিল। এরপর যদি কোনো দানশীল ব্যক্তিকে হাতিম বলা হয়, তাহলে এর দ্বারা দানশীল হওয়ার কিনায়া করা হবে। কেননা, হাতিম (নামবাচক শব্দ)-কে তার লাযিমী অর্থ তথা দানশীলের অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনিভাবে আবূ লাহাব নামক কুখ্যাত কাফিরের জন্য দোজখী হওয়া অত্যাবশ্যক। সুতরাং কোনো কাফিরের নাম যদি আবূ লাহাব রাখা হয় এবং বলা হয় رَأَيْتُ اَبَا لَهَبٍ তাহলে এর দ্বারা দোজখী হওয়া আবশ্যক হবে কিনায়া হিসেবে। কেননা, আবূ লাহাব (নামবাচক শব্দ)-এর মধ্যে দোজখী হওয়ার লাযিমী অর্থ রয়েছে।

মুসান্নিফ এবং কতিপয় লোকের মতের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মুসান্নিফের মতানুসারে শব্দটি (নামবাচক) প্রথমত তার আসল অর্থে এবং আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, এরপর তা থেকে লাযিমী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। দ্বিতীয় মতানুসারে শব্দ (নাম) টি না তার আসল অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, না তার দ্বিতীয় অর্থে (নামবাচক) এ ব্যবহৃত হচ্ছে; বরং এটি প্রথম থেকেই লাযিমী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি جَاءَ حَاتِمٌ-এর মধ্যে حَاتِمٌ শব্দটি প্রথমেই দানশীলের অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি হাতেম তাঈ নামক বিখ্যাত দানবীরের অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এমনিভাবে جَاءَ اَبُوْ لَهَبٍ-এর মধ্যে اَبُوْ لَهَبٍ প্রথমেই দোজখী হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবূ লাহাব নামক কুখ্যাত কাফিরের অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। দ্বিতীয় মতটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় মতটিকে তিনভাবে প্রত্যাখ্যান ও খণ্ডন করছেন– **এক.** ভিন্নমতাবলম্বীদের মতানুসারে যদি শব্দটি প্রথমেই লাযিমী অর্থে যেমন হাতিম বলে অন্য কোনো দানবীরের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তো এটি ইসতি'আরাহ্ হলো, কিনায়া হলো না। তখন হাতিম হবে মুশাব্বাহ বিহী আর দানবীর ব্যক্তি হবে মুশাব্বাহ। এদের মাঝে আলাকাহ বা সংযোগ রক্ষাকারী হবে দানশীলতা। এমনিভাবে আবূ লাহাব বলে অন্য কোনো জাহান্নামীকে উদ্দেশ্য করা। এদের মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী হচ্ছে কুফর, এ স্থানে আসল অর্থ উদ্দেশ্য করা যাচ্ছে না প্রতিবন্ধক থাকার কারণে। সেই প্রতিবন্ধক হচ্ছে হাতিম আত্তাঈ-এর আগমন এবং আবূ লাহাবকে (আব্দুল উয্যা) দেখা দু'টোই অসম্ভব। কেননা, তারা উভয়েই সহস্রাধিক বছর আগে ইহলোক ত্যাগ করেছে। তাদের মতানুসারে যেহেতু এখানে কিনায়া বলা সম্ভব হচ্ছে না; বরং ইসতি'আরাহ্ বিল কিনায়া হয়ে যাচ্ছে, তাই তাদের অভিমত অগ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ عَلٰى مَا سَيَجِيْئُ : এর দ্বারা কিনায়ার অধ্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিনায়ার অধ্যায়ে বলা হবে যে, কিনায়া বলা হয় শব্দকে তার আসল অর্থে প্রথমত ব্যবহার করা হবে যাতে তাকে লাযিমী অর্থে নেওয়া যায়। (এটি মুসান্নিফের মাযহাব) সাক্কাকীর মাযহাব হচ্ছে শব্দকে **প্রথমত** তার লাযিমী অর্থে ব্যবহার করত মালযূমের অর্থের দিকে নিয়ে যাওয়া। মালযূমের অর্থ হচ্ছে তার আসল অর্থ।

দুই. যদি ভিন্নমতাবলম্বীদের মতানুসারে তাকে কিনায়া বলা হয়। তাহলে নিম্নের সমস্যা দেখা দেবে। যেমন– কোনো ব্যক্তি এক কাফিরের প্রতি ইশারা করে বলল فَعَلَ كَذَا هٰذَا الرَّجُلُ (এ লোকটি এমন করেছে) কিন্তু সে উদ্দেশ্য করল ইশারাকৃত লোকটি ছাড়া অন্য কেউ এ কাজটি করেছে অথবা আবূ জাহল নাম নয়, এমন কাফিরকে বলল اَبُوْ جَهْلٍ فَعَلَ كَذَا এবং উভয় অবস্থায় এর দ্বারা ব্যক্তিদ্বয়ের দোজখী হওয়ার কিনায়া করা হলো অর্থাৎ مَلْزُوْمٌ যথা আবূ জাহল এবং কাফিরের প্রতিই ইঙ্গিত বলে লাযিম (দোজখী হওয়া) উদ্দেশ্য করা হলো। মোটকথা, উভয় উদাহরণের মধ্যে আবূ জাহল এবং ইশারাকৃত কাফির ব্যক্তির মধ্যে প্রথমেই লাজিমী অর্থ তথা দোজখী হওয়া ইচ্ছা করা হয়েছে। আর এটি হচ্ছে ভিন্নমতাবলম্বীদের মতে কিনায়া; অথচ এ জাতীয় উদাহরণের মধ্যে কিনায়া হয়েছে, এ কথা কেউই সমর্থন করেন না। এমন উদাহরণে কিনায়া হওয়ার বিষয়টি সকলের অস্বীকার প্রমাণ করে যে, এতে কিনায়া হয়নি। অতএব, কিনায়া-এর ব্যাখ্যা এটা হবে না, যা তারা বলেছেন; বরং কিনায়ার ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ অর্থাৎ মুসান্নিফ যা বলেছেন তাই হবে।

তিন. তাদের কিনায়ার সংজ্ঞার বিপক্ষে তৃতীয় দলিলটি হচ্ছে, মিফতাহ গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাক্কাকীসহ অন্যরা এ স্থলে কিনায়ার যে উদাহরণ দিয়েছেন তা হলো تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ (আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক) ভিন্নমতাবলম্বীদের মতানুসারে আয়াতে কিনায়া হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, আয়াতে আবূ লাহাব দ্বারা রাসূলের যুগের সেই আবূ লাহাবই উদ্দেশ্য, অন্য কোনো কাফির দোজখী উদ্দেশ্য নয়। অতএব, আয়াতের মধ্যে প্রথমেই লাযিমী অর্থ তথা দোজখীর অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। সুতরাং অন্যদের মতানুসারে আয়াতে কিনায়া হয়নি। তবে আয়াতে মুসান্নিফসহ জমহুরের মতানুসারে কিনায়া হবে। কেননা, আল্লামা সাক্কাকী প্রমুখ একে কিনায়ার উদাহরণ বলেছেন। মোটকথা, এটাই প্রমাণিত হলো যে, কিনায়ার ঐ সংজ্ঞাই সঠিক যা মুসান্নিফসহ সকলেই বলেছেন। ভিন্নমতাবলম্বী বর্ণিত কিনায়ার সংজ্ঞাটি সঠিক নয়; বরং এতে নানা সমস্যা রয়েছে।

বি. দ্র. تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ এ উদাহরণটিকে মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক হওয়ার উদাহরণ হওয়ার উপর অনেকেই আপত্তি তুলেছেন। তারা বলেন, আয়াতের মধ্যে اَبُوْ لَهَبٍ মুসনাদ ইলাইহ হয়নি; বরং এটি يَدَا-এর মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। এর জবাব হচ্ছে, আয়াতে يَدَا শব্দটি অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত اَبُوْلَهَبٍ মুসনাদ ইলাইহ।

قَوْلُهُ اَوْ اِبْهَامِ اِسْتِلْذَاذِهِ : এখান থেকে মূল লেখক মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক শব্দে নির্দিষ্টরূপে আনার আরেকটি কারণ বর্ণনা করছেন। তা হচ্ছে মুতাকাল্লিম তার শ্রোতার মাঝে এ ধারণা সৃষ্টি করবে যে, সে মুসনাদ ইলাইহের নাম নিতে তৃপ্তি লাভ করে। যেমনটি এ কবিতার চরণে দেখা যাচ্ছে– بِاللّٰهِ يَا ظَبِيَّاتِ الْقَاعِ قُلْنَ لَنَا * أَلَيْلَاىَ مِنْكُنَّ اَمْ لَيْلٰى مِنَ الْبَشَرِ

এ কবিতার দ্বিতীয় লাইনে اَمْ لَيْلٰى বলা হয়েছে নাম উচ্চারণ করত তৃপ্তি লাভ করার জন্য। অন্যথায় এখানে اَمْ هِىَ বলা দরকার ছিল। কেননা আগের লাইনে لَيْلٰى আসাতে পরের লাইনে সর্বনাম আসাটাই ভাষাগত দাবি; কিন্তু কবি তা করেননি শ্রোতাকে এ ধারণা দেওয়ার জন্য যে, তিনি লাইলার নাম নিতে তৃপ্তি লাভ করেন।

قَوْلُهُ اَوِ التَّبَرُّكِ : কখনো মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক শব্দ দ্বারা নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক করা হয় বরকত নেওয়ার জন্য। যেমন, আল্লাহ তা'আলার আলোচনা চলা কালে اَللّٰهُ الْهَادِىْ বলা। এমনিভাবে রাসূল ﷺ সম্পর্কে আলোচনা করা অবস্থায় مُحَمَّدُ الشَّفِيْعُ বলা। এখানে اَللّٰهُ এবং مُحَمَّدٌ নাম দু'টি বরকত নেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। যদিও هُوَ সর্বনাম দ্বারা এখানে বলা যেত। কখনো تَفَاؤُلْ (শুভলক্ষণ), اَلتَّطَيُّرُ (কুলক্ষণ), اَلتَّسْجِيْلُ عَلَى السَّامِعِ (শ্রোতার কাছে বিষয়কে শক্তিশালী করার জন্য) মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক শব্দ করে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক করা হয়। যেমন–

১. অশুভ লক্ষণের জন্য বলল اَلسَّفَّاحُ فِىْ دَارِ صَدِيْقِكَ (খুনী তোমার বন্ধুর ঘরে)।

২. শুভলক্ষণের জন্য বলল سَعِيْدٌ فِىْ دَارِكَ (সৌভাগ্যবান তোমার ঘরে)।

৩. শ্রোতার কাছে বিষয়কে মজবুত করার জন্য বলল نَعَمْ زَيْدٌ اَقَرَّ بِكَذَا এটি ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলল, যে জিজ্ঞাসা করেছিল هَلْ اَقَرَّ زَيْدٌ بِكَذَا বলা বাহুল্য যে, এখানে نَعَمْ অথবা هُوَ اَقَرَّ বললেই চলত; কিন্তু তা না বলে সে زَيْدٌ-কে উল্লেখ করল বিষয়টিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ ছাড়া আরো অন্যান্য উদ্দেশ্য মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক রূপে ব্যবহার করা হয়।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করার আরো অনেকগুলো কারণ রয়েছে। নিম্নে সে কারণগুলো সংক্ষেপে দেওয়া হলো।

১. তুচ্ছতা প্রকাশের জন্য বা সম্মান প্রকাশের জন্য। যেমন– رَكِبَ عَلِىٌّ وَ هَرَبَ مُعَاوِيَةُ

২. শুধু তুচ্ছতা প্রকাশের জন্য। যেমন– اَبُوْ لَهَبٍ فَعَلَ كَذَا উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.)-এর মতে اَبُوْ لَهَبٍ-এর মধ্যে ইযাফত হিসেবে কিনায়া হয়েছে– عَلَمْ হিসেবে নয়। কতিপয় লোকের মতে, এতে عَلَمْ হিসেবে কিনায়া হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) তাদের মতকে খণ্ডন করেছেন।

৩. সুখ লাভের ধারণা সৃষ্টি করার জন্য বা বরকত হাসিলের জন্য।

৪. সুভলক্ষণ ও কুলক্ষণ প্রকাশের জন্য।

৫. শ্রোতার মনে মুসনাদ ইলাইহকে সুদৃঢ় করার জন্য ইত্যাদি।

وَبِالْمَوْصُوْلِيَّةِ اَىْ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِاِيْرَادِهٖ اِسْمَ مَوْصُوْلٍ لِعَدَمِ عِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِالْاَحْوَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِهٖ سِوَى الصِّلَةِ كَقَوْلِكَ الَّذِىْ كَانَ مَعَنَا اَمْسِ رَجُلٌ عَالِمٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا لَايَكُوْنُ لِلْمُتَكَلِّمِ اَوْ لِكِلَيْهِمَا عِلْمٌ بِغَيْرِ الصِّلَةِ نَحْوُ الَّذِيْنَ فِىْ بِلَادِ الشَّرْقِ لَا اَعْرِفُهُمْ اَوْ لَا نَعْرِفُهُمْ لِقِلَّةِ جَدْوٰى مِثْلِ هٰذَا الْكَلَامِ وَنُدْرَةِ وُقُوْعِهٖ اَوْ اِسْتِهْجَانِ التَّصْرِيْحِ بِالْاِسْمِ اَوْ زِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ اَىْ تَقْرِيْرِ الْغَرَضِ الْمَسُوْقِ لَهُ الْكَلَامُ وَقِيْلَ تَقْرِيْرِ الْمُسْنَدِ وَقِيْلَ تَقْرِيْرِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ نَحْوُ وَ رَاوَدَتْهُ اَىْ يُوْسُفَ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمُرَاوَدَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنْ رَادَ يَرُوْدُ جَاءَ وَ ذَهَبَ فَكَأَنَّ الْمَعْنٰى خَادَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهٖ وَفَعَلَتْ فِعْلَ الْمُخَادِعِ لِصَاحِبِهٖ عَنِ الشَّىْءِ الَّذِىْ لَايُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَهُ مِنْ يَدِهٖ يَحْتَالُ عَلَيْهِ اَنْ يَّغْلِبَهُ وَيَاْخُذَهُ مِنْهُ وَهِىَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّمَحُّلِ لِمُوَاقَعَتِهٖ اِيَّاهَا وَالْمُسْنَدُ اِلَيْهِ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهٖ مُتَعَلِّقٌ بِرَاوَدَتْهُ فَالْغَرْضُ الْمَسُوْقُ لَهُ الْكَلَامُ نَزَاهَةُ يُوْسُفَ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَطَهَارَةُ ذَيْلِهٖ وَالْمَذْكُوْرُ اَدَلُّ عَلَيْهِ مِنْ اِمْرَاَةِ الْعَزِيْزِ اَوْ زُلَيْخَا لِاَنَّهٗ اِذَا كَانَ فِىْ بَيْتِهَا وَتَمَكَّنَ مِنْ نَيْلِ الْمُرَادِ عَنْهَا وَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ فِىْ غَايَةِ النَّزَاهَةِ وَقِيْلَ هُوَ تَقْرِيْرٌ لِلْمُرَاوَدَةِ لِمَا فِيْهِ مِنْ فَرْطِ الْاِخْتِلَاطِ وَالْاُلْفَةِ وَقِيْلَ هُوَ تَقْرِيْرُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ لِاِمْكَانِ وُقُوْعِ الْاِبْهَامِ وَالْاِشْتِرَاكِ فِىْ اِمْرَاَةِ الْعَزِيْزِ وَ زُلَيْخَا وَالْمَشْهُوْرُ اَنَّ الْاٰيَةَ مِثَالٌ لِزِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ فَقَطْ وَظَنِّىْ اَنَّهَا مِثَالٌ لَهَا وَلِاسْتِهْجَانِ التَّصْرِيْحِ بِالْاِسْمِ وَقَدْ بَيَّنْتُهٗ فِى الشَّرْحِ ـ

অনুবাদ : **এবং ইসমে মাওসূল দ্বারা** অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল রূপে আনার দ্বারা مَعْرِفَةٌ করা হয়, **শ্রোতার صِلَةٌ ব্যতীত তার সাথে খাস বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে না জানার কারণে। যেমন তুমি বললে, যে আমাদের সাথে গতকাল ছিল সে একজন আলিম।** মূল লেখক সেই প্রকারের উল্লেখ করেননি যাতে বক্তা অথবা বক্তা ও শ্রোতা কারোই صِلَةٌ ছাড়া অন্য কোনো জ্ঞান থাকে না। যেমন– (কেউ বলল,) যারা পূর্বের রাষ্ট্রগুলোতে বাস করে তাদের আমি চিনি না অথবা বলল, আমরা চিনি না। এ ধরনের বাক্যের উপকারিতা সীমিত এবং এর ব্যবহার সচরাচর পাওয়া যায় না। **অথবা** (নাম) **স্পষ্টভাবে বলাকে খারাপ মনে করার কারণে কিংবা অতিরিক্ত স্পষ্ট করার জন্য** অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে তাকে জোরালো করার জন্য কেউ কেউ বলেন, মুসনাদকে জোরালো করার জন্য আবার কেউ কেউ মুসনাদ ইলাইহ জোরালো করার জন্য। যেমন– وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا অর্থাৎ যার ঘরে তিনি ছিলেন **সে তাকে নিজের প্রতি ফুসলালো এবং প্রলুব্ধ করল তাকে** অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-কে। اَلْمُرَاوَدَةُ হচ্ছে رَادَ يَرُوْدُ-এর مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার (رَادَ يَرُوْدُ) অর্থ যাওয়া-আসা। সুতরাং এর অর্থ সে তার মন আকর্ষণ করার জন্য তার জন্যে প্রতারণার ফাঁদ ফেলল এবং সে তার সাথে এক প্রতারকের ন্যায় আচরণ করল, যেমন– প্রতারক তার সঙ্গীর সাথে করে থাকে ঐ বস্তুর কারণে যা তার হাতছাড়া করতে চায় না এবং তার উপর জয়ী হওয়ার জন্য সে তার উপর আক্রমণ করে এবং তার (প্রতারক) হাত সে বস্তুটি ছিনিয়ে নেয়, এখানে এর অর্থ হচ্ছে– ইউসুফ যুলায়খার উপর প্রবল হওয়ার জন্য ধোঁকা দেওয়া। (আয়াতে) মুসনাদ ইলাইহ হচ্ছে الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهٖ এ বাক্যের عَنْ نَفْسِهٖ মুতা'আল্লিক হবে رَاوَدَتْهُ-এর সাথে। এ

বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা প্রমাণ করা। আযীযে মিসরের স্ত্রী অথবা যুলায়খা বলার চেয়ে উল্লিখিত পদ্ধতিটি উদ্দেশ্যের উপর অধিক অর্থবহ। কেননা, যখন তিনি তার ঘরে অবস্থান করছেন এবং তার উদ্দেশ্য যুলায়খার সাথে পূরণ করার সুযোগও পেলেন, কিন্তু তারপরেও করলেন না; তো তিনি পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। কেউ কেউ বলেন, এতে প্রতারণার বিষয়টি শক্তিশালী করা হয়েছে। কেননা, এতে (ঘরে অবস্থানের কারণে) চূড়ান্ত পর্যায়ের মেলমেশা ও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটি মুসনাদ ইলাইহকে শক্তিশালী করা হয়েছে। কেননা, আযীযে মিসরের স্ত্রী এবং যুলায়খা নামের মধ্যে সন্দেহ ও অনির্দিষ্টতা রয়েছে। (কিন্তু যার ঘরে তিনি ছিলেন এতে কোনো সন্দেহের অবকাশটুকু নেই) প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে আয়াতটি শুধুমাত্র বক্তব্যকে মজবুত করেছে (মুসান্নিফ বলেন) আমার ধারণা হচ্ছে– এটি বক্তব্যকে মজবুত করা এবং নামোল্লেখ করা অপছন্দনীয় উভয় প্রকারের উদাহরণ। বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থে বর্ণনা করেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَبِالْمَوْصُولِيَّةِ اَىْ تَعْرِيْفُ الخ : নির্দিষ্টজ্ঞাপক বিশেষ্যের এক প্রকার হলো ইসমে মাওসূল, যেমন– اَلَّتِىْ ـ اَلَّذِيْنَ ـ اَلَّذَانِ ـ اَلَّذِىْ ইত্যাদি।

ইসমে মাওসূল তার সিলাহ ছাড়া ব্যবহৃত হয় না। ইসমে মাওসূল দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয়, যখন শ্রোতা শুধুমাত্র মাওসূলের সিলাহ সম্পর্কে অবগত থাকে মুসনাদ ইলাইহের অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় জানে না। যেমন– মামুন এক ব্যক্তি সম্পর্কে এতটুকু জানে যে, সে গতকাল হাসানের সাথে ছিল। মামুন তার সম্পর্কে আর কিছুই জানে না, এমতাবস্থায় হাসান যদি মামুনকে সেই ব্যক্তির কোনো গুণ বা তথ্য জানাতে চায় তাহলে মামুনকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে মুসনাদ ইলাইহ দ্বারা নির্দিষ্ট করে বলবে اَلَّذِىْ كَانَ مَعِىْ اَمْسِ رَجُلٌ عَالِمٌ অর্থাৎ যে আমার সাথে গতকাল ছিল সে আলিম। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইসমে মাওসূল ব্যবহার করার মোট তিনটি অবস্থা রয়েছে।

১. শ্রোতা সিলাহ ছাড়া আর কিছুই জানে না।

২. বক্তা সিলাহ ছাড়া আর কিছুই জানে না।

৩. শ্রোতা এবং কথক কেউই সিলাহ ছাড়া আর কিছুই জানে না।

মূল লেখক ১ম অবস্থাটির উদাহরণ দিলেন; কিন্তু শেষ দু'টির উদাহরণ দেননি, এর কারণ হচ্ছে– ২য় এবং ৩য় অবস্থা ব্যবহারিক দিক থেকে বিরল এবং এ ধরনের বাক্য বিশেষ উপকারীও নয়।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ, যেমন– اَلَّذِيْنَ فِىْ بِلَادِ الشَّرْقِ لَا اَعْرِفُهُمْ অর্থাৎ যারা প্রাচ্যে থাকে তাদের আমি চিনি না।

তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ, যেমন– اَلَّذِيْنَ فِى السُّعُوْدِيَّةِ لَا نَعْرِفُهُمْ অর্থাৎ যারা সৌদী আরবে থাকে তাদের আমি চিনি না।

কখনো ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয় নাম উচ্চারণ করাকে খারাপ মনে করার কারণে। যেমন– পেশাব, বায়ু নির্গত হওয়া ইত্যাদি অজু ভঙ্গকারী। এ কথা বুঝাতে কেউ বলল اَلَّذِىْ يَخْرُجُ مِنْ اَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ এখানে পেশাব ও নির্গত বায়ুর উচ্চারণকে অপছন্দনীয় মনে করার কারণে ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয়েছে।

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয় বাক্যের উদ্দেশ্যকে শক্তিশালী ও জোরালো করার জন্য অর্থাৎ বাক্যটি যখন ইসমে মওসূল দ্বারা প্রকাশ করলে বেশি শক্তিশালী হয় তখন ইসমে মাওসূল দ্বারা বাক্যটি প্রকাশ করা হয়। তবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, ইসমে মাওসূল বাক্যের উদ্দেশ্যকে শক্তিশালী করে, না মুসনাদকে, নাকি মুসনাদ ইলাইহকে এ ব্যাপারে তিনটি মতই পাওয়া যায়।

زِيَادَةُ التَّقْرِيْرِ-এর **উদাহরণ : وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهٖ**

অর্থাৎ আর তিনি যে রমণীর ঘরে ছিলেন, সে রমণী তাঁকে প্রলুব্ধ করল।

এ বাক্যের رَاوَدَتْ-এর ফায়েল (মুসনাদ ইলাইহ) হলো اَلَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا (ইসমে মাওসূল) এবং মাফঊল হলো সর্বনাম যার বিশেষ্য হলো ইউসুফ (আ.) عَنْ نَفْسِهٖ হরফে জার এবং মাসদার মিলে رَاوَدَتْ-এর সাথে মুতাআল্লিক।

بَابُ-এর ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ রَوْدٌ এটি بَابُ مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার-এর আসল অক্ষর হচ্ছে **اَلْمُرَاوَدَةُ-এর তাহকীক :** এটি نَصَرَ থেকে ব্যবহৃত হয় رَادَ يَرُوْدُ-এর অর্থ হচ্ছে আসা-যাওয়া করা, অনুসন্ধান করা; بَابُ مُفَاعَلَةٌ থেকে আসলে এর অর্থ হবে বাধা দেওয়া, প্রতারণা করা। সুতরাং راودته-এর অর্থ রমণী তাকে তার মন আকর্ষণের জন্য প্রতারণা করল। প্রতারক তার হাতের জিনিস যাতে ছুটে না যায় এ জন্য তার সাথীর সাথে যেরূপ প্রতারণা করে যুলাইখা ইউসুফ (আ.)-এর সাথে এরূপ ব্যবহারই করল। এখানে প্রতারণা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যুলায়খা ইউসুফকে সঙ্গম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। এ আয়াতে ইসমে মাওসূল ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা বর্ণনা করা। ইসমে মাওসূল (اَلَّتِىْ) কে মুসনাদ ইলাইহ বানানোর দ্বারা উদ্দেশ্যটি দারুণভাবে সাধিত হয়েছে। যদি মুসনাদ ইলাইহ আযীযে মিসরের স্ত্রী কিংবা যুলায়খাকে বানানো হতো, তাহলে উদ্দেশ্যটা পরিপূর্ণভাবে সাধিত হতো না। কারণ, اَلَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا বলার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে ইউসুফ (আ.) যুলায়খার ঘরেই অবস্থান করছিলেন। তার সাথে ঘনিষ্টভাবে থাকার সুযোগ ছিল এবং ইচ্ছা করলে তিনি সহসাই তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারতেন। তার পরেও যখন তিনি নিজেকে পবিত্র রাখলেন, এতে তিনি নিজেকে পবিত্রতার চরম শিখরে অবস্থান করালেন। আযীযে মিসরের স্ত্রী অথবা যুলায়খা ইউসুফ (আ.)-কে ফুসলিয়েছেন, কিন্তু তিনি তার কুমন্ত্রণায় সাড়া দেননি, এ কথা যদি বলা হতো তাহলেও ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা বুঝা যেত, কিন্তু ততটা নয় যেমনটি ইসমে মাওসূল ব্যবহার কারার দ্বারা হয়েছে। কেননা, তখন তো এ সম্ভাবনা থাকত যে, ইউসুফকে দূর থেকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, আর হযরত ইউসুফ (আ.) তাকে এড়িয়ে চলেছেন।

قَوْلُهُ قِيْلَ هُوَ تَقْرِيْرٌ لِلْمُرَاوَدَةِ لِمَا فِيْهِ مِنْ فَرْطِ الخ : কারো মতে আয়াতের মধ্যে ইসমে মাওসূলকে ব্যবহার করার দ্বারা مُرَاوَدَةٌ তথা মুসনাদকে শক্তিশালী করা হয়েছে। مُرَاوَدَةٌ অর্থ– ফুসলানো। ইসমে মাওসূল ব্যবহার কারার দ্বারা জানা গেল যে, হযরত ইউসুফের সাথে একস্থানে থাকার কারণে প্রচুর মেলামেশার সুযোগ ছিল। যার ফলে পরস্পর আন্তরিকতা ও ভালোবাসা ছিল। অতএব, যুলায়খা খুব সহজেই যে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বিভ্রান্ত করতে পারবেন তাই স্বাভাবিক।

আয়াতে যদি মুসনাদ ইলাইহ হিসেবে যুলায়খা অথবা আযীযে মিসরের স্ত্রী বলা হতো তবে ফুসলানোর বিষয়টি এতটা স্পষ্ট হতো না। কেননা, তখন এ ধারণাও হতে পারত যে, যুলায়খার সাথে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কদাচিৎ হয়তো সাক্ষাৎ হয়েছে। তাই সে ফুসলানোর সুযোগ এতটা পেয়েছে কোথায়।

قَوْلُهُ قِيْلَ هُوَ تَقْرِيْرُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ : কারো কারো মতে উক্ত আয়াতে ইসমে মাওসূলকে মুসনাদ ইলাইহ বানানোর দ্বারা মুসনাদ ইলাইহের অর্থকে শক্তিশালী করা হয়েছে। কেননা, আয়াতে যদি اَلَّتِىْ هُوَ-কে মুসনাদ ইলাইহ না বানিয়ে وَ رَاوَدَتْهُ اِمْرَأَةُ الْعَزِيْزِ বলা হতো তাহলে এই সন্দেহ থেকেই যেত যে, আযীযে মিসরের কোনো স্ত্রী হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ফুসলিয়েছেন যার ঘরে তিনি থাকতেন সে না অন্য কেউ? এমনিভাবে যুলায়খাকে মুসনাদ ইলাইহ করে বাক্যটি ব্যবহার করলেও এতে সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, যুলায়খা নামের কত রমণীই থাকতে পারে, ইউসুফ যার ঘরে ছিলেন এটা সেই যুলায়খা তা বুঝা যেত না। পক্ষান্তরে اَلَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا দ্বারা বলা হলে এতে ভুল-ভ্রান্তি সন্দেহের কোনো সম্ভাবনা থাকে না; বরং বিভিন্ন প্রমাণাদি দ্বারা এটাও প্রমাণ হয়ে যায় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) যার ঘরে ছিলেন সেই আযীযে মিসরের স্ত্রী এবং তারই নাম যুলায়খা।

অতএব, মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল রূপে ব্যবহার করায় কাঙ্ক্ষিত মুসনাদ ইলাইহ পাকাপোক্ত ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠে গেল।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, তালখীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারদের কাছে উক্ত আয়াতে زِيَادَةُ تَقْرِيْرٍ-এর উদাহরণ। কিন্তু আমার মত হচ্ছে এটি زِيَادَةُ تَقْرِيْرٍ এবং اِسْتِهْجَانُ التَّصْرِيْحِ উভয়ের উদাহরণ। অর্থাৎ আয়াতে ইসমে মাওসূল দ্বারা বক্তব্যকে যেমন জোরালো ও শক্তিশালী করা হয়েছে, তেমনি আয়াতে জুলায়খা নামক মহিলার নাম নেওয়াকে অনুচিত মনে করত ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহকে কখনো ইসমে মাউসূলের সাহায্যে নির্দিষ্ট করা হয়, আর তা করা হয় যখন শ্রোতা صِلَةٌ ব্যতীত মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্কে আর কিছু না জানে যেমন– اَلَّذِىْ كَانَ مَعَنَا اَمْسِ رَجُلٌ عَالِمٌ এ ছাড়াও ইসমে মাওসূল আরো বিভিন্ন কারণে ব্যবহৃত হয়।

◎ নামোল্লেখকে খারাপ মনে করা হলে বা বিষয়কে সুস্পষ্ট করার জন্য। যেমন– وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهَا এ আয়াতে মুসনাদ ইলাইহ হচ্ছে اَلَّتِىْ যার দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতার বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

اَوِ التَّفْخِيْمِ اَىْ التَّعْظِيْمِ وَالتَّهْوِيْلِ نَحْوُ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فَاِنَّ فِىْ هٰذَا الْاِبْهَامِ مِنَ التَّفْخِيْمِ مَا لَايَخْفٰى اَوْ تَنْبِيْهِ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْخَطَاِ نَحْوُ **شعر** اِنَّ الَّذِيْنَ تُرَوْنَهُمْ اَىْ تَظُنُّوْنَهُمْ اِخْوَانَكُمْ * يَشْفِىْ غَلِيْلَ صُدُوْرِهِمْ اَنْ تُصْرَعُوْا اَىْ تُهْلَكُوْا اَوْتُصَابُوْا بِالْحَوَادِثِ فَفِيْهِ مِنَ التَّنْبِيْهِ فِىْ خَطَاِهِمْ فِىْ هٰذَا الظَّنِّ مَا لَيْسَ فِىْ قَوْلِكَ اِنَّ الْقَوْمَ الْفُلَانِىَّ -

---

<u>অনুবাদ :</u> অথবা (মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়) **বড়করণ** অর্থাৎ বিশালতা এবং ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য। **যেমন– অতঃপর তাদের নিমজ্জিত করল সমুদ্রের ঐ অবস্থা যা তাদেরকে নিমজ্জিত করল।** নিশ্চয়ই এই অস্পষ্টতার মধ্যে এক ধরনের বিশালতা রয়েছে যা গোপনীয় নয়। **অথবা শ্রোতাকে ভুলের প্রতি সতর্ক করার জন্য, যেমন–** [কবিতার চরণ (অনুবাদ)] **তোমরা যাদের ভাই মনে করছ তোমাদের ধ্বংস হওয়ার সংবাদ তাদের অন্তরের হিংসা দূর করে অর্থাৎ** তোমাদের ধ্বংস এবং বিপদাপদে গ্রাস হওয়ার সংবাদ এতে তাদের ভুল ধারণার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যা তোমার 'অমুক সম্প্রদায়' কথাটিতে নেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اَوِ التَّفْخِيْمِ اَىْ التَّعْظِيْمِ الخ : মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল রূপে ব্যবহার করার আরেকটি কারণ হচ্ছে– বিশালতা ও ভয়াবহতা বুঝানো। যেমন– কুরআনের আয়াত فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ অর্থাৎ ফেরাআউন ও তার অনুসারীদের নিমজ্জিত করেছে সমুদ্রের যা তাদেরকে নিমজ্জিত করেছে অর্থাৎ বিশাল তরঙ্গমালা। আয়াতে তরঙ্গমালার উল্লেখ করা হয়নি; বরং ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয়েছে। এ কথা বুঝানোর জন্য যে, ঢেউ বর্ণনাতীত ভয়াবহ ও বিশাল ছিল। কখনো শ্রোতাকে তার ভুল দেখিয়ে দেওয়ার জন্য ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয়। যেমনটি কবিতার নিম্নোক্ত চরণের মাঝে আমরা দেখতে পাই : اِنَّ الَّذِيْنَ تُرَوْنَهُمْ اِخْوَانَكُمْ * يَشْفِىْ غَلِيْلَ صُدُوْرِهِمْ اَنْ تُصْرَعُوْا

অর্থাৎ যেসব লোককে তোমরা সুধারণাবশত ভাই মনে কর (তারা তোমাদের ভাইতো নয়ই; বরং শত্রু। কেননা,) তোমাদের পরাজিত হওয়ার দ্বারা তাদের অন্তরের হিংসা বিদ্বেষ প্রশমিত হয়।

এ বাক্যে ইসমে মাওসূল এবং তার সিলাহ (اِنَّ الَّذِيْنَ تُرَوْنَهُمْ اِخْوَانَكُمْ)-এর দ্বারা শ্রোতাকে বক্তা এই সংকেত দিচ্ছে যে, তোমাদের সুধারণা ভুল এবং আত্মঘাতীমূলক। তাদের তোমরা ভাই ভাবলে কি হবে তারা তো তোমাদের ধ্বংস চায়। যদি তুমি শ্রোতাকে ইসমে মাওসূল ও সিলার সাথে না বলে اِنَّ الْقَوْمَ الْفُلَانِىَّ বলতো, তাহলে তাদের সুধারণা যে ভুল তার ইঙ্গিত হতো না।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল দ্বারা مَعْرِفَةْ করা হয় বড়ত্ব ও বিশালতা বুঝানোর জন্য। যেমন– فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল দ্বারা مَعْرِفَةْ করা হয় শ্রোতার ভুলের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। যেমন– اِنَّ الَّذِيْنَ تُرَوْنَهُمْ اِخْوَانَكُمْ * يَشْفِىْ غَلِيْلَ صُدُوْرِهِمْ اَنْ تُصْرَعُوْا

أَوِ الْإِيْمَاءِ اَيِ الْإِشَارَةِ إِلَى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ اَىْ إِلَى طَرِيْقِهٖ تَقُوْلُ عَمِلْتُ هٰذَا الْعَمَلَ عَلٰى وَجْهِ عَمَلِكَ وَعَلٰى جِهَتِهٖ اَىْ طَرْزِهٖ وَطَرِيْقَتِهٖ يَعْنِىْ تَاْتِىْ بِالْمَوْصُوْلِ وَالصِّلَةِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى اَنَّ بِنَاءَ الْخَبَرِ عَلَيْهِ مِنْ اَىِّ وَجْهٍ وَاَىِّ طَرِيْقٍ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْمَدْحِ وَالذَّمِّ وَغَيْرِ ذٰلِكَ نَحْوُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ فَاِنَّ فِيْهِ اِيْمَاءً اِلٰى اَنَّ الْخَبَرَ الْمَبْنِىَّ عَلَيْهِ اَمْرٌ مِنْ جِنْسِ الْعِقَابِ وَالْاِذْلَالِ وَهُوَ قَوْلُهٗ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ وَمِنَ الْخَطَأِ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ تَفْسِيْرُ الْوَجْهِ فِىْ قَوْلِهٖ اِلٰى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ بِالْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ وَقَدْ اِسْتَوْفَيْنَا ذٰلِكَ فِى الشَّرْحِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **অথবা খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য** অর্থাৎ খবরের পদ্ধতি বা ধরনের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। (وَجْهٌ-এর অর্থ– ধরন ও পদ্ধতি। এর ব্যবহার এরূপ) তুমি বল عَمِلْتُ هٰذَا الْعَمَلَ عَلٰى وَجْهِ) (عَمَلِكَ অর্থাৎ আমি এ কাজটি করেছি তোমার কাজের পদ্ধতিতে অর্থাৎ সে রকম বা ধরনে। অর্থাৎ তুমি ইসমে মাওসূল ও সিলাহকে ব্যবহার করছ এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য যে, খবর কিরূপে ও ধরনে গঠিত অর্থাৎ ভালো প্রতিদান, শাস্তি, প্রশংসা ও নিন্দা ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিতদানের জন্য। **যেমন– নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত করতে অহঙ্কার করে।** এতে (ইসমে মাওসূল ও সিলাহ-এর মাধ্যমে) ইঙ্গিত রয়েছে এ কথার প্রতি যে, খবর গঠিত শাস্তি ও অপমান জাতীয় কোনো বিষয় দ্বারা। আর তার খবর হচ্ছে আয়াত **"তারা দোজখে অপমানিত অবস্থায় প্রবেশ করবে।"** এ স্থানে وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ-এর وَجْهٌ-এর ব্যাখ্যা ইল্লত এবং সবব (কার্যকারণ ও হেতু) দ্বারা করা একটা ভ্রান্তি (যার শিকার অনেকেই হয়েছে)। আমি একে ব্যাখ্যাগ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ اَوِ الْاِيْمَاءِ اَىْ الْاِشَارَةِ الخ : মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল দ্বারা নির্দিষ্ট করে ব্যবহারের আরেকটি কারণ হচ্ছে– এর মাধ্যমে খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হবে। ব্যাপারটি হচ্ছে এরূপ যে, ইসমে মাওসূল ও সিলাহ মিলে এমন একটি মুবতাদা হবে, যে মুবতাদার মধ্যে খবর কেমন হতে পারে তার ইঙ্গিত থাকবে। যেমন– মুবতাদার মধ্যে কাফিরদের অবাধ্যাচারণের কথা থাকবে, যার ফলে খবরে সেই কাফিরদের শাস্তির বিষয় আলোচিত হবে, এমন একটা অনুমান আমরা ইসমে মাওসূল ও সিলার সাহায্যে যে মুবাতাদা হয়েছে তার থেকেই পেয়ে যাব।

قَوْلُهٗ اِلٰى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ : এখান থেকে সামনের কতটুকু ইবারতের মধ্যে وَجْهٌ শব্দের তাহকীক ও ব্যবহার দেখানো হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, وَجْهٌ শব্দের অর্থ এখানে جِهَةٌ বাংলায় যার অর্থ হচ্ছে পথ; পদ্ধতি; ধরন ও রকম ইত্যাদি। আবার وَجْهٌ শব্দের অর্থ– عِلَّةٌ ও سَبَبٌ ও ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে সে অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

মুসান্নিফ (র.) প্রথম অর্থে وَجْهٌ-এর ব্যবহার দেখাচ্ছেন, যেমন– বলা হয়ে থাকে عَمِلْتُ هٰذَا الْعَمَلَ عَلٰى وَجْهِ عَمَلِكَ অর্থাৎ আমি এ কাজটি তোমার কাজের ধরনে করেছি অর্থাৎ তোমার কাজ যে ধরনের ও পদ্ধতির আমার কাজটিও সেরূপই হয়েছে।

মোটকথা, ইসমে মাওসূল এবং সিলার সাহায্যে মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করত খবরের প্রকৃতি ও ধরনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। অর্থাৎ খবরটি শাস্তির বিষয়ে বা ছওয়াবের বিষয়ে কিংবা প্রশংসা জাতীয় ও নিন্দাসূচক ইত্যাদির নির্দেশ ইসমে মাওসূল ও সিলাহ দ্বারা গঠিত মুবতাদা থেকেই পাওয়া যাবে। যেমন– اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ (নিশ্চয় যারা

আমার ইবাদত করতে অহঙ্কার বোধ করে) আয়াতের اَلَّذِيْنَ হলো ইসমে মাওসূল يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ হলো তার সিলাহ। উভয়ে মিলে إِنَّ-এর ইসম তথা মুসনাদ ইলাইহ। পাঠক লক্ষ্য করলেই অনুধাবন করতে পারবে যে, উক্ত মুসনাদ ইলাইহের খবর গঠিত হবে শাস্তি এবং অপমানজনক বিষয় দ্বারা। কেননা, আল্লাহ তা'আলার সাথে অবাধ্যতার পরিণতি হচ্ছে শাস্তি ও স্থায়ী লাঞ্ছনা। অতএব, যারা এমন করেছেন তারা আজাব ও শাস্তির মুখোমুখি হবে। তাইতো আমরা দেখতে পেলাম, উপরোক্ত মুসনাদ ইলাইহের খবর বা মুসনাদ রূপে سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ (অচিরেই তারা দোজখে অপমানিত অবস্থায় প্রবেশ করবে)।

قَوْلُهُ وَمِنَ الْخَطَاِ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরের বাক্যস্থিত وَجْه-এর অর্থ অনেকে سَبَبْ ও عِلَّةْ দ্বারা করেন। তিনি বলেন, এখানে এরূপ অর্থ নেওয়া সঠিক নয়। যদিও وَجْه-এর এ অর্থও প্রচলিত আছে। কেননা ইল্লত ও সববের অর্থ সব স্থানে চলে না। উক্ত আয়াতের اِسْتِكْبَارْ যদিও শাস্তির ইল্লত; তদ্রূপ হযরত শুয়ায়েব (আ.)-কে অস্বীকার করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ ও ইল্লত সামনে আগত কবিতার চরণ।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো মুসনাদ ইলাইহ ইসমে মাওসূল দ্বারা مَعْرِفَةْ করা হয় খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। অর্থাৎ ইসমে মাওসূলের ব্যবহার দ্বারাই খবর কি প্রকৃতির শাস্তি সম্পর্কিত, নাকি প্রশংসাসূচক বা পুরস্কার সম্পর্কিত ইত্যাদি, তা বুঝা যাবে।

যেমন (মুসনাদ ইলাইহ হচ্ছে) إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ এর দ্বারাই খবর কি ধরনের হবে তা অনুমান করা যাচ্ছে। এরপর খবর এসেছে سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ الخ

ثُمَّ إِنَّهُ اَيِ الْاِيْمَاءَ اِلٰى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ لَا مُجَرَّدُ جَعْلِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ مَوْصُوْلًا كَمَا سَبَقَ اِلٰى بَعْضِ الْاَوْهَامِ رُبَّمَا يُجْعَلُ ذَرِيْعَةً اَيْ وَسِيْلَةً اِلَى التَّعْرِيْضِ بِالتَّعْظِيْمِ لِشَانِهِ اَيْ لِشَانِ الْخَبَرِ نَحْوُ شِعْرُ اِنَّ الَّذِيْ سَمَكَ السَّمَاءَ اَيْ رَفَعَ السَّمَاءَ بَنٰى لَنَا * بَيْتًا اَرَادَ بِهِ الْكَعْبَةَ اَوْ بَيْتَ الشَّرَفِ وَالْمَجْدِ دَعَائِمُهُ اَعَزُّ وَاَطْوَلُ مِنْ دَعَائِمِ كُلِّ بَيْتٍ فَفِيْ قَوْلِهٖ اِنَّ الَّذِيْ سَمَكَ السَّمَاءَ اِيْمَاءٌ اِلٰى اَنَّ الْخَبَرَ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ اَمْرٌ مِنْ جِنْسِ الرِّفْعَةِ وَالْبِنَاءِ عِنْدَ مَنْ لَهٗ ذَوْقٌ سَلِيْمٌ ثُمَّ فِيْهِ تَعْرِيْضٌ بِتَعْظِيْمِ شَانِ بِنَاءِ بَيْتِهٖ لِكَوْنِهٖ فِعْلَ مَنْ رَفَعَ السَّمَاءَ الَّتِيْ لَابِنَاءَ اَعْظَمُ مِنْهَا وَ اَرْفَعُ ـ

অনুবাদ : **অতঃপর নিশ্চয় এটি** অর্থাৎ খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা শুধুমাত্র মুসনাদ ইলাইহ ইসমে মাওসূল বানানো নয়, যেমনটি অনেক লোক ভেবে থাকেন। **কখনো খবরের বিরাট মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের মাধ্যম বা অসিলা করা হয়।**

কবিতার চরণ (অনুবাদ) : **যিনি আকাশকে সুউচ্চে স্থাপন করেছেন, তিনি আমাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন।** তিনি এর দ্বারা কা'বাঘর অথবা সম্মান ও মর্যাদার ঘরের ইচ্ছা করেছেন, **যার স্তম্ভগুলো বাড়ি-ঘরের স্তম্ভের চেয়ে সুদীর্ঘ এবং শক্তিশালী।** এখানে اِنَّ الَّذِيْ سَمَكَ السَّمَاءُ-এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, খবরটির মধ্যে নির্মাণ এবং সুউচ্চতার কোনো কথা থাকবে, এ কথা সাহিত্য রুচির যে কোনো ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারবে। অতঃপর কবিতায় (কবির) বাড়ির মর্যাদার প্রতি এক প্রকার ইঙ্গিত হয়ে যাচ্ছে। কেননা, এ ঘরটি এমন হাতের তৈরি যিনি সুউচ্চ আকাশ নির্মাণ করেছেন, যার চেয়ে উঁচু ও বৃহৎ কোনো নির্মিত জিনিস নেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ اِنَّ الَّذِيْ سَمَكَ السَّمَاءُ الخ : এবং তার পরবর্তী চরণ اِنَّ الَّتِيْ ضَرَبَتْ بَيْتًا مُهَاجِرَةً এমন হয়নি। প্রথমোক্ত চরণে سَمَكَ السَّمَاءُ ইল্লত হয়নি بِنَاءَ بَيْتٍ-এর জন্যে এবং ২য় চরণে ضَرْبِ بَيْتٍ ইল্লত হয়নি زَوَالْ مُحَبَّتْ-এর জন্য। অতএব, وجه-এর অর্থ ইল্লত করা যেহেতু সব স্থানে প্রযোজ্য হয় না, তাই وَجْه-এর অর্থ ইল্লত দ্বারা করা সঠিক হবে না।

قَوْلُهٗ ثُمَّ اِنَّهٗ اَيِ الْاِيْمَاءُ : উল্লিখিত ইবারত দ্বারা ইসমে মাওসূলের আরেকটি ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। পেছনের পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, ইসমে মাওসূল দ্বারা খবরের প্রকৃতি সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়। এখানে বলা হচ্ছে- সেই ইঙ্গিতের সাথে কখনো খবরের মর্যাদা ও মহত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।

মুসান্নিফ (র.) প্রথমে اِنَّهٗ-এর সর্বনামের বিশেষ্য কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এর مَرْجِعْ (বিশেষ্য) হলো اَلْاِيْمَاءُ اِلٰى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ মুসনাদ ইলাইহ ইসমে মাওসূল আনা এ সর্বনামের مَرْجِعْ নয়। দ্বিতীয় মতটিকে কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে আল্লামা খালখালীও রয়েছেন।

মূল লেখক উক্ত প্রকারের উদাহরণ হিসেবে কবি ফারাযদাকের একটি কবিতা এনেছেন। তিনি এটি কবি জারীরের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য রচনা করেছেন। কবি ফারাযদাক আরবের শ্রেষ্ঠ গোত্র কুরাইশের বংশোদ্ভূত ছিলেন। পক্ষান্তরে জারীর ছিলেন বনু তামীম গোত্রের অধিবাসী।

কবিতার চরণ : اِنَّ الَّذِيْ سَمَكَ السَّمَاءَ بَنٰى لَنَا * بَيْتًا دَعَائِمُهٗ اَعَزُّ وَ اَطْوَلُ

যে সত্তা আকাশকে সুউচ্চে নির্মাণ করেছেন, তিনি আমাদের জন্য এমন এক ঘর তৈরি করেছেন, যার স্তম্ভ ও খুঁটিগুলো সুমহান এবং সুদীর্ঘ।

যে কোনো সাহিত্যরসিক কবিতার প্রথম লাইনটি (ইসমে মাওসূল এবং সিলাহ মিলে মুবতাদা) দেখা মাত্র অনুধাবন করতে পারবে যে, খবরটিতেও সুউচ্চতা এবং নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়টি ছাড়া মুবতাদা দ্বারা এখানে খবরের উঁচু মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা এভাবে যে, তিনি এমন সত্তা যার প্রতিটি কাজ মহৎ ও বিশাল। সুতরাং আমাদের এই ঘরও মহান ও আযীমুশশান হবে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, এখানে খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিতের সাথে সাথে খবরের বিশালতার যে ইঙ্গিত এখানে রয়েছে তা মূলত বাগদাদ। اَلَّذِىْ (ইসমে মাওসূল)-এর সাথে سَمَكَ السَّمَاءَ-এর যুক্ত হওয়ার কারণে। কেননা, যদি এর পরিবর্তে অন্য কোনো বাক্য নেওয়া হতো যেমন- اِنَّ الَّذِىْ بَنٰى بَيْتًا بَنٰى لَنَا بَيْتًا বলা হলে খবর যে আযীমুশশান একথা বুঝা যায় না, যদিও ইসমে মাওসূল এবং সিলাহ দ্বারা খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

قَوْلُهٗ دَعَائِمُهٗ اَعَزُّ وَاَطْوَلُ : دَعَامَةٌ-এর বহুবচন হচ্ছে دَعَائِمُ অর্থ- খুঁটি। কবিতায় بَيْتًا দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়- ১. কা'বা শরীফ, ২. সম্মান ও মর্যাদার ঘর। প্রথম মতানুসারে কা'বা শরীফ দ্বারা গর্ব করা হয়েছে। কা'বা ফারাযদাকের বসতির নিকটে ছিল বলে, তা ছাড়া ফারাযদাকের সম্প্রদায়ের লোকেরা কা'বার খিদমতে নিয়োজিত ছিল। অথচ জারীরের গোত্রের এ দু'টি মর্যাদার কোনোটি হাসিল ছিল না। কবি জারীর মুসলমান ছিলেন, তাই ফারাযদাকের কা'বা নিয়ে গর্ব উপরোক্ত দু'টি কারণে। যদিও মুসলমান হওয়ার ভিত্তিতে কা'বা সব মুসলমানের গর্ব ও আত্ম গৌরবের প্রতীক।

আর ২য় মতানুসারে কবিতার মর্মার্থ হলো, কুরাইশী হওয়ার কারণে ফারাযদাকের বংশের লোকদের আল্লাহ তা'আলা বিরাট প্রতিপত্তি ও উত্তম মর্যাদা দান করেছেন, যা জারীরের বংশের লোকদের মাঝে অনুপস্থিত।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিতকে খবরের মর্যাদার বুঝানোর মাধ্যম বানানো হয়। যেমন-

اِنَّ الَّذِىْ سَمَكَ السَّمَاءَ بَنٰى لَنَا * بَيْتًا دَعَائِمُهٗ اَعَزُّ وَ اَطْوَلُ

কবিতার এ পঙ্ক্তির প্রথম লাইন শোনা বা দেখা মাত্র যে কোনো সাহিত্য রসিক অনুধাবন করতে পারবে যে, এর দ্বিতীয় লাইনে সুউচ্চ নির্মাণ সংক্রান্ত কোনো কথা থাকবে।

اَوْ ذَرِيْعَةً اِلَى تَعْظِيْمِ شَانِ غَيْرِهٖ اَىْ غَيْرِ الْخَبَرِ نَحْوُ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخَاسِرِيْنَ فَفِيْهِ اِيْمَاءٌ اِلَى اَنَّ الْخَبَرَ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ مِمَّا يُنْبِئُ عَنِ الْخَيْبَةِ وَالْخُسْرَانِ وَتَعْظِيْمٍ لِشَانِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ رُبَّمَا يُجْعَلُ ذَرِيْعَةً اِلَى الْاِهَانَةِ لِشَانِ الْخَبَرِ نَحْوُ اِنَّ الَّذِىْ لَايُحْسِنُ مَعْرِفَةَ الْفِقْهِ قَدْ صَنَّفَ فِيْهِ كِتَابًا اَوْ لِشَانِ غَيْرِهٖ نَحْوُ اِنَّ الَّذِىْ يَتَّبِعُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ خَاسِرٌ ـ

অনুবাদ : **অথবা** (খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত) **খবর ভিন্ন অন্য বিষয়ের** মহত্ত্ব বুঝানোর মাধ্যম বানানো হয়। যেমন– اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخَاسِرِيْنَ (অর্থাৎ **যারা শু'আইব** (আ.)-কে **মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত**।) এ আয়াতের ইসমে মাউসূল ও সিলাহ দ্বারা গঠিত মুসনাদ ইলাইহতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, খবর গঠিত হয়েছে এমন বিষয় দ্বারা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও ব্যর্থতার কথা থাকবে এবং (সেই সাথে) শু'আইব (আ.)-এর সুমহান মর্যাদার কথাও। আবার কখনো একে খবরের অমর্যাদার প্রতি ইঙ্গিতের মাধ্যম বানানো হয়। যেমন– اِنَّ الَّذِىْ لَايُحْسِنُ مَعْرِفَةَ الْفِقْهِ قَدْ صَنَّفَ فِيْهِ كِتَابًا (অর্থাৎ যে ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পর্কে ভালো অবগত নয়– সে এ বিষয়ে কিতাব লিখেছে।) অথবা খবর ব্যতীত অন্য বিষয়ের মর্যাদা খাটো করার মাধ্যম করা হবে। যেমন– নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শয়তানের অনুকরণ করে সে ক্ষতিগ্রস্ত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ اَوْ ذَرِيْعَةً اِلَى تَعْظِيْمِ : মুসনাদ ইলাইহ ইসমে মাওসূল দ্বারা নির্দিষ্ট করত খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত দানের মাধ্যমে কখনো খবর ভিন্ন অন্য বিষয়ের মর্যাদার কথা বুঝানো হয়। এর উদাহরণ হলো–

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخَاسِرِيْنَ

উক্ত আয়াতে ইসমে মাওসূল (اَلَّذِيْنَ) এবং সিলাহ (كَذَّبُوْا شُعَيْبًا) মিলে মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে যা এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, খবরের মধ্যে আশাহত হওয়ার ও ব্যর্থতার কথা থাকবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলার নবীর বিরুদ্ধাচরণ ক্ষতি ও ব্যর্থতাই ডেকে আনে। এর সাথে সাথে আয়াতে হযরত শু'আইব (আ.)-এর সুমহান মর্যাদার কথাও জানা গেল। এভাবে যে, যার বিরুদ্ধাচরণ ক্ষতির কারণ তিনি সাধারণ কোনো মানুষ নন; বরং তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুসনাদ ইলাইহ (ইসমে মাওসূল ও সিলাহ) খবরের প্রকৃতি সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদানের সাথে সাথে একে খবরের মর্যাদাহীনতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন– اِنَّ الَّذِىْ لَا يُحْسِنُ مَعْرِفَةَ الْفِقْهِ قَدْ صَنَّفَ فِيْهِ كِتَابًا এ উদাহরণে ইসমে মাওসূল (الذى) এবং সিলাহ (لَايُحْسِنُ مَعْرِفَةَ الْفِقْهِ) মিলে মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে যা তার পরবর্তীতে আগমনকারী খবরের প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, খবরটা ফিক্‌হ সংক্রান্ত কোনো বিষয় হবে। যেমন– ফিক্‌হশাস্ত্র সংকলন করে কিতাব লিখবে। কিন্তু মুবতাদার মধ্যে এমন একটি ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তার সংকলন ভালো হবে না। কেননা, যখন সে ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ তখন তার থেকে আর কতটুকুই ভালো রচনা আসতে পারে, এটাই তার মর্যাদাহীনতা। কেননা, জ্ঞান যেমনি মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, তেমনি মূর্খতা ও অপারগতা মানুষের মর্যাদাকে খাটো করে। মুসান্নিফ বলেন, কখনো এর মধ্যে খবর ছাড়া অন্য বিষয়ের অমর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে। যেমন– اِنَّ الَّذِىْ يَتَّبِعُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ خَاسِرٌ এ বাক্যে (اَلَّذِىْ) ইসমে মাওসূল ও (يَتَّبِعُ الشَّيْطَانَ) সিলাহ মিলিতভাবে খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, খবরটিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও পরিণামে ব্যর্থতার কথা থাকবে, সেই সাথে শয়তানের তুচ্ছতা ও চরম লাঞ্ছনার কথাও এতে রয়েছে। কারণ, যার অনুকরণ করলে ক্ষতি হয় এবং ব্যর্থতার শিকার হতে হয় সে অবশ্যই চরম নিকৃষ্ট।

সার-সংক্ষেপ : ইসমে মাওসূল ও সিলাহ দ্বারা গঠিত মুসনাদ ইলাইহ কখনো খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত দানের সাথে সাথে খবর ব্যতীত অন্য কিছুর সম্মান বুঝায়, আবার কখনো খবরের অসম্মানও বুঝায়।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ– اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخَاسِرِيْنَ এ উদাহরণে হযরত শু'আইব (আ.)-এর সম্মান প্রকাশ পেয়েছে, তিনি ইবারতে خَبَرٌ নন। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ– اِنَّ الَّذِىْ لَايُحْسِنُ مَعْرِفَةَ الْفِقْهِ قَدْ صَنَّفَ فِيْهِ كِتَابًا

কখনো خَبَرٌ ব্যতীত অন্য বিষয়ের তুচ্ছতা বুঝায়। যেমন– اِنَّ الَّذِىْ يَتَّبِعُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ خَاسِرٌ এ উদাহরণে শয়তানের তুচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে, শয়তান এখানে خَبَرٌ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

وَقَدْ يُجْعَلُ ذَرِيْعَةً اِلَى تَحْقِيْقِ الْخَبَرِ اَىْ جَعْلِهِ مُحَقَّقًا ثَابِتًا نَحْوُ اِنَّ الَّتِى ضَرَبَتْ بَيْتًا مُهَاجِرَةً * بِكُوْفَةِ الْجُنْدِ غَالَتْ وُدَّهَا غَوْلُ، فَاِنَّ فِىْ ضَرْبِ الْبَيْتِ بِكُوْفَةِ الْجُنْدِ وَالْمُهَاجَرَةِ اِلَيْهَا اِيْمَاءً اِلَى اَنَّ طَرِيْقَ بِنَاءِ الْخَبَرِ مِمَّا يُنْبِئُ عَنْ زَوَالِ الْمَحَبَّةِ وَانْقِطَاعِ الْمَوَدَّةِ ثُمَّ اِنَّهُ يُحَقِّقُ زَوَالَ الْمَحَبَّةِ وَيُقَرِّرُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ بُرْهَانٌ عَلَيْهِ وَهٰذَا مَعْنٰى تَحْقِيْقِ الْخَبَرِ وَهُوَ مَفْقُوْدٌ فِىْ مِثْلِ اِنَّ الَّذِىْ سَمَكَ السَّمَاءَ اِذْ لَيْسَ فِىْ رَفْعِ اللّٰهِ تَعَالٰى السَّمَاءَ تَحْقِيْقٌ وَ تَثْبِيْتٌ لِبِنَائِهِ لَهُمْ بَيْتًا فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْاِيْمَاءِ وَتَحْقِيْقِ الْخَبَرِ -

অনুবাদ : কখনো একে খবরের নিশ্চয়তার উসিলা বানানো হয়। অর্থাৎ খবরটিকে নিশ্চিত ও অলজ্ঘনীয় করা হয়। যেমন কবিতার চরণ : (অনুবাদ) যে নারী দেশ ত্যাগ করে কুফাতুল জুনদে বসতি স্থাপন করেছে, তার ভালোবাসাকে ভূতপ্রেত (অশুভ শক্তি) নিঃশেষ করে দিয়েছে। কুফাতুল জুনদে বসতি স্থাপন এবং সেখানে দেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, খবরটি গঠিত এমন বিষয় দ্বারা, যাতে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা কেটে যাওয়ার এবং মুছে যাওয়ার কথা থাকবে। অতঃপর তা ভালোবাসা শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে নিশ্চিত মজবুত করেছে। এমনকি এটা যেন (ভালোবাসা শেষ হয়ে যাওয়ার) দলিল। খবরটি সুনিশ্চিত হওয়ার ব্যাখ্যা এটাই। আর এটা اِنَّ الَّذِىْ سَمَكَ السَّمَاءَ-এর মাঝে অনুপস্থিত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সুউচ্চে আকাশ স্থাপন করাতে তাদের বাড়ি নির্মাণের নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং ইঙ্গিত ও খবরের নিশ্চয়তা এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقَدْ يُجْعَلُ ذَرِيْعَةً الخ : মুসান্নিফ বলেন, যখন ইসমে মাওসূল ও সিলার সাহায্যে গঠিত মুসনাদ ইলাইহ দ্বারা খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, উক্ত ইঙ্গিতকে খবরের নিশ্চয়তা বুঝানোর উসিলা বা মাধ্যম বানানো হয়। যেমন–

اِنَّ الَّتِىْ ضَرَبَتْ بَيْتًا مُهَاجِرَةً * بِكُوْفَةِ الْجُنْدِ غَالَتْ وُدَّهَا غَوْلُ

কবিতার ضَرَبَتْ بَيْتًا-এর অর্থ– বসতি স্থাপন করল। مُهَاجِرَةً বাক্যে حَالٌ হয়েছে। كُوْفَةُ الْجُنْدِ (স্থানের নাম) হরফে জারের মাধ্যমে ضَرَبَتْ-এর মাফউল হয়েছে। غَالَتْ এখানে اَكَلَتْ-এর অর্থে যার অর্থ খেয়ে ফেলা ও গ্রাস করা। غَوْلٌ শব্দের অর্থ– ভূত-প্রেত বা অশুভ শক্তি। কবিতার اَلَّتِىْ শব্দটি ইসমে মাওসূল, ضَرَبَتْ .... اَلْجُنْدِ মিলে তার সিলাহ। ইসমে মাওসূল এবং সিলাহ মিলে মুবতাদা (মুসনাদ ইলাইহ) তার খবরের প্রকৃতির (ভালোবাসা ও আন্তরিকতা টুটে যাওয়ার) প্রতি ইঙ্গিত করছে। তাইতো আমরা খবর (غَالَتْ وُدَّهَا غَوْلُ)-এর মধ্যে সেই অর্থই পাচ্ছি। আবার মুবতাদার বক্তব্য খবরের অর্থকে শক্তিশালী করছে। তা এভাবে যে, খবর হলো ভালোবাসা নিঃশেষ হওয়া। মুবতাদার মধ্যে প্রেমাস্পদের বাড়ি ছেড়ে দূর দেশে বসতি স্থাপন করা এ বক্তব্য দ্বারা ভালোবাসা নিঃশেষ হওয়ার বিষয়টি মজবুত হচ্ছে। কেননা, দূরদেশে বসতি স্থাপন করা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে তার নিজ দেশ এবং দেশের লোকজনের প্রতি তার ভালোবাসা নেই। কেননা, ভালোবাসা থাকলে সে নিজ দেশ ছেড়ে যেত না। তার দেশের লোকদের সাথে বাঁধন ছুটে গেছে বলেই সে দূর দেশে চলে যাচ্ছে।

মুসান্নিফ বলেন ضَرَبَتْ بَيْتًا এই অংশটি খবরের বক্তব্যকে এমনভাবে মজবুত করছে যেন এটি খবরের জন্য দলিল হয়ে গেছে। অর্থাৎ তার দূরদেশে বসতি স্থাপন যেন বিরহের দলিল।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটাই হচ্ছে تَحْقِيْقُ خَبَرٍ-এর অর্থ

قَوْلُهُ وَهٰذَا مَعْنٰى تَحْقِيْقِ الْخَبَرِ وَهُوَ مَفْقُوْدٌ فِىْ مِثْلِ اِنَّ الَّذِىْ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পরবর্তী কবিতা اِنَّ الَّذِىْ سَمَكَ-এর মধ্যে تَحْقِيْقِ خَبَرٍ-এর অর্থ পাওয়া যায় না। কেননা, সেখানে سَمَكَ السَّمَاءَ আল্লাহ তা'আলার আকাশকে

সুউচ্চে স্থাপন করা তাদের জন্য বাড়ি নির্মাণ করার কারণ নয় এবং দলিলও নয়। সুতরাং তাদের বাড়ি বানানোর খবরটিকে তা নিশ্চিত করছে না এবং খবরের বক্তব্যকে শক্তিশালীও করছে না। فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِيمَاءِ وَتَحْقِيقِ الْخَبَرِ

মুসান্নিফ বলেন, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা إِيمَاءٌ إِلَى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ এবং تَحْقِيقِ الْخَبَرِ-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। আর তা হলো إِيْمَاءٌ-এর মধ্যে শুধুমাত্র খবরের ধরন কিরূপ হবে তার নির্দেশনা থাকে; কিন্তু تَحْقِيْقِ خَبَرٌ-এর খবরের ধরনের নির্দেশনার সাথে খবরটি যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নিশ্চিত ঘটেছে তার ইঙ্গিত থাকে। বরং বলতে গেলে খবরটি যে নিশ্চিত ঘটেছে এর জন্য মুসনাদ ইলাইহ দলিল হয়ে থাকে। যেমন উপরের কবিতায় ضَرْبِ بَيْتٍ তার زَوَالْ مُحَبَّتٌ-এর জন্য দলিল ছিল; কিন্তু শুধুমাত্র إِيْمَاءٌ-এর মধ্যে এ কথাটি নেই। যেমন পূর্ববর্তী কবিতা سَمَكَ السَّمَاءَ তাদের জন্য বাড়ি নির্মাণের কারণ ও দলিল নয়।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো ইসমে মাওসূল ও সিলাহ সম্মিলিতভাবে মুসনাদ ইলাইহরূপে ব্যবহৃত হয়ে খবরের প্রকৃতি সম্পর্কে সংবাদ দানের সাথে সাথে খবরের নিশ্চয়তা বুঝায় এবং খবর সংঘটিত হওয়ার দলিল হয়। যেমন–

إِنَّ الَّتِي ضَرَبَتْ بَيْتًا مُهَاجِرَةً * بِكُوفَةِ الْجُنْدِ غَالَتْ وُدَّهَا غُوْلٌ

এ কবিতার চরণে মুবতাদা অংশে দেশত্যাগ ও প্রবাসে বসতি স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। আর খবর অংশে ভালোবাসা ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং মুবতাদা খবরের বক্তব্যকে মজবুত করল। কারণ, দেশত্যাগ করা ভালোবাসা ছিন্ন হওয়ার দলিল। মুসান্নিফ (র.) বলেন, اَلْإِيمَاءُ إِلَى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ এবং تَحْقِيْقُ الْخَبَرِ এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল। কেননা, إِيْمَاءٌ-এর মাঝে تَحْقِيْقُ الْخَبَرِ-এর বিষয়টি নেই। যেমন পূর্ববর্তী কবিতা إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ-এর মধ্যে تَحْقِيْقُ الْخَبَرِ পাওয়া যায় না।

وَبِالْاِشَارَةِ اَىْ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِاِيْرَادِهِ اِسْمَ الْاِشَارَةِ لِتَمَيُّزِهِ اَيِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ اَكْمَلَ تَمِيْزٍ لِغَرَضٍ مِنَ الْاَغْرَاضِ نَحْوُ قَوْلِهِ ع هٰذَا اَبُو الصَّقْرِ فَرْدًا نَصَبَ عَلَى الْمَدْحِ اَوْ عَلَى الْحَالِ فِىْ مَحَاسِنِهِ * مِنْ نَسْلِ شَيْبَانَ بَيْنَ الضَّالِّ وَالسَّلَمِ * وَهُمَا شَجَرَتَانِ بِالْبَادِيَةِ يَعْنِىْ يُقِيْمُوْنَ بِالْبَادِيَةِ لِاَنَّ فَقْدَ الْعِزِّ فِى الْحَضَرِ ـ

অনুবাদ : এবং ইশারা দ্বারা অর্থাৎ ইসমে ইশারা ব্যবহার করার দ্বারা **মুসনাদ ইলাইহকে যে কোনো উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা হয় যাতে** মুসনাদ ইলাইহ **সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও চিহ্নিত হয়**। যেমন কবির কবিতার চরণ : (অনুবাদ) **এই আবুস্ সাকার উত্তম গুণাবলিতে অদ্বিতীয়**। فَرْدًا এতে মানসূব হয়েছে প্রশংসাসূচক ফে'লের (মাফউলের) ভিত্তিতে, নয়তো হালের ভিত্তিতে। সে দাল এবং সালামের মধ্যবর্তী গোত্র শায়বানের বংশোদ্ভূত। (দাল এবং সালাম) এগুলো জঙ্গলের দু'টি বৃক্ষ। অর্থাৎ তারা উপত্যকায় বাস করে। কেননা, শহুরে জীবনে মর্যাদাহানি হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَبِالْاِشَارَةِ اَىْ تَعْرِيْفُ الخ : মূল লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহের একটি অবস্থা হলো মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারার সাহায্যে নির্দিষ্ট করা। এর দ্বারা মুসনাদ ইলাইহ সবচেয়ে উত্তম পন্থায় চিহ্নিত হয়। ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হলে মুসনাদ ইলাইহের ব্যাপারে আর কোনো অস্পষ্টতা থাকে না। আর এভাবে নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তমরূপে প্রশংসা করা। যেমন নিম্নের কবিতার চরণে করা হয়েছে–

هٰذَا اَبُو الصَّقْرِ فَرْدًا فِىْ مَحَاسِنِهِ * مِنْ نَسْلِ شَيْبَانَ بَيْنَ الضَّالِّ وَالسَّلَمِ

فَرْدًا শব্দটি মানসূব, মাফউল হিসেবে অথবা حال হিসেবে। মাফউল হলে এর আমেল হলো اَمْدَحُ অথবা اَعْنِىْ উহ্য ফে'ল যা প্রশংসার অর্থ প্রদান করে। অথবা (اَبُو الصَّقْرِ) যুলহাল فَرْدًا হলো হাল। তারকীবের মধ্যে اَبُو الصَّقْرِ হচ্ছে هٰذَا মুবতাদার খবর। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, যুলহালের জন্য ফায়েল অথবা মাফউল হওয়া জরুরি। কিন্তু এখানে তো ফে'লের অস্তিত্বই অনুপস্থিত, তাহলে হালের তারকীব কিভাবে সম্ভব? এর জওয়াব হলো, اَبُو الصَّقْرِ অর্থগতভাবে মাফউল হয়েছে ইসমে ইশারার কারণে অথবা هاء তাম্বীহের কারণে, কেননা ইসমে ইশারাতে اُشِيْرُ-এর অর্থ এবং هَاءُ তাম্বীহে اُنَبِّهُ-এর অর্থ রয়েছে। অতএব, فَرْدًا অর্থগতভাবে মাফউল থেকে হাল হয়েছে। সুতরাং এখন কোনো আপত্তি বাকি নেই।

مَحَاسِنُ শব্দটি مَحْسَنٌ-এর বহুবচন। مَحْسِنٌ এখানে حُسْنٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য মতে এটি حُسْنٌ-এর বহুবচন خِلَافُ قِيَاسٍ হিসেবে। এর অর্থ শারীরিক সৌন্দর্য, উত্তম চরিত্র। شيبان এক ব্যক্তির নাম। তার নামে তার অধস্তন বংশধরেরা শায়বানী নামে পরিচিত হয়। এক সময় এটি গোত্রের নামে পরিচিত হয়ে যায়। ضَالٌ বন্যকূল গাছ। سَلَمٌ মরুভূমির এক প্রকার কাটাবিশিষ্ট গাছ। উভয় ধরনের গাছ বনে-জঙ্গলে হয়ে থাকে, এখানে উভয় প্রকার বৃক্ষের মধ্যবর্তী জায়গার দ্বারা উপত্যকা উদ্দেশ্য।

এ কবিতায় মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার প্রশংসা করার জন্য। কেননা, যখন একটি বস্তুকে ইসমে ইশারার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা হবে, তখন এর প্রশংসা যথার্থরূপে হবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এই আবুস সাকার যে গুণাবলিতে অদ্বিতীয় এবং শায়বান বংশোদ্ভূত, সে বন্যকূল বন ও সালামবনের মধ্যবর্তী উপত্যকায় বাস করে। কেননা, শহুরে জীবনে প্রতিষ্ঠার অভাবে তার মর্যাদার হানি হয়।

اَوِ التَّعْرِيْضِ بِغَبَاوَةِ السَّامِعِ حَتّٰى كَاَنَّهٗ لَايُدْرِكُ غَيْرَ الْمَحْسُوْسِ كَقَوْلِهٖ
اُولٰئِكَ اٰبَائِىْ فَجِئْنِىْ بِمِثْلِهِمْ * اِذَا جَمَعْتَنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ اَوْ بَيَانِ حَالِهٖ اَىِ الْمسندِ
اِلَيْهِ فِى الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ اَوِ التَّوَسُّطِ كَقَوْلِكَ هٰذَا وَ ذٰلِكَ اَوْ ذَاكَ زَيْدٌ وَاَخَّرَ ذِكْرَ التَّوَسُّطِ لِاَنَّهٗ
اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الطَّرْفَيْنِ وَاَمْثَالُ هٰذِهِ الْمَبَاحِثِ يَنْظُرُ فِيْهَا اَهْلُ اللُّغَةِ مِنْ
حَيْثُ اَنَّهَا تُبَيِّنُ اَنَّ هٰذَا مَثَلًا لِلْقَرِيْبِ وَ ذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ وَ ذٰلِكَ لِلْبَعِيْدِ وَعِلْمُ الْمَعَانِىْ
مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ اِذَا اُرِيْدَ قُرْبُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ يُؤْتٰى بِهٰذَا وَهُوَ زَائِدٌ عَلٰى اَصْلِ الْمُرَادِ الَّذِىْ هُوَ
الْحُكْمُ عَلَى الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ الْمَذْكُوْرِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِشَيْءٍ يُوْجِبُ تَصَوُّرَهٗ عَلٰى اَىِّ وَجْهٍ كَانَ ـ

অনুবাদ : **অথবা** (ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়) **শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি কটাক্ষ করার জন্য।** যেন সে অনুভূতির বাইরের বিষয়কে অনুধাবন করতে পারে না। **যেমন– কবির কবিতার চরণ :** (অনুবাদ) **এরা হচ্ছে** আমার পূর্বপুরুষ হে জারীর! সভা-সমাবেশগুলো যখন আমাদের জমায়েত করে সম্ভব হলে তাদের ন্যায় মর্যাদাবান লোক তুমি হাজির করো। **অথবা মুসনাদ ইলাইহের অবস্থান তথা নিকটে, দূরে এবং মাঝখানে বর্ণনা করার জন্য। যেমন– তুমি বললে এই, ঐ এবং এই যে যায়েদ।** মধ্যবর্তী ইসমে ইশারার উল্লেখ পরে করেছেন। কেননা, তার অবস্থান নির্ণয় উভয় পার্শ্বের (নিকটবর্তী ও দূরবর্তী) অবস্থান নির্ণয়ের পর করা যায়। এ জাতীয় অধ্যায়গুলোতে অভিধানশাস্ত্রবিদগণ এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেন যে, অভিধান বর্ণনা করে– উদাহরণস্বরূপ هٰذَا নিকটবর্তী (ইশারার) জন্য, ذَاك মধ্যবর্তীর জন্য এবং ذٰلِكَ দূরবর্তীর জন্য। ইলমুল মা'আনী এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে, যখন মুসনাদ ইলাইহের নিকটবর্তী অবস্থান ইচ্ছা করা হয়, ইসমে ইশারা তখন هٰذَا দ্বারা আনা হয়, এ বিষয়টি আসল অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত। আসল অর্থ তো উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহের ব্যাপারে যে কোনো হুকুম দেওয়া এবং এমন বিষয় দ্বারা ব্যক্ত করা যা তার প্রতিচ্ছবিকে সাব্যস্ত করে, তা যে কোনোভাবেই হোক না কেন?

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ اَوِ التَّعْرِيْضِ بِغَبَاوَةِ الخ : উক্ত ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করার অপরাপর কারণগুলোর মধ্যে দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। ১. ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয়, শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি কটাক্ষ করার জন্য। অর্থাৎ শ্রোতা এতটা নির্বোধ ও বোকা যে, সে পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা যা বুঝা যায় না, এমন কিছু অনুভব করতে পারে না, তাই তার জন্য ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয়। কারণ, ইসমে ইশারার উৎপত্তি হয়েছে অনুভূত বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। অতএব, তাকে ইসমে ইশারা দ্বারা বলা হলে সে সহজে বুঝে যাবে। যেমন কবি ফারাযদাক তার যুগের অপর বিখ্যাত কবি জারীরের প্রতি কটাক্ষ করার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারা দ্বারা বলেছেন।

اُولٰئِكَ اٰبَائِىْ فَجِئْنِىْ بِمِثْلِهِمْ * اِذَا جَمَعَتْنَا يَاجَرِيْرُ الْمَجَامِعُ

কবিতার উক্ত চরণে ফারাযদাক জারীরের প্রতি কটাক্ষ করার জন্য اولئك ইসমে ইশারা ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, জারীর এতটা বোকা ও মেধাহীন যে, তাকে ইসমে ইশারার সাহায্যে না বললে সে মেধাহীনতার কারণে মুসনাদ ইলাইহকে অনুধাবন করতে পারবে না। তাই জারীরকে বলছেন হে জারীর, চোখ কান খুলে দেখ, এই যে এরাই আমার বংশের মহৎ লোকেরা। ফারাযদাক যদি অমুক অমুক ও অমুক আমার বংশের লোক বলতেন, তাহলে জারীরের প্রতি উক্ত কটাক্ষ করা হতো না।

قَوْلُهُ أَوْ بَيَانُ حَالِهِ فِى الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ : মুসনাদ ইলাইহ কাছে, দূরে ও মাঝামাঝি, এর কোনো এক অবস্থায় আছে এ কথা বুঝানোর জন্য ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয়। মুসনাদ ইলাইহ কাছে আছে একথা বুঝানোর জন্য বলা হয় (যেমন-) هٰذَا زَيْدٌ। যদি মধ্যবর্তী কোনো স্থানে থাকে, তাহলে বলা হয় ذَاكَ زَيْدٌ আর যদি দূরে কোথাও থাকে, তাহলে বলা হয় ذٰلِكَ زَيْدٌ

قَوْلُهُ وَاَخَّرَ ذِكْرَ التَّوَسُّطِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, সিরিয়াল অনুসারে প্রথমে কাছে, এরপর মাঝে, এরপর দূরে এভাবে ইসমে ইশারার বর্ণনা দরকার ছিল। কিন্তু মূল লেখক এ সিরিয়ালের অনুসরণ না করে মধ্যবর্তী ইশারাকে দূরবর্তী ইশারার পরে কেন আনলেন?

এর **উত্তরে** মুসান্নিফ (র.) **বলেন,** تَوَسُّطْ হলো নিকট ও দূর-এর মাঝের স্থানের নাম। মধ্যবর্তী স্থানের অস্তিত্ব উভয় পার্শ্বের অবস্থান নির্ণয়ের পর হয়ে থাকে, তাই تَوَسُّطْ (মধ্যবর্তী)-এর উল্লেখ পরে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَمْثَالُ هٰذِهِ الْمَبَاحِثِ : এই ইবারত দ্বারাও একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, هٰذَا দ্বারা নিকটবর্তী ইঙ্গিত, ذَاكَ দ্বারা মধ্যবর্তী ইঙ্গিত এবং ذٰلِكَ দ্বারা দূরবর্তী ইঙ্গিত, এ সবের আলোচনা তো অভিধানশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ইলমে মা'আনীতে যে কোনো বিষয়ের মূল অর্থের বাইরে অতিরিক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লিখিত ইসমে ইশারার অর্থসমূহ বর্ণনা করা মূল (অভিধানগত) অর্থের আলোচনা। এগুলো মূল অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো অর্থ নয়। তাই বালাগাত বিশারাদগণ এ আলোচনায় কিভাবে নিজেদের নিয়োজিত করলেন?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, অভিধানশাস্ত্রবিদগণ শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করেন। যেমন (তারা বলেন,) هٰذَا নিকটবর্তী অর্থ দেয় ذٰلِكَ দূরবর্তীর অর্থ দেয় ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ইলমে মা'আনীর ইমামগণের বর্ণনার ধারা হলো, যখন মুসনাদ ইলাইহ নিকটবর্তী হয় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসনাদ ইলাইহের উক্ত অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়, তখন هٰذَا কে ব্যবহার করা হয়। এমনিভাবে যখন মুসনাদ ইলাইহ দূরবর্তী হয় এবং সেই দূরবর্তী মুসনাদ ইলাইহ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়, তখন ذٰلِكَ ব্যবহার করা হয়। এ ধারার বর্ণনা তার মূল অর্থ বর্ণনার মতো নয়; বরং এতে অতিরিক্ত অর্থ বিদ্যমান। মুসনাদ ইলাইহের ক্ষেত্রে আসল অর্থ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহের উপর যে কোনোভাবে মুসনাদের হুকুম দেওয়া– মুসনাদ ইলাইহ ইসমে মাওসূল, নামবাচক ও ইসমে ইশারা যাই হোক না কেন; কিন্তু তার নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী হওয়া যখন বুঝানো উদ্দেশ্য হয় তখন ইসমে ইশারা هٰذَا, অথবা ذٰلِكَ ব্যবহার করা হয়। অতএব, নামবাচক বিশেষ্য অথবা ইসমে মাওসূল, যা মুসনাদ ইলাইহ হতে পারে সেটাকে নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী বুঝানোর উদ্দেশ্যে যদি هٰذَا অথবা ذٰلِكَ ব্যবহার করা হয়, তাহলে তাই হবে অতিরিক্ত অর্থ যা মূল মুসনাদ ইলাইহ (নামবাচক বা ইসমে মাওসূল)-এর চেয়ে বেশি অর্থসম্পন্ন। অতএব, তাদের উপর আপত্তি উঠতে পারে না।

সার-সংক্ষেপ :

ক. ইসমে ইশারাহ রূপে মুসনাদ ইলাইহের ব্যবহার করা হয় কখনো শ্রোতার নির্বুদ্ধিতা প্রমাণের জন্য। যেমন–

أُولٰئِكَ اٰبَائِىْ فَجِئْنِىْ بِمِثْلِهِمْ * اِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ

খ. কখনো মুসনাদ ইলাইহের অবস্থান বুঝানোর জন্য ইসমে ইশারাহ রূপে মুসনাদ ইলাইহকে প্রকাশ করা হয়। যেমন– ১. هٰذَا زَيْدٌ ২. ذَاكَ زَيْدٌ ৩. ذٰلِكَ زَيْدٌ

গ. উল্লেখ্য যে, ইসমে ইশারাহ দ্বারা মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্কে অতিরিক্ত একটি বিষয় জানা যায়। আর তা হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহের অবস্থান। ইসমে ইশারাহ ব্যবহার না করা হলে তা জানা হতো না।

أَوْ تَحْقِيْرِهِ أَيْ تَحْقِيْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْقُرْبِ نَحْوُ أَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ أَوْ تَعْظِيْمِهِ بِالْبُعْدِ نَحْوُ الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ تَنْزِيْلاً لِبُعْدِ دَرَجَتِهِ وَ رَفْعَةِ مَحَلِّهِ مَنْزِلَةَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ أَوْ تَحْقِيْرِهِ بِالْبُعْدِ كَمَا يُقَالُ ذٰلِكَ اللَّعِيْنُ فَعَلَ كَذَا تَنْزِيْلاً لِبُعْدِهِ عَنْ سَاحَةِ عِزِّ الْحُضُوْرِ وَالْخِطَابِ مَنْزِلَةَ بُعْدِ الْمُسَافَةِ وَلَفْظُ ذٰلِكَ صَالِحٌ لِلْإِشَارَةِ إِلَى كُلِّ غَائِبٍ عَيْنًا كَانَ أَوْ مَعْنًى وَكَثِيْرًا مَا يُذْكَرُ الْمَعْنَى الْحَاضِرُ الْمُتَقَدِّمُ بِلَفْظِ ذٰلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى غَيْرُ مُدْرَكٍ بِالْحِسِّ فَكَأَنَّهُ بَعِيْدٌ ـ

অনুবাদ : **অথবা মুসনাদ ইলাইহকে ব্যবহার করা করা হয় নিকটবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করার জন্য।** যেমন– أَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ অর্থাৎ এই সে? যে তোমাদের প্রভুর সমালোচনা করে। **অথবা দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা মুসনাদ ইলাইহের সম্মান বুঝানোর জন্য। যেমন– আলিফ-লাম-মীম।** ঐ পবিত্র গ্রন্থ (এভাবে বলা হয়েছে) এর মর্যাদার দূরত্ব এবং সুমহান স্থানকে স্থানের দূরত্বের পর্যায়ের ধরে। **অথবা দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে তুচ্ছ জ্ঞান করার জন্য। যেমন বলা হয়, ঐ নিকৃষ্ট ব্যক্তি এ কাজ করেছে।** এভাবে বলা হয়েছে তার উপস্থিতি এবং সম্বোধনের সম্মানের ময়দানের দূরত্বকে স্থানের দূরত্বের পর্যায়ে ধরে। ذٰلِكَ শব্দটি যে কোনো ধরনের অনুপস্থিত বস্তু অথবা বিষয়ের প্রতি ইশারা দানের উপযুক্ত। অনেক সময় ইতঃপূর্বে আলোচিত স্মরণে আছে, এমন বিষয়ের প্রতি ذٰلِكَ দ্বারা ইশারা করা হয়। কেননা, অর্থ বা বিষয় পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত না হওয়াতে তা দূরবর্তী বলেই গণ্য হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ تَحْقِيْرِهِ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করার আরো কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

এক. تَحْقِيْرُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْقُرْبِ মুসনাদ ইলাইহকে তুচ্ছতা জ্ঞান করার জন্য কখনো নিকটবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়, আমরা আমাদের ব্যবহারেও সাধারণ এবং তুচ্ছ বুঝানোর জন্য নিকটবর্তী ইসমে ইশারা ব্যবহার করে থাকি। যেমন– বলে থাকি এটা সহজ বিষয়, এইতো সাধারণ ইত্যাদি। যে জিনিস সহজ লভ্য সেটা মানুষের কাছে ততবেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান হয় না। অতএব, নিকটবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা যখন কোনো বস্তুকে ইঙ্গিত করা হবে তখন সে বস্তুটি কম গুরুত্বপূর্ণ হবে। এর উদাহরণ– أَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ

অভিশপ্ত আবূ জাহল রাসূল ﷺ -কে তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিল : "এই কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের প্রভু-প্রতিমাদের সমালোচনা করে।"

قَوْلُهُ أَوْ تَعْظِيْمِهِ : কখনো মুসনাদ ইলাইহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মুসনাদ ইলাইহকে দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয় অর্থাৎ দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা একথা বুঝানো হয় যে, যার প্রতি ইশারা করা হয়েছে তা এমন মর্যাদাসম্পন্ন এবং আযীমুশশান যে, তার মর্যাদার কারণে সে এত দূরত্বে অবস্থান করছে যে, তাকে কাছে পাওয়া যায় না। যেমন– الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ এ আয়াতে ذٰلِكَ-এর مُشَارٌ إِلَيْهِ হলো كِتَابٌ (কুরআন)। এটি খুব কাছে হওয়া সত্ত্বেও মর্যাদাগতভাবে এত উঁচুতে অবস্থান করছে যে, তার কাছে পৌঁছা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এর প্রতি ذٰلِكَ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেন তার মর্যাদার দূরত্বকে স্থানের দূরত্বের জায়গায় রাখা হয়েছে এবং স্থানগত দূরের জিনিসকে যেমন দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়, তেমনি এটাকেও দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوْ تَحْقِيْرِهِ بِالْبُعْدِ : মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে অপমান করার জন্য দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন– মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিকে কেউ বলল ذٰلِكَ اللَّعِيْنُ فَعَلَ كَذَا অর্থাৎ ঐ অভিশপ্ত লোকটি এমনটি করেছে। এটা তখনই বলা হয় যখন উক্ত ব্যক্তি সম্বোধন করার উপযুক্ত না হয় এবং খুবই নিকৃষ্ট হয়, তার সম্মান পাওয়ার ক্ষেত্রের এ দূরত্বকে স্থানের দূরত্বের পর্যায়ে রেখে স্থানের দূরত্বের ক্ষেত্রে যেমন দূরবর্তী ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয় এখানেও তেমনটি করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَفْظُ ذٰلِكَ صَالِحٌ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ذٰلِكَ শব্দটি দ্বারা প্রত্যেক অনুপস্থিত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা যায়। সেই অনুপস্থিত বিষয়টি কোনো বস্তুও হতে পারে, আবার তা নিরাকার অর্থগত বিষয়ও হতে পারে। কিন্তু অনুপস্থিত বিষয়ের প্রতি ذٰلِكَ-এর ইশারাটি মাজাযের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, হাকীকীভাবে ذٰلِكَ এমন দূরবর্তী বস্তুর ইঙ্গিতের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা চর্মচক্ষ দ্বারা দেখা যায়। অদৃশ্য কোনো বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতের জন্য ذٰلِكَ কে ব্যবহার করা যায় না।

قَوْلُهُ وَكَثِيْرًا مَّا يُذْكَرُ الْمَعْنٰى : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) ذٰلِكَ الْكِتَابُ-এর মধ্যে ذٰلِكَ-এর ব্যবহার সম্পর্কে আরেকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, কখনো চলমান কোনো বিষয় যা ذٰلِكَ-এর আগে এসেছে, এমন বিষয়ের প্রতি ذٰلِكَ দ্বারা ইশারা করা। এখানে বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন জিনিস, যা চোখের সাহায্যে দেখা যায় না। অতএব, এর মধ্যে শব্দও শামিল হবে। কেননা, শব্দকে দেখা যায় না।

এসব বিষয় এবং শব্দের প্রতি ذٰلِكَ (اِسْمِ اِشَارَةْ بَعِيْد) দ্বারা এ জন্য ইঙ্গিত করা হবে যে, এগুলো অদৃশ্য হওয়ার কারণে যেন দূরে অবস্থান করছে।

অনেক স্থানে এরূপ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন– كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ اَمْثَالَهُمْ-এর ذٰلِكَ শব্দটি দ্বারা কুরআনের একটি প্রবাদ– যথা ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اتَّبَعُوْا الْبَاطِلَ الخ-এর প্রতি ইঙ্গিত ذلك দ্বারা করা হয়েছে। এমনিভাবে শপথ রূপে তুমি বললে بِاللّٰهِ الْغَالِبِ এরপর বললে ذٰلِكَ قَسَمٌ عَظِيْمٌ এখানে দেখা যাচ্ছে ذٰلِكَ الْكِتَابُও উপরোক্ত দু'টি ব্যবহারের মতো একটি ব্যবহার।

قَوْلُهُ الْمَعْنَى الْحَاضِرُ الْمُتَقَدِّمُ بِلَفْظِ ذٰلِكَ : এ বাক্যের مَعْنٰى দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে لَفْظ বা শব্দ অর্থাৎ মানবের কথাবার্তা। اَلْحَاضِرُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে عرف বা সাধারণ যাকে উপস্থিত মনে করে। যেমন উল্লিখিত উদাহরণে (بِاللّٰهِ قسم الغالب) আর اَلْمُتَقَدِّمُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যা ইসমে ইশারার পূর্বে গিয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. নিকটবর্তী ইসমে ইশারাহ দ্বারা কখনো শ্রোতার প্রতি তুচ্ছতা প্রকাশ করা হয়। যেমন– وَهٰذَا الَّذِىْ

খ. দূরবর্তী ইসমে ইশারাহ দ্বারা কখনো সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যেমন– ذٰلِكَ الْكِتَابُ

গ. দূরবর্তী ইসমে ইশারাহ দ্বারা কখনো তুচ্ছতা প্রকাশ করা হয়। যেমন– ذٰلِكَ اللَّعِيْنُ فَعَلَ كَذَا

ঘ. শব্দ-বাক্য ও কথাবার্তার প্রতি দূরবর্তী ইসমে ইশারাহ ব্যবহার করা হয়।

اَوِ التَّنْبِيْهِ اَىْ تَعْرِيْفِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِالْاِشَارَةِ لِلتَّنْبِيْهِ عِنْدَ تَعْقِيْبِ الْمُشَارِ اِلَيْهِ بِاَوْصَافٍ اَىْ عِنْدَ اِيْرَادِ الْاَوْصَافِ عَلٰى عَقْبِ الْمُشَارِ اِلَيْهِ يُقَالُ عَقَّبَهُ فُلَانٌ اِذَا جَاءَ عَلٰى عَقِبِهِ ثُمَّ تُعَدِّيْهِ بِالْبَاءِ اِلَى الْمَفْعُوْلِ الثَّانِيْ وَتَقُوْلُ عَقَّبْتُهُ بِالشَّيْءِ اِذَا جَعَلْتَ الشَّيْءَ عَلٰى عَقِبِهِ وَبِهٰذَا ظَهَرَ فَسَادُ مَا قِيْلَ اِنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ جَعْلِ اِسْمِ الْاِشَارَةِ بِعَقْبِ اَوْصَافٍ عَلٰى اَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّنْبِيْهِ اَىْ لِلتَّنْبِيْهِ عَلٰى اَنَّ الْمُشَارَ اِلَيْهِ جَدِيْرٌ بِمَا يَرِدُ بَعْدَهُ اَىْ بَعْدَ اِسْمِ الْاِشَارَةِ مِنْ اَجْلِهَا مُتَعَلِّقٌ بِجَدِيْرٍ اَىْ حَقِيْقٌ بِذٰلِكَ لِاَجْلِ الْاَوْصَافِ الَّتِىْ ذُكِرَتْ بَعْدَ الْمُشَارِ اِلَيْهِ نَحْوُ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلٰى قَوْلِهٖ اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ عَقَّبَ الْمُشَارَ اِلَيْهِ وَهُوَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاَوْصَافٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنَ الْاِيْمَانِ بِالْغَيْبِ وَاِقَامَةِ الصَّلٰوةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ ثُمَّ عَرَّفَ الْمُسْنَدَ اِلَيْهِ بِالْاِشَارَةِ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ الْمُشَارَ اِلَيْهِمْ اَحِقَّاءُ بِمَا يَرِدُ بَعْدَ اُولٰئِكَ وَهُوَ كَوْنُهُمْ عَلَى الْهُدٰى عَاجِلًا وَالْفَوْزُ بِالْفَلَاحِ اٰجِلًا مِنْ اَجْلِ اِتِّصَافِهِمْ بِالْاَوْصَافِ الْمَذْكُوْرَةِ ـ

অনুবাদ : **অথবা মুসনাদ ইলাইহিকে** ইসমে ইশারার সাহায্যে নির্দিষ্ট দ্বারা **সতর্ক করা হয় যখন ইঙ্গিতকৃত বস্তুর পরে কিছু গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়** অর্থাৎ ইঙ্গিতকৃত বস্তুর পর বিভিন্ন গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। عَقَّبَهُ فُلَانٌ বলা হয় যখন অমুক ব্যক্তি তার পরে আসে। এরপর তাকে দ্বিতীয় মাফউলের দিকে بـاء দ্বারা মুতা'আদ্দী করা। তুমি বললে عَقَّبْتُهُ بِالشَّيْءِ অর্থ যখন তুমি জিনিসকে তারপরে আনবে। সুতরাং এর দ্বারা এ ব্যাপারে কতিপয় লোকদের যখন ইসমে ইশারাহ (তথা মুশারুন ইলাইহ)-কে গুণসমূহের পরে আনা হয় এর ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে গেল। عَلٰى اَنَّهُ মুতা'আল্লিক হবে تَنْبِيْه-এর সাথে। অর্থাৎ এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দানের জন্য যে, মুশারুন ইলাইহ **তারপর** অর্থাৎ ইসমে ইশারার পর **উল্লিখিত বিষয়ের ব্যাপারে উপযুক্ত সেই গুণগুলোর কারণে,** যা উল্লেখ করা হয়েছে মুশারুন ইলাইহের পর। **যেমন** (অর্থ) যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে এবং নামাজ কায়েম করে **তারাই তাদের প্রভুর প্রদর্শিত হিদায়েতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম**। মুশারুন ইলাইহ তথা مُتَّقِيْن-এর পরে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস, নামাজ কায়েম করা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় এনেছেন। অতঃপর মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করেছেন, এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য যে, মুশারুন ইলাইহ اُولٰئِكَ-এর পর যা আসছে তার ব্যাপারে তা অধিক উপযুক্ত। তা হচ্ছে ইহজগতে তাদের সফলকাম হওয়া এবং পরজগতে প্রভূত কল্যাণের মাধ্যমে কামিয়াব হওয়া। আর এটা তাদের উল্লিখিত গুণাবলিতে অভিষিক্ত হওয়ার কারণেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اَوِ التَّنْبِيْهِ الخ : মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয় শ্রোতাকে এ কথা অবগত করানোর জন্য যে, মুশারুন ইলাইহের পর যে সকল গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে তার কারণেই ইসমে ইশারার পরবর্তী সব বিষয়ের হুকুম তাকে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ মুশারুন ইলাইহ উক্ত হুকুম পাওয়ার উপযুক্ত উল্লিখিত গুণাবলির

কারণেই হয়েছে, অন্য কারণে নয়। যেমন : أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ আয়াতের দু'স্থানে أُولَٰئِكَ হলো ইসমে ইশারা। তার মুশারুন ইলাইহ হচ্ছে مُتَّقِيْنَ। মুশারুন ইলাইহের পর অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস, নামাজ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা ইত্যাদি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ইসমে ইশারার পর দু'টি বক্তব্য রয়েছে– ১. পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার হিদায়েত, ২. আখিরাতে সফলতা। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইসমে ইশারার সাহায্যে মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, مُتَّقِيْنَ তথা আল্লাহভীরুদের সফলতা এবং হিদায়েতপ্রাপ্তি উল্লিখিত গুণাবলির কারণে হবে, যা মুশারুন ইলাইহের পর এবং ইসমে ইশারার আগে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ عِنْدَ تَعْقِيْبِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِأَوْصَافٍ : এই ইবারতের ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ বলেন عَقَّبَ ফে'লটির কখনো একটি মাফউল হয়, আবার কখনো দু'টি। যখন দ্বিতীয় মাফউলের প্রয়োজন হয় তখন দ্বিতীয় মাফউলটি بَاءْ تَعْدِيَةْ-এর পর আসে। عَقَّبَهُ فُلَانٌ অর্থ অমুক তার পরে এসেছে। আর عَقَّبْتَهُ بِالشَّيْءِ-এর অর্থ হচ্ছে তুমি তার পরে জিনিসটি আনলে। অভিধানের উক্ত ব্যবহার অনুসারে تَعْقِيْبُ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِأَوْصَافٍ-এর অর্থ হচ্ছে মুশারুন ইলাইহের পর গুণাবলিকে আনা। তাইতো তিনি এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন عِنْدَ إِيْرَادِ الْأَوْصَافِ عَلَىٰ عَقْبِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ

মুসান্নিফ (র.) বলেন, কতিপয় লোক মনে করেন, بَاءْ যার উপর আসে তা আগে হয় প্রথম মাফউল থেকে। সে মতে আয়াতে গুণাবলি আগে আসবে, এরপর মুশারুন ইলাইহ আসবে। তাদের এ মতটি সঠিক নয়। কেননা, একেতো তা অভিধানের বর্ণনার বিপরীত, দ্বিতীয়ত আয়াতের বর্ণনার সাথেও মিলে না। কারণ, আয়াতের মধ্যে মুশারুন ইলাইহ (مُتَّقِيْنَ) আগে এসেছে, তারপর গুণাবলি (অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস করা, নামাজ কায়েম ইত্যাদি) পরে এসেছে।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো ইসমে ইশারার পূর্বে এমন মুশারুন ইলাইহ গত হয় যার কতিপয় গুণাবলি ইসমে ইশারার পূর্বে এবং মুশারুন ইলাইহের পর উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ইসমে ইশারাকে উল্লেখ করত এ ইঙ্গিত প্রদান করা হয় যে, ইসমে ইশারার পরবর্তী বিষয়গুলো ঐসব গুণাবলির কারণে প্রযোজ্য, যার উল্লেখ ইসমে ইশারার পূর্বে হয়েছে। যেমন– أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ الخ এ আয়াতের أُولَٰئِكَ হচ্ছে ইসমে ইশারা, তার মুশারুন ইলাইহ হচ্ছে مُتَّقِيْنَ। মুশাররুন-এর গুণাবলি اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ থেকে শুরু হয়েছে। ইসমে ইশারার পরবর্তী বিষয় হচ্ছে দু'টি– ১. হিদায়েতের উপর থাকা ও ২. আখিরাতের সফলতা। সুতরাং ইসমে ইশারা দ্বারা এ ইঙ্গিত প্রদান করা হচ্ছে যে, মুত্তাকীগণ হিদায়েত ও আখিরাতের সফলতা লাভে উপযুক্ত, তাদের ঈমান, নামাজ কায়েম ও যাকাত প্রদান ইত্যাদি গুণাবলির কারণে।

وَبِاللَّامِ اَىْ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِاللَّامِ لِلْاِشَارَةِ اِلٰى مَعْهُوْدٍ اَىْ اِلٰى حِصَّةٍ مِنَ الْحَقِيْقَةِ مَعْهُوْدَةٍ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ وَاحِدًا كَانَ اَوْ اِثْنَيْنِ اَوْ جَمَاعَةً يُقَالُ عُهِدْتُ فُلَانًا اِذَا اَدْرَكْتَهُ اَوْ لَقِيْتَهُ وَ ذٰلِكَ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ صَرِيْحًا اَوْ كِنَايَةً نَحْوُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى اَىْ لَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِىْ طَلَبَتْ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ كَالَّتِىْ اَىْ كَالْاُنْثٰى الَّتِىْ وُهِبَتْ تِلْكَ الْاُنْثٰى لَهَا اَىْ لِامْرَأَةِ عِمْرَانَ فَالْاُنْثٰى اِشَارَةٌ اِلٰى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ صَرِيْحًا فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى لٰكِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ اِلَيْهِ وَالذَّكَرُ اِشَارَةٌ اِلٰى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ كِنَايَةً فِىْ قَوْلِهِ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَاِنَّ لَفْظَ مَا وَاِنْ كَانَ يَعُمُّ الذُّكُوْرَ وَالْاِنَاثَ لٰكِنَّ التَّحْرِيْرَ وُهُوَ اَنْ يُّعْتَقَ الْوَلَدُ لِخِدْمَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ اِنَّمَا كَانَ لِلذُّكُوْرِ دُوْنَ الْاِنَاثِ وَهُوَ مُسْنَدٌ اِلَيْهِ وَقَدْ يُسْتَغْنٰى عَنْ ذِكْرِهِ لِتَقَدُّمِ عِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِهِ نَحْوُ خَرَجَ الْاَمِيْرُ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الْبَلَدِ اِلَّا اَمِيْرٌ وَاحِدٌ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **এবং** মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয় **আলিফ লাম দ্বারা পরিচিত জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য।** অর্থাৎ হাকীকতের একটি অংশ যা বিবরণদাতা এবং শ্রোতার মধ্যে পরিচিত, একটি হোক অথবা একাধিক হোক, তার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য, عَهِدْتَ فُلَانًا বলা হয়– যখন তুমি তাকে পেলে এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করলে। এটা (পরিচিত হওয়া) তার উল্লেখ ইতঃপূর্বে স্পষ্ট অথবা পরোক্ষভাবে হওয়ার কারণে। যেমন– (কাঙ্ক্ষিত) **পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো নয়** অর্থাৎ **ইমরানের স্ত্রী যে পুত্র সন্তান কামনা করেছিল তা তাকে প্রদত্ত মেয়ে সন্তানের মতো নয়। তার জন্য** অর্থাৎ ইমরানের স্ত্রীর জন্য। মেয়ে সন্তান বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে এমন বিশেষ্যের দিকে যার উল্লেখ ইতঃপূর্বে স্পষ্টত গেছে আল্লাহ তা'আলার বাণী رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى (হে প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি)-এর মধ্যে। কিন্তু এটা মুসনাদ ইলাইহ নয়। পুত্র সন্তান বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে এমন বিষয়ের দিকে যার উল্লেখ ইতঃপূর্বে প্রচ্ছন্নভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী رَبِّىْ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا (হে প্রভু! আমি আপনার জন্য আমার পেটে যা আছে তার মান্নত করলাম)-এর মধ্যে مَا শব্দটি যদি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যবহার হয় তদুপরি তাহরীর অর্থাৎ সন্তানকে বায়তুল মোকাদ্দাসের খিদমতের জন্য নিয়োগ করা এটা তো কেবল পুরুষের জন্য প্রযোজ্য, মেয়েদের জন্য নয়। এটা মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে। অবশ্য কখনো তা পূর্বে (মুসনাদ ইলাইহের) উল্লেখের প্রতি মুখাপেক্ষী হয় না, শ্রোতার এ ব্যাপারে পূর্ব জ্ঞান থাকার কারণে। যেমন আমির বের হয়েছেন এটা বলা সহীহ যখন শহরে একজন মাত্র আমির থাকেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَبِاللَّامِ الخ : مَعْرِفَةٌ-এর আলামতসমূহের মধ্যে একটি প্রকার হলো 'আলিফ লাম'। নাকিরার সাথে 'আলিফ লাম' যুক্ত হলে উক্ত নাকিরা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। 'আলিফ লাম' প্রথমত দু' প্রকার। যথা–

১. اَلِفْ لَامْ عَهْدِ خَارِجِيْ ২. اَلِفْ لَامْ حَقِيْقِيْ

প্রথম প্রকারকে তিনভাগে ভাগ করা যায়– ১. صَرِيْحِيْ ২. كِنَائِيْ ৩. عِلْمِيْ

১. اَلِفْ لَامْ ব্যবহার করার আগে যদি এর উল্লেখ স্পষ্টভাবে হয়ে থাকে, তাহলে তাকে صَرِيْحِيْ বলা হয়। ২. যদি الف لَامْ ব্যবহারের আগে এর ব্যবহার পরোক্ষভাবে ইঙ্গিতবহ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে كِنَائِيْ বলা হবে। ৩. আর যদি উক্ত আলিফ লামের ইশারাকৃত বিষয়টি শ্রোতার জ্ঞানে থাকে, তাহলে তাকে عِلْمِيْ বলা হবে।

اَلِفْ لَامْ حَقِيْقِيْ-এর প্রকারভেদ : 'আলিফ লাম' হাকীকী চার প্রকার। ১. الف ولام حَقِيْقَتْ مِنْ حَيْثُ هِيَ একে اَلِفْ وَلَامْ اِسْتِغْرَاقِيْ عُرْفِيْ .৪ اَلِفْ وَلَامْ اِسْتِغْرَاقِيْ حَقِيْقِيْ .৩ اَلِفْ وَلَامْ عَهْدِ ذِهْنِيْ .২ বলা হয় جِنْسِي

১. যদি اَلِفْ وَلَامْ দ্বারা جِنْس-এর কোনো فرد এক বা একাধিক فرد-কে উদ্দেশ্য না করা হয়; বরং হাকীকতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, তাহলে তাকে جِنْسِيْ বলা হয়। ২. আর যদি কোনো একটি অনির্দিষ্ট فَرْد-এর মাধ্যমে হাকীকত মুরাদ নেওয়া হয়, তাহলে তাকে عَهْد ذِهْنِيْ বলা হয়। ৩. যদি হাকীকতের মাধ্যমে তার সমস্ত اَفْرَادْ-কে উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তাহলে তাকে اِسْتِغْرَاقِيْ বলা হয়। اِسْتِغْرَاقِيْ দু'প্রকার : ১. حَقِيْقِي ২. عُرْفِيْ। ক. এখন حَقِيْقِيْ বলা হয় শব্দ তার অভিধানগত চাহিদা অনুসারে যেসব افراد-কে অন্তর্ভুক্ত করে এর সবগুলোকে উদ্দেশ্য করা সম্ভব হওয়া। খ. আর যদি এর সংখ্যা এবং অন্তর্ভুক্তি عُرْف অনুসারে হয়ে থাকে, শব্দের চাহিদানুপাতে না হয়, তাহলে তাকে اِسْتِغْرَاقِيْ عُرْفِيْ বলা হয়।

মূল লেখক প্রথমে اَلِفْ وَ لَامْ عَهْدِ خَارِجِي দ্বারা আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, বর্ণনাকারী এবং শ্রোতার মাঝে পরিচিত হাকীকতের একটি নির্দিষ্ট অংশের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য তাকে ব্যবহার করা হয়। সেই নির্দিষ্ট অংশটি একক অথবা দুই কিংবা দুয়ের অধিক সবই হতে পারে। ইঙ্গিত বুঝানো তখনই সঠিক হবে যখন তার আলোচনা ইতঃপূর্বে স্পষ্টত অথবা পরোক্ষভাবে গিয়ে থাকে; অন্যথায় নয়। সুস্পষ্টভাবে এবং পরোক্ষভাবে এর আলোচনা গত হবে– এর উদাহারণ সামনে আসছে। মুসান্নিফ (র.) مَعْهُوْد শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ সুনির্দিষ্ট হওয়া। এর প্রমাণ হচ্ছে عَهْد-এর ব্যবহার عَهِدْتَ فُلَانًا তখনই বলা হয় যখন তুমি তাকে পাবে এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর এটা বলা বাহুল্য যে, কারো সাথে সাক্ষাৎ হওয়া এবং তাকে পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট হওয়া অবশ্যই জরুরি। সুতরাং এখানে مَعْهُوْد বলে সুনির্দিষ্ট (লাযিমী অর্থ) উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

لَامْ দ্বারা ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির উল্লেখ পূর্বে সুস্পষ্ট এবং পরোক্ষভাবে যাওয়ার উদাহরণ হচ্ছে لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى অর্থাৎ যে পুত্র সন্তান ইমরানের স্ত্রী (হযরত মারয়ামের মাতা) কামনা করেছিল তা সেই মেয়েটির মতো নয়, যা তাকে দেওয়া হয়েছে। বরং তাকে দেওয়া মেয়েটি (মারয়াম) কাঙ্ক্ষিত ছেলের চেয়ে অনেক উত্তম। আয়াতটি সূরা আলে ইমরানের তৃতীয় রুকূ' থেকে নেওয়া হয়েছে। আয়াতে হযরত মারয়ামের জন্মের সময়ে তার মায়ের কিছু কথা এখানে বিবৃত হয়েছে।

মারয়াম যখন তার মায়ের গর্ভে ছিলেন তখন তিনি তার গর্ভস্থিত বাচ্চা সম্পর্কে মান্নত করে বলেন, رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার পেটে যে সন্তান রয়েছে তা আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য সোপর্দ করলাম। তিনি পুত্র সন্তান কামনা করে এই প্রার্থনা করলেন; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এর বিপরীত, ফলে তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন। কন্যা সন্তান দেখে হতাশ হয়ে তিনি বললেন, رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতে সন্তান দান করার মান্নত করেছিলাম; অথচ তুমি তো আমাকে কন্যা সন্তান দিলে! এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى অর্থাৎ তোমার কাঙ্ক্ষিত পুত্র সন্তান এ মেয়েটির মতো নয়। আয়াতের اَلذَّكَرُ এবং اَلْاُنْثٰى উভয় ইসমের 'আলিফ লাম'টি عَهْد خَارِجِي-এর 'আলিফ লাম'। اَلْاُنْثٰى দ্বারা এমন নির্দিষ্ট বিশেষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার আলোচনা ইতঃপূর্বে সুস্পষ্টভাবে গেছে وَضَعْتُهَا اُنْثٰى-এর মধ্যে। তবে তারকীবের মধ্যে এটি

মুসনাদ ইলাইহ নয়। অথচ আলোচনা চলছে মুসনাদ ইলাইহ সংক্রান্ত। আয়াতের اَلذَّكَرُ দ্বারা এমন একটি নির্দিষ্ট বিশেষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যার আলোচনা ইতঃপূর্বে প্রচ্ছন্নভাবে গেছে। আর সেই আয়াতটি হচ্ছে اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ আয়াতের مَا শব্দটি যদিও ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই বুঝায়, কিন্তু যেহেতু একে বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতে নিযুক্ত করা হবে তাই এর দ্বারা ছেলেই উদ্দেশ্য। অতএব, مَا-এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছেলে। যখন مَا দ্বারা ছেলে উদ্দেশ্য, কাজেই اَلذَّكَرُ-এর পূর্বে এর আলোচনাও مَا-এর মধ্যে গেছে; যদিও তা প্রচ্ছন্নভাবে। اَلذَّكَرُ শব্দের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে। সুতরাং এটি মুসনাদ ইলাইহকে (আলিফ ও লাম নির্দিষ্ট ইসমের প্রতি ইঙ্গিতবাচক) নির্দিষ্ট করার উদাহরণ হলো।

قَوْلُهٗ وَقَدْ يُسْتَغْنٰى عَنْ ذِكْرِهٖ : এ বাক্য দ্বারা عَهْد خَارِجِىْ-এর তৃতীয় প্রকার عَلَمِىْ-এর উদহারণ দেওয়া হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন- কখনো আলিফ লামের বিশেষ্যটির পূর্বোল্লেখ প্রয়োজন হয় না, শ্রোতার জ্ঞান এ বিষয়ে থাকার কারণে। যেমন কেউ বলল خَرَجَ الْاَمِيْرُ আমির বের হয়ে গেছেন। যদিও আমিরের উল্লেখ পূর্ব আলোচনায় যায়নি; তবু এটিকে ব্যবহার করা সঠিক হয়েছে। কেননা, শ্রোতা জানে যে, শহরে একজন মাত্র আমিরই রয়েছেন। অতএব, লাম দ্বারা সুনির্দিষ্ট বা পরিচিত ইসমের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহ কখনো নির্দিষ্ট হয় 'আলিফ লাম' দ্বারা। 'আলিফ-লাম' প্রথমত দু' প্রকার।

১. اَلِفْ لَامْ عَهْد خَارِجِىْ ২. اَلِفْ لَامْ حَقِيْقِىْ

اَلِفْ لَامْ عَهْد خَارِجِىْ যে শব্দে ব্যবহৃত হয় সে শব্দটি নির্দিষ্ট হয় এভাবে যে, সেই আলিফ লাম দ্বারা বক্তা ও শ্রোতার মাঝে পরিচিত কোনো বস্তু বা ব্যক্তির ইঙ্গিত করা হয়। সে ইঙ্গিতকৃত বস্তু বা ব্যক্তি একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সবই হতে পারে। যেমন- وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى

أَوْ لِلْإِشَارَةِ إِلَى نَفْسِ الْحَقِيْقَةِ وَمَفْهُوْمُ الْمُسَمّٰى مِنْ غَيْرِ اِعْتِبَارٍ لِمَا صَدَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْاَفْرَادِ كَقَوْلِكَ الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ وَقَدْ يَأْتِيْ الْمُعَرَّفُ بِلَامِ الْحَقِيْقَةِ لِوَاحِدٍ مِنَ الْاَفْرَادِ بِاِعْتِبَارِ عَهْدِيَّتِهِ فِي الذِّهْنِ لِمُطَابَقَةِ ذٰلِكَ الْوَاحِدِ الْحَقِيْقَةَ يَعْنِيْ يُطْلَقُ الْمُعَرَّفُ بِلَامِ الْحَقِيْقَةِ الَّذِيْ هُوَ مَوْضُوْعٌ لِلْحَقِيْقَةِ الْمُتَّحِدَةِ فِي الذِّهْنِ عَلٰى فَرْدٍ مَوْجُوْدٍ مِنَ الْحَقِيْقَةِ بِاِعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَعْهُوْدًا فِي الذِّهْنِ وَجُزْئِيًّا مِنْ جُزْئِيَّاتِ تِلْكَ الْحَقِيْقَةِ مُطَابِقًا اِيَّاهَا كَمَا يُطْلَقُ الْكُلِّيُّ الطَّبْعِيُّ عَلٰى جُزْئِيٍّ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ وَ ذٰلِكَ عِنْدَ قِيَامِ قَرِيْنَةٍ عَلٰى اَنَّ لَيْسَ الْقَصْدُ اِلٰى نَفْسِ الْحَقِيْقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوْدِ وَلَا مِنْ حَيْثُ وُجُوْدِهَا فِيْ ضِمْنِ جَمِيْعِ الْاَفْرَادِ بَلْ فِيْ بَعْضِهَا كَقَوْلِكَ اُدْخُلِ السُّوْقَ حَيْثُ لَا عَهْدَ فِي الْخَارِجِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَخَافُ اَنْ يَّأْكُلَهُ الذِّئْبُ ـ

অনুবাদ : **অথবা হাকীকতের প্রতি ও একটি নির্দিষ্ট অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য** ('আলিফ লাম' দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টরূপে আনা হয়) এবং এতে فَرْد সমূহ প্রযোজ্য হওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হবে না। **যেমন– তুমি বললে** اَلرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ **(পুরুষ মহিলা থেকে উত্তম)। কখনো** হাকীকতের লাম **মুতাকাল্লিমের মনে নির্দিষ্ট হওয়ার ভিত্তিতে হাকীকতের অধীন যে কোনো একটি** فَرْد**-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।** আর তা এ হিসেবে যে, এককটি হাকীকতের মোতাবেক হয়েছে। অর্থাৎ হাকীকতের লাম দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ্য যা মনোগতভাবে সকলের জন্য তাকে মনে মনে হাকীকতের অধীন বাস্তবের একটি فَرْد-এর বা একটি جُزْئِىْ-এর জন্য প্রয়োগ করা এই ভিত্তিতে যে, এটি হাকীকতের মোতাবেক। যেমনটি كُلِّىْ طَبْعِىْ তার অনেক অংশের মধ্য থেকে একটি অংশের উপর প্রয়োগ হয়, আর এটা তখনই হয় যখন এমন নিদর্শন থাকে যে, এখানে মৌলিক হাকীকত উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি অস্তিত্বশীল হয়েছে এর মাধ্যমে সমস্ত সদস্যের (فَرْد)-এর সাহায্যে নয়; বরং কোনো একটির সাহায্যে। **যেমন– তুমি বললে** اُدْخُلِ السُّوْقَ **(তুমি বাজারে যাও) যখন বাজার বাহ্যিকভাবে সুনির্দিষ্ট না হবে;** এর উদাহরণ আল্লাহ তা'আলার বাণী اَخَافُ اَنْ يَّأْكُلَهُ الذِّئْبُ (অর্থ–) আমি আশঙ্কা করি "তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اَوْ لِلْإِشَارَةِ الخ : মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে আলিফ-লাম দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয় হাকীকত তথা একটি বিশেষ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। نَفْس حَقِيْقَةْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَفْرَادْ ছাড়া শুধুমাত্র হাকীকত। মুসান্নিফ (র.) এখানে হাকীকতের ব্যাখ্যায় مَفْهُوْم শব্দটি এনেছেন, এর দ্বারা তিনি উপরোক্ত বক্তব্যকেই শক্তিশালী করেছেন কারণ, حَقِيْقَةْ-এর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতে اَفْرَادْ-এর মাধ্যমে হাকীকতের অস্তিত্বের বিষয়টি রয়েছে।

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, كُلِّىْ দ্বারা যদি وُجُوْدٌ فِى الْخَارِجِ (বাস্তবে অস্তিত্বশীল) উদ্দেশ্য হয়, তাহলে একে হাকীকত বলা হয়। আর যদি বাস্তবে অস্তিত্ব উদ্দেশ্য না হয়; বরং মানসিক বিষয় হয় তাহলে একে مَفْهُوْم বলা হয়। এখানে যেহেতু হাকীকত দ্বারা বাস্তবের অস্তিত্ব উদ্দেশ্য নয়, তাই মুসান্নিফ-এর ব্যাখ্যায় مَفْهُوْم শব্দটি এনেছেন। মুসান্নিফ (র.) আরো বলেন, হাকীকতটি اَفْرَادْ-এর উপর প্রয়োগ হয়, এ হিসেবে এখানে হাকীকত উদ্দেশ্য নয়। এর উদাহরণ اَلرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ পুরুষ জাতি নারী জাতি থেকে উত্তম। এখানে اِمْرَأَةٌ এবং رَجُلٌ দ্বারা নারী ও পুরুষের হাকীকত উদ্দেশ্য, সকল পুরুষ বা নির্দিষ্ট একজন পুরুষ উদ্দেশ্য নয়। এ জাতীয় আরো উদাহরণ হচ্ছে–

اَلدِّيْنَارُ خَيْرٌ مِنَ الدِّرْهَمِ ـ اَلْكُلُّ اَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ ـ اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ

قَوْلُهُ وَقَدْ يَأْتِي الْمُعَرَّفُ بِلَامِ الخ : মূল লেখকের বক্তব্যের উপর একটি আপত্তি কেউ কেউ করে থাকেন। তারা বলেন, তিনি পূর্বোক্ত দু' প্রকার (عَهْد خَارِجِيْ وَحَقِيْقِيْ) লামের বর্ণনায় তিনি যথাক্রমে وَقَدْ يُفِيْدُ ও وَقَدْ يَأْتِيْ ব্যবহার করেছেন। তার বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন বৈষম্যের কারণ কি? প্রথমত এর জবাব হলো, মূল লেখক তার বর্ণনার মধ্যে নতুনত্ব আনার জন্য এরূপ করেছেন। দ্বিতীয়ত এবং মূল কারণ হচ্ছে শেষোক্ত দু'প্রকার (لَامْ عَهْدِ ذِهْنِيْ ও لَامْ اِسْتِغْرَاقِيْ) হাকীকতের লামেরই প্রকার এবং এর অন্তর্ভুক্ত। সে দিকেই ইঙ্গিত করার জন্য এরূপ ব্যবহার করেছেন, যাতে পাঠক বুঝতে পারে এটি হাকীকতেরই প্রকার। কেননা, لِلْاِشَارَةِ ইত্যাদি ব্যবহার করলে এ দু'টিকে স্বতন্ত্র প্রকার বলেই মনে হতো।

তিনি বলেন, হাকীকতের লাম কখনো তার فَرْدٌ সমূহের মধ্য থেকে অনির্দিষ্ট فَرْدٌ-এর উপর প্রয়োগ হয়, তখন সেই فَرْدٌ টি মুতাকাল্লিমের মনে নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যদি فَرْدٌ অনির্দিষ্ট হয় তাহলে মুতাকাল্লিমের মনে সেটা নির্দিষ্ট হবে কি করে? কেননা, মূল লেখক তার ইবারত بِاعْتِبَارِ عَهْدِيَّتِهٖ فِى الذِّهْنِ বলেছেন।

এর উত্তর হচ্ছে– عَهْد ذِهْنِيْ দ্বারা যে فَرْدٌ টির প্রতি ইঙ্গিত করা হবে বাস্তবিকপক্ষে সে فَرْدٌ টি অনির্দিষ্ট এবং চিহ্নিত নয়। কিন্তু এটি হাকীকতের একটি فَرْد এবং তা হাকীকতের মোতাবেক, এ হিসেবে এটি যখন মনের মধ্যে অবস্থান করে এবং জানা হয় তখন এটি মনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। তাই একে সুনির্দিষ্ট বলা হয়েছে।

মোটকথা, মনের মধ্যে এর অবস্থান ও স্থিতির কারণে عَهْد ذِهْنِيْ বলা হয়। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, عَهْد অর্থ– পাওয়া। এটা মনের মধ্যে পাওয়া যায় এবং থাকে, এ কারণে একে عَهْد ذِهْنِيْ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَمَا يُطْلَقُ الْكُلِّيُّ الطَّبْعِيُّ عَلٰى جُزْئِيِّ : মুসান্নিফ বলেন, এটি كُلِّيْ طَبْعِيْ-এর মতো। كُلِّيْ طَبْعِيْ যেমন তার অনেক جُزْئِيْ থেকে একটি جُزْئِيْ-এর উপর প্রয়োগ হয়। এর উদাহরণ হলো اِنْسَانٌ একটি كُلِّيْ طَبْعِيْ, তার অনেকগুলো جُزْئِيْ রয়েছে। এটি যায়েদ, আমর, খালিদ ইত্যাদির উপর আলাদাভাবে প্রয়োগ হয় এবং প্রত্যেকটি جُزْئِيْ-এর মধ্যে পাওয়া যায়। এমনিভাবে হাকীকতও তার কোনো একটি فَرْدٌ-এর মধ্যে পাওয়া যায় এবং প্রয়োগ হয়। এই فَرْدٌ টি সে হাকীকতের মোতাবেক হয়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, হাকীকতের লাম দ্বারা একটি فَرْدٌ তখনই উদ্দেশ্য করা হয় যখন এ দলিল থাকে যে, এর দ্বারা হাকীকত উদ্দেশ্য নয় অর্থাৎ اَفْرَادٌ ছাড়া মৌলিক হাকীকত উদ্দেশ্য নয়, যেমন জিনসের লামের মধ্যে হয়ে থাকে। যেমন– اُدْخُلِ السُّوْقَ অর্থাৎ তুমি বাজারে প্রবেশ করো। এটি عَهْد خَارِجِيْ-এর উদাহরণ হবে, যখন মুতাকাল্লিম এবং শ্রোতার মধ্যে বাজার দ্বারা কোনো বাজার তাদের মাঝে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, যার আলোচনা পূর্বে প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে অতিবাহিত হয়েছে, অথবা শ্রোতা জানে। اَلسُّوْقِ-এর মধ্যে বর্তমান লামটি মৌলিক হাকীকতের লাম (যা কোনো فَرْدٌ-এর মাধ্যমে অস্তিত্বশীল হয়েছে) নয়। কেননা, কোনো বিষয়ের حَقِيْقَتْ ও مَاهِيَتْ-এর মধ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব। এ ছাড়া اِسْتِغْرَاقٌ-এর লামও নয়। কারণ, তখনতো উদ্দেশ্য হবে যত বাজার আছে সবগুলোতে প্রবেশ করো। আর এটা যে কোনো মানুষের জন্য অসম্ভব। অতএব এখানে এই প্রমাণ রয়েছে যে, এটি মৌলিক হাকীকতের লাম নয়। আবার اِسْتِغْرَاقٌও উদ্দেশ্য করা সম্ভব নয়। عَهْد خَارِجِيْ যে হবে না তার কথাও ইতঃপূর্বেই বলা হয়েছে। এটিকে মূল লেখক তার ইবারতের মধ্যে لَاعَهْدَ فِيْ الْخَارِجِ বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। অতএব, এটি عَهْد ذِهْنِيْ-এর লাম। এর আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে কুরআনের আয়াতে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর উক্তি; তিনি বলেছিলেন, اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ আয়াতে اَلذِّئْبُ-এর লাম হচ্ছে عَهْد ذِهْنِيْ-এর লাম। কেননা, এটি মূল হাকীকতের লাম নয়। কেননা, তা ভক্ষণ করতে সক্ষম নয়; বরং হাকীকতের اَفْرَادٌ দ্বারা তা সম্ভব। اَفْرَادٌ দ্বারা সব اَفْرَادٌ উদ্দেশ্য নয়। কারণ একজন মানুষকে সব বাঘ মিলে খাবে এটাও অসম্ভব। এখানে এর দ্বারা মুতাকাল্লিম এবং শ্রোতার মাঝের পরিচিত এবং নির্দিষ্ট বাঘের কথাও বলা হয়নি। অতএব, এটা عَهْد خَارِجِيْও নয়। সুতরাং যখন اَلذِّئْبُ-এর আলিফ লাম এ তিন প্রকারের কোনো প্রকারই হলো না, সুতরাং এটি আলিফ-লাম আহদে যাহনী হবে।

সার-সংক্ষেপ : মুসনাদ ইলাইহকে কখনো নির্দিষ্ট করা হয় আলিফ লামের দ্বারা। এই নির্দিষ্টকরণের দ্বারা হাকীকতের প্রতি ইশারা করা হয়। এ ধরনের আলিফ-লামকে اَلِفْ لَامْ حَقِيْقِيْ বলা হয়। اَلِفْ لَامْ حَقِيْقِيْ তিন প্রকার। ক. اَلِفْ لَامْ দ্বারা তাত্ত্বিক হাকীকত বা একটি সুনির্দিষ্ট অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। যেমন– اَلرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْاَةِ. খ. الف لَامْ حَقِيْقِيْ দ্বারা কখনো হাকীকতের একটি فَرْد-এর প্রতি মনে মনে নির্দিষ্ট করত ইঙ্গিত করা হয়। সেহেতু فرد টি হাকীকতেরই অংশ এবং হাকীকতের মোতাবেক, তাই لَامْ حَقِيْقَتْ দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। এটা দ্বারা একটি বিশেষ فَرْدٌ তখনই উদ্দেশ্য করা হয়, যখন এর দ্বারা তাত্ত্বিক হাকীকত উদ্দেশ্য করা যায় না। এটা كُلِّيْ طَبْعِيْ-এর মতো। যেমন– তুমি কাউকে নির্দিষ্ট কোনো বাজার উদ্দেশ্য না করে বললে اُدْخُلِ السُّوْقَ (তুমি বাজারে প্রবেশ করো) কুরআনে এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন– اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ হাকীকতে লামের এ দ্বিতীয় প্রকারকে عَهْد ذِهْنِيْ বলা হয়।

وَهٰذَا فِى الْمَعْنٰى كَالنَّكِرَةِ وَاِنْ كَانَ فِى اللَّفْظِ يَجْرِى عَلَيْهِ اَحْكَامُ الْمَعَارِفِ مِنْ وُقُوْعِهٖ مُبْتَدَأً وَ ذَا حَالٍ وَ وَصْفًا لِلْمَعْرِفَةِ وَمَوْصُوْفًا بِهَا وَنَحْوُ ذٰلِكَ وَاِنَّمَا قَالَ كَالنَّكِرَةِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَفَاوُتٍ مَّا وَهُوَ اَنَّ النَّكِرَةَ مَعْنَاهُ بَعْضُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ جُمْلَةِ الْحَقِيْقَةِ وَهٰذَا مَعْنَاهُ نَفْسُ الْحَقِيْقَةِ وَ اِنَّمَا تُسْتَفَادُ الْبَعْضِيَّةُ مِنَ الْقَرِيْنَةِ كَالدُّخُوْلِ وَالْاَكْلِ فِيْمَا مَرَّ فَالْمُجَرَّدُ وَذُو اللَّامِ بِالنَّظْرِ اِلَى الْقَرِيْنَةِ سَوَاءٌ وَبِالنَّظْرِ اِلٰى اَنْفُسِهِمَا مُخْتَلِفَانِ وَلِكَوْنِهٖ فِى الْمَعْنٰى كَالنَّكِرَةِ قَدْ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ النَّكِرَةِ وَيُوْصَفُ بِالْجُمْلَةِ كَقَوْلِهٖ ع وَلَقَدْ اَمُرُّ عَلَى اللَّئِيْمِ يَسُبُّنِىْ -

অনুবাদ : আর এটা অর্থগতভাবে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মতো যদিও শব্দগতভাবে এর উপর নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক বিশেষ্যের বিধি-বিধান জারি হয়ে থাকে। অর্থাৎ মুবতাদা, যুলহাল, নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক বিশেষ্যের সিফাত এবং এর মাওসূফ ইত্যাদি হতে পারা। তিনি অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মতো বললেন, কেননা, এদের মাঝে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে নাকিরা হওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে, হাকীকতের মধ্য থেকে কোনো একটা অনির্দিষ্ট বিষয়। আর এ হাকীকতের অর্থ। (বাকি রইল عَهْد ذِهْنِىْ-এর অর্থ কোনো একটি অনির্দিষ্ট فَرْد)-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে– কোনো একটি فَرْد সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ও লক্ষণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যেমন– (প্রমাণ হচ্ছে) প্রবেশ করা, খাওয়া ইত্যাদি যার আলোচনা গত হয়ে গেছে। সুতরাং আলিফ-লাম যুক্ত এবং আলিফ-লাম ছাড়া উভয় প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করলে সমান। কিন্তু উভয়েও সত্তাগতভাবে ভিন্ন। যেহেতু তা অর্থগতভাবে অনির্দিষ্টের মতো, তাই কখনো এর সাথে অনির্দিষ্টের ন্যায় ব্যবহার করা হয় এবং জুমলাকে এর সিফাত আনা হয়। কবির কবিতার চরণ (অনুবাদ) : যখন আমি এমন নিকৃষ্ট লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি যে আমাকে গালি দেয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَهٰذَا فِى الْمَعْنٰى الخ : এ ইবারতে عَهْد ذِهْنِىْ-এর আলিফ-লামযুক্ত শব্দের তারকীব সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বলেন, এ জাতীয় আলিফ-লামযুক্ত শব্দ অর্থগতভাবে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মতো। কিন্তু শাব্দিকভাবে এটি অন্যান্য নির্দিষ্ট বিশেষ্যের মতো। অর্থাৎ যেসব বিষয়ে নির্দিষ্ট বিশেষ্য আবশ্যক, সেসব স্থানে এটিকে ব্যবহার করা যায়। নিম্নে এর উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন–

ক. মুবতাদার জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ্য শর্ত। উদাহরণ– اَلذِّئْبُ فِى الْغَابَةِ

খ. যুলহালের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ্য শর্ত। উদাহরণ– رَأَيْتُ الذِّئْبَ خَارِجًا مِنَ الْغَابَةِ

গ. নির্দিষ্ট মাওসূফের জন্য নির্দিষ্ট সিফাত শর্ত। উদাহরণ– زَيْدُ الْكَرِيْمُ عِنْدَكَ

ঘ. নির্দিষ্ট সিফাতের জন্য নির্দিষ্ট মাওসূফ শর্ত। উদাহরণ– اَلْكَرِيْمُ الَّذِىْ فَعَلَ كَذَا فِىْ دَارِ صَدِيْقِكَ

আরো যেসব স্থানে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক বিশেষ্য হওয়া শর্ত সেখানেও এটি ব্যবহৃত হতে পারে।

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا قَالَ كَالنَّكِرَةِ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, মূল লেখক এটিকে অর্থগতভাবে অনির্দিষ্টের মতো বললেন; কিন্তু অনির্দিষ্ট বললেন না কেন? এর উত্তরে তিনি বলেন, অনির্দিষ্ট এবং لام عَهْد ذِهْنِىْ দ্বারা যে বিশেষ্য গঠন হয়েছে তাদের মাঝে সামান্য পার্থক্য আছে। তা হচ্ছে নাকিরাহ যে কোনো অনির্দিষ্ট বিশেষ্যকে বলা হয় এবং এ অনির্দিষ্টতার জন্যই এর সৃষ্টি। পক্ষান্তরে عَهْد ذِهْنِىْ-এর লাম হাকীকতের জন্য সৃষ্ট এবং তা মনের মধ্যে বিদ্যমান ও জ্ঞাত আছে। তবে এর দ্বারা কোনো একটি অনির্দিষ্ট অংশ বুঝানোর বিষয়টি তো তখনই হয়ে

থাকে, যখন কোনো প্রমাণ থাকে। অর্থাৎ (প্রমাণ থাকা অবস্থায়) উভয়টা একই। কেননা, উভয়ে একটি অনির্দিষ্ট অর্থ বুঝিয়ে থাকে। তবে সত্তাগতভাবে উভয়ে এক নয়। কেননা, عَهْد ذِهْنِي-এর লাম হলো হাকীকতের লাম এবং মনের মধ্যে অবগত। অথচ নাকিরার অর্থ যে কোনো অনির্দিষ্ট বিশেষ্য। মোটকথা, উভয়ের মাঝে সামান্য পার্থক্য থাকার কারণেই মুসান্নিফ (র.) একে كَالنَّكِرَةِ বলেছেন, সরাসরি نَكِرَةٌ বলেননি।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ প্রকার অর্থগতভাবে نَكِرَةٌ হওয়ার কারণে কখনো কখনো এর সাথে نَكِرَةٌ-এর মতো আচরণ করা হয়। যেমন এর সিফাত জুমলা দ্বারা আনা হয়, আর জুমলা অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের হুকুমে। যেমন– নিম্নোক্ত কবিতার চরণে এর সিফাত জুমলা হয়েছে– وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِيْ

উক্ত কবিতার চরণে আলিফ-লামযুক্ত عَهْد ذِهْنِيْ হচ্ছে اَللَّئِيْمُ শব্দটি, যা তারকীবের মধ্যে মাওসূফ হয়েছে। এর সিফাত হয়েছে يَسُبُّنِيْ যা (فِعْلٌ, فَاعِلٌ ও مَفْعُوْلٌ মিলে) একটি জুমলা (বাক্য), এখানে জুমলা (যা অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের হুকুম রাখে) সিফাত হওয়াতে তার মাওসূফটিও অনির্দিষ্ট বলেই গণ্য হচ্ছে। অন্যথায় সিফাত এবং তার মাওসূফের মধ্যে تَطَابُقْ হচ্ছে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, اَللَّئِيْمُ-এর লামটি হাকীকত হয়নি। (বরং عَهْد ذِهْنِيْ হয়েছে, এর দলিল হচ্ছে أَمُرُّ ফে'লটি)। আবার এটি اِسْتِغْرَاقِيْও হয়নি কারণ সব নিকৃষ্ট লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার কবি যেহেতু তার মহত্ত্ব এবং ধৈর্যের বর্ণনা দিতে চান, তাই এটি عَهْد خَارِجِيْও হবে না। অতএব যখন অন্য তিন প্রকারের লাম হওয়ার সম্ভাবনা রইল না, তাই এটি عَهْد ذِهْنِيْ-ই হবে। পুরো পঙ্‌ক্তিটি এই–

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِيْ * فَمَضَيْتُ ثُمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِيْنِيْ

কবিতার চরণটির অর্থ– আর যখন আমি এমন নিকৃষ্ট ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করি যে আমাকে গালি দেয়, আমি তখন তাকে পাশ কাটিয়ে যাই এবং বলি সে তো আমাকে বলেনি।

সার-সংক্ষেপ :

اَلِفْ لَامْ عَهْد ذِهْنِيْ দ্বারা যে ইসম مَعْرِفَةٌ হয় তা অর্থগতভাবে نَكِرَةٌ-এর মতো, যদি শাব্দিকভাবে তাতে مَعْرِفَةٌ-এর বিধি-বিধান প্রয়োগ হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, এটি অর্থগতভাবে نَكِرَةٌ -এর মতো হলেও نَكِرَةٌ-এর সাথে তার পার্থক্য রয়েছে। نَكِرَةٌ হাকীকতের অধীন যে কোনো অনির্দিষ্ট فَرْدٌ-কে বুঝায়। আর مُعَرَّفْ بِلَامِ حَقِيْقَتْ দ্বারা হাকীকতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, তবে করীনার কারণে হাকীকতের কোনো একটি فَرْدٌ-এর সাহায্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, অর্থগতভাবে হওয়ার কারণে কখনো শব্দগতভাবে তার نَكِرَةٌ-এর আচরণ করা হয়। যেমন এর সিফাত جُمْلَةٌ-এর সাহায্যে আনা হয়। যেমন– وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيْمِ يَسُبُّنِيْ

وَقَدْ يُفِيْدُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ الْمُشَارُ بِهَا اِلَى الْحَقِيْقَةِ الْاِسْتِغْرَاقَ نَحْوُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اُشِيْرَ بِاللَّامِ اِلَى الْحَقِيْقَةِ لٰكِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِىَ هِىَ وَلَا مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقِهَا فِىْ ضِمْنِ بَعْضِ الْاَفْرَادِ بَلْ فِىْ ضِمْنِ الْجَمِيْعِ بِدَلِيْلِ صِحَّةِ الْاِسْتِثْنَاءِ الَّذِىْ شَرْطُهٗ دُخُوْلُ الْمُسْتَثْنٰى فِى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ لَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِهٖ فَاللَّامُ الَّتِىْ لِتَعْرِيْفِ الْعَهْدِ الذِّهْنِىِّ اَوِ الْاِسْتِغْرَاقِ هِىَ لَامُ الْحَقِيْقَةِ حُمِلَتْ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا بِحَسْبِ الْمَقَامِ وَالْقَرِيْنَةِ وَلِهٰذَا قُلْنَا اِنَّ الضَّمِيْرَ فِىْ قَوْلِهٖ وَقَدْ يَاْتِىْ وَقَدْ يُفِيْدُ عَائِدٌ اِلَى الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ الْمُشَارِ بِهَا اِلَى الْحَقِيْقَةِ وَلَابُدَّ فِىْ لَامِ الْحَقِيْقَةِ مِنْ اَنْ يُقْصَدَ بِهَا الْاِشَارَةُ اِلَى الْمَاهِيَّةِ بِاعْتِبَارِ حُضُوْرِهَا فِى الذِّهْنِ لِيَتَمَيَّزَ عَنْ اَسْمَاءِ الْاَجْنَاسِ النَّكِرَاتِ مِثْلُ الرُّجْعٰى وَ رُجْعٰى وَاِذَا اُعْتُبِرَ الْحُضُوْرُ فِى الذِّهْنِ فَوَجْهُ اِمْتِيَازِهٖ عَنْ تَعْرِيْفِ الْعَهْدِ اَنَّ لَامَ الْعَهْدِ اِشَارَةٌ اِلٰى حِصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ حَقِيْقَةٍ وَاحِدًا كَانَ اَوْ اِثْنَيْنِ اَوْ جَمَاعَةً وَلَامُ الْحَقِيْقَةِ اِشَارَةٌ اِلٰى نَفْسِ الْحَقِيْقَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ اِلَى الْاَفْرَادِ فَلْيَتَاَمَّلْ ـ

অনুবাদ : আর কখনো হাকীকতের লাম দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্য **ইসতিগরাক** (সামগ্রিকতা)-এর **অর্থ প্রদান** করে। যেমন– (اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ) **নিশ্চয়ই সব মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।** (اَلْاِنْسَانُ-এর) লাম দ্বারা হাকীকতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা তাত্ত্বিক হাকীকত উদ্দেশ্য করা হয়নি এবং হাকীকতের অস্তিত্ব কোনো একটি فَرْدٌ-এর মাঝে রয়েছে এটিও ইচ্ছা করা হয়নি; বরং সব اَفْرَادٌ-এর মাধ্যমে এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এর দলিল হচ্ছে ঐ ইসতেছনা (এ ক্ষেত্রে) বিশুদ্ধ হয় যাতে মুসতাছনাটা মুসতাছনা মিনহুর মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শর্ত রয়েছে, যদি মুসতাছনা উল্লেখ না করা হয়। সুতরাং যে লামটি عَهْد ذِهْنِىْ এবং ইসতিগরাকের অর্থ দেয় সেটিই লামে হাকীকত। আমরা যা উল্লেখ করলাম তার অর্থে নেওয়া হয়েছে অবস্থা ও পরিস্থিতি এবং করীনার ভিত্তিতে। এ কারণেই আমরা বলেছি قَدْ يَاْتِىْ এবং وَقَدْ يُفِيْدُ-এর সর্বনাম এমন লামের দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্যের প্রতি ফিরেছে যার মুশারুন ইলাইহ হচ্ছে হাকীকত। হাকীকতের লামের মধ্যে মাহিয়াতের প্রতি ইশারা করা জরুরি তা অন্তরে বিদ্যমান থাকার কারণে, যাতে তা اَسْمَاءُ اَجْنَاسْ نَكِرَاتٌ থেকে পৃথক হয়ে যায়। যেমন– الرُّجْعٰى ও رُجْعٰى। আর যখন এতে অন্তরে বিদ্যমান হওয়ার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করা হলো এমতাবস্থায় এর সাথে عَهْد خَارِجِىْ দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্যের পার্থক্য হচ্ছে এভাবে যে, عَهْد خَارِجِىْ-এর লাম ইঙ্গিত করে হাকীকতের একটি নির্দিষ্ট অংশের প্রতি, চাই সেটি একবচন অথবা দ্বিবচন কিংবা বহুবচন (যাই হোক না কেন?) আর হাকীকতের লাম ইঙ্গিত করে তাত্ত্বিক হাকীকতের প্রতি, এতে اَفْرَادْ-এর প্রতি দৃষ্টি থাকে না। অতএব, আপনি ভেবে দেখুন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَقَدْ يُفِيْدُ الْمُعَرَّفُ الخ : মূল লেখক বলেন, হাকীকতের লাম দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্য কখনো ইসতিগরাক তথা সামগ্রিকতার অর্থ প্রদান করে।

ইতঃপূর্বে আমাদের আলোচনায় একথা বিবৃত হয়েছে যে, হাকীকতের লাম দ্বারা কখনো তাত্ত্বিক হাকীকতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় যেখানে اَفْرَادْ-এর মাধ্যমে এর অস্তিত্বের বিষয়টি লক্ষণীয় হয় না। আবার এটি কখনো এমন হাকীকতের প্রতি ইঙ্গিত করে যা তার اَفْرَادْ থেকে কোনো একটির মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে অস্তিত্ব লাভ করে. একে পরিভাষায় لَامْ عَهْد ذِهْنِىْ বলা হয়।

আবার কখনো এমন হাকীকতের প্রতি ইঙ্গিত করে যা তার অধীন সব فَرْدْ-এর মধ্যে অস্তিত্ব লাভ করে। একে পরিভাষায় لَامْ اِسْتِغْرَاقْ বলা হয়। এর উদাহরণ মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ এখানে اَلْاِنْسَانْ-এর মধ্যে যে আলিফ লাম রয়েছে এর দ্বারা হাকীকতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা তাত্ত্বিক হাকীকত উদ্দেশ্য নয় যেমনটি জিনসের মধ্যে এবং প্রথম প্রকারে উদ্দেশ্য হয়েছে: বরং এটি তার সব فَرْدْ-এর মাধ্যমে বিকশিত হয় এবং অস্তিত্ব লাভ করে।

এখন যদি কেউ বলেন যে, এটি কিভাবে اِسْتِغْرَاقْ হলো? এর দলিল কি? এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন بِدَلِيْلِ صِحَّةِ الْاِسْتِثْنَاءِ الَّذِىْ الخ অর্থাৎ এটি اِسْتِغْرَاقِىْ হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে– আমাদের উল্লিখিত উদাহরণে اَلْاِنْسَانْ-এর পর اِلَّا দ্বারা ইসতিছনা করা হয়েছে। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হচ্ছে মুসতাছনায়ে মুত্তাসিল। আর আমরা জানি মুসতাছনায়ে মুত্তাসিলের মধ্যে মুসতাছনা তার মুসতাছনা মিনহুর অন্তর্ভুক্ত থাকা জরুরি। আর এটা প্রমাণ করে মুসতাছনা মিনহু ব্যাপক এবং এর মধ্যে অনেক فَرْدْ রয়েছে; অন্যথায় মুসতাছনা মুসতাছনা মিনহুর মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতো না।

মোটকথা, মুসতাছনা তার মুসতাছনা মিনহুর মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দ্বারা তার ব্যাপকতা বুঝায়। আর উক্ত ব্যাপকতার اَلِفْ لَامْ ইসতিগরাকের জন্য তা প্রমাণ হয়ে গেল। ইসতিগরাকের তরজমা অনুসারে অর্থ হবে সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

সুতরাং اَلْاِنْسَانْ-এর আলিফ-লাম এখানে হাকীকতের জন্য হতে পারবে না। কেননা, তখন ইসতিছনা সহীহ হবে না, হাকীকতের লাম বলা হলে তাতে اَفْرَادْ অন্তর্ভুক্ত হবে না, اَفْرَادْ অন্তর্ভুক্ত না হলে اَفْرَادْ-এর ইসতিছনা হচ্ছে না। عَهْد ذِهْنِىْ-এর লামও বলা যাচ্ছে না, কারণ এতেও সমস্যা। عَهْد ذِهْنِىْ-এর মধ্যে হাকীকতের অনির্দিষ্ট কিছু فَرْدْ শামিল হয়। এমতাবস্থায় মুসতাছনা মুসতাছনা মিনহুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া অনিশ্চিত। অতএব, ইসতিছনা সঠিক হচ্ছে না।

যেহেতু উক্ত দু' অবস্থায় ইসতিছনা সঠিক হচ্ছে না, অথচ আল্লাহ তা'আলা ইসতিছনা করেছেন, তাই এ দু'টি অবস্থা সঠিক নয়। একইভাবে لَامْ عَهْد خَارِجِىْ হতে পারে না; বরং ইসতিছনার জন্য এটা আরো সমস্যাপূর্ণ। অতএব, আয়াতের اَلْاِنْسَانْ-এর লাম নিশ্চিতভাবেই اِسْتِغْرَاقْ-এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاللَّامُ الَّتِىْ لِتَعْرِيْفِ الْعَهْدِ الخ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ হাকীকতের দু'লাম যে, কখনো তাত্ত্বিক হাকীকত না বুঝিয়ে অন্য দু'প্রকার যথা– عَهْد ذِهْنِىْ ও اِسْتِغْرَاقِىْ-এর জন্য ব্যবহার হয় তারই বিশ্লেষণ করছেন। তিনি বলেন, عَهْد ذِهْنِىْ এবং اِسْتِغْرَاقِىْ-এর লাম মূলত হাকীকতের লাম। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এবং প্রমাণ সাপেক্ষে হাকীকতের লামকে عَهْد ذِهْنِىْ এবং اِسْتِغْرَاقْ-এর অর্থে ব্যবহার করা হয়। এ দু অর্থে ব্যবহারকালীন সময়েও লাম হাকীকতের জন্যই হবে। তবে তখন তাত্ত্বিক হাকীকত উদ্দেশ্য হবে না এবং তিন অবস্থাতেই হাকীকত মূল উদ্দেশ্য হবে। সব فَرْدْ অথবা কতিপয় فَرْدْ কোনোটাই মূল উদ্দেশ্য নয়। আর لَامْ عَهْد خَارِجِىْ হচ্ছে ভিন্ন প্রকার।

অতএব, লাম মূলত দু' প্রকার : ১. লামে হাকীকত, ২. লামে আহদে খারেজী। প্রথম প্রকারের অধীনে তিনটি প্রকার রয়েছে। এতে মোট চার প্রকার হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَلَابُدَّ فِىْ لَامِ الْحَقِيْقَةِ مِنْ اَنْ يُقْصَدَ : মুসান্নিফ (র.) এ বাক্য দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি বুঝার জন্য কয়েকটি কথা জেনে নেওয়া দরকার। প্রথমত اِسْم جِنْس نَكِرَةٌ যদি মাসদার হয়, তাহলে সবার মতে তার অর্থ এবং দালালত নিশ্চিতভাবে হাকীকত হবে। যেমন– ذِكْرٰى، بُشْرٰى এমনিভাবে اِسْم جِنْس যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলেও এটি নিশ্চিতভাবে হাকীকতের অর্থ প্রদান করে। তবে যদি اِسْم جِنْس মাসদার না হয়ে نَكِرَةٌ (আলিফ-লাম ছাড়া) হয়। যেমন– رَجُلٌ- اَسَدٌ ইত্যাদি তবে এ প্রকারে মতবিরোধ রয়েছে। কতিপয় লোক মনে করেন এটি عَهْد ذِهْنِىْ অর্থাৎ অনির্দিষ্ট فَرْدْ-এর অর্থ প্রদান করে। আবার অন্যরা মনে করে এটি তাত্ত্বিক হাকীকতের অর্থ দেয়।

এখন মূল প্রশ্নটিতে আসা যাক, প্রশ্নটি হচ্ছে হাকীকতের লাম যা ইসমে জিনসের মধ্যে আসে এটা হয়তো তাত্ত্বিক হাকীকত এবং মাহিয়াত বুঝানো উদ্দেশ্য হবে, যাতে মনে কোনো কিছু বিদ্যমান হওয়া বা নিশ্চিত হওয়ার অর্থ থাকবে না। অথবা এমন মাহিয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করবে, যা মনে বিদ্যমান এবং নির্দিষ্ট থাকবে।

প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে প্রশ্ন সৃষ্টি হবে যে, আলিফ-লামযুক্ত নির্দিষ্ট اِسْمُ جِنْس যেমন– اَلذِّكْرٰى وَالرُّجْعٰى এবং আলিফ-লামমুক্ত অনির্দিষ্ট اِسْم جِنْس-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য রইল না। কেননা, উভয়টাই এমন হাকীকতের অর্থ দেয় যা মনে বিদ্যমান ও নির্দিষ্ট থাকে না। আবার দু'টির মধ্যে পার্থক্য না থাকার কথাও অস্বীকার করা যায় না। কেননা, আলিফ-লামযুক্ত (নির্দিষ্ট) এবং আলিফ-লামমুক্ত (অনির্দিষ্ট) উভয়ের মাঝে অবশ্যই পার্থক্য আছে।

আর যদি বলেন, দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য, তাহলেও সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। কেননা, তখন হাকীকতের লাম এবং عَهْد خَارِجِىْ-এর লামের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। কেননা, উভয়ের মধ্যে অন্তরে উপস্থিতি থাকে এবং নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের মতে হাকীকতের লামের অর্থ দ্বিতীয়টি। অর্থাৎ হাকীকতের লাম যা اِسْم جِنْس-এর মধ্যে এসেছে তা দ্বারা অন্তরে বিদ্যমান আছে, এই ভিত্তিতে মাহিয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। এ সংজ্ঞার ভিত্তিতে হাকীকতের লাম এবং عَهْد خَارِجِىْ-এর লামের মাঝে কোনো ধরনের পার্থক্য না থাকাকে আমরা স্বীকার করি না। কেননা, لَامْ حَقِيْقَتْ-এর حَقِيْقَتْ حَاضِرَهْ مُعَيَّنَهْ فِى الذِّهْن টি مُشَارٌ اِلَيْه হয়ে থাকে। আর لَامْ عَهْد خَارِجِىْ-এর حَقِيْقَتْ مُعَيَّنَهْ فِى الذِّهْن টি مُشَارٌ اِلَيْه-এর اَفْرَادْ সমূহের একটি নির্দিষ্ট فَرْد হয়ে থাকে। আর حَقِيْقَتْ عَلَمِىّ-এর حَقِيْقَتْ-এর فَرْد-এর মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। আর ২য় অর্থ উদ্দেশ্য হলে مُعَرَّفْ بِلَامْ حَقِيْقَتْ এবং اِسْمُ جِنْس حَاضِرْ-এর মাঝেও পার্থক্য হয়ে যাবে। তা এ ভাবে যে, مُعَرَّفْ لَامْ حَقِيْقَتْ-এর মধ্যে লাম দ্বারা مَاهِيَتْ-এর দিকে مُنَكَّرْ فِى الذِّهْن এবং مُعَيَّنْ فِى الذِّهْن হওয়ার হিসাবে ইঙ্গিত হয়। আর اِسْم جِنْس مُنَكَّرْ مَصْدَرْ দ্বারা مَاهِيَتْ-এর দিকে ইঙ্গিত হয় বটে, কিন্তু حُضُوْرْ فِى الذِّهْن এবং تَعَيُّنْ فِى الذِّهْن-এর কোনো লক্ষ্য হয় না। এ জবাবটিকেই সুস্পষ্ট করার জন্য لَابُدَّ দ্বারা বলেন যে, লামে হাকীকতের মধ্যে حُضُوْرُ الْمَاهِيَت فِى الذِّهْن হিসেবে মাহিয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। যাতে করে এটা اِسْمُ جِنْس مُنَكَّرْ থেকে পৃথক হয়ে যায়, যেমন اَلرُّجْعٰى এবং رُجْعٰى আর যখন حُضُوْرْ فِى الذِّهْن-এর اِعْتِبَارْ করা হবে তখন لَامْ عَهْد সংজ্ঞা থেকে এভাবে হবে যে, لَامْ عَهْد দ্বারা حَقِيْقَتْ-এর নির্দিষ্ট অংশের দিকে ইঙ্গিত করা হবে, চাই তা একদিন দু'দিন বা দুয়ের অধিক হোক না কেন। আর لَامْ حَقِيْقَتْ দ্বারা কোনো اَفْرَادْ-এর কোনো সংখ্যা নির্বিশেষে نَفْس الْحَقِيْقَتْ-এর দিকে ইঙ্গিত করা হবে। ব্যাপারটি বুঝে নেওয়া উচিত।

সার-সংক্ষেপ :

ক. اَلِفْ لَامْ কখনো اِسْتِغْرَاقِىْ ও হয়ে থাকে। ইসতিগরাকের অর্থ হচ্ছে আলিফ-লাম দ্বারা জিনসের অধীন সমস্ত فَرْد-কে এক সাথে উদ্দেশ্য করা। যেমন– اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ এ আয়াতের اَلْاِنْسَانْ-এর আলিফ-লাম দ্বারা মানুষের সব সদস্য উদ্দেশ্য। এর দলিল হলো, এরপর উল্লিখিত ইসতিছনা (اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا)। এখানে যদি আলিফ-লাম ইসতিগরাকের জন্য না হয়, তাহলে আয়াতের ইসতিছনা শুদ্ধ হবে না।

খ. اِسْم جِنْس مُنَكَّرْ এবং لَامْ حَقِيْقَتْ-এর মাঝে পার্থক্য এই যে, لَامْ حَقِيْقَتّ-এর মাঝে مَاهِيَتْ-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়, কিন্তু اِسْم جِنْس مُنَكَّرْ-এর মাঝে এমন কোনো ইঙ্গিত থাকে না।

গ. لَامِ حَقِيْقَتْ এবং لَامْ عَهْد خَارِجِىّ -এর পার্থক্য হলো– لَامْ عَهْد خَارِجِىّ-এর মধ্যে ইঙ্গিত করা হয় হাকীকতের কোনো সুনির্দিষ্ট فَرْد-এর দিকে, আর لَامْ حَقِيْقِىْ-এর মাঝে ইঙ্গিত করা হয় হাকীকতের দিকে।

وَهُوَ اَيِ الْاِسْتِغْرَاقُ ضَرْبَانِ حَقِيْقِيٌّ وَهُوَ اَنْ يُّرَادَ كُلُّ فَرْدٍ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ بِحَسْبِ اللُّغَةِ نَحْوُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَىْ عَالِمُ كُلِّ غَيْبٍ وَشَهَادَةٍ وَعُرْفِيٌّ وَهُوَ اَنْ يُّرَادَ كُلُّ فَرْدٍ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ بِحَسْبِ مُتَفَاهَمِ الْعُرْفِ نَحْوُ جَمَعَ الْاَمِيْرُ الصَّاغَةَ اَىْ صَاغَةَ بَلَدِهٖ اَوْ اَطْرَافِ مَمْلَكَتِهٖ لِاَنَّهُ الْمَفْهُوْمُ عُرْفًا لَاصَاغَةُ الدُّنْيَا قِيْلَ اَلْمِثَالُ مَبْنِيٌّ عَلٰى مَذْهَبِ الْمَازِنِىْ وَاِلَّا فَاللَّامُ فِىْ اِسْمِ الْفَاعِلِ عِنْدَ غَيْرِهٖ مَوْصُوْلٌ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ الْخِلَافَ اِنَّمَا هُوَ فِىْ اِسْمِ الْفَاعِلِ بِمَعْنَى الْحُدُوْثِ دُوْنَ غَيْرِهٖ نَحْوُ اَلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَالْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ لِاَنَّهُمْ قَالُوْا هٰذِهِ الصِّلَةُ فِعْلٌ فِىْ صُوْرَةِ الْاِسْمِ فَلَابُدَّ فِيْهِ مِنْ مَعْنَى الْحُدُوْثِ وَلَوْ سُلِّمَ فَالْمُرَادُ تَقْسِيْمُ مُطْلَقِ الْاِسْتِغْرَاقِ سَوَاءٌ كَانَ بِحَرْفِ التَّعْرِيْفِ اَوْ غَيْرِهٖ وَالْمَوْصُوْلُ اَيْضًا مِمَّا يَأْتِىْ لِلْاِسْتِغْرَاقِ نَحْوُ اَكْرِمِ الَّذِيْنَ يَاْتُوْنَكَ اِلَّا زَيْدًا وَاضْرِبِ الْقَائِمِيْنَ اِلَّا عَمْرًوا ـ

অনুবাদ : **আর তা** অর্থাৎ ইসতিগরাক **দু' প্রকার হাকীকী,** আর তা হচ্ছে শব্দ অভিধানগতভাবে যতগুলো فَرْد কে শামিল করে সবগুলোর ইচ্ছা করা, **যেমন– তিনি দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত।** অর্থাৎ **প্রত্যেকটি দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান বস্তু সম্পর্কে জানেন এবং উরফী** (বাস্তবতার নিরিখে) আর তা হচ্ছে সাধারণ লোকের জ্ঞানানুসারে শব্দগুলো যেসব فَرْد-কে শামিল করে তার ইচ্ছা করা। **যেমন আমীর স্বর্ণকারদের একত্রিত করেছেন, অর্থাৎ তার শহরের অথবা রাজ্যের স্বর্ণকারদের।** কেননা, এটাই সাধারণ লোকদের ধারণা ও বিশ্বাস, গোটা পৃথিবীর স্বর্ণকার নয়। কেউ কেউ বলেন, উদাহরণটি মাযানীর মাযহাবানুসারে সঠিক। অন্য মতে ইসমে ফায়েলের আলিফ লাম তো ইসমে মাওসূলের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ মতেও সমস্যা রয়েছে। কেননা, মতবিরোধ হলো ঐ ইসমে ফায়েলের ব্যাপারে, যা ক্ষণস্থায়ী অর্থ প্রদান করে, সব ইসমে ফায়েলের ব্যপারে নয়। যেমন– বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, জ্ঞানী ও মূর্খ। কেননা, তারা বলে, এসব সিলাহ ইসমের আকৃতিতে ফে'ল, তাই এতে ক্ষণস্থায়ী অর্থ আবশ্যক। যদি (উপরোক্ত মত) মেনেও নেওয়া হয়, তাহলে উদ্দেশ্য হবে সাধারণ ইসতিগরাকের প্রকারভেদ, চাই সেটা নির্দিষ্টকরণের অক্ষর দ্বারা হোক অথবা অন্যভাবে। ইসমে মাওসূলও ইুসতিগরাক-এর জন্য আসে, যেমন– যারা তোমার কাছে আগমন করে তাদের সবাইকে সম্মান করো যায়েদ ব্যতীত এবং আমরকে ছাড়া সব দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে প্রহার করো।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَهُوَ اَىْ اَلْاِسْتِغْرَاقُ الخ : মূল লেখক বলেন, ইসতিগরাক (ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতা) সাধারণভাবে দু' প্রকার। এক. حَقِيْقِىٌّ (প্রকৃত) দুই عُرْفِىٌّ (প্রচলন ও প্রসিদ্ধির নিরিখে)। اِسْتِغْرَاقْ حَقِيْقِىْ (প্রকৃত সামগ্রিকতা) বলা হয় শব্দের দ্বারা এমন সব اَفْرَادْ (সদস্যদের) ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য করা, যাদেরকে শব্দ আভিধানিকভাবে এবং মূল ব্যবহার অনুসারে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বলা হচ্ছে– তিনি عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ তিনি সব অদৃশ্য এবং দৃশ্যজগৎ সম্পর্কে জানেন। এখানে اَلْغَيْبُ এবং اَلشَّهَادَةُ-এর মধ্যে প্রকৃত সামগ্রিকতাকে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যত অদৃশ্য এবং দৃশ্য বস্তু রয়েছে, তিনি সবই জানেন, শব্দ তার আভিধানিক অর্থে যতটুকুকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, এখানে এর সবটুকুই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। اِسْتِغْرَاقْ عُرْفِىْ বলা হয় শব্দ দ্বারা সাধারণ মানুষ যে অর্থ বুঝে তাই উদ্দেশ্য করা। আভিধানিকভাবে শব্দ যত অর্থ ও বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে তা উদ্দেশ্য না করা। যেমন কেউ বলল, جَمَعَ الْاَمِيْرُ الصَّاغَةَ অর্থাৎ শাসনকর্তা সব স্বর্ণকারদের একত্রিত করেছেন, এখানে اَلصَّاغَةُ (স্বর্ণকার) দ্বারা পৃথিবীর তামাম স্বর্ণকার উদ্দেশ্য নয়। সাধারণ মানুষ এ অর্থ বুঝেও না; বরং এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরের সব স্বর্ণকারকে অথবা শাসনকর্তা দেশের অভ্যন্তরে যত স্বর্ণকার আছে সবাইকে একত্রিত করেছেন। যদিও اَلصَّاغَةُ শব্দটি আভিধানিকভাবে পৃথিবীর সকল স্বর্ণকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কেউ কেউ বলেন, ইমাম মাযানীর মাযহাবানুসারে اَلصَّاغَةُ ইসতিগরাক-এর উদাহরণ হবে। অন্য সব নাহুবিদদের মতানুসারে এটি ইসতিগরাকের উদাহরণ হতে পারে না। কেননা, ইমাম মাযানী মনে করেন, ইসমে ফায়েল এবং মাফউলের উপর যত লাম আসে তা নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক লাম। অন্য দিকে সকলের মতে ইসমে ফায়েল এবং মাফউলের উপর যে লাম আসে তা ইসমে মাওসূলের লাম। اَلصَّاغَةُ বহুবচন, এর একবচন হলো صَائِغٌ (اِسْمُ فَاعِلٍ) জমহুরের মতে যেহেতু এটি ইসমে মাওসূল-এর লাম তাই এটি اِسْتِغْرَاقْ-এর অর্থ দেবে না। আর ইমাম মাযানীর মতানুসারে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক লাম হওয়াতে اِسْتِغْرَاقْ-এর অর্থ দেবে। অতএব, এটি اِسْتِغْرَاقْ-এর উদাহরণও হবে।

قَوْلُهُ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ الْخِلَافَ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) কতিপয় লোকের উক্ত ব্যাখ্যার উপর আপত্তি তোলেন, তিনি বলেন, মাযানী এবং জমহুরের মাঝে মতবিরোধ সবক্ষেত্রে নয়; বরং বিশেষ ক্ষেত্রে। সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউল যখন حُدُوْث (ক্ষণস্থায়ী)-এর ধারণ করে এমতাবস্থায় যদি উক্ত ইসমে ফায়েল এবং মাফউলের উপর আলিফ-লাম আসে তখন ইমাম মাযানীর মতে উক্ত আলিফ-লাম নির্দিষ্টজ্ঞাপক। আর জমহুরের মতে তা ইসমে মাওসূল। পক্ষান্তরে ইসমে ফায়েল ও মাফউলের অর্থ যদি স্থায়ী ও দৃঢ়তাজ্ঞাপক হয়, যেমন– مُؤْمِنٌ (বিশ্বাসী), كَافِرٌ (অবিশ্বাসী), عَالِمٌ (জ্ঞানী) ও جَاهِلٌ (মূর্খ) ইত্যাদি। এমতাবস্থায় উভয় মাযহাব মতে তা নির্দিষ্টজ্ঞাপক লাম হবে। اَلصَّاغَةُ যেহেতু দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাই এর নির্দিষ্টজ্ঞাপক লাম হওয়াতে কোনো মতবিরোধ রইল না। অতএব, উভয় মতেই তা اِسْتِغْرَاقْ-এর লাম হতে পারে।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُمْ قَالُوْا هٰذِهٖ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ জমহুরের পক্ষে দলিল বর্ণনা করেছেন, জমহুর বলেন ইসমে ফায়েল এবং ইসমে মাফউল যদি حُدُوْث (কাল নির্ভর ক্রিয়ার) অর্থ প্রদান করে তাহলে লাম ইসমে মাওসূলের অর্থে হবে। নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক হবে না। কেননা, উক্ত ইসমে ফায়েল এবং ইসমে মাফউল যা লামের তথা ইসমে মাওসূলের সিলাহ হচ্ছে, বাহ্যিকভাবে বিশেষ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি ফে'লের অর্থে হয়েছে। ইসমে ফায়েল এ ক্ষেত্রে فِعْل مَعْرُوْف-এর এবং ইসমে মাফউল فِعْل مَجْهُوْل-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এটা সকলেরই জানা আছে যে, নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক লাম ফে'লের উপর আসে না। তা শুধুমাত্র ইসমের সাথে খাস। অতএব, এ জাতীয় ইসমে ফায়েল এবং মাফউলের লাম ইসমে মাওসূলের জন্যই হবে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক লাম হবে না। আমাদের আলোচ্য শব্দ اَلصَّاغَةُ যেহেতু স্থায়িত্বের অর্থ প্রদান করে তাই এটি নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক লাম এবং এখানে اِسْتِغْرَاقْ-এর অর্থ প্রদান করে। অতএব, اَلصَّاغَةُ যেভাবে ইমাম মাযানীর মতে ইসতিগরাকের অর্থ প্রদান করেছে, তেমনি জমহুরের মতেও তা ইসতিগরাকেরই উদাহরণ। তাই কতিপয় লোকের দাবি যে, তা কেবল মাযানীর মতে ইসতিগরাকের লাম, এ কথা প্রমাণিত হলো না।

قَوْلُهُ وَلَوْ سُلِّمَ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ কতিপয় লোকের আপত্তির جَوَابْ تَسْلِيْمِيْ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় যে, ইমাম মাযানী এবং জমহুরের মাঝে সাধারণ ইসমে ফায়েল এবং ইসমে মাফউলের মাঝেই মতবিরোধ অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে এ মতবিরোধ রয়েছে। মাযানীর মতে, ইসমে ফায়েলের এবং মাফউলের শুরুতে আসা লাম হলো নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনের জন্য। আর জমহুরের মতে, তা ইসমে মাওসূলের লাম, তবু এতে ইসতিগরাক-এর অর্থ পাওয়া সম্ভব। আর এটা এভাবে যে, তখন আমাদের ইসতিগরাকের দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সাধারণ ইসতিরাকের প্রকার, সেটা লাম দ্বারা যেমন হতে পারে, অন্যভাবেও হতে পারে, তেমনি এটা ইসমে মাওসূলও হতে পারে, যেমন– اَكْرِمِ الَّذِيْنَ يَاْتُوْنَكَ اِلَّا زَيْدًا এটি প্রকৃত ইসতিগরাকের উদাহরণ اِلَّا زَيْدًا-এর اِسْتِثْنَاءٌ দ্বারা এটা প্রমাণ হয় যে, সম্বোধিত ব্যক্তির কাছে যত লোক আসবে যায়েদকে ছাড়া সবাইকে সম্মান করবে। এখানে اَلَّذِيْنَ দ্বারা সবাই উদ্দেশ্য অর্থাৎ اِسْتِغْرَاقْ حَقِيْقِيْ-ই উদ্দেশ্য। ইসমে মাওসূলের মাঝে اِسْتِغْرَاقْ عُرْفِيْ-এর উদাহরণ হচ্ছে اِضْرِبِ الْقَائِمِيْنَ اِلَّا عَمْرًا এটাও اِسْتِغْرَاقْ-এর উদাহরণ, এর প্রমাণ হচ্ছে এখানে اِسْتِثْنَاءْ হয়েছে। ইসতিছনা প্রমাণ করে যে, তার مُسْتَثْنٰى مِنْهُ ব্যাপক এবং তাতে ইসতিগরাকের অর্থ বিদ্যমান। তবে حَقِيْقِيْ-এর উদাহরণ নয়; বরং عُرْفِيْ-এর উদাহরণ। কেননা, সারা পৃথিবীর সব মানুষকে প্রহার করা সম্ভব নয়, তার আদেশও কেউ দেবে না। অতএব, বুঝা গেল বিশেষ স্থানের কিছু দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে প্রহার করার নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়েছে। সারা পৃথিবীর সবাইকে নয়। আর এটাই হচ্ছে اِسْتِغْرَاقْ عُرْفِيْ।

সার-সংক্ষেপ :

ইসতিগরাক দু' প্রকার। ক. اِسْتِغْرَاقْ حَقِيْقِيْ খ. اِسْتِغْرَاقْ عُرْفِيْ

اِسْتِغْرَاقْ حَقِيْقِيْ বলা হয় এমন ইসতিগরাককে যার শব্দের চাহিদানুপাতে সমস্ত فَرْدْ শামিল হয়। যেমন– عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ অর্থ– সব দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত।

اِسْتِغْرَاقْ عُرْفِيْ : বলা হয় এমন ইসতিগরাককে, যার মধ্যে প্রচলিত ধারণানুযায়ী শব্দ দ্বারা اَفْرَادْ উদ্দেশ্য অর্থাৎ শব্দ দ্বারা সাধারণ মানুষ যেরূপ অর্থ বুঝে থাকে ততটুকু উদ্দেশ্য করা। যেমন– جَمَعَ الْاَمِيْرُ الصَّاغَةَ শাসনকর্তা শহরের বা দেশের সব স্বর্ণকারদের একত্রিত করেছেন। শব্দের চাহিদানুযায়ী পৃথিবীর সব স্বর্ণকার এখানে উদ্দেশ্য নয়। জমহুরের মতে স্থায়িত্বের অর্থ প্রদানকারী ইসমে ফায়েলের প্রথমে যে اَلِفْ ـ لَامْ আসে তা ইসমে মাওসূলের اَلِفْ لَامْ নয়। ইমাম মাযানীর মতানুযায়ী যে কোনো ইসমে ফায়েলের اَلِفْ ـ لَامْ নির্দিষ্টজ্ঞাপক। অতএব, সবার মতে اَلصَّاغَةُ-এর اَلِفْ ـ لَامْ হচ্ছে নির্দিষ্টবাচক তথা ইসতিগরাকের اَلِفْ لَامْ।

وَ اسْتِغْرَاقُ الْمُفْرَدِ سَوَاءً كَانَ بِحَرْفِ التَّعْرِيْفِ أَوْ غَيْرِهٖ أَشْمَلُ مِنْ اِسْتِغْرَاقِ الْمُثَنّٰى وَالْمَجْمُوْعِ بِمَعْنٰى أَنَّهٗ يَتَنَاوَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْاَفْرَادِ وَالْمُثَنّٰى يَتَنَاوَلُ كُلَّ اِثْنَيْنِ وَالْجَمْعُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ جَمَاعَةٍ بِدَلِيْلِ صِحَّةِ لَا رِجَالَ فِى الدَّارِ اِذَا كَانَ فِيْهَا رَجُلٌ اَوْ رَجُلَانِ دُوْنَ لَارَجُلَ فَاِنَّهٗ لَايَصِحُّ اِذَا كَانَ فِيْهَا رَجُلٌ اَوْ رَجُلَانِ وَهٰذَا فِى النَّكِرَةِ الْمَنْفِيَّةِ مُسَلَّمٌ وَاَمَّا فِى الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ فَلَا بَلِ الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِلَامِ الْاِسْتِغْرَاقِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْاَفْرَادِ عَلٰى مَا ذَكَرَهٗ اَكْثَرُ اَئِمَّةِ الْاُصُوْلِ وَالنَّحْوِ دَلَّ عَلَيْهِ الْاِسْتِقْرَاءُ وَاَشَارَ اِلَيْهِ اَئِمَّةُ التَّفْسِيْرِ وَقَدْ اَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ فِى الشَّرْحِ فَلْيُطَالِعْ ثَمَّهٗ ـ

অনুবাদ : আর **একবচনের ইসতিগরাক**, চাই তা নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক হরফের মাধ্যমে হোক বা অন্যভাবে, আধিক্যজ্ঞাপক দ্বিবচন এবং বহুবচনের ইসতিগরাক থেকে। কেননা, এটি (একবচনের ইসতিগরাক) প্রত্যেকটি فَرْدٌ-কে **অন্তর্ভুক্ত করে।** দ্বিবচন প্রত্যেক দ্বিবচনকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং বহুবচন প্রত্যেক দল এবং বহুজনকে অন্তর্ভুক্ত করে। **এর দলিল** لَارِجَالَ فِى الدَّارِ **বলাটা শুদ্ধ, যখন ঘরে একজন অথবা দু'জন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে** لَا رَجُلَ **বলা যাবে না।** কেননা, যখন ঘরে একজন অথবা দু'জন থাকবে তখন لَارَجُلَ فِى الدَّارِ বাক্যটি বলা শুদ্ধ হবে না। এ নিয়ম অনির্দিষ্ট না-বাচক বাক্যের ক্ষেত্রে তো গ্রহণযোগ্য, তবে লাম দ্বারা নির্দিষ্ট শব্দের ক্ষেত্রে এ বিধান নয়; বরং ইসতিগরাকের লাম দ্বারা নির্দিষ্ট বহুবচনও প্রত্যেকটি فَرْدٌ-কে শামিল করে। এটি অধিকাংশ মূলনীতিশাস্ত্রবিদ এবং নাহুবিদগণের মতানুসারে। সাধারণ ব্যবহারও বিষয়টিকে সমর্থন করে। এর প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন তাফসীর বিশারদগণ। এ প্রসঙ্গে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি ব্যখ্যাগ্রন্থে (মুতাওয়াল্লে) সুতরাং বিষয়টি সেখানে দেখে নেওয়া উচিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَ اسْتِغْرَاقُ الْمُفْرَدِ الخ : ইসমে জিনস একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন তিনভাবেই ব্যবহার হতে পারে। এ তিন প্রকারের মধ্যে যদি ইসতিগরাকের অর্থ প্রদানকারী কোনো অক্ষর আসে (যথা– نَكِرَةٌ-এর উপর حَرْفُ نَفِيْ বা لَامْ اِسْتِغْرَاقْ ইত্যাদি হওয়া) তাহলে উক্ত তিন প্রকারের মধ্যে মূল লেখকের দাবি মতে একবচন সবচেয়ে বেশি ব্যাপক হবে এবং সবচেয়ে বেশি فَرْدٌ-কে অন্তর্ভুক্ত করবে। তুলনামূলকভাবে দ্বিবচন এবং বহুবচনের মধ্যে এই ব্যাপকতা কম হবে। কেননা, একবচনের ইসতিগরাক হলে সব সদস্য বহুবচন, দ্বিবচন এবং একবচন সবই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কোনো সদস্য তার থেকে বাদ পড়বে না। পক্ষান্তরে দ্বিবচনের ইসতিগরাকে একবচন বাদ পড়বে, বহুবচনের ইসতিগরাকে এক এবং দ্বিবচন বের হয়ে যাবে অর্থাৎ দ্বিবচন দুই থেকে শুরু করে উপরের সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে। বহুবচন তিন থেকে শুরু করে তার চেয়ে বেশি সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যেমন– لَا رِجَالَ فِى الدَّارِ (ঘরে অনেক পুরুষ নেই) যখন ঘরে একজন অথবা দু'জন পুরুষ থাকবে তখনও বাক্যটির অর্থ ঠিকই থাকবে। কারণ, বাক্যটিতে দুয়ের অধিক লোক নেই এ কথা বলা হয়েছে; দু' বা দুয়ের কম লোক থাকার কথা বা না থাকার কথা কিছুই বলা হয়নি। এমনিভাবে لَا رَجُلَيْنِ فِى الدَّارِ (ঘরে দু'জন পুরুষ নেই) ঘরে একজন পুরুষ থাকলেও বাক্যটি সঠিক হবে। পক্ষান্তরে ঘরে একজন অথবা দু'জন থাকা অবস্থায় لَا رَجُلَ فِى الدَّارِ বলা সঠিক হবে না; বরং বাক্যটি তখনই বলা সঠিক হবে, যখন ঘরে একজনও না থাকে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا فِى النَّكِرَةِ الْمَنْفِيَّةِ الخ : এ বাক্যটি দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, একবচনের ইসতিগরাক দ্বিবচন-বহুবচনের ইসতিগরাকের চেয়ে বেশি ব্যাপক এবং কার্যকর হওয়া এ কথা তো نَكِرَةٌ (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য)-এর উপর না-বাচক অক্ষর আসলে যথার্থ হয়। অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে ইসতিগরাক হয় তা দ্বিবচন এবং বহুবচনের ইসতিগরাকের চেয়ে বেশি ব্যাপক; কিন্তু যদি নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক লামের দ্বারা ইসতিগরাক করা হয় তখন এ অর্থ পাওয়া যায় না, এ কথা আমরা সমর্থন করি না। আমরা দেখতে পাই বহুবচনের উপর যখন ইসতিগরাকের লাম আসে, যেমন- اَلْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُسْلِمَاتُ ইত্যাদির মধ্যে প্রত্যেকটি فَرْدٌ (সদস্য)-ই অন্তর্ভুক্ত। উসূলশাস্ত্রবিদ এবং নাহুবিদগণের মতামত এরূপই। তা ছাড়া প্রচলিত ব্যবহারও উক্ত বিষয়কে সমর্থন করে, কুরআনের আয়াত اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, এর দ্বারা মুসলমানগণের সব সদস্যই উদ্দেশ্য। এমনিভাবে وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-এর সব মুহসিন এবং وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ দ্বারাও সমস্ত কিছুর নামই উদ্দেশ্য। অতএব, ইসতিগরাকের ব্যাপকতার ক্ষেত্রে একবচন এবং বহুবচন সমানই হয়ে গেল। তাই মূল লেখকের দাবি একবচনের ইসতিগরাক বহুবচনের ইসতিগরাকের চেয়ে ব্যাপক সঠিক রইল কোথায়?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, বহুবচনের উপর নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক লাম আসলে তার বহুবচন বাতিল হয়ে যায়। তখন তা শাব্দিকভাবে বহুবচন থাকলেও অর্থগতভাবে একবচন হয়ে যায়। মূল লেখক একবচন দ্বারা অর্থগত একবচনই বুঝিয়েছেন, সেটা শাব্দিকভাবে যেরূপই হোক না কেন, সুতরাং লাম দ্বারা নির্দিষ্ট বহুবচন যেহেতু অর্থগতভাবে একবচন হয়ে যায় তাই এটিকে নিয়ে আপত্তি তোলা যথার্থ হবে না। মুসান্নিফ (র.) সে বহুবচনের তুলনায় একবচনের ইসতিগরাককে ব্যাপক বলেছেন, যে বহুবচনের অর্থে কোনো পরিবর্তন হয়নি; বরং বহুবচন রূপে বহাল রয়েছে।

এর আরেকটি উত্তর হচ্ছে, মূল লেখকের বক্তব্য অনির্দিষ্ট না-বাচক বাক্যের সাথে খাস, তাইতো তিনি অনির্দিষ্ট বাক্যের দ্বারাই এর উদাহরণ দিয়েছেন। তার উপরে যে আপত্তি তোলা হয়েছে তা নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক ইসতিগরাকের লামের দ্বারা, তাই এতে তার বক্তব্যের খণ্ডন হচ্ছে না।

সার-সংক্ষেপ :

اِسْتِغْرَاقٌ তিন প্রকার : ১. اِسْتِغْرَاقُ مُفْرَدْ ২. اِسْتِغْرَاقُ تَثْنِيَةْ ৩. اِسْتِغْرَاقُ جَمْعْ। লেখক বলেন, মুফরাদের ইসতিগরাক দ্বিবচন ও বহুবচনের ইসতিগরাকের চেয়ে ব্যাপকতর। এ জন্য যদি কারো ঘরে একজন বা দু'জন লোক থাকে, তারপর সে لَا رِجَالَ فِىْ بَيْتِىْ বলে তাহলে তার এ বাক্য শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে; কিন্তু এ অবস্থায় তার لَا رَجُلَ فِىْ بَيْتِىْ বলা শুদ্ধ হবে না। উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.)-এর বক্তব্য اَلِفْ لَامْ যুক্ত বহুবচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, বহুবচনের সাথে اَلِفْ لَامْ যুক্ত হলে তা বিধানগতভাবে একবচনে পরিণত হয়ে যায়। অথবা, লেখকের বক্তব্য نَكِرَةٌ-এর সাথে খাস।

وَلَمَّا كَانَ هٰهُنَا مَظَنَّةُ اِعْتِرَاضٍ وَهُوَ اَنَّ اِفْرَادَ الْاِسْمِ يَدُلُّ عَلٰى وَحْدَةِ مَعْنَاهُ وَالْاِسْتِغْرَاقُ يَدُلُّ عَلٰى تَعَدُّدِهٖ وَهُمَا مُتَنَافِيَانِ اَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهٖ وَلَاتَنَافِى بَيْنَ الْاِسْتِغْرَاقِ وَاِفْرَادِ الْاِسْمِ لِاَنَّ الْحَرْفَ الدَّالَّ عَلَى الْاِسْتِغْرَاقِ كَحَرْفِ النَّفْيِ وَالتَّعْرِيْفِ اِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ اَىْ عَلَى الْاِسْمِ الْمُفْرَدِ حَالَ كَوْنِهٖ مُجَرَّدًا عَنِ الدَّلَالَةِ عَلٰى مَعْنَى الْوَحْدَةِ كَمَا اَنَّهٗ مُجَرَّدٌ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى التَّعَدُّدِ وَاِمْتِنَاعُ وَصْفِهٖ بِنَعْتِ الْجَمْعِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّشَاكُلِ اللَّفْظِىْ وَلِاَنَّهٗ اَىِ الْمُفْرَدُ الدَّاخِلُ عَلَيْهِ حَرْفُ الْاِسْتِغْرَاقِ بِمَعْنٰى كُلِّ فَرْدٍ لَامَجْمُوْعِ الْاَفْرَادِ وَلِهٰذَا اِمْتَنَعَ وَصْفُهٗ بِنَعْتِ الْجَمْعِ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ وَاِنْ حَكَاهُ الْاَخْفَشُ فِىْ نَحْوِ اَلدِّيْنَارُ الصُّفْرُ وَالدِّرْهَمُ الْبِيْضُ ـ

অনুবাদ : যখন এখানে একটি আপত্তি রয়েছে, (আপত্তিটি হচ্ছে) বিশেষ্যের একবচন একক অর্থ প্রদান করে। আর ইসতিগরাক বহুত্বের অর্থ প্রদান করে। আর এ বিষয়টি পরস্পর বিরোধী, তাই লেখক এ উক্তি দ্বারা তার উত্তর দেন। তিনি বলেন, **ইসতিগরাক এবং বিশেষ্যের একবচন ব্যবহার হওয়ার মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কেননা,** ইসতিগরাকের অর্থ প্রদানকারী **অক্ষর** তো না-বাচক এবং নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক অক্ষরের মতো, (এগুলো) **একবচন বিশেষ্যের উপর তখনই আসে যখন একে একক অর্থ প্রদানের থেকে বিরত রাখা হয়।** যেমন– তা একাধিক অর্থ প্রদান থেকে বিরত থাকে। এর বহুবচন সিফাত হয় না, তার শাব্দিক কাঠামোকে রক্ষা করার জন্য।

তা ছাড়া এটি অর্থাৎ যে একবচনের উপর ইসতিগরাকের অক্ষর আসলে **তাতে প্রত্যেকটি فرد-এর অর্থ প্রদান করে সব فرد-এর অর্থ দেয় না। আর এ কারণেই জমহুরের মতে বহুবচন দ্বারা এর সিফাত আনা যায় না।** নাহুবিদ আখফাস اَلدِّيْنَارُ الصُّفْرُ এবং وَالدِّرْهَمُ الْبِيْضُ (জাতীয় উদাহরণে বহুবচন সিফাতসহ) বর্ণনা করেছেন (আরবের ব্যবহার থেকে)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَلَمَّا كَانَ هٰهُنَا الخ **:** মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ স্থানে একটি আপত্তি হতে পারে। আপত্তিটি হলো ইসমে জিনস একবচনের উপর ইসতিগরাকের লাম সংযুক্ত করা অনুচিত। কারণ, এতে একই শব্দের মধ্যে একক এবং বহু এ দু' বিপরীত অর্থ একত্রিত হয়ে যায়। আর এটা এভাবে হয় যে, ইসমে জিনস একবচন, একবচন হওয়ার কারণে একক অর্থ প্রদান করে, আবার ইসতিগরাকের অক্ষর এর উপর আসার কারণে তা বহুত্বের অর্থ প্রদান করে। এক এবং বহু এ দু'য়ের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে, তাই ইসতিগরাকের অক্ষর না আসা বাঞ্ছনীয়।

মূল লেখক এ আপত্তিটির দু'টি জবাব দিয়েছেন, প্রথমটি جَوَاب اِنْكَارِى অর্থাৎ আমরা এখানে এক এবং বহু এ দু'য়ের মাঝে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় তা মানতে রাজি নই। কেননা, একবচনের মধ্যে এককের অর্থ দূর করার পর ইসতিগরাকের হরফ যুক্ত করা হয়, অর্থাৎ اِسْم جِنْس একবচনকে প্রথমে এককের অর্থ থেকে খালি করা হয় তারপর ইসতিগরাকের লাম তার সাথে যুক্ত হয়। যেমন আমরা দ্বিবচনের এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রথমে একবচনের একক অর্থ দূর করি, তারপর তাতে দ্বিবচন এবং বহুবচনের চিহ্ন যোগ করি। যেহেতু প্রথমে একবচনের একক অর্থ থেকে একবচনকে খালি করা হয়, এরপর তার মধ্যে ইসতিগরাকের লাম আসে; তাই এতে একক অর্থ এবং ব্যাপকতা একত্রিত হয় না। আর এটি একত্রিত না হলে পরস্পর বিরোধী দু'টি বিষয় একত্রিত হলো না। অতএব, ইসমে জিনস একবচনের উপর ইসতিগরাকের লাম যুক্ত হওয়াতে আর কোনো বাধা রইল না।

قَوْلُهُ اِمْتِنَاعُ وَصْفِهِ بِنَعْتِ الْجَمْعِ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হলো, একবচনের উপর ইসতিগরাকের অক্ষর যুক্ত হলে একক অর্থ আর থাকে না, তখন এটি একাধিক অর্থের প্রতি দালালত করে। এমতাবস্থায় তার সিফাত যদি আনা হয় তাহলে সে সিফাতটিও বহুবচন হওয়া জরুরি। কেননা, মাওসূফ এবং তার সিফাতের মধ্যে সমাঞ্জস্য জরুরি। সে মতে উদাহরণ এরূপ হওয়া দরকার ছিল جَاءَ الرَّجُلُ الْعَالِمُوْنَ কিন্তু নাহুবিদগণ এ ধরনের ব্যবহারকে অবৈধ বলেছেন।

এর উত্তর হলো : নাহুবিদগণ এ ধরনের তারকীবকে অনুমোদন করেননি। তারা বলেন, এতে শব্দের আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়, শব্দের কাঠামো ও আকৃতি রক্ষা করার জন্য বহুবচন দ্বারা এর সিফাত আনা হয় না। এর ব্যখ্যা হচ্ছে এই যে, ইসমে জিনস মুফরাদ বা একবচনের উপর ইসতিগরাকের হরফ আসার পরও তার মুফরাদের আকৃতি অপরিবর্তিতই থেকে যায়, তাই যদি এর সিফাত বহুবচন আনা হয়, তাহলে মাওসূফ এবং সিফাতের আকৃতি দু' রকম হয়ে যায়।

অতএব, মাউসূফ এবং সিফাতের আকৃতি একইরূপ রাখার জন্য বহুবচন দ্বারা এর সিফাত আনা হবে না।

এর দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, যে মুফরাদের উপর ইসতিগরাকের লাম এসেছে তা كُلّ فَرْد-এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ তা আলাদাভাবে প্রত্যেক فرد-এর উপর দালালত করবে, একসাথে সকল فرد-কে বুঝাবে না। যখন তা একটি فرد-এর উপর দালালত করবে, তখন অন্য فرد বুঝাবে না। এভাবে সমস্ত فرد-কে বুঝাবে; কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে আর আমরা জানি كُلّ فَرْد এবং একবচনের দু'টো একই; বরং একবচনের বিপরীত হলো جَمِيْع فَرْد বা সকল ফরদ। অতএব, একবচন ও এক অর্থ হওয়ার সাথে সাথে ইসতিগরাকের লাম একত্রিত হতে পারে, এতে কোনো বিরোধ নেই। যখন এ কথা প্রমাণিত হলো যে, দু'য়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই, তাই اِجْتِمَاعُ مُتَنَافِيَيْن-এর আপত্তি এর উপর আরোপিত হবে না।

قَوْلُهُ وَاِنْ حَكَاهُ الْاَخْفَشُ فِىْ نَحْوِ اَلدِّيْنَارُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, নাহুবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ইসতিগরাকের লাম দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্য যদিও সব فرد -এর দিক নির্দেশ করে তবু এর সিফাত বহুবচন ব্যবহার হবে না, তবে বিখ্যাত নাহুবিদ আখফাশ এমন কিছু আরবি সাহিত্যের উদাহরণ বর্ণনা করেন যাতে দেখা যায়, বহুবচন উক্ত লাম বিশিষ্ট বিশেষ্যের সিফাত হয়েছে। এর জবাব হচ্ছে, এ ব্যবহার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতে তা দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যাবে না। এসব উদাহরণ شاذ-এর অন্তর্ভুক্ত।

সার-সংক্ষেপ :

যখন الف ـ لام দ্বারা استغراق উদ্দেশ্য করা হয় তখন একটি আপত্তি উঠে যে, ইসমের একবচন একক অর্থ প্রদান করে, আবার استغراق বহুত্বের বা বহুজনের অর্থ দেয়। এ দু'টি বিপরীতধর্মী বিষয় একত্রিত হবে কিভাবে? মূল লেখক এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর দিয়েছেন।

১. ইসতিগরাকের الف لام মুফরাদ ইসমের উপর এমতবস্থায় যুক্ত হয় যখন সে ইসমকে একক অর্থ প্রদান করার যোগ্যতা থেকে বিমুক্ত করা হয়। অর্থাৎ একই সময়ে একই সাথে কোনো ইসম একক ও ইসতিগরাকের অর্থ প্রদান করে না।

২. যে ইসমের সাথে ইসতিগরাকের আলিফ-লাম যুক্ত হয় সে ইসম একসাথে বহুত্বের অর্থ প্রদান করে না; বরং যে ইসম এক এক করে বহুত্বের বা বহুজনের অর্থ দেয়। এ জন্যই সে সিফাত বহুবচনের সিফাতের মতো হয় না; বরং একবচনের সিফাতের মতো হয়।

وَبِالْإِضَافَةِ أَيْ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِإِضَافَتِهِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَعَارِفِ لِأَنَّهَا أَيْ الْإِضَافَةَ أَخْصَرُ طَرِيْقٍ إِلَى إِحْضَارِهِ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ نَحْوُ ع هَوَايَ أَيْ مَهْوِيَ وَهٰذَا أَخْصَرُ مِنَ الَّذِيْ أَهْوَاهُ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَالْاِخْتِصَارُ مَطْلُوْبٌ لِضَيْقِ الْمَقَامِ وَفَرْطِ السَّامَةِ لِكَوْنِهِ فِي السِّجْنِ وَالْحَبِيْبُ عَلَى الرَّحِيْلِ مَعَ الرَّكْبِ الْيَمَانِيْنَ مُصْعِدٌ أَيْ مُبْعِدٌ ذَاهِبٌ فِي الْأَرْضِ وَتَمَامُهُ ع جَنِيْبٌ وَجُثْمَانِيْ بِمَكَّةَ مُوَثَّقٌ * اَلْجَنِيْبُ الْمَجْنُوْبُ الْمُسْتَتْبَعُ وَالْجُثْمَانُ الشَّخْصُ وَالْمُوَثَّقُ الْمُقَيَّدُ وَلَفْظُ الْبَيْتِ خَبَرٌ وَمَعْنَاهُ تَأَسُّفٌ وَتَحَسُّرٌ ـ

অনুবাদ : **এবং ইযাফত দ্বারা** অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট বিশেষ্যসমূহের প্রতি ইযাফত করার দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। **কেননা,** (এ ক্ষেত্রে) **ইযাফত** মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে পৌঁছে দেওয়ার **সংক্ষিপ্ততম পন্থা। যেমন– কবিতার চরণ :** (অর্থ) **আমার প্রিয়জন** (هَوَايَ) হচ্ছে اَلَّذِيْ أَهْوَاهُ ইত্যাদির চেয়ে সংক্ষিপ্ততম। আর সংক্ষিপ্তকরণই উদ্দেশ্য স্থানের সীমাবদ্ধতা এবং তীব্র ব্যাকুলতার কারণে, কেননা, সে ছিল কারাগারে আর তার প্রিয়তমা স্ত্রী **ইয়ামেনী কাফেলার সাথে** দূর দূরান্তের পথে **যাত্রার অপেক্ষায়**। কবিতার অবশিষ্টাংশ এরূপ– আমার শরীর **মক্কায়** বন্দী। جَنِيْبٌ শব্দের অর্থ– অনুসারী এবং পিছু নেওয়া ব্যক্তি। جُثْمَان অর্থ– ব্যক্তি। مُوَثَّقٌ অর্থ– বন্দী, কবিতা শাব্দিকভাবে বর্ণনামূলক বাক্য, তার অর্থ হতাশা এবং বিষাদ (প্রকাশ করা)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَبِالْإِضَافَةِ أَيْ تَعْرِيْفُ الخ : এখান থেকে নির্দিষ্ট বিশেষ্যের সপ্তম এবং সর্বশেষ প্রকারের আলোচনা শুরু হয়েছে। মূল লেখক বলেন, অনির্দিষ্ট মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট বিশেষ্যের প্রতি ইযাফত করে নির্দিষ্ট করা হয়। আর এভাবে ইযাফত তখনই করা হয় যখন মুসনাদ ইলাইহকে সংক্ষিপ্ত উপায়ে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়। কেননা, ইযাফত (সম্বন্ধ)-এর মাধ্যমে পুরো বাক্যকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা যায়।

সামনের কবিতায় ইযাফতের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে–

هَوَايَ مَعَ الرَّكْبِ الْيَمَانِيْنَ مُصْعِدٌ * جَنِيْبٌ وَجُثْمَانِيْ بِمَكَّةَ مُوَثَّقٌ

কবিতার চরণটির অর্থ : আমার প্রিয়জন ইয়েমেনী কাফেলার সাথে সুদূর পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য যাচ্ছে। আর আমি মক্কায় বন্দিত্ব বরণ করছি। উক্ত কবিতায় هَوَايَ মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে ইযাফত (সম্বন্ধ) করার মাধ্যমে, যদি এখানে ইযাফত ব্যবহার না করে ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হতো তাহলে বাক্যটি বড় হয়ে যেত। যেমন– اَلَّذِيْ أَهْوَاهُ অথবা مِنْ أَهْوَاهُ অথবা هَوَايَ الَّذِيْ يَمِيْلُ إِلَيْهِ قَلْبِيْ এ তিনটি ব্যবহারের তুলনায় ইযাফত সংক্ষিপ্তরূপ। আর সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যেই তাকে ইযাফতের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া কবিতার ক্ষেত্রটি সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপের জন্য সমীচীন। কেননা, এখানে প্রেমিক কারাগারে অবস্থান করছে, আর তার প্রেমাস্পদ দীর্ঘ সফরে যাত্রা করেছে। এমতাবস্থায় প্রেমিক দুঃখ-ভারাক্রান্ত। অতএব, তার দীর্ঘ বাক্যালাপ করার মতো পরিস্থিতি নেই; বরং সংক্ষিপ্তভাবে তার মনের ভাব প্রকাশ করবে এটাই স্বাভাবিক।

এ স্থানে মূল লেখকের দাবি ইযাফত হলো أَخْصَرُ طَرِيْقٍ (সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম উপায়) এ কথার উপর অনেকে আপত্তি তুলেছেন। তারা বলেন, ইযাফত অন্যান্য নির্দিষ্ট ইসমের তুলনায় কোনোটা থেকে সংক্ষিপ্ত। যেমন ইসমে মাওসূল, আবার কোনোটা থেকে বড়, যেমন, সর্বনাম ও নামবাচক বিশেষ্য। অতএব, তার ক্ষেত্রে 'সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত' এ বিশেষণ কি করে সঠিক হবে?

এর উত্তর হলো, বক্তা মুসনাদ ইলাইহকে যে গুণের ও বিশেষণের মাধ্যমে শ্রোতার কাছে নির্দিষ্ট করতে চান, সে বিশেষণের মাধ্যমে পরিচিত করার সংক্ষিপ্ততম পদ্ধতি হলো ইযাফত। সাধারণভাবে মুসনাদ ইলাইহের সত্তাকে পরিচিত করার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অবশ্য ইযাফত নয়। উল্লিখিত কবিতায় কবির উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার কাছে মুসনাদ ইলাইহকে তার প্রিয়জন রূপে পরিচিত এবং চিহ্নিত করবে সেই সাথে সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য শেষ করবে। উল্লেখ্য যে, এখানে সর্বনাম, নামবাচক অথবা ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য ইত্যাদির মাধ্যমে মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করা যেত, কিন্তু এতে বক্তার উদ্দেশ্যটি অর্জিত হতো না, বরং তার অনুরাগের কথা অব্যক্তই থেকে যেত, এমনিভাবে নামবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করে যদি বলত (উদাহরণ স্বরূপ) حَامِد مَهْوِى বাক্যটি সংক্ষিপ্ত থাকত না; বরং এটি মুকতাযায়ে হালের বিপরীত দীর্ঘ হয়ে যেত। এমনিভাবে যদি আলিফ-লাম দ্বারা নির্দিষ্ট করে এভাবে বলা হতো اَلْمَحْبُوْبُ اِلَىَّ তবুও বাক্যটি দীর্ঘ হয়ে যেত। মোটকথা, ইযাফত হচ্ছে বক্তার উদ্দেশ্য আদায় করে মুসনাদ ইলাইহকে পরিচিত করার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি, উল্লিখিত কবিতায় কবি আপন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সাথে সাথে মুসনাদ ইলাইহকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেছেন। মুসান্নিফ (র.) কবিতায় উল্লিখিত কিছু শব্দের তাহকীক সুবিন্যস্তভাবে বর্ণনা করেছেন, প্রথমে তিনি هواى-এর তাহকীক করতে গিয়ে বলেন, এটি এখানে مهوى-এর অর্থে, مهوى আসলে مهووى ছিল, প্রথম واو আসল অক্ষর, যা মাদ্দার মাঝে বিদ্যমান, দ্বিতীয় واو হলো ইসমে মাফউলের। প্রথম ياء লাম কালিমার স্থানে আসল অক্ষর, দ্বিতীয় ياء উত্তম পুরুষের সর্বনাম, দ্বিতীয় واو হলো সাকিন আর প্রথম ياء হরকতযুক্ত। অতএব, واو-কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করত ياء-কে ياء-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। আর ياء-এর কারণে প্রথম واو-এর নিচে যের দেওয়া হয়েছে। ফলে مهوى হয়েছে। مُصْعِدٌ শব্দে অর্থ দূরযাত্রী। جَنِيْبٌ শব্দটি مجنوب-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مجنوب বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যাকে আগে রেখে অন্যরা তার পেছনে চলে। এখানে কবির উদ্দেশ্য হলো, তার প্রেমাস্পদ এমন ব্যক্তি, যাকে সামনে রেখে অন্যরা পেছনে চলে। ফলে তার কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ নেই। جُثْمَانٌ শব্দের অর্থ– দেহ ও শরীর।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহকে কখনো নির্দিষ্ট (معرفة) করা হয় নির্দিষ্ট ইসমসমূহের প্রতি ইযাফত করার মাধ্যমে।

ইযাফতের মাধ্যমে معرفة করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুতাকাল্লিমের উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ততম উপায়ে প্রকাশ করা।

এর উদাহরণ هَوَاىَ مَعَ الرَّكْبِ الْيَمَانِيْنَ مُصْعِدٌ এ পঙ্‌ক্তির هَوَاىَ শব্দটি ইযাফতের মাধ্যমে معرفة হয়ে মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে।

اَوْ لِتَضَمُّنِهَا اَىْ لِتَضَمُّنِ الْاِضَافَةِ تَعْظِيْمًا لِشَانِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ اَوِ الْمُضَافِ اَوْ غَيْرِهِمَا كَقَوْلِكَ فِىْ تَعْظِيْمِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ عَبْدِىْ حَضَرَ تَعْظِيْمًا لَكَ بِاَنَّ لَكَ عَبْدًا اَوْ فِىْ تَعْظِيْمِ الْمُضَافِ عَبْدُ الْخَلِيْفَةِ رَكِبَ تَعْظِيْمًا لِلْعَبْدِ بِاَنَّهُ عَبْدٌ لِلْخَلِيْفَةِ وَفِىْ تَعْظِيْمِ غَيْرِ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ اِلَيْهِ عَبْدُ السُّلْطَانِ عِنْدِىْ تَعْظِيْمًا لِلْمُتَكَلِّمِ بِاَنَّ عَبْدَ السُّلْطَانِ عِنْدَهُ وَهُوَ وَاِنْ كَانَ الْمُضَافُ اِلَيْهِ لٰكِنَّهُ غَيْرُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ الْمُضَافُ وَغَيْرُ مَا اُضِيْفَ اِلَيْهِ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهِ اَوْ غَيْرِهِمَا اَوْ لِتَضَمُّنِهَا تَحْقِيْرًا لِلْمُضَافِ نَحْوُ وَلَدُ الْحَجَّامِ حَاضِرٌ اَوْ لِلْمُضَافِ اِلَيْهِ نَحْوُ ضَارِبُ زَيْدٍ حَاضِرٌ اَوْ غَيْرِهِمَا نَحْوُ وَلَدُ الْحَجَّامِ جَلِيْسُ زَيْدٍ اَوْ لِاِغْنَائِهَا عَنْ تَفْصِيْلٍ مُتَعَذِّرٍ نَحْوُ اِتَّفَقَ اَهْلُ الْحَقِّ عَلٰى كَذَا اَوْ مُتَعَسِّرٍ نَحْوُ اَهْلُ الْبَلَدِ فَعَلُوْا كَذَا وَلِاَنَّهُ يَمْنَعُ عَنِ التَّفْصِيْلِ مَانِعٌ مِثْلُ تَقْدِيْمِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ نَحْوُ عُلَمَاءُ الْبَلَدِ حَاضِرُوْنَ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْاِعْتِبَارَاتِ ـ

অনুবাদ : **অথবা এ কারণে যে, ইযাফত মুযাফ ইলাইহ অথবা মুযাফ অথবা এ দু'টি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের সম্মান দানের অর্থ বহন করে।** **যেমন তুমি** মুযাফ ইলাইহের সম্মান দানের ক্ষেত্রে **বললে** عَبْدِىْ حَضَرَ **(আমার কৃত দাস উপস্থিত হয়েছে)** তোমার সম্মানের বিষয় এটি যে, তোমার একটি দাস আছে। **অথবা** মুযাফের সম্মান দানের জন্য, যেমন عَبْدُ الْخَلِيْفَةِ رَكِبَ **(খলিফার দাস আরোহণ করেছে)** এতে দাসের মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে এ হিসেবে যে, সে খলিফার দাস এবং মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ ছাড়া অন্যের সম্মানের জন্য, যেমন عَبْدُ السُّلْطَانِ عِنْدِىْ **(বাদশাহের দাস আমার কাছে এসেছে,** এখানে) বক্তার মর্যাদা বুঝা যাচ্ছে যে, বাদশাহের দাস তার কাছে (অতএব, সে খুবই মর্যাদাবান ব্যক্তি)। সে (يَاءُ مُتَكَلِّمٍ) যদিও এখানে মুযাফ ইলাইহ, কিন্তু তা মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ নয় এবং মুসনাদ ইলাইহকে যার প্রতি ইযাফত করা হয়েছে এমন মুযাফ ইলাইহও নয়। আর লেখকের উক্তি اَوْ غَيْرِهِمَا দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই, **অথবা** ইযাফত (করা হয়) মুযাফের **অমর্যাদার অর্থ বহন করার জন্যে।** যেমন- وَلَدُ الْحَجَّامِ حَاضِرٌ **(রক্তমোক্ষকের ছেলে উপস্থিত)** অথবা মুযাফ ইলাইহের (অমর্যাদার অর্থ) যেমন ضَارِبُ زَيْدٍ حَاضِرٌ (যায়েদের প্রহারকারী উপস্থিত) অথবা এ দু'টির ভিন্ন অন্য কারোর জন্য। যেমন- وَلَدُ الْحَجَّامِ جَلِيْسُ زَيْدٍ (রক্তমোক্ষকের ছেলে যায়েদের সহচর) অথবা অসম্ভব দীর্ঘ ব্যাখ্যা থেকে ইযাফত অমুক্ষাপেক্ষী করে দেওয়ার কারণে, যেমন- اِتَّفَقَ اَهْلُ الْحَقِّ عَلٰى كَذَا (সত্যপন্থি লোকেরা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন) অথবা কষ্টসাধ্য দীর্ঘ ব্যাখ্যা থেকে বাঁচার জন্য। যেমন- اَهْلُ الْبَلَدِ فَعَلُوْا كَذَا (শহরের লোকেরা এরূপ করেছে) অথবা ইযাফত করা হয় বিস্তারিত ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে, যেমন (বিস্তারিত ব্যাখ্যায়) কতককে কতকের আগে উল্লেখ করতে হয়, যেমন- عُلَمَاءُ الْبَلَدِ حَاضِرُوْنَ (শহরের আলিমগণ উপস্থিত।) ইত্যাদি অন্যান্য কারণে ইযাফত করা হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ لِتَضَمُّنِهَا أَيْ لِتَضَمُّنِ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে ইযাফত দ্বারা নির্দিষ্ট করার আরো কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। اضافت দ্বারা কখনো মুযাফ ইলাইহ অথবা মুযাফ অথবা দু'টি ভিন্ন অন্য কারো সম্মান বুঝানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। উক্ত সম্মান বুঝানোর জন্য মুসনাদ ইলাইহের ইযাফত দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়।

ক. ইযাফত দ্বারা মুযাফ ইলাইহের সম্মান বুঝানো হয়েছে, এর উদাহরণ হলো عَبْدِيْ حَضَرَ তথা আমার দাস উপস্থিত হয়েছে, এ উদাহরণে মুযাফ ইলাইহ (يَاء مُتَكَلِّم) অর্থাৎ বক্তার সম্মান বুঝানো হয়েছে। তা এভাবে যে, ইযাফত প্রমাণ করছে যে, তার একজন ক্রীতদাস আছে। আর যার ক্রীতদাস আছে সে সম্মানিত ব্যক্তি।

খ. ইযাফত দ্বারা মুযাফের সম্মান বুঝানোর উদাহরণ হলো عَبْدُ الْخَلِيْفَةِ رَكِبَ (খলিফার ক্রীতদাস আরোহণ করেছে) এতে মুযাফ-এর সম্মান হয়েছে। কেননা, ইযাফত দ্বারা জানা গেল যে, সে খলিফার দাস। আর খলিফা বা বাদশাহর দাস হওয়াটা গৌরবের বিষয়।

গ. কখনো ইযাফত দ্বারা মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ ছাড়া অন্য কারো সম্মান বুঝানো হয়, এর উদাহরণ হলো عَبْدُ السُّلْطَانِ عِنْدِيْ এখানে মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে عَبْدُ السُّلْطَانِ এর মুসনাদ হলো عِنْدِيْ। এ উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহের মুযাফ বা মুযাফ ইলাইহ কারো সম্মান বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। এখানে বক্তার সম্মান বুঝানো উদ্দেশ্য, যা এখানে মুসনাদের মুযাফ ইলাইহ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ : এ বাক্য দ্বারা একটি সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে। সন্দেহটি হচ্ছে, عَبْدُ السُّلْطَانِ عِنْدِيْ-এর মধ্যে আপনি বলেছেন, মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ ভিন্ন অন্য ব্যক্তি তথা বক্তার মর্যাদা বুঝানো হয়েছে; অথচ আমরা দেখছি বক্তার সর্বনামটি এখানে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন,

১. মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ ভিন্ন দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ এবং মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ ইলাইহ, সাধারণ মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ নয়। উল্লিখিত উদাহরণ ভিন্ন ব্যক্তি তথা বক্তার সর্বনামটি যদিও মুযাফ ইলাইহ হয়েছে; কিন্তু তা মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ ইলাইহ নয়; বরং মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ ইলাইহের ভিন্ন ব্যক্তি। অতএব, মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ-এর থেকে ভিন্ন হওয়ার শর্তটি এখানে পাওয়া গেছে।

২. ইযাফত দ্বারা কখনো মুযাফ ইলাইহ, মুযাফ এবং এ দু'য়ের ভিন্ন কারো অমর্যাদা বুঝানোর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। উক্ত অমর্যাদা এবং তুচ্ছতা বুঝানোর জন্য কখনো ইযাফত দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয়। এখানেও মুযাফ, মুযাফ ইলাইহ এবং এতদ্ভিন্ন কারো অমর্যাদা বুঝানো হবে। এ হিসেবে তিনটি পৃথক উদাহরণের মাধ্যমে তিন প্রকার বুঝানো হলো।

ক. ইযাফত দ্বারা মুযাফের অমর্যাদা ও তুচ্ছতা বুঝানো হয়েছে। এর উদাহরণ হচ্ছে وَلَدُ الْحَجَّامِ حَاضِرٌ (রক্তমোক্ষকের ছেলে উপস্থিত) এখানে মুযাফ– ولد-এর তুচ্ছতা বুঝানো হয়েছে এই বলে যে, সে রক্তমোক্ষকের ছেলে।

খ. ইযাফত দ্বারা মুযাফ ইলাইহের অমর্যাদা তুচ্ছতা বুঝানো হয়েছে। এর উদাহরণ হচ্ছে ضَارِبُ زَيْدٍ حَاضِرٌ যায়েদের প্রহারকারী উপস্থিত। এ উদাহরণে মুযাফ ইলাইহ زيد-এর অমর্যাদা বুঝানো হয়েছে। এই বলে যে, সে প্রহৃত হয়েছে।

গ. ইযাফত দ্বারা মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ ছাড়া ভিন্ন কারো অমর্যাদা ও তুচ্ছতা বুঝানোর উদাহরণ হচ্ছে وَلَدُ الْحَجَّامِ جَلِيْسُ زَيْدٍ (রক্তমোক্ষকের ছেলে যায়েদের সহচর)। এ উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ হচ্ছে ولد এবং তার মুযাফ ইলাইহ হচ্ছে الحجام । এখানে এ দু'জনের কারো অমর্যাদা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে زيد-এর অমর্যাদা বুঝানো হয়েছে এই বলে যে, তার বন্ধু হচ্ছে রক্তমোক্ষকের ছেলে, তার সাথে সে চলাফেরা করে।

৩. ইযাফত দ্বারা কখনো মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয় এ কারণে যে, মুসনাদ ইলাইহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অসম্ভব; কিন্তু ইযাফত এ অসম্ভব কাজ করা থেকে উদ্ধার করে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করার পথ বাতলে দেয়। যেমন– আপনি বলছেন اِتَّفَقَ اَهْلُ الْحَقِّ عَلٰى كَذَا সত্যপন্থিরা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। এখানে ইযাফতের মাধ্যমে সত্যপন্থি সকলের কথাই বলা হয়েছে। এভাবে না বলে বিস্তারিতভাবে সকলের নাম বলা অসম্ভব ছিল। ইযাফতের মাধ্যমে কেবল اَهْلُ الْحَقِّ বলে উদ্দেশ্য সাধন করা হয়েছে এবং সেই সাথে অসম্ভব কাজ থেকে নিস্তার পাওয়া গেছে।

৪. ইযাফত দ্বারা কখনো মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয় এ জন্য যে, মুসনাদ ইলাইহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কষ্টসাধ্য; কিন্তু ইযাফতের মাধ্যমে বিষয়টি সহজেই বর্ণনা করা যায়, যেমন বলা হয়ে থাকে اَهْلُ الْبَلَدِ فَعَلُوْا كَذَا অর্থাৎ শহরের লোকেরা এমন করেছে। এখানে শহরের সকলের নাম নিয়ে বিস্তারিতভাবে বলা অসম্ভব নয়; কিন্তু তা যথেষ্ট কষ্টের কাজ। এই কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সংক্ষেপে মুসনাদ ইলাইহকে ইযাফতের সাথে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে।

৫. ইযাফত দ্বারা কখনো মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয় এজন্য যে, বিস্তারিতভাবে সকলের নাম নিয়ে বলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। উক্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইযাফত করা হয়। যেমন– عُلَمَاءُ الْبَلَدِ حَاضِرُوْنَ (দেশের আলিমগণ উপস্থিত)। এ উদাহরণে দেশের আলিমদের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের নাম নিয়ে বলা সম্ভব ছিল; কিন্তু বলতে গেলে কাউকে আগে এবং কাউকে পরে উল্লেখ করতে হতো। এতে করে কারো মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অতএব, কারো নাম আগে বলা এবং কারো নাম পরে বলা থেকে বাঁচার জন্য সংক্ষেপে ইযাফতের সাথে বলা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ ছাড়া আরো অন্যান্য কারণে ইযাফত করা হয় এবং এর দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয়।

সার-সংক্ষেপ :

ইযাফতের মাধ্যমে মুসনাদ ইলাইহকে معرفة করার বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে।

১. ইযাফতের মাধ্যমে মুযাফ ইলাইহের মর্যাদা প্রকাশ পায়। যেমন– عَبْدِىْ حَضَرَ

২. ইযাফতের মাধ্যমে মুযাফের মর্যাদা প্রকাশ পায়। যেমন– عَبْدُ الْخَلِيْفَةِ رَكِبَ

৩. মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ ব্যতীত তৃতীয় কারো সম্মান প্রকাশ পায়। যেমন– عَبْدُ السُّلْطَانِ عِنْدِىْ

৪. ইযাফতের মাধ্যমে মুযাফের অমর্যাদা প্রকাশ করা হয়। যেমন– ضَارِبُ الْحَجَّامِ حَاضِرٌ

৫. ইযাফতের সাহায্যে মুযাফ ইলাইহের হীনতা প্রকাশ পায়। যেমন– ضَارِبُ زَيْدٍ حَاضِرٌ

৬. ইযাফতের সাহায্যে তৃতীয় কারো হীনতা প্রকাশ করা হয়। যেমন– وَلَدُ الْحَجَّامِ جَلِيْسُ زَيْدٍ

৭. কখনো অসম্ভব বিবরণ থেকে বাঁচার জন্য ইযাফত করা হয়। যেমন– اِتَّفَقَ اَهْلُ الْحَقِّ عَلٰى كَذَا

৮. কখনো কষ্টসাধ্য বিবরণ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ইযাফত করা হয়। যেমন– اَهْلُ الْبَلَدِ فَعَلُوْا كَذَا

৯. কখনো বিস্তারিত বর্ণনায় সমস্যা থাকায় ইযাফত করা হয়। যেমন– عُلَمَاءُ الْبَلَدِ حَاضِرُوْنَ

وَاَمَّا تَنْكِيْرُهُ اَىْ تَنْكِيْرُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فَلِلْاِفْرَادِ اَىْ لِلْقَصْدِ اِلٰى فَرْدٍ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اِسْمُ الْجِنْسِ نَحْوُ وَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى اَوِ النَّوْعِيَّةِ اَىْ لِلْقَصْدِ اِلٰى نَوْعٍ مِنْهُ نَحْوُ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اَىْ نَوْعٌ مِنَ الْاَغْطِيَةِ وَهُوَ غِطَاءُ التَّعَامِىْ عَنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَفِى الْمِفْتَاحِ اَنَّهُ لِلتَّعْظِيْمِ اَىْ غِشَاوَةٌ عَظِيْمَةٌ اَوِ التَّعْظِيْمِ اَوِ التَّحْقِيْرِ كَقَوْلِهٖ شِعْرٌ لَهٗ حَاجِبٌ اَىْ مَانِعٌ عَظِيْمٌ عَنْ كُلِّ اَمْرٍ يَشِيْنُهٗ اَىْ يَعِيْبُهٗ وَلَيْسَ لَهٗ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبٌ اَىْ مَانِعٌ حَقِيْرٌ فَكَيْفَ بِالْعَظِيْمِ ـ

অনুবাদ : **আর মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয় যে কোনো فرد (সদস্য)-কে বুঝানোর জন্য,** অর্থাৎ ইসমে জিনস যার উপর প্রয়োগ হয় এমন فرد-এর ইচ্ছা করার জন্য। **যেমন–** وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى **(এবং শহরের প্রান্ত থেকে একটি লোক দৌড়ে আসল)। অথবা প্রকার বুঝানোর জন্য,** অর্থাৎ ইসমে জিনসের একটি প্রকার বুঝানোর জন্য। **যেমন–** وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ **(আর তাদের চোখের উপর রয়েছে এক ধরনের পর্দা)** অর্থাৎ এক বিশেষ প্রকারের আবরণ। আর সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলির ব্যাপারে অন্ধত্ব। মিফতাহ গ্রন্থে বর্ণিত তা অর্থাৎ غشاوة (এর তানবীন) বিশালতা (বুঝানো)-এর জন্য। অর্থাৎ বিরাট আবরণ। **অথবা বড় কিংবা সামান্য বুঝানোর জন্য। যেমনটি কবির উক্তি** (لَهٗ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ اَمْرٍ يَشِيْنُهٗ) **তাকে ত্রুটিযুক্ত করতে পারে এমন বিষয়ে তার বিরাট প্রতিবন্ধক রয়েছে; কিন্তু তার করুণাপ্রার্থীদের ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকই নেই** অর্থাৎ সামান্য বাধাও নেই, তাহলে বড় বাধা কিভাবে থাকবে?

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَاَمَّا تَنْكِيْرُهُ الخ : এ ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্ট (نكره) ব্যবহার করার বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১. প্রথম কারণ হচ্ছে, ইসমে জিনসের কোনো একটি অনির্দিষ্ট সদস্যের উপর যখন হুকুম দেওয়ার ইচ্ছা করা হয় তখন মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয়, সেই মুসনাদ ইলাইহ একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচনও হতে পারে। যদি نكره একবচন হয়, তাহলে ইসমে জিনসের একটি فرد উদ্দেশ্য হবে, দ্বিবচন হলে দু'টি فرد, আর বহুবচন হলে তার একটি দল উদ্দেশ্য হবে।

এর উদাহরণ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى আয়াতে পুরুষ জাতির অনির্দিষ্ট একজন সদস্যকে رجل বুঝানো হয়েছে। তারকীবের মধ্যে رجل মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে। এটি একবচন فرد হওয়াতে এর দ্বারা এক ব্যক্তি উদ্দেশ্য হবে, দু'জন বা তিনজন উদ্দেশ্য নয়। আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। رجل দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ফেরাউনের বংশের এক মু'মিন ব্যক্তি। শহরের প্রান্ত বলে ফেরাউনের শহর বুঝানো হয়েছে। কথিত আছে, সে শহরের নাম ছিল মুনিফ।

قَوْلُهٗ اَوِ النَّوْعِيَّةِ : ২. কখনো মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয় ইসমে জিনসের কোনো এক প্রকার বুঝানোর জন্য। যেমন– وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ অর্থাৎ আর তাদের চোখের উপর বিশেষ ধরনের পর্দা রয়েছে। এ আয়াতে غشاوة শব্দটি অনির্দিষ্ট। তারকীবে এটি মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে। এখানে অনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকার বুঝানো যে এক বিশেষ ধরনের আবরণ, সাধারণ কোনো আবরণ নয়। সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলি দেখার ব্যাপারে অন্ধত্ব। তারা সব দেখত এবং শুনত; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও সেগুলোকে অন্ধত্বের কারণে অনুধাবন করতে পারত না।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মূল লেখক ইতঃপূর্বে বলেছেন نكره দ্বারা فرد বুঝানো হয়, আবার এখানে বললেন نوع (প্রকার) বুঝানো হয়, এ দু'টি অর্থ এক সাথে نكره-এর মধ্যে কিভাবে একত্রিত হবে?

এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, نكره (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য) সাধারণভাবে وَحْدَت (একক অর্থের) দিকনির্দেশ করে। وَحْدَت দু'ধরনের- ১. وَحْدَت شَخْصِي ২. وَحْدَت نَوْعِي

অতএব, দু' ধরনের وَحْدَت-এর প্রতি দিক নির্দেশ করে। সে মতে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে দু'টি অর্থের সমাবেশ ঘটতে সমস্যা নেই।

غشاوة-এর দ্বারা প্রকার উদ্দেশ্য, এটা আল্লামা যমখশরী (র.)-এর তাফসীর, যা তিনি কাশ্শাফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মিফতাহ গ্রন্থে আল্লামা সাক্কাকী (র.) غشاوة-এর তানবীনকে تعظيم অর্থাৎ বড়ত্ব প্রকাশের অর্থে বর্ণনা করেছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে তাদের চোখের উপর বড় আবরণ রয়েছে। অনেকের মতে মিফতাহ গ্রন্থের ব্যাখ্যাটি উত্তম। কেননা, আয়াত দ্বারা কুরআনের আয়াত এবং অন্যান্য নির্দশনাবলি গ্রহণে কাফিরদের দূরত্ব বুঝানো আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কুরআন এ কথা বুঝাতে চায় যে, তারা কুরআনের আয়াত এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে অনেক দূরত্বে অবস্থান করছে, তাদের সত্যগ্রহণ করার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। আর বলা বাহুল্য যে, উক্ত বক্তব্য ও উদ্দেশ্য تعظيم-এর অর্থ গ্রহণ করার সাথেই বেশি সামাঞ্জস্যপূর্ণ।

কতিপয় লোক মনে করেন, আল্লামা যমখশরী (র.)-এর বক্তব্য যা লেখক বর্ণনা করেছেন এবং মিফতাহ গ্রন্থের বক্তব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তারা বলেন, বড় পর্দা ও আবরণ হচ্ছে সাধারণ পর্দার এক প্রকার। অতএব, লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের চোখে এক ধরনের পর্দা রয়েছে, যা বিশাল ও অতিকায়।

৩. মূল লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহকে কখনো অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয়, এর দ্বারা সম্মান ও বিশালতা বুঝানোর জন্য। আবার কখনো মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে আনা হয় তুচ্ছতা এবং সামান্য বুঝানোর জন্য। একটি কবিতার পঙ্ক্তিতে উভয়টির উদাহরণ পাওয়া যায়।

কবি বলেন- لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ اَمْرٍ يَشِيْنُهُ * وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبٌ

'তার (আমার প্রিয়জনের) রয়েছে এক বিশেষ প্রতিবন্ধক ঐসব বিষয়ে, যা তাকে দুষ্ট ও ত্রুটিযুক্ত করতে পারে। কিন্তু তার করুণাপ্রার্থীদের জন্য (তার কাছে যাওয়াতে) কোনো বাধা নেই।' উল্লিখিত পঙ্ক্তির প্রথম লাইনের حاجب (প্রতিবন্ধক শব্দটি বড় ও বিশাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার দ্বিতীয় লাইনের حاجب শব্দটি সামান্য ও সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে উভয় حاجب তারকীবের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব, অনির্দিষ্ট শব্দ কখনো বিশালতা বুঝায়, আবার কখনো সামান্য অর্থ প্রদান করে। আর উল্লিখিত অর্থদ্বয় আদায়ের জন্য মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে আনা হয়।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহকে কখনো نكرة রূপে ব্যবহার করা হয়। نكرة বা অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার নিম্নোক্ত কারণে হয়ে থাকে

ক. ইসমুল জিনস-এর কোনো একটি فرد বুঝানোর জন্য। যেমন- وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى

খ. ইসমুল জিনস-এর কোনো একটি نوع বুঝানোর জন্য। যেমন- وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

গ. কোনো ইসমের মর্যাদা ও মাহাত্মের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য, আবার কখনো অমর্যাদা ও সামান্য বুঝানোর জন্য। যেমন- لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ يَشِيْنُهُ * وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبٌ

اَوِ التَّكْثِيْرِ كَقَوْلِهِمْ وَاِنَّ لَهُ لَاِبِلًا وَاِنَّ لَهُ لَغَنَمًا اَوِ التَّقْلِيْلِ نَحْوُ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْظِيْمِ وَالتَّكْثِيْرِ اَنَّ التَّعْظِيْمَ بِحَسْبِ اِرْتِفَاعِ الشَّانِ وَعُلُوِّ الطَّبَقَةِ وَالتَّكْثِيْرُ بِاعْتِبَارِ الْكَمِّيَاتِ وَالْمَقَادِيْرِ تَحْقِيْقًا كَمَا فِى الْاِبِلِ اَوْ تَقْدِيْرًا كَمَا فِى الرِّضْوَانِ وَكَذَا التَّحْقِيْرُ وَالتَّقْلِيْلُ وَلِلْاِشَارَةِ اِلٰى اَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا قَالَ وَقَدْ جَاءَ التَّنْكِيْرُ لِلتَّعْظِيْمِ وَالتَّكْثِيْرِ نَحْوُ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ اَىْ ذَوُوْ عَدَدٍ كَثِيْرٍ هٰذَا نَاظِرٌ اِلَى التَّكْثِيْرِ اَوْ ذَوُوْ اٰيَاتٍ عِظَامٍ هٰذَا نَاظِرٌ اِلَى التَّعْظِيْمِ وَقَدْ يَكُوْنُ لِلتَّحْقِيْرِ وَالتَّقْلِيْلِ نَحْوُ حَصَلَ لِىْ مِنْهُ شَيْءٌ اَىْ حَقِيْرٌ قَلِيْلٌ ـ

অনুবাদ : অথবা (মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয়) **আধিক্য বুঝানোর জন্য। যেমন আরবদের উক্তি** وَاِنَّ لَهُ لَاِبِلًا وَاِنَّ لَهُ لَغَنَمًا **নিশ্চয়ই তার অনেক উট ও মেষপাল রয়েছে। অথবা স্বল্পতা বুঝানোর জন্য যেমন–** وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ **আল্লাহ তা'আলার (স্বল্প) সন্তুষ্টিই অনেক বড়।** বিশালতা এবং আধিক্য এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে– বিশালতা মর্যাদাগত উচ্চতা এবং উপরের স্তরের দ্বারা হয়, আর আধিক্য সংখ্যাগতভাবে এবং পরিমাণ দ্বারা হয়, এটা বাস্তবিকভাবে হতে পারে, যেমন– উটের উদাহরণের মধ্যে। অথবা মনস্তাত্ত্বিকভাবে, যেমন– সন্তুষ্টির উদাহরণে হয়েছে। ঠিক এমনই হয়েছে সামান্য ও স্বল্পতার মধ্যে। এ দু'য়ের মাঝের পার্থেক্যর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য লেখক বলেন, **কখনো অনির্দিষ্ট শব্দ বিশালতা এবং মহত্ত্ব, আধিক্য বুঝানোর জন্য আসে। যেমন–** (وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ) অর্থাৎ **যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে থাকে তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ ইতঃপূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে।** (رسل শব্দটি অনির্দিষ্ট এখানে আধিক্যের অর্থ বুঝানোর জন্য এসেছে) অর্থাৎ **অনেক সংখ্যায়।** এটি (তরজমাটি) আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়েছে। **অথবা "অনেক বড় মু'জিযা নিদর্শনের অধিকারীদের"** এ অর্থ মহত্ত্বের (تعظيم)-এর প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়েছে। **আবার কখনো অনির্দিষ্ট বিশেষ্য সামান্য এবং অল্প বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–** حَصَلَ لِىْ مِنْهُ شَيْءٌ **তার থেকে আমি অল্পই পেয়েছি।**

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اَوِ التَّكْثِيْرِ كَقَوْلِهِمْ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করার আরো কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. কখনো মুসনাদ ইলাইহকে আধিক্যের অর্থ বুঝানোর জন্য অনির্দিষ্টরূপ আনা হয়, যেমন– আরবদের উক্তি وَاِنَّ لَهُ لَاِبِلًا وَاِنَّ لَهُ لَغَنَمًا অর্থাৎ তার প্রচুর উট এবং মেষপাল রয়েছে।

এ উদাহরণে لَاِبِلًا ও لَغَنَمًا এ দু'টি বিশেষ্য অনির্দিষ্ট এবং বাক্যে মুসনাদ ইলাইহ (اِنَّ-এর ইসম) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ দু'টি বিশেষ্য এখানে সংখ্যার আধিক্য বুঝিয়েছে।

২. কখনো মুসনাদ ইলাইহ স্বল্পতার অর্থ বুঝানোর জন্য অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কুরআনের আয়াত رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সামান্য সন্তুষ্টি অনেক বড়। আয়াতে رضوان শব্দটি অনির্দিষ্ট হয়েছে এবং তা মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে। এটি এখানে সামান্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْظِيْمِ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো تَعْظِيْم-وَتَحْقِيْر-এর উল্লেখ করার পর تَكْثِيْر وَتَقْلِيْل কেন উল্লেখ করা হলো? কেননা, تعظيم এবং تكثير একই বিষয় ও একার্থক। এমনিভাবে تحقير ও تقليل পরস্পর সমার্থক। অতএব, একটির উল্লেখের দ্বারা অপরটিকে উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে না।

এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, প্রশ্নটি ভুল ধারণা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মূলত এ বিষয়গুলোকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। এ গুলোর মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

মূলত تعظيم এবং تكثير-এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমনটি পার্থক্য রয়েছে تحقير এবং تقليل-এর মাঝে। تعظيم হচ্ছে كيفيات-এর সাথে সম্পর্কিত। تعظيم বা সম্মান ও মর্যাদা দান কারো উঁচু মর্যাদা ও উপরের স্তরে অবস্থানের কারণে হয়। আর تكثير হয়ে থাকে সংখ্যা ও পরিমাণের ক্ষেত্রে। যেমন– শতশত, হাজার হাজার উট ও ঘোড়া। মোটকথা, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করার দ্বারা সংখ্যা ও পরিমাণ বুঝানো হয়। যেমন– উল্লিখিত উদাহরণে ابل ও غنم দ্বারা প্রচুর সংখ্যা বুঝানো হয়েছে এটি কোনো বস্তুর كيفيات-এর সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং এটি পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত। তবে গণনা কখনো বাহ্যিকভাবে করা যায় এবং বুঝা যায়। যেমন– উট ও মেষপালের ক্ষেত্রে তা করা সম্ভব। আবার কখনো এ সংখ্যা নির্ধারণ বাহ্যিকভাবে করা সম্ভব হয় না। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এর গণনা হয়ে থাকে। যেমন– رضوان দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সামান্য পরিমাণ সন্তুষ্টিই অনেক বড়। কিন্তু সামান্য কতটুকু তা গণনা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এটি হচ্ছে একটি معنوى বিষয়। বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই। আর বাস্তবে অস্তিত্বহীন কোনো বস্তুর গণনা কি করে সম্ভব। অতএব, এর মধ্যে এর افراد-কে মনে মনে ধরে সে মতে কমবেশি পরিমাপ করা যেতে পারে। এমনিভাবে পার্থক্য রয়েছে تقليل এবং تحقير-এর মাঝে। تحقير-এর সম্পর্ক কোনো বস্তুর অবস্থার সাথে, আর تقليل-এর সম্পর্ক সেই বস্তুর পরিমাণের সাথে।

এগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য লেখক বলেন, অনির্দিষ্ট বিশেষ্য বিশালতা ও আধিক্য (উভয়)-এর অর্থের জন্য আসে। লেখক এখানে تعظيم ও تكثير শব্দদ্বয়কে আতফ করে লিখেছেন। আতফ দু'টি বিষয়ের বৈপরীত্যের প্রমাণ বহন করে। অতএব, দু'টি ভিন্ন বিষয়, উভয়ের উদাহরণ মূল লেখক কুরআনের একটি আয়াত থেকে পেশ করেছেন। আয়াত وَإِنْ يُكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ আয়াতের رسل শব্দটি অনির্দিষ্ট এবং মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে। رسل-এর তানবীন অনির্দিষ্টতার অর্থ দানের জন্য। সেই সাথে তা আধিক্যের অর্থে হতে পারে। আবার বিশালতা বুঝানোর জন্যও হতে পারে।

আধিক্যের জন্য হলে আয়াতের অর্থ হবে আপনার পূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। আর মহত্ত্বের জন্য হলে এর অর্থ হবে আপনার পূর্বে বড় বড় রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যাদের কাছে অনেক বিস্ময়কর মু'জিযাসমূহ বিদ্যমান ছিল।

মুসান্নিফ تحقير এবং تقليل-এর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করার জন্য বলেছেন, অনির্দিষ্ট বিশেষ্য কখনো তুচ্ছ ও স্বল্প কিছু বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানেও তিনি দু'টিকে আতফের অক্ষরের সাথে বর্ণনা করেছেন, যা উভয়ের ভিন্নতার ইঙ্গিত বহন করে। যেমন– حَصَلَ لِىْ شَيْءٌ আমার সামান্য কিছু অর্জিত হয়েছে। এ উদাহরণের شىء শব্দটি অনির্দিষ্ট। এর তানবীন تحقير (তুচ্ছ) এবং تقليل (স্বল্প) উভয় অর্থে এখানে হতে পারে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. কখনো মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয় মুসনাদ ইলাইহের আধিক্য বুঝানোর জন্য। যেমন–
إِنَّ لَهُ لَإِبِلًا وَإِنَّ لَهُ لَغَنَمًا

খ. কখনো মুসনাদ ইলাইহের স্বল্পতা বুঝানোর জন্য نكرة ব্যবহার করা হয়। যেমন– وَرِضْوَانٌ اللّٰهِ اَكْبَرُ

উল্লেখ্য যে, تعظيم ও تحقير এবং تكثير ও تقليل-এর মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। কারণ, প্রথম দু'টির সম্পর্ক كيفيات-এর সাথে, পক্ষান্তরে শেষ দু'টির সম্পর্ক كميات-এর সাথে।

وَمِنْ تَنْكِيْرِ غَيْرِهِ اَىْ غَيْرِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ لِلْاَفْرَادِ وَالنَّوْعِيَّةِ نَحْوُ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاۤءٍ اَىْ كُلَّ فَرْدٍ مِنْ اَفْرَادِ الدَّوَابِّ مِنْ نُطْفَةٍ مُعَيَّنَةٍ هِىَ نُطْفَةُ اَبِيْهِ الْمُخْتَصَّةُ بِهٖ وَكُلَّ نَوْعٍ مِنْ اَنْوَاعِ الدَّوَابِّ مِنْ نَوْعٍ مِنْ اَنْوَاعِ الْمِيَاهِ وَهُوَ نَوْعُ النُّطْفَةِ الَّتِىْ تَخْتَصُّ بِذٰلِكَ النَّوْعِ مِنَ الدَّوَابِّ وَمِنْ تَنْكِيْرِ غَيْرِهِ لِلتَّعْظِيْمِ نَحْوُ فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ اَىْ حَرْبٍ عَظِيْمٍ ـ

অনুবাদ : **আর মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য বিশেষ্যকে অনিনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয়** (মুসনাদ ইলাইহের মতো) **কোনো এক فرد (সদস্য) বুঝানোর জন্য অথবা প্রকার বুঝানোর জন্য। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বিচরণশীল প্রত্যেক প্রাণীকে বিশেষ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।** অর্থাৎ বিচরণশীল প্রাণীর প্রতিটি সদস্যকে নির্দিষ্ট শুক্রকীট তথা তার পিতার শুক্রকীট থেকে জন্ম দিয়েছেন এবং (দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে) বিচরণশীল প্রাণীসমূহের প্রত্যেক প্রকারকে পানির একটি বিশেষ প্রকার থেকে সৃষ্টি করেছেন। সেটি হচ্ছে বীর্য। যে বীর্যটি বিচরণশীল প্রাণীর বিশেষ প্রকারের সাথে খাস, অন্য বিশেষ্যের অনির্দিষ্টকরণ **মহত্ত্ব বর্ণনার জন্যও আসে। যেমন– তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দাও।** অর্থাৎ বিরাট যুদ্ধের।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَمِنْ تَنْكِيْرِ غَيْرِهِ الخ : মুসান্নিফ বলেন, মুসনাদ ইলাইহের মতো অন্যান্য বিশেষ্য, যা বাক্যে মুসনাদ অথবা অন্য মা'মূল হয়েছে, অনির্দিষ্ট فرد এবং প্রকার বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্য অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমে লেখক অনির্দিষ্ট সদস্য এবং প্রকার বুঝানোর উদাহরণ পেশ করেছেন, যেমন– وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاۤءٍ অর্থাৎ 'আল্লাহ প্রত্যেক বিচরণশীল প্রাণীকে বিশেষ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।' আয়াতের دَابَّةٍ এবং مَّاۤءٍ শব্দ দু'টি অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এদের একটিও মুসনাদ ইলাইহ নয়। دابة তারকীবের মধ্যে مضاف اليه হিসেবে মাজরূর হয়েছে। আর ماء হয়েছে من (حرف جر)-এর মাজরূর। শব্দ দু'টি ইসমে জিনসের অনির্দিষ্ট সদস্যের অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ وَحْدَتْ شَخْصِىْ-এর জন্য, আবার ইসমে জিনসের কোনো প্রকারের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রথম অর্থানুযায়ী বাক্যের তরজমা আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি একটি প্রাণীকে এক বিশেষ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীকে তার পিতার বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, دابة দ্বারা প্রতিটি প্রাণী অনির্দিষ্টভাবে উদ্দেশ্য হবে। এমনিভাবে পানি দ্বারাও এক পানি উদ্দেশ্য হবে। যদি কেউ এখানে আপত্তি তোলে যে, হযরত আদম, হাওয়া, হযরত ঈসা (আ.) এবং মাটি থেকে তৈরি পোকা-মাকড় ইত্যাদিকে তো আল্লাহ তা'আলা বীর্য ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। অতএব, প্রত্যেক প্রাণীকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করা কিভাবে হলো?

এর উত্তর হলো আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ নিয়মের ঘোষণা দেওয়া। উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা এ নিয়মের ব্যতিক্রম। আর যদি دابة এবং ماء শব্দ দু'টি প্রকারের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহলে আয়াতের তরজমা হবে এরূপ– আল্লাহ এক প্রকার বিচরণশীল প্রাণীকে এক প্রকারের পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন– মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন।

قَوْلُهٗ وَمِنْ تَنْكِيْرِ غَيْرِهِ لِلتَّعْظِيْمِ : লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য বিশেষ্যকে কখনো অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয় বিশালতা বুঝানোর জন্য। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী, فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ এ আয়াতে حرب শব্দটি অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তারকীবের মধ্যে حرب শব্দটি (حرف جر)-এর মাজরূর হয়েছে, মুসনাদ ইলাইহ হয়নি। এর দ্বারা এখানে حَرْبٍ عَظِيْمٍ (বিরাট ও ভয়াবহ যুদ্ধ) উদ্দেশ্য। পুরো বাক্যের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে বিরাট ও ভয়াবহ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দাও। এ আয়াত সুদের চরম পরিণতির কথা বর্ণনা করছে। সুদের কারবার করা আর আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার সমতুল্য। এ আয়াতে যেহেতু চরম পরিণতির বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, তাই এখানে حرب দ্বারা حَرْبٍ عَظِيْمٍ উদ্দেশ্য হবে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য ইসমকে نكرة বা অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা فرد কিংবা نوع বুঝানোর জন্য। যেমন– وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاۤءٍ

খ. কখনো মুসনাদ ইলাইহকে نكرة রূপে ব্যবহার করা হয় বড়ত্ব বুঝানোর জন্য। যেমন– فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ

وَلِلتَّحْقِيرِ نَحْوُ وَإِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا اَىْ ظَنًّا حَقِيرًا ضَعِيفًا إِذِ الظَّنُّ مِمَّا يَقْبَلُ الشِّدَّةَ وَالضُّعْفَ فَالْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ هٰهُنَا لِلنَّوْعِيَّةِ لَا لِلتَّاكِيدِ وَبِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ صَحَّ وُقُوعُهُ بَعْدَ الْاِسْتِثْنَاءِ مُفَرَّغًا مَعَ اِمْتِنَاعِ مَا ضَرَبْتُهُ اِلَّا ضَرْبًا عَلٰى اَنْ يَكُونَ الْمَصْدَرُ لِلتَّاكِيدِ لِاَنَّ مَصْدَرَ ضَرَبْتُهُ لَايَحْتَمِلُ غَيْرَ الضَّرْبِ حَتّٰى يَصِحَّ الْاِسْتِثْنَاءُ وَالْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ يَجِبُ اَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّدًا لِيَشْمُلَ الْمُسْتَثْنٰى وَغَيْرَهُ وَكَمَا اَنَّ التَّنْكِيرَ الَّذِىْ فِىْ مَعْنَى الْبَعْضِيَّةِ يُفِيدُ التَّعْظِيمَ فَكَذٰلِكَ صَرِيحُ لَفْظِ الْبَعْضِ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اَرَادَ بِبَعْضِهِمْ مُحَمَّدًا ﷺ فَفِىْ هٰذَا الْاِبْهَامِ مِنْ تَفْخِيمِ شَانِهٖ وَفَضْلِهٖ وَاِعْلَاءِ قَدْرِهٖ مَالَا يَخْفٰى -

---

<u>অনুবাদ :</u> **এবং তুচ্ছ জ্ঞান করার জন্য। যেমন– আমরা কেবল তুচ্ছ এবং দুর্বল ধারণা করি।** কেননা, ধারণা তো এমন যে, এতে প্রবলতা এবং দুর্বলতা উভয়টি বিদ্যমান আছে। ظَنًّا এখানে মাফউলে মুতলাক, প্রকার বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তাকিদের জন্য নয়। এ কারণে এটি ইসতিছনার পরে আসতে পারে যখন মুসতাছনা মিনহু না থাকে। অথচ মাসদার তাকিদের জন্য হওয়ার কারণে مَا ضَرَبْتُهُ اِلَّا ضَرْبًا বলা বিশুদ্ধ নয়। কেননা, ضَرَبْتُهُ-এর মাসদারে প্রহার করার অর্থ ছাড়া অন্য অর্থের সম্ভাবনা নেই যে এর ক্ষেত্রে ইসতিছনা বিশুদ্ধ হবে। মুসতাছনা মিনহু ব্যাপক অর্থবোধক হতে হয় যাতে তা মুসতাছনা এবং অন্য ইসমকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, অনির্দিষ্ট বিশেষ্য যা কতকের অর্থ ধারণ করে তা যেমন বিশালতা ও মহত্ত্বের অর্থ প্রদান করে, তেমনি بعض শব্দটিও একই অর্থ দিয়ে থাকে, যেমন– (ব্যবহৃত হয়েছে) আল্লাহ তা'আলার বাণীতে, তিনি বলেন, তিনি তাদের কতিপয়কে অন্য কতিপয়ের উপর মর্যাদা দান করেছেন। তাদের কতিপয় লোক বলে তিনি মুহাম্মদ ﷺ উদ্দেশ্য করেছেন। এ অস্পষ্টতার মধ্যে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিরাট স্বীকৃতি এবং উচ্চ মর্যাদার বিষয়টি রয়েছে যা অস্পষ্ট নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَلِلتَّحْقِيرِ نَحْوُ الخ : মূল লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহ ব্যতীত অন্য বিশেষ্যের অনির্দিষ্টতা কখনো তুচ্ছতা বুঝানোর আসে, যেমন– কুরআনের আয়াত اِنْ نَظُنُّ اِلَّا ظَنًّا আয়াতে ظَنًّا শব্দটি অনির্দিষ্ট। এটি এখানে মাফউলে মুতলাক হওয়াতে মানসূব হয়েছে এবং মুসনাদ ইলাইহ হয়নি। এর অনির্দিষ্টতা এখানে সামান্য ও তুচ্ছতার অর্থ প্রদান করছে। কেননা, আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমরা তুচ্ছ এবং দুর্বল ধারণা করছি।

মুসতাছনা মিনহু এখানে ব্যাপকার্থক, আর মুসতাছনা বিশেষ অর্থবোধক। মুসতাছনা মিনহু হলো এমন ধারণা, যাতে দৃঢ়তা ও প্রবলতা রয়েছে, আবার শক্তি ও দুর্বলতাও রয়েছে। লেখক সেই খাস মুসতাছনাকে ব্যাপক মুসতাছনা মিনহুর অন্তর্ভুক্তি থেকে বের করেছেন। অতএব, ইসতিছনা বিশুদ্ধ হয়েছে।

মোটকথা, এ আয়াতে ظن শব্দটি প্রকার বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এটি ظن-এর প্রকার বুঝিয়েছে. ফে'লের তাকিদ হয়নি।

قَوْلُهٗ وَبِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ صَحَّ وُقُوْعُهٗ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, ظَنًّا হচ্ছে مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغ আর مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغ বলা হয় এমন মুসতাছনাকে যার মুসতাছনা মিনহু অনুল্লেখ থাকে। এখানে সে উহ্য মুসতাছনা মিনহু হচ্ছে ظن (মাসদার)।

আর মুসতাছনা মিনহুর ব্যাপকতা জরুরি, যাতে মুসতাছনা তার অন্তর্ভুক্ত থাকে। অতঃপর ইসতিছনার হরফের মাধ্যমে একে বের করা যায়। কিন্তু ظن শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক নয়। কেননা, ধারণা কেবল ধারণাকে শামিল করে, অন্য কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

অতএব, এ ক্ষেত্রে ইসতিছনা বিশুদ্ধ হওয়ার কথা নয়, মুসতাছনা এবং তার মুসতাছনা মিনহু একই বিষয় হওয়াতে إِسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ হওয়া লাযেম আসছে। সুতরাং ইসতিছনা বাতিল বলে গণ্য হবে, যেমন- مَا ضَرَبْتُهُ إِلَّا ضَرْبًا বাতিল বলে গণ্য হয়েছে ঠিক একই কারণে।

এ প্রশ্নের জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি মাসদার তাকিদের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন অন্য অর্থ তাতে থাকে না। আর তাই তাকিদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত আপত্তি সঠিক বলে গণ্য হবে। আর যদি মাসদার তাকিদের সাথে অন্য অর্থ ধারণ করে, তাহলে ইসতিসনা বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। উল্লিখিত আয়াতের ظن (مستثنى) শুধুমাত্র তাকিদের জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং তা তাকিদের সাথে প্রকারও বুঝায়। আর মাসদারটিকে প্রকার বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হলে তা মুসতাছনা মিনহু হতে পারবে এবং ইসতিছনাও বিশুদ্ধ হবে। তখন إِسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ হওয়ার আপত্তিটিও আর থাকবে না। তখন উহ্য মুসতাছনা মিনহু (ظن) ব্যাপকার্থক হবে এবং তার মধ্যে একাধিক فرد থাকবে। যেমন- শক্তিশালী এবং মজবুত ধারণা, দুর্বল ও সামান্য ধারণা ইত্যাদি। এরপর ইসতিছনার মাধ্যমে দুর্বল ধারণাকে বের করে দেওয়া হয়েছে। অতএব, এ ধরনের ইসতিছনার মধ্যে আর কোনো সমস্যা রইল না।

এমনিভাবে مَا ضَرَبْتُهُ إِلَّا ضَرْبًا-এর ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, যদি মাসদারটি মাফউলে মুতলাকের জন্য হয় তবে এর ইসতিছনা বিশুদ্ধ হবে না। কিন্তু যদি তা ظَنًّا-এর মতো প্রকারের অর্থ প্রদান করে, তাহলে তারকীব বিশুদ্ধ হয়ে যাবে এবং إِسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ লাযেম আসবে না।

قَوْلُهُ وَكَمَا أَنَّ التَّنْكِيْرَ الَّذِيْ فِيْ مَعْنَى الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেসব অনির্দিষ্ট বিশেষ্য بعض (কতিপয়)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় এগুলো যেমন تعظيم (সম্মান ও বিশালতা) বুঝায়, ঠিক بعض শব্দটিও বাক্যের মধ্যে কখনো تعظيم-এর অর্থ প্রদান করে। এর উদাহরণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ আর আল্লাহ তা'আলা কতক নবীকে অন্যদের উপর বিরাট মর্যাদা দান করেছেন। بعضهم-এর দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ উদ্দেশ্য। এখানে بعض শব্দটি সম্মান দানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে অস্পষ্ট বর্ণনার দ্বারা রাসূল ﷺ -এর শ্রেষ্ঠত্ব, সুমহান মর্যাদা ও সর্বোচ্চস্তরের হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর এটি করা হয়েছে بعض শব্দের সাহায্যে।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহের বাইরে অন্য ইসমকে কখনো نكرة রূপে ব্যবহার করা হয় সেই ইসমের তুচ্ছতা বুঝানোর জন্য, وَإِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا আয়াতে উল্লিখিত ظنا শব্দটি প্রকার বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। نوع বা প্রকার বুঝানোর কারণেই এর থেকে استثناء করা বৈধ হয়েছে। যদি এটি تاكيد-এর জন্য ব্যবহৃত হতো, তাহলে এর থেকে ইসতিসনা করা বৈধ হতো না। যেমন- مَا ضَرَبْتُهُ إِلَّا ضَرْبًا বলা বিশুদ্ধ নয়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, بعض শব্দটি কখনো تعظيم-এর অর্থ প্রদান করে, যেমন- وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

وَاَمَّا وَصْفُهُ اَىْ وَصْفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ وَالْوَصْفُ قَدْ يُطْلَقُ عَلٰى نَفْسِ التَّابِعِ الْمَخْصُوْصِ وَقَدْ يُطْلَقُ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَهُوَ اَنْسَبُ هٰهُنَا وَ اَوْفَقُ بِقَوْلِهٖ وَاَمَّا بَيَانُهُ وَاَمَّا الْاِبْدَالُ مِنْهُ اَىْ اَمَّا ذِكْرُ النَّعْتِ لَهُ فَلِكَوْنِهٖ اَيِ الْوَصْفِ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَالْاَحْسَنُ اَنْ يَكُوْنَ بِمَعْنَى النَّعْتِ عَلٰى اَنْ يُرَادَ بِاللَّفْظِ اَحَدُ مَعْنِيَيْهِ وَبِضَمِيْرِهٖ مَعْنَاهُ الْاٰخَرُ عَلٰى مَا سَيَجِئُ فِى الْبَدِيْعِ مُبَيِّنًا لَهُ اَىْ لِلْمُسْنَدِ اِلَيْهِ كَاشِفًا عَنْ مَعْنَاهُ كَقَوْلِكَ اَلْجِسْمُ الطَّوِيْلُ الْعَرِيْضُ الْعَمِيْقُ يَحْتَاجُ اِلٰى فَرَاغٍ يَشْغَلُهُ فَاِنَّ هٰذِهِ الْاَوْصَافَ مِمَّا يُوْضِحُ الْجِسْمَ وَيَقَعُ تَعْرِيْفًا لَهُ وَنَحْوُهُ فِى الْكَشْفِ اَىْ مِثْلُ هٰذَا الْقَوْلِ فِىْ كَوْنِ الْوَصْفِ لِلْكَشْفِ وَالْاِيْضَاحِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ وَصْفًا لِلْمُسْنَدِ اِلَيْهِ قَوْلُهُ **شِعْرٌ** اَلْاَلْمَعِىُّ الَّذِىْ يَظُنُّ بِكَ الظَّنَّ ٭ كَاَنْ قَدْ رَاٰى وَقَدْ سَمِعَا فَالْاَلْمَعِىُّ مَعْنَاهُ الذَّكِىُّ الْمُتَوَقِّدُ وَالْوَصْفُ بَعْدَهُ مِمَّا يَكْشِفُ مَعْنَاهُ وَيُوْضِحُهُ لٰكِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ اِلَيْهِ لِاَنَّهُ اِمَّا مَرْفُوْعٌ عَلٰى اَنَّهُ خَبَرُ اِنَّ فِى الْبَيْتِ السَّابِقِ اَعْنِىْ قَوْلَهُ **شِعْرٌ** اِنَّ الَّذِىْ جَمَعَ السَّمَاحَةَ وَالنَّجْدَةَ وَالْبِرَّ وَ التُّقٰى جَمْعًا اَوْ مَنْصُوْبٌ عَلٰى اَنَّهُ صِفَةٌ لِاِسْمِ اِنَّ اَوْ بِتَقْدِيْرِ اَعْنِىْ ـ

অনুবাদ : **মুসনাদ ইলাইহের সিফাত ব্যবহার করা** (তার একটি অবস্থা) وصف শব্দটি কখনো একটি বিশেষ তাবে'কে বুঝায়, আবার কখনো মাসদারের অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে এটাই (মাসদারের অর্থে হওয়া) অধিক যুক্তিযুক্ত এবং (পরবর্তীতে) তার উক্তি وَاَمَّا بَيَانُهُ وَاَمَّا الْاِبْدَالُ مِنْهُ-এর সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের জন্য সিফাত উল্লেখ করা হয়। **ত** (সুস্পষ্টকারী) **হওয়ার কারণে** অর্থাৎ (সর্বনাম দ্বারা) উদ্দেশ্য وصف বা মাসদারের অর্থ। তবে এখানে সর্বোত্তম হচ্ছে সিফাতের অর্থে গ্রহণ করা এ হিসেবে যে, শব্দ দ্বারা তার দু' অর্থের একটি অর্থ নেওয়া হবে এবং তার সর্বনাম দ্বারা তার অপর অর্থ গ্রহণ করা, যার আলোচনা ইলমে বদী' এর মধ্যে আসবে– **মুসনাদ ইলাইহের বর্ণনাকারী এবং তার অর্থ উদ্ঘাটনকারী। যেমন– তুমি বললে শরীর হচ্ছে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা বিশিষ্ট, যা এমন খালি স্থানের মুখাপেক্ষী, যাকে সে পরিবেষ্টন করবে।** এ গুণাবলি শরীরের বর্ণনা দিচ্ছে এবং পরিচয় দানকারী হয়েছে। **এমন সিফাত হয়ে থাকে পূর্ববর্তী শব্দকে স্পষ্ট করার জন্য** এবং পরিস্ফুট করার ক্ষেত্রে, যদিও সেটি মুসনাদ ইলাইহের প্রকৃত সিফাত না হয়। **কবির কবিতার চরণ : (অনুবাদ) আলোকিত মেধার অধিকারী ব্যক্তি যে তোমার সম্পর্কে না দেখে না শুনে এমন ধারণা করে, যেন সে তোমাকে দেখেছে এবং তোমার সম্পর্কে শুনেছে।** اَلْاَلْمَعِىُّ শব্দের অর্থ– প্রখর মেধাবী। এর পরবর্তী সিফাতগুলো তার অর্থকে প্রকাশ করছে এবং স্পষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু এটি (তারকীবের মধ্যে) মুসনাদ ইলাইহ হয়নি। কেননা, এটি হয়তো পূর্ববর্তী পঙ্ক্তিতে যে اِنَّ রয়েছে তার খবর। পূর্ববর্তী পঙ্ক্তিটি হচ্ছে اِنَّ الَّذِىْ جَمَعَ السَّمَاحَةَ ٭ وَالنَّجْدَةَ وَالْبِرَّ وَالتُّقٰى جَمْعًا (অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি যথার্থভাবে দানশীলতা, আভিজাত্য, সততা এবং আল্লাহভীরুতাকে একত্রিত করেছে) অথবা এটি اِنَّ-এর ইসমের সিফাত হিসেবে মানসূব হয়েছে। অথবা এটি উহ্য اعنى দ্বারা মানসূব হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاَمَّا وَصْفُهُ الخ : মুসনাদ ইলাইহের توابع আসা তার আরেকটি অবস্থা, توابع মোট পাঁচ প্রকার। প্রথমটি হচ্ছে সিফাত বা না'ত। লেখক তাবে'সমূহের মধ্য থেকে সিফাত দ্বারা আলোচনা শুরু করেছেন, যেহেতু তাবে'র আলোচনা সিফাত দ্বারাই শুরু হয়, সাধারণ রীতি অনুসারে। মুসনাদ ইলাইহ সুনির্দিষ্ট হোক বা অনির্দিষ্ট হোক, উভয় অবস্থায় সিফাত মুসনাদ ইলাইহের অবস্থা হয়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, الوصف। শব্দটির ব্যবহার দু'ধরনের : ১ বিশেষ তাবে' যা তারকীবের মধ্যে সিফাত হয়ে থাকে ২. الوصف তার শাব্দিক অর্থে ব্যবহার হয়। অর্থাৎ সিফাত এবং না'ত (গুণবাচক) হওয়া।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ স্থানে আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য করা উত্তম। অর্থাৎ সিফাত এবং না'ত আনা, তাহলে এর তরজমা পরবর্তীতে বর্ণিত অন্যান্য তাবে'-এর তরজমার সাথে মিলবে। কেননা, তিনি পরবর্তীতে بدل প্রসঙ্গে বলেছেন أَمَّا الْإِبْدَالُ তারপর বয়ান সম্পর্কে বলেছেন أَمَّا بَيَانُهُ সেগুলো যেমন (বদল আনা, তার বয়ান আনা) মাসদারের অর্থ দিচ্ছে এটাও (সিফাত আনা) ঠিক এমনই অর্থ দিচ্ছে।

قَوْلُهُ فَلِكَوْنِهِ الخ : এ বাক্যটি দ্বারা তিনি সিফাত আনার কারণ উল্লেখ করেছেন। তবে মুসান্নিফ (র.) প্রথমে كونه-এর সর্বনাম সম্পর্কে বলেন, সর্বনামটির مرجع হবে وصف তবে তা হবে আভিধানিক অর্থে, পারিভাষিক সিফাত নয়। কারণ, ইতঃপূর্বে وصف শাব্দিক অর্থে অতিবাহিত হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাধারণ ব্যাখ্যা অনুসারে উক্ত مرجع বলা হলেও উত্তম কথা হচ্ছে كونه-এর সর্বনামটি শাব্দিক অর্থের وصف-এর দিকে নয়; বরং পারিভাষিক সিফাতের দিকে। কেননা, মুসনাদ ইলাইহের বিবরণদাতা, অর্থ উদ্ঘাটনকারী ও পরিচয় দানকারী হয় পারিভাষিক সিফাত, আভিধানিক অর্থে وصف তা হয় না।

তবে এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, اما وصفه-এর মধ্যে আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা আর সর্বনামের মধ্যে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে। কারণ, বিশেষ্য বা مرجع এবং তার সর্বনাম দ্বারা দু'ধরনের উদ্দেশ্য হয়ে যাচ্ছে, যা রীতি বিরুদ্ধ কাজ। এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটি করা হয়েছে ইলমে বদী'র একটি নিয়মের অনুসরণে, নিয়মটি হলো– صَنْعَتِ إِسْتِخْدَام আর এর ব্যাখ্যা হচ্ছে– কোনো শব্দের দু'টি অর্থ থাকবে। শব্দটি উল্লেখ করা হলে তার একটি অর্থ উদ্দেশ্য হবে, আর তার সর্বনাম উল্লেখ করলে অন্য অর্থ উদ্দেশ্য করা হবে। এখানে صَنْعَتِ إِسْتِخْدَام মোতাবেক কাজ করা হয়েছে।

মূল লেখক মুসনাদ ইলাইহের সিফাত আনার কারণ সম্পর্কে বলেন, তা মুসনাদ ইলাইহকে স্পষ্ট করে এবং এর অর্থ বর্ণনা করে। যেমন– তুমি বললে اَلْجِسْمُ الطَّوِيْلُ الْعَرِيْضُ الْعَمِيْقُ يَحْتَاجُ إِلَى فَرَاغٍ يَشْغُلُهُ এ বাক্যে الجسم হলো মুসনাদ ইলাইহ মাওসূফ, তার সিফাত হচ্ছে তিনটি طويل، عريض، عميق এ তিনটি সিফাত শরীরের পরিচয় দান করছে এবং এর বর্ণনা দিচ্ছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, সিফাত যেমনভাবে মুসনাদ ইলাইহের গুণাগুণ বর্ণনা করে তেমনি তা মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য বিশেষ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করে। যেমন– اَلَا لَمَعِيُّ الَّذِيْ يَظُنُّ بِكَ الظَّنَّ * كَأَنْ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمِعَا কবিতায় الا لمعى শব্দের অর্থ প্রচণ্ড ধীশক্তির অধিকারী ও প্রখর মেধাবী। এটি মাওসূফ, তার সিফাত হলো الذى يظن الخ এটি তার মাওসূফের অর্থকে স্পষ্ট করছে। মেধাবী এবং প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ব্যক্তি এমন যে, তোমার সম্পর্কে তার ধারণা তোমাকে দেখা ও তোমার সম্পর্কে শোনার মতো হয়ে যায়।

اَلْمَعِيُّ শব্দটি বাক্যের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ হয়নি। এতে দু'ধরনের ই'রাবের সম্ভবনা রয়েছে– ১. তা পূর্ববর্তী পঙ্ক্তিতে উল্লিখিত إن (حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعْل)-এর খবর হিসেবে মারফূ' হয়েছে, ২. অথবা পূর্ববর্তী إن-এর اسم-এর সিফাত রূপে মানসূব। কারো মতে এটি اعنى উহ্য ফে'লের মাফউল হিসেবে মানসূব হবে।

পূর্ববর্তী পঙ্ক্তিটি হচ্ছে إِنَّ الَّذِيْ جَمَعَ السَّمَاحَةَ وَالنَّجْدَةَ وَالْبِرَّ وَالتُّقَى جَمْعًا মোটকথা হচ্ছে المعى। শব্দটি মারফূ' বা মানসূব যাই হোক না কেন, এটি তারকীবে মুসনাদ ইলাইহ হয়নি।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহের অবস্থাসমূহের মধ্যে এর توابع ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইবারতে توابع-এর প্রথম تابع তথা صفت নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

وصف শব্দের দু'টি অর্থ– ১. গুণ বর্ণনা করা (অর্থাৎ معنى مصدرى), ২. বাক্যের মধ্যে صفت (تابع) হওয়া। মূল লেখকের ইবারতে وصفه-এর মধ্যে প্রথম অর্থে, আর فلكونه-এর মধ্যে দ্বিতীয় অর্থে صَنْعَتِ إِسْتِخْدَام রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি বাক্যে মুসনাদ ইলাইহের صفت হয়েছে এর উদাহরণ হচ্ছে اَلْجِسْمُ الطَّوِيْلُ الْعَرِيْضُ الْعَمِيْقُ يَحْتَاجُ إِلَى فَرَاغٍ এ বাক্যে الجسم হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ মাওসূফ, এরপর তিনটি صفت আনা হয়েছে। মুসনাদ ইলাইহ নয় এমন শব্দের صفت ব্যবহার করার একটি উদাহরণ মুসান্নিফ (র.) দিয়েছেন, যেমন– اَلَا لَمَعِيُّ الَّذِيْ يَظُنُّ بِكَ الظَّنَّ * كَأَنْ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمِعَا। এ কবিতায় اَلْمَعِيُّ শব্দ মাওসূফরূপে ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু এটি বাক্যে মুসনাদ ইলাইহ হয়নি।

উল্লেখ্য যে, উভয় স্থানে صفت-কে ব্যবহার করা হয়েছে সুস্পষ্ট বিবরণ দানকারী ও অর্থ প্রকাশকারী হিসেবে।

أَوْ لِكَوْنِ الْوَصْفِ مُخَصِّصًا لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَيْ مُقَلِّلًا اِشْتِرَاكَهُ أَوْ رَافِعًا اِحْتِمَالَهُ وَفِيْ عُرْفِ النُّحَاةِ التَّخْصِيْصُ عِبَارَةٌ عَنْ تَقْلِيْلِ الْاِشْتِرَاكِ فِي النَّكِرَةِ وَالتَّوْضِيْحُ عَنْ رَفْعِ الْاِحْتِمَالِ الْحَاصِلِ فِي الْمَعَارِفِ نَحْوُ زَيْدٌ التَّاجِرُ عِنْدَنَا فَإِنَّ وَصْفَهُ بِالتَّاجِرِ يَرْفَعُ اِحْتِمَالَ غَيْرِهِ أَوْ لِكَوْنِ الْوَصْفِ مَدْحًا أَوْ ذَمًّا نَحْوُ جَاءَنِيْ زَيْدٌ الْعَالِمُ أَوِ الْجَاهِلُ حَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْمَوْصُوْفُ أَعْنِيْ زَيْدًا قَبْلَ ذِكْرِهِ أَيْ ذِكْرِ الْوَصْفِ وَإِلَّا لَكَانَ الْوَصْفُ مُخَصِّصًا أَوْ لِكَوْنِهِ تَأْكِيْدًا نَحْوُ أَمْسِ الدَّابِرُ كَانَ يَوْمًا عَظِيْمًا فَإِنَّ لَفْظَ أَمْسِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الدُّبُوْرِ وَقَدْ يَكُوْنُ الْوَصْفُ لِبَيَانِ الْمَقْصُوْدِ وَتَفْسِيْرِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَآئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ حَيْثُ وَصَفَ دَابَّةً وَطَائِرًا بِمَا هُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْجِنْسَيْنِ لِبَيَانِ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُمَا إِلَى الْجِنْسِ دُوْنَ الْفَرْدِ بِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ أَفَادَ هٰذَا الْوَصْفُ زِيَادَةَ التَّعْمِيْمِ وَالْإِحَاطَةِ ـ

অনুবাদ : অথবা সিফাত মুসনাদ ইলাইহের জন্য **সীমাবদ্ধকারী হওয়ার কারণে**। অর্থাৎ তার অংশীদার কমিয়ে দিবে অথবা ভিন্ন অর্থের সম্ভবনা দূরকারী হবে। নাহুবিদদের পরিভাষায় অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের ক্ষেত্রে তাখসীস বলা হয় অংশীদার কমানোকে। আর নির্দিষ্ট বিশেষ্যসমূহের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বহু অর্থের সম্ভাবনাকে দূর করা। **যেমন ব্যবসায়ী যায়েদ আমাদের কাছে রয়েছে।** এখানে ব্যবসায়ী শব্দটি দ্বারা (সীমাবদ্ধ করা এবং) সিফাত বর্ণনা করাতে অন্য (যায়েদ)-এর সম্ভাবনাকে রহিত করে দিয়েছে। **অথবা** সিফাত **প্রশংসাসূচক অথবা নিন্দাসূচক হওয়ার কারণে। যেমন– আমার কাছে আলিম যায়েদ এসেছে অথবা মূর্খ যায়েদ এসেছে। যখন মাওসূফ এমনিতে সুনির্দিষ্ট থাকে** অর্থাৎ যায়েদ **তার সিফাত উল্লেখ করার আগ থেকেই পরিচিত।** আর যদি এমন না হয় তাহলে তা তাখসীসকারী **অথবা তাকিদকারী। যেমন–** أَمْسِ الدَّابِرُ كَانَ يَوْمًا عَظِيْمًا অর্থাৎ **পেছনের দিন গতকাল ছিল বিশাল বড় দিন।** امس (গতকাল) শব্দটি অতীতের প্রতি দিকনির্দেশ করছে। কখনো সিফাতের ব্যবহার হয়ে থাকে উদ্দেশ্যের বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা দানের জন্য– যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী স্থলভাগে যত বিচরণশীল প্রাণী রয়েছে এবং পাখি যারা তাদের দু'ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায় (আয়াতে আল্লাহ তা'আলা) دابة এবং طائر শব্দদ্বয়ের সিফাত এনেছেন এমন বিষয় দ্বারা যা এ দু'টির সাথেই খাস। (আর এটা করেছেন) এ কথা বর্ণনা করার জন্য যে, এ দু'টি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জিনস, কোনো فرد এখানে উদ্দেশ্য নয়। এ ভিত্তিতে এ সিফাতটি অধিক ব্যাপকতার এবং সকল সদস্যকে পরিবেষ্টন করে নেওয়ার অর্থ দেবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ لِكَوْنِ الْوَصْفِ الخ : লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে তাখসীস করার জন্য তার সিফাত যুক্ত করা হয়। ইলমে বয়ানের বিশেষজ্ঞদের মতে, অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে তাখসীসের অর্থ হচ্ছে তার অংশীদার কমিয়ে দেওয়া এবং কোনো অর্থকে সংকীর্ণ করে দেওয়া। যেমন– رَجُلٌ عَالِمٌ عِنْدَنَا অর্থাৎ আলিম ব্যক্তি আমাদের কাছে। رجل শব্দটি আলিম বা আলিম নয়, এমন সকল পুরুষকেই অন্তর্ভুক্ত করে; কিন্তু عالم বলার সাথে সাথে আলিম নয় এমন ব্যক্তি رجل থেকে বের হয়ে গেছে। অতএব, عالم সিফাতটি পুরুষের অংশীদার কমিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের অংশীদার কমানোকেই তাখসীস বলা হয়।

আর যদি মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট হয় তাহলে সিফাত সেই নির্দিষ্ট বিশেষ্যের অস্পষ্টতা দূর করে দেয় এবং একই নাম বিশিষ্ট ভিন্ন বিশেষ্য হওয়ার সম্ভাবনাকে রহিত করে। যেমন– খালিদ নামক দু'জন ব্যক্তি আছে, এদের একজন আলিম অপর জন ব্যবসায়ী। এমতাবস্থায় যখন তুমি বলবে خَالِدُ الْعَالِمُ عِنْدَنَا তখন আলিম সিফাতটি তার ব্যবসায়ী হওয়ার সম্ভাবনাকে রহিত করল এবং খালিদকে আলিমের সাথে নির্দিষ্ট করে ফেলল।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইলমে বয়ানের বর্ণনা মতে تخصيص-এর দু'টি কাজ : ১. تَقْلِيْلُ الْاِشْتِرَاكِ ২. رَفْعُ الْاِحْتِمَالِ। পক্ষান্তরে নাহুবিদদের মতে, তাখসীস শুধুমাত্র অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মাঝে হতে পারে। অর্থাৎ শুধুমাত্র অংশীদার কমানোকে তাখসীস বলা হয়। আর নির্দিষ্ট বিশেষ্যের অস্পষ্টতা দূর করাকে توضيح বলা হয়। এটিকে তারা তাখসীস বলেন না। অথবা সিফাত শব্দের প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়, এমনিভাবে শব্দের নিন্দা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– প্রথমটির উদাহরণ হচ্ছে جَاءَنِيْ زَيْدُ الْعَالِمُ আমার কাছে জ্ঞানী যায়েদ এসেছে। এ উদাহরণে اَلْعَالِمُ শব্দটি সিফাত, যা যায়েদের প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারের উদহারণ جَاءَنِيْ زَيْدُ الْجَاهِلُ অর্থাৎ আমার কাছে মূর্খ যায়েদ এসেছে। এ বাক্যে اَلْجَاهِلُ শব্দটি সিফাত হয়েছে, যা যায়েদের নিন্দা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সিফাত প্রশংসা কিংবা নিন্দার অর্থে তখনই ব্যবহৃত হবে যখন বাক্যের মাওসূফের সিফাত সম্পর্কে আগ থেকে জানা থাকে এবং মাওসূফ নির্দিষ্ট থাকে। আর যদি মাওসূফ নির্দিষ্ট না থাকে তাহলে সিফাত তাখসীসের অর্থে হবে প্রশংসাসূচক কিংবা নিন্দাসূচক হবে না।

কখনো মুসনাদ ইলাইহের তাকিদের জন্য সিফাত আনা হয়। এখানে তাকিদ দ্বারা পারিভাষিক তাকিদ উদ্দেশ্য নয় এবং অর্থগত তাকিদ উদ্দেশ্যে নয়; বরং তাকিদ দ্বারা শাব্দিক তাকিদ উদ্দেশ্য। সিফাত তাকিদের হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ উক্ত সিফাতের অর্থ ধারণ করতে হবে। অন্যথা সিফাত তাকিদের জন্য হবে না। কেননা, মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে উক্ত সিফাতের অর্থ থাকলেই কেবল মুসনাদ ইলাইহের জন্য সিফাত তাকিদকারী হবে। যেমন– اَمْسِ الدَّابِرُ كَانَ يَوْمًا عَظِيْمًا এ উদাহরণে امس। হলো মুসনাদ ইলাইহ, اَلدَّابِرُ হলো তার সিফাত دابر অর্থ– অতীত, আর امس। অর্থও অতীত ও গত। অতএব, اَلدَّابِرُ এখানে امس-এর তাকিদ হবে। কখনো মুসনাদ ইলাইহের উদ্দেশ্য বর্ণনার জন্য এবং তার ব্যাখ্যা করার জন্য সিফাত আনা হয়, যেমন– وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ আয়াতের মধ্যে فِي الْاَرْضِ সিফাত হয়েছে دابة-এর এবং يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ সিফাত হয়েছে طائر-এর, দু'টি সিফাত তার মাওসূফের উদ্দেশ্য বর্ণনা করছে যে, এখানে دابة এবং طائر দ্বারা জিনস উদ্দেশ্য। কেননা, এখানে উল্লিখিত শব্দগুলো দ্বারা এমন সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের জিনসের সাথে খাস। অতএব, এখানে জিনস উদ্দেশ্য, فرد উদ্দেশ্য নয়। তাই আয়াতের তরজমা হবে : বিচরণশীল প্রাণীর জিনসের মধ্য হতে এমন বিচরণশীল প্রাণী নেই এবং পাখির জিনসের মধ্য হতে এমন কোনো পাখি নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেননি; বরং প্রত্যেকের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু এখানে সিফাত দ্বারা জিনস উদ্দেশ্য তাই সিফাত এখানে সব সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং জিনসের কোনো সদস্যই বাদ পড়বে না।

সার-সংক্ষেপ :

ক. সিফাত কখনো তার মুসনাদ ইলাইহ মাওসূফকে খাস বা সংকীর্ণ করে। تخصيص-এর অর্থ দু'টি تَقْلِيْلُ الْاِشْتِرَاكِ ও رَفْعُ الْاِحْتِمَالِ যেমন– زَيْدٌ التَّاجِرُ عِنْدَنَا

খ. কখনো صفت ব্যবহার করা হয় মুসনাদ ইলাইহের প্রসংসা কিংবা নিন্দা করার জন্য। যেমন–

جَاءَنِيْ زَيْدُ الْعَالِمُ اَوِ الْجَاهِلُ

গ. কখনো صفت ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র তাকিদের জন্য। যেমন– اَمْسِ الدَّابِرُ كَانَ يَوْمًا عَظِيْمًا

ঘ. কখনো সিফাত তার মাওসূফের দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা বর্ণনা করে। যেমন–

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ

وَاَمَّا تَوْكِيْدُهُ اَىْ تَوْكِيْدُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فَلِلتَّقْرِيْرِ اَىْ لِتَقْرِيْرِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ اَىْ تَحْقِيْقِ مَفْهُوْمِهِ وَمَدْلُوْلِهِ اَعْنِىْ جَعْلِهِ مُقَرَّرًا مُحَقَّقًا ثَابِتًا بِحَيْثُ لَايُظَنُّ بِهِ غَيْرُهُ نَحْوُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ اِذَا ظَنَّ الْمُتَكَلِّمُ غَفْلَةَ السَّامِعِ عَنْ سِمَاعِ لَفْظِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ اَوْ عَنْ حَمْلِهِ عَلٰى مَعْنَاهُ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِهِ تَقْرِيْرُ الْحُكْمِ نَحْوُ اَنَا عَرَفْتُ اَوِ الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ نَحْوُ اَنَا سَعَيْتُ فِىْ حَاجَتِكَ وَحْدِىْ اَوْ لَا غَيْرِىْ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَاكِيْدِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فِىْ شَيْءٍ وَتَاكِيْدُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ لَايَكُوْنُ لِتَقْرِيْرِ الْحُكْمِ قَطُّ وَسَيُصَرِّحُ الْمُصَنِّفُ بِهٰذَا اَوْ دَفْعِ تَوَهُّمِ التَّجَوُّزِ اَىْ اَلتَّكَلُّمِ بِالْمَجَازِ نَحْوُ قَطَعَ اللِّصَّ الْاَمِيْرُ الْاَمِيْرُ اَوْ نَفْسُهُ اَوْ عَيْنُهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اَنَّ اِسْنَادَ الْقَطْعِ اِلَى الْاَمِيْرِ مَجَازٌ وَاِنَّمَا الْقَاطِعُ بَعْضُ غِلْمَانِهِ اَوْ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ السَّهْوِ نَحْوُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اَنَّ الْجَائِىَ غَيْرُ زَيْدٍ وَاِنَّمَا ذُكِرَ زَيْدٌ عَلٰى سَبِيْلِ السَّهْوِ اَوْ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ عَدَمِ الشُّمُوْلِ نَحْوُ جَاءَنِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ اَوْ اَجْمَعُوْنَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَجِئْ اِلَّا اَنَّكَ لَمْ تَعْتَدَّ بِهِمْ اَوْ اَنَّكَ جَعَلْتَ الْفِعْلَ الْوَاقِعَ مِنَ الْبَعْضِ كَالْوَاقِعِ مِنَ الْكُلِّ بِنَاءً عَلٰى اَنَّهُمْ فِىْ حُكْمِ شَخْصٍ وَاحِدٍ ـ

অনুবাদ : আর মুসানাদ ইলাইহকে (তাকিদ দ্বারা) **তাকিদযুক্ত করা হয় মুসনাদ ইলাইহকে শক্তিশালী করার জন্য।** অর্থাৎ তার অর্থ ও ভাব সুনিশ্চিত করার জন্য। অর্থাৎ একে শক্তিশালী, সুনিশ্চিত এবং প্রমাণিত করা যাতে তা দ্বারা অন্যকে ধারণা না করা হয়, যেমন– جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ (এভাবে বলা হয়) যখন বক্তা শ্রোতাকে মুসনাদ ইলাইহের শব্দটি শোনার ব্যাপারে অথবা তার গ্রহণ করার ব্যাপারে উদাসীন মনে করে। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা বিষয়কে মজবুত করা হয়। যেমন– اَنَا عَرَفْتُ (আমি চিনলাম)। অথবা মুসনাদ ইলাইহকে মজবুত করার জন্য, যেমন আমি একাই তোমার প্রয়োজন পূরণে চেষ্টা করেছি অথবা আমিই চেষ্টা করেছি, আমি ছাড়া অন্য কেউ নয়। এ উদাহরণে আপত্তি আছে– কেননা, এটি মোটেও মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ নয়। কারণ, মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ কখনো খবর বা বিষয়কে মজবুত করার জন্য হবে না। এ ব্যাপারে লেখক স্পষ্ট বক্তব্য রাখবেন। **অথবা রূপকার্থে ব্যবহৃত হওয়ার ধারণাকে দূর করবে।** অর্থাৎ রূপকভাবে বলা, যেমন– আমির চোরের হাত কেটেছেন– তিনি স্বয়ং ও নিজে কেটেছেন ইত্যাদি। (এখানে তাকিদ ব্যবহার করা হয়েছে) যাতে কেউ ধারণা না করে হাতকাটার নিসবত আমিরের দিকে রূপকার্থে হয়েছে, প্রকৃত কর্তনকারী হচ্ছে তার কোনো এক কৃতদাস। **অথবা ভুল করার ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য।** যেমন– جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ এ উদাহরণের ব্যাপারে (অর্থাৎ তাকিদ না থাকা অবস্থায়) যেন ধারণা না করা হয় যে, আগমনকারী যায়েদ ছাড়া অন্য কেউ ভুলে যায়েদের নামোল্লেখ করা হয়েছে। **অথবা সকলেই অন্তর্ভুক্ত নয় এ ধারণা দূর করার জন্য।** যেমন– جَاءَنِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ اَوْ اَجْمَعُوْنَ যাতে এ ধারণা না হয় যে, কতিপয় লোক আসেনি, তবে আপনি তাদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন না অথবা আপনি কতিপয় লোক দ্বারা সংঘটিত কাজকে সকলের কাজ সাব্যস্ত করলেন এই ভিত্তিতে যে, তারা সকলে সম্মিলিতভাবে একজন লোকের সমপর্যায়ে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاَمَّا تَوْكِيْدُهُ الخ : এখান থেকে তাবে'র দ্বিতীয় প্রকার 'তাকিদ'-এর আলোচনা শুরু হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থা হলো তার তাকিদ ব্যবহার করা। তাকিদ আনা হয় মুসনাদ ইলাইহের অর্থকে সুনিশ্চিত এবং সন্দেহমুক্ত করার জন্য। তিনি বলেন, তাকিদ হলো মুসনাদ ইলাইহকে এমনভাবে মজবুত ও নিশ্চিত প্রমাণিত করা যে, শ্রোতা মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে না পারে। যেমন– কেউ বলল, جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ অর্থাৎ আমার কাছে যায়েদই এসেছে। এ বাক্যের দ্বিতীয় যায়েদটি তাকিদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরনের তাকিদযুক্ত বাক্য বলার ক্ষেত্র সাধারণভাবে দু'টি– ১. শ্রোতা সম্পর্কে বক্তা যখন ধারণা করবে যে, সে মুসনাদ ইলাইহের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনছে না, ২. যখন বক্তা শ্রোতা সম্পর্কে ধারণা করবে যে, সে মুসনাদ ইলাইহের হাকিকী অর্থ গ্রহণ করছে না।

যেমন কেউ বলল جَاءَ اَسَدٌ, বক্তা এ কথা বলে বুঝতে পারল যে, শ্রোতা اسد দ্বারা প্রকৃত সিংহকে বুঝছে না; বরং সে সিংহ দ্বারা কোনো বীর শক্তিশালী মানুষকে বুঝছে; এমতাবস্থায় বক্তা তাকিদের সাথে বলল– جَاءَ اَسَدٌ اَسَدٌ।

قَوْلُهُ اَعْنِىْ جَعْلَهُ مُقَرَّرًا : মুসান্নিফ (র.) বলেন, তাকিদের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতার মনে মুসনাদ ইলাইহকে বসিয়ে দেওয়া। শুধুমাত্র অস্পষ্টতা দূর করা নয়; যাতে শ্রোতা কোনোভাবেই (মুসনাদ ইলাইহ ব্যতীত) অন্য কিছু ধারণা না করতে পারে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِهِ تَقْرِيْرُ الْحُكْمِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূল লেখকের التقرير শব্দটিকে অনেকে تقرير حكم বলেন, অনেকে আবার تَقْرِيْر مَحْكُوْم عَلَيْه বলে থাকেন।

تَقْرِيْر حُكْم-এর উদাহরণ হচ্ছে– اَنَا عَرَفْتُ এখানে حكم-এর ইসনাদ দু'বার হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ইসনাদ প্রথম ইসনাদের তাকিদ হয়েছে।

تَقْرِيْر مَحْكُوْم عَلَيْه-এর উদাহরণ হচ্ছে اَنَا سَعَيْتُ فِىْ حَاجَتِكَ وَحْدِىْ اَوْلَا غَيْرِىْ এখানে وحدى এবং لا غيرى দ্বারা مَحْكُوْم عَلَيْه-এর তাকিদ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِيْهِ نَظَرٌ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, تَقْرِيْر مَحْكُوْم عَلَيْه-এর উদাহরণের প্রতি আপত্তি রয়েছে। কেননা, وحدى এবং لا غيرى এখানে মুসনাদ ইলাইহকে তাকিদ করেনি। কেননা, وحدى তারকীবের মধ্যে حال হয়েছে, আর ولا غيرى মুসনাদ ইলাইহের উপর আতফ হয়েছে। আর حال এবং معطوف কখনোই পারিভাষিক তাকিদ হতে পারে না। আর যদি তাকিদ দ্বারা শাব্দিক তাকিদ উদ্দেশ্য হয়, তাহলেও এখানে মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ হয়নি। এখানে বরং মুসনাদ ইলাইহ তার যথাস্থানের আগে আসার কারণে তাতে যে তাখসীস হয়েছে উক্ত তাখসীসের তাকিদ হয়েছে। মোটকথা, কতিপয় লোকদের দাবি تَقْرِيْر مَحْكُوْم عَلَيْه তো সঠিক। কিন্তু তাদের দেওয়া উদাহরণ উক্ত দাবির প্রমাণ নয়।

قَوْلُهُ وَتَاكِيْدُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) কতিপয় লোকদের মতামতকে খণ্ডন করে বলেন, মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ কখনোই হুকুমকে মজবুত করে না। তাদের দেওয়া উদাহরণ اَنَا عَرَفْتُ-এর মধ্যে মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনার দ্বারা তার হুকুম শক্তিশালী হয়েছে ইসনাদ দু'বার হওয়ার কারণে। কিন্তু মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ দ্বারা হুকুমের দৃঢ়তা প্রমাণিত হয় না। এর প্রমাণ অচিরেই মূল লেখকের বক্তব্যে আসবে।

মূল লেখক বলেন, কখনো তাকিদ আনা হয় রূপকার্থে ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনাকে রহিত করার জন্য। যেমন কেউ বলল, قَطَعَ اللِّصَّ الْاَمِيْرُ এটি শাব্দিক তাকিদের উদাহরণ, অর্থগতভাবে তাকিদের উদাহরণ হচ্ছে قَطَعَ اللِّصَّ الْاَمِيْرُ نَفْسُهُ اَوْ عَيْنُهُ অর্থ– আমির চোরের হাত কেটেছেন, এখানে الامير মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ আনা হয়েছে। যাতে শ্রোতা এ ধারণা না করে যে, হাত আমির কাটেননি; বরং তার কোনো কর্মচারী কেটেছে।

قَوْلُهُ اَوْ لِيَدْفَعَ تَوَهُّمَ السَّهْوِ : কখনো ভুলের সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ আনা হয়। অর্থাৎ কখনো শ্রোতা মনে করে মুতাকাল্লিম ভুল করে মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ করেছে, প্রকৃতপক্ষে মুসনাদ ইলাইহ এটা নয়, শ্রোতার এ ধরনের ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে তাকিদের সাথে বর্ণনা করা হয়। যেমন– جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ আমার কাছে যায়েদই এসেছে, এ উদাহরণে দ্বিতীয় যায়েদকে উল্লেখ না করা হলে শ্রোতা মনে করত যে, যায়েদ প্রকৃত মুসনাদ ইলাইহ নয়। অতএব, যখনই তাকিদের জন্য দ্বিতীয় যায়েদকে উল্লেখ করা হলো তখন শ্রোতার এ ধরনের ধারণা থাকবে না; পাল্টে যাবে।

قَوْلُهُ أَوْ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ عَدَمِ الشُّمُوْلِ : কখনো মুসনাদ ইলাইহের সাথে তাকিদযুক্ত করা হয় মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে সকলে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য। যেমন- جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَوْ أَجْمَعُوْنَ অর্থাৎ আমার কাছে গোত্রের সকলেই এসেছে। যদি বলা হতো جَاءَنِي الْقَوْمُ (আমার কাছে গোত্রের লোকেরা এসেছে) তাহলে শ্রোতার মনে এ ধারণা জন্মানোর খুব সম্ভাবনা ছিল যে, গোত্রের সবলোক আসেনি, বেশির ভাগ লোক এসেছে, কিছুলোক আসেনি। বক্তা কিছু লোককে ধর্তব্যের মধ্যে রাখেননি তাই বলে দিয়েছেন গোত্রের লোকেরা এসেছে।

অথবা শ্রোতা গোত্রের সব লোকের মাঝে পরস্পর সহযোগিতা ও হৃদ্যতার কারণে তাদের সকলকে এক দেহের মতো ভেবেছেন। তারপর যখন কতিপয় লোকের আগমন ঘটেছে তিনি সবার প্রতি আগমনের নিসবত করে দিয়েছেন। শ্রোতার এ জাতীয় ধারণাকে দূর করার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে তাকিদের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَوْ أَجْمَعُوْنَ এ উদাহরণে كلهم এবং اجمعون। সবার দ্বারা আগমনের কাজ হওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করে। সুতরাং যখন এদের কোনো একটিকে উল্লেখ করা হবে তখন শ্রোতার মনে কোনোরূপ সন্দেহ থাকবে না।

সার-সংক্ষেপ :

ক. মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ ব্যবহার করা হয় তাকে পরিস্ফুট ও স্পষ্ট করার জন্য। এমন করা হয় যখন মুতাকাল্লিম শ্রোতার অমনোযোগিতা কিংবা ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করার মনোভাব লক্ষ্য করে। যেমন- جَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ ও جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ

খ. কখনো তাকিদ ব্যবহার করা হয় রূপক অর্থ গ্রহণ করার সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য। যেমন-

قَطَعَ اللِّصَّ الْاَمِيْرُ الْاَمِيْرُ

গ. ভুল ধারণা দূর করার জন্য কখনো তাকিদ ব্যবহার করা হয়। যেমন ذَهَبَ خَالِدٌ خَالِدٌ

ঘ. সকলে অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ ধারণাকে দূর করার জন্য তাকিদ ব্যবহার করা হয়। যেমন-

جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَوْ أَجْمَعُوْنَ

وَاَمَّا بَيَانُهُ اَىْ تَعْقِيْبُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِعَطْفِ الْبَيَانِ فَلِاِيْضَاحِهِ بِاِسْمٍ مُخْتَصٍّ بِهٖ نَحْوُ قَدِمَ صَدِيْقُكَ خَالِدٌ وَلَا يَلْزَمُ اَنْ يَكُوْنَ الثَّانِىْ اَوْضَحُ لِجَوَازِ اَنْ يَحْصُلَ الْاِيْضَاحُ مِنْ اِجْتِمَاعِهِمَا وَقَدْ يَكُوْنُ عَطْفُ الْبَيَانِ بِغَيْرِ اِسْمٍ يُخْتَصُّ بِهٖ كَقَوْلِهٖ ع وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرَ يَمْسَحُهَا * فَاِنَّ الطَّيْرَ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْعَائِذَاتِ مَعَ اَنَّهُ لَيْسَ اِسْمًا مُخْتَصًّا بِهَا وَقَدْ يَجِيْئُ عَطْفُ الْبَيَانِ لِغَيْرِ الْاِيْضَاحِ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ اَنَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْكَعْبَةِ جِيْئَ بِهٖ لِلْمَدْحِ لَا لِلْاِيْضَاحِ كَمَا يَجِيْئُ الصِّفَةُ لِذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : **আর** মুসনাদ ইলাইহের পর **আতফে বয়ান যুক্ত করা** এমন নামবাচক বিশেষ্য দ্বারা, যা মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস। (এটা করা হয়) **তাকে স্পষ্ট করার জন্য। যেমন– তোমার বন্ধু খালিদ এসেছে।** দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ আত্ফে বয়ান মাত্বূ'-এর চেয়ে) স্পষ্টতর হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা, উভয়টির সম্মিলনে স্পষ্ট হওয়া সম্ভব। কখনো আতফে বয়ান হয় এমন বিশেষ্য দ্বারা যার সাথে মুসনাদ ইলাইহ খাস নয়। যেমন কবির উক্তি : ঐ সত্তার কসম, যিনি নিরাপত্তা দানকারী আশ্রয়প্রার্থী পাখিদেরকে যাদেরকে স্পর্শ করে। এখানে طير শব্দটি عَائِذَاتِ-এর আতফে বয়ান; অথচ طير (পাখি) এমন বিশেষ্য নয়, যা তার সাথে খাস। কখনো আত্ফে বয়ান ব্যবহৃত হয় স্পষ্টকরণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– আল্লাহ তা'আলা সংরক্ষিত ঘর কা'বাকে মানুষের অবস্থানের স্থান করেছেন। তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থকার (আল্লামা যমখশরী) বলেন, اَلْبَيْتَ الْحَرَام (সংরক্ষিত ঘর) কা'বা শব্দের আত্ফে বয়ান। এটিকে আনা হয়েছে প্রশংসার উদ্দেশ্য, স্পষ্টকরণের জন্য নয়। যেমন প্রশংসার জন্য সিফাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاَمَّا بَيَانُهُ الخ : উল্লিখিত ইবারতে লেখক মুসনাদ ইলাইহের অবস্থা বর্ণনার উদ্দেশ্যে আরেকটি তাবে'-এর উল্লেখ করেছেন। এ প্রকারটির নাম হলো عَطْف بَيَان। মুসনাদ ইলাইহের জন্য তখনই আত্ফে বয়ান আনা হয়, যখন উদ্দেশ্য হয় মুসনাদ ইলাইহকে এমন বিশেষ্য দ্বারা পরিচিত করা, যে বিশেষ্য মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস, যেমন– قَدِمَ صَدِيْقُكَ خَالِدٌ এ উদাহরণে صَدِيْقُكَ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ। একে خالد দ্বারা শ্রোতার সামনে পরিচিত করা হয়েছে। خالد হলো এমন বিশেষ্য, যা মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস। কেননা, খালিদ বন্ধুর নাম। আর ব্যক্তির নাম তার সাথে খাস হয়। খালিদ শ্রোতার বন্ধুকে পরিচিত এবং স্পষ্ট করে তুলেছে। কেননা, শ্রোতাকে যখন বলা হলো তোমার বন্ধু এসেছে তখন তার একাধিক বন্ধু থাকার কারণে তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হবে যে, কোন বন্ধু আসল! কিন্তু যখন আত্ফে বয়ানরূপে খালিদের নাম বলা হলো তখন সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং কোন্ বন্ধু আসল, তা তার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ اَنْ يَكُوْنَ الثَّانِىْ اَوْضَحَ : এ বাক্য দ্বারা মূলত মূল লেখকের বক্তব্যের উপর আপত্তি তোলা হচ্ছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, লেখকের বর্ণনার আলোকে মনে হয় আত্ফে বয়ান মুসনাদ ইলাইহের চেয়ে স্পষ্টতর হবে। কেননা, তিনি বলেছেন, আতফে বয়ান ايضاح (স্পষ্ট করা)-এর জন্য আসে। আর মুসনাদ ইলাইহকে তখনই স্পষ্ট করা যাবে, যখন আতফে বয়ান মুসনাদ ইলাইহের চেয়ে স্পষ্টতর হবে এবং মুসনাদ ইলাইহ কম পরিচিত হবে। অথচ আতফে বয়ানের জন্য অধিক পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি উভয়ের সম্মিলনে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় তাহলেও চলবে। যেমন খালিদ

নামে অনেক ব্যক্তি আছে। তাদের মধ্যে একজনের ডাক নাম আবূ আব্দুল্লাহ। আবূ আব্দুল্লাহ অনেকের ডাক নাম আছে; কিন্তু তাদের একজনের নাম খালিদ। এমতাবস্থায় যদি বলা হয় قَدِمَ خَالِدٌ (খালিদ এসেছে।) তাহলে অস্পষ্টতা থাকবে যে, কোন খালিদ আসল। আবার যদি বলা হয় قَدِمَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ তাহলেও অস্পষ্টতা থাকবে যে, কোন আবূ আব্দুল্লাহ আসল। এ পরিস্থিতিতে যদি বক্তা বলে قَدِمَ خَالِدٌ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ তথা আবূ আব্দুল্লাহ খালিদ আগমন করেছে। তাহলে এসব অস্পষ্টতা দূর হবে এবং শ্রোতা বুঝতে পারবে যে, সে খালিদ এসেছে যার ডাক নাম আবূ আব্দুল্লাহ।

قَوْلُهٗ وَقَدْ يَكُوْنُ عَطْفُ الْبَيَانِ بِغَيْرِ اِسْمٍ يَخْتَصُّ بِهٖ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের বক্তব্যের উপর আরেকটি আপত্তি করেছেন। আপত্তি হচ্ছে– লেখক বলেছেন, আতফে বয়ান তার এমন বিশেষ্য হবে, যা متبوع (পূর্ববর্তী ইসম)-এর সাথে খাস। কিন্তু তার এ বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা, কখনো আতফে বয়ান এমন বিশেষ্য হয় না যা তার পূর্ববর্তী ইসমের সাথে খাস। যেমন– কবি বলেন, وَالْمُؤْمِنُ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرَ يَمْسَحُهَا এ কবিতার মধ্যে الطير (পাখি) আতফে বয়ান হয়েছে العائذات থেকে। অথচ الطير শব্দটি عائذات-এর সাথে খাস নয়। কেননা, পাখিরা আশ্রয় চায়, আবার অনেক পাখি আশ্রয় চায় না। সুতরাং পাখি মাত্রই আশ্রয়প্রার্থী নয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উক্ত কবিতায় العائذات শব্দটি মুসনাদ ইলাইহ হয়নি; বরং المؤمن-এর মাফউলে বিহী। এ কবিতাংশ দ্বারা শুধুমাত্র এটা দেখানো উদ্দেশ্য যে, আতফে বয়ান তার متبوع-এর সাথে খাস হওয়া জরুরি নয়। যেমনটি বলেছেন মূল লেখক।

পুরো শেয়েরটি এ রকম– وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرَ يَمْسَحُهَا * رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الْغَيْلِ وَالسَّنَدِ

والعائذات শব্দটি عائذة-এর বহুবচন, অর্থ– আশ্রয় প্রার্থী। এখানে উদ্দেশ্য পাখিদের সেসব দল যারা হারাম শরীফে নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় নেয়। কারণ, হারাম শরীফে সব ধরনের শিকার নিষিদ্ধ। الطير তারকীবে আতফে বয়ান হয়েছে। الغيل এবং السند দু'টি স্থানের নাম, যেগুলো হারাম শরীফের দু'পার্শ্বে অবস্থিত। পঙক্তিটির অর্থ– নিরাপত্তা দানকারী প্রভুর কসম, যিনি হারাম শরীফে আশ্রয়গ্রহণকারী পাখিদের স্থান (আশ্রয়) দিয়েছেন।

(পাখিগুলো আক্রান্ত হবে তো দূরের কথা) গাইল ও সানাদের মধ্যবর্তী এলাকায় চলমান মক্কার অভিযাত্রীরা তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

قَوْلُهٗ وَقَدْ يَجِئُ عَطْفُ الْبَيَانِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের উপর তৃতীয় আপত্তিটি করছেন। তার আপত্তিটি হচ্ছে, লেখকের ইবারত দ্বারা অনুমিত হয় যে, আতফে বয়ান শুধুমাত্র অস্পষ্টতা দূরীকরণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ, আমরা দেখতে পাই যে, আত্‌ফে বয়ান কখনো অস্পষ্টতা দূরীকরণ ছাড়া অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন– আল্লাহর বাণী جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ الخ এ আয়াতে اَلْبَيْتَ الْحَرَامَ হচ্ছে الكعبة-এর আত্‌ফে বয়ান। কিন্তু তা কা'বার অস্পষ্টতা দূর করার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা, কা'বা তো এমনিতেই সকলের কাছে সুপরিচিত ও চিরচেনা। তাফসীরে কাশ্‌শাফ গ্রন্থের লেখক আল্লামা যমখশরী বলেন, এখানে আত্‌ফে বয়ান অস্পষ্টতা দূর করার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং প্রশংসার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সিফাত কখনো তার মাওসূফের প্রশংসার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মূল লেখকের বক্তব্যের উপর মুসান্নিফ (র.)-এর এ তিনটি আপত্তির জবাবে কোনো কোনো ব্যখ্যাকার বলেছেন, মূল লেখকের বক্তব্য সাধারণ ব্যবহার অনুযায়ী করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল লেখক যা বর্ণনা করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই হয়ে থাকে। যদি কখনো এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় সেটা সাধারণ ব্যবহারের ব্যতিক্রম। অতএব, ব্যতিক্রম বা বিরল ব্যবহার লেখকের বক্তব্যের বিপক্ষে দলিল হবে না।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহের সাথে আত্‌ফে বয়ান যুক্ত করা হয় মুসনাদ ইলাইহকে তার সাথে খাস ইসমের দ্বারা সুস্পষ্ট এবং পরিচিত করার জন্য। যেমন– قَدِمَ صَدِيْقُكَ خَالِدٌ অর্থাৎ তোমার বন্ধু খালেদ এসেছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূল লেখকের ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় ইসমটি স্পষ্টতর হওয়া এবং আত্‌ফে বয়ান তার মাত্‌বূ'-এর সাথে খাস হওয়া জরুরি, কিন্তু বাস্তবে এরূপ হওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; বরং এরূপ না হওয়া সত্ত্বেও আত্‌ফে বয়ান হতে পারবে।

মূল লেখকের ইবারত দ্বারা এটাও মনে হয় যে, দ্বিতীয় ইসম বা আত্‌ফে বয়ান তার متبوع-কে শুধুমাত্র স্পষ্ট কর‍ার জন্য ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, কখনো আত্‌ফে বয়ান তার متبوع-এর প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যেমন– جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ

وَاَمَّا الْاِبْدَالُ مِنْهُ اَىْ مِنَ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فَلِزِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ مِنْ اِضَافَةِ الْمَصْدَرِ اِلَى الْمَفْعُوْلِ اَوْ مِنْ اِضَافَةِ الْبَيَانِ اَىْ لِلزِّيَادَةِ الَّتِىْ هِىَ التَّقْرِيْرُ وَهٰذَا مِنْ عَادَةِ اِفْتِنَانِ صَاحِبِ الْمِفْتَاحِ حَيْثُ قَالَ فِى التَّاكِيْدِ لِلتَّقْرِيْرِ وَهٰهُنَا لِزِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ وَمَعَ هٰذَا لَايَخْلُوْ عَنْ نُكْتَةٍ لَطِيْفَةٍ وَهِىَ الْاِيْمَاءُ اِلٰى اَنَّ الْغَرْضَ مِنَ الْبَدْلِ هُوَ اَنْ يَكُوْنَ مَقْصُوْدًا بِالنِّسْبَةِ وَالتَّقْرِيْرُ زِيَادَةٌ تَحْصُلُ تَبْعًا وَضِمْنًا بِخِلَافِ التَّاكِيْدِ فَاِنَّ الْغَرْضَ مِنْهُ نَفْسُ التَّقْرِيْرِ وَالتَّحْقِيْقِ نَحْوُ جَاءَ اَخُوْكَ زَيْدٌ فِىْ بَدْلِ الْكُلِّ وَيَحْصُلُ التَّقْرِيْرُ بِالتَّكْرِيْرِ وَجَاءَ نِى الْقَوْمُ اَكْثَرُهُمْ فِىْ بَدْلِ الْبَعْضِ وَسُلِبَ عَمْرٌو ثَوْبُهُ فِىْ بَدْلِ الْاِشْتِمَالِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **কখনো মুসনাদ ইলাইহের বদল ব্যবহার করা হয়। এটা করা হয় অতিরিক্ত সুদৃঢ় করার জন্য।** এখানে মাসদারের সম্বন্ধ হয়েছে মাফউলের দিকে। অথবা এটি ইযাফাতে বয়ানিয়া, অর্থাৎ অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জন্য, আর সেটা হচ্ছে অর্থকে মজবুত এবং সুস্পষ্ট করা। এটা মিফতাহ গ্রন্থের লেখকের স্বভাবসুলভ বৈচিত্র্য ইবারতের একটি। কেননা, তিনি তাকিদের মধ্যে বলেছেন لِلتَّقْرِيْرِ আর এখানে زِيَادَةُ التَّقْرِيْرِ। এ ছাড়াও এখানে একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার রয়েছে। সেটা হচ্ছে বদলের মধ্যে আসল উদ্দেশ্য হলো এ কথার ইঙ্গিত করা যে, বদল নিসবতের মধ্যে মুখ্য হয়ে থাকে। আর অর্থের দৃঢ়তা অর্জিত হয় অনুগামী হওয়া এবং পরোক্ষভাবে। কিন্তু তাকিদ তার বিপরীত। কেননা, তাকিদের মধ্যে মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে দৃঢ়তা এবং নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা। **যেমন, তোমার ভাই যায়েদ এসেছে।** এটি বদলুল কুলের উদাহরণ। আর অর্থের দৃঢ়তা তাকরারের কারণে হয়েছে। جَاءَنِى الْقَوْمُ اَكْثَرُهُمْ **আমার কাছে গোত্রের অধিকাংশ লোক এসেছে।** এটি بَدْلُ الْبَعْضِ-এর উদাহরণ। سُلِبَ عَمْرٌو ثَوْبُهُ **"আমর তথা তার কাপড় ছিনতাই হয়েছে।"** এটি بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ-এর উদাহরণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْاِبْدَالُ الخ **:** মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থা হলো এর বদল ব্যবহার করা। বদল হচ্ছে তাবে'-এর চতুর্থ প্রকার। বাক্যের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ হচ্ছে مُبْدَلْ مِنْهُ (এবং অর্থাৎ পূর্ববর্তী ইসম) بدل হচ্ছে তার তাবে', বদল ব্যবহার করার কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, فَلِزِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ অর্থাৎ বদল তার আগের শব্দ (মুসনাদ ইলাইহ)-এর অর্থকে দৃঢ় এবং শক্তিশালী করে।

لِزِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ এ যুক্ত শব্দটির ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ (র.) বলেন, زيادة শব্দটি মাসদার, এখানে মুযাফ হয়েছে তার ফায়েলের দিকে (যদি زيادة লাযিম হিসেবে ব্যবহৃত হয়)। অথবা তার মাফউলের দিকে মুযাফ হয়েছে। তখন زيادة মুতা'আদ্দীরূপে ব্যবহৃত হবে। মুসান্নিফ (র.) শুধুমাত্র দ্বিতীয়টির কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত ইযাফত ইযাফতে লামিয়া হবে। আর যদি زيادة শব্দটি এখানে حَاصِلُ الْمَصْدَرِ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে তা التقرير-এর দিকে ইযাফত হবে বয়ানিয়া হিসেবে। অর্থাৎ বদল আনা হয় অতিরিক্ত বিষয়ের জন্য আর তা হচ্ছে تقرير।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : কেউ কেউ বলেন, زيادة শব্দটিকে اِضَافَةٌ اِلَى الْمَفْعُوْلِ বা মাফউলের দিকে সম্বন্ধ হয়েছে– এ কথা বলা ঠিক নয়, কেননা تقرير সাধারণভাবে কোনো শব্দকে দু'বার ব্যবহার করার দ্বারা পাওয়া যায়। তার زيادة-এর জন্য এরপর আরেকটি শব্দ উল্লেখ করা চাই। কিন্তু উল্লিখিত উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহ দু'বার উল্লেখ করা হয়নি। আর এটাতো পূর্বেই বলা হয়েছে যে, تقرير হওয়ার জন্য দু'বার উল্লেখ করা প্রয়োজন। অতএব, এখানে তাকরীর হয়নি আর তাকরীর না হলে বদল তাকরীরকে বৃদ্ধি করবে কিভাবে?

এর উত্তর হচ্ছে, উল্লিখিত পদ্ধতিতে তাকরীরকে বৃদ্ধি করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়; বরং লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে বদল মুসনাদ ইলাইহের অর্থকে দৃঢ় করে। তবে এ তাকরীর বদলের মধ্যে একটি অতিরিক্ত বিষয়। বদলের মধ্যে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিসবতের মধ্যে তা উদ্দিষ্ট হয়। তার মুবদাল মিনহু উদ্দেশ্য হয় না।

মুসনাদ ইলাইহের তাকরীর ও দৃঢ়তা এখানে উদ্দেশ্যের চেয়ে অতিরিক্ত বিষয়। তাই এখানে এভাবে زِيَادَةُ التَّقْرِيْرِ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا مِنْ عَادَةِ : এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হচ্ছে লেখক তাকিদের অধ্যায়ে বললেন, তাকিদ আনা হয় (لِلتَّقْرِيْرِ) অর্থের দৃঢ়তার জন্য। আর বদলের আলোচনায় বললেন لِزِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ তার এ দু' বক্তব্যের মাঝে পার্থক্য কি?

এর উত্তরে বলা হয়েছে, এটি মিফতাহ গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাক্কাকীর বর্ণনার ধারা মতে হয়েছে। যেহেতু তালখীসের লেখক তার অনুকরণ করেছেন তাই তিনিও এভাবেই বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সাক্কাকী (র.) এভাবে কেন বর্ণনা করলেন এ প্রশ্ন রয়েই গেল। এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, আল্লামা সাক্কাকী (র.)-এর অভ্যাস হলো ইবারতের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করা। তিনি বাক্যের মধ্যে নতুনত্ব ও অভিনব কৌশল ব্যবহারে পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি বাস্তবে তাই করে থাকেন। এ কারণে তিনি তাকিদের মধ্যে لِلتَّقْرِيْرِ আর বদলের মধ্যে لِزِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ বলছেন। তা ছাড়া এ নতুনত্ব ছাড়াও আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি زيادة শব্দটি বৃদ্ধি করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, বদলের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিসবতের ক্ষেত্রে মুখ্য হওয়া। আর অর্থের দৃঢ়তা বদলের মধ্যে অতিরিক্ত বিষয় যা প্রাসঙ্গিকভাবে এবং অনুগামী হিসেবে পাওয়া গেছে। কিন্তু তাকিদ তার বিপরীত, তাকিদের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহের দৃঢ়তা এবং নিশ্চয়তা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এ পার্থক্যের প্রতি দিকনির্দেশ করার জন্য বদলের মধ্যে زيادة শব্দটি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

بدل মোট চার প্রকার : ১. بَدْلُ الْكُلِّ যার সত্তা আর মুবদাল মিনহুর সত্তা সম্পূর্ণ এক। যেমন– جَاءَنِىْ اَخُوْكَ زَيْدٌ এ উদাহরণে বদল (যায়েদ) এবং তার মুবদাল মিনহু (তোমার ভাই) একই ব্যক্তি। এতে মুসনাদ ইলাইহ দু'বার ব্যবহার হওয়াতে অর্থের দৃঢ়তা হয়েছে।

২. بَدْلُ الْبَعْضِ যার সত্তা মুবদাল মিনহুর সত্তার কতক অংশ। যেমন– جَاءَنِى الْقَوْمُ اَكْثَرُهُمْ এ উদাহরণে اكثرهم হলো بَدْلُ الْبَعْضِ যা তার মুবদাল মিনহুর তথা القوم-এর একাংশ মাত্র।

৩. بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ যা মুবদাল মিনহুর সাথে সম্পর্কিত হয়। আর মুবদাল মিনহু তার বদলের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে যেমন سُلِبَ زَيْدٌ ثَوْبُهُ এ উদাহরণে ثوبه বদল হয়েছে, যা তার মুবদাল মিনহু-এর সম্পর্কিত বিষয়।

৪. بَدْلُ الْغَلَطِ যা ভুলের পর বলা হয়। যেমন– جَاءَ زَيْدٌ حِمَارٌ এ উদাহরণে حمار কথাটি ভুলে যায়েদ বলার পর বলা হয়েছে। بَدْلُ الْغَلَطِ যেহেতু লেখার ও সাহিত্যমান সম্পন্ন বাক্যে পাওয়া যায় না; বরং তা কেবলই সাধারণ মানুষের মৌখিক কথায় ব্যবহৃত হয় তাই লেখক এটিকে তার আলোচনায় পরিহার করেছেন।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহের بدل ব্যবহার করা হয় মুসনাদ ইলাইহকে খুব ভালোভাবে সুস্পষ্ট করার জন্য। بدل মোট চার প্রকার মূল লেখক তিন প্রকার বদলের উদাহরণ দিয়েছেন–

১. بَدْلُ الْكُلِّ-এর উদাহরণ– جَاءَنِىْ اَخُوْكَ زَيْدٌ

২. بَدْلُ الْبَعْضِ-এর উদাহরণ– جَاءَنِى الْقَوْمُ اَكْثَرُهُمْ

৩. بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ-এর উদাহরণ– سُلِبَ عَمْرٌو ثَوْبُهُ

৪. بَدْلُ الْغَلَطِ-এর উদাহরণ– رَأَيْتُ زَيْدًا حِمَارًا

وَبَيَانُ التَّقْرِيْرِ فِيْهِمَا اَنَّ الْمَتْبُوْعَ يَشْتَمِلُ عَلَى التَّابِعِ اِجْمَالًا حَتّٰى كَاَنَّهُ مَذْكُوْرٌ اَمَّا فِى الْبَعْضِ فَظَاهِرٌ وَاَمَّا فِى الْاِشْتِمَالِ فَلِاَنَّ مَعْنَاهُ اَنْ يَشْتَمِلَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ عَلَى الْبَدْلِ لَا كَاشْتِمَالِ الظَّرْفِ عَلَى الْمَظْرُوْفِ بَلْ مِنْ حَيْثُ يَكُوْنُ مُشْعِرًا بِهٖ اِجْمَالًا مُتَقَاضِيًا لَهٗ بِوَجْهٍ مَّا بِحَيْثُ تَبْقَى النَّفْسُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ مُتَشَوِّقَةً اِلٰى ذِكْرِهٖ مُنْتَظِرَةً لَهٗ وَبِالْجُمْلَةِ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ الْمَتْبُوْعُ فِيْهِ بِحَيْثُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ التَّابِعُ نَحْوُ اَعْجَبَنِىْ زَيْدٌ اِذَا اَعْجَبَكَ عِلْمُهٗ بِخِلَافِ ضَرَبْتُ زَيْدًا اِذَا ضَرَبْتَ حِمَارَهٗ وَلِهٰذَا صَرَّحُوْا بِاَنَّ نَحْوَ جَاءَنِىْ زَيْدٌ اَخُوْهُ بَدْلُ غَلَطٍ لَا بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ كَمَا زَعَمَ بَعْضُ النُّحَاةِ ثُمَّ بَدْلُ الْبَعْضِ وَالْاِشْتِمَالِ بَلْ بَدْلُ الْكُلِّ اَيْضًا لَايَخْلُوْ عَنْ اِيْضَاحٍ وَتَفْسِيْرٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَدْلِ الْغَلَطِ لِاَنَّهٗ لَايَقَعُ فِىْ فَصِيْحِ الْكَلَامِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> এ দু'টির মধ্যে অর্থের দৃঢ়তা (পাওয়া যাওয়ার)-এর বর্ণনা এরূপ যে, মাতবূ' তার তাবে'কে মৌলিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। অতএব, যেন তাকে (মাতবূ'-এর মাধ্যমে) উল্লেখ করা হলো। এ বিষয়টি بَدْلُ الْبَعْضِ-এর মাঝে স্পষ্টই। আর بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ-এর মধ্যে এর অর্থ মুবদাল মিনহু অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তবে এটি কোনো পাত্র তার পাত্রস্থ বস্তুকে যেমন ধারণ করে এরূপ নয়; বরং এটি এমন যে, মুবদাল মিনহু এর প্রতি ইঙ্গিত প্রদানকারী এবং এর অস্তিত্বকে চায় এমনভাবে যে, যখনই মুবদাল মিনহু উল্লেখ করা হয়, মন তখন এর উল্লেখের প্রতি উদ্গ্রীব এবং তার অপেক্ষায় থাকে। মোটকথা, মাতবূ'টি এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, মাতবূ' বলে যেন তাবে' উদ্দেশ্য করা যায়। যেমন– اَعْجَبَنِىْ زَيْدٌ اِذَا اَعْجَبَكَ عِلْمُهٗ অর্থাৎ আমাকে যায়েদ মুগ্ধ করেছে (এ কথা বলবে) যখন তার জ্ঞান-গরিমা তোমাকে মুগ্ধ করেছে। এর বিপরীত হলো তুমি যায়েদের গাধাকে মেরে বললে, আমি যায়েদকে মেরেছি (কেননা, গাধাকে মেরে গাধার মালিককে মারা বুঝানো হয় না) এ কারণে তারা সুস্পষ্টভাবে বলেছে جَاءَنِىْ زَيْدٌ اَخُوْهُ এ জাতীয় উদাহরণ বদলুল গলত হবে, বদলুল ইশতিমাল হবে না। যেমনটি কতিপয় নাহুবিদগণ মনে করে থাকেন। তারপর بَدْلُ الْبَعْضِ, بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ এমনকি بَدْلُ الْكُلِّ কোনোটাই (মুবদাল মিনহুর) ব্যাখ্যা দান করা এবং তাকে সুস্পষ্ট করার কাজ থেকে মুক্ত নয়। (অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার মাতবূ'কে সুস্পষ্ট করে থাকে) তিনি বদলুল গলত-এর আলোচনা করেননি। কেননা, তা শুদ্ধ-সাবলীল বাক্যাবলিতে আসে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَبَيَانُ التَّقْرِيْرِ الخ : ইতঃপূর্বে বদলের আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছে যে, বদলের মধ্যে তার মুবদাল মিনহুর অর্থকে দৃঢ় করার বিষয়টি নিহিত আছে। تقرير সাধারণভাবে শব্দকে দু'বার ব্যবহার করার দ্বারা অর্জিত হয়। بَدْلُ الْكُلِّ-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তাতে মুবদাল মিনহু এবং বদল যেহেতু সত্তাগতভাবে এক, তাই শব্দগত ভিন্নতা সত্ত্বেও অর্থগতভাবে দু'বার উল্লেখ হয়ে যায়। আর এভাবে এতে تقرير (দৃঢ়তা) পাওয়া যায়। بَدْلُ الْبَعْضِ এবং بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ-এর মধ্যে কিভাবে অর্থকে মজবুত এবং শক্তিশালী করা হয় এর আলোচনা চলমান ইবারতের মধ্যে করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, مُبْدَلْ مِنْه বাক্যের মধ্যে متبوع হয়, আর بدل হয় তার تابع আর নিয়মানুসারে متبوع তার تابع-কে সীমিত অর্থে নিজের মাঝে অন্তর্ভুক্ত রাখে। بَدْلُ الْبَعْضِ-এর মধ্যে বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ, بَدْلُ الْبَعْضِ-এর মধ্যে মুবদাল মিনহু হয় সমগ্র, আর বদল হয় তার جزء (অংশ বিশেষ)। আর একটি পূর্ণাঙ্গ বস্তু তার অংশ বিশেষকে স্বাভাবিকভাবেই শামিল করে।

যেমন- جَاءَنِى الْقَوْمُ اَكْثَرُهُمْ অর্থাৎ আমার কাছে গোত্রের অধিকাংশ লোক এসেছে। এ উদাহরণে القوم। হলো মুবদাল মিনহু এবং كل, আর اكثر। হলো বদল এবং উক্ত সমষ্টির একটি অংশ। অতএব, بَدَلُ الْبَعْضِ তার মুবদাল মিনহুর মধ্যে উল্লেখ থাকবে। আর বদল যখন মুবদাল মিনহুর মধ্যে উল্লেখ হয় তারপর আবার বদল উল্লেখ করা হলে দু'বার উল্লেখ করা হলো, আর দু'বার উল্লেখের দ্বারা অর্থ শক্তিশালী এবং দৃঢ় হয়। সুতরাং بَدَلُ الْبَعْضِ-এর মধ্যে মুসনাদ ইলাইহের تقرير পাওয়া যাচ্ছে।

بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ-এর মধ্যে মুসনাদ ইলাইহের تقرير-এর আলোচনা :

বদলুল ইশতিমালের মধ্যে অন্য বদলের মতো মাতবূ' তার তাবে'কে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে এ অন্তর্ভুক্তকরণ অন্য বদলের মতো নয়। তিনি বলেন, পাত্র যেমন তার মধ্যে অবস্থিত দ্রব্যাদিকে সংরক্ষণ করে তেমনিভাবে মাতবূ' বদলুল ইশতিমালকে অন্তর্ভুক্ত করে না; বরং এভাবে যে, মুবদাল মিনহু বাক্যের মধ্যে উল্লেখ করার পর উক্ত মুবদাল মিনহু তার বদলের সংবাদ দেয় এবং এর প্রতি শ্রোতা আগ্রহী ও আকাঙ্ক্ষী থাকে। তাই মুবদাল মিনহু উল্লেখ করার সময় বদলের আকাঙ্ক্ষা এবং অপেক্ষা দেখা যায়। পুরো কথাটি সংক্ষেপ করলে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে মুবদাল মিনহু উল্লেখের দ্বারা বদল উদ্দেশ্য করা যায় এবং মুবদাল মিনহুর স্থানে তাবে'কে ব্যবহার করা যায়। এর অর্থ হচ্ছে মাতবূ', উল্লেখ করত এর দ্বারা তাবে'কে উদ্দেশ্য করা। এতে ফে'লের নিসবত হবে মাতবূ'র দিকে। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ফে'লের নিসবত তাবে'র দিকে করা হয়েছে। যেমন- اَعْجَبَنِى زَيْدٌ (যায়েদ আমাকে মুগ্ধ করেছে) زيد হলো মাতবূ'। এটি এখানে এমন একটি সিফাতকে চাচ্ছে যা মূলত মুগ্ধ করার কারণ। কেননা যায়েদ সত্তাগতভাবে মুগ্ধ করার কারণ নয়। অতঃপর বক্তা বলল : علمه (তার জ্ঞান), এ কথা শোনার দ্বারা শ্রোতার মন থেকে অপেক্ষার পালা শেষ হলো এবং তার আগ্রহের বিষয় পেয়ে গেল। পক্ষান্তরে যদি কেউ যায়েদের গাধাকে প্রহার করে আর বদলুল ইশতিমাল হিসেবে বলে ضَرَبْتُ زَيْدًا حِمَارَهُ তাহলে এটি বদলুল ইশতিমাল হবে না; বরং এটি بَدَلُ الْغَلَطِ হবে। কেননা, এখানে ضَرَبْتُ زَيْدًا। মাতবূ' তার তাবে' গাধার প্রহার করার সংবাদ দেয় না এবং যায়েদের প্রহৃত হওয়ার সংবাদ শুনলে তার গাধার প্রহৃত হওয়ার সংবাদের অপেক্ষায় কেউ থাকে না। এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম جَاءَنِىْ زَيْدٌ اَخُوْهُ জাতীয় উদাহরণকে বদলুল গলত বলেন, বদলুল ইশতিমাল বলেন না। অবশ্য আল্লামা ইবনে হাজেবের মতে, এটি বদলুল ইশতিমাল।

সকলের মতে, এটি বদলুল গলত হওয়ার কারণ হলো, উদাহরণের মধ্যে যায়েদকে উল্লেখ করার দ্বারা তার ভাইয়ের সংবাদ দেওয়া হয় না এবং যায়েদের কথা বললে তার ভাইয়ের সংবাদের অপেক্ষায় কেউ থাকে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ بَدَلُ الْبَعْضِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের উপর আপত্তি তুলে বলেন, তিন ধরনের বদল দ্বারাই তার মাতবূ'কে সুস্পষ্ট এবং সন্দেহমুক্ত করা হয়। অতএব, মূল লেখকের ইবারত এরূপ হওয়ার দরকার ছিল- اِنَّمَا اَلْاِ بْدَالُ مِنْهُ لِزِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ وَالْاِيْضَاحِ অর্থাৎ তিনি تقرير উল্লেখ করলেও ايضاح। শব্দটি উল্লেখ করেননি।

এর জবাব হচ্ছে লেখক তার ইবারতে تقرير শব্দটি উল্লেখ করেছেন, আর تقرير অর্থগতভাবে ايضاح।-কে আবশ্যক করে। তাছাড়া ايضاح। এখানে উদ্দেশ্যও নয়, তাই تقرير (উদ্দেশ্য)-কে শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

মূল লেখক কর্তৃক উল্লিখিত তিন প্রকার بدل-এর মধ্যে متبوع কে সুস্পষ্ট করার বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

بَدَلُ الْكُلِّ-এর মাঝে مُبْدَل مِنْه এবং بدل-এর অর্থ একই। এখানে بدل যে সত্তাকে বুঝায় مُبْدَل مِنْه ও সেই একই সত্তাকে বুঝায়, তাই এখানে مُبْدَل مِنْه উল্লেখ করার পর بدل-কে উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে একই সত্তা দু'বার উল্লেখ করা। আর এটা জানা কথা যে, কোনো সত্তাকে দু'বার উল্লেখ করার দ্বারা সে বিষয়টি সুস্পষ্ট ও পরিস্ফুট হয়।

بَدَلُ الْبَعْضِ-এর মাঝে مُبْدَل مِنْه তার بدل-এর كل বা পূর্ণসত্তা হয় আর بَدَلُ الْبَعْضِ হয় তার অংশবিশেষ। সেহেতু كل-এর উল্লেখের দ্বারা তার بعض-এর উল্লেখ হয়ে যায়, তাই এর মধ্যেও মুসনাদ ইলাইহকে যেন দু'বার উল্লেখ করা হলো।

بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ-এর মধ্যে مُبْدَل مِنْه বলার সাথে সাথে بدل-এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, ফলে مُبْدَل مِنْه-এর উল্লেখটাই بدل-এর প্রতি ইঙ্গিতকারী হয়। এভাবে বিবেচনা করলে দু'বারই উল্লেখ করা হলো। প্রথমবার পরোক্ষভাবে দ্বিতীয়বার প্রত্যক্ষভাবে।

وَاَمَّا الْعَطْفُ اَىْ جَعْلُ الشَّئِ مَعْطُوفًا عَلَى الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فَلِتَفْصِيْلِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ مَعَ اِخْتِصَارٍ نَحْوُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو فَاِنَّ فِيْهِ تَفْصِيْلًا لِلْفَاعِلِ بِاَنَّهُ زَيْدٌ وَ عَمْرٌو مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى تَفْصِيْلِ الْفِعْلِ بِاَنَّ الْمَجِيْئَيْنِ كَانَا مَعًا اَوْ مُتَرَتِّبَيْنِ مَعَ مُهْلَةٍ اَوْ بِلَا مُهْلَةٍ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مَعَ اِخْتِصَارٍ عَنْ نَحْوِ جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَجَاءَنِىْ عَمْرٌو فَاِنَّ فِيْهِ تَفْصِيْلًا لِلْمُسْنَدِ اِلَيْهِ مَعَ اَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَطْفِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بَلْ مِنْ عَطْفِ الْجُمْلَةِ وَمَا يُقَالُ مِنْ اَنَّهُ اِحْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ جَاءَنِىْ زَيْدٌ جَاءَنِىْ عَمْرٌو مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ فَلَيْسَ بِشَيْئٍ اِذْ لَيْسَ فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَفْصِيْلِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بَلْ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ اِضْرَابًا عَنِ الْكَلَامِ الْاَوَّلِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِىْ دَلَائِلِ الْاِعْجَازِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **তারপর হলো আত্‌ফ করা।** অর্থাৎ কোনো জিনিসকে মুসনাদ ইলাইহের উপর আত্‌ফ করা হয় **মুসনাদ ইলাইহকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করার জন্য। যেমন–** جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو অর্থাৎ **আমার কাছে যায়েদ এবং আমর এসেছে।** এখানে আগমন করার ফায়েলটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে (হরফ আত্‌ফের মাধ্যমে) অর্থাৎ ফায়েল হচ্ছে যায়েদ এবং আমর। এতে ফে'লের ব্যাখ্যার কোনো ইঙ্গিত নেই অর্থাৎ তাদের দু'জনের আগমন একই সাথে হয়েছে নাকি একের পর এক হয়েছে, (দ্বিতীয় জনের আগমন) বিলম্বে না অবিলম্বে। মুসান্নিফ (র.)-এর শব্দ مَعَ اِخْتِصَارٍ-এর দ্বারা جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَجَاءَنِىْ عَمْرٌو জাতীয় উদাহরণ সংজ্ঞা থেকে বাদ দিয়েছেন। কেননা, এগুলোতে মুসনাদ ইলাইহের ব্যাখ্যা থাকলেও এতে মুসনাদ ইলাইহকে অপর মুসনাদ ইলাইহের উপর আত্‌ফ করা হয়নি; বরং পুরো বাক্যকে আত্‌ফ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন যে, مَعَ اِخْتِصَارٍ দ্বারা جَاءَنِى زَيْدٌ جَاءَنِىْ عَمْرٌو তথা দু'টি আত্‌ফবিহীন বাক্যের একের পর অপরের সংযুক্তিকে বাদ দেওয়া হয়েছে এটা কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। কেননা, এ জাতীয় বাক্যে মুসনাদ ইলাইহের ব্যাখ্যা নেই; বরং এ সম্ভাবনা আছে যে, দ্বিতীয় বাক্যটি দ্বারা প্রথম বাক্য থেকে সরে আসা হয়েছে। শায়খ আব্দুল কাহের জুরজানী দালাইলুল ই'জায গ্রন্থে বিষয়টিকে স্পষ্টত এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْعَطْفُ الخ : মুসনাদ ইলাইহের তাবে' সম্পর্কিত আরেকটি অবস্থা হলো মুসনাদ ইলাইহের উপর অন্য কোনো ইসমকে আত্‌ফ করা। আত্‌ফ করা হয় কয়েকটি কারণে, তন্মধ্যে মুসনাদ ইলাইহকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা বা বিশদভাবে বর্ণনা করা প্রধান কারণ। যেমন– جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو অর্থাৎ আমার নিকট যায়েদ এবং আমর এসেছে। এখানে যায়েদ মুসনাদ ইলাইহের উপর আমরকে আত্‌ফ করা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, যায়েদের সাথে আমরও মুসনাদ ইলাইহ। এ উদাহরণে মুসনাদ তথা ফে'লের কোনো ব্যাখ্যা আসেনি অর্থাৎ তাদের ফে'ল (আগমন) কিভাবে হয়েছে– একের পর এক ধারাবাহিকভাবে না ধারাবাহিকতা ছাড়া। একের পর এক আসলে সামান্য ব্যবধানে নাকি বিলম্বে। এর কোনো কিছুই বর্ণনা করা হয়নি।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, مَعَ اِخْتِصَارٍ-এর قيد দ্বারা جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَجَاءَنِىْ عَمْرٌو জাতীয় উদাহরণগুলো উল্লিখিত আত্‌ফের আওতা থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ, যদিও এ জাতীয় উদাহরণ-এর মধ্যে মুসনাদ ইলাইহের ব্যাখ্যা হয়েছে,

কিন্তু আমেলের পুনরাবৃত্তির কারণে এতে اختصار বা সংক্ষিপ্তকরণ হয়নি এবং সেই সাথে এ জাতীয় উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহের উপর মুসনাদ ইলাইহের আত্ফ হয়েছে এ কথা বলা যাবে না; বরং এটাকে عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ বলা হবে। অথচ আমাদের আলোচনা চলছে عَطْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ-এর বিষয়ে।

قَوْلُهُ وَمَا يُقَالُ مِنْ اَنَّهُ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলছেন যে, কতিপয় লোক মনে করেন- مَعَ اِخْتِصَارٍ-এর قيد দ্বারা جَاءَنِىْ زَيْدٌ جَاءَنِىْ عَمْرٌو (আত্ফবিহীন) জাতীয় বাক্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের এ মতটি ভ্রান্ত এবং তাদের মতটি আমাদের আলোচনায় আসার মতোও কিছু নয়। তার কারণ হলো, আমাদের আলোচনা আত্ফের অধ্যায়ে এবং যেসব আতফের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয় তা নিয়ে। আর তাদের উল্লিখিত বাক্যটি আত্ফ ছাড়া ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া তাদের মতামতটি বাতিল হওয়ার আরেকটি কারণ হলো তাদের উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহের বিশ্লেষণ হচ্ছে না; বরং তাদের উদাহরণে বর্ণিত দু'টি বাক্যের মধ্যে দ্বিতীয় বাক্যটি; বরং প্রথম বাক্যের বিপরীত এবং দ্বিতীয় বাক্যটি বলে প্রথম বাক্য থেকে মুতাকাল্লিম তার অবস্থান পরিবর্তন করছে। এ জাতীয় উদাহরণের ক্ষেত্রে আমাদের উক্ত ব্যাখ্যা শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর অভিমত দ্বারা সমর্থিত। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ দালাইলুল ই'জায جَاءَنِىْ زَيْدٌ جَاءَنِىْ عَمْرٌو সম্পর্কে উক্ত ব্যাখ্যাকে স্পষ্টত বর্ণনা করেছেন।

আমাদের ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা গেল তাদের দেওয়া এ উদাহরণ মূল লেখকের فَلِتَفْصِيْلِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ-এর قيد দ্বারা বের হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের দাবি মতে مَعَ اِخْتِصَارٍ-এর قيد দ্বারা তা বের হয়ে যাবে না এবং এ قيد দ্বারা একে বের করা সঠিকও হবে না।

اَوْ لِتَفْصِيْلِ الْمُسْنَدِ بِاَنَّهُ قَدْ حَصَلَ بِاَحَدِ الْمَذْكُوْرَيْنِ اَوَّلًا وَعَنِ الْاٰخَرِ بَعْدَهُ مَعَ مُهْلَةٍ اَوْ بِلَا مُهْلَةٍ كَذٰلِكَ اَىْ مَعَ اِخْتِصَارٍ وَاحْتَرَزَ بِذٰلِكَ عَنْ نَحْوِ جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو بَعْدَهُ بِيَوْمٍ اَوْ سَنَةٍ اَوْ مَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ نَحْوُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ فَعَمْرٌو اَوْ ثُمَّ عَمْرٌو اَوْ جَاءَنِى الْقَوْمُ حَتّٰى خَالِدٌ فَالثَّلٰثَةُ تَشْتَرِكُ فِىْ تَفْصِيْلِ الْمُسْنَدِ اِلَّا اَنَّ الْفَاءَ تَدُلُّ عَلَى التَّعْقِيْبِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ وَثُمَّ عَلَى التَّرَاخِىْ وَحَتّٰى عَلٰى اَنَّ اَجْزَاءَ مَا قَبْلَهَا مُتَرَتِّبَةٌ فِى الذِّهْنِ مِنَ الْاَضْعَفِ اِلَى الْاَقْوٰى اَوْ بِالْعَكْسِ فَمَعْنٰى تَفْصِيْلِ الْمُسْنَدِ فِيْهَا اَنْ يُعْتَبَرَ تَعَلُّقُهُ بِالْمَتْبُوْعِ اَوَّلًا وَبِالتَّابِعِ ثَانِيًا مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ اَقْوٰى اَجْزَاءِ الْمَتْبُوْعِ اَوْ اَضْعَفُهَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهَا التَّرْتِيْبُ الْخَارِجِىُّ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **অথবা** (মুসনাদ ইলাইহের উপর আত্‌ফ করা হবে) **মুসনাদের** বিশ্লেষণের জন্যে। অর্থাৎ এ কথা বুঝানোর জন্য যে, মুসনাদটি প্রথমে উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তারপর দ্বিতীয়জন দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে বিলম্বে অথবা অবিলম্বে– সাথে সাথেই, **সেভাবেই** অর্থাৎ সংক্ষিপ্তভাবে। এর দ্বারা তিনি جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو بَعْدَهُ بِيَوْمٍ اَوْ سَنَةٍ (আমার কছে যায়েদ এসেছে এবং তার একদিন অথবা এক বছর পর আমর এসেছে) অথবা এ জাতীয় কিছুকে সংজ্ঞা থেকে বাদ দিয়েছেন। **যেমন**– جَاءَنِىْ زَيْدٌ فَعَمْرٌو اَوْ ثُمَّ عَمْرٌو **অথবা সে বলল,** جَاءَنِى الْقَوْمُ حَتّٰى خَالِدٌ সুতরাং এ তিনটি (হরফে আত্‌ফ যথা فَاء، ثُمَّ ও حَتّٰى) মুসনাদের ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে পরস্পর সমার্থক, তবে فَاء (বিশেষভাবে) কোনো কাজ অবিলম্বে পরে হওয়া বুঝায়। আর ثُمَّ বিলম্বে পরে হওয়া বুঝায়। আর حَتّٰى-এর পূর্ববর্তী অংশসমূহ পরবর্তী অংশসমূহ থেকে মানসিক বিন্যাসানুযায়ী কম গুরুত্বপূর্ণ অথবা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। এতে মুসনাদের বিস্তারিত বিবরণের অর্থ হচ্ছে প্রথমে এর সম্পর্ক মাতবূ'-এর সাথে, এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে তাবে'-এর সাথে ঘটবে, এ হিসেবে যে, এ (দ্বিতীয়) টি মাতবূ'-এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অংশ; নয়তো সবচেয়ে দুর্বলতম অংশ; কিন্তু এতে বাহ্যিক স্তর বিন্যাসের শর্ত নেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اَوْ لِتَفْصِيْلِ الْمُسْنَدِ الخ : উল্লিখিত ইবারতের সারকথা হলো কখনো মুসনাদ ইলাইহের উপর আত্‌ফ করা হয় সংক্ষিপ্তভাবে মুসনাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্যে। এটা এভাবে হয়ে থাকে যে, মুসনাদ ইলাইহের তথা مَعْطُوْف عَلَيْه-এর দ্বারা মুসনাদ প্রথমে বাস্তবায়িত হয়েছে, এরপর দ্বিতীয়টি তথা معطوف-এর দ্বারা অব্যবহিত পরে অথবা কিছুটা বিলম্বে মুসনাদ বাস্তবায়িত হয়েছে।

কিন্তু এখানেও مَعَ اِخْتِصَارٍ-এর قيد থাকবে অর্থাৎ সংক্ষিপ্তভাবে মুসনাদের ব্যাখ্যা করবে, মূল লেখক مَعَ كذلك দ্বারা اِخْتِصَارٍ-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ قيد দ্বারা جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو بَعْدَهُ بِيَوْمٍ اَوْ سَنَةٍ জাতীয় উদাহরণ বের হয়ে যায়। কারণ, যদিও এ উদাহরণে মুসনাদের ব্যাখ্যা হয়েছে। কিন্তু بَعْدَهُ بِيَوْمٍ ,اَوْ بِسَنَةٍ ও بَعْدَهُ بِشَهْرٍ ইত্যাদি শব্দ যোগ করার কারণে উক্ত ব্যাখ্যা সংক্ষেপে হয়নি; বরং লম্বা হয়ে গেছে, তাই এটা تَفْصِيْل مُسْنَد থেকে বহির্ভূত। اختصار-এর সাথে تَفْصِيْل مُسْنَد-এর উদাহরণ হলো جَاءَنِىْ زَيْدٌ فَعَمْرٌو اَوْ ثُمَّ عَمْرٌو اَوْ جَاءَنِى الْقَوْمُ حَتّٰى خَالِدٌ এ উদাহরণগুলোর মধ্যে তিনটি حَرْف عَطْف যথাক্রমে فَاء، ثُمَّ ও حَتّٰى ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি মুসনাদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সমার্থক অর্থাৎ প্রতিটি حَرْف عَطْف এ কথা বুঝায় যে, প্রথমত مَعْطُوْف عَلَيْه দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং

মুসনাদটি দ্বিতীয়ত معطوف দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে তিনটি হরফে আত্ফের মধ্যে সামান্য অর্থগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন- فا সাধারণভাবে معطوف-এর কাজ তার مَعْطُوْف عَلَيْه-এর কাজের অব্যবহিত পরে সংঘটিত হওয়া বুঝায়। আর ثم দ্বারা সে ইসমকে আত্ফ করা হয় যে ইসম তার مَعْطُوْف عَلَيْه-এর বেশ পরে মুসনাদকে সংঘটিত করে। আর حتى-এর مَا قَبْل তথা مَعْطُوْف عَلَيْه এবং حتى-এর مَا بَعْد তথা معطوف-এর মধ্যে এক ধরনের শ্রেণীবিন্যাস হয়। সেই শ্রেণীবিন্যাস দু' ধরনের হতে পারে- ১. حتى-এর مَا قَبْل, اَقْوى বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর حتى-এর مَا بَعْد সে তুলনায় اضعف বা কম গুরুত্বপূর্ণ। ২. حتى-এর مَا قَبْل টা اضعف বা কম গুরুত্বপূর্ণ। আর حتى-এর مَا بَعْد সে তুলনায় اقوى বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- جَاءَنِى الْقَوْمُ حَتّٰى خَالِدٌ এ উদাহরণে যদি খালিদ গোত্রের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয় তাহলে তা দ্বিতীয় প্রকার, আর যদি খালিদ গোত্রের নিম্নশ্রেণীর লোক হয় তাহলে প্রথম প্রকার বলে গণ্য হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এখানে حتى-এর مَا قَبْل এবং مَا بَعْد-এর মাঝে বাহ্যিক কোনো বিন্যাস বা ধারাবাহিকতা নেই। অর্থাৎ حتى-এর مَا قَبْل আগে এবং مَا بَعْد পরে মুসনাদকে সংঘটিত করেছে এমন কোনো বিন্যস্তকরণ হবে না। যেমন উল্লিখিত উদাহরণ তথা جَاءَنِى الْقَوْمُ حَتّٰى خَالِدٌ-এর মধ্যে قوم আগে এসেছে আর خالد পরে এসেছে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বাস্তবে এর উল্টোও হতে পারে। তাই حتى যুক্ত ইবারত দ্বারা বাহ্যিক কোনো স্তর বিন্যাস হবে না।

যেমন উল্লিখিত উদাহরণ তথা جَاءَنِى الْقَوْمُ حَتّٰى خَالِدٌ-এর মধ্যে قوم আগে এসেছে আর خالد পরে এসেছে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বাস্তবে এর উল্টোও হতে পারে। তাই حتى যুক্ত ইবারত দ্বারা বাহ্যিক কোনো স্তর বিন্যাস হবে না।

সার-সংক্ষেপ :

আত্ফ কখনো মুসনাদ ইলাইহের মতো মুসনাদের تفصيل করে। আত্ফ দ্বারা জানা যায় যে, মুসনাদ তার মুসনাদ ইলাইহ দ্বারা কখন সংঘটিত হয়েছে। প্রথমটির পর দ্বিতীয়টি সাথে সাথেই নাকি বিলম্বে? আরো জানা যায় যে, প্রথমটি আগে, দ্বিতীয়টি পরে অথবা প্রথমটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর দ্বিতীয়টি কম গুরুত্ব অথবা তার উল্টো ইত্যাদি।

فَاِنْ قُلْتَ فِىْ هٰذِهِ الثَّلَاثَةِ اَيْضًا تَفْصِيْلٌ لِلْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فَلِمَ لَمْ يَقُلْ اَوْ تَفْصِيْلِهِمَا مَعًا قُلْتُ فَرْقٌ بَيْنَ اَنْ يَكُوْنَ الشَّيْئُ حَاصِلًا مِنَ الشَّيْئِ وَبَيْنَ اَنْ يَكُوْنَ مَقْصُوْدًا مِنْهُ وَتَفْصِيْلُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فِىْ هٰذِهِ الثَّلَاثَةِ وَاِنْ كَانَ حَاصِلًا لٰكِنْ لَيْسَ الْعَطْفُ بِهٰذِهِ الثَّلَاثَةِ لِاَجْلِهِ لِاَنَّ الْكَلَامَ اِذَا اشْتَمَلَ عَلٰى قَيْدٍ زَائِدٍ عَلٰى مُجَرَّدِ الْاِثْبَاتِ اَوِ النَّفْيِ فَهُوَ الْغَرَضُ الْخَاصُّ وَالْمَقْصُوْدُ الْاَصْلِىُّ مِنَ الْكَلَامِ فَفِىْ هٰذِهِ الْاَمْثِلَةِ تَفْصِيْلُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ كَاَنَّهٗ اَمْرٌ كَانَ مَعْلُوْمًا وَاِنَّمَا سِيْقَ الْكَلَامُ لِبَيَانِ اَنَّ مَجِيْئَ اَحَدِهِمَا كَانَ بَعْدَ الْاٰخَرِ فَلْيَتَامَّلْ وَ هٰذَا الْبَحْثُ مِمَّا اَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِىْ دَلَائِلِ الْاِعْجَازِ وَ وَصّٰى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : আপনি যদি বলেন, এ তিন হরফে আত্ফের মধ্যেও তো মুসনাদ ইলাইহের বিশদ বিবরণ হচ্ছে। তাই তিনি اَوْ تَفْصِيْلِهِمَا مَعًا (অথবা উভয়ের একই সাথে বিশদ বিবরণের জন্য) কেন বলেননি? (এর উত্তরে) আমি বলবো, কোনো একটি জিনিস থেকে কোনো বিষয় এমনিতে অর্জিত হওয়া এবং সে বিষয় সে জিনিসের উদ্দেশ্য হওয়া এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য আছে। মুসনাদ ইলাইহের বিশদ বিবরণ যদিও এ তিনটির মাঝে পাওয়া গেছে; কিন্তু এ তিন হরফ দ্বারা আত্ফ এ কারণে নয়। কেননা, বাক্যে যদি (اثبات) হ্যাঁ-বাচক ও (نفى) না-বাচক হওয়ার চেয়ে বেশি কোনো কয়েদ থাকে, তাহলে সে কয়েদটি মূল উদ্দেশ্য হয়। এ তিনটি বাক্যে মুসনাদ ইলাইহের বিশদ বিবরণ যেন আগ থেকেই জানা ছিল। তারপরেও বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এ কথা বর্ণনা করার জন্য যে, একজনের আগমন অপরজনের পরে। বিষয়টি একটু ভাবুন (তাহলে সমাধান পেয়ে যাবেন) এ বিষয়টি শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানী তার দালাইলুল ই'জায গ্রন্থে আলোচনা করে এ বিষয়টিকে আয়ত্ত করার অসিয়ত করে গেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ فَاِنْ قُلْتَ فِىْ الخ : উল্লিখিত ইবারতের বিষয়বস্তু তরজমা দ্বারাই মোটামুটি বিশেষিত হয়ে গেছে। এখানে সার-সংক্ষেপরূপে কয়েকটি কথা আলোচনা করা হলো।

মূলত মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো আমাদের বক্তব্য অনুসারে মুসনাদের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয় فا ـ ثم ـ حتى-এর দ্বারা, কিন্তু আমরা বলি এসব হওয়া দ্বারা যেমন মুসনাদের বিশদ বিবরণ হয় তেমনি মুসনাদ ইলাইহেরও বিবরণ হয়। তাই আপনাদের বক্তব্য আরো ব্যাপক হওয়া উচিত ছিল, আপনারা যদি বলতেন وَتَفْصِيْلِهَا مَعًا তাহলে বরং উত্তম হতো।

এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, আপনাদের বক্তব্য যথার্থ। কিন্তু এখানে একটি বিষয় বুঝার আছে। তা হলো, কোনো বিষয় অনিচ্ছাকৃত লাভ করা এবং কোনো বিষয় উদ্দিষ্ট হিসেবে লাভ করার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা আপনারা অবশ্যই মানবেন। এ তিনটি হরফের দ্বারা আত্ফ করা হলে মুসনাদ ইলাইহের বিবরণ অনিচ্ছাকৃতভাবে হাসিল হয় বটে। কিন্তু এসব হরফের দ্বারা আত্ফের উদ্দেশ্য কিন্তু মুসনাদের বিশদ বিবরণ। কেননা, এসব হরফের মধ্যে যে অতিরিক্ত অর্থ আছে সেসব মুসনাদের বিবরণের জন্য। আর আমরা জানি, বাক্যের মধ্যে হ্যাঁ-বাচক বা না-বাচকের উপর যে অতিরিক্ত অর্থ থাকে তাই বাক্যের উদ্দেশ্য। অতএব, এগুলো দ্বারা মুসনাদের বিবরণ উদ্দেশ্য। তাই মুসনাদের বিশদ বিবরণের কথাই বলা হয়েছে। এগুলোর দ্বারা মুসনাদ ইলাইহের বিশদ বিবরণ উদ্দেশ্য না হওয়ার কারণে বিষয়টির উল্লেখ করা হয়নি।

বি. দ্র. فاء-এর মধ্যে অতিরিক্ত অর্থ হচ্ছে ترتيب (বিন্যস্তকরণ) ও تعقيب (অবিলম্বে হওয়া)। حتى-এর মধ্যে অতিরিক্ত অর্থ হচ্ছে মর্যাদাগত বিন্যস্তকরণ। উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে عطف দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَعْطُوْف عَلَيْه-এর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে সাধারণভাবে معطوف-এর ক্ষেত্রে তাই ঘটা। অতএব, উপরোক্ত তিনটি হরফের মধ্যে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া গেল।

أَوْ رَدِّ السَّامِعِ عَنِ الْخَطَأِ فِي الْحُكْمِ إِلَى الصَّوَابِ نَحْوُ جَاءَنِي زَيْدٌ لَا عَمْرٌو لِمَنْ اِعْتَقَدَ أَنَّ عَمْرًوا جَاءَكَ دُوْنَ زَيْدٍ أَوْ أَنَّهُمَا جَاءَاكَ جَمِيْعًا وَلٰكِنْ أَيْضًا لِلرَّدِّ إِلَى الصَّوَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَايُقَالُ لِنَفْيِ الشِّرْكَةِ حَتّٰى أَنَّ نَحْوَ مَا جَاءَنِي زَيْدٌ لٰكِنْ عَمْرٌو إِنَّمَا يُقَالُ لِمَنْ اِعْتَقَدَ أَنَّ زَيْدًا جَاءَكَ دُوْنَ عَمْرٍو لَا لِمَنْ اِعْتَقَدَ أَنَّهُمَا جَاءَاكَ جَمِيْعًا وَفِيْ كَلَامِ النُّحَاةِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَالُ لِمَنْ اِعْتَقَدَ اِنْتِفَاءَ الْمَجِيْءِ عَنْهُمَا جَمِيْعًا ـ

<u>অনুবাদ :</u> **অথবা শ্রোতাকে** হুকুমের ব্যাপারে ভ্রান্তি থেকে (উদ্ধার করে) **সঠিক বিষয়ের প্রতি দিক নির্দেশ করার জন্য** (আত্ফ করা হয়)। যেমন- (মুতাকাল্লিম বলল) جَاءَنِي زَيْدٌ لَا عَمْرٌو **(আমার কাছে যায়েদ এসেছে আমর নয়)** এমন ব্যক্তিকে যে ধারণা করেছে তোমার (মুতাকাল্লিম)-এর কাছে আমর এসেছে; কিন্তু যায়েদ আসেনি। অথবা (সে ধারণা করছে) তোমার কাছে তারা উভয়ে এসেছে। (হরফে আত্ফ) لٰكِن সঠিক বিষয়ের প্রতি দিক নির্দেশ করার জন্য। তবে তা কোনো বিষয়ের অংশীদার কমানোর অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তাই مَاجَاءَنِي زَيْدٌ لٰكِنْ عَمْرٌو জাতীয় উদাহরণ কেবল ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা যাবে, যে ধারণা করে তোমার কাছে শুধু আমর এসেছে, যায়েদ নয়। ঐ ব্যক্তিকে বলা যাবে না, যে ধারণা করে তারা উভয়ে তোমার কাছে এসেছে। নাহুবিদগণের বক্তব্যে যা পাওয়া যায় তাতে ধারণা হয় (لٰكِن-এর উপরোক্ত উদাহরণটি) বলা যাবে ঐ ব্যক্তিকে যে উভয়ের না আসারও ধারণা করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ رَدِّ السَّامِعِ الخ : উপরোক্ত ইবারতে মূল লেখক আত্ফের ব্যবহারের আরেকটি ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তা হচ্ছে হরফে আতফ যদি لا হয়, তাহলে তার কি অর্থ? তিনি বলেন, কখনো আত্ফ করা শ্রোতার ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্যে। আর এটা তখনই হয় যখন আত্ফ করা হয় لا দ্বারা। যেমন- جَاءَنِيْ زَيْدٌ لَاعَمْرٌو মুতাকাল্লিম তার শ্রোতাকে বলল, আমার কাছে যায়েদ এসেছে আমর নয়। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ জাতীয় উদাহরণ শ্রোতার দু'ধরনের ভুল নিরসনের জন্য আসে- ১. শ্রোতা ধারণা করছে শুধু আমর এসেছে। ২. শ্রোতা ধারণা করছে যায়েদ এবং আমর উভয় এসেছে। যদি প্রথম ধারণার বিপরীতে উল্লিখিত উদাহরণটি বলা হয়, তাহলে তাকে পরিভাষায় قَصْر قَلْب বলা হয়। قلب শব্দের অর্থ হলো- বিপরীত। যেহেতু এর মাধ্যমে শ্রোতার ধারণার বিপরীত বিষয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাই তকে قَصْر قَلْب বলা হয়। আর যদি শ্রোতার দ্বিতীয় ধারণার বিপরীতে উদাহরণটি পেশ করা হয়, তাহলে তাকে قَصْر اَفْرَاد বলা হয়। افراد শব্দের অর্থ হলো- এক বা একক। শ্রোতার ধারণা মতে কাজটি সংঘটিত হয়েছিল একাধিক লোকের দ্বারা; অথচ বাস্তবে তা ঘটেছে একজন দ্বারা। যেহেতু বক্তা একাধিক ব্যক্তির ধারণাকে বাতিল করে একজনের ব্যাপারে হুকুমকে সাবিত করেছে, তাই একে افراد বলা হয়। উভয় অবস্থায় মুতাকাল্লিম শ্রোতার ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে সঠিক ধারণা দান করছে, তাই رَدُّ السَّامِعِ إِلَى الصَّوَابِ-এর বিষয়টি এখানে পাওয়া গেল।

মুসান্নিফ (র.) এরপর হরফে আত্ফ لٰكِن-এর কথা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, لا-এর মতো لٰكِن ও رَدُّ السَّامِعِ إِلَى الصَّوَابِ অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু এ দু'টির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য হলো لا-এর মধ্যে قَصْر قَلْب এবং قَصْر اَفْرَاد উভয়টি সম্ভব। আর لٰكِن শুধুমাত্র قَصْر قَلْب-এর জন্য হয়, অর্থাৎ যে শ্রোতা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা কাজটি সম্পাদন হওয়ার বিশ্বাস করে আর তার ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য এমতাবস্থায় لٰكِن দ্বারা আত্ফ করা যাবে না।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, নাহুবিদদের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা لٰكِن-কে قصر افراد-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন- مَا جَاءَنِيْ زَيْدٌ لٰكِنْ عَمْرٌو তারা বলেন, শ্রোতা যখন উভয়ের না আসার ধারণা করবে তখন এই উদাহরণটি পেশ করা যাবে। অতএব, এটি তো قَصْر اَفْرَادْ হচ্ছে।

মোটকথা, না-বাচকের উদাহরণের মধ্যে বালাগাতবিশারদদের মতে لٰكِن ব্যবহার হবে قَصْر قَلْب-এর জন্য আর নাহুবিদগণের ভাষায় সেটাই قَصْر اَفْرَادْ হবে, قَصْر قَلْب হবে না। তবে لٰكِن হ্যাঁ-বাচক বাক্যের قَصْر قَلْب এবং قَصْر اَفْرَادْ কোনোটার জন্যই হবে না।

أَوْ صَرْفِ الْحُكْمِ عَنْ مَحْكُوْمٍ عَلَيْهِ إِلَى مَحْكُوْمٍ عَلَيْهِ أَخَرَ نَحْوُ جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو أَوْ مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو فَإِنَّ بَلْ لِلْإِضْرَابِ عَنِ الْمَتْبُوْعِ وَصَرْفِ الْحُكْمِ إِلَى التَّابِعِ وَمَعْنَى الْإِضْرَابِ عَنِ الْمَتْبُوْعِ أَنْ يُجْعَلَ الْمَتْبُوْعُ فِي حُكْمِ الْمَسْكُوْتِ عَنْهُ لَا أَنْ يُنْفَى عَنْهُ الْحُكْمُ قَطْعًا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَمَعْنَى صَرْفِ الْحُكْمِ فِي الْمُثْبَتِ ظَاهِرٌ وَكَذَا فِي الْمَنْفِيِّ إِنْ جَعَلْنَاهُ بِمَعْنَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ التَّابِعِ وَالْمَتْبُوْعُ فِي حُكْمِ الْمَسْكُوْتِ عَنْهُ أَوْ مُتَحَقِّقُ الْحُكْمِ لَهُ حَتَّى يَكُوْنَ مَعْنَى مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو أَنَّ عَمْرًا لَمْ يَجِئْ وَعَدَمُ مَجِيْءِ زَيْدٍ وَمَجِيْئُهُ عَلَى الْإِحْتِمَالِ أَوْ مَجِيْئُهُ مُحَقَّقٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُبَرِّدِ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ بِمَعْنَى ثُبُوْتِ الْحُكْمِ لِلتَّابِعِ حَتَّى يَكُوْنَ مَعْنَى مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو أَنَّ عَمْرًا جَاءَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُوْرِ فَفِيْهِ إِشْكَالٌ ـ

অনুবাদ : **অথবা একটি** مَحْكُوْم عَلَيْه **থেকে হুকুমকে আরেকটি** مَحْكُوْم عَلَيْه-**এর দিকে স্থানান্তরিত করা। যেমন– আমার কাছে যায়েদ এসেছে; বরং আমর এসেছে। অথবা আমার কাছে যায়েদ আসেনি; বরং আমর এসেছে।** কেননা, بل শব্দটি মাতবূ' থেকে বিমুখ করা এবং হুকুমকে তাবে'র প্রতি স্থানান্তরিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। মাতবু' থেকে বিমুখ করার অর্থ হচ্ছে মাতবূ'র ব্যাপারে কোনো বিবরণ থাকবে না। এমন নয় যে, তা থেকে হুকুম নিশ্চিতভাবে না-বাচক করা হবে, এতে অনেকের মতবিরোধ রয়েছে। হ্যাঁ-বাচক বাক্যে হুকুমকে স্থানান্তর করার বিষয়টি তো প্রকাশ্য। এমনিভাবে না-বাচক বাক্যেও, যদি আমরা একে এই অর্থে গ্রহণ করি যে, তাবে' থেকে হুকুম না-বাচক হবে আর মাতবূ'-এর ব্যাপারে বিবরণ থাকবে না, অথবা হুকুম তার জন্য প্রমাণিত হবে। ফলে مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو-এর অর্থ হবে, নিশ্চয়ই আমর আসেনি আর যায়েদের আসা এবং না আসা উভয়ের সম্ভাবনা আছে। অথবা যায়েদ এসেছে নিশ্চিত, এটা নাহুবিদ মুবাররাদের মাযহাব মতে। আর আমরা যদি না-বাচক বাক্যে بل-কে ব্যবহার করি এভাবে যে, তা দ্বারা তাদের জন্য হুকুম সাবিত হয়। ফলে مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو-এর অর্থ হবে– আমর এসেছে নিশ্চিত। এটা জমহুরের মাযহাব মতে, কিন্তু এতে ঘোরতর আপত্তি আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ صَرْفِ الْحُكْمِ الخ : উল্লিখিত ইবারতে আত্‌ফের অক্ষর بل-এর আলোচনা শুরু হয়েছে। بل দ্বারা আত্‌ফ করা হয় এক মুসনাদ ইলাইহ থেকে হুকুমকে অন্য মুসনাদ ইলাইহের দিকে স্থানান্তরিত করার জন্য। যেমন– جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو আমার কাছে যায়েদ এসেছে; বরং আমর এসেছে। এ বাক্যের মধ্যে جاء-এর ফায়েল হিসেবে মুসনাদ ইলাইহ হচ্ছে যায়েদ, এর উপর بل দ্বারা আত্‌ফ করা হয়েছে আমরকে, এর ফলে আসার হুকুম যা যায়েদের উপর ছিল তা এখন আমরের দিকে চলে গেছে।

এমনিভাবে না-বাচক বাক্যের উদাহরণে مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو অর্থাৎ আমার কাছে যায়েদ আসেনি; বরং আমর।

মুসান্নিফ (র.) আত্‌ফ দ্বারা হুকুম স্থানান্তর করার কারণ সম্পর্কে বলেন, بل-এর কাজ হলো মাত্‌বূ'-কে পাশ কাটিয়ে তাবে'-এর প্রতি হুকুমকে স্থানান্তর করা। إِضْرَابٌ-এর অর্থ হলো, মাত্‌বূ'-এর ব্যাপারে হুকুম হ্যাঁ-বাচক বাক্যে না-বাচক করা এবং না-বাচক বাক্যে হ্যাঁ-বাচক করা নয়; বরং মাত্‌বূ'-এর ব্যাপারে বাক্যে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে না। এটা জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণকারী আল্লামা ইবনে হাজেব বলেন, মাতবূ' থেকে إِضْرَابٌ (পাশ কাটানো)-এর অর্থ হচ্ছে হ্যাঁ-বাচক বাক্যে মাতবূ' থেকে নিশ্চিতভাবে হুকুমকে নফী করা হবে। তবে যদি বাক্যে بل-এর পূর্বে لا শব্দটি থাকে, তাহলে সকলের মতেই মাতবূ' থেকে হুকুম না-বাচক হবে। যেমন- جَاءَنِيْ زَيْدٌ لَا بَلْ عَمْرٌو এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, আমার কাছে যায়েদ আসেনি; বরং আমর এসেছে।

قَوْلُهُ وَمَعْنَى صَرْفِ الْحُكْمِ فِي الْمُثْبَتِ ظَاهِرٌ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি বাক্যের মধ্যে আতফের অক্ষর بل দ্বারা আতফ করা হয়, তাহলে হ্যাঁ-বাচক বাক্যে হুকুম স্থানান্তরের বিষয়টি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ জমহুরের মতে মাত্বূ' এবং মা'তূফ আলাইহের ব্যাপারে বাক্যে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে না এবং আল্লামা ইবনে হাজেবের মতে, মাতবূ'র ব্যাপারে হুকুমটি না-বাচক হয়ে যাবে। যেমন- جَاءَنِيْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو এ বাক্যে আগমনের হুকুমটি আমরের সাথে হবে। আর মাত্বূ' যায়েদের ব্যাপারে জমহুরের মত হলো যে, আসা এবং না আসা উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লামা ইবনে হাজেব বলেন, মাতবূ' বা যায়েদ নিশ্চিতভাবে আসেনি; বরং শুধুমাত্র আমর এসেছে। আর যদি না-বাচক বাক্যে بل দ্বারা আত্ফ করা হয়, তাহলে صَرْفِ حُكْمٍ-এর ব্যাপারে মতবিরোধ বিদ্যমান।

এ অবস্থায় ইমাম মুবাররাদ এবং আল্লামা ইবনে হাজেবের মতে صَرْفِ حُكْمٍ-এর অর্থ হচ্ছে তাবে' এবং মা'তূফ থেকে নিশ্চিতভাবে হুকুমকে না-বাচক করা হবে। আর মাতবূ'-এর ব্যাপারে মুবাররাদের মত হলো তার সুস্পষ্ট বিবরণ বাক্যে থাকবে না। আর ইবনে হাজেবের মতে হুকুম মাতবূ'-এর ব্যাপারে প্রমাণিত হবে এবং হ্যাঁ-বাচক হবে। সুতরাং مَا جَاءَنِيْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو-এর অর্থ হচ্ছে আমর নিশ্চিতভাবে আসেনি। এখানে না আসার হুকুমকে আমরের প্রতি স্থানান্তর করা হয়েছে। মাতবূ' তথা যায়েদের ব্যাপারে মুবাররাদের মত হচ্ছে তার আসা এবং না আসা উভয়ের সম্ভাবনা আছে। আর ইবনে হাজেবের মতে যায়েদ অবশ্যই এসেছে।

আমাদের মুসান্নিফের ইবারত :

عَدَمُ مَجِيْءِ زَيْدٍ وَمَجِيْئُهُ عَلَى الْاِحْتِمَالِ أَوْ مَجِيْئُهُ مُحَقَّقٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُبَرِّدِ ـ

এ ইবারতের বিন্যাসে কিছুটা ঝামেলা রয়েছে। কেননা, এ ইবারতের أَوْ مَجِيْئُهُ مُحَقَّقٌ-এর আগ পর্যন্ত মুবাররাদের মাযহাব মতে। أَوْ مَجِيْئُهُ مُحَقَّقٌ হচ্ছে আল্লামা ইবনে হাজেবের মতামত অনুসারে।

অতএব, বাক্যের বিন্যাস এমন হওয়া দরকার ছিল عَلَى الْاِحْتِمَالِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُبَرِّدِ أَوْ مَجِيْئُهُ مُحَقَّقٌ না-বাচক বাক্যে জমহুরের মতে হুকুম স্থানান্তরের অর্থ হচ্ছে মা'তূফ এবং তাবে'-এর জন্য হুকুম সাবিত হবে আর মাতবূ'-এর ব্যাপারে বাক্যে কোনো সুস্পষ্ট বিবরণ থাকবে না। তাদের মতে مَا جَاءَنِيْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو-এর অর্থ- আমর অবশ্যই এসেছে আর যায়েদের আসা আর না আসা উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

قَوْلُهُ فَفِيْهِ إِشْكَالٌ : মুসান্নিফ বলেন, জমহুরের মাযহাবের উপর আপত্তি রয়েছে। আপত্তিটি হচ্ছে- না-বাচক বাক্যে হুকুমও না-বাচক হয়ে থাকে হাঁ-বাচক হয় না। অতএব, بل দ্বারা যদি হুকুম স্থানান্তর করা হয়, তাহলে না-বাচক হুকুম স্থানান্তর করবে। অথচ জমহুর বলেন, না-বাচক বাক্যে তাবে'-এর জন্য হ্যাঁ-বাচক হুকুম হবে যদিও এখানে তার মাতবূ'তে না-বাচক হুকুম রয়েছে। তাদের মতে এখানে হুকুম স্থানান্তর বা صَرْفِ حُكْمٍ পাওয়া গেল না; বরং এখানে মাতবূ'-এর হুকুমের বিপরীত হুকুম স্থানান্তর করা হচ্ছে। অর্থাৎ এখানে মাতবূ'-এর হুকুম না-বাচক রয়েছে, অথচ স্থানান্তর করা হচ্ছে এর বিপরীত হ্যাঁ-বাচক হুকুম। তাদের এখানের বক্তব্য صَرْفِ حُكْمٍ-এর সংজ্ঞার সাথে মিলছে না।

এর উত্তরে জমহুরের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে صَرْفِ حُكْمٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে تَغْيِيْرِ حُكْمٍ (হুকুমের পরিবর্তন) আর এখানে তা বিদ্যমান। এর ব্যাখ্যা এই যে, মাতবূ'-এর ব্যাপারে আগমনের না-বাচকের নিসবত ছিল। অতঃপর بل দ্বারা এই হুকুমকে পরিবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ তাবে'-এর মধ্যে তাকে হ্যাঁ-বাচক করা হয়েছে এবং আগমনের সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আমর এসেছে। অন্যদিকে প্রথম মুসনাদ ইলাইহ ও মাতবূ'-এর ব্যাপারে হুকুমের সুস্পষ্ট বিবরণ নেই।

মোটকথা, জমহুরের মতে হুকুম না-বাচক থেকে হ্যাঁ-বাচকে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এতটুকু দ্বারাই بل-এর অর্থ পাওয়া গেছে- যা إِضْرَابٌ-এর জন্য যথেষ্ট।

اَوْ لِلشَّكِّ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ اَوِ التَّشْكِيْكِ لِلسَّامِعِ اَىْ اِيْقَاعِهِ فِى الشَّكِّ نَحْوُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌو اَوْ لِلْاِبْهَامِ نَحْوُ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ اَوْ لِلتَّخْيِيْرِ اَوْ لِلْاِبَاحَةِ نَحْوُ لِيَدْخُلِ الدَّارَ زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌو وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اَنَّ فِى الْاِبَاحَةِ يَجُوْزُ الْجَمْعُ بِخِلَافِ التَّخْيِيْرِ ـ

অনুবাদ : অথবা (মুসনাদ ইলাইহের উপর আতফ করা হয়) বক্তার **সন্দেহের কারণে অথবা শ্রোতাকে সন্দেহে আপতিত করার জন্য। যেমন আমার কাছে যায়েদ অথবা আমর এসেছে।** অথবা, (আত্ফ করা হয়) অস্পষ্ট করার জন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– নিশ্চয়ই আমরা অথবা তোমরা হিদায়েতের উপর নতুবা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে, অথবা এখতিয়ার দান কিংবা বৈধতা দানের জন্য। যেমন বাড়িতে যায়েদ অথবা আমর প্রবেশ করুক, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে বৈধতার ক্ষেত্রে উভয়ের একত্রে কাজ করা সম্ভব, কিন্তু এখতিয়ার দানের ক্ষেত্রে তা নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اَوْ لِلشَّكِّ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ الخ : উল্লিখিত ইবারতে আত্ফের অক্ষর او সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। او দ্বারা বিভিন্ন অর্থে আত্ফ হয়ে থাকে। মূল লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহের উপর او দ্বারা আত্ফ করা হয়–

১. বক্তা বা বর্ণনাকারীর সন্দেহ এবং দ্বিধা থাকার কারণে।

২. বক্তা তার শ্রোতাকে সন্দেহে ও দ্বিধায় ফেলার জন্য (উভয় প্রকারের উদাহরণ) যেমন– جَاءَنِىْ زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌو (আমার কাছে যায়েদ অথবা আমর এসেছে) এ উদাহরণটি উভয় প্রকারের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা, বক্তা যদি সত্যিকারভাবে না জানে, তাদের মধ্যে কে এসেছে, তাহলে এটি প্রথম প্রকার। আর যদি বক্তা সুনিশ্চিতভাবে জানে আগমনকারীকে, কিন্তু সে তার শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলেছে, আমার কাছে যায়েদ অথবা আমর এসেছে, তাহলে এটি দ্বিতীয় প্রকার।

৩. لِلْاِبْهَامِ نَحْوُ الخ মুসান্নিফ বলেন, বিষয়টিকে অস্পষ্ট এবং শ্রোতার থেকে আসল বিষয়টিকে গোপন রাখার জন্যও او দ্বারা আত্ফ করা হয়। যেমন– اِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى الخ আয়াতে انا এবং اياكم এ দু'য়ের মাঝে او এনে ইবহাম সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪. কখনো او দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে এখতিয়ার দান অথবা হুকুমের বৈধতা দান করা হয়। যেমন– لِيَدْخُلِ الدَّارَ زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌو অর্থাৎ ঘরের মধ্যে যায়েদ অথবা আমর যেন প্রবেশ করে। উদাহরণে এখতিয়ার দান অথবা বৈধতা দান উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ ঘরে প্রবেশ করা দু'জনের যে কোনো একজনের দ্বারা হবে। তদ্রূপ উভয়ের জন্য প্রবেশ করার অনুমতি আছে।

اباحت এবং تخيير-এর মাঝে পার্থক্য : اباحت-এর মধ্যে বাহ্যিক লক্ষণের ভিত্তিকে মা'তূফ এবং মা'তূফ 'আলাইহ একত্রিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু تخيير-এর মধ্যে তা সম্ভব নয়।

وَاَمَّا الْفَصْلُ اَىْ تَعْقِيْبُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِضَمِيْرِ الْفَصْلِ وَاِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ اَحْوَالِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ لِاَنَّهُ يَقْتَرِنُ بِهِ اَوَّلاً وَلِاَنَّهُ فِى الْمَعْنٰى عِبَارَةٌ عَنْهُ وَفِى اللَّفْظِ مُطَابِقٌ لَهُ فَلِتَخْصِيْصِهٖ اَىِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِالْمُسْنَدِ يَعْنِىْ لِقَصْرِ الْمُسْنَدِ عَلَى الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ لِاَنَّ مَعْنٰى قَوْلِنَا زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ اَنَّ الْقِيَامَ مَقْصُوْرٌ عَلٰى زَيْدٍ لَايَتَجَاوَزُ اِلٰى عَمْرٍو فَالْبَاءُ فِىْ قَوْلِهٖ فَلِتَخْصِيْصِهٖ بِالْمُسْنَدِ مِثْلُهَا فِىْ قَوْلِهِمْ خَصَّصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْرِ اِذَا ذَكَرْتَهُ دُوْنَ غَيْرِهٖ كَاَنَّكَ جَعَلْتَهُ مِنْ بَيْنِ الْاَشْخَاصِ مُخْتَصًّا بِالذِّكْرِ اَىْ مُتَفَرِّدًا بِهٖ وَالْمَعْنٰى هٰهُنَا جَعْلُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ مِنْ بَيْنِ مَا يَصِحُّ اِتِّصَافُهُ بِكَوْنِهٖ مُسْنَدًا اِلَيْهِ مُخْتَصًّا بِاَنْ يَثْبُتَ لَهُ الْمُسْنَدُ كَمَا يُقَالُ فِىْ اِيَّاكَ نَعْبُدُ مَعْنَاهُ نَخُصُّكَ بِالْعِبَادَةِ وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَكَ ـ

অনুবাদ : আর ফসল– (মুসনাদ ইলাইহের একটি অবস্থা) অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের পর ফস্‌ল (পার্থক্য সৃষ্টিকারী)-এর সর্বনাম ব্যবহার করা, এটিকে মুসনাদ ইলাইহের অবস্থার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। কেননা, এটি এর সাথে প্রথমে যুক্ত হয়। তা ছাড়া এটা অর্থগতভাবে মুসনাদ ইলাইহকে বুঝায় এবং শাব্দিকভাবে তার মতো। **মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের সাথে খাস করার জন্য।** অর্থাৎ মুসনাদকে মুসনাদ ইলাইহের উপর সীমাবদ্ধ করার জন্য। কেননা, আমাদের উক্তি زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ-এর অর্থ হচ্ছে দণ্ডায়মান হওয়া যায়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আমর পর্যন্ত তা সম্প্রসারিত হবে না। মূল লেখকের শব্দ فَلِتَخْصِيْصِهٖ بِالْمُسْنَدِ-এর باء টি خَصَّصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْرِ-এর باء-এর মতো। (এটা তখনই ব্যবহার করা হয়) যখন তুমি শুধু এটাকেই উল্লেখ করবে। যেন তুমি এটিকে অনেক জনের মাঝ থেকে উল্লেখের জন্য নির্দিষ্ট করলে, অর্থাৎ পৃথক করলে। এখানে তাখসীসের অর্থ হচ্ছে– যে সকল বিষয় মুসনাদ ইলাইহ হতে পারে তার মধ্য থেকে মুসনাদকে এর সাথে সাবিত করার জন্য নির্দিষ্ট করা। যেমন– اِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে তোমাকে ইবাদতের সাথে খাস করলাম এবং তুমি ছাড়া অন্যের ইবাদত করবো না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَاَمَّا الْفَصْلُ اَىْ تَعْقِيْبُ الخ : মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থা হলো মুসনাদ ইলাইহের পর মুবতাদা ও খবরের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টিকারী সর্বনাম ব্যবহার করা।

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ اَحْوَالِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো : ضَمِيْر فَصْل মুবতাদা এবং খবরের মাঝে অবস্থান করার কারণে উভয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং উভয়ের সাথে সম্পর্ক একই ধরনের। অতএব, ضَمِيْر فَصْل-কে কেন মুসনাদ ইলাইহের অবস্থার মধ্যে গণ্য করা হলো; কিন্তু মুসনাদের অবস্থার মধ্যে গণ্য করা হলো না?

এর তিনটি উত্তর ইবারতে দেওয়া হয়েছে প্রথম উত্তরটি হচ্ছে, ضَمِيْر فَصْل উভয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও প্রথম সম্পর্ক হয় তার মুসনাদ ইলাইহের সাথে, তারপর মুসনাদের সাথে। কারণ, বাক্যের মধ্যে প্রথমে মুসনাদ ইলাইহ আসে এরপর মুসনাদ আসে। অতএব, একে মুসনাদ ইলাইহের অবস্থার মধ্যে গণ্য করাই সমীচীন।

এর দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে- ضَمِيْر فَصْل অর্থগতভাবে মুসনাদ ইলাইহের দিকে রুজু হয়ে থাকে। আমরা দেখি, زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ-এর মধ্যে هو দ্বারা যায়েদ উদ্দেশ্য, এর দ্বারা মুসনাদ উদ্দেশ্য হয় না। অতএব, এটিকে মুসনাদ ইলাইহের অবস্থার মধ্যে গণ্য করাই উচিত।

তৃতীয় উত্তর হচ্ছে- ضَمِيْر فَصْل বচনের দিক থেকে মুসনাদ ইলাইহের অনুগামী হয়, মুসনাদের অনুগামী হয় না। অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন যা হবে সর্বনামটি তাই হয়ে থাকে। সুতরাং এর সম্পর্ক মুসনাদ ইলাইহের সাথেই বেশি। এ কারণেই একে মুসনাদ ইলাইহের অবস্থার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

ضَمِيْر فَصْل ব্যবহারের কারণ :

লেখক বলেন, ضَمِيْر فَصْل ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে- মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের সাথে খাস করা। অর্থাৎ মুসনাদটি যে শুধুমাত্র উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহ দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে, অন্য কারো দ্বারা সংঘটিত হয়নি এ কথা বুঝানো। যেমন- زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ-এর অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র যায়েদ দাঁড়িয়েছে, অন্য কেউ দাঁড়ায়নি।

قَوْلُهُ فَالْبَاءُ فِىْ قَوْلِهِ فَلِتَخْصِيْصِهِ بِالْمُسْنَدِ الخ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) باء শব্দটি দ্বারা কি অর্থ এখানে উদ্দেশ্য তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, فَلِتَخْصِيْصِهِ بِالْمُسْنَدِ এখানে باء শব্দটি مقصور-এর উপর দাখিল হয়েছে। অর্থাৎ মুসনাদটি সীমাবদ্ধ হবে। যেমন- خَصَّصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْرِ-এর মধ্যে باء দাখিল হয়েছে مقصور-এর উপর। এর অর্থ হবে- আমি অমুকেরই আলোচনা করেছি। এর অর্থ হচ্ছে যে, বক্তা যেন বলল, বিভিন্ন মানুষদের মধ্য হতে অমুককে আলোচনার জন্য নির্ধারণ করেছি। অর্থাৎ তাকে এককভাবে আলোচনার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। অতএব, এখানে মুসনাদটি মুসনাদ ইলাইহের উপর সীমাবদ্ধ হওয়ার অর্থ হচ্ছে যেসব ব্যক্তি মুসনাদ ইলাইহ হতে পারে তাদের মধ্য থেকে উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদ দ্বারা খাস করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসনাদটি কেবল এ মুসনাদ ইলাইহ করেছে, অন্য কেউ করেনি। যেমন- إِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর অনুবাদ হচ্ছে- আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি, অন্য কারো ইবাদত করি না।

وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ أَيْ تَقْدِيمُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلِكَوْنِ ذِكْرِهِ أَهَمَّ وَلَا يَكْفِي فِي التَّقْدِيمِ مُجَرَّدُ ذِكْرِ الْإِهْتِمَامِ بَلْ لَابُدَّ أَنْ يُبَيَّنَ أَنَّ الْإِهْتِمَامَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ وَبِأَيِّ سَبَبٍ فَلِذَا فَصَّلَهُ بِقَوْلِهِ إِمَّا لِأَنَّهُ أَيْ تَقْدِيمَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْأَصْلُ لِأَنَّهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَلَابُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ فَقَصَدُوا أَنْ يَكُونَ فِي الذِّكْرِ أَيْضًا مُقَدَّمًا وَلَا مُقْتَضِيَ لِلْعُدُولِ عَنْهُ أَيْ عَنْ ذٰلِكَ الْأَصْلِ إِذْ لَوْ كَانَ أَمْرٌ يَقْتَضِي الْعُدُولَ عَنْهُ فَلَا يُقَدَّمُ كَمَا فِي الْفَاعِلِ فَإِنَّ مَرْتَبَةَ الْعَامِلِ التَّقَدُّمُ عَلَى الْمَعْمُولِ ـ

অনুবাদ : (মুসনাদ ইলাহির অবস্থাসমূহের একটি হলো) **মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে ব্যবহার। কেননা, তাকে উল্লেখ করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।** মুসান্নিফ (র.) বলেন, অগ্রগামী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া এতটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়; বরং কোন দিক থেকে এবং কি কারণে গুরুত্বপূর্ণ এটা উল্লেখ করা জরুরি। এ কারণে তার জবানীতে তিনি (তালখীসের লেখক)-এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১. কেননা, মুসনাদ ইলাইহকে আগে উল্লেখ করাই নিয়ম। কারণ, তার ব্যাপারেই হুকুমের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। হুকুমের পূর্বে তার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। এ কারণে তারা বর্ণনার ক্ষেত্রে তাকে অগ্রগামী করার ইচ্ছা করেছেন। **আর এ নীতির থেকে সরে আসার কোনো দলিল যদি না থাকে।** কেননা, যদি এমন কোনো দলিল থাকে তখন তা আগে আসে না। যেমন ফায়েল (মুসনাদ ইলাইহ হওয়া সত্ত্বেও ফে'লের পরে আসে) কেননা, আমেলের স্তর মা'মূলের উপরে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ الخ : মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থা হলো এটি মুসনাদের আগে উল্লিখিত হবে। এর কারণ হচ্ছে, এর উল্লেখ মুসনাদের তুলনায় গুরুত্ববহ, আর মুসনাদ তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুসনাদ ইলাইহ বেশি গুরুত্বপূর্ণ এতটুকু বলাই যথেষ্ট নয়; বরং এর কারণও উল্লেখ জরুরি যে, কি কারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রে আসার উপযুক্ত হলো। সে মতে মূল লেখক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

এক. মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনাই নিয়ম ও সাধারণ নীতি। কেননা, এটি বাক্যের مَحْكُوم عَلَيْه (যার ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়)। আর যার ব্যাপারে বর্ণনা করা হয় তার অস্তিত্ব বর্ণনার আগে হওয়া আবশ্যক। এ কারণে তারা আলোচনাতেও আগে রাখার ইচ্ছা করেছেন।

লেখক বলেন, উক্ত নীতি অনুসারে তাকে আগে তখনই রাখা হবে যখন এ নীতি থেকে সরে আসার কোনো দলিল না থাকে। কেননা, যদি কোনো বিষয় উক্ত নীতি থেকে সরে আসার দাবি জানায় অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ পরে আসুক এটা চায়, তাহলে তাকে পরেই আনা হবে, আগে আনা হবে না। যেমন যদি মুসনাদ ইলাইহ ফায়েল হয় তাহলে তাকে আগে আনা হবে না; বরং তাকে ফে'লের পরে আনা হবে।

ফে'লের ক্ষেত্রে মুসনাদ ইলাইহ (ফায়েল)-কে পরে আনার দলিল হচ্ছে ফায়েল ফে'লের মা'মূল আর ফে'ল তার আমেল। মর্যাদাগতভাবে আমেল আগে আসে, আর মা'মূল পরে আসে। এ হিসেবে ফে'লকে প্রথমে আর ফায়েলকে পরে আনা হয়।

তা ছাড়া তারকীবগতভাবে কখনই ফায়েল ফে'লের আগে আসতে পারে না। ফায়েল ফায়েল হওয়ার জন্য শর্ত হলো ফে'লের পরে আসবে। অন্যথায় তা ফায়েল হতে পারবে না।

প্রকাশ থাকে যে, আমেল অর্থগতভাবে ইল্লত হয় আর মা'মূল হয় তার معلول। ইল্লত তার معلول-এর থেকে সব সময় আগে আসে। এ কারণে আমেল মর্যাদাগতভাবে আগে আসে, আর মা'মূল পরে আসে।

وَاِمَّا لِتَمْكِيْنِ الْخَبَرِ فِيْ ذِهْنِ السَّامِعِ لِاَنَّ فِي الْمُبْتَدَاِ تَشْوِيْقًا اِلَيْهِ اَيْ اِلَى الْخَبَرِ كَقَوْلِهِ **شِعْرٌ** وَالَّذِيْ حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيْهِ * حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمَادٍ يَعْنِيْ تَحَيَّرَتِ الْخَلَائِقُ فِيْ مَعَادِ الْجِسْمَانِيْ وَالنُّشُوْرِ الَّذِيْ لَيْسَ بِنَفْسَانِيٍّ بِدَلِيْلِ مَا قَبْلَهُ **شِعْرٌ** بَانَ اَمْرُ الْاِلٰهِ وَاخْتَلَفَ * النَّاسُ فَدَاعٍ اِلَى ضَلَالٍ وَهَادٍ يَعْنِيْ بَعْضُهُمْ يَقُوْلُ بِالْمَعَادِ وَبَعْضُهُمْ لَايَقُوْلُ بِهِ وَ اِمَّا لِتَعْجِيْلِ الْمَسَرَّةِ اَوِ الْمَسَاءَةِ لِلتَّفَاؤُلِ عِلَّةٌ لِتَعْجِيْلِ الْمَسَرَّةِ اَوِ التَّطَيُّرِ عِلَّةٌ لِتَعْجِيْلِ الْمَسَاءَةِ نَحْوُ سَعْدٌ فِيْ دَارِكَ لِتَعْجِيْلِ الْمَسَرَّةِ وَالسَّفَّاحُ فِيْ دَارِ صَدِيْقِكَ لِتَعْجِيْلِ الْمَسَاءَةِ وَاِمَّا لِاِيْهَامِ اَنَّهُ اَيِ الْمُسْنَدَ اِلَيْهِ لَايَزُوْلُ عَنِ الْخَاطِرِ لِكَوْنِهِ مَطْلُوْبًا اَوْ اَنَّهُ يُسْتَلَذُّ بِهِ لِكَوْنِهِ مَحْبُوْبًا وَاِمَّا لِنَحْوِ ذٰلِكَ مِثْلُ اِظْهَارِ تَعْظِيْمِهِ اَوْ تَحْقِيْرِهِ وَ مَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : **অথবা খবরকে শ্রোতার মনে বদ্ধমূল করার জন্য। কেননা, (কখনো) মুবতাদা-এর মধ্যে খবরের প্রতি আগ্রহ উদ্দিপক বিষয় থাকে, কবির কবিতার চরণ : وَالَّذِيْ حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيْهِ * حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمَادٍ অর্থাৎ যার ব্যাপারে সৃষ্টিকুল দ্বিধাগ্রস্ত তা হচ্ছে এমন প্রাণী যার সৃষ্টি জড়পদার্থ থেকে।** অর্থাৎ সব মানুষ সৃষ্টিকুলের দৈহিক পুনরুত্থানের ব্যাপারে চিন্তিত ও সংশয়গ্রস্ত, রূহানী পুনরুত্থানের ব্যাপারে (দ্বিধাগ্রস্ত) নয়। এর পূর্বের পঙ্ক্তিতে এ ব্যাপারে দলিল রয়েছে। পূর্ব পঙ্ক্তি হচ্ছে– بَانَ اَمْرُ الْاِلٰهِ وَاخْتَلَفَ * النَّاسُ فَدَاعٍ اِلَى ضَلَالٍ وَهَادٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ মতবিরোধে লিপ্ত, কেউ ভ্রষ্টতার পথে আহবান করছে আর কেউ সত্যপথে (অর্থাৎ কেউ শারীরিক পুনরুত্থান বিশ্বাস করছেন, আর অনেকে করছে অবিশ্বাস) **অথবা সুসংবাদ প্রথমে বা দুঃসংবাদ প্রথমে দেওয়ার জন্য। শুভ লক্ষণের জন্য–** এটি تَعْجِيْلُ الْمَسَرَّةِ-এর ইল্লত। **অথবা কুলক্ষণ প্রকাশের জন্য।** এটি تَعْجِيْلُ الْمَسَاءَةِ-এর ইল্লত। যেমন– سَعْدٌ فِيْ دَارِكَ (সৌভাগ্য তোমার বাড়িতে) সুসংবাদ প্রথমে দেওয়ার উদাহরণ। اَلسَّفَّاحُ فِيْ دَارِ صَدِيْقِكَ (**খুনী তোমার বন্ধুর বাড়িতে**) দুঃসংবাদ প্রথমে দেওয়ার জন্য।

অথবা এ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য যে, মুসনাদ ইলাইহ অন্তর থেকে বিস্মৃত হয় না। কেননা, তা কাঙ্ক্ষিত। **অথবা তা দ্বারা তৃপ্তিবোধ করার জন্য,** তা অতি প্রিয় হওয়ার কারণে, **অথবা এ জাতীয় অন্য উদ্দেশ্যে।** যেমন– তার সম্মান অথবা অমর্যাদা প্রকাশের জন্য এবং এ ধরনের অন্য উদ্দেশ্যে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاِمَّا لِتَمْكِيْنِ الْخَبَرِ الخ : মূল লেখক উল্লিখিত ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে ব্যবহার করার আরো কিছু যুক্তি পেশ করেছেন। সেগুলোর উপস্থিতিতে মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের আগে আনা হয়।

২. لِتَمْكِيْنِ الْخَبَرِ فِيْ ذِهْنِ السَّامِعِ তথা খবর (মুসনাদ)-কে শ্রোতার মনে বদ্ধমূল করার জন্য। অর্থাৎ বক্তা যদি শ্রোতার মনে খবরটিকে সুদৃঢ় করতে চায় তাহলে মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে উল্লেখ করা সমীচীন। কেননা, যখন মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে উল্লেখ করা হয় তখন শ্রোতার মনে খবরটি শোনার আগ্রহ জন্মে। আর আগ্রহও আশক্তির পর কোনো বিষয় শ্রুত হলে তা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং সুন্দরভাবে অবস্থান করে। তবে এখানে মনে রাখা দরকার যে, মুসনাদ ইলাইহ (মুবতাদা)-এর দ্বারা খবরের আগ্রহ তখনই হবে যখন মুসনাদে ইলাইহের সাথে এমন সিফাত বা صلة থাকবে যা খবরের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। যেমন বিখ্যাত কবি আবুল 'আলা মু'আররী তার কবিতায় বলেন–

وَالَّذِىْ حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيْهِ * حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمَادٍ .

কবিতার চরণের অর্থ : যার ব্যাপারে জগৎবাসী দ্বিধাগ্রস্ত এবং চিন্তিত, তা হচ্ছে এমন এক প্রাণী যার সৃষ্টি জড়পদার্থ থেকে। কবিতার সারমর্ম হচ্ছে, মানুষের মৃত্যুর পর তার হাড়-মাংস মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর পুনরুত্থিত হতে পারে কিনা– এ ব্যাপারে জগৎবাসী দ্বিধাগ্রস্ত এবং চিন্তিত। একদল বলছে, তাদের দৈহিক পুনরুত্থান হবে, অন্যদল বলছে হবে না।

قَوْلُهُ بِدَلِيْلِ مَا قَبْلَهُ : অর্থাৎ حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ দ্বারা যে, মানুষ উদ্দেশ্য এবং তাদের দৈহিক ও আত্মিক পুনরুত্থান হবে এর দলিল রয়েছে উক্ত কবিতার পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তিতে। সেই পঙ্‌ক্তিটি হলো–

بَانَ اَمْرُ الْاِلٰهِ وَاخْتَلَفَ * النَّاسُ فَدَاعٍ اِلٰى ضَلَالٍ وَهَادٍ

ভাবার্থ– বিভিন্ন প্রমাণ ও আয়াতের মাধ্যমে পুনরুত্থানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু কতিপয় লোক এ মতের বিরোধী রয়েছে। কেউ বলে, পুনরুত্থান হবে (তারা হিদায়েতের উপর)। আর কেউ বলে, পুনরুত্থান হবে না। তারা বিভ্রান্তির বেড়াজালে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ সম্পর্কে অনেকে বলেন, এর দ্বারা হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি থেকে সৃষ্ট সাপ অথবা পাথর থেকে জন্ম নেওয়া ছামূদ জাতির উটনীকে বুঝানো হয়েছে। মূলত তাদের উক্ত ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির ভুল প্রমাণ করে। উল্লিখিত উদাহরণে الذى (اِسْم مَوْصُوْل) এবং তার صلة মিলে মুবতাদা হয়েছে। এটি শুনে শ্রোতার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে একথা জানার জন্য যে, মানুষ কার ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্ত। এরপর যখন 'খবর' বলা হলো তখন শ্রোতার মনে তা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

৩. **قَوْلُهُ وَاِمَّا لِتَعْجِيْلِ الْمَسَرَّةِ اَوِ الْمَسَاءَةِ الخ :** মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা হয় যাতে শ্রোতাকে দ্রুত সুসংবাদ দেওয়া যায় এবং শ্রোতা এর দ্বারা শুভ লক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। যেমন– سَعْدٌ فِىْ دَارِكَ, এখানে سعد শব্দটি যদিও একজনের নাম; কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে সৌভাগ্য বা সৌভাগ্যবান। অতএব, এ বাক্যটি শোনামাত্র শ্রোতা বুঝবে, তার ঘরে সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছে। এ কথার দ্বারা শ্রোতার মনে দ্রুত আনন্দ সঞ্চারিত হবে। সুতরাং এখানে শ্রোতার মনে খুশির সংবাদ পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে ব্যবহার করা জরুরি।

৪. **قَوْلُهُ لِتَعْجِيْلِ الْمَسَاءَةِ :** কখনো মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা হয় শ্রোতাকে দ্রুত বিষণ্ন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। যেমন– কেউ বলল, اَلسَّفَّاحُ فِىْ دَارِ صَدِيْقِكَ আরবিতে اَلسَّفَّاحُ বলা হয় খুনীকে। শ্রোতার খুনী শব্দটি শোনা মাত্র তার মন খারাপ হয়ে যাবে এবং এর দ্বারা সে কুলক্ষণ ধরে নিবে। অতএব, এখানে মুসনাদ ইলাইহকে আগে ব্যবহার করা শ্রোতার মনকে বিষণ্ন করে দেওয়ার কারণ হবে।

৫. কখনো মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা হয় এ কথা জানানোর জন্য যে, এটি আমার এত প্রিয় যে, আমার মন থেকে কখনো বিস্মৃত হয় না। (বরং যখনই কথা বলি, তার দ্বারাই কথা শুরু করি।) অথবা এর স্মরণ দ্বারা তৃপ্তিবোধ হয় এ কথা জানানোর জন্য। যেমন–اَلْحَبِيْبُ جَاءَنِىْ অর্থাৎ আমার প্রিয়জন আমার কাছে এসেছে।

قَوْلُهُ وَاِمَّا لِنَحْوِ ذٰلِكَ : লেখক বলেন, আরো অন্যান্য উদ্দেশ্যে মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা হয়। যথা– কারো প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে আনা হয়। অথবা কারো প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের জন্য তাকে আগে উল্লেখ করা হয়। অথবা এ জাতীয় অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আগে আনা হয়।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে مقدم করা হয় খবরকে শ্রোতার মনে সুদৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেওয়ার জন্য। যেমন– وَالَّذِىْ حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيْهِ * حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمَادٍ এ কবিতায় বর্ণিত মানুষের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টি মানুষের মৃত্যুর পর শারীরিক পুনরুত্থান হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে।

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে مقدم করা শুভ/অশুভ সংবাদ দ্রুত প্রদানের জন্য, যাতে শ্রোতা সংবাদ শুভ/অশুভ লক্ষণ যাচাই করতে পারে। প্রথমটির উদাহরণ যেমন– سَعْدٌ فِىْ دَارِكَ দ্বিতীয়টির উদাহরণ যেমন– اَلسَّفَّاحُ فِىْ دَارِ صَدِيْقِكَ

অথবা, মুসনাদ ইলাইহকে অগ্রবর্তী করা হয় এ কথার ইঙ্গিত প্রদানের জন্য যে, তা কখনো মুতাকাল্লিমের অন্তর থেকে বিদূরীত হয় না। অথবা, মুসনাদ ইলাইহ উচ্চারণ করত স্বাদ গ্রহণের জন্য। আরো বিভিন্ন কারণে মুসনাদ ইলাইহ مقدم করা হয়।

قَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ وَقَدْ يُقَدَّمُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ لِيُفِيْدَ التَّقْدِيْمُ تَخْصِيْصَهُ بِالْخَبَرِ الْفِعْلِيْ اَىْ قَصْرُ الْخَبَرِ الْفِعْلِيْ عَلَيْهِ إِنْ وَلِىَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ حَرْفَ النَّفْيِ اَىْ وَقَعَ بَعْدَهَا بِلَا فَصْلٍ نَحْوُ مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا اَىْ لَمْ اَقُلْهُ مَعَ اَنَّهُ مَقُوْلٌ لِغَيْرِىْ فَالتَّقْدِيْمُ يُفِيْدُ نَفْىَ الْفِعْلِ عَنِ الْمُتَكَلِّمِ وَثُبُوْتَهُ لِغَيْرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِىْ نُفِىَ عَنْهُ مِنَ الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ وَلَا يَلْزَمُ ثُبُوْتُهُ لِجَمِيْعِ مِنْ سِوَاكَ لِاَنَّ التَّخْصِيْصَ اِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى مَنْ يَتَوَهَّمُ الْمُخَاطَبُ اِشْتِرَاكَكَ مَعَهُ اَوْ اِنْفِرَادَكَ بِهِ دُوْنَهُ ـ

অনুবাদ : শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানী বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে আনা হয়, যাতে এ প্রথমোল্লেখ তার ক্রিয়াবাচক খবরের সাথে খাস হওয়া প্রমাণ করে। অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক খবরটি তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে **যদি মুসনাদ ইলাইহটি না-বাচক অক্ষরের সাথে মিলে আসে।** অর্থাৎ তার অব্যবহিত পরে আসে। **যেমন– مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا অর্থাৎ আমি এটি বলিনি, তবে এটি অন্যের উক্তি।** (এখানে) মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামীতা কাজটিকে তার থেকে না-বাচক করত অন্যের জন্য ব্যাপক অথবা অব্যাপক যেভাবে নেতিবাচক করা হয়েছে সেভাবেই প্রমাণিত করার অর্থ দিচ্ছে। তবে এর দ্বারা অন্য সকলের জন্য কাজটি প্রমাণিত করে, এটি অত্যাবশ্যকীয় নয়। কেননা, নির্দিষ্ট করা হয়েছে তো ঐসব ব্যক্তির হিসেবে যাদের সাথে শ্রোতা তোমাকে (উক্ত কাজে) অংশীদার মনে করে অথবা তোমাকে স্বতন্ত্র মনে করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ قَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ الخ : বিখ্যাত নাহুবিদ ও অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ আল্লামা আবদুল কাহির জুরজানী বলেন, وَقَدْ يُقَدَّمُ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ ...... الخ আল্লামা জুরজানীর বক্তব্যের সারকথা হলো এই যে, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা হয়, যাতে এতে তার ক্রিয়াবাচক ফে'লের সাথে খাস এ কথা বুঝানো যায়। অর্থাৎ এ কথা বুঝানোর উদ্দেশ্যে যে, খবরটি মুবতাদার সাথেই খাস। তবে উক্ত মুসনাদ ইলাইহ তাখসীসের অর্থ প্রদানের জন্য দু'টি শর্ত–

১. মুসনাদ ইলাইহের খবর ক্রিয়াবাচক হওয়া, ২. মুসনাদ ইলাইহ না-বাচক অক্ষরের পরে আসবে, উক্ত মুসনাদ ইলাইহ এবং না-বাচক অক্ষরের মাঝে কোনো দূরত্ব সৃষ্টিকারী কোনো শব্দ থাকবে অথবা থাকবে না।

উল্লেখ্য যে, خَبَرِ فِعْلِى-এর সাথে মুসনাদ ইলাইহকে খাস করার অর্থ একে মুসনাদ ইলাইহের জন্য প্রমাণ করা নয়; বরং যেহেতু শুরুতে না-বাচক অক্ষর থাকবে তাই ক্রিয়াবাচক খবর-এর نَفِى-এর সাথে তাকে খাস করা হবে।

قَوْلُهُ اَىْ وَقَعَ بَعْدَهَا بِلَا فَصْلٍ : মুসান্নিফের এ কয়েদের দ্বারা বুঝা যায়, যদি মুসনাদ ইলাইহ এবং না-বাচক অক্ষরের মাঝে পৃথককারী শব্দ থাকে তাহলে তা তাখসীসের অর্থ দিবে না, অথচ আমরা দেখি যদি ফে'লের মা'মূল দ্বারা পৃথক করা হয় তবুও তাখসীসের অর্থ প্রদান করে। যেমন– مَا زَيْدًا اَنَا ضَرَبْتُ আমিই যায়েদকে প্রহার করিনি এবং مَا فِى الدَّارِ اَنَا جَلَسْتُ অর্থাৎ আমিই ঘরে বসিনি।

এর উত্তর হচ্ছে– এখানে بِلَا فَصْلٍ-এর শব্দটি এমনিতেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কয়েদ রূপে নয়। আর ولى (মিলিত হয়ে আসা)-এর দু'টি হাকীকত রয়েছে– ১. আভিধানিক, ২. পারিভাষিক, পারিভাষিক অর্থে তাতে কোনো فاصل থাকতে পারবে না। তাই এতে بِلَافَصْلٍ-এর কয়েদ লাগানো হয়েছে। তবে ولى যদি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তাতে দূরত্ব সৃষ্টিকারী আসতে পারে, এখানে بِلَا فَصْلٍ-এর কয়েদটি মুসান্নিফ ولى-এর পারিভাষিক হাকীকতের ভিত্তিতে নিয়েছেন, কিন্তু এখানে ولى-এর আভিধানিক হাকীকত হওয়াটাই অধিক সমীচীন। অতএব, দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে না-বাচক-এর অক্ষরের পরে আসা। উভয় শর্ত পাওয়া গেলে মুসনাদ ইলাইহের প্রথমোল্লেখ তাখসীসের অর্থ দিবে। অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক খবরটি তার

মুসনাদ ইলাইহের মাঝেই সীমাবদ্ধ হবে, যেমন مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا এ বাক্যে انا শব্দটি মুসনাদ ইলাইহ, যা না-বাচক অক্ষর ما-এর পরে এসেছে। মুসনাদ ইলাইহের খবর قُلْتُ هٰذَا ফে'ল। অতএব, এ বাক্যের قُلْتُ هٰذَا মুসনাদ ইলাইহের মাঝে সীমাবদ্ধ। এখানে মুসনাদ তথা কথা না বলা তাখসীস হয়েছে انا মুবতাদার উপর।

অতএব, مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا-এর অর্থ– আমি বলিনি এ কথা, যদিও আমি ছাড়া অন্যরা বলেছে। এখানে খবরটি সীমাবদ্ধ হওয়া এবং মুসনাদ ইলাইহের সাথে হওয়ার অর্থ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে আনার দ্বারা ফে'লটি বক্তা থেকে না-বাচক হয়ে যাবে এবং বক্তা ছাড়া অন্য সকলের জন্য..... এভাবেই প্রমাণিত হবে। যদি বক্তা থেকে বিশেষভাবে না-বাচক হয়, তাহলে অন্যের জন্য বিশেষভাবে হ্যাঁ-বাচক হবে। যদি বক্তা থেকে ব্যাপকভাবে না-বাচক হয়, তাহলে অন্যের জন্য ব্যাপকভাবে হ্যাঁ-বাচক হবে। উল্লিখিত উদাহরণে বক্তা থেকে বিশেষভাবে কাজটি না-বাচক হয়েছে। বক্তা বলেছে আমি এটা বলিনি। অতএব, অন্যের জন্য এভাবেই হ্যাঁ-বাচক হবে। আর যদি বক্তা থেকে কোনো কাজ ব্যাপকভাবে না-বাচক হয়, যেমন– বক্তা বলে مَا اَنَا رَاَيْتُ اَحَدًا "আমি কাউকে দেখিনি" এ উদাহরণে বক্তা থেকে ব্যাপকভাবে দেখাকে নফী করা হয়েছে। অতএব, অন্যের জন্য ব্যাপকভাবে দেখাকে প্রমাণিত করা হবে। অর্থাৎ তাহলে অন্যরা সব মানুষকে দেখেছে।

قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ ثُبُوْتُهُ لِجَمِيْعِ الخ : এ বাক্যটি দ্বারা শ্রোতাদের একটি সন্দেহের অপনোদন করা হচ্ছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বক্তা থেকে যে বিষয়টি না-বাচক করা হয়েছে, অন্য সবের জন্য সেই বিষয়কে সাবিত করা হবে। তাহলে কি বক্তা ছাড়া পৃথিবীর সকলের জন্য তা সাবিত হবে। অথচ এটা তো অসম্ভব– কেননা পৃথিবীর সকলেই উক্ত কাজটি করবে এটা সম্ভব নয়। এই সন্দেহের অপনোদনের উদ্দেশ্যে মুসান্নিফ বলেন, অন্যের জন্য সাবিত করার দ্বারা পৃথিবীর সকল মানুষ অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি নয়। কেননা, তাখসীস দু'প্রকার– ১. قَصْر اِضَافِىْ ২. قَصْر حَقِيْقِىْ এখানে তাখসীসের দু'প্রকারের যে কোনো একভাবে قصر বা তাখসীস গ্রহণ করলে পৃথিবীর সব মানুষের জন্য কাজটি সাবিত হয় না।

প্রথম প্রকার قَصْر حَقِيْقِى বলা হয় কোনো বিষয়কে অন্য আরেকটি বিষয়ের সাথে হাকীকীভাবে এমনভাবে সীমাবদ্ধ এবং খাস করা যে, প্রথমোক্ত বিষয়টি দ্বিতীয় বিষয় ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। যেমন– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এ কালিমাতে মাবুদ এবং ইলাহকে আল্লাহর সাথে খাস এবং আল্লাহ তা'আলার উপর সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তা আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

قَصْر اِضَافِىْ বলা হয় কোনো বিষয়কে আরেকটি বিষয়ের সাথে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের তুলনায় খাস করা এবং প্রথমোক্ত বিষয়টিকে দ্বিতীয় বিষয়ের সাথে খাস করা। যেমন– لَا شُجَاعَ اِلَّا حَسَنٌ অর্থ– হাসানই বীর, এ বাক্যের অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হাসানই বীর; বরং এর অর্থ হচ্ছে শ্রোতা হাসান এবং তার বন্ধু সাঈদ উভয়কে বীর মনে করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বীর শুধুমাত্র হাসান, সাঈদ নয়। অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে এখানে لَا شُجَاعَ اِلَّا حَسَنٌ বলা হয়েছে। অতএব, বাক্যের অর্থ হবে, হাসানই বীর, সাঈদ নয়। অর্থাৎ দু'জনকে একত্রে বীর মনে করা সঠিক নয় আল্লামা আব্দুল কাহির জুরজানীর বক্তব্যে قَصْر اِضَافِىْ-এর কথা বলা হয়েছে, قَصْر حَقِيْقِى-এর কথা বলা হয়নি। তার উদাহরণ– مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ক্রিয়াবাচক শব্দটি মুসনাদ ইলাইহের উপর সীমাবদ্ধ হবে। অন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির তুলনায়– হাকীকীভাবে নয়। যখন বক্তার শ্রোতা মনে করেন উক্ত কাজটি করার ক্ষেত্রে মুসনাদ ইলাইহের সাথে অন্য কেউ শরিক আছেন অথবা তিনি ধারণা করেন যে, মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কাজটি করেছে।

অন্য কাউকে উক্ত কাজে শরিক মনে করলে যে قصر হবে, তাকে قَصْرِافْرَادْ বলা হয়।

আর মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া ভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে মুসনাদটি সম্পাদন করার ধারণা করা হলে যে قصر হয়, তাকে قَصْر قَلْب বলে। অতএব, অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের তুলনায়– قصر করা হলে মুসনাদ ইলাইহ থেকে কাজ নেতিবাচক করা হলে পৃথিবীর অন্যসব মানুষের জন্য কাজ ইতিবাচক হয়ে যায়। যেমন বক্তা এখানে বলল, আমি এটা বলিনি এর দ্বারা বক্তা ছাড়া পৃথিবীর সবাই বলেছে, এটা আবশ্যক হবে না।

সার-সংক্ষেপ : শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানী (র.) বলেন, যদি মুসনাদ ইলাইহের সাথে حَرْف نَفِى যুক্ত হয় এবং মুসনাদ ইলাইহে আগে উল্লিখিত হয়, তাহলে তারপরবর্তী فعل টি তার সাথে খাস হয়ে যায়। যেমন – مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا

এখানে انا-কে অগ্রবর্তী করার দ্বারা না-বলাকে মুতাকাল্লিমের সাথে খাস করা হয়েছে এবং অন্যের জন্য বলাকে সাবিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মুতাকাল্লিম থেকে হুকুমকে যেভাবে নফী করা হয় সেভাবেই হুকুমকে অন্যের জন্য সাবিত করা হয়। তবে মুতাকাল্লিম থেকে নফী করে অন্য সকলের জন্য সাবিত করা হবে বিষয়টি এমন নয়; বরং শ্রোতার ধারণা অনুযায়ী অন্যের জন্য সাবিত করা হবে।

وَلِهٰذَا اَىْ وَلِاَنَّ التَّقْدِيْمَ يُفِيْدُ التَّخْصِيْصَ وَنَفْىَ الْحُكْمِ عَنِ الْمَذْكُوْرِ مَعَ ثُبُوْتِهٖ لِلْغَيْرِ لَمْ يَصِحَّ مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا وَلَا غَيْرِىْ لِاَنَّ مَفْهُوْمَ مَا اَنَا قُلْتُ ثُبُوْتُ قَائِلِيَّةِ هٰذَا الْقَوْلِ لِغَيْرِ الْمُتَكَلِّمِ وَمَنْطُوْقَ لَا غَيْرِىْ نَفْيُهَا عَنْهُ وَهُمَا مُتَنَاقِضَانِ وَلَا مَا اَنَا رَاَيْتُ اَحَدًا لِاَنَّهٗ يَقْتَضِىْ اَنْ يَكُوْنَ اِنْسَانٌ غَيْرَ الْمُتَكَلِّمِ قَدْ رَاٰى كُلَّ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ لِاَنَّهٗ قَدْ نُفِىَ عَنِ الْمُتَكَلِّمِ الرُّؤْيَةُ عَلٰى وَجْهِ الْعُمُوْمِ فِى الْمَفْعُوْلِ فَيَجِبُ اَنْ يَثْبُتَ لِغَيْرِهٖ عَلٰى وَجْهِ الْعُمُوْمِ فِى الْمَفْعُوْلِ لِيَتَحَقَّقَ تَخْصِيْصُ الْمُتَكَلِّمِ بِهٰذَا النَّفْىِ وَلَا مَا اَنَا ضَرَبْتُ اِلَّا زَيْدًا لِاَنَّهٗ يَقْتَضِىْ اَنْ يَكُوْنَ اِنْسَانٌ غَيْرَكَ قَدْ ضَرَبَ كُلَّ اَحَدٍ سِوٰى زَيْدٍ لِاَنَّ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ مُقَدَّرٌ عَامٌّ وَكُلُّ مَا نَفَيْتَهٗ عَنِ الْمَذْكُوْرِ عَلٰى وَجْهِ الْحَصْرِ يَجِبُ ثُبُوْتُهٗ لِغَيْرِهٖ تَحْقِيْقًا لِمَعْنَى الْحَصْرِ اِنْ عَامًّا فَعَامٌّ وَاِنْ خَاصًّا فَخَاصٌّ وَفِىْ هٰذَا الْمَقَامِ مَبَاحِثُ نَفِيْسَةٌ وَشَّحْنَا بِهَا فِى الشَّرْحِ -

অনুবাদ : **আর এ কারণেই** অর্থাৎ (মুসনাদ ইলাইহকে) প্রথমে উল্লেখ তাখসীস এবং উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহ থেকে হুকুমকে না-বাচক করে অন্যের জন্য তা প্রমাণিত করার অর্থ প্রদান করে, مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا وَلَا غَيْرِىْ **বাক্যটি বিশুদ্ধ হবে না**। কেননা, مَا اَنَا قُلْتُ-এর অর্থ হচ্ছে এ কথার উক্তিকারী বক্তা ছাড়া অন্য কাউকে সাব্যস্ত করা। তার لَاغَيْرِىْ-এর ভাষা তাকে না-বাচক করেছে। আর দু'টো পরস্পর বিরোধী বিষয় এবং مَا اَنَا رَاَيْتُ اَحَدًا বিশুদ্ধ নয়। কেননা, এ বাক্যটির চাহিদা হচ্ছে বক্তা ছাড়া এমন মানুষ রয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষকে দেখেছে। কেননা, বক্তা থেকে মাফউলকে ব্যাপকভাবে দেখা না-বাচক করা হয়েছে। অতএব, অন্যের জন্য ব্যাপকভাবে মাফউলকে দেখা প্রমাণিত হবে। যাতে বক্তাকে উক্ত না-বাচক বাক্যের সাথে খাস করা যায় এবং مَا اَنَا ضَرَبْتُ اِلَّا زَيْدًا **বাক্যটিও বিশুদ্ধ নয়**। কেননা, এ বাক্যের দাবি হচ্ছে তুমি ছাড়া অন্য এক ব্যক্তি যায়েদ ছাড়া সব মানুষকে মেরেছে, এখানে মুসতাছনা মিনহু উহ্য, যা ব্যাপক অর্থবোধক। আর আপনি উল্লিখিত বিশেষ্য থেকে যা সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে না-বাচক করবেন তা অন্যের জন্য সাবিত হবে। সীমাবদ্ধতার অর্থের পূর্ণতার জন্য। এটা যদি ব্যাপক হয় তাহলে ব্যাপকভাবে যদি সংকীর্ণ অর্থ হয়, তাহলে সংকীর্ণভাবে এ স্থানে মূল্যবান আলোচনা রয়েছে, সে আলোচনা দ্বারা ব্যাখ্যাগ্রন্থকে সাজিয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَلِهٰذَا اَىْ وَلِاَنَّ الخ **:** উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখক আল্লামা আব্দুল কাহির জুরজানীর ইবারত وَقَدْ يُقَدَّمُ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ لِيُفِيْدَ تَخْصِيْصَهٗ -এর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, মুসনাদ ইলাইহকে আপন স্থানের আগে আনার দ্বারা তাখসীসের অর্থ পাওয়া যায়, তা উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহ তথা বক্তা থেকে এবং বাক্যের হুকুমকে না-বাচক করত অন্যের জন্য তা প্রমাণ করে। আর এ কারণে مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا وَلَا غَيْرِىْ বাক্যটি বিশুদ্ধ নয়। কারণ مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا এ বাক্যের মধ্যে হুকুম তথা عَدَمُ الْقَوْلِ (না বলা)-এর সাথে মুসনাদ ইলাইহকে খাস করা এবং উক্ত হুকুমকে মুসনাদ ইলাইহের উপর সীমাবদ্ধ করার কারণে উক্ত কথার মুতাকাল্লিম অন্য কেউ প্রমাণিত হবে। কেননা, কথা থেকে তা না-বাচক হওয়ার সাথে সাথে তা অন্যের জন্য প্রমাণিত হবে। কিন্তু এরপর যদি لَا غَيْرِىْ বলা হয় তাহলে এর দ্বারা বক্তা ছাড়া অন্য কেউ মুতাকাল্লিম হবে এটা না-বাচক হয়ে যাবে। যা ইতঃপূর্বে তাখসীসের সাথে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। কেননা, لَا

غَيْرِىْ-এর অর্থ হচ্ছে আমি ছাড়া অন্য এটা বলেনি।

অতএব, বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দু'টি বাক্য একত্রিত হয়ে গেল। لَا غَيْرِىْ-এর পূর্বের অংশ অন্যের জন্য হুকুমকে প্রমাণ করে আর لَا غَيْرِىْ তা নফী করে। আর পরস্পর বিরোধী দু' বিষয় একত্রিত হওয়ার কারণে বাক্যটির কোনো অর্থ রইল না এবং পুরো বাক্যই অনর্থক বলে প্রমাণিত হলো। অতএব, বাক্যটি অবিশুদ্ধ ও বাতিল হয়ে গেল, লেখক বলেন– مَا اَنَا رَاَيْتُ اَحَدًا বাক্যটিও বিশুদ্ধ নয়। কেননা, এ বাক্যের তাখসীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, বক্তা ছাড়া একজন ব্যক্তি এমন রয়েছেন যিনি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে দেখেছেন। অথচ যে কোনো মানুষের জন্য এটা অসম্ভব যে, পৃথবীর প্রত্যেকটি মানুষকে দেখবে।

বাক্যটি থেকে এমন অর্থ নেওয়ার কারণ হচ্ছে, বাক্যের মুসনাদ ইলাইহ (বক্তা) থেকে মাফউলের ব্যাপারে হুকুম না-বাচক হয়েছে ব্যাপকভাবে। অর্থাৎ বক্তা বলেছে, আমি কাউকে দেখিনি। এ কারণে ব্যাপকতা এবং সংকীর্ণতার নিয়মের ভিত্তিতে বক্তা ছাড়া অন্যের জন্য হুকুমটি মাফউলের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ অন্য ব্যক্তি পৃথিবীর সব মানুষকে দেখেছে। আর এটা করা হবে বক্তাকে না-বাচকের দ্বারা যে তাখসীস করা হয়েছে তার অর্থের পূর্ণতার জন্য। কেননা, আমরা ইতঃপূর্বে বলে এসেছি যে, তাখসীসের অর্থ হচ্ছে বক্তা (মুসনাদ ইলাইহ) থেকে যা নেতিবাচক হয়েছে হুবহু তাই অন্যের জন্য ইতিবাচক হবে।

লেখক বলেন, مَا اَنَا ضَرَبْتُ اِلَّا زَيْدًا এ বাক্যটিও বিশুদ্ধ নয়। কারণ, এ বাক্যের দাবি হচ্ছে বক্তা ছাড়া অন্য ব্যক্তি যায়েদ ছাড়া পৃথিবীর সবাইকে মেরেছে, অথচ এমনটা অসম্ভব।

এমন অর্থ করার কারণ হচ্ছে বাক্যের মুসতাছনা মিনহু উহ্য আছে– যা ব্যাপকতার অর্থ বহন করে। উহ্য শব্দসহ বাক্যটি এরূপ– مَا اَنَا ضَرَبْتُ اَحَدًا اِلَّا زَيْدًا অর্থ– আমি যায়েদ ছাড়া অন্য কাউকে মারিনি। অতএব, বক্তা ছাড়া অন্যের জন্য কথাটি হ্যাঁ-বাচক আকারে এভাবে হবে– অন্য ব্যক্তি যায়েদ ছাড়া সবাইকে মেরেছে।

মোটকথা, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে মুসনাদ ইলাইহ থেকে যা ব্যাপকভাবে নেতিবাচক হয় মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্যের জন্য তা ব্যাপকভাবে ইতিবাচক হয়। আর এখানে তাই হয়েছে। কিন্তু ইতিবাচকের অর্থটি অসম্ভব হওয়ার কারণে নেতিবাচক বাক্যটি বিশুদ্ধ হবে না। কেননা, নেতিবাচক বাক্যটিই সেই অসম্ভব অর্থকে ধারণ করছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ অধ্যায়ে মূল্যবান কতিপয় বিষয় রয়েছে, যার আলোচনা আমি ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুতাওয়ালে বিস্তারিতভাবে করেছি। সংক্ষিপ্ত এই কিতাবে স্থানাভাবে তা করা যায়নি, যাদের আগ্রহ রয়েছে তারা মুতাওয়াল দেখতে পারেন।

সার-সংক্ষেপ :

যেহেতু মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা উল্লিখিত ইসম থেকে হুকুমকে নফী করে এবং অন্যের জন্য হুকুম সাবিত করে, তাই এ উদাহরণ– مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا وَلَا غَيْرِىْ শুদ্ধ হবে না। কারণ, এ বাক্যটিতে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রয়েছে। مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا দ্বারা মুতাকাল্লিম ছাড়া অন্যের হুকুম সাবিত হয় আর لَا غَيْرِىْ দ্বারা অন্যদের থেকে হুকুম নফী হয়।

তদ্রূপ مَا اَنَا رَاَيْتُ اَحَدًا ও শুদ্ধ নয়। কেননা, এ বাক্যের বিপরীতক্রমে যা প্রমাণিত হয় তা অসম্ভব বিষয়। অর্থাৎ আমি ব্যতীত অন্যরা পৃথিবীর সকলকে দেখেছে।

তদ্রূপ مَا اَنَا ضَرَبْتُ اِلَّا زَيْدًا বাক্যটি শুদ্ধ নয়। কারণ, এর দ্বারাও অসম্ভব বিষয় আবশ্যক হয়। কারণ, শেষোক্ত

وَإِلَّا اَیْ وَاِنْ لَمْ يَلِ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ حَرْفَ النَّفْيِ بِاَنْ لَا يَكُوْنَ فِى الْكَلَامِ حَرْفُ النَّفْيِ اَوْ يَكُوْنَ حَرْفُ النَّفْيِ مُتَاَخِّرًا عَنِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فَقَدْ يَاتِىْ التَّقْدِيْمُ لِلتَّخْصِيْصِ رَدًّا عَلٰى مَنْ زَعَمَ اِنْفِرَادَ غَيْرِهٖ اَیْ غَيْرَ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ الْمَذْكُوْرِ بِهٖ اَیْ بِالْخَبَرِ الْفِعْلِىْ اَوْ زَعَمَ مُشَارَكَتَهٗ اَیْ مُشَارَكَةَ الْغَيْرِ فِيْهِ اَیْ فِى الْخَبَرِ الْفِعْلِىْ نَحْوُ اَنَا سَعَيْتُ فِىْ حَاجَتِكَ لِمَنْ زَعَمَ اِنْفِرَادَ الْغَيْرِ بِالسَّعْيِ فَيَكُوْنُ قَصْرَ قَلْبٍ اَوْ زَعَمَ مُشَارَكَتَهٗ لَكَ فِى السَّعْيِ فَيَكُوْنُ قَصْرَ اِفْرَادٍ وَ يُؤَكَّدُ عَلَى الْاَوَّلِ اَیْ عَلٰى تَقْدِيْرِ كَوْنِهٖ رَدًّا عَلٰى مَنْ زَعَمَ اِنْفِرَادًا لِغَيْرِ بِنَحْوِ لَا غَيْرِىْ مِثْلُ لَا زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌو لَامَنْ سِوَاىَ لِاَنَّهُ الدَّالُّ صَرِيْحًا عَلٰى اِزَالَةِ شُبْهَةِ اَنَّ الْفِعْلَ صَدَرَ عَنِ الْغَيْرِ وَيُؤَكَّدُ عَلَى الثَّانِىْ اَیْ عَلٰى تَقْدِيْرِ كَوْنِهٖ رَدًّا عَلٰى مَنْ زَعَمَ الْمُشَارَكَةَ بِنَحْوِ وَحْدِىْ مِثْلُ مُتَفَرِّدًا اَوْ مُتَوَحِّدًا اَوْ غَيْرَ مُشَارِكٍ لِاَنَّهُ الدَّالُّ صَرِيْحًا عَلٰى اِزَالَةِ شُبْهَةِ اِشْتِرَاكِ الْغَيْرِ فِى الْفِعْلِ وَالتَّاكِيْدُ اِنَّمَا يَكُوْنُ لِدَفْعِ شُبْهَةٍ خَالَجَتْ قَلْبَ السَّامِعِ ـ

অনুবাদ : অন্যথায় অর্থাৎ যদি মুসনাদ ইলাইহ না-বাচক অক্ষরের সাথে মিলিত না হয়– এভাবে যে, বাক্যে কোনো না-বাচক অক্ষরই নেই, অথবা তা আছে; কিন্তু মুসনাদ ইলাইহের পরে হয়, **তখন মুসনাদ ইলাইহের অগ্রবর্তীতা তাখসীসের জন্য হয়, এমন ব্যক্তির ধারণা খণ্ডন করার জন্য যে, উল্লিখিত** (মুসনাদ ইলাইহ ভিন্ন) **অন্য ব্যক্তি একাকী কাজটি করেছে বলে ধারণা করে। অথবা তার সাথে অন্যকে অংশীদার বলে ধারণা করে।** যেমন– اَنَا سَعَيْتُ فِىْ حَاجَتِكَ অর্থাৎ **আমিই তোমার প্রয়োজন পূরণে চেষ্টা করেছি** (এমন ব্যক্তিকে বলল) যে ধারণা করছে অন্য কেউ একা চেষ্টা করেছে– এটা قَصْرِ قَلْب-এর ক্ষেত্রে। অথবা সে ধারণা করছে চেষ্টার ব্যাপারে অন্য তোমার সাথে অংশীদার। তাহলে এটা قَصْرِ اِفْرَادْ হবে। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যে অন্যের একাকী কাজটি করার ধারণা করছে তার ধারণা খণ্ডন করার অবস্থায় **তাকিদ আনা হবে** لَا غَيْرِىْ **জাতীয় শব্দ দ্বারা,** যেমন - لَا زَيْدٌ, لَا عَمْرٌو, لَامَنْ سِوَاىَ ইত্যাদি। কেননা, এগুলো সুস্পষ্টভাবে এ সন্দেহ দূরকারী যে, কাজটি অন্য কারো থেকে প্রকাশ পেয়েছে **এবং দ্বিতীয় অবস্থায়** অর্থাৎ অংশিদারিত্বের ধারণাকারীর সন্দেহ খণ্ডনকালে وَحْدِىْ জাতীয় শব্দ দ্বারা তাকিদ আনা হবে, যেমন مُتَفَرِّدًا، مُتَوَحِّدًا ও غَيْرُ مُشَارِكٍ ইত্যাদি। কেননা, এগুলো সুস্পষ্টভাবে কাজে অন্যের অংশীদারিত্বের সন্দেহ অপনোদন করে, আর তাকিদ আনা হয় ঐ দ্বিধা দূর করার জন্য যা শ্রোতার মনে বাসা বাঁধে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَإِلَّا اَیْ وَاِنْ لَمْ الخ : মূল লেখক বলেন, যদি মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের অক্ষরের সাথে না মিলে আসে তখন তা কখনো তাখসীস করার অর্থ– আবার কখনো হুকুমকে শক্তিশালী করার অর্থ প্রদান করে। না-বাচকের হরফের সাথে মিলিত না হওয়ার দু'টি অবস্থা–

১. বাক্যের মধ্যে না-বাচক হরফ থাকবে না।

২. বাক্যের মধ্যে না-বাচক হরফ থাকলেও তা মুসনাদ ইলাইহের পর আসবে।

এ দু' অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহের প্রথমোল্লেখ হয়তো তাখসীসের কাজ করবে। এ তাখসীস দ্বারা হয়তো উদ্দেশ্য হবে এমন ব্যক্তির ধারণা খণ্ডন করা যে মনে করছে ক্রিয়াবাচক মুসনাদ (খবরটি) উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহ (বক্তা) করেনি; বরং অন্য কেউ করেছে।

অথবা, তাখসীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এমন ব্যক্তির ধারণা খণ্ডন করা, যে ধারণা করে উক্ত কাজটি মুসনাদ ইলাইহ একা করেনি; বরং এতে মুসনাদ ইলাইহের সাথে অন্যরা শরিক ছিল। যেমন– أَنَا سَعَيْتُ فِيْ حَاجَتِكَ অর্থাৎ আমিই তোমার প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে শ্রোতা যদি ধারণা করে থাকে কাজটি মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য কেউ করেছে, তাহলে এটি قَصْر قَلْب হবে, আর যদি বাক্যের শ্রোতার ধারণা থাকে কাজটি উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহ এবং অন্যরা সম্মিলিতভাবে করেছে, তাহলে এটি قَصْر إِفْرَادْ হবে।

যদি উক্ত বাক্যটিকে তাকিদযুক্ত করার ইচ্ছা করা হয়, তাহলে প্রথম অবস্থায় لَاغَيْر এবং এর মতো অর্থবোধক শব্দ যথা لَازَيْدٌ لَا عَمْرٌو ও لَا مَنْ سِوَايَ ইত্যাদি দ্বারা তাকিদ করা হবে। কেননা, এ জাতীয় শব্দগুলো সুস্পষ্টভাবে এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, কাজটি শুধুমাত্র মুসনাদ ইলাইহ থেকেই প্রকাশ পেয়েছে, অন্য কারো থেকে প্রকাশ পায়নি।

দ্বিতীয় অবস্থায় وَحْدِيْ এবং এর মতো অর্থবোধক শব্দ যথা مُتَفَرِدًا, مُتَوَحِّدًا ও غَيْرُ مُشَارِكٍ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তাকিদ করা হবে। এ শব্দগুলো সুস্পষ্টভাবে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, কাজটি করার ব্যাপারে মুসনাদ ইলাইহের সাথে আর কোনো অংশীদার নেই; বরং উক্ত কাজের একমাত্র কর্তা হলো উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহ (বক্তা) অন্য কেউ নয়।

সার-সংক্ষেপ :

যদি অগ্রবর্তী মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে যুক্ত না হয় চাই সে বাক্যে তারপরে না-বাচকের হরফ থাকুক অথবা বাক্যটি হ্যাঁ-বাচক উভয় অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহ مقدم করার দ্বারা قَصْر قَلْب অথবা قَصْر اَفْرَادْ হবে।

উভয় প্রকারের উদাহরণ হলো– أَنَا سَعَيْتُ فِيْ حَاجَتِكَ এ বাক্যটি শ্রোতার ধারণানুযায়ী উভয় قصر-এর উপমা হতে পারে। قَصْر قَلْب হলে এর تاكيد সামনের শব্দগুলো দ্বারা করা যাবে। যেমন– لَا زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌو . لَا غَيْرِىْ ও لَا مَنْ سِوَايَ ইত্যাদি। قَصْر اَفْرَادْ-এর তাকিদের শব্দগুলো হচ্ছে– وحدى . متفردا ও مُتَوَحِّدًا ইত্যাদি।

وَقَدْ يَاتِيْ لِتَقْوِيَةِ الْحُكْمِ وَتَقْرِيْرِهٖ فِيْ ذِهْنِ السَّامِعِ دُوْنَ التَّخْصِيْصِ نَحْوُ هُوَ يُعْطِي الْجَزِيْلَ قَصْدًا اِلٰى تَحْقِيْقِ اَنَّهٗ يَفْعَلُ اِعْطَاءَ الْجَزِيْلِ وَسَيَرِدُ عَلَيْكَ تَحْقِيْقُ مَعْنَى التَّقَوِّيْ وَكَذَا اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَنْفِيًّا فَقَدْ يَأْتِي التَّقْدِيْمُ لِلتَّخْصِيْصِ وَقَدْ يَاتِيْ لِلتَّقَوِّيْ فَالْاَوَّلُ نَحْوُ اَنْتَ مَا سَعَيْتَ حَاجَتِيْ قَصْدًا اِلٰى تَخْصِيْصِهٖ بِعَدَمِ السَّعْيِ وَالثَّانِيْ نَحْوُ اَنْتَ لَاتَكْذِبُ وَهُوَ لِتَقْوِيَةِ الْحُكْمِ الْمَنْفِيْ وَتَقْرِيْرِهٖ فَاِنَّهٗ اَشَدُّ لِنَفْيِ الْكِذْبِ مِنْ لَاتَكْذِبُ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَكْرَارِ الْاِسْنَادِ الْمَفْقُوْدِ فِيْ لَاتَكْذِبُ وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلٰى مِثَالِ التَّقَوِّيْ لِيُفَرِّعَ عَلَيْهِ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ تَاكِيْدِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ كَمَا اَشَارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهٖ وَكَذَا مِنْ لَاتَكْذِبُ اَنْتَ يَعْنِيْ اَنَّهٗ اَشَدُّ لِنَفْيِ الْكِذْبِ مِنْ لَاتَكْذِبُ اَنْتَ مَعَ اَنَّ فِيْهِ تَاكِيْدًا لِاَنَّهٗ اَيْ لِاَنَّ لَفْظَ اَنْتَ اَوْ لِاَنَّ لَاتَكْذِبُ اَنْتَ لِتَاكِيْدِ الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ بِاَنَّهٗ هُوَ ضَمِيْرُ الْمُخَاطَبِ تَحْقِيْقًا وَلَيْسَ الْاِسْنَادُ اِلَيْهِ عَلٰى سَبِيْلِ السَّهْوِ وَالتَّجَوُّزِ اَوِ النِّسْيَانِ لَا لِتَاكِيْدِ الْحُكْمِ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْاِسْنَادِ وَهٰذَا الَّذِيْ ذُكِرَ مِنَ التَّقْدِيْمِ لِلتَّخْصِيْصِ تَارَةً وَالتَّقَوِّيْ اُخْرٰى اِنْ بُنِيَ الْفِعْلُ عَلٰى مُعَرَّفٍ ـ

অনুবাদ : **কখনো মুসনাদ ইলাইহের প্রথমোল্লেখ্য হুকুমকে শক্তিশালী করা** এবং শ্রোতার মনে তাকে সুদৃঢ় করার জন্য হয়ে থাকে– তাখসীসের জন্য নয়। যেমন– هُوَ يُعْطِي الْجَزِيْلَ **(সেই অনেক দান করে)** এ কথার ইচ্ছা করত যে, সে নিশ্চিতভাবে প্রচুর দান করার কাজটি করে। تقوى-এর অর্থের বিশ্লেষণ অচিরেই আসবে। **এমনিভাবে যখন ক্রিয়াটি নেতিবাচক হয়।** সুতরাং (নেতিচবাচক অবস্থায়) মুসনাদ ইলাইহের প্রথমোল্লেখ্য তাখসীসের জন্য কখনো হয়, আবার কখনো সুদৃঢ় করার জন্য হয়। প্রথম প্রকার (এর উদাহরণ) যেমন তুমিই আমার অভাব মোচনে চেষ্টা করনি। এটা তাকে চেষ্টা না করার সাথে খাস করার উদ্দেশ্যে (বলা হয়েছে)। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে اَنْتَ لَا تَكْذِبُ **(তুমি মিথ্যা বলনি)** এটা (উল্লিখিত) নেতিবাচক হুকুমকে শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে (বলা হয়েছে)। **কেননা, এটা لَا تَكْذِبُ-এর তুলনায় প্রচণ্ডভাবে মিথ্যাকে না-বাচক করেছে।** কেননা, এতে ইসনাদ-এর তাকরার হয়েছে যা নেই لَا تَكْذِبُ-এর মধ্যে। মূল লেখক নেতিবাচক ফে'লের মধ্যে শুধুমাত্র تقوى-এর উদাহরণ দিয়েছেন, যাতে এর আলোকে এর মাঝে এবং মুসনাদ ইলাইহের তাকিদের মাঝে পার্থক্য আলোচিত হতে পারে। যেমনটি তিনি ইঙ্গিত করেছেন, তার বাক্য এমনি لَا تَكْذِبُ اَنْتَ থেকেও। অর্থাৎ তা (اَنْتَ لَا تَكْذِبُ) মিথ্যাকে না-বাচক করার ক্ষেত্রে لَا تَكْذِبُ اَنْتَ থেকে অধিক কঠোর। অথচ এর মধ্যেও তাকিদ রয়েছে। **কেননা انت শব্দটি** অথবা لَا تَكْذِبُ اَنْتَ **মুসনাদ ইলাইহের তাকিদের জন্য,** এভাবে তা নিশ্চিতভাবে মধ্যম পুরুষের সর্বনাম, তার প্রতি ভুলক্রমে, রূপকভাবে কিংবা অজ্ঞাতভাবে নিসবত করা হয়নি। **হুকুমের তাকিদের জন্য নয়** ইসনাদের তাকরার না থাকার কারণে। এই যে উল্লেখ করা হলো তাকদীম (মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে আনা) কখনো তাখসীসের জন্য কখনো শক্তিশালী করার জন্য, যদি ফে'লটি মা'রূফ হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقَدْ يَأْتِي لِتَقْوِيَةِ الخ : মূল লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহ যদি না-বাচকের হরফের সাথে না মিলে আসে, তখন তার ফে'লের আগে আসা– কখনো যেমন তাখসীসের জন্য হয় তেমনি কখনো শ্রোতার মনের মধ্যে হুকুমকে সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী করার জন্য হয়ে থাকে, তাখসীসের জন্য হয় না। যেমন– هُوَ يُعْطِي الْجَزِيلَ তথা সে খুব দানশীল, এ উদাহরণের মধ্যে অধিক দানের হুকুমটিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। আর এটা এভাবে যে, প্রথমত هو মুবতাদা বলার সাথে সাথে একটি খবরের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অতঃপর যখন يعطى বলা হলো তখন এর নিসবত মুবতাদা (هو)-এর দিকে হয়েছে এবং এর দ্বারা اعطاء (কাজটি) মুবতাদার জন্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। অতঃপর يعطى ফে'লটির মাধ্যে একটি সর্বনাম রয়েছে যার مرجع হচ্ছে মুবতাদা, ফে'ল তার সর্বনামের প্রতি মুসনাদ হয়েছে। অতএব, يعطى-এর নিসবত দু'বার হয়েছে মুবতাদার দিকে এবং اعطاء-এর কাজটি মুবতাদার জন্য দু'বার প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যেন বাক্যটি এমন হলো يُعْطِي زَيْدُ الْجَزِيلَ يُعْطِي زَيْدُ الْجَزِيلَ। দু'বার ইসনাদ হওয়া এবং হুকুম দু'বার হওয়ার দ্বারা বাক্যের মধ্যে এক ধরনের শক্তি সৃষ্টি হয় এবং হুকুমটি সুদৃঢ় হয়। সুতরাং هُوَ يُعْطِي الْجَزِيلَ বাক্যটির মধ্যে হুকুমটি শক্তিশালী হয়েছে।

মূল লেখক বলেন, এমনিভাবে যখন ফে'ল না-বাচক হয় অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে আনা হয়, এরপর নফীর অক্ষর আসে ফে'লের উপর, তখন মুসনাদ ইলাইহের প্রথমোল্লেখ কখনো তাখসীস-এর অর্থ প্রদান করে, আবার কখনো হুকুমকে সুদৃঢ় করার অর্থ প্রদান করে।

তাখসীসের উদাহরণ হচ্ছে اَنْتَ مَا سَعَيْتَ فِي حَاجَتِيْ অর্থাৎ তুমিই আমার অভাব পূরণ করনি। এ উদাহরণে– عَدَم سَعْي দ্বারা মুসনাদ ইলাইহ খাস করা হয়েছে এবং মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য থেকে হুকুমটিকে প্রমাণ করা হয়েছে। অতএব, এ উদাহরণটিতে مَا اَنَا قُلْتُ هٰذَا-এর মতো তাখসীস হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে–اَنْتَ لَا تَكْذِبُ তুমি মিথ্যা বলনি, এ উদাহরণটিতে হুকুম শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় হয়েছে। কেননা, এতে মিথ্যাকে لَاتَكْذِبُ এবং اَنْتَ لَا تَكْذِبُ-এর তুলনায় চরমভাবে না-বাচক করা হয়েছে, এর কারণ হচ্ছে اَنْتَ لَاتَكْذِبُ-এর মধ্যে ইসনাদ দু'বার হয়েছে। প্রথমবার সরাসরি لَا تَكْذِبُ-এর নিসবত হয়েছে انت (মুবতাদা)-এর দিকে, এরপর لَا تَكْذِبُ-এর সর্বনামের দিকে যার مرجع মূলত মুবতাদা। আমরা ইতঃপূর্বে বলে এসেছি যে, ইসনাদের তাকরার দ্বারা হুকুম শক্তিশালী হয়। আর তাই এখানে হুকুম শক্তিশালী হয়েছে। পক্ষান্তরে لَا تَكْذِبُ-এর মধ্যে ইসনাদের তাকরার হয়নি।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মুসান্নিফ (র.) হুকুম শক্তিশালী হওয়ার কারণ নির্ধারণ করেছেন ইসনাদের তাকরারকে। সে মতে যেসব স্থানে ইসনাদের তাকবার দ্বারা তাখসীস হয়েছে, সেখানে তো হুকুমও শক্তিশালী হয়েছে, অতএব মুসান্নিফ (র.) কর্তৃক এ দু'টির আলাদা দু'টি উদাহরণ দেওয়ার কি দরকার ছিল?

এর উত্তর হচ্ছে– কোনো বিষয় স্বতন্ত্রভাবে উদ্দেশ্য হওয়া এবং এমনিতে অর্জিত হওয়া এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। তাখসীসের মধ্যে হুকুম শক্তিশালী হয় বটে; কিন্তু তা মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নয়; বরং উদ্দেশ্যহীনভাবে হাসিল হয়। যেহেতু মূল লেখক মূল উদ্দেশ্য হিসেবে দু'প্রকার করেছেন এ হিসেবে দু'টি আলাদা প্রকার হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

قَوْلُهُ وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلٰى مِثَالِ : এ বাক্যের দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে যখন ফে'ল না-বাচক হয় তখন মুসনাদ ইলাইহের প্রথমোল্লেখ। তাখসীস এবং হুকুমকে শক্তিশালী করা উভয় অর্থ প্রদান করে থাকে। কিন্তু লেখক تَقْوِى حُكْم (হুকুম শক্তিশালী করা)-এর উদাহরণ দিলেন, কিন্তু তাখসীসের উদাহরণ দিলেন না কেন? এর উত্তর হচ্ছে– ইতঃপূর্বে তাখসীস এবং হুকুম শক্তিশালী করা উভয়ের উদাহরণ আলোচনায় গত হয়েছে। এ কারণে এর উদাহরণ উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু লেখক হুকুম শক্তিশালী করার উদাহরণটিকে মুসনাদ ইলাইহের

তাকিদের সাথে এর পার্থক্য উল্লেখ করার জন্য এনেছেন। এ কারণে তিনি বলেছেন اَنْتَ تَكْذِبُ-এর মধ্যে না-বাচক হওয়ার অর্থ لَاتَكْذِبُ اَنْتَ থেকে অনেক বেশি। যদিও لَاتَكْذِبُ اَنْتَ-এর মধ্যে اَنْتَ দ্বারা মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ আনা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে لَاتَكْذِبُ اَنْتَ-এর মধ্যে اَنْتَ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ ও ফায়েলের তাকিদ। মূলত মুসনাদ ইলাইহ হচ্ছে لَاتَكْذِبُ-এর মধ্যে সর্বনাম লুক্কায়িত আছে। এ তাকিদের উদ্দেশ্য হচ্ছে كِذْب-এর নিসবত মধ্যম পুরুষের সর্বনামের প্রতি ভুলক্রমে, অজ্ঞাতসারে এবং রূপকভাবে হয়নি; এ কথা প্রমাণ করা। এ উদাহরণে اَنْتَ শব্দটি হুকুমের তাকিদের জন্য নয়। হুকুমের তাকিদ হওয়ার জন্য ইসনাদের তাকরার হতে হয়। এখানে তো ইসনাদের বা হুকুমের তাকরার হয়নি। অতএব, لَاتَكْذِبُ اَنْتَ-এর মধ্যে হুকুমের তাকিদ হয়নি; বরং এতে مَحْكُوْم عَلَيْهِ-এর তাকিদ হয়েছে। আর হুকুমের তাকিদ مَحْكُوْم عَلَيْهِ (যার ব্যাপারে হুকুম দেওয়া হয়)-এর তাকিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অধিকতর শক্তিশালী। হুকুমের তাকিদ হলে এতে ইসনাদের তাকরার হয় আর ইসনাদের তাকরার হলে হুকুম শক্তিশালী হয়। পক্ষান্তরে যার ব্যাপারে হুকুম দেওয়া হয়, তার মধ্যে ইসনাদের তাকরার হয় না এবং এতে ইসনাদ একটি থাকে। مَحْكُوْم عَلَيْهِ-এর তাকরারে উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা এর রূপকার্থ হওয়া, ভুল হওয়া এবং অজ্ঞাতভাবে বলা– এসব সন্দেহ দূরীভূত হয়।

মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখকের বক্তব্য : وَقَدْ يَأْتِىْ لِلتَّخْصِيْصِ وَقَدْ يَأْتِىْ لِتَقْوِيَةٍ এমন অবস্থার সাথে খাস যখন ফে'লের নির্দিষ্টজ্ঞাপক উপরোক্ত হুকুম হবে না। অতএব, বুঝা গেল যে, উক্ত বিধান সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য নয়।

সার-সংক্ষেপ :

ক. কখনো মুসনাদ ইলাইহকে مُقَدَّمْ করা হয় শুধুমাত্র হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্য। এ ক্ষেত্রে তাখসীস-এর কোনো অর্থ পাওয়া যাবে না। যেমন– هُوَ يُعْطِى الْجَزْلَ

খ. যদি মুসনাদ ইলাইহকে مُقَدَّمْ করা হয় তারপর না-বাচকের হরফ যুক্ত ফে'ল আসে (فِعْل مَنْفِىْ আসে) তাহলে এই অগ্রবর্তীতা কখনো তাখসীসের অর্থ প্রদান করে অপর কখনো হুকুম শক্তিশালী করার অর্থ প্রদান করে। তাখসীরের উদাহরণ– ১. اَنْتَ مَا سَعَيْتَ فِىْ حَاجَتِىْ হুকুম শক্তিশালী করার উদাহরণ– ২. اَنْتَ لَا تَكْذِبُ

وَاِنْ بُنِيَ الْفِعْلُ عَلٰى مُنَكَّرٍ اَفَادَ التَّقْدِيْمُ تَخْصِيْصَ الْجِنْسِ اَوِ الْوَاحِدِ بِهٖ اَىْ بِالْفِعْلِ نَحْوُ رَجُلٌ جَاءَنِىْ اَىْ لَا اِمْرَأَةٌ فَيَكُوْنُ تَخْصِيْصَ جِنْسٍ اَوْ لَا رَجُلَانِ فَيَكُوْنُ تَخْصِيْصَ وَاحِدٍ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ اِسْمَ الْجِنْسِ حَامِلُ الْمَعْنَيَيْنِ اَلْجِنْسِيَّةِ وَالْعَدَدِ الْمُعَيَّنِ اَعْنِى الْوَاحِدَ اِنْ كَانَ مُفْرَدًا اَوِ الْاِثْنَيْنِ اِنْ كَانَ مُثَنًّى اَوِ الزَّائِدَ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ جَمْعًا فَاَصْلُ النَّكِرَةِ الْمُفْرَدَةِ اَنْ يَّكُوْنَ لِوَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسِ فَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ الْجِنْسُ فَقَطْ وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ الْوَاحِدُ فَقَطْ وَالَّذِىْ يُشْعِرُ بِهٖ كَلَامُ الشَّيْخِ فِىْ دَلَائِلِ الْاِعْجَازِ اَنْ لَافَرْقَ بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ فِىْ اَنَّ الْبِنَاءَ عَلَيْهِ قَدْ يَكُوْنُ لِلتَّخْصِيْصِ وَقَدْ يَكُوْنُ لِلتَّقَوِّىْ ـ

অনুবাদ : আর যদি ফে'লের ভিত্তি অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক বিশেষ্যের উপর হয়, তাহলে (মুসনাদ ইলাইহের) প্রথমে আসা ফে'ল এর দ্বারা তাখসীসুল জিনস অথবা তাখসীসে ওয়াহিদ-এর অর্থ দিবে, যেমন– আমার কাছে পুরুষ এসেছে অর্থাৎ মহিলা নয়– তাহলে এটা তাখসীসে জিনস হবে। **অথবা দু'জন পুরুষ নয়,** তাহলে তাখসীসে ওয়াহিদ। আর এটা এ কারণে যে, ইসমে জিনস এ দু'টি অর্থ ধারণ করে– জিনসের এবং নির্দিষ্ট সংখ্যার অর্থাৎ তা একক হলে এককের, দ্বিবচনের হলে দ্বিবচনের, অথবা এর চেয়ে বেশি যদি বহুবচন হয়, অনির্দিষ্ট এককের মূলার্থ জিনসের এককের জন্য। তাই কখনো এর দ্বারা জিনসের ইচ্ছা করা হয়। কখনো এর দ্বারা এককের অর্থ করা হয়। শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর বক্তব্য যে ইঙ্গিত বহন করে তা হচ্ছে ফে'লের ভিত্তি নির্দিষ্টজ্ঞাপক এবং অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক হওয়াতে কোনো পার্থক্য নেই। এগুলো কখনো তাখসীসের জন্য হবে আবার কখনো হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্য হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَاِنْ بُنِيَ الْفِعْلُ الخ : ইতঃপূর্বে মুসনাদ ইলাইহ অগ্রবর্তী করার আলোচনাতে এ কথা বলা হয়েছে যে, যদি মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্টজ্ঞাপক হয় ইসমে যাহির হোক অথবা সর্বনাম এবং মুসনাদ ইলাইহ না-বাচক অক্ষরের সাথে মিলিত না হয়। অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে হয়তো কোনো না-বাচক হরফ নেই অথবা থাকলেও তা মুসনাদ ইলাইহ থেকে বিচ্ছিন্ন, এসব অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহ আপন স্থান থেকে আগে আসার দ্বারা কখনো তাখসীসের অর্থ অর্জিত হয়, আবার কখনো হুকুম শক্তিশালী করা উদ্দেশ্য হয়। পূর্বের উদাহরণ দ্বারা এসব সুস্পষ্ট হয়েছে। যদি মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্টজ্ঞাপক হয়– চাই না-বাচকের অক্ষর মিলিত হয়ে আসুক অথবা মিলিত না হয়ে আসুক, উভয়াবস্থায় মুসনাদ ইলাইহের অগ্রবর্তী হওয়া তাখসীসের অর্থ দেবে। তাখসীস দু' প্রকার : ১. তাখসীসে জিনস, ২. তাখসীসে ওয়াহিদ। তাখসীসে জিনসের অর্থ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহকে জিনসের সাথে খাস করবে। ফলে অন্য জিনসের প্রকার এ থেকে বের হয়ে যাবে। যেমন– رَجُلٌ جَاءَنِىْ لَا اِمْرَأَةٌ অর্থাৎ আমার কাছে পুরুষ এসেছে মহিলা আসেনি। এখানে মুসনাদ ইলাইহ পুরুষ জাতির সাথে খাস। এমতাবস্থায় একজন, দু'জন অথবা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক এটা উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না। তাখসীসে ওয়াহিদ বলা হয়, মুসনাদ ইলাইহকে সংখ্যার সাথে খাস করা, যেমন– رَجُلٌ جَاءَنِىْ অর্থাৎ আমার কাছে একজন মাত্র পুরুষ এসেছে অর্থাৎ দুই বা দুই-এর অধিক আসেনি। এখানে আগমন করার কাজটি একজন ব্যক্তির নামে খাস করা হয়েছে– এখানে আগমনকারী পুরুষ নাকি মহিলা এ বলা উদ্দেশ্য নয়।

ইসমে জিনস দ্বারা দু' ধরনের তাখসীস উদ্দেশ্য হওয়ার কারণ হচ্ছে, ইসমে জিনসের মধ্যে দু'টি অর্থ রয়েছে- ১. জিনস বা ব্যক্তিগত সত্তা, ২. নির্দিষ্ট সংখ্যা সুতরাং ইসমে জিনস যদি একবচন হয়, তাহলে তাতে জিনস এবং এককের অর্থ বিদ্যমান থাকে। যদি দ্বিবচন হয়, তাহলে তাতে দুই এবং জিনসের অর্থ থাকে। যদি ইসমে জিনস বহুবচন হয়, তাহলে তাতে দুই-এর অধিক এবং জিনসের অর্থ থাকে। যেহেতু ইসমে জিনসটা জিনস (জাতি) এবং সংখ্যা উভয়ের অর্থের সম্ভাবনাপূর্ণ এমতাবস্থায় যদি ইসমে জিন্স দ্বারা জিনস উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সংখ্যার অর্থ বাদ পড়বে। যেমন- একবচনের উদাহরণ رَجُلٌ جَاءَنِيْ لَا اِمْرَأَةٌ (দ্বিবচনের উদাহরণ) رَجُلَانِ جَاءَنِيْ لَا اِمْرَأَتَانِ তাখসীসে জিনস উদ্দেশ্য তখনই হবে, যখন শ্রোতা ধারণা করবে (উদাহরণ স্বরূপ-) মহিলা এসেছে পুরুষ আসেনি অথবা যখন ধারণা করবে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে এসেছে। শ্রোতার প্রথম ধারণার সময় এটি قَصْرِ قَلْبٍ হবে আর শ্রোতার দ্বিতীয় ধারণার সময় এটি قَصْرِ اِفْرَادٍ হবে।

আর যদি বক্তা সংখ্যার তাখসীস করার ইচ্ছা করে তাহলে তাখসীসের দ্বারা সেই সংখ্যা না-বাচক হবে যা তাখসীসকৃত সংখ্যার বিপরীত। যেমন- একবচনের মধ্যে رَجُلٌ جَاءَنِيْ لَا اِثْنَانِ وَلَاجَمَاعَةٌ দ্বিবচনের উদাহরণের ক্ষেত্রে رَجُلَانِ جَاءَنِيْ لَا وَاحِدٌ وَلَا جَمَاعَةٌ এভাবে বাক্য তখনই বলা হবে যখন শ্রোতার ধারণা বক্তার ধারণার বিপরীত হবে। এখানেও শ্রোতার ধারণানুসারে এটা قَصْرِ قَلْبٍ এবং قَصْرِ اَفْرَادٍ উভয়টাই হতে পারে।

قَوْلُهُ فَاصَلُ النَّكِرَةِ الْمُفْرَدَةِ اَنْ يَكُوْنَ لِوَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) তার পূর্বের দাবি ইসমে জিনস জিনস (জাতি) এবং সংখ্যা উভয়ের অর্থ ধারণ করে এর পক্ষে দলিল দিচ্ছেন।

তিনি বলেন, نَكِرَةٌ مُفْرَدٌ বা একক অনির্দিষ্ট শব্দ যাকে ইসমে জিনস বলা হয়- এর মূলার্থ হচ্ছে তা জিনসের এককে ব্যবহার হয় এবং এতে জিনসের অর্থ লক্ষণীয় হয়। মোটকথা, ইসমে জিনস অনির্দিষ্ট একবচন হলে তা একক অর্থ এবং জাতি উভয়টি বুঝায়। কখনো এ দু অর্থ থেকে যে-কোনো একটি অর্থ যেমন জিনস উদ্দেশ্য করা হয় অন্যটির উদ্দেশ্য করা হয় না। আবার কখনো একবচনের অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়; কিন্তু জিনসের উদ্দেশ্য করা হয় না।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْ يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الشَّيْخِ الخ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ মূল লেখকের উপর আপত্তি করেছেন। মূল লেখক قَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ বলে, শায়খের মতামত তুলে ধরেছেন তার মাযহাব হিসেবে। এক পর্যায়ে এসে তিনি বলেন, যদি ফে'লের ভিত্তি অনির্দিষ্ট মুসনাদ ইলাইহের উপর হয় তাহলে তা কেবল তাখসীসের অর্থ প্রদান করে হুকুমের শক্তিশালী হওয়ার অর্থ প্রদান করে না। অথচ এটা শায়খের মাযহাব মতে সঠিক নয়। কেননা, শায়খের লিখিত দালাইলুল ই'জায গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ফে'লের ভিত্তি মুসনাদ ইলাইহের উপর হলে তা কখনো তাখসীসের অর্থ প্রদান করে আবার কখনো হুকুম শক্তিশালী করার অর্থ প্রদান করে মুসনাদ ইলাইহের নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট উভয় অবস্থায় এতে কোনো পার্থক্য নেই।

অতএব, মূল লেখক এ আলোচনায় শায়খের মাযহাব সঠিকভাবে বর্ণনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সার-সংক্ষেপ :

যদি মুসনাদ ইলাইহ نَكِرَةٌ হয় এবং এর পরবর্তী ফে'লের ভিত্তি উক্ত نَكِرَةٌ-এর উপর হয়, তাহলে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রবর্তী হওয়ার দ্বারা তাখসীস পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, তাখসীস দু' প্রকার- ১. تَخْصِيْصُ وَاحِدٍ ২. تَخْصِيْصُ الْفَرْدِ

تَخْصِيْصُ الْوَاحِدِ বলা হয় যাতে এক জিনসকে অন্য জিনসে থেকে খাস করা। যেমন- رَجُلٌ جَاءَنِيْ বলে اِمْرَأَةٌ থেকে খাস করা।

تَخْصِيْصُ الْفَرْدِ বলা হয়, কোনো সংখ্যাকে খাস করা। যেমন- رَجُلٌ جَاءَنِيْ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য মাত্র একজন লোক এসেছে, একাধিক লোক আসেনি।

মুসনাদ ইলাইহ نَكِرَةٌ যদি مُقَدَّمٌ হয়, তাহলে উভয় প্রকারের তাখসীসের অর্থ পাওয়া যায়। শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর মতে مَعْرِفَةٌ এবং نَكِرَةٌ মুসনাদ ইলাইহের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের تَقْدِيْم তাখসীস ও হুকুম শক্তিশালী করার অর্থ প্রদান করে।

وَ وَافَقَهُ اَىْ عَبْدَ الْقَاهِرِ السَّكَّاكِيُّ عَلٰى ذٰلِكَ اَىْ عَلٰى اَنَّ التَّقْدِيْمَ يُفِيْدُ التَّخْصِيْصَ لٰكِنْ خَالَفَهُ فِىْ شَرَائِطَ وَتَفَاصِيْلَ فَاِنَّ مَذْهَبَ الشَّيْخِ اَنَّهُ اِنْ وَلِىَ حَرْفَ النَّفْىِ فَهُوَ لِلتَّخْصِيْصِ قَطْعًا وَاِلَّا فَقَدْ يَكُوْنُ لِلتَّخْصِيْصِ وَقَدْ يَكُوْنُ لِلتَّقَوِّىْ مُضْمَرًا كَانَ اَوْ مُظْهَرًا مُعَرَّفًا اَوْ مُنَكَّرًا مُثْبَتًا كَانَ الْفِعْلُ اَوْ مَنْفِيًّا وَمَذْهَبُ السَّكَّاكِيِّ اَنَّهُ اِنْ كَانَ نَكِرَةً فَهُوَ لِلتَّخْصِيْصِ اِنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ وَاِنْ كَانَ مَعْرِفَةً فَاِنْ كَانَ مُظْهَرًا فَلَيْسَ اِلَّا لِلتَّقَوِّىْ وَاِنْ كَانَ مُضْمَرًا فَقَدْ يَكُوْنُ لِلتَّقَوِّىْ وَقَدْ يَكُوْنُ لِلتَّخْصِيْصِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ مَا يَلِىَ حَرْفَ النَّفْىِ وَغَيْرِهِ وَاِلٰى هٰذَا اَشَارَ بِقَوْلِهِ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ التَّقْدِيْمُ يُفِيْدُ الْاِخْتِصَاصَ اِنْ جَازَ تَقْدِيْرُ كَوْنِهِ اَىْ كَوْنِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فِى الْاَصْلِ مُؤَخَّرًا عَلٰى اَنَّهُ فَاعِلٌ مَعْنًى فَقَطْ لَا لَفْظًا نَحْوُ اَنَا قُمْتُ فَاِنَّهُ يَجُوْزُ اَنْ يُّقَدَّرَ اَنَّ اَصْلَهُ قُمْتُ اَنَا فَيَكُوْنُ اَنَا فَاعِلًا مَعْنًى تَاكِيْدًا لَفْظًا وَقُدِّرَ عَطْفٌ عَلٰى جَازَ يَعْنِىْ اَنَّ اِفَادَةَ التَّخْصِيْصِ مَشْرُوْطَةٌ بِشَرْطَيْنِ اَحَدُهُمَا جَوَازُ التَّقْدِيْرِ وَالْاٰخَرُ اَنْ يُّعْتَبَرَ ذٰلِكَ اَىْ يُقَدَّرُ اَنَّهُ كَانَ فِى الْاَصْلِ مُؤَخَّرًا ـ

অনুবাদ : সাক্কাকী (র.) শায়খ আব্দুল কাহিরের সাথে ঐকমত্য করেছেন এ ব্যাপারে অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের অগ্রবর্তী হওয়া তাখসীসের অর্থ প্রদান করে। তবে তিনি (সাক্কাকী) তাঁর সাথে শর্তসমূহ এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেন। শায়খের মতানুসারে যদি মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে মিলিত হয়ে আসে, তাহলে এটা নিশ্চিতভাবে তাখসীসের জন্য। অন্যথায় কখনো এটা তাখসীসের জন্য হয়, আবার কখনো হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্য হয়। সেটা সর্বনাম হোক অথবা ইসমে যাহির, নির্দিষ্ট হোক অথবা অনির্দিষ্ট (এমতাবস্থায়) ফে'ল হ্যাঁ-বাচক হোক অথবা না-বাচক। আর সাক্কাকীর মাযহাব হচ্ছে, যদি তা (অগ্রবর্তী বিশেষ্যটি) অনির্দিষ্ট হয়, তাহলে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তাখসীসের জন্য হবে। আর যদি নির্দিষ্ট ইসমে যাহির হয়, তাহলে শুধুমাত্র হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্য। আর যদি সর্বনাম হয় তাহলে কখনো তাখসীসের জন্য, কখনো হুকুম শক্তিশালী করার জন্য– না-বাচক হরফ মিলিত হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন (সামনের) এ উক্তি দ্বারা, তবে তিনি বলেছেন, মুসনাদ ইলাইহের অগ্রবর্তী হওয়া তাখসীসের অর্থ দেয়, যদি এটা স্বরে নেওয়া হয় যে, মুসনাদ ইলাইহ প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদ্বর্তী ছিল, এ হিসেবে যে, তা অর্থগতভাবে ফায়েল ছিল শাব্দিকভাবে নয়। যেমন– اَنَا قُمْتُ এ বাক্যটির ক্ষেত্রে এ কথা মেনে নেওয়া সম্ভব যে, এটি قُمْتُ اَنَا ছিল। অতএব, اَنَا এখানে অর্থগতভাবে ফায়েল শাব্দিক তাকিদ হিসেবে। قُدِّرَ এটি আত্ফ হয়েছে جَازَ-এর উপর। অর্থাৎ তাখসীসের অর্থ বুঝানো দু'টি শর্তের উপর নির্ভরশীল। এর একটি হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ পশ্চাদ্বর্তী ছিল এটা উহ্য মানা সম্ভব হওয়া এবং অপরটি হলো উহ্য মেনে নেওয়া যে, এটি আসলেই পশ্চাদ্বর্তী ছিল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَ وَافَقَهُ أَيْ عَبْدَ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখকের বক্তব্য হচ্ছে- আল্লামা সাক্কাকী মুসনাদ ইলাইহকে অগ্রবর্তী করার দ্বারা তাখসীসের অর্থ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে শায়খের সাথে একমত। তবে তাদের মধ্যে শর্তসমূহ এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণে পরস্পর মতবিরোধ রয়েছে।

শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর মতানুসারে মুসনাদ ইলাইহকে অগ্রবর্তী করার মোট নয়টি অবস্থা রয়েছে। এর ব্যাখ্যা এরূপ- মুসনাদ ইলাইহ (সাধারণভাবে) তিন প্রকার : ১. মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্ট। ২. মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট এবং প্রকাশ্য বিশেষ্য (সর্বনাম নয়)। ৩. মুসনাদ ইলাইহ সুনির্দিষ্ট এবং সর্বনাম। এ প্রত্যেকটি মুসনাদ ইলাইহের তিন অবস্থা। ক. মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে মিলিত হয়ে আসবে। অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ পরপরেই আসবে। খ. বাক্যের মধ্যে না-বাচকের হরফ থাকবেই না। গ. বাক্যে না-বাচকের হরফ থাকবে, তবে তা মুসনাদ ইলাইহের পরে, আগে নয়। এ তিন প্রকারকে পূর্বের তিন প্রকারের মাঝে গুণন করলে ($৩ \times ৩ = ৯$) নয় প্রকার হয়। অর্থাৎ

ক. মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্ট হলে তিন প্রকার।

খ. নির্দিষ্ট প্রকাশ্য বিশেষ্য হলে তিন প্রকার এবং

গ. নির্দিষ্ট হয়ে সর্বনাম হলে তিন প্রকার।

ক এর তিন প্রকারের ব্যাখ্যা এরূপ যে,

১. মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে মিলিত এবং অনির্দিষ্ট।

২. মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে মিলিত এবং নির্দিষ্ট প্রকাশ্য বিশেষ্য।

৩. মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে মিলিত এবং সর্বনাম। তিন অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহ অগ্রবর্তী হওয়ার দ্বারা শুধুমাত্র তাখসীসের অর্থ দিবে। এ ছাড়া বাকি ছয় প্রকার- (বাক্যের মধ্যে না-বাচকের হরফ নেই তিন প্রকার। না-বাচকের হরফ আছে তবে তা মুসনাদ ইলাইহের পরে এর তিন প্রকার)-এর মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ অগ্রবর্তী হওয়ার দ্বারা কখনো তাখসীসের অর্থ পাওয়া যায়, কখনো এর দ্বারা হুকুমকে শক্তিশালী করার অর্থ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে আল্লামা সাক্কাকীর মতানুসারে মুসনাদ ইলাইহ যদি অনির্দিষ্ট হয়, তাহলে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রবর্তী হওয়ার দ্বারা তাখসীসের অর্থ পাওয়া যাবে, তবে শর্ত হচ্ছে তাখসীস করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকতে হবে। যদি মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট এবং প্রকাশ্যে বিশেষ্য হয়, তাহলে তার অগ্রগামী হওয়ার দ্বারা শুধুমাত্র হুকুম শক্তিশালী হবে (তাখসীস নয়), এতে না-বাচকের হরফ থাকুক বা না থাকুক, যদি থাকে তাহলে আগে আসুক বা না আসুক, সর্ব অবস্থায় একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি মুসনাদ ইলাইহ সুনির্দিষ্ট সর্বনাম হয়, তাহলে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা কখনো তাখসীস আবার কখনো হুকুমকে শক্তিশালী করার অর্থ প্রদান করে। না-বাচকের হরফ বাক্যে মুসনাদ ইলাইহের আগে আসুক অথবা পরে আসুক- কিংবা বাক্যে না-বাচকের হরফ নাই থাকুক। এক কথায় আল্লামা সাক্কাকী তাখসীস ও হুকুম শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে না-বাচকের হরফকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। অথচ শায়খ একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

এ পর্যায়ে শায়েখ আব্দুল কাহির জুরজানী এবং সাক্কাকীর মতামত বিশ্লেষণ করার পর দেখা যাচ্ছে মাত্র তিন অবস্থায় শায়খ এবং সাক্কাকীর মাঝে মতৈক্য রয়েছে। অবশিষ্ট ছয় অবস্থায় তাদের মাঝে মতানৈক্য।

যে তিনটি প্রকারে তাদের মাঝে মতৈক্য- সেগুলো হচ্ছে-

১. মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্ট এবং না-বাচকের হরফের পরে এসেছে। এ অবস্থায় উভয়ের মতে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা শুধুমাত্র তাখসীসের অর্থ প্রদান করে।

২. মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট ও সর্বনাম এবং না-বাচকের হরফ তার পরে আসে।

৩. মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট সর্বনাম এবং বাক্যের মধ্যে কোনো না-বাচক হরফ না থাকে। এ (শেষ) দু' অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা উভয়ের মতে তাখসীস এবং হুকুমকে শক্তিশালী করার অর্থ প্রদান করে। এ ছাড়া অবশিষ্ট ছয় প্রকারের হুকুমের ক্ষেত্রে পরস্পরে মতবিরোধ বিদ্যমান।

উপরের আলোচনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুসনাদ ইলাইহের অগ্রবর্তী হওয়া তাখসীসের অর্থ প্রদান করে এ ব্যাপারে সাক্কাকী (র.) শায়খ আব্দুল কাহিরের সাথে মতৈক্যে পৌঁছলেও বিস্তারিত বিশ্লেষণে তাদের মাঝে অনেক ক্ষেত্রে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। শর্তারোপ করার ক্ষেত্রেও তাদের মাঝে ভিন্নমত রয়েছে। আল্লামা সাক্কাকীর মতে দু'টি শর্ত পাওয়া গেলে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা তাখসীসের অর্থ প্রদান করবে। তার এ দু'টি শর্তের প্রতি মূল লেখক ইঙ্গিত প্রদান করেছেন এই বাক্য দ্বারা।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ التَّقْدِيْمُ يُفِيْدُ الْاِخْتِصَاصَ : মর্মার্থ– সাক্কাকী বলেন, মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা তাখসীসের অর্থ প্রদানের জন্য দু'টি শর্তের উপর নির্ভরশীল।

শর্ত দু'টি হচ্ছে– ১. মুসনাদ ইলাইহ আসলে পশ্চাতে ছিল–এ কথা ধারণা করা সম্ভব হওয়া, এ হিসেবে যে, মুসনাদ ইলাইহ বাক্যের মুসনাদের (ফে'লের) অর্থগত ফায়েল হয়েছে। আর এ কারণেই এটা ফে'লের পরে এসেছে। অতঃপর এটাকে তাখসীসের উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

অর্থগত ফায়েল বলার কারণ, মুসনাদ ইলাইহ ফে'লের থেকে ভিন্নভাবে (ফায়েল ছাড়া) পরে আসলে তা ফায়েলের তাকিদ অথবা বদল হবে। আমরা জানি তাকিদ ও বদল অর্থগত ফায়েল হয়, এগুলো শাব্দিকভাবে ফায়েল নয়। যেমন– اَنَا قُمْتُ-এর মধ্যে একথা সম্ভব যে, তা মূলে قُمْتُ اَنَا ছিল। এ বাক্যের اَنَا সর্বনামটি শাব্দিকভাবে قُمْتُ-এর ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِل থেকে তাকিদ এবং তা অর্থগতভাবে ফায়েল। কেননা, اَنَا-এর সমার্থক ت ফায়েল। অতএব, اَنَا ও ফায়েল। তবে তা অর্থগতভাবে ফায়েল। এখানে শাব্দিকভাবে ফায়েল হচ্ছে– ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِل

২. মুসনাদ ইলাইহ পশ্চাতে ছিল, এটা ধরে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে মুসনাদ ইলাইহকে অগ্রবর্তী করা হয় এবং সেখানে এ কথা মেনেও নেওয়া হয়েছে যে, মুসনাদ ইলাইহ প্রকৃতপক্ষে অর্থগতভাবে হিসেবে পশ্চাতে ছিল, পরে তাকে তাখসীসের উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

মোটকথা, আল্লামা সাক্কাকীর মতে উক্ত উভয় প্রকারের শর্ত পাওয়া গেলে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামীতা তাখসীসের অর্থ প্রকাশ করবে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. আল্লামা আবূ ইউসুফ সাক্কাকী (র.) শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর সাথে এ ব্যাপারে একমত যে, মুসনাদ ইলাইহের مُقَدَّمْ হওয়া তাখসীসের অর্থ প্রদান করে। কিন্তু শর্তসমূহ এবং বিস্তারিত বর্ণনায় তাদের উভয়ের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

খ. মুসনাদ ইলাইহ প্রথমত তিন প্রকার– ১. মুসনাদ ইলাইহ نَكِرَةٌ বা অনির্দিষ্ট, ২. মুসনাদ ইলাইহ اِسْم مَعْرِفَةٌ ও ظَاهِرْ ৩. মুসনাদ ইলাইহ مَعْرِفَةٌ ও اِسْم ضَمِيْر। এ তিন প্রকারের প্রত্যেকটির তিন অবস্থা– ক. মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে মিলে আসবে, খ. বাক্যে না-বাচকের হরফ থাকবে না, গ. বাক্যে না-বাচকের হরফ মুসনাদ ইলাইহের পরে থাকবে।

যদি মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে মিলে আসে, তাহলে তিন অবস্থাতেই تَقْدِيْمُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ তাখসীসের অর্থ দিবে। বাকি ছয় অবস্থাতে تَقْدِيْم কখনো তাখসীসের কখনো হুকুমকে শক্তিশালী করার অর্থ প্রদান করবে।

উপরোক্ত নয় প্রকারের মধ্যে তিন প্রকারে সাক্কাকী (র.) এবং শায়খ জুরজানী (র.)-এর মতৈক্য পাওয়া যায়। বাকি ছয় প্রকারের হুকুমে তাদের মাঝে মতবিরোধ। প্রকাশ থাকে যে, আল্লামা সাক্কাকী (র.)-এর মতে তাখসীসের অর্থ প্রদানের জন্য দু'টি শর্ত পাওয়া যেতে হবে– ১. মুসনাদ ইলাইহকে পশ্চাদ্বর্তী করা সম্ভব হওয়া। ২. পশ্চাদ্বর্তী করার বিষয়টি পাওয়া যাওয়া।

وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطَانِ فَلَا يُفِيدُ التَّقْدِيمُ إِلَّا تَقَوِّيَ الْحُكْمِ سَوَاءٌ جَازَ تَقْدِيرُ التَّاخِيرِ كَمَا مَرَّ فِيْ أَنَا قُمْتُ أَوْ لَمْ يُقَدَّرْ أَوْ لَمْ يَجُزْ تَقْدِيرُ التَّاخِيرِ أَصْلًا نَحْوُ زَيْدٌ قَامَ فَإِنَّهُ لَايَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ أَنَّ أَصْلَهُ قَامَ زَيْدٌ فَقُدِّمَ لِمَا سَنَذْكُرُهُ وَلَمَّا كَانَ مُقْتَضَى هٰذَا الْكَلَامِ أَنْ لَا يَكُوْنَ نَحْوُ رَجُلٌ جَاءَنِيْ مُفِيدًا لِلتَّخْصِيصِ لِأَنَّهُ إِذَا أُخِّرَ فَهُوَ فَاعِلٌ لَفْظًا لَا مَعْنًى اِسْتَثْنَاهُ السَّكَّاكِيُّ وَأَخْرَجَهُ مِنْ هٰذَا الْحُكْمِ بِأَنْ جَعَلَهُ فِي الْأَصْلِ مُؤَخَّرًا عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ مَعْنًى لَا لَفْظًا بِأَنْ يَكُوْنَ بَدَلًا مِنَ الضَّمِيرِ الَّذِيْ هُوَ فَاعِلٌ لَفْظًا وَهٰذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَاسْتَثْنَى السَّكَّاكِيُّ الْمُنَكَّرَ بِجَعْلِهِ مِنْ بَابِ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبْدَالِ مِنَ الضَّمِيرِ يَعْنِيْ قُدِّرَ أَنَّ أَصْلَ رَجُلٌ جَاءَنِيْ جَاءَنِيْ رَجُلٌ عَلَى أَنَّ رَجُلًا لَيْسَ بِفَاعِلٍ بَلْ هُوَ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِيْ جَاءَنِيْ كَمَا ذُكِرَ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَنَّ الْوَاوَ فَاعِلٌ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بَدَلٌ مِنْهُ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ هٰذَا الْبَابِ لِئَلَّا يَنْتَفِيَ التَّخْصِيصُ إِذْ لَاسَبَبَ لَهُ أَيِ التَّخْصِيصِ سِوَاهُ أَيْ سِوَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مُؤَخَّرًا فِي الْأَصْلِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ مَعْنًى وَلَوْلَا أَنَّهُ مُخَصَّصٌ لَمَا صَحَّ وُقُوعُهُ مُبْتَدَأً ـ

অনুবাদ : অন্যথায় অর্থাৎ যদি দু'টি শর্ত না পাওয়া যায় **তাহলে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা শুধুমাত্র হুকুমকে শক্তিশালী করবে। চাই তার পশ্চাতে থাকা বৈধ ছিল, কিন্তু উহ্য মানা হয়নি,** যেমন أَنَا قُمْتُ-এর মধ্যে **অথবা মূলত পশ্চাতে ছিল, কিন্তু এটা উহ্য মানা বৈধই নয়,** যেমন زَيْدٌ قَامَ কেননা, এতে এটা উহ্য মানা বৈধই নয় যে, এর মূল قَامَ زَيْدٌ ছিল, এরপর একে অগ্রবর্তী করা হয়েছে, এর কারণ অচিরেই আমরা আলোচনা করবো।

যেহেতু উপরোক্ত আলোচনার দাবি মতে رَجُلٌ جَاءَنِيْ তাখসীসের অর্থ দিচ্ছে না। কেননা, যদি এটা (رَجُلٌ)-কে পশ্চাদ্বর্তী করা হয়, তাহলে এটি শাব্দিকভাবে ফায়েল হবে, অর্থগতভাবে নয়। (এ কারণে) সাক্কাকী (র.) এটাকে পৃথক করেছেন এবং উপরোক্ত হুকুম থেকে বের করেছেন। এভাবে যে, তিনি মূলে একে পশ্চাদ্বর্তী করেছেন অর্থগত ফায়েলরূপে– শাব্দিকভাবে নয়, অর্থাৎ এটা সর্বনাম (শাব্দিক ফায়েল) থেকে বদল হয়েছে। এটাই তার (সামনের) উক্তির ভাবার্থ, সাক্কাকী نَكِرَةٌ **পৃথক করেছেন– একে** وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا **জাতীয় গণ্য করে, অর্থাৎ সর্বনাম থেকে বদল হয়েছে দাবি করে।** অর্থাৎ رَجُلٌ جَاءَنِيْ-এর মূল جَاءَنِيْ رَجُلٌ মনে করা হবে এ হিসেবে যে, رَجُلٌ ফায়েল নয়; বরং جَاءَنِيْ-এর সর্বনাম থেকে বদল হয়েছে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا-এর মধ্যে যে وَاوْ হচ্ছে ফায়েলটির প্রকৃত ফায়েল, الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا-এর বদল (رَجُلٌ جَاءَنِيْ) একে তিনি وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, **যাতে এটি তাখসীসশূন্য না হয়। কেননা, এতে তাখসীসের অন্য কোনো সবব নেই,** অর্থাৎ মূলে অর্থগত ফায়েলরূপে পশ্চাদ্বর্তী ছিল– এটা ছাড়া (তাখসীসের সবব নেই)। আর যদি এতে তাখসীস না হয়, তাহলে এটা মুবতাদা হতে পারত না, (অথচ মুবতাদা হয়েছে, সুতরাং তাখসীসও হয়েছে)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الخ : ইতঃপূর্বে তাখসীসের জন্য আল্লামা সাক্কাকী যে দু'টি শর্তারোপ করেছেন সেটা না পাওয়া গেলে কি সমস্যা হয় সে সম্পর্কে এ ইবারতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মূল লেখক বলেন, যদি শর্ত দু'টি না পাওয়া যায় তাহলে অগ্রবর্তী করার নিয়ম দ্বারা শুধুমাত্র হুকুমকে শক্তিশালী করা যাবে– তাখসীস করা যাবে না। যেমন প্রথম শর্ত পাওয়া গেল, কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত পাওয়া গেল না। অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ পশ্চাতে ছিল এটা বলা তো সম্ভব, যেমন أَنَا قُمْتُ-এর উদাহরণে বলা সম্ভব যে, এটা قُمْتُ أَنَا ছিল। কিন্তু এ উদাহরণে আমরা মানছি না যে, এটি মূলে পশ্চাতেই ছিল।

তাহলে এখানে প্রথম শর্ত (পশ্চাতে উল্লিখিত হওয়া বৈধ) পাওয়া গেল, কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত (মূলে পশ্চাতে ছিল, এরপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে) পাওয়া গেল না। অথবা প্রথম শর্তই পাওয়া গেল না, অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ (মুবতাদা) ফে'লের পশ্চাতে থাকাই অবৈধ। যেমন– زَيْدٌ قَامَ-এর মধ্যে। এখানে زَيْدٌ অর্থগত ফায়েলরূপে পশ্চাতে ছিল, এটা বলা বৈধ নয়। কেননা, যদি বলা হয় زَيْدٌ قَامَ মূলে قَامَ زَيْدٌ ছিল, তাহলে زَيْدٌ তারকীবে قَامَ-এর শাব্দিক ফায়েল হচ্ছে, অর্থগত ফায়েল নয়। এমতাবস্থায় যদি বলা হয় যে, زَيْدٌ (শাব্দিক ফায়েল)-কে অগ্রবর্তী করা হয়েছে, তাহলে বলতে হয় শাব্দিক ফায়েলকে ফে'লের অগ্রবর্তী করা হয়েছে, আর শাব্দিক ফায়েলকে ফে'লের আগে আনা কোনো ক্রমেই বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ مُقْتَضَى هٰذَا الْكَلَامِ : এ বাক্য দ্বারা সাক্কাকীর মাযহাবের ব্যাপারে আপত্তি করা হচ্ছে। সাক্কাকী (র.) বলেছেন, দু'টি শর্ত একত্রে না পাওয়া গেলে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা শুধুমাত্র হুকুমকে শক্তিশালী করবে– তাখসীসের অর্থ দিবে না, সে মতে رَجُلٌ جَاءَنِيْ তাখসীসের অর্থ দিতে পারে না। কারণ, এতে প্রথম শর্তটি পাওয়া যায়নি। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এরূপ যে, رَجُلٌ جَاءَنِيْ-এর ব্যাপারে যদি বলা হয় এটি جَاءَنِيْ رَجُلٌ ছিল, তাহলে رَجُلٌ তারকীবে جَاءَ -এর শাব্দিক ফায়েল হচ্ছে। আর শাব্দিক ফায়েলকে ফে'লের আগে আনা অবৈধ। অতএব, رَجُلٌ جَاءَنِيْ মূলে جَاءَنِيْ رَجُلٌ ছিল না। দ্বিতীয়ত তাঁর মতে, অর্থগত ফায়েল তথা (বদল ও তাকিদ ইত্যাদি)-কে আগে আনার দ্বারাও তাখসীসের অর্থ পাওয়া যায়। এ বাক্যে رَجُلٌ যেহেতু অর্থগত ফায়েলরূপে অগ্রগামী হচ্ছে না, সেহেতু رَجُلٌ তাখসীসের অর্থ প্রদান করছে না। তাখসীসের অর্থ না দিলে একে মুবতাদা বানানো সহীহ হবে না।

সাক্কাকীর পক্ষে এ আপত্তিকর জবাবে মুসান্নিফ বলেন, এ উদাহরণটি উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম। যদিও উপরের বর্ণিত নিয়মানুসারে এতে তাখসীস হতে পারে না; বরং শুধুমাত্র হুকুম শক্তিশালী হয়। তিনি বলেন, এ উদাহরণে رَجُلٌ মূলে ফে'ল (جَاءَ)-এর পরেই ছিল এবং অর্থগত ফায়েল রূপেই, এভাবে যে, جَاءَ-এর মধ্যে যে সর্বনাম রয়েছে তা جَاءَ-এর শাব্দিক ফায়েল। আর رَجُلٌ সে সর্বনাম থেকে বদল হয়েছে। বদল অর্থগত ফায়েল। অতএব, رَجُلٌ বাক্যটিতে অর্থগত ফায়েল, আর অর্থগত ফায়েলের অগ্রবর্তীতা তাখসীস সৃষ্টি করে। সুতরাং رَجُلٌ-কে মুবতাদা বানানো বিশুদ্ধ হবে। এ ব্যাপারে মূল লেখকের বক্তব্য হলো– অনির্দিষ্ট মুসনাদ ইলাইহকে সাক্কাকী ইসতিছনা (ব্যতিক্রম) করেছেন এবং এ উদাহরণকে أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا-এর সমগোত্রীয় বলেছেন। أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا-এর তারকীব হচ্ছে أَسَرُّوْا-এর সর্বনাম وَاوْ হচ্ছে শাব্দিক ফায়েল, الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا হচ্ছে তার থেকে বদল جَاءَنِيْ رَجُلٌ ও এমনই, অর্থাৎ جاء-এর সর্বনাম ফায়েল এবং رَجُلٌ হচ্ছে তার বদল।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ هٰذَا الْبَابِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) সাক্কাকী (র.)-এর رَجُلٌ جَاءَنِيْ-কে নিয়মের ব্যতিক্রম বলা এবং একে أَسَرُّوا النَّجْوَى-এর সমগোত্রীয় বলার কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, رَجُلٌ جَاءَنِيْ জাতীয় উদাহরণকে أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا-এর সমগোত্রীয় বলার কারণ হচ্ছে– এর মধ্যে তাখসীস সৃষ্টি করা। কেননা, এখানে অর্থগত ফায়েল বলা এবং তাকে অগ্রবর্তী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া ছাড়া তাখসীস করার অন্য কোনো সুযোগ নেই। তাখসীস সৃষ্টি করার দরকার হচ্ছে এ জন্য যে, رَجُلٌ-কে মুসনাদ ইলাইহ এবং মুবতাদা যাতে বলা যায়। কারণ, তাখসীস হয়নি এমন (نَكِرَةٌ) অনির্দিষ্ট বিশেষ্যকে মুবতাদা বানানো শুদ্ধ নয়।

সার-সংক্ষেপ :

আল্লামা সাক্কাকী (র.)-এর যদি তাখসীস করার উভয় শর্ত না পাওয়া যায়, তাহলে تَقْدِيْم مُسْنَدْ إِلَيْهِ শুধুমাত্র হুকুমকে শক্তিশালী করবে। যেমন– زَيْدٌ قَامَ এ বাক্য দ্বারা তাখসীসের অর্থ পাওয়া যাবে না, এর দ্বারা হুকুম শক্তিশালী হবে মাত্র

رَجُلٌ جَاءَ-এর মধ্যে সাক্কাকী (র.) কর্তৃক উল্লিখিত শর্ত পাওয়া যায় না। তবুও তার মধ্যে কিভাবে তাখসীস হলো?

এর জবাবে তিনি বলেন, এ জাতীয় نَكِرَةٌ মুসনাদ ইলাইহ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا-এর মতো অর্থাৎ رَجُلٌ جَاءَ-এর বেলায়ও বলা হবে যে, এটি মূলে جَاءَنِيْ ছিল, তবে رَجُلٌ এখানে مَرْفُوْعٌ হয়েছে ফায়েলের بَدَلْ হিসেবে ফায়েল হিসেবে নয়।

بِخِلَافِ الْمُعَرَّفِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وُقُوعُهُ مُبْتَدأً مِنْ غَيْرِ اِعْتِبَارِ التَّخْصِيصِ فَلَزِمَ اِرْتِكَابُ هٰذَا الْوَجْهِ الْبَعِيدِ فِي الْمُنَكَّرِ دُونَ الْمُعَرَّفِ فَإِنْ قِيلَ فَيَلْزَمُهُ اِبْرَازُ الضَّمِيرِ فِي مِثْلِ جَاءَنِي رَجُلَانِ وَجَاءَنِي رِجَالٌ وَالْاِسْتِعْمَالُ بِخِلَافِهِ قُلْنَا لَيْسَ مُرَادُهُ اَنَّ الْمَرْفُوعَ فِي قَوْلِنَا جَاءَنِي رَجُلٌ بَدْلٌ لَا فَاعِلٌ فَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَقُولُ بِهِ عَاقِلٌ فَضْلًا عَنْ فَاضِلٍ بَلِ الْمُرَادُ اَنَّ فِي مِثْلِ قَوْلِنَا رِجَالٌ جَاءَنِي يُقَدَّرُ اَنَّ الْاَصْلَ جَاءَنِي رَجُلٌ عَلٰى اَنَّ رَجُلًا بَدْلٌ لَا فَاعِلٌ فَفِي مِثْلِ قَوْلِنَا رِجَالٌ جَاءُونِي يُقَدَّرُ اَنَّ الْاَصْلَ جَاءُونِي رِجَالٌ فَلْيَتَامَّلْ ـ

<u>অনুবাদ :</u> **নির্দিষ্ট বিশেষ্য বা مَعْرِفَةٌ তার বিপরীত,** তাতে তাখসীসের বিষয়টি গ্রহণ করা ছাড়াও এটি মুবতাদা হতে পারে। অতএব, এ দূরবর্তী ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হচ্ছে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যর মধ্যে, নির্দিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে নয়। যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে, এ মতানুসারে جَاءَنِي رَجُلَانِ এবং جَاءَنِي رِجَالٌ-এর মধ্যেও সর্বনামকে প্রকাশ্যে ব্যবহার করা জরুরি, অথচ সাধারণ ব্যবহাররীতি এর বিপরীত। উত্তরে আমরা বলি, তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, جَاءَنِي رَجُلٌ-এর পেশ বিশিষ্ট বিশেষ্যটি বদল হয়েছে, ফায়েল নয়, এ কথা তো সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি বলবে না। তবে সাক্কাকীর মতো পণ্ডিত ব্যক্তি কী করে বলবেন; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের رَجُلٌ جَاءَنِي জাতীয় উক্তি যে, এর মূল جَاءَنِي رَجُلٌ ছিল এটা ধরে নেওয়া হবে। এ হিসেবে যে, رَجُلٌ তারকীবে বদল হবে– শাব্দিক ফায়েল হবে না। সে মতে رِجَالٌ جَاءُونِي জাতীয় আমাদের উক্তি এর মূল جَاءُونِي رِجَالٌ ছিল ধরে নেওয়া হবে। সুতরাং আপনি ভেবে দেখুন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُعَرَّفِ الخ : মূল লেখক বলেন, নির্দিষ্ট বিশেষ্য বা مَعْرِفَةٌ তার বিপরীত। অর্থাৎ অনির্দিষ্ট বিশেষ্যর মধ্যে তাখসীসের জন্য যে দূরবর্তী ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে তার প্রয়োজন নেই। কেননা, এতে কোনো ধরনের তাখসীস ছাড়াই এটা মুবতাদা হতেই পারে।

قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ فَيَلْزَمُهُ اِبْرَازُ الضَّمِيرِ : এ ইবারত দ্বারা আল্লামা সাক্কাকীর মতের উপর একটি আপত্তি করা হচ্ছে। আপত্তিটি হচ্ছে, সাক্কাকীর মতানুসারে رَجُلٌ جَاءَنِي-এর মূল হচ্ছে جَاءَنِي رَجُلٌ-এর সর্বনামটি ফায়েল, رَجُلٌ উক্ত ফায়েল থেকে বদল হয়েছে। তার এ মতের ফলশ্রুতিতে আবশ্যক হয় যে, অনির্দিষ্ট (ফায়েল) যদি দ্বিবচন এবং বহুবচন হয়, তাহলে এর ফে'লের মধ্যেও (দ্বিবচন ও বহুবচনের) রূপান্তর হওয়া উচিত। যেমন– جَاءَ نِيَ رَجُلَانِ ও جَاءَنِي رِجَالٌ কিন্তু সাধারণ ব্যবহার তো আমরা এরূপ দেখি না। সাধারণ ব্যবহার হচ্ছে– جَاءَنِي رَجُلَانِ ও جَاءَنِي رِجَالٌ

এ আপত্তির জবাবে মুসান্নিফ বলেন, সাক্কাকী (র.)-এর উদ্দেশ্য এরূপ নয়, যা (আপত্তি আকারে) বর্ণনা করা হলো। তার উদ্দেশ্য এই নয় যে جَاءَنِي رَجُلٌ-এর মধ্যে مَرْفُوعٌ (পেশ বিশিষ্ট) অনির্দিষ্ট বিশেষ্য আসলেই বদল– ফায়েল নয়। جَاءَنِي رَجُلٌ-এর পেশ বিশিষ্ট শব্দটি ফায়েল নয়, এ কথা তো সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও বলে না। তাহলে সাক্কাকীর মতো মহাজ্ঞানী ব্যক্তি কি করে এ কথা বলতে পারেন? বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে رَجُلٌ جَاءَنِي-এর মধ্যে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যকে খাস করার জন্য এটা মনে করা হয়েছে যে, মূলে جَاءَنِي رَجُلٌ ছিল। এর মধ্যে رَجُلٌ বদল হয়েছে, আর جَاءَ-এর সর্বনাম ফায়েল হয়েছে।

আর এটা একটি প্রয়োজন পূরণের জন্য অসম্ভব বিষয়কে যেমন কখনো সম্ভব ধরে নেওয়া হয় ঠিক তেমনি। কেননা, যদি এমন মনে না করা হতো তাহলে رَجُلٌ-কে মুবতাদা বানানো শুদ্ধ হতো না। এরূপ ধরে নিয়ে تَقْدِيْمُ مَا حَقُّهُ التَّاخِيْرُ يُفِيْدُ الْحَصْرَ-এর নিয়মানুসারে এটিকে তাখসীস করা হয়েছে। অতঃপর তাকে মুবতাদা বানানো হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, رَجُلٌ শব্দটি শাব্দিক ফায়েল না বানিয়ে বদল বানানো হলো কেন?

এর উত্তর অবশ্য পাঠকগণ ইতঃপূর্বে পেয়েছেন যে, শাব্দিক ফায়েলকে তার ফে'লের অগ্রবর্তী করা বৈধ নয়। শুধুমাত্র অর্থগত ফায়েলের ক্ষেত্রেই তা করা যায়।

মোটকথা, رَجُلٌ جَاءَنِيْ-এর মধ্যে এটা মনে করা হয়েছে যে, এর মূল جَاءَنِيْ رَجُلٌ ছিল। رَجُلٌ তারকীবে বদল হয়েছে, ফায়েল নয়। ঠিক একই ধরনের তারকীব হবে رَجُلَانِ جَاءَنِيْ এবং رِجَالٌ جَاءُوْنِيْ-এর মধ্যেও।

এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, যেসব অবস্থায় অনির্দিষ্ট বিশেষ্যসমূহ শাব্দিকভাবে তারকীবে পরে এসেছে, সেগুলোতেও অনির্দিষ্ট বিশেষ্যগুলো বদল হয়েছে, ফায়েল হয়নি। কেননা, এসব ক্ষেত্রে ফায়েল হয়েছে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যসমূহই। আর নিয়মানুসারে ফায়েল যদি প্রকাশ্য বিশেষ্য হয়, তাহলে ফে'ল সব সময় একবচন হবে।

সার-সংক্ষেপ :

লেখক বলেন যে, رَجُلٌ جَاءَنِيْ-এর ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এটি মূলে جَاءَنِيْ رَجُلٌ ছিল এরূপ ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট (مَعْرِفَةٌ) মুসনাদ ইলাইহের ক্ষেত্রে করার প্রয়োজন নেই। কারণ, نَكِرَةٌ-এর ক্ষেত্রে এরূপ না করা হলে তাখসীসের অর্থ পাওয়া যেত না এবং نَكِرَةٌ মুবতাদা হওয়ার যোগ্যতা লাভ করত না। পক্ষান্তরে مَعْرِفَهْ এমনিই মুবতাদা হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, ফায়েল اِسْمُ ظَاهِرْ হলে ফে'ল সবসময় একবচন হয়। এ নীতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ বাক্য جَاءَنِيْ رِجَالٌ হবে جَاءُوْنِيْ رِجَالٌ হবে না।

ثُمَّ قَالَ السَّكَّاكِيُّ وَشَرْطُهُ اَىْ وَشَرْطُ جَعْلِ الْمُنَكَّرِ مِنْ هٰذَا الْبَابِ وَاعْتِبَارِ التَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ فِيْهِ اَنْ لَايَمْنَعَ مِنَ التَّخْصِيْصِ مَانِعٌ كَقَوْلِكَ رَجُلٌ جَاءَنِىْ عَلٰى مَا مَرَّ اَنَّ مَعْنَاهُ رَجُلٌ جَاءَنِىْ لَا اِمْرَأَةٌ اَوْ لَا رَجُلَانِ دُوْنَ قَوْلِهِمْ شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ فَاِنَّ فِيْهِ مَانِعًا مِنَ التَّخْصِيْصِ اَمَّا عَلَى التَّقْدِيْرِ الْاَوَّلِ يَعْنِىْ تَخْصِيْصَ الْجِنْسِ فَلِامْتِنَاعِ اَنْ يُّرَادَ الْمُهِرُّ شَرٌّ لَا خَيْرٌ لِاَنَّ الْمُهِرَّ لَايَكُوْنُ اِلَّا شَرًّا وَ اَمَّا عَلَى التَّقْدِيْرِ الثَّانِىْ يَعْنِىْ تَخْصِيْصَ الْوَاحِدِ فَلِنُبُوِّهٖ عَنْ مَظَانِّ اِسْتِعْمَالِهٖ اَىْ لِنُبُوِّ تَخْصِيْصِ الْوَاحِدِ عَنْ مَوَاضِعِ اِسْتِعْمَالِ هٰذَا الْكَلَامِ لِاَنَّهٗ لَا يُقْصَدُ بِهٖ اَنَّ الْمُهِرَّ شَرٌّ لَا شَرَّانِ وَهٰذَا ظَاهِرٌ وَاِذْ قَدْ صَرَّحَ الْاَئِمَّةُ بِتَخْصِيْصِهٖ حَيْثُ تَاَوَّلُوْهُ بِمَا اَهَرَّ ذَا نَابٍ اِلَّا شَرٌّ فَالْوَجْهُ اَىْ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ قَوْلِهِمْ بِتَخْصِيْصِهٖ وَبَيْنَ قَوْلِنَا بِالْمَانِعِ مِنَ التَّخْصِيْصِ تَفْظِيْعُ شَانِ الشَّرِّ بِتَنْكِيْرِهٖ اَىْ جَعْلُ التَّنْكِيْرِ لِلتَّعْظِيْمِ وَالتَّهْوِيْلِ لِيَكُوْنَ الْمَعْنٰى شَرٌّ عَظِيْمٌ فَظِيْعٌ اَهَرَّ ذَا نَابٍ لَا شَرٌّ حَقِيْرٌ فَيَكُوْنَ تَخْصِيْصًا نَوْعِيًّا وَالْمَانِعُ اِنَّمَا كَانَ مِنْ تَخْصِيْصِ الْجِنْسِ اَوِ الْوَاحِدِ ـ

অনুবাদ : **অতঃপর** সাক্কাকী **বলেন : এবং তার শর্ত** অর্থাৎ অনির্দিষ্ট বিশেষ্যকে এ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তিকরণের এবং অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্বর্তী করার শর্ত হচ্ছে **তাখসীসের ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকা। যেমন–** رَجُلٌ جَاءَنِىْ। **ইতঃপূর্বে আলোচনা গত হয়েছে যে,** এর অর্থ একজন পুরুষ এসেছে– একজন মহিলা কিংবা দু'জন পুরুষ আসেনি। **তবে তাদের উক্তি** شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ **নয়। কেননা, এতে তাখসীসের প্রতিবন্ধক রয়েছে। প্রথম অবস্থায়** অর্থাৎ তাখসীসে জিনসের ক্ষেত্রে **কুকুরকে সন্ত্রস্তকারী কেবল অনিষ্ট, কল্যাণকর কিছু নয়। এটা ইচ্ছা করা অসম্ভব হওয়ার কারণে।** কেননা, সন্ত্রস্তকারী কেবল অমঙ্গলই হয়ে থাকে। **আর দ্বিতীয় অবস্থায়** অর্থাৎ তাখসীসে ওয়াহিদ-এর ক্ষেত্রে **তা এ বাক্যের ব্যবহারের থেকে অনেক দূরবর্তী হওয়ার কারণে,** কেননা, (এ বাক্য দ্বারা) এটা উদ্দেশ্য করা হয় না যে, সন্ত্রস্তকারী শুধুমাত্র একটি অনিষ্ট, দু'টি অনিষ্ট নয়। বিষয়টি স্পষ্ট; **কিন্তু যখন নাহুর ইমামগণ-এর তাখসীসের বিষয়টি জোরালো ভাবে বলেছেন তখন তারা এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন** مَا اَهَرَّ ذَا نَابٍ اِلَّا شَرٌّ **দ্বারা। এমতাবস্থায়** উভয় মত তথা তাদের তাখসীসের মত এবং আমাদের মত তাখসীস হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক আছে। এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় করার পথ হচ্ছে এই যে, **অনির্দিষ্টতার অবস্থাকে বড় বিশাল ও মারাত্মক ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা,** যাতে অর্থ হয় যে, বিরাট ও ভয়াবহ অনিষ্ট কুকুরকে সন্ত্রস্ত করেছে সাধারণ অনিষ্ট নয়, তাহলে এটি বিশেষ প্রকারগত তাখসীস হলো। আর (তাখসীসের ব্যাপারে) যে প্রতিবন্ধকতা ছিল তা ছিল তাখসীসে জিনস এবং ওয়াহিদের ব্যাপারে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ ثُمَّ قَالَ السَّكَّاكِيُّ الخ : ইতঃপূর্বে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যকে তাখসীস করার জন্য দু'টি শর্তের উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে আরেকটি শর্ত যোগ করা হচ্ছে। সেই শর্তটি হচ্ছে, তাখসীস করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধক না থাকা। অতএব, আগের দু'টি শর্তের সাথে এ শর্তটি যুক্ত হয়ে মোট তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে তাখসীস হবে। ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা

হয়েছে যে, তাখসীস দু'প্রকার। তাখসীসে জিনস ও তাখসীসে ওয়াহিদ। যেমন- رَجُلٌ جَاءَنِيْ لَا رَجُلٌ جَاءَنِيْ দ্বারা যদি اِمْرَأَةٌ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটি তাখসীসে জিনস। আর যদি এর দ্বারা رَجُلٌ جَاءَنِيْ لَا رَجُلَانِ وَ رِجَالٌ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটি তাখসীসে ওয়াহিদ (একবচনকে খাস করা) হবে। সাধারণভাবে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে এ দু'ধরনের তাখসীস পাওয়া যায়। তবে তাখসীসের জন্য শর্ত হচ্ছে তাখসীসের ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকবে না। যেহেতু شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ-এর মধ্যে তাখসীসের বাধা আছে, তাই এতে তাখসীস হবে না। কেননা, এতে যদি তাখসীসে জিনস উদ্দেশ্য করা হয়, তাহলে বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে এরূপ شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ لَا خَيْرٌ অর্থাৎ কুকুরকে অনিষ্ট জাতীয় বিষয় সন্ত্রস্ত করেছে কল্যাণকর কিছু নয়। এ অনুবাদের সারকথা হচ্ছে এই যে, কুকুরকে সাধারণভাবে দু'টি বিষয় সন্ত্রস্ত করে- ১. অনিষ্ট জাতীয়, ২. কল্যাণকর বিষয়। অতঃপর বক্তা এখানে কল্যাণকর বিষয়কে নেতিবাচক করত শুধুমাত্র অকল্যাণকর বিষয়কে প্রমাণিত করেছেন। অথচ কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করায় অকল্যাণ, কল্যাণকর বিষয় কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করায় না। অতএব, কল্যাণকে না-বাচক করত অকল্যাণকে প্রমাণ করা যাচ্ছে না, যাতে এটা তাখসীসে জিনস হতে পারে।

আর যদি এর দ্বারা তাখসীসে ওয়াহিদ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে এরূপ شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ لَا شَرَّانِ অর্থাৎ একটি অনিষ্ট কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করিয়েছে, দু'টি অনিষ্ট নয়। এ অর্থটি আরবদের ব্যবহারের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আরবরা এ বাক্য দ্বারা এ অর্থ গ্রহণ করে না যে, একটি অনিষ্ট কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করিয়েছে, একাধিক নয়। যেহেতু এ ব্যাখ্যা আরবদের ব্যবহার দ্বারা সমর্থিত নয়। তাই এ বাক্য দ্বারা তাখসীসে ওয়াহিদও উদ্দেশ্য হবে না। মোট কথা, অর্থগত জটিলতার কারণে এ বাক্য দ্বারা তাখসীসে জিনস এবং তাখসীসে ওয়াহিদ কোনোটাই উদ্দেশ্য করা যাচ্ছে না।

قَوْلُهُ اِذْ قَدْ صَرَّحَ الْاَئِمَّةُ بِتَخْصِيْصِهِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে, আল্লামা সাক্কাকীর ব্যাখ্যানুসারে মনে হচ্ছে شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ-এর মধ্যে কোনো ধরনের তাখসীস হয়নি; অথচ নাহুবিদ সকলেই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, এতে অবশ্যই তাখসীস হয়েছে। তারা বলেন, এটি مَا اَهَرَّ ذَا نَابٍ اِلَّا شَرٌّ-এর অর্থে, আর এটা সকলেরই জানা যে, مَا এবং اِلَّا দ্বারা বাক্য গঠন করলে এতে তাখসীস সৃষ্টি হয়। অতএব, সাক্কাকী এবং নাহুবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে গেল।

এর উত্তর হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের মতের মধ্যে অমিল নেই। কেননা, আল্লামা সাক্কাকী তাখসীসে জিনস এবং তাখসীসে ওয়াহিদকে নেতিবাচক করেন, পক্ষান্তরে নাহুবিদগণ তাখসীসে নাওয়ী تَخْصِيْصُ نَوْعِيْ প্রমাণ করেন। নাহুবিদগণ বলেন, شَرٌّ শব্দটির তানবীন এবং অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার বিশালতা ও ভয়াবহতা প্রমাণ করে। বড়, বিশাল ও ভয়াবহ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকারগত তাখসীস হয়। অতএব, বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে এরূপ- شَرٌّ عَظِيْمٌ اَهَرَّ ذَا نَابٍ

সার-সংক্ষেপ :

এ ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে অগ্রবর্তী করার মাধ্যমে যে তাখসীস করা হয়, সে তাখসীস করার তৃতীয় শর্তটি এখানে বর্ণনা হচ্ছে। শর্তটি হলো, তাখসীস করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকা। যেমন- شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ-এর মধ্যে তাখসীসের প্রতিবন্ধক বিষয় রয়েছে। এ উদাহরণের মধ্যে তাখসীসে জিনস কিংবা তাখসীসে ফরদ কোনোটাই উদ্দেশ্য করা যায় না। যেহেতু شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ-এর মধ্যে তাখসীস হওয়ার ব্যাপারে নাহুবিদগণ একমত, তাই লেখক বলেন, এতে تَخْصِيْصُ نَوْعِيْ হয়েছে। সুতরাং এ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হবে شَرٌّ عَظِيْمٌ اَهَرَّ ذَا نَابٍ।

وَفِيْهِ اَىْ فِيْمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ السَّكَّاكِىُّ نَظَرٌ اِذِ الْفَاعِلُ اللَّفْظِىُّ وَالْمَعْنَوِىُّ كَالتَّاكِيْدِ وَالْبَدَلِ سَوَاءٌ فِىْ اِمْتِنَاعِ التَّقْدِيْمِ مَابَقِيَا عَلٰى حَالِهِمَا اَىْ مَادَامَ الْفَاعِلُ فَاعِلًا وَالتَّابِعُ تَابِعًا بَلْ اِمْتِنَاعُ تَقْدِيْمِ التَّابِعِ اَوْلٰى فَتَجْوِيْزُ تَقْدِيْمِ الْمَعْنَوِىْ دُوْنَ اللَّفْظِىْ تَحَكُّمٌ وَكَذَا تَجْوِيْزُ الْفَسْخِ فِى التَّابِعِ دُوْنَ الْفَاعِلِ تَحَكُّمٌ لِاَنَّ اِمْتِنَاعَ تَقْدِيْمِ الْفَاعِلِ اِنَّمَا هُوَ عِنْدَ كَوْنِهِ فَاعِلًا وَاِلَّا فَلَا اِمْتِنَاعَ فِىْ اَنْ يُّقَالَ فِىْ نَحْوِ زَيْدٌ قَامَ اَنَّهُ كَانَ فِى الْاَصْلِ قَامَ زَيْدٌ فَقُدِّمَ زَيْدٌ وَجُعِلَ مُبْتَدَأً كَمَا يُقَالُ فِىْ نَحْوِ جَرْدُ قَطِيْفَةٍ اَنَّ جَرْدًا كَانَ فِى الْاَصْلِ صِفَةً فَقُدِّمَ وَجُعِلَ مُضَافًا وَامْتِنَاعُ تَقْدِيْمِ التَّابِعِ حَالَ كَوْنِهِ تَابِعًا مِمَّا اَجْمَعَ عَلَيْهِ النُّحَاةُ اِلَّا فِى الْعَطْفِ فِىْ ضَرُوْرَةِ الشِّعْرِ فَمَنْعُ هٰذَا مُكَابَرَةٌ وَالْقَوْلُ بِاَنَّ فِىْ حَالَةِ تَقْدِيْمِ الْفَاعِلِ لِيُجْعَلَ مُبْتَدَأً يَلْزَمُ خُلُوُّ الْفِعْلِ عَنِ الْفَاعِلِ وَهُوَ مُحَالٌ بِخِلَافِ الْخُلُوِّ عَنِ التَّابِعِ فَاسِدٌ لِاَنَّ هٰذَا اِعْتِبَارٌ مَحْضٌ ـ

অনুবাদ : **এবং এতে** অর্থাৎ সাক্কাকীর মাযহাবে আপত্তি রয়েছে। **কেননা, শাব্দিক ফায়েল এবং অর্থগত ফায়েল** (যেমন তাকিদ ও বদল) **উভয়ে স্বীয় অবস্থায় থাকাকালে** অর্থাৎ ফায়েল যতক্ষণ ফায়েল থাকে এবং তাবে' যতক্ষণ তাবে' থাকে (উভয়ে) **অগ্রবর্তী করা নিষিদ্ধ হওয়াতে সমান**। বরং তাবে' অগ্রবর্তী হওয়াতে অবৈধতার মাত্রা বেশি, সুতরাং অর্থগত ফায়েলের অগ্রবর্তী হওয়াকে বৈধ বলা এবং শাব্দিক ফায়েলকে অবৈধ বলা এক ধরনের গোঁড়ামি। এমনিভাবে তাবে'-এর রূপান্তরকে বৈধ বলা এবং ফায়েলের ক্ষেত্রে অবৈধ বলা ও গোঁড়ামি। কেননা, ফায়েল অগ্রবর্তী হওয়ার অবৈধতা তো ফায়েল থাকাকালে, অন্যথায় زَيْدٌ قَامَ বলতে তো কোনো বাধা নেই। এ হিসেবে যে, তা (زَيْدٌ) পূর্বে قَامَ زَيْدٌ ছিল। অতঃপর زَيْدٌ-কে অগ্রবর্তী করে মুবতাদা বানানো হয়েছে, যেমনটি বলা হয়েছে جَرْدُ قَطِيْفَةٍ-এর মধ্যে যে, جَرْدٌ আসলে সিফাত ছিল, অতঃপর তাকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে এবং মুযাফ বানানো হয়েছে। আর তাবে' যতক্ষণ তাবে' থাকে– এর অগ্রবর্তী করার অবৈধতার ব্যাপারে নাহুবিদগণের ঐক্য রয়েছে। তবে কবিতার ছন্দমিলের স্বার্থে আত্ফের ক্ষেত্রটি ভিন্ন (এতে অগ্রবর্তী কর) বৈধ। অতএব, একে প্রমাণ ছাড়া অস্বীকার করা গোঁড়ামি। আবার এ কথা বলা যে, ফায়েলকে অগ্রবর্তী করত মুবাদাতা বানালে ফে'ল ফায়েলবিহীন হওয়া আবশ্যক হয়, অথচ এটা সম্ভব। কিন্তু তাবে'-এর বিষয়টি এমন নয়। এ কথাও ভ্রান্তিকর; বরং এটা মানসিক ব্যাপার।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَفِيْهِ اَىْ فِيْمَا الخ : উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখক আল্লামা সাক্কাকীর মাযহাবের উপর বেশ কয়েকটি আপত্তি তুলেছেন।

এক. অর্থগত ফায়েলকে অগ্রবর্তী করে এর দ্বারা তাখসীস করা বৈধ, শাব্দিক ফায়েলকে অগ্রবর্তী করে তাখসীস করা অবৈধ। এক কথায় অগ্রগামী করত তাখসীস করার ক্ষেত্রে শাব্দিক ফায়েল এবং অর্থগত ফায়েলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে– সাক্কাকী (র.)-এর এই বক্তব্য আপত্তিমুক্ত নয়।

দুই. তার মাযহাব হচ্ছে رَجُلٌ جَاءَنِيْ-এর মধ্যে رَجُلٌ পশ্চাদ্বর্তী ছিল, তাকে অগ্রবর্তী করতঃ তাখসীস সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে তাখসীস করার অন্য কোনো উপায় নেই। এ বক্তব্যও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

তিন. شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ-এর মধ্যে তাখসীসে জিনস হওয়া অসম্ভব। এটাও প্রশ্নমুক্ত নয়।

চার. ফায়েলকে তার সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব, কিন্তু তাবে'কে তার সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। তার সর্বশেষ এ কথাটিও সঠিক নয়।

উপরোক্ত ইবারতে বিষয়গুলো খণ্ডন করে তার বক্তব্য পেশ করেন। প্রথমত অর্থগত ফায়েল এবং শাব্দিক ফায়েল যতক্ষণ উভয়ে আপন অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ ফায়েল ফায়েল থাকা অবস্থায় এবং তাবে' তাবে' থাকা অবস্থায় এদের অগ্রবর্তী করা যাবে না। এমতাবস্থায় অগ্রবর্তী করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে উভয়ে সমান। যেমন– زَيْدٌ قَامَ-এর زَيْدٌ-কে যদি পশ্চাদ্বর্তী করা হয় এবং বলা হয় قَامَ زَيْدٌ তাহলে زَيْدٌ হবে ফায়েল। আর زَيْدٌ যতক্ষণ শাব্দিক ফায়েল থাকবে তাকে অগ্রবর্তী করা যাবে না। এমনিভাবে অর্থগত ফায়েল তথা তাকিদ ও বদল যতক্ষণ তাবে' থাকবে তাকে অগ্রবর্তী করা নিষিদ্ধ। তাকিদের উদাহরণ اَنَا قُمْتُ-এর মধ্যে যখন اَنَا পশ্চাদ্বর্তী করে قُمْتُ اَنَا বলা হবে, তখন اَنَا তারকীবে ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ مُتَّصِلٌ-এর তাকিদ হবে।

বদলের উদাহরণ رَجُلٌ جَاءَنِيْ-এর মধ্যে رَجُلٌ যখন পশ্চাদ্বর্তী হবে তখন সর্বনাম থেকে বদল হবে। তাকিদ এবং বদল হচ্ছে তাবে', আর তাবে' হচ্ছে অর্থগত ফায়েল। আর অর্থগত ফায়েলকে স্ব-অবস্থায় বহাল থাকা অবস্থায় অগ্রবর্তী করা শাব্দিক ফায়েলের মতোই নিষিদ্ধ। মুসান্নিফ বলেন, বরং অর্থগত ফায়েল অগ্রবর্তী করা বেশি খারাপ, অর্থাৎ শাব্দিক ফায়েলকে অগ্রবর্তী করলে যতটা সমস্যা সৃষ্টি হয় অর্থগত ফায়েলকে অগ্রবর্তী করলে এর চেয়ে বেশি সমস্যা হয়। সমস্যাগুলো নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

১. যদি তাবে'-কে ফে'লের অগ্রবর্তী করা হয় তাহলে দুদিক থেকে সমস্যা–

ক. তাবে' তার মাতবূ' (শাব্দিক ফায়েল)-এর পূর্বে ব্যবহৃত হচ্ছে, অথচ তাবে'-কে তার মাত্‌বূ'-এর আগে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

খ. তাবে'-কে এমন বিষয়ের অগ্রবর্তী করা হচ্ছে, যার উপর তার মাতবূ'কে অগ্রবর্তী করাও নিষিদ্ধ। অর্থাৎ ফে'লের অগ্রবর্তী করা হচ্ছে। ফে'লের পূর্বে তার ফায়েলের অগ্রবর্তী করা অবৈধ, এমতাবস্থায় ফায়েলের তাবে' যথা তাকিদ ও বদল ফে'লের আগে করা হচ্ছে, পক্ষান্তরে যদি শাব্দিক ফায়েলকে অগ্রবর্তী করা হয়, তাহলে একটি সমস্যা হয়। তা হচ্ছে ফায়েল তার আমেল– ফে'লের আগে আসছে। আর ফায়েল মা'মূল তার আমেলের অগ্রবর্তী হওয়া অবৈধ।

২. তাবে', যতক্ষণ তাবে' থাকে তাকে তার মাত্‌বূ'র অগ্রবর্তী করা সকলের ঐকমত্যে অবৈধ। অন্যদিকে কূফাবাসী কতিপয় আলেমের মতে শাব্দিক ফায়েলকে তার ফে'লের অগ্রবর্তী করা বৈধ। অর্থাৎ ফায়েলের অগ্রগামিতার নিষিদ্ধতা সর্বসম্মত নয়।

৩. ফায়েলকে যদি কর্তা হওয়ার অর্থ থেকে খালি করে অগ্রবর্তী করা হয়, তাহলে সর্বনাম তার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু তবে যদি অগ্রবর্তী করা হয় তাহলে তার কোনো স্থলাভিষিক্ত থাকে না। সারকথা হচ্ছে– মোট তিন কারণে অর্থগত ফায়েল তথা তাকিদ ও বদলকে অগ্রবর্তী করা শাব্দিক ফায়েলের চেয়ে বেশি সমস্যাপূর্ণ। যখন উভয় ফায়েলকে অগ্রগামী করা অবৈধ; বরং অর্থগত ফায়েলের অগ্রবর্তী হওয়া বেশি সমস্যাপূর্ণ। এমতাবস্থায় সাক্কাকী (র.)-এর শুধুমাত্র অর্থগত ফায়েলের অগ্রগামিতাকে বৈধতা দেওয়া এবং শাব্দিক ফায়েলের অগ্রগামিতাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা এক পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত।

قَوْلُهُ وَكَذَا تَجْوِيْزُ الْفَسْخِ এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) সাক্কাকী (র.)-এর একটি উত্তরকে খণ্ডন করছেন।

সাক্কাকী বলেন, শাব্দিক ফায়েল এবং অর্থগত ফায়েলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, আর যখন উভয়ের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান, এমতবস্থায় দু'টির দু'ধরনের হুকুম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। উভয়ের পার্থক্য সম্পর্কে তিনি বলেন, তাবে'-এর মধ্যে তাবে'-এর অর্থকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব, কিন্তু ফায়েলের মধ্যে ফায়েলকে তার অর্থ থেকে ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ফায়েল ফায়েল থাকা অবস্থায় ফে'লের আগে আসতে পারে না, কিন্তু তাবে'-এর বিষয়টি এমন নয়।

সাক্কাকী (র.)-এর এ উত্তরটি খণ্ডন করে মুসান্নিফ (র.) বলেন, শাব্দিক ফায়েলের মধ্যে পরিবর্তনকে বৈধ না বলা আর তাবে'-এর মধ্যে পরিবর্তনকে বৈধ বলাও একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত এবং প্রমাণ ছাড়া একটি বিষয়ের উপর হুকুম লাগানো। কেননা, সাধারণ রীতি অনুসারে উভয়ের মাঝে পরিবর্তন করা বৈধ। যেমন তাবে'-এর মধ্যে তেমনি শব্দগত ফায়েলের মধ্যে। কেননা, ফায়েলের অগ্রবর্তীতা তখনই নিষিদ্ধ, যখন তা ফায়েল থাকে। অন্যথায় যদি বলা হয় زَيْدٌ قَامَ-এর মধ্যে ফায়েল মূলে পশ্চাদ্বর্তী ছিল এবং ইবারত قَامَ زَيْدٌ ছিল অতঃপর যায়েদের থেকে ফায়েলের অর্থকে বিচ্ছিন্ন করে মুবতাদা বানানো হয়েছে আর قَامَ-এর সর্বনামকে বানানো হয়েছে قَامَ-এর ফায়েল, তাহলে এ প্রক্রিয়াকে কেউ অবৈধ বলবে না। যেমনটি جَرْدُ قَطِيْفَةٍ-এর মধ্যে হয়েছে। মূলে এটি ছিল قَطِيْفَةٌ جَرْدٌ (মাওসূফ এবং সিফাত) এতে جَرْدٌ হচ্ছে সিফাত। অতঃপর তা থেকে তাবে'-এর অর্থকে পৃথক করে তাকে অগ্রগামী করা হয়েছে এবং قَطِيْفَةٍ-এর মুযাফ বানানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَامْتِنَاعُ تَقْدِيْمِ التَّابِعِ : ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) সাক্কাকীর আরেকটি জবাবকে খণ্ডন করেছেন।

সাক্কাকী বলেন, আপনারা যে বললেন, শাব্দিক ফায়েলের মধ্যে অগ্রবর্তী হওয়া অবৈধ এবং অর্থগত ফায়েলের মধ্যেও আমার এ উক্তিটি সঠিক নয়; বরং একপেশে আমি তা মনে করি না। কারণ, তাবে'-কে স্বীয়রূপে বহাল রেখে তার মাতবূ'-এর আগে আনা বৈধ। যেমন- وَعَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ السَّلَامُ এ বাক্যটিতে رَحْمَةُ اللّٰهِ হলো মা'তূফ; এর মা'তূফ আলাইহ হচ্ছে اَلسَّلَامُ এখানে মা'তূফ তার মা'তূফ আলাইহের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। এ উদাহরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাবে'-কে স্বীয় অবস্থায় রেখে মাতবূ'-এর অগ্রবর্তী করা যায়। পক্ষান্তরে শব্দগত ফায়েলকে কখনো স্বীয় অবস্থায় বহাল রেখে তার ফে'ল (আমল)-এর অগ্রবর্তী করা যায় না। অতএব, আমার সিদ্ধান্তটিই সঠিক। মুসান্নিফ তার প্রতি উত্তরে বলেন, তাবে'-তাবে' থাকা অবস্থায় তাকে তার মাতবূ'-এর অগ্রবর্তী করা যায় না। এ কথায় সকল নাহুর ইমামগণ একমত, তবে সাক্কাকী যে কবিতা দিয়ে সর্বসম্মত রীতিকে ভাঙ্গার চেষ্টা করেছেন, এর জবাব হচ্ছে এটি কবিতার ছন্দ মিলের জন্য করা হয়েছে। অতএব, তাবে' স্বীয় অবস্থায় বহাল, তাকে অগ্রবর্তী করা যায় না, এ কথা অস্বীকার করা একঘেয়েমির শামিল। মোটকথা, শব্দগত ফায়েল এবং অর্থগত ফায়েল উভয়কে অগ্রবর্তী করা অনুচিত এবং সমান বিধি বহির্ভূত।

قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ بِاَنَّ فِىْ حَالَةِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ সাক্কাকীর পক্ষ থেকে করা আরেকটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। সাক্কাকী বলেন, আমাদের বর্ণিত শব্দগত ও অর্থগত ফায়েল সম্পর্কিত বক্তব্য যে, শব্দগত ফায়েলের অগ্রগামিতা অবৈধ এবং অর্থগত ফায়েলের ক্ষেত্রে বৈধ একে আপনাদের একপেশে বলা ঠিক হয়নি। কারণ, এ দু'টির মাঝে স্পষ্টত ব্যবধান রয়ে গেছে।

পার্থক্য হচ্ছে, শব্দগত ফায়েলকে তার অর্থ থেকে পৃথক করে অগ্রবর্তী করা হলে ফে'ল তার ফায়েল থেকে খালি হওয়া আবশ্যক হচ্ছে। অথচ ফায়েলবিহীন ফে'ল হওয়া অসম্ভব। পক্ষান্তরে তাবে'-কে তার স্বীয় অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে মাত্‌বূ' তাবে'বিহীন হয়ে যায়। আর মাতবূ' তাবে'বিহীন হলেও কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয় না। অতএব, উভয়ের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, তাই দু'টি বিষয়ের হুকুম দু'রকম হবে। সুতরাং অর্থগত ফায়েলের অগ্রবর্তী হওয়াকে বৈধ বলা এবং শব্দগত ফায়েলের অগ্রবর্তী হওয়াকে অবৈধ বলা প্রমাণ ছাড়া কথা হলো না এবং একপেশে সিদ্ধান্তও হলো না।

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, শব্দগত ফায়েলকে অগ্রবর্তী করলে ফে'ল ফায়েলবিহীন হওয়া আবশ্যক হয়, এটা একটা মানসিক সিদ্ধান্ত, প্রকৃতপক্ষে এমন হয় না। কেননা, যখন ফায়েলকে ফে'লের আগে আনা হয়, তখন ফে'লের মধ্যে অবস্থিত সর্বনাম তার ফায়েল হয়। যখন সর্বনাম ফায়েল হয়ে যাচ্ছে তখন তো ফে'ল ফায়েলবিহীন হলো না। আর যখন বিষয়টি এমনই তখন তো শব্দগত ফায়েল এবং অর্থগত ফায়েলের মধ্যে কোনো পার্থক্য রইল না। এমতাবস্থায় তাবে'-এর মধ্যে রূপান্তর করা শব্দগত ফায়েলের মতোই অবৈধ হবে। সুতরাং শব্দগত ফায়েলের যে হুকুম তাবে'-এরও সেই হুকুম। অতএব, একটার মধ্যে রূপান্তর বৈধ বলা আর অপরটার মধ্যে রূপান্তর অবৈধ বলা অনুচিত এবং একদেশপূর্ণ সিদ্ধান্ত। অথচ এ কাজটিই করেছেন সাক্কাকী (র.)।

ثُمَّ لاَنُسَلِّمُ اِنْتِفَاءَ التَّخْصِيْصِ فِيْ نَحْوِ رَجُلٌ جَاءَنِىْ لَوْلاَ تَقْدِيْرُ التَّقْدِيْمِ لِحُصُوْلِهِ اَىْ التَّخْصِيْصِ بِغَيْرِهِ اَىْ بِغَيْرِ تَقْدِيْرِ التَّقْدِيْمِ كَمَا ذَكَرَهُ السَّكَّاكِىُّ مِنَ التَّهْوِيْلِ وَغَيْرِهِ كَالتَّحْقِيْرِ وَالتَّنْكِيْرِ وَالتَّقْلِيْلِ وَالسَّكَّاكِىُّ وَاِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاَنْ لاَ سَبَبَ لِلتَّخْصِيْصِ سِوَاهُ لٰكِنْ لَزِمَ ذٰلِكَ مِنْ كَلاَمِهِ فِى الْمِفْتَاحِ حَيْثُ قَالَ اِنَّمَا يَرْتَكِبُ ذٰلِكَ الْوَجْهُ الْبَعِيْدُ فِى الْمُنَكَّرِ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْاِبْتِدَاءِ ثُمَّ لاَنُسَلِّمُ اِمْتِنَاعَ اَنْ يُرَادَ الْمُهِرَّ شَرٌّ لاَ خَيْرٌ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَاهِرِ قُدِّمَ شَرٌّ لِاَنَّ الْمَعْنٰى الَّذِىْ اَهَرَّ ذَا نَابٍ مِنْ جِنْسِ الشَّرِّ لاَ مِنْ جِنْسِ الْخَيْرِ ـ

অনুবাদ : অতঃপর আমরা رَجُلٌ جَاءَنِىْ জাতীয় উদাহরণের ক্ষেত্রে **উহ্য ইবারত মেনে না নিলে তাখসীস হয় না, এ দাবি সমর্থন করি না।** কেননা, উহ্য না মেনে নিলেও এখানে তাখসীস হতে পারে। **যেমন সাক্কাকী (র.) নিজেই বলেছেন** বিরাট তুচ্ছ সামান্য ইত্যাদি গুণের সাহায্যে তাখসীস হতে পারে। সাক্কাকী (এ ব্যাপারে) যদিও প্রকাশ্যে বলেননি, এটি ছাড়া তাখসীসের অন্য কোনো পন্থা নেই, তবুও এ (বিষয়)টি তার মিফতাহ গ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। তিনি সেখানে বলেন, নিশ্চয়ই এ জাতীয় দূরবর্তী ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে এতে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মাঝে মুবতাদা (বানানোর)-এর শর্ত না পাওয়া যাওয়ার কারণে। **এরপর আমরা এ কথাও মানতে প্রস্তুত নই যে,** مُهِرٌّ **শুধুমাত্র** شَرٌّ **হবে** خَيْرٌ **হবে না।** আর এটা (মেনে নেওয়া) কি করে সম্ভব? অথচ শায়খ আব্দুল কাহির বলেছেন, شَرٌّ-কে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। কেননা, বাক্যের অর্থ হচ্ছে অনিষ্ট জাতীয় বিষয় কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করিয়েছে, কল্যাণ জাতীয় কিছু নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ ثُمَّ لاَنُسَلِّمُ اِنْتِفَاءَ الخ : এ ইবারত পূর্বের ইবারতের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইতঃপূর্বে আল্লামা সাক্কাকী (র.)-এর উপর যে আপত্তি করা হয়েছিল এর সাথে এখানে আরো কয়েকটি আপত্তি করা হচ্ছে।

লেখক বলেন, رَجُلٌ جَاءَنِىْ-এর মধ্যে رَجُلٌ-কে পশ্চাদ্বর্তী করত অগ্রবর্তী করা ছাড়া তাখসীস করার আর কোনো পথ নেই। সাক্কাকীর এ কথা আমরা মেনে নিতে পারি না। কেননা, এ জাতীয় উদাহরণে উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়া অন্যভাবেও তাখসীস হতে পারে। যদি বলা হয় رَجُلٌ-এর তানবীন বিশালতা, ভয়াবহতা ও মহত্ত্ব কিংবা তুচ্ছ, নগণ্য ইত্যাদি অর্থ প্রদান করে, তাহলে এর দ্বারা تَخْصِيْصُ نَوْعِىْ হবে।

সাক্কাকী তার নিজ কিতাব 'মিফতাহ' এ شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ-এর ক্ষেত্রে এরূপ তাখসীসের কথাই বলেছেন। অর্থাৎ তিনি شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ-এর মধ্যে যে ধরনের তাখসীসের কথা বলেছেন, সে ধরনের তাখসীস এখানে (رَجُلٌ جَاءَنِىْ)-এর মধ্যেও হতে পারে।

অতএব, তার اِذْ لاَ سَبَبَ لَهُ سِوَاهُ কথাটি বলা ঠিক হয়নি, কেননা তার এ কথার অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে এ উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহ পশ্চাদ্বর্তী ছিল, অতঃপর তাকে অগ্রবর্তী করত তাখসীস করা হয়েছে এতে। এ ছাড়া তাখসীসের অন্য কোনো উপায় নেই।

وَاِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاَنْ لاَ سَبَبَ لِلتَّخْصِيْصِ : এ বাক্য দ্বারা সাক্কাকী (র.)-এর পক্ষ থেকে উত্থাপিত একটি আপত্তির জবাব দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্নটি হচ্ছে, সাক্কাকী (র.) তাঁর কিতাবের কোথাও বলেননি إِذْ لَاسَبَبَ لَهُ سِوَاهُ। এমতাবস্থায় তাঁর প্রতি এ উক্তিটি করা কি সঠিক হবে যে, তিনি এ কথা বলেছেন।

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাক্কাকী (র.) যদিও তাঁর কিতাবে হুবহু এ বাক্যটি বলেননি, কিন্তু তাঁর ইবরাত থেকে এ ধরনের অর্থ অনুধাবিত হয়। তাঁর ইবারত হচ্ছে– إِنَّمَا يُرْتَكَبُ ذٰلِكَ الْوَجْهُ الْبَعِيْدُ فِيْ الْمُنَكَّرِ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْاِبْتِدَاءِ অর্থ অনির্দিষ্ট মুসনাদ ইলাইহ (মুবতাদা)-এর মধ্যে এই দূরবর্তী প্রক্রিয়া (পশ্চাদ্বর্তী করত তাকে অগ্রবর্তী করা)-এর অবলম্বন এ জন্যই করা হয়েছে যে, এটা না করলে এর মুবতাদা হওয়ার শর্ত পাওয়া যেত না। অর্থাৎ তাখসীস হতো না, যে তাখসীসের সাহায্যে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য মুবতাদা হয়। অতএব, বলা যায় যে, সাক্কাকী যেন বলেছেন– إِذْ لَاسَبَبَ لَهُ سِوَاهُ।

মোটকথা, সাক্কাকীর এ ব্যক্তব্যের সাথে আরমা একমত নই, কেননা আমরা দেখছি যে, অনির্দিষ্ট বিশেষ্যর মধ্যে এ পদ্ধতি ছাড়াও তাখসীস হতে পারে।

সাক্কাকীর উপর উক্ত আপত্তির জবাবে অনেকে বলেন, সাক্কাকীর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ তাখসীস অর্থাৎ তাখসীসে জিনস এবং ওয়াহিদ। সব ধরনের তাখসীসকে তিনি না-বাচক করেননি। অতএব, তার উপর আপত্তি রইল না।

ثُمَّ لَا نُسَلِّمُ اِمْتِنَاعَ اَنْ يُّرَادَ الْمُهِرَّ : ইবারত দ্বারা লেখক সাক্কাকীর উপর আরেকটি আপত্তি তুলেছেন। আপত্তিটি হচ্ছে সাক্কাকী (র.) বলেছিলেন شر اهر ذا نابَ-এর মধ্যে তাখসীসে জিন্‌স এবং তাখসীসে ওয়াহিদ হয়নি। লেখক বলেন, তার এ দাবিটি সঠিক নয় এবং তার দাবির সাথে আমরা একমত নই। আমাদের মত হচ্ছে শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর মতো। শায়খ বলেন شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ-এর মধ্যে তাখসীসে জিনস হয়েছে, কেননা, তাঁর মতে বাক্যটির ব্যাখ্যা এরূপ شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ لَا خَيْرٌ অর্থ অনিষ্ট জাতীয় বিষয় কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করিয়েছে, কল্যাণসহ কিছু নয়। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখে থাকি, কুকুর যখন তার মনিব অথবা মনিবের প্রিয়জনকে দেখে তখনও ঘেউ ঘেউ করে, তার এই ঘেউ ঘেউ করার কারণ মোটেও অনিষ্ট জাতীয় কিছু নয়। পক্ষান্তরে কুকুর চোর-ডাকাত অথবা অন্য শত্রুকে দেখলেও ঘেউ ঘেউ করে। এর কারণ অবশ্যই অমঙ্গল। অতএব, কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করায় অনিষ্ট এবং ভালো উভয়টি। এ হিসেবে অনিষ্টকে প্রমাণ করে কল্যাণকে না-বাচক করা নিয়ম মোতাবেক সঠিক। একটি প্রমাণ করা, আরেকটি না-বাচক করার দ্বারা তাখসীসে জিন্‌স হয়, এখানেও তাই হয়েছে। অতএব, উল্লিখিত উদাহরণে তাখসীসে জিনস হয়, এখানেও তাই হয়েছে। অতএব, উল্লিখিত উদাহরণে তাখসীসে জিনস হওয়া সম্ভব। তাই সাক্কাকী কর্তৃক এর জিনসের তাখসীসকে না-বাচক করা ঠিক হয়নি।

ثُمَّ قَالَ السَّكَّاكِيْ وَيَقْرُبُ مِنْ قَبِيْلِ هُوَ قَامَ زَيْدٌ قَائِمٌ فِى التَّقَوِّىْ لِتَضَمُّنِهِ اَىْ لِتَضَمُّنِ قَائِمِ الضَّمِيْرَ مِثْلُ قَامَ فِيْهِ يَحْصُلُ لِلْحُكْمِ التَّقَوِّىْ وَشَبَّهَهُ اَىْ شَبَّهَ السَّكَّاكِيُّ مِثْلَ قَائِمِ الْمُتَضَمِّنِ لِلضَّمِيْرِ بِالْخَالِىْ عَنْهُ اَىْ عَنِ الضَّمِيْرِ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ تَغَيُّرِهِ فِى التَّكَلُّمِ وَالْخِطَابِ وَالْغَيْبَةِ نَحْوُ اَنَا قَائِمٌ وَاَنْتَ قَائِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ كَمَا لَا يَتَغَيَّرُ الْخَالِىْ عَنِ الضَّمِيْرِ نَحْوُ اَنَا رَجُلٌ وَهُوَ رَجُلٌ وَبِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ قَالَ يَقْرُبُ وَلَمْ يَقُلْ نَظِيْرُهُ وَفِىْ بَعْضِ النُّسَخِ وَشَبَهِهِ بِلَفْظِ الْاِسْمِ مَجْرُوْرًا عَطْفٌ عَلٰى تَضَمُّنِهِ يَعْنِىْ اَنَّ قَوْلَهُ يَقْرُبُ مُشْعِرٌ بِاَنَّ فِيْهِ شَيْئًا مِنَ التَّقَوِّىْ وَلَيْسَ مِثْلُ التَّقَوِّىْ فِىْ زَيْدٌ قَامَ فَالْاَوَّلُ لِتَضَمُّنِهِ الضَّمِيْرَ وَالثَّانِىْ لِشَبَهِهِ بِالْخَالِىْ عَنِ الضَّمِيْرِ وَلِهٰذَا اَىْ وَلِشَبَهِهِ بِالْخَالِىْ عَنِ الضَّمِيْرِ لَمْ يُحْكَمْ بِاَنَّهُ اَىْ مِثْلَ قَائِمٍ مَعَ الضَّمِيْرِ وَكَذَا مَعَ فَاعِلِهِ الظَّاهِرِ اَيْضًا جُمْلَةٌ وَلَا عُوْمِلَ قَائِمٌ مَعَ الضَّمِيْرِ مُعَامَلَتَهَا اَىْ مُعَامَلَةَ الْجُمْلَةِ فِى الْبِنَاءِ فِىْ مِثْلِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَ رَجُلًا قَائِمًا وَ رَجُلٍ قَائِمٍ ـ

<u>অনুবাদ :</u> অতঃপর সাক্কাকী (র.) **বলেন, হুকুমকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে** زَيْدٌ قَائِمٌ হচ্ছে هُوَ قَامَ-এর **কাছাকাছি।** কেননা, قَامَ একটি সর্বনামকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন قَائِمٌ করে থাকে। এতে হুকুমের মাঝে এক ধরনের শক্তি সৃষ্টি হয়। **আর তিনি** সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত قَائِمٌ-কে **তুলনা করেছেন সর্বনামহীন ইসমের-এর সাথে,** এ **হিসেবে যে, তা উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ** এবং নাম **পুরুষ কোনো ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হয় না।** যেমন– اَنْتَ قَائِمٌ، اَنَا قَائِمٌ এবং هُوَ قَائِمٌ এটা সর্বনামমুক্ত বিশেষ্যের মতো, যেমন– اَنَا رَجُلٌ، اَنْتَ رَجُلٌ ও هُوَ رَجُلٌ এ হিসেবেই তিনি বলেছেন "কাছাকাছি"। এর মতো বলেননি। কোনো কোনো সংস্করণে شَبَهِهِ (ফে'ল নয়) বিশেষ্য রূপে রয়েছে। যা যের যুক্ত হয়েছে تَضَمُّنِهِ-এর উপর আতফ হওয়ার কারণে, অর্থাৎ يَقْرُبُ শব্দটি এ বিষয়ের ইঙ্গিত প্রদান করে যে, এতে এক ধরনের হুকুম শক্তিশালী করার অর্থ রয়েছে। কিন্তু এটা زَيْدٌ قَامَ-এর মতো শক্তিশালী নয়। প্রথমত সর্বনামকে শামিল রাখার কারণে, আর দ্বিতীয়ত সর্বনামহীনের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াতে। **আর এ কারণে** অর্থাৎ সর্বনামহীন শব্দের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াতে **এতে হুকুম দেওয়া হবে না যে,** তা সর্বনামযুক্ত قَائِمٌ-এর মতো এবং এটি তার ফায়েলসহ পূর্ণবাক্য এটাও বলা হবে না। **সর্বনামযুক্ত** قَائِمٌ-**এর আচরণবিধি মাবনী হওয়ার বিবেচনায় পূর্ণবাক্যের মতো হবে না।** যেমন رَجُلٌ قَائِمٌ ও رَجُلًا قَائِمًا, رَجُلٍ قَائِمٍ

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ السَّكَّاكِيُّ الخ : লেখক বলেন, আল্লামা সাক্কাকী (র.) বলেছেন, হুকুম শক্তিশালী করার ব্যাপারে زَيْدٌ قَائِمٌ হচ্ছে هُوَ قَامَ-এর কাছাকাছি। কাছাকাছি হওয়ার অর্থ হচ্ছে هُوَ قَامَ-এর মধ্যে নিশ্চিতভাবেই হুকুম শক্তিশালী হয়েছে; কিন্তু زَيْدٌ قَائِمٌ-এর মধ্যে হুকুম শক্তিশালী না হওয়ার একটি দিক রয়েছে, তবে শক্তিশালী হওয়ারও দিক রয়েছে। যেহেতু উভয়ের মধ্যে ঠিক একই ধরনের হুকুম নয়, তাই একটি অপরটির মতো নয়। বিস্তারিত ব্যাখ্যা– আমরা দেখি هُوَ قَامَ-এর

মধ্যে ইসনাদের তাকরার হচ্ছে, এতে দণ্ডায়মান হওয়ার নিসবত প্রথমে هُوَ-এর দিকে করা হয়েছে, অতঃপর দণ্ডায়মান হওয়ার নিসবত قَامَ -এর মধ্যে অবস্থিত সর্বনামের দিকে হয়েছে। ইসনাদের তাকরার দ্বারা হুকুম শক্তিশালী হয়। সুতরাং هُوَ قَامَ-এর মধ্যে হুকুম শক্তিশালী হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত; কারণ এতে ইসনাদের তাকরার নিশ্চিতভাবে হয়েছে।

زَيْدٌ قَائِمٌ-এর মধ্যে ইসনাদের তাকরার নিশ্চিত নয়। এর কারণ হচ্ছে قَائِمٌ যদি ও قَامَ-এর মতো সর্বনাম কে অন্তর্ভুক্ত করে, তদুপরি এটি সর্বনামবিহীন সাধারণ বিশেষ্যের সাথেও সম্পর্ক রাখে। সাধারণ বিশেষ্য (اِسْمٌ جَامِدٌ) যেমনটি বক্তার অবস্থানভেদে বিভিন্ন রকম হয় না। যেমন উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে اَنَا رَجُلٌ মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে اَنْتَ رَجُلٌ ও নাম পুরুষের বেলায় هُوَ رَجُلٌ তেমনি قَامَ-এর বেলায় বক্তার অবস্থান ভেদে কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে اَنَا قَائِمٌ মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে اَنْتَ قَائِمٌ এবং নাম পুরুষের ক্ষেত্রে هُوَ قَائِمٌ। তিনটি উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, সাধারণ বিশেষ্যের মতো قَائِمٌও তিনটি অবস্থায় একই রকম হচ্ছে।

অতএব, এতে সর্বনাম অভ্যন্তরে আছে, বিধায় ইসনাদ দু'বার হয়েছে যেমন বলা যায়, তেমনি সাধারণ বিশেষ্যের মতো এতে ইসনাদ একবার হয়েছে এটাও বলা যায়।

এক কথায় زَيْدٌ قَائِمٌ-এর মধ্যে এক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসনাদে তাকরার হয়েছে, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ইসনাদে তাকবার হয়নি। অতএব, এ ব্যাপারে আমরা বলবো, এটি হুকুমকে শক্তিশালী করে, তবে এর বিপরীত বিষয়ের অর্থ এতে রয়েছে। আর এ কারণে মূল লেখক একে يَقْرُبُ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন এবং نَظِيْرٌ বা মতো বলেননি।

মুসান্নিফ বলেন, شَبَّهَهُ এটি ফে'লরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ সাক্কাকী এটিকে ইসমে জামিদের সাথে উপমা দিয়েছেন, কোনো সংস্করণে শব্দটি মাসদাররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন بَاءْ-এর উপর সাকিন হবে। মাসদার হলে এটি تَضَمُّنِهِ-এর মা'তূফ হিসেবে যের যুক্ত হবে।

তখন বাক্যের অর্থ হবে زَيْدٌ قَائِمٌ হুকুম শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে هُوَ قَامَ-এর মতো, এটি সর্বনামকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে। তবে নিশ্চিতভাবে হুকুম শক্তিশালী করে না সর্বনামযুক্ত ইসমে জামিদের সাথে সম্পর্ক রাখার ভিত্তিতে ইসমে যমীরের সাথে সাদৃশ্যের কারণে। এতে সর্বনাম নেই বলে গণ্য হবে। সর্বনাম না থাকলে ইসানদের তাকরার হবে না। আর ইসনাদের তাকরার না হলে হুকুম শক্তিশালী হবে না।

লেখক বলেন, قَائِمٌ জাতীয় শব্দ সর্বনামহীন সাধারণ বিশেষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে নাহুবিদগণ এটিকে جُمْلَةٌ বা পূর্ণ বাক্য হওয়ার অনুমোদন দেন না। তদ্রূপ قَائِمٌ اَبُوْهُ বাক্য হবে না। একই কারণে এটি জুমলার মতো মাবনীর আওতায় পড়বে না। আমরা দেখি, পেশের অবস্থায় এটি جَاءَنِىْ رَجُلٌ قَائِمٌ হচ্ছে। যবরের অবস্থায় رَاَيْتُ رَجُلًا قَائِمًا এবং যেরযুক্ত হলে مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قَائِمٍ।

وَمِمَّا يُرٰى تَقْدِيْمُهٗ اَىْ وَمِنَ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ الَّذِىْ يُرٰى تَقْدِيْمُهٗ عَلَى الْمُسْنَدِ كَاللَّازِمِ لَفْظُ مِثْلِ وَغَيْرِ اِذَا اسْتُعْمِلَا عَلٰى سَبِيْلِ الْكِنَايَةِ فِىْ مِثْلِ نَحْوُ مِثْلُكَ لَايَبْخَلُ وَغَيْرُكَ لَايَجُوْدُ بِمَعْنٰى اَنْتَ لَاتَبْخَلُ وَاَنْتَ تَجُوْدُ مِنْ غَيْرِ اِرَادَةِ تَعْرِيْضٍ لِغَيْرِ الْمُخَاطَبِ بِاَنْ يُّرَادَ بِالْمِثْلِ وَالْغَيْرِ اِنْسَانٌ اٰخَرُ مُمَاثِلٌ لِلْمُخَاطَبِ اَوْ غَيْرُ مُمَاثِلٍ بَلِ الْمُرَادُ نَفْىُ الْبُخْلِ عَنْهُ عَلٰى طَرِيْقِ الْكِنَايَةِ لِاَنَّهٗ اِذَا نُفِىَ الْبُخْلُ عَمَّنْ كَانَ عَلٰى صِفَتِهٖ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ اِلٰى مُمَاثِلٍ لَزِمَ نَفْيُهٗ عَنْهُ وَاِثْبَاتُ الْجُوْدِ لَهٗ بِنَفْيِهٖ عَنْ غَيْرِهٖ مَعَ اِقْتِضَائِهٖ مَحَلًّا يَقُوْمُ بِهٖ وَاِنَّمَا يُرَى التَّقْدِيْمُ فِىْ مِثْلِ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ كَاللَّازِمِ لِكَوْنِهٖ اَىْ لِكَوْنِ التَّقْدِيْمِ اَعْوَنَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِمَا اَىْ بِهٰذَيْنِ التَّرْكِيْبَيْنِ لِاَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُمَا اِثْبَاتُ الْحُكْمِ بِطَرِيْقِ الْكِنَايَةِ الَّتِىْ هِىَ اَبْلَغُ وَالتَّقْدِيْمُ لِاِفَادَةِ التَّقَوِّىْ اَعْوَنُ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَيْسَ مَعْنٰى قَوْلِهٖ كَاللَّازِمِ اَنَّهٗ قَدْ يُقَدَّمُ وَقَدْ لَايُقَدَّمُ بَلِ الْمُرَادُ اَنَّهٗ كَانَ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ اَنْ يَجُوْزَ التَّاخِيْرُ لٰكِنْ لَمْ يَرِدِ الْاِسْتِعْمَالُ اِلَّا عَلَى التَّقْدِيْمِ نَصَّ عَلَيْهِ فِىْ دَلَائِلِ الْاِعْجَازِ ـ

অনুবাদ : যে সকল স্থানে মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের আগে উল্লেখ করা জরুরি মনে করা হয় সেগুলো হচ্ছে– مِثْل এবং غَيْر শব্দদ্বয়। যখন উভয়টিকে ইঙ্গিতবহ রূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন– مِثْلُكَ لَايَبْخَلُ وَغَيْرُكَ لَايَجُوْدُ অর্থাৎ তোমার মতো লোক কৃপণতা করতে পারে না, তুমি ভিন্ন অন্য কেউ বদান্যতা করে না। এর অর্থ হচ্ছে তুমি মোটেও কৃপণতা করো না এবং তুমিই কেবল দান করো। এটা শ্রোতা ছাড়া অন্য কারো প্রতি ইঙ্গিত না দিয়ে যখন বলা হয়। অর্থাৎ এমন ইচ্ছা করা যে, مِثْل অথবা غَيْر দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ইচ্ছা করা, সে শ্রোতার সমকক্ষ হোক অথবা সমকক্ষ না হোক। আর উদ্দেশ্য হচ্ছে তার কৃপণতাকে অস্বীকার করা ইঙ্গিতের সাহায্যে। কেননা, যখন তার মতো গুণের অধিকারী ব্যক্তি থেকে অন্য কোনো সমকক্ষ ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত ছাড়া অস্বীকার করা হবে তখন এর দ্বারা তার থেকে কৃপণতা অস্বীকার হওয়া আবশ্যক হবে। আর দানশীলতা তার জন্য আবশ্যক হবে অন্য থেকে তা নেতিবাচক হওয়ার কারণে। কেননা, দানশীলতা এমন একটি স্থানকে চায় যা তার বাস্তবায়ন করবে। এসব অবস্থায় অগ্রগামিতাকে আবশ্যকের মতো মনে হয়। কেননা, অগ্রগামিতা এ দু'য়ের অর্থ বুঝানোর জন্য সহায়ক। কেননা, এদের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হুকুমকে ইঙ্গিতের সাথে প্রমাণ করা, যা স্পষ্ট বক্তব্যের তুলনায় বেশি বালাগাতপূর্ণ, আর হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্য এ ধরনের অগ্রবর্তিতা অধিক সহায়ক। তিনি এখানে আবশ্যকের মতো বলেছেন, এর অর্থ নয় যে, কখনো কখনো অগ্রগামী হয় আবার কখনো হয় না। আর এর অর্থ হচ্ছে যুক্তির আলোকে এটিকে পশ্চাদ্বর্তী করা বৈধ হওয়া উচিত, কিন্তু ব্যবহার কেবলমাত্র অগ্রবর্তীরূপে। বিষয়টি তিনি দালাইলুল ই'জাযে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَمِمَّا يُرٰى تَقْدِيْمُهٗ الخ : মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদের আগে মুসনাদ ইলাইহকে অগ্রবর্তী করা আবশ্যক হয় না, তবে আবশ্যকের মতো হয়, যেমন– مِثْلُ ও غَيْرُ শব্দদ্বয় যদি মুসনাদ ইলাইহ হয় এবং এগুলোকে ইঙ্গিতার্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে মুসনাদ ইলাইহকে আগে উল্লেখ করাই রীতি; যদিও তা আবশ্যক নয়।

এখানে মূল লেখক আবশ্যক বলেননি, বরং এটা আবশ্যকের মতো বলেছেন। এর কারণ হচ্ছে, নিয়ম-রীতি হিসেবে এখানে অগ্রবর্তী করা আবশ্যক নয়; কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে অগ্রবর্তী হিসেবে। ব্যবহারের কারণে এর পশ্চাদ্বর্তী হওয়ার বিষয়টি

মন মেনে নিতে পারে না। এ কারণে যদি কেউ বলে لَايَبْخَلُ مِثْلُكَ لَايَجُودُ غَيْرُكَ তাহলে তা মন মেনে নেবে না। এমনকি তা বালাগাতের আওতার বাইরে চলে যাবে।

মোটকথা, নিয়মানুসারে তার আগে উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক না হওয়াতে তিনি আবশ্যকের মতো বলেছেন।

উদাহরণ– ১. مِثْلُكَ لَايَبْخَلُ বা তোমার মতো লোক কৃপণ নয়। ২. غَيْرُكَ لَا يَجُوْدُ বা তুমি ছাড়া দানশীল নেই।

এ দু'টি উদাহরণের প্রথমটির অর্থ হচ্ছে তুমি কৃপণ নও, আর দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে তুমি দানশীল। উদাহরণ দু'টি থেকে ইঙ্গিতার্থ হিসেবে ঐ তরজমা করা হয়েছে। এ উদাহরণ দ্বারা অন্য কাউকে কটাক্ষ করা যদি উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে এ অর্থ হবে। আর যদি অন্য কাউকে কটাক্ষ করা হয়, তাহলে এগুলো কিনায়া হবে না, তবে অগ্রবর্তী হওয়া আবশ্যকের মতো যখন বলা হয়েছে তাহলে উক্ত কিনায়া অবশ্যই উদ্দেশ্য হবে।

পক্ষান্তরে যদি অন্য কাউকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে مِثْلُكَ لَايَبْخَلُ-এর উদ্দেশ্য হবে বিশেষ এক ব্যক্তি। তখন বাক্যের অর্থ হবে তোমার মতো ব্যক্তিটি কৃপণ নয়। এমনিভাবে غَيْرُكَ لَايَجُوْدُ-এর মধ্যে غَيْرُ দ্বারা বিশেষ এক ব্যক্তি উদ্দেশ্য হবে, তখন বাক্যের অর্থ হবে– তোমার চেয়ে ভিন্ন ব্যক্তিটি দানশীল নয়।

كِنَايَةٌ হলে বাক্যের ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, مِثْلُكَ لَايَبْخَلُ-এর মধ্যে তোমার মতো গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তি থেকে যখন কৃপণতাকে নফী করা হলো এবং সেই গুণাবলির অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যও করা হলো না; তাহলে এর দ্বারা এটা আবশ্যক হবে যে, শ্রোতা থেকেও কৃপণতার নফী হবে। এমতাবস্থায় শ্রোতার গুণাবলির লোকগুলো থেকে কৃপণতার নফী করা হচ্ছে مَلْزُوْمٌ আর لَازِمٌ হচ্ছে শ্রোতার কৃপণতাকে নফী করা। এখানে مَلْزُوْمٌ উল্লেখ করত لَازِمٌ-কে উদ্দেশ্য করা হচ্ছে। আর এটাকেই كِنَايَةٌ বলা হয়।

মোটকথা, এখানে শ্রোতার মতো গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তি থেকে কৃপণতাকে নফী করে এখানে শ্রোতা থেকে কৃপণকে নফী করা হয়েছে। অর্থাৎ مِثْلُكَ لَايَبْخَلُ বলে أَنْتَ لَاتَبْخَلُ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ غَيْرُكَ لَا يَجُوْدُ-এর মধ্যেও কিনায়া হয়েছে। এটা করা হয়েছে এভাবে যে, শ্রোতা ছাড়া অন্য সকল থেকে দানশীলতাকে নফী করা হয়েছে। এর ফলে শুধুমাত্র শ্রোতা দানশীল হবে। কেননা, দানশীলতা এমন একটি গুণ যা এমন একটি স্থানকে চায়, যার দ্বারা দানশীলতা প্রমাণিত হবে। সুতরাং যখন শ্রোতা ছাড়া অন্য সকল থেকে দানশীলতা নফী হলো, তাহলে দানশীলতা তার চাহিদানুসারে শ্রোতার জন্য প্রমাণিত হবে। অন্যথায় একটি গুণ তার সত্তা ছাড়া অস্তিত্ববান হওয়া আবশ্যক হয়। সারকথা হচ্ছে, এখানেও مَلْزُوْمٌ তথা শ্রোতা ছাড়া অন্যদের থেকে দানশীলতাকে নফী করা দ্বারা لَازِمٌ তথা শ্রোতার জন্য দানশীলতা প্রমাণ করা হচ্ছে। আর এভাবেই এটা কিনায়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا يُرَى التَّقْدِيْمُ فِىْ مِثْلِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ مِثْلُكَ لَايَبْخَلُ - غَيْرُكَ لَايَجُوْدُ বাক্য দ্বারা مِثْلُ এবং غَيْرُ-এর অগ্রগামিতা লাযিমের মত বলা হয়েছে। কেননা, তারকীবদ্বয়ের যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য অগ্রগামিতা ছাড়া অর্জিত হবে না। আমরা ইতঃপূর্বে বলে এসেছি যে, এতে কিনায়া উদ্দেশ্য مِثْلُكَ لَايَبْخَلُ দ্বারা শ্রোতা উদ্দেশ্য, এমনিভাবে غَيْرُكَ لَايَجُوْدُ দ্বারাও উদ্দেশ্য শ্রোতা। মোটকথা, কিনায়া অর্থ অবশ্যই অগ্রগামিতা দ্বারা অর্জিত হয়। আর এ জন্যই অগ্রগামিতা আবশ্যকের মতো। এখানে বলে রাখা দরকার যে, কায়েদা হচ্ছে اَلْكِنَايَةُ اَبْلَغُ مِنَ الصَّرِيْحِ (কিনায়া উদ্দিষ্ট অর্থ আদায়ে স্পষ্ট শব্দের চেয়ে বেশি কার্যকর)। এর কারণ হচ্ছে, কিনায়া এর বিষয়টি দলিলসহ প্রমাণিত হয়। আর صَرِيْح শব্দের মধ্যে বিষয়ের প্রমাণে দলিল থাকে না। যেমন– (কিনায়ার একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ হচ্ছে فُلَانٌ كَثِيْرُ الرَّمَادِ (অমুকের প্রচুর ছাই রয়েছে) এ বাক্য দ্বারা সে ব্যক্তির দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতা প্রমাণ করা হচ্ছে। কেননা, ঐ ব্যক্তির ঘরে বেশি ছাই থাকে যার ঘরে বেশি রান্না হয়। বেশি রান্নার কারণ হচ্ছে মেহমানের অধিক সমাগম, আর মেহমানের সমাগম সেখানেই বেশি হয় যেখানে অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি থাকে।

মোটকথা, উদ্দিষ্ট অর্থ হচ্ছে বদান্যতা ও অতিথিপরায়ণতা প্রমাণ করা। তা বাক্যের দ্বারা প্রমাণ হয় কেননা বাক্যটির অর্থ এরূপই فُلَانٌ كَرِيْمٌ لِاَنَّهُ كَثِيْرُ الرَّمَادِ । অতএব, দানশীলতার বিষয় প্রমাণিত হলো।

মোটকথা, যেহেতু কিনায়ার মধ্যে দলিলসহ অর্থ প্রমাণিত হয়, তাই তা স্পষ্ট বাক্যের চেয়ে বেশি কার্যকর। মুসান্নিফ বলেন, كَلَازِمٍ (আবশ্যকের মতো)-এর অর্থ এ নয় যে, কখনো এগুলো অগ্রবর্তী হয়, আবার কখনো পশ্চাদ্বর্তী হয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অগ্রবর্তী করার নিয়ম এখানে না থাকলেও ব্যবহারগতভাবে আবশ্যক। মুসান্নিফ (র.) বলেন, শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানী (র.) তার দালাইলুল ই'জায গ্রন্থে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

قِيْلَ وَقَدْ يُقَدَّمُ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ الْمُسَوَّرُ بِكُلِّ عَلَى الْمُسْنَدِ الْمَقْرُوْنِ بِحَرْفِ النَّفْيِ لِاَنَّهُ اَيْ اَلتَّقْدِيْمَ دَالٌّ عَلَى الْعُمُوْمِ اَيْ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ نَحْوُ كُلُّ اِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ فَاِنَّهُ يُفِيْدُ نَفْيَ الْقِيَامِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اَفْرَادِ الْاِنْسَانِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اُخِّرَ نَحْوُ لَمْ يَقُمْ كُلُّ اِنْسَانٍ فَاِنَّهُ يُفِيْدُهُ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ جُمْلَةِ الْاَفْرَادِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَالتَّقْدِيْمُ يُفِيْدُ عُمُوْمَ السَّلْبِ وَشُمُوْلَ النَّفْيِ وَالتَّاخِيْرُ لَايُفِيْدُ اِلَّا سَلْبَ الْعُمُوْمِ وَنَفْيَ الشُّمُوْلِ وَ ذٰلِكَ اَيْ كَوْنُ التَّقْدِيْمِ مُفِيْدًا لِلْعُمُوْمِ دُوْنَ التَّاخِيْرِ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَرْجِيْحُ التَّاكِيْدِ وَهُوَ اَنْ يَّكُوْنَ لَفْظُ كُلِّ لِتَقْرِيْرِ الْمَعْنَى الْحَاصِلِ قَبْلَهُ عَلَى التَّاسِيْسِ وَهُوَ اَنْ يَّكُوْنَ لِاِفَادَةِ مَعْنًى جَدِيْدٍ مَعَ اَنَّ التَّأْسِيْسَ رَاجِحٌ لِاَنَّ الْاِفَادَةَ خَيْرٌ مِنَ الْاِعَادَةِ ـ

অনুবাদ : **কেউ কেউ বলেন যে, كُلْ শব্দযুক্ত মুসনাদ ইলাইহকে** এমন মুসনাদের আগে আনা হয়, যা না-বাচকের হরফযুক্ত। **কেননা, অগ্রবর্তিতা ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করে।** অর্থাৎ প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুমকে নফী করার অর্থ দেয়। যেমন– كُلُّ اِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ (প্রত্যেক মানুষ দাঁড়ায়নি) এ বাক্যটি মানব সমাজের প্রত্যেকটি فَرْد থেকে দণ্ডায়মান হওয়াকে নফী করেছে। এর ব্যতিক্রম অর্থ হবে যদি كُلْ-কে পশ্চাদ্বর্তী করা হয়। যেমন– لَمْ يَقُمْ كُلُّ اِنْسَانٍ (সব মানুষ দাঁড়ায়নি) এ বাক্যটি মানবকুলের সমষ্টি থেকে দাঁড়ানোকে না-বাচক করার অর্থ দিয়েছে। অতএব, (كُلْ-এর) অগ্রগামিতার নফীটি ব্যাপক এবং সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ প্রদান করে। আর পশ্চাদ্বর্তিতা শুধুমাত্র ব্যাপকতাকে নফী করে এবং সকলে শামিল হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। আর এটা অর্থাৎ অগ্রগামিতা ব্যাপকতার অর্থ দেয়, কিন্তু পশ্চাদ্বর্তিতা দেয় না, যাতে তাকিদ এবং অর্থাৎ كُلْ শব্দটি তার আগে বাক্যের অর্থকে শক্তিশালী করার জন্য হওয়াকে প্রাধান্য দিতে হয় তাসীসের উপর। تَاسِيْس হচ্ছে শব্দটি একটি নতুন অর্থ দিবে, যা আগের অর্থের চেয়ে ভিন্ন। তা ছাড়া তাসীস হচ্ছে অগ্রগণ্য। কেননা, নতুন অর্থ পুরাতন অর্থের পুনরাবৃত্তি থেকে উত্তম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ قِيْلَ وَقَدْ يُقَدَّمُ الخ : এ ইবারতে বর্ণিত কয়েকটি পরিভাষা প্রথমে জেনে নেওয়া দরকার। মানতিক শাস্ত্রবিদগণের মতে سُوْر শব্দটি। اَفْرَادْ-এর সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানকারী। যেমন– كُلْ (সবাই) بَعْض (কতিপয়) ইত্যাদি। আর যে শব্দের সাথে এসব سُوْر সম্পৃক্ত হয়, তাকে مُسَوَّرْ বলা হয়।

سَلْب عُمُوْم-এর অর্থ সকলের থেকে কোনো কাজকে নফী করা হয়। عُمُوْمُ السَّلْب-এর অর্থ হচ্ছে اَفْرَادْ-এর মধ্য থেকে প্রত্যেক সদস্য থেকে কোনো কাজকে নফী করা। এক কথায় سَلْب عُمُوْم-এর মধ্যে প্রত্যেকটি সদস্য نَفِيْ হয় না। পক্ষান্তরে عُمُوْم سَلْب-এর মধ্যে প্রত্যেকটি সদস্য থেকে কাজকে নফী করা হয়।

تَاكِيْد বলা হয় কোনো শব্দকে এমন অর্থে গ্রহণ করা, যে অর্থ ইতঃপূর্বে অর্জিত হয়েছে।

আর تَاسِيْس বলা হয় কোনো শব্দ নতুন অর্থে গ্রহণ করা।

লেখক বলেন, ইবনুল মালিক সহ আরো কতিপয় লোকের মতে, দু'টি শর্ত পাওয়া গেলে মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা ওয়াজিব। ১. মুসনাদ ইলাইহের উপর যদি سُوْر হিসেবে كُلْ শব্দটি প্রবেশ করে। ২. মুসনাদে যদি حَرْف نَفِيْ থাকে, কোনো একটি শর্ত না পাওয়া গেলে এরূপভাবে আগে আনা হবে না।

আল্লামা দুসুকীর মতে, আরেকটি শর্ত হলো মুসনাদ ইলাইহ এমন হতে হবে যে, তাকে যদি পরে আনা হয় তাহলে এটি তারকীবে ফায়েল হবে। মোটকথা, এ তিনটি শর্ত যদি পাওয়া যায় এবং বক্তার উদ্দেশ্য যদি হয় নেতিবাচক, যা সকলের ক্ষেত্রে ব্যাপক হবে ও সবাইকে শামিল করবে, এমতাবস্থায় মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা আবশ্যক হবে। কেননা, যদি তাকে পরে আনা হয়, তাহলে বক্তার উদ্দেশ্য সাধন হবে না। উদাহরণস্বরূপ বক্তা যদি নেতিবাচক কথাকে ব্যাপক করতে চায় তাহলে মুসনাদ ইলাইহকে আগে এনে এভাবে বলবে كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ কোনো মানুষ দাঁড়ায়নি। এ বাক্যটি সমস্ত মানুষ থেকে দাঁড়ানোকে নফী করে। অতএব, দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপকভাবে নফী হলো। যদি উদ্দেশ্য আদায় করতে বক্তা মুসনাদ ইলাইহকে পরে আনে তাহলে উক্ত উদ্দেশ্য আদায় হবে না। যেমন, সে বলল لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ সব লোক দাঁড়ায়নি। এ বাক্যটি ব্যাপকতাকে নফী করেছে এবং দাঁড়ানোর মধ্যে সবার শামিল হওয়াকে নফী করেছে।

অতএব, যদি মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা হয়, তাহলে তার নফী সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করে বসে যে, উল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে এটি সকলের বেলায় নফী কেন হবে ? এমনিভাবে পরে আনা হলে তার নফী ব্যাপকতার ব্যাপারে হবে। তখন অর্থ হবে এই যে, সবাই আসেনি (কেউ হয়তো এসেছে, আবার কেউ হয়ত আসেনি)-এর উত্তর এই যে, যদি উল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও অগ্রবর্তীকে নেতিবাচকের ব্যাপকতার অর্থে এবং পশ্চাদ্বর্তীকে ব্যাপকতা না-বাচক অর্থে গ্রহণ না করা হয়, তাহলে تَأْكِيد-এর উপর تَأْسِيس অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক হচ্ছে। অথচ সর্বসম্মত মতে تَأْسِيس হচ্ছে তাকিদের চেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

وَبَيَانُ لُزُوْمِ تَرْجِيْحِ التَّاكِيْدِ عَلَى التَّأْسِيْسِ اَمَّا فِيْ صُوْرَةِ التَّقْدِيْمِ فَلِاَنَّ قَوْلَنَا اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ مُوْجِبَةٌ مُهْمَلَةٌ اَمَّا الْاِيْجَابُ فَلِاَنَّهُ حُكِمَ فِيْهَا بِثُبُوْتِ عَدَمِ الْقِيَامِ لِلْاِنْسَانِ لَابِنَفْيِ الْقِيَامِ عَنْهُ لِاَنَّ حَرْفَ السَّلْبِ وَقَعَ جُزْءًا مِنَ الْمَحْمُوْلِ وَاَمَّا الْاِهْمَالُ فَلِاَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى كَمِّيَّةِ اَفْرَادِ الْمَوْضُوْعِ مَعَ اَنَّ الْحُكْمَ فِيْهَا عَلَى مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْاِنْسَانُ وَاِذَا كَانَ اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ مُوْجِبَةً مُهْمَلَةً يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ نَفْيَ الْقِيَامِ عَنْ جُمْلَةِ الْاَفْرَادِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ لِاَنَّ الْمُوْجِبَةَ الْمُهْمَلَةَ الْمَعْدُوْلَةَ الْمَحْمُوْلَ فِيْ قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ عِنْدَ وُجُوْدِ الْمَوْضُوْعِ نَحْوُ لَمْ يَقُمْ بَعْضُ الْاِنْسَانِ بِمَعْنَى اَنَّهُمَا مُتَلَازِمَتَانِ فِي الصِّدْقِ لِاَنَّهُ قَدْ حُكِمَ فِي الْمُهْمَلَةِ بِنَفْيِ الْقِيَامِ عَمَّا صَدَقَ عَلَيْهِ الْاِنْسَانُ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ جَمِيْعَ الْاَفْرَادِ اَوْ بَعْضَهَا وَاَيًّامَا كَانَ يَصْدُقُ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنِ الْبَعْضِ وَكُلَّمَا صَدَقَ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنِ الْبَعْضِ صَدَقَ نَفْيُهُ عَمَّا صَدَقَ عَلَيْهِ الْاِنْسَانُ فِي الْجُمْلَةِ ـ

অনুবাদ : তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দান আবশ্যক হওয়ার ব্যাখ্যা। অগ্রবর্তী করার অবস্থায় আমাদের উক্তি اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ হচ্ছে مُوْجِبَةٌ مُهْمَلَةٌ এটি مُوْجِبَةٌ হওয়ার কারণ হচ্ছে এতে দণ্ডায়মান না হাওয়াকে মানুষের জন্য প্রমাণ করা হয়েছে। তার থেকে দণ্ডায়মান হওয়া না-বাচক করা হয়নি। কেননা, না-বাচকের অক্ষর এখানে খবরের অংশ হয়েছে। আর مُهْمَلَةٌ-এর কারণ হচ্ছে এ বাক্যে এমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি যা সদস্য সমূহের সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে। সেই সাথে এতে হুকুম করা হচ্ছে এমন বিষয়ে যাকে মানুষ বলা চলে। অতএব তার অর্থ সকল থেকে দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ না-বাচক হওয়াই বাঞ্ছনীয়, প্রত্যেকটি সদস্য থেকে নয়, কেননা مُوْجِبَةٌ مُهْمَلَةٌ مَعْدُوْلَةُ الْمَحْمُوْلِ তার মুসনাদ ইলাইহের অস্তিত্ব থাকা অবস্থায় سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ-এর হুকুমে। যেমন لَمْ يَقُمْ بَعْضُ الْاِنْسَانِ এ হিসেবে যে, প্রয়োগের দিক থেকে উভয়েই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কেননা, মুহমালার মধ্যে ঐ সকল সদস্য থেকে দাঁড়ানো না-বাচক হয়েছে, যাদের উপর 'মানুষ' কথাটি প্রয়োগ হয়– এখানে মানুষ কথাটি ব্যাপক– সব মানুষ হতে পারে আবার কতিপয় মানুষও হতে পারে, যাই উদ্দেশ্য হোক না কেন এতে কতিপয় লোকের থেকে নিশ্চিতভাবে দাঁড়ানো না-বাচক হচ্ছে। আর যখন কতিপয় লোক থেকে দাঁড়ানো না বাচক হলো– তাহলে মোটের উপর দাঁড়ানো না-বাচক হলো এসব সদস্যের ব্যাপারে, যাদের মানুষ বলে আখ্যায়িত করা যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَبَيَانُ لُزُوْمِ الخ **:** ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, যদি মুসনাদ ইলাইহের সাথে كل শব্দটি যুক্ত হয় এবং তার মুসনাদ না-বাচকের অক্ষরের সাথে মিলিত হয়ে আসে, তাহলে মুসনাদ ইলাইহ অগ্রবর্তিতা সকলের ক্ষেত্রে নেতিবাচক হুকুম প্রদান করে। এ অবস্থায় যদি সকলের ক্ষেত্রে না-বাচক প্রমাণ না হয়, তাহলে তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। অর্থাৎ তখন كل শব্দটি তাকিদের জন্য হবে তাসীসের জন্য হবে না। এর বিশদ বর্ণনা হচ্ছে এই যে, كل শব্দটি ছাড়া বাক্যটি হচ্ছে– اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ مُوْجِبَةٌ مُهْمَلَةٌ مَعْدُوْلَةُ الْمَحْمُوْلِ

موجبه হওয়ার কারণ হচ্ছে, এতে انسان (মুসনাদ ইলাইহ) সম্পর্কে عَدَمِ قِيَام (দণ্ডায়মান না হওয়া) প্রমাণ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, انسان থেকে দাঁড়ানোকে নফী করা হয়নি। এখানে না দাঁড়ানো সাবিত করা হয়েছে। বলার কারণ হচ্ছে لم (না-বাচক হরফ) এখানে মুসনাদ খবর-এর অংশ বিশেষ। আর যখন না-বাচক হরফ মুসনাদ অথবা মুসনাদ ইলাইহের অংশ হয়ে বসে তখন সেই বাক্যকে معدولة বলা হয়, যদি তা মুসনাদ (খবর)-এর অংশ হয় তাহলে তাকে مَعْدُوْلَةُ الْمَحْمُوْلِ বলা হয়, আর যদি তা মুবতাদার অংশ হয় তাহলে একে مَعْدُوْلَةُ الْمَوْضُوْعِ বলা হয়। আর নিয়ামানুসারে مَعْدُوْلَةُ الْمَوْضُوْعِ অথবা مَعْدُوْلَةُ الْمَحْمُوْلِ বাক্যসমূহ موجبة হয়ে থাকে, তবে যদি নিসবত না-বাচক করার জন্য আরেকটি না-বাচক হরফ আনা হয় তাহলে তা سالبة হতে পারে। অতঃপর বাক্যটিকে مهملة বলার কারণ হচ্ছে এতে কোনো سور বিদ্যমান নেই। যেসব বাক্যের মধ্যে سور যথা كل ও بعض ইত্যাদি শব্দ নেই সেসব বাক্যকে مهملة বলা হয়। سور সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, سور বলা হয় এমন শব্দকে, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের افراد-এর পরিমাণ ও সংখ্যার ব্যাপারে ইঙ্গিত প্রদান করে। সে মতে اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ হচ্ছে مهملة যেহেতু এতে سور নেই।

মোটকথা اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ-এর মধ্যে مُوْجِبَة, مُهْمَلَة ও مَعْدُوْلَةُ الْمَحْمُوْلِ সবগুলো বিষয় পাওয়া গেল। অতএব, বাক্যের অর্থ হবে সব মানুষ দাঁড়ায়নি। এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকটি মানুষ দাঁড়ায়নি। কাজেই এ বাক্য দ্বারা সকলের দণ্ডায়মান না হওয়া প্রমাণিত হলো প্রত্যেকের নয়।

فَهِيَ فِيْ قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنِ الْجُمْلَةِ لِاَنَّ صِدْقَ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمَوْجُوْدِ الْمَوْضُوْعِ إِمَّا بِنَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ اَوْ بِنَفْيِهٖ عَنِ الْبَعْضِ مَعَ ثُبُوْتِهٖ لِلْبَعْضِ وَاَيًّامَّا كَانَ يَلْزَمُهَا نَفْيُ الْحُكْمِ عَنْ جُمْلَةِ الْاَفْرَادِ دُوْنَ كُلِّ فَرْدٍ لِجَوَازِ اَنْ يَكُوْنَ مَنْفِيًّا عَنِ الْبَعْضِ ثَابِتًا لِلْبَعْضِ الْاٰخَرِ وَاِذَا كَانَ اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ بِدُوْنِ كُلِّ مَعْنَاهُ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنْ جُمْلَةِ الْاَفْرَادِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَلَوْ كَانَ بَعْدَ دُخُوْلِ كُلِّ اَيْضًا مَعْنَاهُ كَذٰلِكَ كَانَ كُلٌّ لِتَاكِيْدِ الْمَعْنَى الْاَوَّلِ فَيَجِبُ اَنْ يُحْمَلَ عَلٰى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ لِيَكُوْنَ كُلٌّ لِتَاسِيْسِ مَعْنًى اٰخَرَ تَرْجِيْحًا لِلتَّاسِيْسِ عَلَى التَّاكِيْدِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> এটা (مُوْجِبَة مُهْمَلَة) سَالِبَة جُزْئِيَّة-এর অর্থে, **যা সকলের থেকে হুকুম নফী করা আবশ্যক করে।** سَالِبَة جُزْئِيَّة যার প্রয়োগ প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম নফী করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে অথবা কতককে নফী করা হবে, অবশিষ্ট কতকের জন্য হুকুম প্রমাণ করা হবে। সারকথা হচ্ছে, কতিপয় লোক থেকে হুকুম নফী করা হচ্ছে, প্রত্যেক সদস্য থেকে নয়। এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, কতকের জন্য নফী হবে আর কতকের জন্য প্রমাণিত হবে। অতএব, اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ বাক্যটি كل ছাড়া এর অর্থ 'সকলের দণ্ডায়মান না হওয়া' প্রমাণ হলো, প্রত্যেকের থেকে নয়। যদি كل যুক্ত হওয়ার পরও অর্থ তেমনি থাকে, তাহলে كل প্রথম অর্থের তাকিদের জন্য হলো।

অতএব, এর অর্থ প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম নফী করা ওয়াজিব, যাতে كل তাসীসের জন্য হয়– তাকিদের জন্য নয়। তাসীসকে তাকিদের উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ فَهِيَ فِيْ قُوَّةِ السَّالِبَةِ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নিফ مُوْجِبَة مُهْمَلَة-এর যে তরজমা করেছিলেন তার দলিল পেশ করছেন। তিনি বলেন, مُوْجِبَة مُهْمَلَة مَعْدُوْلَةُ الْمَحْمُوْل-এর মুসনাদ ইলাইহ وجودى বা অস্তিত্বশীল হলে তা سَالِبَة جُزْئِيَّة-এর হুকুমে হয়। অর্থাৎ اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ বাক্যটি لَمْ يَقُمْ بَعْضُ الْاِنْسَانِ-এর হুকুমে হয়ে যায়। এর কারণ হচ্ছে مُوْجِبَة مُهْمَلَة লাযিম করে سَالِبَة جُزْئِيَّة-কে। লাযিম করার অর্থ হচ্ছে একটি পাওয়া গেলে অপরটিও পাওয়া যায়, একটির অস্তিত্ব অপরটির অস্তিত্বকে আবশ্যক করে। এর কারণ হচ্ছে اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ-এর মধ্যে দণ্ডায়মান না হাওয়া মানুষের সদস্যদের মধ্য হতে হয়েছে, এটা সব সদস্য থেকেও হতে পারে আবার কতিপয় সদস্যদের থেকেও হতে পারে। এ উভয় সম্ভাবনার মধ্য থেকে যে কোনো একটি হোক না কেন এটা নিশ্চিত যে, কতিপয় লোক দাঁড়ায়নি। অতএব, مهملة-এর দ্বারা কতিপয় লোকের দণ্ডায়মান না হওয়া প্রমাণিত হলো। এর ফলে সবাই দাঁড়ায়নি এটাও প্রমাণিত হলো। কারণ, কতিপয় বাদ পড়লে সকলের দ্বারা তো কাজ হলো না।

উক্ত বর্ণনানুসারে مهملة মিলে যাচ্ছে سَالِبَة جُزْئِيَّة-এর সাথে। কারণ, سَالِبَة جُزْئِيَّةও সবার দ্বারা সংশ্লিষ্ট হুকুম না হওয়াকে প্রমাণ করে। প্রত্যেক থেকে না-বাচক করে না।

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, سَالِبَة جُزْئِيَّة-এর প্রয়োগ দু'ভাবে হতে পারে–

১. প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম নফী করা অবস্থায়। কেননা, প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম নফী করা হলে কতিপয় সদস্য থেকে হুকুম নফী করা হলো। আর কতিপয় সদস্য থেকে হুকুম নফী হওয়াকে سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ বলা হয়।

২. কতিপয় সদস্য থেকে হুকুম নফী করা হবে। আর কতিপয় সদস্যের জন্য হুকুম সাবিত হবে। এতেও কতিপয় সদস্য থেকে হুকুম নফী হওয়ার দ্বারা سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ পাওয়া গেল। (এটা দ্বিতীয় প্রয়োগ)

উভয় অবস্থায় سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ পাওয়া গেল যার দ্বারা এটা প্রমাণ হলো যে, মুবতাদার সদস্যদের সকল থেকে হুকুম নফী হবে– প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম না-বাচক হবে না। ইতঃপূর্বে مهملة-এর আলোচনায় এ বক্তব্যই প্রমাণিত হয়েছিল। অতএব, سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ এবং مهملة পরস্পরকে লাযেম করে। মোটকথা হচ্ছে, إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ-এর অর্থ সকলে দাঁড়ায়নি আর এটা প্রত্যেক সদস্যের না দাঁড়ানোর অর্থ দেয় না।

এখন যদি كل যুক্ত হওয়ার পর সেই অর্থই থাকে, তাহলে كل পূর্বের অর্থের তাকিদের জন্য হলো, তাসীসের জন্য হলো না। অতএব, كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ-এর অর্থ হবে প্রত্যেকটি মানুষ দাঁড়ায়নি। এ অর্থ না করে যদি বলা হয় সবাই দাঁড়ায়নি, তাহলে كل তাকিদের জন্য হলো। সুতরাং তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য না দেওয়ার জন্য كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ-এর অর্থ হবে কোনো মানুষ দাঁড়ায়নি।

وَأَمَّا فِي صُوْرَةِ التَّاخِيْرِ فَلِأَنَّ قَوْلَنَا لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ سَالِبَةٌ مُهْمَلَةٌ لَاسُوْرَ فِيْهَا وَالسَّالِبَةُ الْمُهْمَلَةُ فِيْ قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلنَّفْيِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ نَحْوُ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِقَائِمٍ وَلَمَّا كَانَ هٰذَا مُخَالِفًا لِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّ الْمُهْمَلَةَ فِيْ قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ لِوُرُوْدِ مَوْضُوْعِهَا أَيْ مَوْضُوْعِ الْمُهْمَلَةِ فِيْ سِيَاقِ النَّفْيِ حَالَ كَوْنِهِ نَكِرَةً غَيْرَ مُصَدَّرَةٍ بِلَفْظِ كُلٍّ فَإِنَّهُ يُفِيْدُ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ وَإِذَا كَانَ لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ بِدُوْنِ كُلٍّ مَعْنَاهُ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَلَوْ كَانَ بَعْدَ دُخُوْلِ كُلٍّ أَيْضًا كَذٰلِكَ كَانَ كُلٌّ لِتَاكِيْدِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى نَفْيِ الْقِيَامِ عَنْ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ لِيَكُوْنَ كُلٌّ لِتَاسِيْسِ مَعْنًى اٰخَرَ وَ ذٰلِكَ لِأَنَّ لَفْظَةَ كُلٍّ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ لَايُفِيْدُ إِلَّا أَحَدَ هٰذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ فَعِنْدَ إِنْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا يَثْبُتُ الْاٰخَرُ ضَرُوْرَةً فَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّقْدِيْمَ بِدُوْنِ كُلٍّ لِسَلْبِ الْعُمُوْمِ وَنَفْيِ الشُّمُوْلِ وَالتَّاخِيْرَ لِعُمُوْمِ السَّلْبِ وَشُمُوْلِ النَّفْيِ فَبَعْدَ دُخُوْلِ كُلٍّ يَجِبُ أَنْ يُعْكَسَ هٰذَا لِيَكُوْنَ كُلٌّ لِلتَّاسِيْسِ الرَّاجِحِ لَا لِلتَّاكِيْدِ الْمَرْجُوْحِ -

অনুবাদ : আর পরে আনার অবস্থায় আমাদের উক্তি لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ হচ্ছে سَالِبَةٌ مُهْمَلَةٌ এতে কোনো سُوْر নেই, **আর নিয়মানুসারে** مُهْمَلَةٌ سَالِبَةٌ **হচ্ছে** سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ-**এর অর্থে যা প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুমকে নফী করে।** যেমন- لَاشَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِقَائِمٍ যখন এটি তাদের কাছে প্রচলিত ধারণানুযায়ী مُهْمَلَةٌ হচ্ছে جُزْئِيَّةٌ-এর হুকুমের বিপরীত, তাই তিনি তার বক্তব্যে সেটা বর্ণনা করছেন **মুহমালার মুসনাদ ইলাইহটি না-বাচকের অধীনে আসার কারণে,** এমতাবস্থায় যে, তা অনির্দিষ্ট হুকুমকে না-বাচক করে। অতএব, যখন كل ছাড়া لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ-এর অর্থ প্রত্যেকটি সদস্য থেকে দণ্ডায়মান হওয়াকে নফী করা, তখন كل প্রবেশের পর যদি এই অর্থ বহাল থাকে, তাহলে كل প্রথম অর্থকে তাকিদ করল। অতএব সকল থেকে নফী করা অর্থ গ্রহণ করা ওয়াজিব, যাতে كل আরেকটি নতুন অর্থকে সৃষ্টি করে। কেননা, এস্থানে كل দু'টি অর্থের যে কোনো একটির সম্ভাবনা রাখে। **একটি না-বাচক** হলে অবশ্যম্ভাবীভাবে আরেকটি প্রমাণিত হবে। সারকথা **হচ্ছে,** كل ছাড়া মুসনাদ ইলাইহ আগে আসা সমষ্টিকে নফী করা এবং সকলের অন্তর্ভুক্তকরণকে না-বাচক করা। আর পরে আসার দ্বারা প্রত্যেক সদস্য হুকুমের ব্যাপারে নফী হয় এবং নফী সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। كل **সংযুক্ত হওয়ার পর এর উল্টো হওয়া উচিত,** যাতে كل অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তাসীসের জন্য হয়, অপ্রাধান্য তাকিদের জন্য না হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي الصُّوْرَةِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি মুসনাদ ইলাইহ পরে আসে এবং মুসনাদ ইলাইহের উপর كل শব্দটি আসে আর মুসনাদ হরফে নফীর সাথে যুক্ত হয়, তাহলে মুসনাদ ইলাইহের পরে আসা সমষ্টির জন্য নফী হয়। অন্যথায় তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কারণ, كل ছাড়া মুসনাদ ইলাইহ যদি পরে আসে যেমন- لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ তাহলে এটি سَالِبَةٌ مُهْمَلَةٌ আর লেখকের মতানুসারে لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ হচ্ছে سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ-এর হুকুমে এর প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম নফী হয় সে মতে سَالِبَةٌ مُهْمَلَةٌ-এর মধ্যেও প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম নফী হবে। অতএব, এর অর্থ হচ্ছে لَاشَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِقَائِمٍ

মুসান্নিফ (র.) বলেন, سَالِبَةٌ مُهْمَلَةٌ হচ্ছে سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ-এর হুকুমে লেখকের এ মতটি জমহুর উলামাদের মতের বিপরীত, জমহুরের মতে سَالِبَةٌ مُهْمَلَةٌ হচ্ছে سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ-এর হুকুমে। কেননা, مهملة হচ্ছে جزئية-এর হুকুমে।

লেখকের বক্তব্য জমহুরের বক্তব্যের বিপরীত হওয়াতে লেখক আত্মপক্ষ সমর্থন করে জবাব দিচ্ছেন যে, আমার বক্তব্য سَالِبَةٌ مُهْمَلَةٌ হচ্ছে سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ-এর হুকুমে। এটা তখনই যখন বাক্যের মুসনাদ ইলাইহ নফীর পরে আসবে, তা অনির্দিষ্ট এবং তার সাথে كل শব্দটি যুক্ত না করে যেমন– لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ জমহুরের মতে سَالِبَةٌ مُهْمَلَةٌ হচ্ছে سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ-এর হুকুমে, তার প্রয়োগ উক্ত অবস্থা ছাড়া অন্য তিন অবস্থায় হয়ে থাকে। যেমন– ১. মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট, ২. মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্ট, তবে তার পূর্বে হরফে নফী নেই। ৩. মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্ট এবং হরফে নফীর পরেও এসেছে; কিন্তু মুসনাদ ইলাইহের সাথে كل শব্দটি যুক্ত। যেমন– (প্রথম প্রকারের উদাহরণ) اَلْاِنْسَانُ لَمْ يَقُمْ দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ এ তিন অবস্থায় سَالِبَةٌ مُهْمَلَةٌ অবশ্যই سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ-এর হুকুমে হবে।

তবে যখন মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্ট ও নফীর পরে আসবে এবং তাতে كل প্রবেশ করবে না, তখন তা سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ-এর হুকুমে হবে। যেমন– لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ এটির অর্থ হবে, প্রত্যেক সদস্য থেকে দণ্ডায়মান নফী হওয়া। অতএব لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ অর্থ كل ছাড়া প্রত্যেক সদস্য থেকে বিষয় নফী করা, এখন كل এতে প্রবেশ করার পরও যদি সেই পূর্বের অর্থ বহাল থাকে এবং অর্থ হয় প্রত্যেক মানুষ দাঁড়ায়নি, তাহলে كل এখানে তাকিদের জন্য হয়ে যাচ্ছে এবং তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক হচ্ছে। অথচ তাসীসকে তাকিদের উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আর এ জন্যই আমরা বলবো, كل প্রবেশ করার পর لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ-এর অর্থ হবে সবার থেকে দণ্ডায়মান হওয়াকে না-বাচক করা। এ ছাড়া এখানে অন্য অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ নেই, হয় সবার থেকে নফী করবে অথবা প্রত্যেক সদস্য থেকে নফী করবে, এখানে كل-এর দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যখন তাকিদের কারণে দু'টির একটি (প্রত্যেক সদস্য থেকে নফী এর অর্থ) বাদ পড়ল, তখন অপরটি অবশ্যই প্রমাণিত হবে। আর অপর অর্থ হচ্ছে সমষ্টিকে না-বাচক করা।

অতএব, এটা প্রমাণিত হলো যে, মুসনাদ ইলাইহ পরে আসলে আর এর সাথে كل যুক্ত করলে মুসনাদ ইলাইহের অর্থ হবে, সব মানুষ থেকে হুকুম নফী করা, প্রত্যেক মানুষ থেকে হুকুম নফী করা নয়।

শেষ কথা হচ্ছে– মুসনাদ ইলাইহ আগে আসার অবস্থায় كل ব্যতীত অর্থ হচ্ছে ব্যাপকতাকে নফী করা এবং সকলের অন্তর্ভুক্তিতে নফী করাকে আর পরে আসলে তার অর্থ প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নফী করা এবং না-বাচকতা সকলের জন্য ব্যাপক হওয়া– অতএব, كل অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এতে অর্থের পরিবর্তন জরুরি যাকে كل তাসীসের জন্য হয় তাকিদের জন্য না হয়– যাতে তাসীস তাকিদের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

বিশেষ নোট : লেখক তার ইবারতে মুসনাদ ইলাইহের আগে আসা ও পরে আসার অবস্থায় كل ব্যতীত কী অর্থ– হয় এবং كل সহ কী অর্থ হয়, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কিন্তু এসব আলোচনার শেষ কথা বলেননি এবং মূল বিষয়টির সিদ্ধান্ত দেননি। মূলত বিষয় ছিল যদি মুসনাদ ইলাইহের সাথে كل যুক্ত হয় এবং মুসনাদের সাথে নফীর হরফ থাকে উদাহরণ স্বরূপ كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ এ অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা ওয়াজিব, কারণ যদি আগে না আনা হয় তাহলে তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক হচ্ছে। কেননা, كل ছাড়া إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ-এর অর্থ সব মানুষ দাঁড়ায়নি। এখন যদি كل যুক্ত করে আগে না এনে পরে আনা হয়, আর বলা হয় لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ তাহলে এটাও ব্যাপকতাকে নফী করবে এবং পূর্ববর্তী বাক্য (إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ) যে অর্থ দিয়েছে অনুরূপ অর্থ দিবে। তাহলে كل শব্দটি প্রথম অর্থের তাকিদ করল, তাসীসের জন্য হলো না। পক্ষান্তরে যদি كل শব্দটি যুক্ত করে তাকে আগে আনা হয় এবং বলা হয় كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ তাহলে অর্থ হবে : প্রত্যেকটি লোক দাঁড়ায়নি অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তিকে নফী করবে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে كل অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর আগে আনা হলে মুসনাদ ইলাইহ তাসীসের অর্থ দেয়, কিন্তু পরে আনা হলে তাকিদের অর্থ দেয়। যেহেতু كل-এর অন্তর্ভুক্তির পর আগে আসা তাসীসের অর্থ দেয়, তাই তাসীসকে তাকিদের উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা ওয়াজিব।

সারাংশ : আরবি ভাষাসাহিত্যের রীতি অনুসারে কোনো একটি নতুন শব্দ দ্বারা নতুন অর্থ গ্রহণ করা জরুরি, পূর্বের অর্থের পুনরাবৃত্তি না করে। উল্লিখিত ইবারতের প্রথম অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহ (كل সহ) আগে না আনলে অর্থের পুনরাবৃত্তি হয়। তাই অর্থের পুনরাবৃত্তি থেকে বাঁচার জন্য আগে আনা ওয়াজিব। দ্বিতীয় অবস্থায় বা পশ্চাদ্বর্তী করার অবস্থায়ও كل ছাড়া বাক্যের অর্থ كل সহ বাক্যের অর্থের বিপরীত করতে হয়, অন্যথায় তাকিদ তাসীসের উপর প্রাধান্য লাভ করে। অথচ এটা করা ঠিক নয়।

وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ النَّفْىَ عَنِ الْجُمْلَةِ فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى يَعْنِى الْمُوْجِبَةَ الْمُهْمَلَةَ الْمَعْدُوْلَةَ الْمَحْمُوْلَ نَحْوُ اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ وَعَنْ كُلِّ فَرْدٍ فِى الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ يَعْنِى السَّالِبَةَ الْمُهْمَلَةَ نَحْوُ لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ اِنَّمَا اَفَادَهُ الْاِسْنَادُ اِلٰى مَا اُضِيْفَ اِلَيْهِ كُلٌّ وَهُوَ لَفْظُ اِنْسَانٍ وَقَدْ زَالَ ذٰلِكَ الْاِسْنَادُ الْمُفِيْدُ لِهٰذَا الْمَعْنٰى بِالْاِسْنَادِ اِلَيْهَا اَىْ اِلٰى كُلٍّ لِاَنَّ اِنْسَانًا صَارَ مُضَافًا اِلَيْهِ فَلَمْ يَبْقَ مُسْنَدًا اِلَيْهِ فَتَكُوْنُ اَىْ عَلٰى تَقْدِيْرِ اَنْ يَكُوْنَ الْاِسْنَادُ اِلٰى كُلٍّ اَيْضًا مُفِيْدًا لِلْمَعْنَى الْحَاصِلِ مِنَ الْاِسْنَادِ اِلَى الْاِنْسَانِ تَكُوْنُ كُلٌّ تَاسِيْسًا لَا تَاكِيْدًا لِاَنَّ التَّاكِيْدَ لَفْظٌ يُفِيْدُ تَقْوِيَةَ مَا يُفِيْدُهُ لَفْظٌ اٰخَرُ وَهٰذَا لَيْسَ كَذٰلِكَ لِاَنَّ هٰذَا الْمَعْنٰى حِيْنَئِذٍ اِنَّمَا اَفَادَهُ الْاِسْنَادُ اِلٰى لَفْظِ كُلٍّ لَاشَيْئٌ اٰخَرُ حَتّٰى تَكُوْنَ كُلٌّ تَاكِيْدًا لَهُ وَحَاصِلُ هٰذَا الْكَلَامِ اَنَّا لَا نُسَلِّمُ اَنَّهُ لَوْ حُمِلَ الْكَلَامُ بَعْدَ كُلٍّ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِىْ حُمِلَ عَلَيْهِ قَبْلَ كُلٍّ كَانَ كُلٌّ لِلتَّاكِيْدِ وَلَا يَخْفٰى اَنَّ هٰذَا الْمَنْعَ اِنَّمَا يَصِحُّ عَلٰى تَقْدِيْرِ اَنْ يُرَادَ التَّاكِيْدُ الْاِصْطِلَاحِىُّ اَمَّا لَوْ اُرِيْدَ بِذٰلِكَ اَنْ تَكُوْنَ كُلٌّ لِاِفَادَةِ مَعْنًى كَانَ حَاصِلًا بِدُوْنِهٖ فَاِنْدِفَاعُ الْمَنْعِ ظَاهِرٌ ـ

অনুবাদ : এতে আপত্তি আছে। কেননা, প্রথম অবস্থায় তথা مُوْجِبَة مُهْمَلَة مَعْدُوْلَةُ الْمَحْمُوْلِ-এর অবস্থায় যেমন- اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ-এর মধ্যে **না-বাচক করা হচ্ছে** সকলকে, আর **দ্বিতীয় অবস্থায়** তথা سَالِبَة مُهْمَلَة-এর অবস্থায় যেমন- لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ-এর মধ্যে না-বাচক করা হচ্ছে **প্রতিটি সদস্যকে। আর এই অর্থ দিচ্ছে সেই ইসনাদ, যা করা হয়েছে كل-এর মুযাফ ইলাইহের প্রতি**। আর তা হচ্ছে, انسان শব্দটি। **আর সেই ইসনাদ كل-এর প্রতি ইসনাদের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যাচ্ছে**। কেননা, انسان এখানে মুযাফ ইলাইহ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তা আর মুসনাদ ইলাইহ থাকছে না। **সুতরাং** كل-এর দিকে ইসনাদ করার মাধ্যমে **সেই অর্থই পাওয়া যাচ্ছে,** যা انسان-এর দিকে ইসনাদের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। **অতএব,** كل (এভাবে) **তাসীসের জন্য হলো। তাকিদের জন্য নয়;** কেননা, তাকিদ বলা হয় কোনো শব্দ দ্বারা ঐ অর্থ প্রদান করা যে অর্থ শব্দ দ্বারা অর্জিত হয়েছে। আর এখানে তা হয়নি। কেননা, তখন এ অর্থ كل-এর দিকে ইসনাদের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। এ অর্থ অন্য কোনো শব্দ প্রদান করেনি যে, كل তার তাকিদ হবে।

সারকথা হচ্ছে, আমরা এ কথা মানতে রাজি নই যে, كل শব্দের সংযুক্তির পর যদি বাক্যের অর্থ তাই হয় যা كل-এর সংযুক্তির পূর্বে ছিল, তাহলে كل তাকিদের জন্য হলো। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আপত্তি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তাকিদ দ্বারা পারিভাষিক তাকিদ উদ্দেশ্য হয়। আর যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়- كل এমনই একটি অর্থ প্রদান করে, যা كل ব্যতীত অর্জিত হয়েছে তাহলে স্পষ্টত আপত্তির নিরসন হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَفِيْهِ نَظَرٌ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখক ইবনুল মালিক প্রমুখের পুরো বক্তব্যের উপর তিনটি আপত্তি তুলেছেন। অর্থাৎ মূল লেখক ইবনুল মালিক প্রমুখের দাবিকে তো সত্য বলে মেনে নিয়েছেন; কিন্তু তাদের বক্তব্যের মধ্যে তিনটি অসামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন।

তার প্রথম প্রশ্নটি অগ্রবর্তী এবং পশ্চাদ্বর্তী উভয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আপত্তিটি পশ্চাদ্বর্তী করার অবস্থায়। প্রথম আপত্তিটি হচ্ছে– অগ্রবর্তী করার অবস্থায় كل-এর অন্তর্ভুক্তির পূর্বে اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ-এর অর্থ "সব মানুষ দাঁড়ায়নি", এখন كل প্রবেশের পর যদি অর্থ كُلُّ اِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ সব মানুষ দাঁড়ায়নি হয়, তাহলে كل তাকিদের জন্য হলো।

এমনিভাবে لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ-এর অর্থ হচ্ছে কোনো মানুষ দাঁড়ায়নি। এখন كل শব্দটি প্রবেশের পর لَمْ يَقُمْ كُلُّ اِنْسَانٍ অর্থ যদি কোনো মানুষ দাঁড়ায়নি হয়, তাহলে এটা আপনাদের মতে তাকিদ; কিন্তু আমরা দেখছি যে, كل প্রবেশের আগে যে ইসনাদ হয়েছে كل প্রবেশের পর নতুনভাবে ইসনাদ হয়েছে এবং উভয় অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহেরও পরিবর্তন হয়েছে। كل থাকা অবস্থায় كل হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ, আর كل না থাকা অবস্থায় كل-এর মুযাফ ইলাইহ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ। كل আসার দ্বারা আগের ইসনাদটি বাতিল হয়ে গেছে। অতএব, كل আসার পর যদি পূর্ববর্তী অর্থ বাকি, থাকে তবুও তো তা তাকিদ হচ্ছে না। কেননা, এ অর্থটি ভিন্ন ইসনাদ দ্বারা পাওয়া গেছে; বরং এটি তাসীস হচ্ছে। কেননা, পরিভাষায় তাকিদের সংজ্ঞা হচ্ছে, তাকিদ ঐ শব্দকে বলা হয়, যা এমন অর্থ প্রদান করে যে অর্থটি ইতঃপূর্বে আরেকটি শব্দ প্রদান করেছিল। অর্থাৎ দু'টি শব্দ একটি অর্থ প্রদান করলে এবং সবই একই ইসনাদের মধ্যে হলে দ্বিতীয় শব্দটি তাকিদ হবে; কিন্তু এখানে তা হয়নি। কেননা, যখন كل-এর ইসনাদ করা হয়েছে তখন উল্লিখিত অর্থটি كل-ই প্রকাশ করেছে, অন্য কেউ নয়। অতএব, এখানে তাকিদ হয়নি।

মোটকথা, কোনো বাক্যে كل প্রবেশ করার আগে যে অর্থ ছিল তা যদি كل প্রবেশ করার পরও বহাল থাকে, তবে তা তাকিদ হবে এটা আমরা মেনে নিতে পারি না।

বাক্যে كل আসার আগের অর্থ এবং كل অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরের অর্থ একই ধরনের হলেও তা তাকিদ নয়; বরং তাসীস হবে। এ আপত্তির জবাবে মুসান্নিফ বলেন, আপত্তিটি যথার্থ। তবে যদি উপরোক্ত তাকিদকে পারিভাষিক তাকিদ না ধরে আমরা যদি আভিধানিক তাকিদ উদ্দেশ্য করি, তাহলে এ আপত্তিটি থাকছে না। তখন তাকিদের অর্থ হবে كل শব্দটি এমন অর্থ প্রদান করছে, যা كل ছাড়া অন্যভাবে অর্জিত হয়েছিল। এভাবে ব্যাখ্যা করলে উল্লিখিত আপত্তিটি আর থাকে না। কেননা, এ অর্থে এখানে كل তাকিদের জন্য হয়েছে এবং এটাও বলা যথার্থ যে, كل অন্তর্ভুক্ত করার পর كل-এর আগের অর্থ যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

وَحِيْنَئِذٍ يُتَوَجَّهُ مَا اَشَارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلِاَنَّ الصُّوْرَةَ الثَّانِيَةَ يَعْنِى السَّالِبَةَ الْمُهْمَلَةَ نَحْوُ لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ اِذَا اَفَادَتِ النَّفْىَ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَقَدْ اَفَادَتِ النَّفْىَ عَنِ الْجُمْلَةِ فَاِذَا حُمِلَتْ كُلٌّ عَلَى الثَّانِىْ اَىْ عَلَى اِفَادَةِ النَّفْىِ عَنْ جُمْلَةِ الْاَفْرَادِ حَتّٰى يَكُوْنَ مَعْنٰى لَمْ يَقُمْ كُلُّ اِنْسَانٍ نَفْىَ الْقِيَامِ عَنِ الْجُمْلَةِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ لَاتَكُوْنُ كُلٌّ تَاسِيْسًا بَلْ تَاكِيْدًا لِاَنَّ هٰذَا الْمَعْنٰى كَانَ حَاصِلًا بِدُوْنِهِ وَحِيْنَئِذٍ فَلَوْ جَعَلْنَا لَمْ يَقُمْ كُلُّ اِنْسَانٍ لِعُمُوْمِ السَّلْبِ مِثْلُ لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ لَمْ يَلْزَمْ تَرْجِيْحُ التَّاكِيْدِ عَلَى التَّاسِيْسِ اِذْ لَا تَاسِيْسَ اَصْلًا بَلْ اِنَّمَا يَلْزَمُ تَرْجِيْحُ اَحَدِ التَّاكِيْدَيْنِ عَلَى الْاٰخَرِ ـ

অনুবাদ : আর তখন প্রশ্ন দিক পরিবর্তন করবে সেই দিকে যার প্রতি লেখক তার বক্তব্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন **আর দ্বিতীয় অবস্থা** অর্থাৎ سَالِبَةٌ مُهْمَلَةٌ যেমন لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ **যখন দণ্ডায়মান হওয়াকে প্রত্যেক সদস্য থেকে না-বাচক করার অর্থ প্রদান করে তখন স্বাভাবিকভাবে সবার থেকে না-বাচক করার অর্থ প্রদান করল আর যখন** كل**-কে দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করা হবে** অর্থাৎ সবার বা সমষ্টি থেকে না-বাচক করা হবে তখন لَمْ يَقُمْ كُلُّ اِنْسَانٍ-এর অর্থ হবে সকল থেকে দণ্ডায়মান হওয়া নেতিবাচক করা প্রত্যেক সদস্য থেকে নয়। **এমতবস্থায়** كل **তাসীসের জন্য হবে** না; বরং তাকিদের জন্য। কেননা, এ অর্থ كل ছাড়া হাসিল হয়েছিল। আর তখন যদি আমরা لَمْ يَقُمْ كُلُّ اِنْسَانٍ-কে প্রত্যেক সদস্য থেকে না-বাচক করার অর্থে গ্রহণ করি لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ-এর মতো, তাহলে তাকিদকে তাসীসের উপর প্রধান্য দেওয়ার বিষয়টি আবশ্যক হয় না, কেননা, এখানে তো তাসীস নেই; বরং দু'তাকিদের মধ্য থেকে একটি তাকিদকে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَحِيْنَئِذٍ يُتَوَجَّهُ الخ : উল্লিখিত ইবারতে লেখক দ্বিতীয় আপত্তিটি উত্থাপন করেছেন। এ আপত্তিটি অবশ্য শুধুমাত্র দ্বিতীয় অবস্থার সাথে খাস। আপত্তিটি হচ্ছে ইবনুল মালিক এবং অন্যান্যদের মতে মুসনাদ ইলাইহকে পশ্চাদ্বর্তী করা হলে كل শব্দটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে যেহেতু বাক্যটি প্রত্যেক সদস্যকে না-বাচক করেছে, অতএব, كل শব্দটি আসার পর সমষ্টিগতভাবে না-বাচক করবে। অন্যথায় তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক হবে।

আমরা বলি, এ বক্তব্য সঠিক নয়, আমাদের মতে كل সংযুক্ত হওয়ার অবস্থায় সমষ্টিকে না-বাচক অথবা প্রত্যেক সদস্যকে না-বাচক করুক– যে অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন كل তাকিদের জন্য হবে। আর দু' তাকিদের মধ্য থেকে একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক হবে। এমতবস্থায় كل শব্দটি তাসীসের জন্য হবে না।

এ ব্যাখ্যা হচ্ছে দ্বিতীয় অবস্থা سَالِبَةٌ مُهْمَلَةٌ-এর মধ্যে যেমন لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ এতে كل সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে আপনাদের কথা মোতাবেক এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেকটি সদস্য থেকে হুকুমকে না-বাচক করা। আর কোনো বাক্যের মধ্যে যদি প্রত্যেকটি সদস্য না-বাচক হয়, তাহলে অবশ্যই এর দ্বারা সমষ্টি না-বাচক হবে। কেননা, সমষ্টির না-বাচক অথবা সবাইকে না করা দু'ভাবে হতে পারে– ১ কেউই যদি না করে, ২. কতিপয় লোক যদি না করে।

نَفْىٌ عَنْ جُمْلَةِ الْاَفْرَادِ সব সদস্যকে না-বাচক করা হচ্ছে ব্যাপক। আর নিয়মানুসারে খাস (বিশেষ প্রকার) আম (ব্যাপকতা)-কে লাযিম করে। অতএব, প্রত্যেক সদস্যকে না-বাচক করার প্রকার সকলকে না-বাচক করার প্রকারকে আবশ্যক করবে। অর্থাৎ যেখানে প্রত্যেক সদস্য না-বাচক হবে সেখানে অবশ্যই সব সদস্য না-বাচক হবে। অতএব, كل সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ-এর মধ্যে উভয় অর্থ তথা প্রত্যেক সদস্য না-বাচক হওয়া ও সব সদস্য না-বাচক হওয়া বিদ্যমান। এরপর যখন كل-কে সংযুক্ত করে পূর্বের অর্থ দু'টির একটি অর্থ গ্রহণ করা হবে, সেটাই তাকিদ হবে। অতএব, ইবনুল মালিক প্রমুখের মতানুসারে এখানে যদি (كل সংযুক্ত হওয়ার পর) সবাইকে না-বাচক করার অর্থ গ্রহণ করা হয়– তাহলেও তো তাসীস হচ্ছে না; বরং তাকিদই হচ্ছে। কেননা, এ অর্থ كل সংযুক্ত হওয়া ছাড়া পাওয়া গিয়াছিল। আবার যদি لَمْ يَقُمْ كُلُّ اِنْسَانٍ-এর অর্থ প্রত্যেক সদস্য দাঁড়ায়নি বলি তাহলেও তাকিদ হচ্ছে, তাসীস হচ্ছে না। অতএব, এখন যে অর্থকেই গ্রহণ করা হবে সেই তাকিদ হবে এবং এটাকে অপর অর্থের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যেহেতু দু'টোই তাকিদ, তাই একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে এক তাকিদকে অপর তাকিদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক হলো।

وَمَا يُقَالُ اِنَّ دَلَالَةَ لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ عَلَى النَّفْيِ عَنِ الْجُمْلَةِ بِطَرِيْقِ الْاِلْتِزَامِ وَ دَلَالَةَ لَمْ يَقُمْ كُلُّ اِنْسَانٍ عَلَيْهِ بِطَرِيْقِ الْمُطَابَقَةِ فَلَا يَكُوْنُ تَاكِيْدًا فَفِيْهِ نَظَرٌ اِذْ لَوْ اُشْتُرِطَ فِي التَّاكِيْدِ اِتِّحَادُ الدَّلَالَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ كُلُّ اِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ عَلَى تَقْدِيْرِ كَوْنِهِ لِنَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْجُمْلَةِ تَاكِيْدًا لِاَنَّ دَلَالَةَ اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ عَلَى هٰذَا الْمَعْنٰى بِطَرِيْقِ الْاِلْتِزَامِ وَلِاَنَّ النَّكِرَةَ الْمَنْفِيَّةَ اِذَا عَمَّتْ كَانَ قَوْلُنَا لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ لَا مُهْمَلَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ هٰذَا الْقَائِلُ لِاَنَّهُ قَدْ بُيِّنَ فِيْهَا اَنَّ الْحُكْمَ مَسْلُوْبٌ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْاَفْرَادِ وَالْبَيَانُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ مُبَيِّنٍ فَلَا مَحَالَةَ هٰهُنَا شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ الْحُكْمَ فِيْهَا عَلٰى كَمِّيَّةِ اَفْرَادِ الْمَوْضُوْعِ وَلَا نَعْنِيْ بِالسُّوْرِ سِوٰى هٰذَا وَحِيْنَئِذٍ يَنْدَفِعُ مَا قِيْلَ سَمَّاهَا مُهْمَلَةً بِاِعْتِبَارِ عَدَمِ السُّوْرِ ـ

অনুবাদ : কেউ কেউ বলেন, لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ-এর অর্থ সবার থেকে হুকুম না-বাচক করা হচ্ছে দালালতে ইলতিযামী আর لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ-এর অর্থ সবার থেকে হুকুম না-বাচক করা হচ্ছে দালালতে মুতাবেকী, তাহলে তো তাকিদ হলো না। কিন্তু এ উত্তরেও আপত্তি আছে। যদি তাকিদের মধ্যে দু'দালালতের একই ধরনের হওয়াকে শর্ত বলা হয়, তাহলে (অগ্রবর্তী করার অবস্থায়) كُلُّ اِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ সকল থেকে হুকুমকে না-বাচক করার অর্থ প্রদানকালে তাকিদ হচ্ছে না। কেননা, এ অর্থের প্রতি اِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ-এর দালালত ইলতেযামীভাবে ছিল। **তা ছাড়া অনির্দিষ্ট নেতিবাচক বিশেষ্য যখন ব্যাপক হয় যেমন আমাদের উক্তি لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ হচ্ছে سَالِبَة كُلِّيَّة হবে مهملة হবে না।** যেমন এ বক্তা দাবি করেছেন। কেননা, এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুকুমটি প্রত্যেকটি সদস্য থেকে না-বাচক করা হয়েছে প্রত্যেকটি বর্ণনার একটি বর্ণনাকারী থাকে। নিশ্চিতভাবে এখানেও এমন একটি বিষয় রয়েছে, যা মুসনাদ ইলাইহের সদস্যসমূহের সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করছে। আর আমরা سور দ্বারা এটা ছাড়া অন্য কিছু বুঝাচ্ছি না, তখন سور না থাকার কারণে তিনি مهملة বলেছেন, এ আপত্তি রহিত হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَمَا يُقَالُ اِنَّ دَلَالَةَ الخ : উপরোক্ত ইবারতে প্রথমত লেখকের আপত্তির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রশ্নটি ছিল– পশ্চাদ্বর্তী করার অবস্থায় كل শব্দের অর্থ نَفْيٌ عَنِ الْجُمْلَةِ (সকল থেকে না-বাচক) করা হলে তাসীস হবে এটা আমরা মানি না। আমরা বলি, এ অর্থ করা হলেও তাকিদই হবে। ইতঃপূর্বে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনুল মালিক তার উপর আরোপিত প্রশ্নের জবাবে যা বলেন তা হচ্ছে, পশ্চাদ্বর্তী অবস্থায় كل যুক্ত না করলে لَمْ يَقُمْ اِنْسَانٌ-এর অর্থ কোনো মানুষ দাঁড়ায়নি, অর্থটা শব্দের দালালতে মুতাবেকী হয়েছে। এর থেকে সবাই দাঁড়ায়নি অর্থটি লাযেমীভাবে পাওয়া যায় যা দালালতে মুতাবেকী নয়। কারণ, প্রত্যেকটি লোক কোনো কাজ না করলে সবাই করেনি– কথাটিও সত্য হয়। এরপর كل যুক্ত করলে দালালতে মুতাবেকী হয় "সবাই দাঁড়ায়নি", যা كل ছাড়া দালালতে ইলাতিযামী ছিল।

অতএব, كل সহ বাক্যের অর্থ সবাই দাঁড়ায়নি বললে (দু'দালালত এক না হওয়াতে) তাকিদ হচ্ছে না। কেননা, তাকিদ তো তখনই হয়– যখন পূর্বের অর্থের দালালত পরের অর্থের দালালতের সাথে মিলে যায়; অথচ এখানে দু'দালালত মিলছে না।

মুসান্নিফ (র.) ইবনুল মালিক প্রমুখের জবাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তাদের জবাব সঠিক নয় এবং তা আপত্তির উর্ধ্বে নয়। তাদের দাবি মতে তাকিদের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য দু'দালালতের একই ধরনের হওয়া নিয়মানুসারে আবশ্যক নয়। কেননা, তাকিদের জন্য দু'দালালতের এক হওয়া আবশ্যক বলা হলে মুসনাদ ইলাইহ অগ্রবর্তী হলে كل দ্বারা পূর্বের অর্থের তাকিদ হয় না। কেননা, إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ-এর অর্থ সকল থেকে হুকুম না-বাচক করা দালালতে ইলতিযামী হিসেবে, আর كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ-এর অর্থ– সকল থেকে হুকুম না-বাচক করা দালালতে মুতাবেকী। দু'দালালতের একই রকম হওয়া শর্ত বলা হলে كل আসার পরও পূর্বের অর্থের তাকিদ হচ্ছে না। এটা তাদের বর্তমান কথা মতো সিদ্ধান্ত। অথচ ইতঃপূর্বে তারা এটাকে তাকিদ বলে এসেছেন। অতএব, এটা প্রমাণিত হলো যে, তাকিদের জন্য দু'দালালতের এক হওয়া আবশ্যক নয়।

নোট : দালালত (الدلالة) শব্দটি ইলমুল মানাতিকের একটি পরিভাষা। এর শাব্দিক অর্থ– পথ প্রদর্শন করা।

পরিভাষায় : দালালত বলা হয় কোনো জিনিস এমন হওয়া যে, তা জানার দ্বারা অন্য অজানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়। দালালত প্রথমত দু'প্রকার। যথা– ১. لَفْظِيَّةٌ ২. غَيْر لَفْظِيَّة এদের প্রত্যেকটি আবার তিন প্রকার : ১. وَضْعِيَّة ২. عَقْلِيَّة ৩. طَبْعِيَّة অতএব, মোট প্রকার হচ্ছে ২ × ৩ = ৬ টি। যথা– ১. لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة ২. لَفْظِيَّة طَبْعِيَّة ৩. لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة ৪. غَيْر لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة ৫. غَيْر لَفْظِيَّة طَبْعِيَّة ৬. غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة।

এ ছয় প্রকারের মধ্যে لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তা তিন প্রকার : ক. مُطَابِقِيْ খ. تَضَمُّنِيْ গ. اِلْتِزَامِيْ।

এ তিন প্রকার আমাদের আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে এগুলোর সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হলো।

ক. دَلَالَة مُطَابِقِي বলা হয় এমন শাব্দিক দালালতকে যাতে শব্দ তার পরিপূর্ণ مَوْضُوْع لَهُ (যার জন্য শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে)-এর প্রতি দিকনির্দেশ করে। যেমন– انسان দ্বারা حَيَوَانٌ نَاطِقٌ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা। এখানে حَيَوَانٌ نَاطِقٌ হচ্ছে انسان বা মানুষের দালালতে মুতাবেকী।

খ. دَلَالَة تَضَمُّنِي এমন শাব্দিক দালালতকে বলা হয়, যাতে শব্দ তার অংশবিশেষের প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন– انسان (মানুষ) বলে শুধুমাত্র حيوان অথবা ناطق বুঝানো।

গ. دَلَالَة اِلْتِزَامِي এমন শাব্দিক দালালতকে বলা হয়, যাতে শব্দ তার مَوْضَع لَهُ-এর লাযিম (সংশ্লিষ্ট বস্তু)-এর প্রতি দিকনির্দেশ করে। যেমন– انسان (মানুষ) বলে তার জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা।

আমাদের আলোচিত বিষয় إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ-এর মুতাবেকী দালালত হচ্ছে কোনো মানুষ দাঁড়ায়নি। আর এর ইলাতিযামী দালালত হচ্ছে সব মানুষ দাঁড়ায়নি। কেননা, কোনো মানুষ না দাঁড়ানো সব মানুষ না দাঁড়ানোকে লাযেম বা আবশ্যক করে। কোনো মানুষ না দাঁড়ালে সব মানুষের না দাঁড়ানো প্রমাণ হবে।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ النَّكِرَةَ الْمَنْفِيَّةَ إِذَا عَمَّتْ : এ ইবারত দ্বারা লেখক ইবনুল মালিক প্রমুখ এর উপর তৃতীয় আরেকটি আপত্তি করেছেন। আপত্তিটি হচ্ছে ইবনুল মালিক প্রমুখ لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ-কে مهملة বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে سَالِبَة كُلِّيَّة কারণ, এ বাক্যে মুসনাদ ইলাইহের প্রত্যেকটি সদস্য থেকে হুকুমকে না-বাচক করা হয়েছে। কেননা, বাক্যটিতে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য না-বাচকের হরফের অধীনে এসেছে। আর নিয়মানুসারে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য না-বাচকের পরে আসলে তা ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করে। ব্যাপকতার ভিত্তিতে মুসনাদ ইলাইহের প্রতিটি সদস্য থেকে হুকুম না-বাচক হয়ে গেছে। কেননা, না-বাচকের অধীনে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য আসলে তা প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম না-বাচক করে।

আর এ ধরনের অর্থ প্রমাণ করার জন্য অবশ্যই বাক্যের মধ্যে বর্ণনাকারী তথা ইঙ্গিত দানকারী রয়েছে। সেই বর্ণনাকারী এবং ইঙ্গিত প্রদানকারী হচ্ছে "অনির্দিষ্ট বিশেষ্য না-বাচকের অধীনে আসা" যেহেতু سور-এর উদ্দেশ্য এটাই (একটি পরিমাণের বিবরণ দেওয়া)। অতএব, এ বাক্যে سور আছে। সুতরাং سور-এর অবস্থান প্রমাণ হওয়ার পর এ কথা বলা যাবে না যে, বাক্যের মধ্যে سور নেই এবং سور না থাকার কারণে আমরা একে مهملة বলেছি।

وَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ إِنْ كَانَتْ كَلِمَةُ كُلِّ دَاخِلَةً فِيْ حَيِّزِ النَّفْيِ بِاَنْ أُخِّرَتْ عَنْ اَدَاتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْمُوْلَةً لِأَدَاةِ النَّفْيِ اَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْخَبَرُ فِعْلًا نَحْوُ شِعْرٌ مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ * تَجْرِى الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِى السُّفُنُ اَوْ غَيْرَ فِعْلٍ نَحْوُ قَوْلُكَ مَا كُلُّ مُتَمَنَّى الْمَرْءِ حَاصِلًا اَوْ مَعْمُوْلَةً لِلْفِعْلِ الْمَنْفِى الظَّاهِرُ اَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى دَاخِلَةٍ وَلَيْسَ بِسَدِيْدٍ لِاَنَّ الدُّخُوْلَ فِيْ حَيِّزِ النَّفْيِ شَامِلٌ لِذٰلِكَ وَكَذَا لَوْ عَطَفْتَهَا عَلَى أُخِّرَتْ بِمَعْنًى اَوْ جُعِلَتْ مَعْمُوْلَةً لِاَنَّ التَّاخِيْرَ عَنْ اَدَاةِ النَّفْيِ اَيْضًا شَامِلٌ لِذَاكَ اَللّٰهُمَّ اِلَّا اَنْ يُخَصَّصَ التَّاخِيْرُ بِمَا اِذَا لَمْ تَدْخُلِ الْاَدَاةُ عَلَى فِعْلٍ عَامِلٍ فِيْ كُلٍّ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ الْمِثَالُ وَالْمَعْمُوْلُ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ فَاعِلًا اَوْ مَفْعُوْلًا وَتَاكِيْدًا اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ نَحْوُ مَا جَاءَنِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فِيْ تَاكِيْدِ الْفَاعِلِ وَمَا جَاءَنِىْ كُلُّ الْقَوْمِ فِى الْفَاعِلِ وَقُدِّمَ مِثَالُ التَّاكِيْدِ عَلَى الْفَاعِلِ لِاَنَّ كُلًّا اَصْلٌ فِيْهِ اَوْ لَمْ اٰخُذْ كُلَّ الدَّرَاهِمِ فِى الْمَفْعُوْلِ الْمُتَاخِرِ اَوْ كُلَّ الدَّرَاهِمِ لَمْ اٰخُذْ فِى الْمَفْعُوْلِ الْمُتَقَدِّمِ وَكَذَا لَمْ اٰخُذِ الدَّرَاهِمَ كُلَّهَا اَوِ الدَّرَاهِمَ كُلَّهَا لَمْ اٰخُذْ فَفِيْ جَمِيْعِ هٰذِهِ الصُّوَرِ تَوَجَّهَ النَّفْىُ اِلَى الشُّمُوْلِ خَاصَّةً لَا اِلَى اَصْلِ الْفِعْلِ وَاَفَادَ الْكَلَامُ ثُبُوْتَ الْفِعْلِ اَوِ الْوَصْفِ لِبَعْضٍ مِمَّا اُضِيْفَ اِلَيْهِ كُلٌّ اِنْ كَانَتْ كُلٌّ فِى الْمَعْنٰى فَاعِلًا لِلْفِعْلِ اَوِ الْوَصْفِ الْمَذْكُوْرِ فِى الْكَلَامِ اَوْ اَفَادَ تَعَلُّقَهُ اَىْ تَعَلُّقَ الْفِعْلِ اَوِ الْوَصْفِ بِهٖ اَىْ بِبَعْضٍ اِنْ كَانَتْ كُلٌّ فِى الْمَعْنٰى مَفْعُوْلًا لِلْفِعْلِ اَوِ الْوَصْفِ وَ ذٰلِكَ بِدَلِيْلِ الْخِطَابِ وَشَهَادَةِ الذَّوْقِ وَالْاِسْتِعْمَالِ وَالْحَقُّ اَنَّ هٰذَا الْحُكْمَ اَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ بِدَلِيْلِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِيْنٍ ـ

অনুবাদ : আর আল্লামা আব্দুল কাহির জুরজানী বলেন, যদি كل শব্দটি না-বাচকের হরফের অধীন হয়, অর্থাৎ না-বাচকের হরফের পরে চাই সেটা তার মা'মূল হোক অথবা না হোক। চাই খবর ফে'ল হোক অথবা না হোক। যেমন– (কবিতা) অর্থাৎ **মানুষ যা আশা করে সব সে পায় না।** যেমন বায়ু নৌযানের ইচ্ছা (প্রয়োজন)-এর বিপরীতে প্রবাহিত হয়। অথবা খবরটি ফে'ল হবে না, যেমন তুমি বললে, মানুষের সব আশা অর্জিত হয় না।

অথবা নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল হবে। বাহ্যত (মনে হয়) এটি دَاخِلَةً-এর উপর আত্ফ হয়েছে; কিন্তু এটি সঠিক নয়। কেননা, না-বাচকের অধীনে হওয়া, এটাকে শামিল করে। এমনিভাবে যদি আপনি এটাকে আত্ফ করতে চান أُخِّرَتْ-এর উপর। অর্থাৎ অথবা তাকে মা'মূল বানানো হবে। (এ আত্ফটি ও সহীহ নয়।) কেননা, না-বাচকের অক্ষরের অধীন হওয়া এ প্রকারকেও শামিল করে, হে আল্লাহ! (তুমি সাহায্য করো) তবে পশ্চাদ্বর্তী (بِاَنْ أُخِّرَتْ عَنْ اَدَاتِهِ)-কে যদি খাস করা হয় "না-বাচকের হরফসমূহ ফে'লের উপর আসেনি" এর সাথে, যার প্রতি উদাহরণগুলো দিক নির্দেশ করছে। (ফায়েলের) মা'মূল ব্যাপক। ফায়েল, মাফঊল অথবা তাকিদ ইত্যাদি مَا جَاءَنِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ এটি ফায়েলের তাকিদের উদাহরণ مَا جَاءَنِىْ كُلُّ الْقَوْمِ এটি ফায়েলের উদাহরণ।

তাকিদের উদাহরণ ফে'লের উদাহরণের আগে আনা হয়েছে, কেননা (كل) এ ব্যাপারে তাকিদ মূলার্থ। অথবা لَمْ اٰخُذْ كُلَّ الدَّرَاهِمِ এটি মাফউল পশ্চাদ্বর্তী করার উদাহরণ। অথবা كُلَّ الدَّرَاهِمِ لَمْ اٰخُذْ এটা মাফউল অগ্রবর্তী করার উদাহরণ। এমনিভাবে لَمْ اٰخُذِ الدَّرَاهِمَ كُلَّهَا অথবা اَلدَّرَاهِمَ كُلَّهَا لَمْ اٰخُذْ এ সকল অবস্থায় **না-বাচক হবে শুধুমাত্র সবাইকে শামিল করার বিষয়ে,** নেতিবাচকতা মূল ফোয়েলের সাথে সম্পর্কিত হবে না। **ফে'ল অথবা সিফাতের সীগাসমূহ** كل-এর মুযাফ ইলাইহের কতক অংশ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে **এ কথা বাক্য বুঝাবে** যদি كل অর্থগতভাবে বাক্যের মধ্যে উল্লিখিত ফে'ল অথবা সিফাতের ফায়েল হয়। **অথবা ফে'ল বা সিফাত কারো সাথে সম্পর্কিত এ কথা বুঝাবে** যদি كل অর্থগতভাবে বাক্যে ফে'ল অথবা সিফাতের মাফউল হয়। এসব প্রচলিত কথপোকথন, সুরুচির সাক্ষ্য এবং ব্যবহাররীতির ভিত্তিতে বলা হলো।

তবে চূড়ান্ত কথা হচ্ছে, এসব নিয়ম অধিকাংশ সময় প্রযোজ্য হয়, সব সময় প্রয়োগ হয় না (সব সময় প্রযোজ্য না হওয়া)-এর দলিল মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী– "আল্লাহ তা'আলা কোনো অহঙ্কারী বিদর্পী বান্দাকে পছন্দ করেন না।" "আল্লাহ তা'আলা কোনো পাপাচারী কাফিরকে পছন্দ করেন না।" "আপনি অধিক শপথকারী নিকৃষ্ট ব্যক্তির আনুগত্য করবেন না।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ الخ : শায়েখ আব্দুল কাহির জুরজানী (র.) বলেন, ১. كل শব্দটি যদি না-বাচকের অধীনে আসে অর্থাৎ كل শব্দটি যদি না-বাচকের হরফের পরে আসে। চাই এটি না-বাচকের হরফের মা'মূল হোক অথবা মা'মূল না হোক (كل-এর) খবর ফে'ল হোক আথবা ফে'ল না হোক।

অথবা, ২. كل নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল হোক। এসব অবস্থায় না-বাচকের হরফ দ্বারা মূল ফে'ল (কাজ)টি নেতিবাচক হবে না; বরং না-বাচকের সম্পর্ক হবে কাজটিতে সকলকে অন্তর্ভুক্ত না করার ব্যাপারে। অর্থাৎ এ সকল অবস্থায় সবাই করেনি, এটা প্রমাণ হবে এবং كل-এর মুযাফ ইলাইহ কতিপয় লোক করেছে, এটাও প্রমাণ হবে। অর্থাৎ ফে'ল অথবা সিফাতের সীগাহর বাস্তবায়ন কতিপয় লোকের সাথে হয়েছে।

খবর যদি ফে'ল হয় এর উদাহরণ হচ্ছে– مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الرَّجُلُ يُدْرِكُهُ * تَجْرِي الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ

এ কবিতায় يدرك ফে'লটি হচ্ছে ما-এর খবর, যা ফে'ল হয়েছে।

অথবা, খবরটি ফে'ল হবে না। যেমন– مَا كُلُّ مُتَمَنَّى الْمَرْءِ حَاصِلًا এ বাক্যে حاصلا শব্দটি ما-এর খবর হয়েছে। এটি ফে'ল নয়; বরং ইসম।

কবিতাটির অর্থ : মানুষ যা আশা করে তার সবই সে পায় না। যেমন বায়ু সব সময় নৌযানের অনুকূলে প্রবাহিত হয় না– কখনো প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়। উভয় উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহের অন্তর্গত প্রত্যেকটি সদস্যকে না-বাচক করা হয়নি; বরং সমষ্টিকে না বাচক করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মূল ফে'ল কিংবা সিফাত না-বাচক হয়নি; বরং ফে'ল এবং সিফাত কতিপয় সদস্য দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

قَوْلُهُ أَوْ مَعْمُوْلَةً لِلْفِعْلِ الْمَنْفِيِّ : এ বাক্যের معمولة শব্দটি معطوف, এর مَعْطُوْف عَلَيْه হচ্ছে داخلة, এমতে বাক্যের অর্থ হবে كل শব্দটি না-বাচকের হরফের অধীন হবে অথবা নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল হবে।

উভয় (مَعْطُوْف وَمَعْطُوْف عَلَيْه)-এর মধ্যে সবাইকে না-বাচক করা হবে, মূল ফে'ল নফী হবে না। কিন্তু এভাবে আত্ফ করা হলে অর্থগত জটিলতা সৃষ্টি হবে। কেননা, معطوف নেতিবাচক ফে'লের পরে আসলেও তো এটা معطوف عليه না-বাচকের হরফের পরেই আসল।

অথচ নিয়মানুসারে মা'তূফ এবং মা'তূফ আলাইহের মাঝে বৈপরীত্য থাকতে হয়; কিন্তু এখানে সেই বৈপরীত্য পাওয়া যাচ্ছে না, তাই داخلة-এর উপর معمولة-এর আত্ফ সঠিক নয়।

আর যদি বলা হয় এটা (معمولة) আত্ফ হয়েছে اخرت-এর উপর; তাহলেও অর্থগত জটিলতা শেষ হচ্ছে না। কেননা, তখন ইবারতের অনুবাদ হবে এরূপ যে, كل শব্দটি না-বাচকের অধীনে আসে অর্থাৎ না-বাচকের হরফের পরে আনা হয় অথবা নেতিবাচক ফে'লের পরে আনা হয় (তাহলে....)

এ আত্‌ফ সঠিক না হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানেও মা'তূফটি মা'তূফ আলাইহের মাঝে এসে গেছে। মা'তূফের মধ্যে মা'তূফ আলাইহের বৈরী কোনো কথা বলা হয়নি। কারণ, না-বাচকের হরফের পরে হওয়া নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল হওয়াকে তার মাঝে শামিল করে।

এমতাবস্থায়, معمولة-এর মা'তূফ আলাইহ নির্ধারণ করাই মুশকিল হয়ে গেছে।

মুসান্নিফ আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নিয়ে একটি জবাব দিচ্ছেন। জবাবটির সারকথা এই যে, প্রথমে বর্ণিত كل-এর না-বাচকের হরফের পরে আসা কথাটি ব্যাপক নয়; বরং এটি খাস। كل শব্দটি নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল হবে– এ প্রকারটি এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ প্রকারটিকে معمولة-এর কয়েদ দ্বারা সাবিত করা হয়েছে। এভাবে বলা হলে মা'তূফ এবং মা'তূফ আলাইহের মাঝে বৈরীতা প্রমাণ হয় এবং মা'তূফ আলাইহ মা'তূফকে অন্তর্ভুক্ত করে না। অতএব, আত্‌ফ সহীহ হওয়ার ব্যাপারে আর কোনো জটিলতা রইল না।

قَوْلُهُ وَالْمَعْمُوْلُ أَعَمُّ : লেখক বলেন, معمول শব্দটি এখানে ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা ফায়েল, মাফঊল, তাকিদ ও হাল ইত্যাদি সব কিছুই বুঝানো হয়েছে।

এগুলো আবার পশ্চাদ্বর্তী হতে পারে এবং অগ্রবর্তী রূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

এরপর এখানে প্রত্যেক প্রকারের মা'মূলের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

১. যদি كل শব্দটি ফায়েলের তাকিদ হয়, যেমন– مَا جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ (আমার কাছে গোত্রের সকলে আসেনি)।

২. كل শব্দটি যদি তারকীবে ফায়েল হয়, যেমন– مَا جَاءَنِي كُلُّ الْقَوْمِ (আমার কাছে গোত্রের সকলে আসেনি)।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, লেখক ফায়েলের উদাহরণটি আগে না এনে ফায়েলের তাকিদের উদাহরণটি আগে আনলেন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, كل শব্দটি তাকিদের অর্থে ব্যবহার হওয়াটা আসল, তাই كل-কে তার আসল অর্থে ব্যবহার করার জন্য তাকিদের উদাহরণটি আগে আনা হয়েছে।

৩. كل শব্দটি যদি মাফঊল এবং অগ্রবর্তী হয়, যেমন– كُلَّ الدَّرَاهِمِ لَمْ أَخُذْ (আমি সব টাকা নেইনি)।

৪. كل শব্দটি যদি পশ্চাদ্বর্তী মাফঊল হয়, যেমন– لَمْ أَخُذْ كُلَّ الدَّرَاهِمِ (আমি সব টাকা নেইনি)।

৫. كل শব্দটি যদি মাফঊলের তাকিদ এবং পশ্চাদ্বর্তী হয়। যেমন– لَمْ أَخُذِ الدَّرَاهِمَ كُلَّهَا

৬. كل শব্দটি যদি মাফঊলের তাকিদ হয় এবং ফে'লের আগে আসে, যেমন– اَلدَّرَاهِمَ كُلَّهَا لَمْ أَخُذْ এসব অবস্থায় না-বাচক হবে। সকলের সংশ্লিষ্ট হওয়ার বিষয়টি ফে'ল অথবা সিফাতের সীগাহ নয়। অর্থাৎ মূল ফে'লটি নেতিবাচক হবে না।

ফে'ল এবং সিফতের সীগাহ كل-এর মুযাফ ইলাইহের কারো কারো জন্য সাবিত হবে। এ হুকুম তখনই যখন كل শব্দটি উল্লিখিত ফে'লের অথবা সিফাতের ফায়েল হবে। আর যদি كل শব্দটি ফে'ল অথবা সিফাতের মাফঊল হয়, তাহলে ফে'ল এবং সিফাত كل-এর মুযাফ ইলাইহের কারো কারো সাথে সম্পর্কিত হবে সকলের সাথে সম্পর্কিত হবে না।

যেমন– لَمْ أَخُذْ كُلَّ الدَّرَاهِمِ-এর অর্থ হচ্ছে আমি সব টাকা নেইনি, এখানে নেওয়ার কাজটি নেতিবাচক হয়নি বরং এখানে নেতিবাচক হয়েছে সব টাকা নেওয়ার বিষয়টি এবং কিছু টাকা নেওয়া প্রমাণিত হয়েছে এভাবে যে, বাক্যের লাযিমী অর্থ হচ্ছে কিছু দিরহাম নেইনি, বাকিগুলো নিয়েছি।

মুসান্নিফ বলেন, كل সংক্রান্ত এ আলোচনার দলিল হচ্ছে প্রচলিত ও ব্যবহারিক ভাষা সাহিত্য এবং সাহিত্যিকগণের রুচি। তারা তাদের ব্যবহার ও ভাষায় كل-কে এ অর্থেই ব্যবহার করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে মুসান্নিফ আরো বলেন, উল্লিখিত বিষয়টি অধিকাংশ ব্যবহাররীতি অনুসারে বলা হয়েছে। এটা কোনো সামগ্রিক নিয়ম নয় যে, এর ব্যতিক্রম হবে না।

পবিত্র কুরআনে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই, যেমন মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ (আল্লাহ কোনো অহংকারীকেই পছন্দ করেন না), وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ (আপনি কোনো অধিক শপথকারী নিকৃষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না), وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ (আল্লাহ কোনো অবিশ্বাসী পাপাচারীকে পছন্দ করেন না)।

এ বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, না-বাচকের অধীন হওয়া সত্ত্বেও আসল ফে'ল নেতিবাচক হয়েছে, সমষ্টির না-বাচক হয়নি। কেননা, বাক্যের অর্থ মোটেও এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা সব অহংকারীকে পছন্দ করেন না, তবে কিছু অহংকারীকে পছন্দ করেন। মোটকথা, কুরআনের আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, উপরের বর্ণিত নিয়মগুলো সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং এর ব্যতিক্রমও রয়েছে।

وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً فِيْ حَيِّزِ النَّفْيِ بِأَنْ قُدِّمَتْ عَلَى النَّفْيِ لَفْظًا وَلَمْ تَقَعْ مَعْمُوْلَةً لِلْفِعْلِ الْمَنْفِيِّ عَمَّ النَّفْيُ كُلَّ فَرْدٍ مِمَّا أُضِيْفَ إِلَيْهِ كُلُّ وَأَفَادَ نَفْيَ أَصْلِ الْفِعْلِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ اِسْمُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ قُصِرَتْ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ هٰذَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمَعْنٰى لَمْ يَقَعْ وَاحِدٌ مِنَ الْقَصْرِ وَالنِّسْيَانِ عَلَى شُمُوْلِ النَّفْيِ وَعُمُوْمِهِ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ جَوَابَ أَمْ إِمَّا بِتَعْيِيْنِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ بِنَفْيِهِمَا جَمِيْعًا تَخْطِئَةً لِلْمُسْتَفْهِمِ لَا بِنَفْيِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ عَارِفٌ بِأَنَّ الْكَائِنَ أَحَدُهُمَا وَالثَّانِيْ مَا رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ قَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ بَعْضُ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ الثُّبُوْتَ لِلْبَعْضِ إِنَّمَا يُنَافِي النَّفْيَ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ لَا النَّفْيَ عَنِ الْمَجْمُوْعِ ـ

অনুবাদ : **অন্যথায়** অর্থাৎ যদি كل শব্দটি না-বাচকের অধীন না হয়; (বরং) তাকে শাব্দিকভাবে না-বাচকের হরফের আগে আনা হয় এবং তা নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল না হয়, **তাহলে নফী প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য হবে** (কেউই হ্যাঁ-বাচক হবে না) كل-এর মুযাফ ইলাইহের ক্ষেত্রে এবং এ জাতীয় বাক্য **প্রত্যেক সদস্য থেকে** মূল ফে'লের নেতিকবাচক হওয়ার অর্থ প্রদান করে। **যেমন মহানবী ﷺ-এর উক্তি :** (যা তিনি করেছিলেন) **যখন যুল ইয়াদাইন নামক সাহাবী** (একদা নামাজান্তে) তাকে বলেছিলেন, **নামাজ কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল** اَلصَّلٰوةُ শব্দটি قُصِرَتْ-এর ফায়েল, **হে আল্লাহর রাসূল! নাকি আপনি** (নামাজের রাকআত) **ভুলে গেছেন। এর কোনোটাই নয়।** এটা রাসূল ﷺ-এর উক্তি। তার এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, সংক্ষিপ্ত কিংবা ভুল কোনোটাই হয়নি– এখানে না-বাচক ব্যাপকার্থে দু'কারণে এবং أم দ্বারা প্রশ্নের জবাব দু'টি বিষয়ের কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করে অন্যথায় উভয়টিকে না-বাচক করে প্রশ্নকারীর ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। এতে সমষ্টির না-বাচক হয় না। কেননা, সে তো জানে একটি বিষয় ঘটেছে অবশ্যই। দ্বিতীয় (দলিল হচ্ছে) বর্ণিত আছে যে, যখন মহানবী ﷺ বললেন, কোনোটাই হয়নি, তখন যুল ইয়াদাইন তাকে বললেন, কোনো একটা তো অবশ্যই হয়েছে। আর এটা স্বীকৃত যে, কতকের জন্য কোনো বিষয় প্রমাণ করা প্রত্যেকের থেকে না-বাচক করার বিপরীত। এটা সমষ্টির নেতিবাচকের বিপরীত নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الخ : লেখক বলেন, যদি كل শব্দটি না-বাচকের হরফের অধীন না হয় অর্থাৎ না-বাচকের হরফ থেকে অগ্রবর্তী হয় শাব্দিকভাবে এবং নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল না হয়। এমতাবস্থায় না-বাচক হবে كل-এর মুযাফ ইলাইহ (অর্থাৎ যার দিকে তাকে সম্বন্ধ করা হয়েছে)-এর প্রতিটি সদস্য এবং বাক্যের কাজটি সম্পূর্ণভাবে নেতিবাচক হবে অর্থাৎ কারো ক্ষেত্রেই কাজটি সংঘটিত হবে না। এর উদাহরণ হচ্ছে রাসূলের উক্তি যা তিনি যুল ইয়াদাইনের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ (কোনোটাই হয়নি)।

ঘটনার বিবরণ এই যে, একদা রাসূল ﷺ জোহর অথবা আসরের নামাজ পড়ান। নামাজ চার রাকআতের জায়গায় দু'রাকআত পড়ানো হয়, নামাজান্তে সাহাবীদের অনেকেই নিশ্চুপ ছিলেন– এ ব্যাপারে কেউ কোনো মন্তব্য করছিলেন না,

এমতাবস্থায় সাহাবী যুল ইয়াদাইন দাঁড়িয়ে মহানবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন, اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ "হে আল্লাহর রাসূল! নামাজ কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল? নাকি আপনি ভুলক্রমে চার রাকআতের স্থানে দু'রাকআত পড়িয়েছেন?" এখানে الصلوة তারকীব বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসান্নিফ বলেন, الصلوة পেশযুক্ত قصرت-এর ফায়েল অথবা (فعل مجهول) قصرت-এর নায়েবে ফায়েল হিসেবে।

এরপর যুল ইয়াদাইন-এর কথার জবাবে রাসূল ﷺ বলেন, كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ (কোনোটাই হয়নি) নামাজ সংক্ষিপ্ত হয়নি এবং আমি ভুলেও যায়নি। এর উত্তরে যুল ইয়াদাইন বললেন, بَعْضُ ذٰلِكَ قَدْكَانَ "কোনো একটা অবশ্যই হয়েছে" এরপর রাসূল ﷺ উপস্থিত লোকদের দিকে তাকালেন তাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)ও ছিলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন– حَقٌّ مَا يَقُوْلُهُ ذُوالْيَدَيْنِ (যুল ইয়াদাইন যা বলছে তা কি সত্যিই) তারা দু'জন বললেন, হ্যাঁ ঠিক। এরপর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে বাকি দু'রাকআত যোগ করে নামাজ শেষ করলেন।

উল্লিখিত হাদীসে كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ-এর মধ্যে كل শব্দটি না-বাচকের অধীন নয় এবং তা বাক্যের প্রতিটি সদস্যকে না-বাচক করেছে। বাক্যে দু'টি বিষয় রয়েছে যথা– قصر ও نسيان উভয়টিকে كل না-বাচক করেছে। এর দু'টি দলিল মুসান্নিফ দিয়েছেন।

১. রাসূল ﷺ-এর এ কথাটি ام দ্বারা প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, ام দ্বারা প্রশ্ন করা হলে দু'ধরনের উত্তর দেওয়া যায়। হয়তো সুনির্দিষ্ট একটি উত্তর বলা হয় অথবা প্রশ্নকারীর ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য উভয়টি না-বাচক করা হয়। দু'টিকে একত্র করে না-বাচক করা যায় না। যেমন কেউ প্রশ্ন করল زَيْدٌ قَائِمٌ اَمْ عَمْرٌو-এর উত্তরে বলা হবে যায়েদ দণ্ডায়মান / আমর দন্ডায়মান অথবা বলা হবে কেউই দাঁড়ায়নি। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে– না দু'জন দণ্ডায়মান নয়। কেননা, প্রশ্নকারী এ কথা আগ থেকেই জানে যে, দু'জন দণ্ডায়মান নয়।

আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনায় সাহাবী যুল ইয়াদাইন প্রশ্ন করেছেন ام দ্বারা। অতএব, প্রশ্নের জবাব হয়তো যে কোনো একটি নির্দিষ্ট করে যে নামাজ ভুল হয়েছে / নামাজ সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, অথবা উত্তর হবে কোনোটাই নয়, সুতরাং كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ-এর অর্থ কোনোটাই নয়, প্রত্যেক সদস্য না-বাচক করে।

অতএব, كل এখানে প্রত্যেক সদস্য না-বাচক করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, রাসূল ﷺ যখন সাহাবী যুল ইয়াদাইনের ام দ্বারা প্রশ্নের জবাবে كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ বললেন, তখন যুল ইয়াদাইন প্রতি উত্তরে বললেন, بَعْضُ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ এ বাক্যটি হচ্ছে مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ নিয়মানুসারে এটি سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ-এর نقيض এটি سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ-এর نقيض নয়। যেহেতু যুল ইয়াদাইন রাসূল ﷺ-এর বিপরীত (نقيض) কথা বলেছেন এবং তার বাক্যটি হচ্ছে مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ সুতরাং রাসূল ﷺ-এর বাক্য كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ হচ্ছে سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ (যা প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম না-বাচক করে) অতএব, রাসূলের উক্তিটি দ্বারা প্রত্যেক সদস্য না-বাচক হবে।

নোট : যুল ইয়াদাইন হচ্ছে হযরত ইরবায ইবনে আমর অথবা খিরবাক ইবনে আমেরের উপাধি। এ উপাধির কারণ হচ্ছে তার হাত দু'টি অস্বাভাবিক লম্বা ছিল এবং দু'হাতই কাজে সমান পারদর্শী ছিল, ডান হাতের মতো বাম হাতে সমান শক্তি ছিল।

স্মর্তব্য : নামাজের মধ্যে কথা বলা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ নামাজ পূর্ণ করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ভুল সংক্রান্ত কথা নামাজের জন্য ক্ষতিকর নয়, বর্তমান যুগের আহলে হাদীসগণ এটার উপর আমল করে থাকে। আমাদের মতে, একটা সময় পর্যন্ত নামাজের মধ্যে কথা বলা বৈধ ছিল, এরপর সেটা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

وَعَلَيْهِ اَىْ عُمُوْمِ النَّفْيِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ قَوْلُهٗ اَىْ قَوْلُ اَبِى النَّجْمِ **شِعْرٌ** قَدْ اَصْبَحَتْ اُمُّ الْخِيَارِ تَدَّعِىْ * عَلَىَّ ذَنْبًا كُلُّهٗ لَمْ اَصْنَعْ بِرَفْعِ كُلِّهٖ عَلٰى مَعْنٰى لَمْ اَصْنَعْ شَيْئًا مِمَّا تَدَّعِيْهِ عَلَىَّ مِنَ الذُّنُوْبِ وَلِاِفَادَةِ هٰذَا الْمَعْنٰى عَدَلَ عَنِ النَّصْبِ الْمُسْتَغْنِىْ عَنِ الْاِضْمَارِ اِلَى الرَّفْعِ الْمُفْتَقِرِ اِلَيْهِ اَىْ لَمْ اَصْنَعْهُ ـ

অনুবাদ : **আর এ অর্থেই** অর্থাৎ প্রত্যেক সদস্য না-বাচক হওয়ার অর্থে কবি আবুন নাজমের **কবিতা** (অর্থাৎ **উম্মুল খিয়ার আমার ব্যাপারে এমন সব অপরাধ-গুনাহের দাবি করছে যার কোনোটাই আমি করিনি।**) كل পেশ সহকারে পঠিত হবে এ অর্থে যে, আমি করিনি আমার উপর যেসব গুনাহ করার দাবি করছে। আর এ অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি (যবর দিয়ে পড়া) যা সর্বনামের মুখাপেক্ষী নয় থেকে পেশের (দিয়ে পড়ার) দিকে যা তার প্রতি মুখাপেক্ষী ফিরে এসেছেন। অর্থাৎ لَمْ اَصْنَعْهُ ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَعَلَيْهِ الخ : লেখক এখানে كل না-বাচকের অধীন না হলে যে, প্রত্যেক সদস্যকে না-বাচক করে তার আরেকটি প্রমাণ পেশ করছেন বিখ্যাত কবি আবুন নাজমের একটি কবিতাংশ দ্বারা।

আবুন নাজমের কবিতা– قَدْ اَصْبَحَتْ اُمُّ الْخِيَارِ تَدَّعِىْ * عَلَىَّ ذَنْبًا كُلُّهٗ لَمْ اَصْنَعْ

অর্থাৎ 'আমার স্ত্রী উম্মুল খিয়ার আমার ব্যাপারে এমন সব অপরাধ ও গুনাহ করার দাবি করছে যার কোনোটাই আমি করিনি।' মুসান্নিফ من الذنوب-এর দ্বারা ব্যাখ্যা করত ইঙ্গিত প্রদান করছেন ذنبا অনির্দিষ্ট বিশেষ্য যদিও হ্যাঁ-বাচক বাক্যে এসেছে, তবুও তা স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে এখানে ব্যাপকার্থে হবে। কেননা, এখানে কবির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করা। আর সম্পূর্ণ প্রমাণ করা সম্ভব হবে না যদি তার থেকে সব দোষ খণ্ডন না করা যায়। অতএব, এখানে প্রত্যেকটি সদস্যকে না-বাচক করা হয়েছে।

ذنبا ইসমে জিনস এটি কমবেশি উভয়ের উপর দালালত করে। এখানে স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে "বেশি"-এর অর্থ প্রদান করছে।

قَوْلُهٗ كُلُّهٗ لَمْ اَصْنَعْ : এর তারকীব প্রসঙ্গে মুসান্নিফ বলেন, كل মূলত মাফঊল ছিল। তাকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। এরপর এর نصب-কে বাদ দিয়ে رفع আনা হয়েছে। এখন كل হলো মুবতাদা তার খবর হচ্ছে لَمْ اَصْنَعْ এ অবস্থায় اصنع-এর মধ্যে সর্বনাম ধরে নিতে হবে যাতে মুবতাদার সাথে সর্বনামটির সম্পর্কে তৈরি হয়। কেননা, নিয়মানুসারে খবর বাক্য বা জুমলা হলে তার থেকে একটি সর্বনাম মুবতাদার দিকে ফিরতে হয়। আর তাতে উহ্য ইবারত হবে لَمْ اَصْنَعْهُ। কিন্তু এর মধ্যে পড়া হলে এ ধরনের সর্বনাম ধরে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু লেখক رفع সহকারে পড়ার তারকীব কেন গ্রহণ করলেন। এর উত্তর হচ্ছে, প্রত্যেকটি সদস্য থেকে হুকুম না-বাচক করার জন্য তিনি পেশের তারকীব গ্রহণ করেছেন। কেননা, মুবতাদা পড়া হলে বাক্যের অনুবাদ হবে– (كُلُّ ذَنْبٍ لَمْ اَصْنَعْهُ) কোনো অপরাধ আমি করিনি। আর এ অর্থ প্রমাণ করাই কবির উদ্দেশ্য। আর যদি نصب পড়া হয়, তাহলে কবিতার অর্থ হবে সব অপরাধ আমি করিনি (বরং কিছু অপরাধ আমি করেছি)। এ অবস্থায় তার উপর আরোপিত প্রত্যেকটি অপরাধের অবসান হচ্ছে না, আর এটা কবির উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। কবির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করা। অতএব, كل-কে পেশ সহকারে পড়া এবং তাকে মুবতাদা বানানো অত্যাবশ্যকীয়।

وَاَمَّا تَاخِيْرُهٗ اَىْ تَاخِيْرُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فَلِاقْتِضَاءِ الْمَقَامِ تَقْدِيْمَ الْمُسْنَدِ وَسَيَجِئُ بَيَانُهٗ هٰذَا الَّذِىْ ذُكِرَ مِنَ الْحَذْفِ وَالذِّكْرِ وَالْاِضْمَارِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ فِى الْمَقَامَاتِ الْمَذْكُوْرَةِ كُلُّهٗ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ مِنَ الْحَالِ وَقَدْ يُخْرَجُ الْكَلَامُ عَلٰى خِلَافِهٖ اَىْ عَلٰى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ لِاِقْتِضَاءِ الْحَالِ اِيَّاهُ فَيُوْضَعُ الْمُضْمَرُ مَوْضِعَ الْمُظْهَرِ كَقَوْلِهِمْ نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ مَكَانَ نِعْمَ الرَّجُلُ فَاِنَّ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ هُوَ الْاِظْهَارُ دُوْنَ الْاِضْمَارِ لِعَدَمِ تَقَدُّمِ ذِكْرِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ وَعَدَمِ قَرِيْنَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَهٰذَا الضَّمِيْرُ عَائِدٌ اِلٰى مُتَعَقَّلٍ مَعْهُوْدٍ فِى الذِّهْنِ وَالْتَزَمَ تَفْسِيْرُهٗ بِنَكِرَةٍ لِيُعْلَمَ جِنْسُ الْمُتَعَقَّلِ وَاِنَّمَا يَكُوْنُ هٰذَا مِنْ وَضْعِ الْمُضْمَرِ مَوْضِعَ الْمُظْهَرِ فِىْ اَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اَىْ قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ الْمَخْصُوْصَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ وَاَمَّا مَنْ يَجْعَلُهٗ مُبْتَدَأً وَنِعْمَ رَجُلًا خَبَرُهٗ فَيَحْتَمِلُ عِنْدَهٗ اَنْ يَكُوْنَ الضَّمِيْرُ عَائِدًا اِلَى الْمَخْصُوْصِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ تَقْدِيْرًا وَيَكُوْنُ الْتِزَامُ اِفْرَادِ الضَّمِيْرِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ نِعْمَا وَنِعْمُوْا مِنْ خَوَاصِّ هٰذَا الْبَابِ لِكَوْنِهٖ مِنَ الْاَفْعَالِ الْجَامِدَةِ ـ

অনুবাদ : আর তাকে অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে **পশ্চাদ্বর্তী করা এ কারণে যে, স্থান-কাল-পাত্র মুসনাদের অগ্রগামীতা চায়।** এর আলোচনা অচিরেই আসবে। **আর এখানে যা উল্লেখ করা হলো** উহ্য হওয়া, উল্লেখ হওয়া, ও সর্বনাম ব্যবহার ইত্যাদি প্রত্যেকটিই **মুকতাযায়ে হালের প্রকাশ্য অবস্থা অনুপাতে। কখনো বাক্যকে ব্যবহার করা হয় এর বিপরীতে।** অর্থাৎ প্রকাশ্য চাহিদার বিপরীতে, হাল তাকেই চাওয়ার কারণে, **তখন প্রকাশ্য বিশেষ্যকে সর্বনামের স্থানে রাখা হয়। যেমন তাদের বাক্য** نِعْمَ الرَّجُلُ-**এর স্থানে** نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ এখানে প্রকাশ্য অবস্থার চাহিদা হচ্ছে বাহ্যিক বিশেষ্য ব্যবহার করা, সর্বনাম নয়। কেননা, মুসনাদ ইলাইহের আলোচনা ইতঃপূর্বে বিবৃত হয়নি এবং এমন লক্ষণও অনুপস্থিত যা মুসনাদ ইলাইহের দিকে নির্দেশ করে আর এ সর্বনামটি অন্তরে অবস্থিত একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, এরপর এর ব্যাখ্যাটি আবশ্যকের পর্যায়ে, যাতে যুক্তিগ্রাহ্য এবং মনে অবস্থিত বিষয় অবহিত হওয়া যায়। তবে এটি "বাহ্যিক বিশেষ্যের স্থানে সর্বনাম ব্যবহার" হবে (এ ব্যাপারে বর্ণিত) **একটি মতানুসারে** অর্থাৎ তাদের মতানুসারে যারা মাখসূসকে উহ্য মুবতাদার খবর মনে করেন। আর যারা মাখসূসকে মুবতাদা আর نِعْمَ رَجُلًا-কে তার খবর ধরেন সেখানে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, সর্বনামটি মাখসূসের দিকে ফিরেছে, যা মর্যাদাগতভাবে অগ্রবর্তী। আর সর্বনামকে সব সময় একক হিসেবে ব্যবহার করা এবং نِعْمَا وَنِعْمُوْا না বলা শুধুমাত্র এ অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য। কেননা, এটি অপরিবর্তনীয় ফে'লসমূহের একটি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَاَمَّا تَاخِيْرُهٗ الخ : মুসনাদ ইলাইহকে পশ্চাদ্বর্তী করা মুসনাদ ইলাইহের একটি অবস্থা। কখন এবং কোথায় মুসনাদ ইলাইহকে পশ্চাদ্বর্তী করা হবে? এর উত্তরে লেখকের খুবই সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর হচ্ছে যেখানে মুসনাদকে অগ্রগামী করা প্রয়োজন। অতএব, اَحْوَالُ الْمُسْنَدِ-এর মধ্যে এর বিশদ আলোচনা আসবে।

লেখক বলেন, উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহের সবগুলো অবস্থা যেমন তাকে উল্লেখ করা, উহ্য রাখা, তার সর্বনাম ব্যবহার করা, নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা ইত্যাদির আলোচনা হয়েছে স্থান-কাল পাত্রের বাহ্যিক অবস্থানুসারে। কখনো প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীতে ব্যবহার করা হয় যা মুকতাযায়ে হাল অনুসারে অবশ্য ঠিকই হয়। যেমন– نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ ব্যবহার করা نِعْمَ الرَّجُلُ-এর স্থলে।

نِعْمَ الرَّجُلُ-এর মধ্যে ফায়েল হলো الرجل। (প্রকাশ্য বিশেষ্য) পক্ষান্তরে نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ-এর মধ্যে ফায়েল হলো সর্বনাম هو যা نعم-এর মাঝে উহ্য আছে। উল্লেখ্য যে, এ সর্বনামের ইসমটি ইতঃপূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। সর্বনামের ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে প্রথমত কোনো প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করা, এরপর সে স্থানে সর্বনামকে ব্যবহার করা। প্রথমেই সর্বনাম ব্যবহার সাধারণ নিয়মবহির্ভূত। অতএব, প্রথমেই সর্বনাম ব্যবহার করা সাধারণ নিয়মের পরিপন্থি। তা ছাড়া ফায়েলটি সর্বনামের মাধ্যমে অস্পষ্ট হয়েছে, তারপর তার ব্যাখ্যা দ্বারা সে অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে تفسير بعد الابهام-এর নিয়মানুসারে। কিন্তু যেহেতু এটি নাহুর নিয়মের অধীনেই করা হয়েছে এবং এভাবেই ব্যবহার করার নিয়ম, তাই এটি স্থান-কাল-পাত্র অনুসারেই হলো।

উল্লেখ্য যে, স্থান-কাল-পাত্র-এর অনুযায়ী হওয়া এবং স্থান-কাল-পাত্রের প্রকাশ্য অবস্থানুযায়ী হওয়ার মাঝে পার্থক্য কিতাবের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, نعم-এর সর্বনামের مرجع এমন বিষয় যা মনের মাধ্যে অবস্থিত, যুক্তিসম্মত, কিন্তু অস্তিত্বের প্রশ্নে অস্পষ্ট। অস্পষ্টতার কারণ হচ্ছে, এর مرجع পুরুষও হতে পারে আবার নারীও, একটি হতে পারে আবার একাধিকও। এর পর যখন رجلا তাকিদ আনা হলো তখন সর্বনামটির জিনস (যাত) জানা গেল এবং এরপর যখন মাখসূসকে উল্লেখ করা হলো তখন এর সত্তাও সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, সেই পুরুষটি হচ্ছে যায়েদ।

মুসান্নিফ বলেন, উল্লিখিত বিশ্লেষণ نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ-এর একটি তারকীব অনুসারে সঠিক। এর ভিন্ন আরেকটি তারকীব এমন যে, এতে اسم ظاهر-এর স্থানে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়নি। সে তারকীব অনুসারে বিশ্লেষণ : نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ এ বাক্যে زيد (مَخْصُوْصُ بِالْمَدْحِ) হচ্ছে উহ্য মুবতাদার খবর। উহ্য ইবারত হবে نِعْمَ رَجُلًا هُوَ زَيْدٌ এখানে ফায়েল হবে نعم স্থিত উহ্য সর্বনাম। দ্বিতীয় তারকীব হচ্ছে زيد (যা মাখসূস হয়েছে) মুবতাদা, আর نِعْمَ رَجُلًا হচ্ছে অগ্রবর্তী খবর। মুবদাতা ও খবর মিলে جُمْلَةَ اِسْمِيَّة হয়েছে।

এ তারকীব অনুসারে উল্লিখিত প্রকাশ্য বিশেষ্যের স্থানে সর্বনাম ব্যবহার করার উদাহরণ এটি হতে পারে না।

কারণ, زيد যা বাক্যের মুবতাদা, তা শাব্দিকভাবে পশ্চাদ্বর্তী হলেও মুবতাদা হওয়ার কারণে মর্যাদাগতভাবে অগ্রবর্তী। আর অগ্রবর্তী হলে সর্বনাম প্রথমেই ব্যবহার হচ্ছে না; বরং এর مرجع প্রথমে এসে গেছে, আগে مرجع যাওয়ার পর সর্বনাম ব্যবহার করাই হলো যাহির বা প্রকাশ্য অবস্থার চাহিদা আর যাহিরের চাহিদা মোতাবেক বাক্যটি যখন ব্যবহার হলো, তখন বাক্যটি প্রকাশ্য বিশেষ্যের স্থানে সর্বনামকে রাখার প্রকারের মধ্যে গণ্য হলো না।

قَوْلُهُ وَيَكُوْنُ اِلْتِزَامُ اِفْرَادِ : এ বাক্য দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হচ্ছে যে, نعم-এর সর্বনাম যেহেতু মাখসূস-এর দিকে ফিরেছে, অতএব মাখসূসের বচনভেদে نِعْمَ-এর মধ্যে পরিবর্তন করা আবশ্যক এবং এভাবে বলা উচিত نِعْمَا رَجُلَيْنِ الزَّيْدَانِ ও نِعْمُوْا رِجَالًا الزَّيْدُوْنَ তাহলে সর্বনাম এবং তার مرجع-এর মধ্যে تطابق হতো। অথচ এমন তো করা হয় না; বরং نِعْمَ সব সময় একবচনই থাকে।

এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, نِعْمَ হচ্ছে اَفْعَال جَامِدَه-এর অন্তর্ভুক্ত। অনেকে তো একে বিশেষ্যরূপে গণ্য করেছেন। যেহেতু (فعل جامد)-এর জন্য মুফরাদ হওয়া আবশ্যক, তাই সব সময় مفرد রূপে ব্যবহার হয়। আর এটাই তার বৈশিষ্ট্য।

وَقَوْلُهُمْ هُوَ اَوْ هِىَ زَيْدٌ عَالِمٌ مَكَانَ الشَّانِ اَوِ الْقِصَّةِ فَالْاِضْمَارُ فِيْهِ اَيْضًا خِلَافُ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ لِعَدَمِ التَّقَدُّمِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاِسْتِعْمَالَ عَلٰى اَنَّ ضَمِيْرَ الشَّانِ اِنَّمَا يُؤَنَّثُ اِذَا كَانَ فِى الْكَلَامِ مُؤَنَّثٌ غَيْرُ فُضْلَةٍ نَحْوُ هِىَ هِنْدٌ مَلِيْحَةٌ فَقَوْلُهُ هِىَ زَيْدٌ عَالِمٌ مُجَرَّدُ قِيَاسٍ -

অনুবাদ : **আর তার উক্তি هُوَ اَوْ هِىَ زَيْدٌ عَالِمٌ এটি شَان এবং قِصَّة-এর স্থলে ব্যবহৃত হচ্ছে।** এতে সর্বনাম ব্যবহার করাও প্রকাশ্য অবস্থার চাহিদার বিপরীত, এর পূর্বে আলোচনা না অতিবাহিত হওয়ার কারণে। জেনে রাখুন– شَان-এর সর্বনামে স্ত্রীলিঙ্গ হয় যখন বাক্যে প্রকৃত স্ত্রীলিঙ্গ থাকে, এটাই প্রচলিত ব্যবহার। যেমন– هِىَ هِنْدٌ مَلِيْحَةٌ তার উক্তি هِىَ زَيْدٌ عَالِمٌ হচ্ছে যুক্তির আলোকে উদাহরণ (এর বাস্তব ব্যবহার এরূপ নয়)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ هُوَ الخ বাক্য প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত হয়, এর আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে– ضَمِيْر شَان ও ضَمِيْر قِصَّة। এটিও প্রকাশ্য বিশেষ্যর স্থলে সর্বনামকে ব্যবহার করার উদাহরণ। যেমন– شَان-এর স্থলে هُوَ زَيْدٌ عَالِمٌ বলা এবং قِصَّة-এর স্থানে هِىَ زَيْدٌ عَالِمٌ বলা, যেহেতু شَان-এর স্থানে সর্বনামটি ব্যবহার হয়, তাই তাকে ضَمِيْر شَان বলা হয়। আর যেহেতু هى قِصَّة-এর স্থানে ব্যবহার হয়, তাই তাকে ضَمِيْر قِصَّة বলা হয়।

ضَمِيْر شَان وَضَمِيْر قِصَّه -কে "প্রকাশ্য অবস্থার চাহিদার বিপরীত" বলার কারণ হচ্ছে এই সর্বনামগুলো সাধারণ রীতির বিপরীতে ব্যবহার হয়েছে। সর্বনাম ব্যবহার করার রীতি হচ্ছে, প্রথমে কোনো ইসমে যাহির ব্যবহার করার পর উক্ত বিশেষ্যের সর্বনাম ব্যবহার করা হবে। কিন্তু এখানে তা করা হয়নি, এখানে প্রথমেই সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে সে রীতির বিপরীতে হওয়াতে প্রকাশ্য অবস্থার চাহিদার বিপরীত হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, هُوَ زَيْدٌ قَائِمٌ-এর তারকীব হচ্ছে هو মুবতাদা, زَيْدٌ قَائِمٌ জুমলা হয়ে সে মুবতাদার খবর। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে মুবতাদার খবর জুমলা হলে সে খবরের সাথে মুবতাদার একটি সংযোগকারী থাকা অত্যাবশ্যকীয়, যাতে খবরটি মুবতাদার সাথে যুক্ত থাকে, অথচ এখানে এমন কোনো সংযোগকারী নেই, এমতাবস্থায় زَيْدٌ قَائِمٌ-কে هو-এর খবর বলা কতটা সমীচীন হবে? এর উত্তর হচ্ছে, যে বাক্য ضَمِيْر شَان-এর ব্যাখ্যা করে, যেমন এখানে زَيْدٌ قَائِمٌ হচ্ছে هو-এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা আর যেটা তাফসীর সেটা মুবতাদার হুকুমে, মুবতাদা (هو)-এর একবচন হওয়ার কারণে তার তাফসীর জুমলাটিও مفرد-এর হুকুমে হয়ে যাবে। আর مفرد কোনো সংযোগকারীর মুখাপেক্ষী হয় না। অতএব, এ বাক্যটিও সংযোগকারীর মুখাপেক্ষী হবে না।

قَوْلُهُ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاِسْتِعْمَالَ عَلٰى الخ : এখানে থেকে মুসান্নিফ লেখকের উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে, মূল লেখকের উক্তি هُوَ اَوْ هِىَ زَيْدٌ قَائِمٌ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আরবদের থেকে هُوَ زَيْدٌ قَائِمٌ-এর ব্যবহার যেমন বর্ণিত এমনিভাবে هى زيد قائم-এর ব্যবহারও বর্ণিত, আরবরা এ দু'ভাবেই এটা ব্যবহার করে থাকেন। অথচ আরবদের সাধারণ ব্যবহার এরূপ নয়। আরবরা هِىَ زَيْدٌ قَائِمٌ এমন ব্যবহার কখনোই করেন না। এর কারণ হচ্ছে, অর্থগতভাবে ضَمِيْر شَان এবং ضَمِيْر قِصَّة যদিও একই ধরনের; কিন্তু তারা এ ব্যাপারে একটি পরিভাষা তৈরি করেছেন যে, বাক্যটি যে সর্বনামের তাফসীর হবে সেই বাক্যটিতে যদি হাকীকী (প্রকৃত) স্ত্রীলিঙ্গ থাকে, তাহলে সে সর্বনামটি অবশ্যই স্ত্রীলিঙ্গবাচক সর্বনাম হবে। যেমন– هِىَ هِنْدٌ مَلِيْحَةٌ এ সর্বনামটিকে তারা ضَمِيْر قِصَّة বলেন। আর যদি সেটিতে প্রকৃত স্ত্রীলিঙ্গ সর্বনাম না থাকে, তাহলে সর্বনামটিকে পুংলিঙ্গ আনতে হবে, তাকে তারা ضَمِيْر شَان বলেন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, زَيْدٌ قَائِمٌ-এর মধ্যে কোনো প্রকৃত স্ত্রীলিঙ্গ নেই, তাই তার সর্বনামটি পুংলিঙ্গের হবে এবং هُوَ زَيْدٌ قَائِمٌ-ই ব্যবহার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে هِىَ زَيْدٌ قَائِمٌ ব্যবহার করা মোটেও সমীচীন হবে না। এ জন্যই আরবরা এ জাতীয় বাক্যে هِىَ زَيْدٌ قَائِمٌ ব্যবহার করেন না। সুতরাং যখন আরবদের ব্যবহার هِىَ زَيْدٌ قَائِمٌ নেই, তাই এরূপ বর্ণিত হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই মূল লেখকের قولهم বলে আরবদের ব্যবহার উদ্ধৃত করা কি সঠিক?

এর জবাব হচ্ছে মূল লেখক যুক্তির আলোকে এ কথা বলেছেন যে, هُوَ اَوْ هِىَ زَيْدٌ قَائِمٌ এটা আরবদের ব্যবহার, তিনি আরবদের ব্যবহারকে যথার্থ অনুসন্ধান করে এ কথা বলেননি; বরং তিনি هِىَ هِنْدٌ مَلِيْحَةٌ-এর উপর কিয়াস করে বলেছেন। তার কিয়াসের ভিত্তি হচ্ছে উভয় সর্বনাম قصة-এর প্রতি ফিরেছে।

ثُمَّ عَلَّلَ وَضْعَ الْمُضْمَرِ مَوْضِعَ الْمُظْهَرِ فِى الْبَابَيْنِ بِقَوْلِهِ لِيَتَمَكَّنَ مَا يَعْقُبُهُ اَىْ يَعْقُبُ ذٰلِكَ الضَّمِيْرَ اَىْ يَجِئُ عَلٰى عَقِبِهِ فِىْ ذِهْنِ السَّامِعِ لِاَنَّهُ اَىْ السَّامِعَ اِذَا لَمْ يَفْهَمْ مِنْهُ اَىْ مِنَ الضَّمِيْرِ مَعْنًى اِنْتَظَرَهُ اَىْ اِنْتَظَرَ السَّامِعُ مَا يَعْقُبُ الضَّمِيْرَ لِيَفْهَمَ مِنْهُ مَعْنًى فَيَتَمَكَّنُ بَعْدَ وُرُوْدِهِ فَضْلَ تَمَكُّنٍ لِاَنَّ الْمَحْصُوْلَ بَعْدَ الطَّلَبِ اَعَزُّ مِنَ الْمِنْسَاقِ بِلَاتَعْبٍ وَلَا يَخْفٰى اَنَّ هٰذَا لَايَحْسُنُ فِىْ بَابِ نِعْمَ لِاَنَّ السَّامِعَ مَالَمْ يَسْمَعِ الْمُفَسِّرَ لَمْ يَعْلَمْ اَنَّ فِيْهِ ضَمِيْرًا فَلَايَتَحَقَّقُ فِيْهِ الشَّوْقُ وَالْاِنْتِظَارُ ـ

অনুবাদ : অতঃপর তিনি সর্বনামকে দু'টি অধ্যায়ে প্রকাশ্য বিশেষ্যর স্থানে ব্যবহার করার কারণ আলোচনা করেছেন, তার এ বক্তব্যের সাহায্যে, **যাতে তার পরবর্তী কথা অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে স্থান করে নেয়।** অর্থাৎ সেই সর্বনামের পরে তথা তার পরে এসে শ্রোতার মনে স্থান করবে। **কেননা, শ্রোতা যখন এর** অর্থাৎ সর্বনাম থেকে **কোনো অর্থ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন অপেক্ষা করবে।** অর্থাৎ শ্রোতা সর্বনামের পরে কি আসে তার অপেক্ষা করবে, যাতে তার অর্থ অনুধাবন করতে পারে। সুতরাং এর পরে তার মনে এটি বিশেষ স্থান করে নিবে। কেননা, তত্ত্ব-তালাশের পর অর্জিত বিষয় এমনিতে বিনাশ্রমে অর্জিত বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় হয়। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, نعم-এর অধ্যায়ে এ উত্তর উত্তম হবে না। কেননা, (نِعْمَ-এর অধ্যায়ে) শ্রোতা যে পর্যন্ত ব্যাখ্যাকারী শব্দটি না শুনবে সে জানতেই পারবে না যে, এখানে একটি সর্বনাম ছিল। অতএব, এতে আগ্রহ ও অপেক্ষা পাওয়া যায় না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ ثُمَّ عَلَّلَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূল লেখক (اَفْعَال مَدْح وَ ذَم)-এর অধ্যায়ে সর্বনামকে প্রকাশ্য বিশেষ্যের স্থানে রাখার কারণ বর্ণনা করেছেন তার একটি মাত্র বাক্য দ্বারা। তার সে বাক্যটি হচ্ছে لِيَتَمَكَّنَ مَا يَعْقُبُهُ অর্থাৎ সর্বনামকে প্রকাশ্য বিশেষ্যর স্থানে ব্যবহার করা হয়, যাতে সর্বনামের পরে আসা বিষয়টি শ্রোতার মনে ভালোভাবে বসে যায় এবং সুদৃঢ় স্থান করে নেয়। কেননা, শ্রোতা যখন প্রথমেই সর্বনামটি শুনবে এবং তার مرجع খুঁজে পাবে না, তখন সে কোনো অর্থ অনুধাবন করতে পারবে না এবং সর্বনাম তার কাছে দুর্বোধ্য থেকে যাবে, ফলে সে এর পরবর্তী বাক্যের অপেক্ষায় থাকবে এবং তার সর্বনামটির অর্থ বুঝার জন্য এক ধরনের উৎসুক ও আগ্রহ সৃষ্টি হবে। আর আগ্রহ ও অপেক্ষার পর যা অর্জিত হয় তা এমনিতে বিনা শ্রমে যা অর্জিত হয়, তার চেয়ে বেশি প্রিয় এবং হৃদয়ে স্থান লাভ করে। কেননা, এতে একেতো জ্ঞানার্জনের স্বাদ, সেই সাথে অপেক্ষার কষ্ট দূর হওয়ার আরাম, উভয় হাসিল হচ্ছে। আর যা বিনা শ্রমে অর্জিত হয় তাতে যদিও জ্ঞানার্জন হয়; কিন্তু অপেক্ষার কষ্ট দূর হওয়ার আরাম তাতে নেই। আর এটাতো দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, কষ্ট লাঘব হওয়ার আরাম উত্তম বলে গণ্য হয় এমন আরাম থেকে যা বিনা শ্রমে অর্জিত হয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَخْفٰى اَنَّ هٰذَا لَايَحْسُنُ : মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখকের এ কারণটি نعم তথা اَفْعَال مَدْح وَ ذَم-এর বেলায় যথার্থ বলে গণ্য হয় না, কেননা نعم সহ অন্যান্য নিন্দা ও প্রশংসাসূচক বাক্যে ব্যাখ্যাকারী শব্দটি শোনার আগে শ্রোতা এর মধ্যে অবস্থিত সর্বনামটি সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যায়। কেননা, ব্যাখ্যাকারী শব্দটির সঙ্গে এ সম্ভাবনা যেমন থাকে যে, এতে সর্বনাম আছে, আবার এ সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে যে, এতে এর ফায়েল প্রকাশ্য বিশেষ্যই হবে। আর এ কারণে শ্রোতার কাছে বিশেষ কোনো আগ্রহ ও অপেক্ষা এখানে সৃষ্টি হবে না। আর আগ্রহ ও অপেক্ষা না থাকলে এর পরের বাক্যটি মনের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে স্থান লাভ করবে না। অতএব, نعم-এর ক্ষেত্রে উল্লিখিত কারণটি প্রযোজ্য হলো না।

এর উত্তরে এটা বলা যেতে পারে যে, মূল লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ অবস্থা যখন শ্রোতার জানা থাকবে যে, نعم মধ্যে সর্বনাম লুক্কায়িত আছে, অতএব, এর পরে যখন কাজের বাকি অংশ প্রকাশ করা হবে, তখন শ্রোতার কাছে বিষয়টি পাকাপোক্তভাবে স্থান করে নিবে। শ্রোতার পূর্ব থেকে জ্ঞান লাভ করার জন্য তাফসীর-এর উল্লেখ জরুরি নয়; বরং অন্য কোনো লক্ষণের মাধ্যমে তা জানতে সক্ষম হতে পারে। মোটকথা, যখন শ্রোতার এটা জানা থাকবে যে, نعم-এর মধ্যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার পূর্বে কোনো مرجع যায়নি, তখন সেই সর্বনামের পর আগত বিষয়ের প্রতি তার বিশেষ উৎসুক তৈরি হবে, আর এ অপেক্ষা ও আগ্রহের পর বাক্যটি বলা হলে তার মনে তা বিশেষ স্থান করে নিবে।

وَقَدْ يُعْكَسُ وَضْعُ الْمُضْمَرِ مَوْضِعَ الْمُظْهَرِ اَىْ يُوْضَعُ الْمُظْهَرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ فَاِنْ كَانَ الْمُظْهَرُ الَّذِىْ وُضِعَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اِسْمُ اِشَارَةٍ فَلِكَمَالِ الْعِنَايَةِ بِتَمْيِيْزِهٖ اَىْ تَمْيِيْزِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ لِاخْتِصَاصِهٖ بِحُكْمٍ بَدِيْعٍ كَقَوْلِهٖ شِعْرٌ كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ هُوَ وَصْفُ عَاقِلِ الْاَوَّلِ بِمَعْنًى كَامِلِ الْعَقْلِ مُتَنَاهٍ فِيْهِ اَعْيَتْ اَىْ اَعْيَتْهُ وَاَعْجَزَتْهُ اَوْ اَعْيَتْ عَلَيْهِ وَصَعُبَتْ مَذَاهِبُهٗ * اَىْ طُرُقُ مَعَاشِهٖ وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوْقًا ، هٰذَا الَّذِىْ تَرَكَ الْاَوْهَامَ حَائِرَةً وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيْرَ اَىِ الْمُتْقِنَ مِنْ نَحَرَ الْاُمُوْرَ عِلْمًا اَتْقَنَهَا زِنْدِيْقًا كَافِرًا نَافِيًا لِلصَّانِعِ الْعَدْلِ الْحَكِيْمِ فَقَوْلُهٗ هٰذَا اِشَارَةٌ اِلٰى حُكْمٍ سَابِقٍ غَيْرِ مَحْسُوْسٍ وَهُوَ كَوْنُ الْعَاقِلِ مَحْرُوْمًا وَالْجَاهِلِ مَرْزُوْقًا فَكَانَ الْقِيَاسُ فِيْهِ الْاِضْمَارُ فَعُدِلَ اِلٰى اِسْمِ الْاِشَارَةِ لِكَمَالِ الْعِنَايَةِ بِتَمْيِيْزِهٖ لِيُرِىَ السَّامِعِيْنَ اَنَّ هٰذَا الشَّىْءَ الْمُتَمَيِّزَ الْمُتَعَيَّنَ هُوَ الَّذِىْ لَهُ الْحُكْمُ الْعَجِيْبُ وَهُوَ جَعْلُ الْاَوْهَامِ حَائِرَةً وَالْعَالِمِ النِّحْرِيْرِ زِنْدِيْقًا فَالْحُكْمُ الْبَدِيْعُ هُوَ الَّذِىْ اُثْبِتَ لِلْمُسْنَدِ اِلَيْهِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِاسْمِ الْاِشَارَةِ ـ

অনুবাদ : **কখনো** প্রকাশ্য বিশেষ্যের স্থানে সর্বনাম রাখার **বিপরীত করা হয়** অর্থাৎ সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্যকে রাখা হয়। **যদি** সর্বনামের স্থানে ব্যবহারের বিশেষ্যটি **ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য** (اِسْمُ اِشَارَةٍ) **হয়** (এটা করা হয়) **মুসনাদ ইলাইহকে ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব** দেওয়ার জন্য **মুসনাদ ইলাইহটি একটি বিচিত্র হুকুমের সাথে খাস হওয়ার কারণে, যেমন তার কবিতা :** অর্থাৎ **বহু মহাজ্ঞানী রয়েছে,** দ্বিতীয় عَاقِلٌ শব্দটি প্রথম عَاقِلٌ-এর সিফাত। অর্থ পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ও চূড়ান্ত পর্যায়ের বুদ্ধিমান। **তাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে** অথবা তার জন্য কঠিন ও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে **জীবিকা, আর অনেক গণ্ডমূর্খ লোক প্রচুর পরিমাণে রিজিক** (জীবিকা) **প্রাপ্ত এ ব্যাপারটা জ্ঞানী লোকদের** চিন্তিত করেছে, আর সুবিজ্ঞ পণ্ডিতদের **নাস্তিকে পরিণত করেছে।** نِحْرِيْرٌ শব্দটি نَحَرَ الْاُمُوْرَ অর্থ– সুনিশ্চিতভাবে জেনেছে زِنْدِيْقٌ শব্দের অর্থ– অবিশ্বাসী মহান কুশলী ন্যায়পরায়ণ স্রষ্টাকে অস্বীকারকারী। তার শব্দ هٰذَا দ্বারা ইতঃপূর্বে বিবৃত ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে জ্ঞানী ব্যক্তির বঞ্চিত হওয়া এবং মূর্খের প্রচুর জীবিকা লাভ করা। এখানে সর্বনাম ব্যবহারই ছিল যথা নিয়ম। এ থেকে ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্যর দিকে তিনি গেছেন বিষয়টিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিচিত ও পৃথক করার জন্য, যাতে শ্রোতাদের দেখানো যায় যে, এটা এমন একটি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির বিষয় যার ব্যাপারে রয়েছে একটি আশ্চর্যপূর্ণ হুকুম। আর তা হচ্ছে জ্ঞানীদের চিন্তা এবং সুবিজ্ঞ পণ্ডিতদের নাস্তিকে পরিণত হওয়া। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হুকুম যা মুসনাদ ইলাইহের জন্য প্রমাণ করা হয়েছে ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্যর মাধ্যমে ব্যক্ত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَقَدْ يُعْكَسُ الخ : লেখক বলেন, مُقْتَضَى الظَّاهِرِ (প্রকাশ্য চাহিদা)-এর বিপরীত আরেকটি অবস্থা হচ্ছে সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্যের ব্যবহার। আমরা জানি, প্রকাশ্য বিশেষ্য বা ইসমে যাহির কয়েক প্রকার যথা– নামবাচক বিশেষ্য, ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য, নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্য ইত্যাদি।

এর মধ্য থেকে ইসমে ইশারা (ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য)-কে সর্বনামের স্থানে ব্যবহার করা হয়। এটা করা হয় মুসনাদ ইলাইহকে অন্যান্য বিশেষ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও আলাদা করার ব্যাপারে চূড়ান্ত গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে. আলাদা করার ব্যাপারে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়– এ জন্য যে, মুসনাদ ইলাইহ কোনো চমকপ্রদ আশ্চর্য হুকুমের সাথে খাস হওয়া এবং উক্ত হুকুম মুসনাদ ইলাইহের সাথে যুক্ত হয়।

যেমন কবি আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক রাওয়ান্দী-এর কবিতা–

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ اَعْيَتْ مَذَاهِبُهٗ * وَ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوْقًا

هٰذَا الَّذِىْ تَرَكَ الْاَوْهَامَ حَائِرَةً * وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيْرَ زِنْدِيْقًا ـ

কবিতার শাব্দিক বিশ্লেষণ :

দ্বিতীয় عَاقِلٍ হচ্ছে প্রথম عَاقِلٍ-এর সিফাত, অর্থ– পূর্ণ বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। এমনিভাবে كَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ-এর দ্বিতীয় جَاهِلٍ শব্দটি প্রথম جَاهِلٍ-এর সিফাত। এর অর্থ– গণ্ডমূর্খ।

اَعْيَتْ ফে'লটি لَازِمْ ও مُتَعَدِّىْ উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। মুসান্নিফ مُتَعَدِّىْ-এর প্রতি اَعْيَتْهُ (মাফউলসহ)-এর মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন তার সমার্থক হচ্ছে اعجز। অর্থ– অক্ষম করে দেওয়া। لَازِمْ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন اَعْيَتْ عَلَيْهِ-এর মাধ্যমে لَازِمْ-এর অর্থ হচ্ছে কঠিন ও কষ্টসাধ্য হয়ে যাওয়া। مَرْزُوْق শব্দের অর্থ– রিযিকপ্রাপ্ত। শব্দটি اِسْم مَفْعُوْل-এর সীগাহ। اَوْهَامْ শব্দটি هَامْ-এর বহুবচন। অর্থ– জ্ঞান, এখানে জ্ঞানী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

عَالِم نِحْرِيْر : نِحْرِيْر-এর অর্থ– অভিজ্ঞ, বিদ্বগ্ধ আলিম। مَذَاهِبُ শব্দটি مَذْهَبُ-এর বহুবচন। এর অর্থ –গন্তব্য, যে স্থানে যাওয়া হয়, তরিকা, মত পথ ও রীতি ইত্যাদি। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জীবিকা উপার্জনের পথ ও পেশা। পুরো কবিতার অর্থ– অনেক জ্ঞানী মহাজ্ঞানীর জীবিকা উপার্জনের পথ নষ্ট হয়ে গেছে, অথবা তাদের ধর্মীয় অনুশাসন তাদের বিরত রেখেছে। আর অনেক অকাট্য মূর্খ লোককে তুমি পাবে যে, প্রচুর জীবিকার অধিকারী জ্ঞানীলোকের বঞ্চিত হওয়া এবং মূর্খ লোকের নিয়ামতপ্রাপ্ত হওয়া এমন বিষয় যা বড় বড় জ্ঞানী মহাজ্ঞানীদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে এবং সুবিজ্ঞ আলিমদের অনেককে নাস্তিক মুরতাদে পরিণত করেছে।

অর্থাৎ রিযিকের তারতম্যের কারণে তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ইনসাফ ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগবে। এ প্রশ্ন হয়তো কাউকে নাস্তিকে পরিণত করবে।

কবিতার هٰذَا হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ, তার মুসনাদ হচ্ছে اَلَّذِىْ تَرَكَ الْاَوْهَامَ এখানে هٰذَا-এর দ্বারা তিনি পূর্ববর্তী কথা আলিম বঞ্চনা এবং মূর্খলোক রিযিকপ্রাপ্ত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অতএব, এখানে নিয়মের অনুসরণ করত সর্বনাম ব্যবহার করা হয়নি; বরং নিয়মের বিপরীতে প্রকাশ্য বিশেষ্য (هٰذَا)-কে ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লিখিত হুকুমটি হচ্ছে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত জ্ঞান। এর জন্য সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করা হয় না। কারণ, ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

সারকথা হচ্ছে, এখানে সর্বনাম ব্যবহার করা ছিল নিয়মের অনুসরণ এবং যাহির অনুসারে কাজ করা, কিন্তু তা না করে নিয়মের এবং যাহিরের বিপরীতে প্রকাশ্য বিশেষ্য (ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য) ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে মুসনাদ ইলাইহ অপরাপর বিশেষ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে যায় এবং যাতে শ্রোতাদের এ কথা বুঝানো যায় যে, এ বিষয় (জ্ঞানী লোকের বঞ্চনা এবং মূর্খদের অঢেল জীবিকা) অপরাপর বিষয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আলাদা বিষয়। আর এটাই তো এমন বিষয় যার মধ্যে একটি বিশেষ চমকপ্রদ হুকুম (জ্ঞানীদের চিন্তিত এবং সুবিজ্ঞ আলিমদের নাস্তিকে পরিণত হওয়া) প্রমাণ করা হয়েছে।

সুতরাং এ বিশেষ চমকপ্রদ হুকুমটি এমন মুসনাদ ইলাইহের জন্য প্রমাণ করা হলো যাকে ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

اَوِ التَّهَكُّمِ عَطْفٌ عَلٰى كَمَالِ الْعِنَايَةِ بِالسَّامِعِ كَمَا اِذَا كَانَ السَّامِعُ فَاقِدَ الْبَصَرِ اَوْ لَايَكُوْنُ ثَمَّةَ مُشَارٌ اِلَيْهِ اَصْلًا اَوِ النِّدَاءِ عَلٰى كَمَالِ بَلَادَتِهِ اَىْ بَلَادَةِ السَّامِعِ بِاَنَّهُ لَا يُدْرِكُ غَيْرَ الْمَحْسُوْسِ اَوْ عَلٰى كَمَالِ فَطَانَتِهِ بِاَنَّ غَيْرَ الْمَحْسُوْسِ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحْسُوْسِ اَوْ اِدِّعَاءِ كَمَالِ ظُهُوْرِهِ اَىْ ظُهُوْرِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ اَىْ وَعَلٰى وَضْعِ اِسْمِ الْاِشَارَةِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ لِادِّعَاءِ كَمَالِ الظُّهُوْرِ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْبَابِ اَىْ غَيْرِ بَابِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ **شِعْرٌ** تَعَالَلْتِ اَىْ اَظْهَرْتِ الْعِلَّةَ وَالْمَرَضَ كَىْ اَشْجٰى اَىْ اَحْزَنَ مِنْ شَجِىَ بِالْكَسْرِ صَارَ حَزِيْنًا لَا مِنْ شَجِىَ بِالْعَظْمِ بِالْفَتْحِ بِمَعْنٰى نَشَبَ فِىْ حَلْقِهِ وَمَا بِكِ عِلَّةٌ * تُرِيْدِيْنَ قَتْلِىْ قَدْ ظَفِرْتِ بِذٰلِكِ اَىْ بِقَتْلِىْ كَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ اَنْ يَّقُوْلَ بِهِ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْسُوْسٍ فَعَدَلَ اِلٰى ذٰلِكِ اِشَارَةً اِلٰى اَنَّ قَتْلَهُ قَدْ ظَهَرَ ظُهُوْرَ الْمَحْسُوْسِ ـ

অনুবাদ : **অথবা শ্রোতাকে বিদ্রূপ করার জন্য** এটি كَمَالُ الْعِنَايَةِ-এর উপর আত্ফ হয়েছে। **যেমন শ্রোতা দৃষ্টিহীন হলে** অথবা যেখানে মোটেও কোনো মুশারুন ইলাইহ না থাকলে **অথবা তার পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের জন্য** যে, সে অনিন্দ্রিয় কোনো বিষয় অনুধাবন করতে পারে না **অথবা তার পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার প্রতি ইঙ্গিত দানের জন্য** যে, তার অনিন্দ্রিয় বিষয়গুলো ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়ের মতো **অথবা তার** অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের **পূর্ণ বিকাশমান দাবি করত। এটি** অর্থাৎ পূর্ণ বিকাশমান হওয়ার দাবি করত ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্যকে সর্বনামের স্থানে রাখা **এ অধ্যায়ের** অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের অধ্যায়ের **বাইরে থেকেও হয়ে থাকে।** কবিতা (অর্থ) **তুমি অসুস্থতার ভান করেছ যাতে আমার কষ্ট হয়।** اَشْجٰى অর্থ– কষ্ট ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়া এটা شَجِىَ (بَابُ سَمِعَ) যেরযুক্ত অর্থ– সে দুঃখিত হলো। এটা شَجِىَ بِالْعَظْمِ (بَابُ ضَرَبَ) যবরযুক্ত নয়, যার অর্থ গলায় হাড় বা কাটা আটকে যাওয়া, **অথচ তোমার রোগ নেই। তুমি আমায় হত্যা করতে চেয়েছ। তুমি এ ব্যাপারে আমাকে হত্যা করতে সফল হয়েছ।** যাহিরী অবস্থার দাবি হচ্ছে بِهٖ বলা (بِذٰلِكِ-এর স্থানে) কেননা, এটা তো ইন্দ্রিয়লব্ধ নয় সুতরাং তিনি ঐ পথে গেলেন এ কথার ইঙ্গিত করার জন্য যে, তা ইন্দ্রিয়ানুভূত হওয়ার মতো বিকশিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اَوِ التَّهَكُّمِ الخ : উল্লিখিত ইবারতে প্রকাশ্য বিশেষ্যের স্থানে সর্বনামকে ব্যবহার করার আরো কতিপয় কারণ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্য থেকে একটি কারণ اَلتَّهَكُّمُ অর্থ শ্রোতার প্রতি বিদ্রূপ ও উপহাস করার জন্য। মুসান্নিফ বলেন, اَلتَّهَكُّمْ শব্দটি كَمَالُ الْعِنَايَةِ-এর উপর আত্ফ হয়েছে। كَمَال عِنَايَةْ যেমনটি ইসমে ইশারা ব্যবহার করার কারণ তেমনি تَهَكُّمْ بِالسَّامِعِ ও ইসমে ইশারা ব্যবহার করার কারণ। মোটকথা, শ্রোতার প্রতি বিদ্রূপ করার জন্য প্রকাশ্য বিশেষ্য আনা হয়, যেমন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি শ্রোতা হলে তাকে বিদ্রূপ করার জন্য বললে هٰذَا ضَرَبَكَ (এ তোমাকে মেরেছে) এটা তখন বলবে, যখন অন্ধ ব্যক্তি বলবে আমাকে কে মেরেছে। তুমি বললে هٰذَا ضَرَبَكَ এখানে প্রশ্নের মধ্যে যেহেতু مَرْجِعْ আছে তাই যাহিরী অবস্থার দাবি মতে এখানে শুধুমাত্র زَيْدٌ বলে দিলেই যথেষ্ট হতো; কিন্তু দৃষ্টিহীন শ্রোতার সাথে ঠাট্টা করার জন্য যাহিরী অবস্থার বিপরীতে সর্বনামের স্থানে ইঙ্গিতবাচক শব্দ দ্বারা বলল هٰذَا زَيْدٌ।

অথবা শ্রোতা দৃষ্টিহীন নয়; বরং চক্ষুধারী, কিন্তু সেখানে মুশারুন ইলাইহ অনুপস্থিত, এমন সময় مَنْ ضَرَبَنِىْ-এর উত্তরে বলা হলো هٰذَا ضَرَبَكَ মুশারুন ইলাইহ অনুপস্থিত এ হিসেবে যাহিরী অবস্থার চাহিদা হলো ইঙ্গিতসূচক বাক্য বা শব্দ না ব্যবহার করে সর্বনাম ব্যবহার করা এবং বলা هُوَ زَيْدٌ কিন্তু শ্রোতাকে বিদ্রূপ করার জন্য বক্তা বলল هٰذَا ضَرَبَكَ।

قَوْلُهٗ اَوِ النِّدَاءِ عَلٰى كَمَالِ بَلَادَتِهٖ : অথবা শ্রোতার নির্বুদ্ধিতার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ইঙ্গিতসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেন শ্রোতা এতটা নির্বোধ যে, সে অনিন্দ্রিয় বিষয় অনুভব করতে পারে না, যেমন কেউ বলল مَنْ عَالِمُ الْبَلَدِ (শহরের আলিম কে?) এর উত্তরে বলা হলো ذٰلِكَ زَيْدٌ (ঐ যায়েদ) অথচ এখানে مَرْجِعْ উল্লেখ থাকার কারণে সর্বনাম ব্যবহার করে বলা দরকার ছিল هُوَ زَيْدٌ। কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা পরিহার করে ইঙ্গিতবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, শ্রোতা এতটা মেধাহীন যে, তাকে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে সে বুঝতে পারে না।

قَوْلُهٗ اَوْ عَلٰى كَمَالِ فِطَانَتِهٖ : অথবা কখনো শ্রোতার উজ্জ্বল মেধার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ইঙ্গিতবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয় যাতে এ কথা বুঝানো যায় যে, শ্রোতা এতটা মেধাবী যে, তার কাছে ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ ও ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয়ের মতো যেমন কোনো মাসআলা বর্ণনা প্রসঙ্গে শিক্ষক বলেন هٰذَا عِنْدَ فُلَانٍ ظَاهِرٌ (এটা অমুকের কাছে স্পষ্ট), এখানে مَرْجِعْ উল্লেখ থাকার কারণে বলা উচিত যে, هُوَ عِنْدَ ولان ظاهر কিন্তু শ্রোতার উজ্জ্বল মেধার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য যে, তার কাছে ইন্দ্রিয় ছাড়া বুঝা যায় না এমন বিষয়ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির মতো তাই ইঙ্গিতসূচক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَوْ اِدِّعَاءِ كَمَالِ ظُهُوْرِهٖ : কখনো মুসনাদ ইলাইহ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হাতের নাগালে, এ কথা বুঝানোর জন্য মুসনাদ ইলাইহকে ইঙ্গিতসূচক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এক কথায়, বক্তা ইসমে ইশারা ব্যবহার করার মাধ্যমে এ কথার দাবি করেন যে, মুসনাদ ইলাইহ যদিও প্রকাশ্য নয়; কিন্তু আমার কাছে তা চোখের দেখার মতো। যেমন কোনো ব্যক্তি তার বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য শ্রোতাকে বলল, هٰذِهٖ ظَاهِرَةٌ এটাতো সুস্পষ্ট। এখানে هِىَ ظَاهِرَةٌ বলা সমীচীন ছিল; কিন্তু তা না করে প্রকাশ্য হওয়ার দাবি করে ইঙ্গিতসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন هٰذِهٖ ظَاهِرَةٌ মূল লেখক বলেন, পরিপূর্ণ স্পষ্ট হওয়ার দাবি করত ইসমে ইশারাকে সর্বনামের স্থানে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্যান্য বিশেষ্যের বেলায় হতে পারে। যেমন নিম্নলিখিত কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি–

تَعَالَلْتِ كَىْ اَشْجٰى وَمَابِكِ عِلَّةٌ * تُرِيْدِيْنَ قَتْلِىْ قَدْ ظَفِرْتِ بِذٰلِكِ

শাব্দিক বিশ্লেষণ : تَعَالَلْتِ হচ্ছে (بَابُ تَفَاعُلٌ)-এর ফে'ল। এর অর্থ হচ্ছে– রোগ ব্যাধির ভান করা। اَشْجٰى উত্তম পুরুষের একবচন, এটি بَابُ سَمِعَ থেকে নির্গত, এর অর্থ– চিন্তিত এবং দুঃখিত হওয়া, এটি بَابُ ضَرَبَ থেকে নির্গত নয়, بَابُ ضَرَبَ থেকে হলে এর অর্থ হচ্ছে গলায় হাড় আটকে যাওয়া। عِلَّةٌ-এর বহুবচন عِلَلٌ অর্থ– রোগ ব্যাধি, কার্যকারণ ইত্যাদি। কবিতার অর্থ– আমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য তুমি রোগের ভান ধরেছ; অথচ তোমার মধ্যে কোনো রোগ নেই। তুমি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে এবং তোমার এ উদ্দেশ্য সফলকাম হয়েছে। এখানে প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত হুকুম আনা হয়েছে। কেননা مُقْتَضَى الظَّاهِرِ হচ্ছে قَدْ ظَفِرْتِ بِهٖ ব্যবহার করা, তা না করে এখানে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত এ দাবি করত এবং এটা বর্ণনার জন্য যে, এ হত্যাটি ইন্দ্রিয়ানুভূতির মতো দৃশ্যমান হয়ে গেছে। তিনি ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য ذٰلِكِ ব্যবহার করেছেন। بِهٖ-এর স্থানে ذٰلِكَ এখানে যের প্রদানকারী অব্যয় দ্বারা যেরযুক্ত হয়েছে, বিধায় এটি মুসনাদ ইলাইহ নয়।

وَاِنْ كَانَ الْمُظْهَرُ الَّذِىْ وُضِعَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ غَيْرَهُ اَىْ غَيْرَ اِسْمِ الْاِشَارَةِ فَلِزِيَادَةِ التَّمَكُّنِ اَىْ جَعْلِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ مُتَمَكِّنًا عِنْدَ السَّامِعِ نَحْوُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ اَىْ اَلَّذِىْ يُصْمَدُ اِلَيْهِ وَيُقْصَدُ فِى الْحَوَائِجِ مِنْ صَمَدَ اِلَيْهِ اِذَا قَصَدَ وَلَمْ يَقُلْ هُوَ الصَّمَدُ لِزِيَادَةِ التَّمَكُّنِ وَنَظِيْرُهُ اَىْ نَظِيْرُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ فِىْ وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ لِزِيَادَةِ التَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهِ اَىْ غَيْرِ بَابِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ وَبِالْحَقِّ اَىْ بِالْحِكْمَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْاِنْزَالِ اَنْزَلْنَاهُ اَىْ اَلْقُرْاٰنَ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ وَبِهٖ نَزَلَ اَوْ اِدْخَالُ الرَّوْعِ عَطْفٌ عَلٰى زِيَادَةِ التَّمَكُّنِ فِىْ ضَمِيْرِ السَّامِعِ وَتَرْبِيَةِ الْمَهَابَةِ وَهٰذَا كَالتَّاكِيْدِ لِاِدْخَالِ الرَّوْعِ اَوْ تَقْوِيَةِ دَاعِى الْمَامُوْرِ وَمِثَالُهُمَا اَىْ مِثَالُ التَّقْوِيَةِ وَاِدْخَالُ الرَّوْعِ مَعَ التَّرْبِيَةِ قَوْلُ الْخُلَفَاءِ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَاْمُرُكَ بِكَذَا مَكَانَ اَنَا اٰمُرُكَ ـ

অনুবাদ : **যদি** সর্বনামের স্থলে ব্যবহৃত প্রকাশ্য বিশেষ্যটি ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্যের চেয়ে **ভিন্ন কোনো বিশেষ্য হয়,** তাহলে তা ব্যবহৃত হবে মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার অন্তরে খুব বেশি সুদৃঢ় করার জন্য। **যেমন–** قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ - صَمَدٌ বলা হয় এমন সত্ত্বাকে, যার প্রতি যাবতীয় প্রয়োজনে অন্যরা মুখাপেক্ষী হয় এবং তাকে কামনা করা হয়। এটি صَمَدَ اِلَيْهِ অর্থ– সে ইচ্ছা করল, থেকে নির্গত এখানে هُوَ الصَّمَدُ বলেননি, শ্রোতার অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে বসানোর জন্য। **তার উপমা** অর্থাৎ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ-কে সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্য অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে শ্রোতার অন্তরে বসানোর জন্য ব্যবহার করার উপমা অর্থাৎ **মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে। কুরআন অবতীর্ণ করার প্রয়োজনীয় হিকমতের সাথে আমি তাকে অবতীর্ণ করেছি এবং হিকমতসহ তা অবতীর্ণ হয়েছে।** এখানে তিনি بِهٖ না বলে بِالْحَقِّ বলেছেন।

অথবা শ্রোতার অন্তরে ভীতি প্রবেশ করানোর জন্য। এটি زِيَادَةُ التَّمَكُّنِ-এর উপর আত্ফ হয়েছে। **আর বড়ত্বকে বৃদ্ধি করার জন্য।** تَرْبِيَةُ الْمَهَابَةِ হচ্ছে এর জন্য তাকিদের মতো, **অথবা নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির আহ্বানকারী** (নির্দেশদাতা)-**কে শক্তিশালী করার জন্য। উভয়টির** অর্থাৎ শক্তিশালী করার এবং বড়ত্ব প্রমাণের সাথে ভীতি সৃষ্টি করার উদাহরণ হচ্ছে **খলিফাগণের উক্তি** اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَاْمُرُكَ তথা **আমীরুল মু'মীনীন তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন।** এটা اَنَا اٰمُرُكَ **তথা আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি এর স্থানে বলা হয়।**

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ الخ : লেখক বলেন, সর্বনামের স্থানে ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য ছাড়া অন্যান্য বিশেষ্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– নামবাচক বিশেষ্য সর্বনামের স্থানে ব্যবহৃত হয়।

আর এমনটি করা হয় কয়েকটি কারণে। যেমন– ১. শ্রোতার মনে মুসনাদ ইলাইহকে সুদৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেওয়ার জন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ সাধারণরীতি অনুসারে এখানে هُوَ الصَّمَدُ বলা উচিত, কেননা اَللّٰهُ-এর مَرْجِعْ-এর পূর্বে বাক্যে গিয়েছে, কিন্তু শ্রোতার মনে আল্লাহ তা'আলা নাম সুদৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেওয়ার জন্য اَللّٰهُ الصَّمَدُ বলা হয়েছে। লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য স্থানেও এরূপ করা হয় অর্থাৎ সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য

বিশেষ্য ব্যবহার করা হয়। এর উদাহরণ হচ্ছে وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ অর্থাৎ আমি পবিত্র কুরআনকে হিকমত তথা প্রজ্ঞাসহ অবতীর্ণ করেছি আর তা হিকমতের সাথেই অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় حَقّْ শব্দটি مُقْتَضٰى ظَاهِرْ-এর বিপরীত ব্যবহৃত হয়েছে, কেননা, ইতঃপূর্বে حَقّْ শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার কারণে পরে সর্বনামের সাথে وَبِهٖ বলার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সাধারণরীতির বিপরীতে শ্রোতার মনে বিষয়টি সুদৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য বিশেষ্যের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَوْ اِدْخَالِ الرَّوْعِ فِىْ ضَمِيْرِ السَّامِعِ : লেখক বলেন, কখনো শ্রোতার অন্তরে ত্রাস ও ভীতি সৃষ্টি করা এবং বক্তার নিজ শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্যকে ব্যবহার করা হয়।

আবার কখনো নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি এর আহ্বানকারী তথা নির্দেশদাতাকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বনামের স্থানে প্রকাশ বিশেষ্যকে রাখা হয়। উক্ত উভয় প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে আমীরুল মু'মীনীন স্বয়ং বললেন اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَأْمُرُكَ আমীরুল মু'মিনীন তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন অথচ এখানে যাহিরী অবস্থার দাবি মতে اَنَا اٰمُرُكَ বলা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি, উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই।

وَعَلَيْهِ اَىْ عَلٰى وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ لِتَقْوِيَةِ دَاعِى الْمَامُوْرِ مِنْ غَيْرِهٖ اَىْ مِنْ غَيْرِ بَابِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ عَلَىَّ لِمَا فِىْ لَفْظِ اَللّٰهِ مِنْ تَقْوِيَةِ الدَّاعِىْ اِلَى التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ لِدَلَالَتِهٖ عَلٰى ذَاتٍ مَوْصُوْفَةٍ بِصِفَاتٍ كَامِلَةٍ مِنَ الْقُدْرَةِ وَغَيْرِهَا اَوِ الْاِسْتِعْطَافِ اَىْ طَلَبِ الْعَطْفِ وَالرَّحْمَةِ كَقَوْلِهٖ شِعْرٌ اِلٰهِىْ عَبْدُكَ الْعَاصِىْ اَتَاكَا * مُقِرًّا بِالذُّنُوْبِ وَقَدْ دَعَاكَا ، لَمْ يَقُلْ اَنَا الْعَاصِىْ لِمَا فِىْ لَفْظِ عَبْدِكَ مِنَ التَّخَضُّعِ وَ اسْتِحْقَاقِ الرَّحْمَةِ وَتَرَقُّبِ الشَّفْقَةِ ـ

অনুবাদ : **আর এ অর্থে** নির্দেশদাতাকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করা হয় মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া **অন্য অধ্যায়েও যেমন– যখন আপনি চূড়ান্ত মনস্থির করেন তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন**। এখানে তিনি আমার উপর বলেননি। কেননা, আল্লাহ শব্দটির মধ্যে তাওয়াক্কুলের আহ্বানকারীকে শক্তিশালী করার বিষয়টি রয়েছে। কেননা, এটা দালালত করে পরিপূর্ণ গুণাবলি তথা সর্বময় ক্ষমতা ইত্যাদির অধিকারী সত্তার উপর। **অথবা দয়া অনুকম্পা প্রার্থনার উদ্দেশ্য, যেমন তার কবিতা : হে আমার প্রভু! তোমার অপরাধী বান্দা তোমার দরবারে এসেছে অপরাধ স্বীকার করে**। আর সে তোমাকে ডাকছে। এখানে اَنَا الْعَاصِىْ (আমি অপরাধী) বলেননি। কেননা, عَبْد (দাস) শব্দের মধ্যে এ ধরনের বিনয় অনুগ্রহের উপযুক্ত এবং মমতার প্রত্যাশা রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَعَلَيْهِ اَىْ عَلٰى وَضْعِ الخ : লেখক বলেন, নির্দেশতাদাতকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কখনো মুসনাদ ইলাইহ ছাড়াও হয়। যেমন– فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ এ আয়াতে উত্তম পুরুষের সর্বনামের স্থলে (اَللّٰهُ) প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু এখানে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন। তাই সর্বনাম ব্যবহার করা হচ্ছে সাধারণ রীতি এবং যাহিরী অবস্থার দাবি।

কিন্তু তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর নির্ভরতা ও ভরসা করার দাবি আল্লাহ শব্দটির মধ্যে বেশি। কেননা, এ শব্দটি এমন সত্তাকে বুঝায়, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও সবজান্তা ইত্যাদি গুণাবলির অধিকারী যা সর্বনামের মধ্যে অনুপস্থিত।

اَللّٰهُ শব্দটি এখানে মুসনাদ ইলাইহ নয়; বরং এটি حَرْف جَرّ-এর مَجْرُوْر।

কখনো দয়া, অনুগ্রহ ও রহমত চাওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্যকে ব্যবহার করা হয়, যেমন এ কবিতায়– اِلٰهِىْ عَبْدُكَ الْعَاصِىْ اَتَاكَ * مُقِرًّا بِالذُّنُوْبِ وَقَدْ دَعَانَا

অর্থাৎ হে আমার প্রভু তোমার অপরাধী বান্দা অপরাধ স্বীকার করে তোমার কাছে আসছে, আর সে তোমাকে ডাকছে।

কবি নিজে আল্লাহর দরবারে অনুগ্রহ চেয়ে এ কবিতা বলছে, সাধারণ রীতি এবং যাহিরী অবস্থার দাবি অনুসারে এখানে اَنَا الْعَاصِىْ (সর্বনাম সহকারে) বলা উচিত ছিল, কিন্তু عَبْد শব্দটির মধ্যে বিনয়, অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ততা ও দয়ার কাঙ্গাল ইত্যাদি বিষয় রয়েছে, যা اَنَا-এর মধ্যে নেই।

قَالَ السَّكَّاكِيُّ هٰذَا اَعْنِىْ نَقْلَ الْكَلَامِ مِنَ الْحِكَايَةِ اِلَى الْغَيْبَةِ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْمُسْنَدِ اِلَيْهِ وَلَا النَّقْلُ مُطْلَقًا بِهٰذَا الْقَدْرِ اَىْ بِاَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْحِكَايَةِ اِلَى الْغَيْبَةِ وَلَا يَخْلُوْ الْعِبَارَةُ عَنْ تَسَامُحٍ بَلْ كُلٌّ مِنَ التَّكَلُّمِ وَالْخِطَابِ وَالْغَيْبَةِ مُطْلَقًا اَىْ سَوَاءٌ كَانَ فِى الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ اَوْ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا وَارِدًا فِى الْكَلَامِ اَوْ كَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ اِيْرَادُهُ يُنْقَلُ اِلَى الْاٰخَرِ فَيَصِيْرُ الْاَقْسَامُ سِتَّةً حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ الثَّلَاثَةِ فِى الْاِثْنَيْنِ وَلَفْظُ مُطْلَقًا لَيْسَ فِىْ عِبَارَةِ السَّكَّاكِىْ لٰكِنَّهُ مُرَادُهُ بِحَسْبِ مَا عُلِمَ مِنْ مَذْهَبِهِ فِى الْاِلْتِفَاتِ وَبِالنَّظْرِ اِلَى الْاَمْثِلَةِ وَيُسَمّٰى هٰذَا النَّقْلُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمَعَانِىْ اِلْتِفَاتًا مَاخُوْذًا مِنْ اِلْتِفَاتِ الْاِنْسَانِ مِنْ يَمِيْنِهِ اِلَى شِمَالِهِ وَبِالْعَكْسِ كَقَوْلِهِ اَىْ قَوْلُ اِمْرَءِ الْقَيْسِ ع تَطَاوَلَ لَيْلُكَ خِطَابٌ لِنَفْسِهِ اِلْتِفَاتًا وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ لَيْلِىْ بِالْاَثْمُدِ * بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْمِيْمِ اِسْمُ مَوْضِعٍ ـ

অনুবাদ : **আল্লামা সাক্কাকী (র.) বলেন, এটি** অর্থাৎ বাক্যকে উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তর করা **মুসনাদ ইলাইহের সাথেই খাস নয়। এমনিভাবে রূপান্তরও এতটুকু** অর্থাৎ উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষের দিকে রূপান্তর-এর সাথেও খাস নয়। এবারত সামান্য ভুল থেকে মুক্ত নয় **বরং উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং নাম পুরুষ থেকে সাধারণভাবে** চাই মুসনাদ ইলাইহ হোক অথবা অন্য কিছু হোক, বাক্যে এমনটি হোক অথবা যাহিরী অবস্থার দাবি এরূপ হোক, **রূপান্তর করা হবে অপর দিকে,** ফলে এখন তিনকে দু'য়ের মাঝে গুণ করে ছয় প্রকার পাওয়া গেল। সাক্কাকীর ইবারতে مُطْلَقًا শব্দটি নেই। তবে ইলতিফাতের ক্ষেত্রে তার নীতি (অনুসারে) এবং উদাহরণ অনুসারে এটা তার মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত (বলা যায়) **এ জাতীয় রূপান্তর ইলমুল মা'আনী বিশারদদের কাছে ইলতিফাত বলে অবিহিত,** মানুষের ডান থেকে বামে এবং বাম থেকে ডানে চোখ ঘুরানো থেকে এটিকে নেওয়া হয়েছে। **যেমন তার** অর্থাৎ কবিগুরু ইমরাউল কায়েসের **কবিতা : তোমার রাত দীর্ঘ হয়েছে।** নিজেকে সম্বোধন করা হয়েছে। এটি ইলতিফাত, কারণ যাহিরী অবস্থার দাবি হচ্ছে لَيْلُكَ-এর স্থানে لَيْلِىْ হওয়া **আছমুদ নামক স্থানে** اَلْاَثْمُدِ শব্দটি) هَمْزَةٌ যবর مِيْم পেশ (সহকারে পড়া হবে) একটি স্থানের নাম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ قَالَ السَّكَّاكِيُّ الخ : ইতঃপূর্বে সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করার দু'টি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে اَنَا اٰمُرُكَ-এর স্থানে اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَاْمُرُكَ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে اَنَا الْعَاصِىْ-এর স্থানে عَبْدُكَ الْعَاصِىْ বলা। উভয় উদাহরণে উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করা সাধারণ নীতি ছিল। তা পরিহার করত বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলত নাম পুরুষের মধ্যে গণ্য।

আল্লামা সাক্কাকী বলেন, বাক্যকে উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তর করা মুসনাদ ইলাইহের সাথেই খাস নয়; বরং মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তর হয়। মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে এরূপ রূপান্তরের উপমা আমরা পূর্বের উদাহরণগুলোতে দেখেছি। অন্য ক্ষেত্রে রূপান্তরের একটি উদাহরণও পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াত থেকে দেওয়া হয়েছে, فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ এ উদাহরণে আল্লাহ শব্দটি মুসনাদ ইলাইহ হয়নি।

সাক্কাকী আরো বলেন, রূপান্তরের বিশেষ্যটি কেবল এতটুকু অর্থাৎ উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখকের ইবারতে সামান্য ভুল রয়েছে। ভুলটি হচ্ছে سَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهٖ কোনো বিষয়কে নিজ সত্তা থেকে না-বাচক করা অবশ্যক হয়।

লেখক বলেন وَلَا النَّقْلُ بِهٰذَا الْقَدْرِ যার অর্থ হচ্ছে– বাক্যকে উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তর এতটুকু অর্থাৎ উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তর এর সাথে খাস নয়। সুতরাং উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তরকে তার নিজ সত্তা থেকে না-বাচক করা হচ্ছে। এটাকে পরিভাষায় سَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِه বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, لَا النَّقْلُ দ্বারা বিশেষ نَقْل উদ্দেশ্য করার কারণে এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। لَا النَّقْلُ-এর نَقْل শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত, এতে উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তর যেমন রয়েছে, তেমনি এতে অন্যান্য রূপান্তরও রয়েছে। এ উত্তরানুসারে এখন বাক্যের অর্থ এরূপ হবে।

সাধারণ রূপান্তর এই প্রকার (উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষ)-এর সাথে খাস নয়, আর এতে করে سَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِه আবশ্যক হলো না। সারকথা হচ্ছে– উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং নাম বা তৃতীয় পুরুষ-এর মধ্য থেকে একটিকে অন্য পদ্ধতিতে রূপান্তর করা যায়, এগুলো মুসনাদ ইলাইহের ক্ষেত্রেও হতে পারে, আবার মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও হতে পারে। যাই হোক মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে অথবা মুসনাদ ইলাইহের বাইরে হোক এর কোনো একটি প্রথমে বাক্যে একভাবে ব্যবহৃত হওয়ার পর ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হওয়া অথবা প্রথমেই প্রকাশ্য বা বাহ্যিক অবস্থার দাবির বিপরীতে উপস্থাপন করার নামই হলো ইলতিফাত। মুসান্নিফ বলেন, বাক্য ব্যবহারের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে– ১. উত্তম পুরুষ (مُتَكَلِّمْ) ২. মধ্যম পুরুষ (مُخَاطَبْ) ৩. নাম বা তৃতীয় পুরুষ (غَائِبْ) এ তিনটি প্রকারের প্রত্যেকটি অন্য দু'প্রকারে রূপান্তরিত হতে পারে। অতএব, তিনকে দু' দ্বারা গুণ করার দ্বারা দৃঢ় প্রকার বের হয়। নিম্নে প্রকারগুলো উল্লেখ করা হলো–

১. উত্তম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষ, ২. উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষ, ৩. মধ্যম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষ, ৪. মধ্যম পুরুষ থেকে নাম পুরুষ, ৫. নাম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষ, ৬. নাম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষ।

قَوْلُهُ وَلَفْظُ مُطْلَقًا لَيْسَ فِيْ عِبَارَةِ الخ : মুসান্নিফ বলেন, مُطْلَقًا যদিও সাক্কাকীর ইবারতে নেই, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইলতিফাতের ব্যাপারে সাক্কাকীর মাযহাব এবং তার লিখিত উদাহরণ লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, مُطْلَقًا-এর قَيْد টি তার নিকট ধর্তব্য। কেননা, সাক্কাকী মুসনাদ ইলাইহ এবং মুসনাদ উভয়ের উদাহরণ পেশ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় এই রূপান্তর মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস নয়; বরং مُطْلَقْ।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সাক্কাকীর মতে প্রথমে ব্যবহৃত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার পরিবর্তন হবে, এটা শর্ত নয়; বরং আগে একবার ব্যবহৃত না হয়ে প্রথমেই প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত ব্যবহার হলে ইলতিফাত হবে।

উল্লিখিত ছয় প্রকার যেহেতু মুসনাদ ইলাইহের এবং মুসনাদ ইলাইহ ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়, অতএব (৬ × ২) ছয়কে দু'দিয়ে গুণন করলে বারো প্রকার হবে। তা ছাড়া (প্রসিদ্ধ মতানুসারে) দ্বিতীয় প্রয়োগ দ্বারা ইলতিফাত হবে। অর্থাৎ বক্তব্যের সূচনা এক ধারাতে হবে, অতঃপর বাক্যের শেষ পর্যন্ত অভিন্ন ধারা বজায় না রেখে مُقْتَضٰى ظَاهِرْ-এর বিপরীত অন্য ধারা প্রয়োগ হলেই ইলতিফাত হবে। অন্য মতে, প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত প্রথম প্রয়োগেই ইলতিফাত হতে পারে। এ দু'প্রকারকে বারো দ্বারা গুণন করলে (১২ × ২ = ২৪) মোট চব্বিশ প্রকারে বিন্যস্ত হবে।

মূল লেখক বলেন, ইলমুল মা'আনী বিশারদগণের মতানুসারে বাক্যের এ ধরনের রূপান্তরকে اِلْتِفَاتْ বলা হয়।

পরিভাষায় ইলতিফাত বলা হয় : اِلْتِفَاتْ অর্থ বিশেষ কোনো সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যে বক্তব্যের সর্বনামগত ধারা পরিবর্তন করা, এ অর্থটি নেওয়া হয়েছে মানুষের ডানে-বায়ে অথবা বায়ে-ডানে তাকানো থেকে, সেখানে যেমন ডান থেকে বামে ফিরলে ইলতিফাত হয় এখানেও তেমনি এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থা ধারণ করলে ইতিফাত হয়।

সাক্কাকীর মতানুসারে ইলতিফাতের উদাহরণ হচ্ছে কবিগুরু ইমরাউল কায়েসের এই কবিতা تَطَاوَلَ لَيْلُكَ بِالْاَثْمُدِ (আছমুদ নামক স্থানে তোমার রাত সুদীর্ঘ হয়েছে) কবি তার কবিতায় নিজেকে সম্বোধন করেছেন। অতএব, বাহ্যিক অবস্থার দাবি মতে এখানে لَيْلِىْ (উত্তম পুরুষের সাথে) ব্যবহার হওয়ার দরকার ছিল, তা না করে مُقْتَضٰى ظَاهِرْ-এর বিপরীত কবি নিজেকে মধ্যম পুরুষের স্থানে রেখে সম্বোধন করেছেন ইলতিফাত হিসেবে। পুরো কবিতাটিই হলো–

تَطَاوَلَ لَيْلُكَ بِالْاَثْمُدِ * وَنَامَ الْخَلِيُّ وَلَمْ تَرْقُدِ + وَبَاتَ وَبَاتَتْ لَهُ لَيْلَةٌ * كَلَيْلَةِ ذِى الْعَائِرِ الْاَرْمَدِ

وَ ذٰلِكَ مِنْ نَبَاءٍ جَائَنِىْ * وَخُبِّرْتُهُ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ

এ কবিতা কবি ইমরাউল কায়েস আছমুদ নামক স্থানে তার পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনে শোকগাথারূপে রচনা করেছিলেন।

পুরো কবিতার অর্থ : হে আমার মন! তোমার রাত্রি আছমুদ নামক স্থানে সুদীর্ঘ হয়েছে, যে ব্যক্তি দুঃখ-বেদনাহীন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ তুমি শুইলে না। তুমি রাত কাটিয়ে দিলে, আর রাত সেও অতিবাহিত হলো তবে রাত পার হলো (এতটা কষ্ট ও যাতনার সাথে) যেমন চোখের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রাত অতিবাহিত হয়। এ রাত জাগা ও কষ্ট-যাতনা এ সংবাদের কারণে যা আমার কাছে এসেছে। আমাকে আবুল আসওয়াদের মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

وَالْمَشْهُوْرُ اَنَّ الْاِلْتِفَاتَ هُوَ التَّعْبِيْرُ عَنْ مَعْنًى بِطَرِيْقٍ مِنَ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ اَيِ التَّكَلُّمُ وَالْخِطَابُ وَالْغَيْبَةُ بَعْدَ التَّعْبِيْرِ عَنْهُ اَيْ عَنْ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى بِاٰخَرَ اَيْ بِطَرِيْقٍ اٰخَرَ مِنَ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ بِشَرْطِ اَنْ يَّكُوْنَ التَّعْبِيْرُ الثَّانِيْ عَلٰى خِلَافِ مَا تَقْتَضِيْهِ الظَّاهِرُ وَيَتَرَقَّبُهُ السَّامِعُ وَلَابُدَّ مِنْ هٰذَا الْقَيْدِ لِيَخْرُجَ مِثْلُ قَوْلِنَا اَنَا زَيْدٌ وَاَنْتَ عَمْرٌو وَع نَحْنُ اللَّذُوْنَ صَبَّحُوا الصَّبَاحَا وَقَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ وَاهْدِنَا وَاَنْعَمْتَ فَاِنَّ الْاِلْتِفَاتَ اِنَّمَا هُوَ فِيْ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَالْبَاقِيْ جَارٍ عَلٰى اُسْلُوْبِهِ وَمَنْ زَعَمَ اَنَّ فِيْ مِثْلِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلْتِفَاتًا وَالْقِيَاسُ اٰمَنْتُمْ فَقَدْ سَهَا عَلٰى مَا يَشْهَدُ بِهٖ كُتُبُ النَّحْوِ ـ

অনুবাদ : **প্রসিদ্ধ মতানুসারে ইলতিফাত বলা হয় তিন পদ্ধতি** যথা উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষ **এর কোনো এক পদ্ধতিতে বাক্য উপস্থাপন করা এই অর্থটিকেই অন্য পদ্ধতিতে ব্যক্ত করার পর**। এই শর্তসাপেক্ষে যে, দ্বিতীয় উক্ত তিন পদ্ধতির প্রয়োগটি مُقْتَضٰى ظَاهِرْ এবং শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হবে। এ কয়েদটি যুক্ত করা আবশ্যক যাতে আমাদের উক্তি اَنَا زَيْدٌ وَاَنْتَ عَمْرٌو এবং **কবিতা** : نَحْنُ اللَّذُوْنَ صَبَّحُوْا الصَّبَاحَ এবং কুরআনের আয়াত اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا ـ اَنْعَمْتَ সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যায়। কেননা, ইলতিফাত হয়েছে শুধুমাত্র اِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর মধ্যে এরপর অবশিষ্ট বাক্যগুলো সে (অভিন্ন) ধারাতেই চলেছে, আর যারা মনে করেন يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এ ইলতিফাত হয়েছে, কেননা, যুক্তি অনুসারে اٰمَنْتُمْ হওয়া দরকার তারা ব্যাকরণশাস্ত্রের কিতাবসমূহের সাক্ষ্য মতে সুস্পষ্ট ভুল করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْمَشْهُوْرُ اَنَّ الْاِلْتِفَاتَ الخ : ইলতিফাতের সংজ্ঞাতে দু'টি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। এর একটি হচ্ছে মিফতাহ গ্রন্থের কালজয়ী লেখক আল্লামা আবূ ইউসুফ ইয়া'কূব সাক্কাকী। আর অপর মতটি হচ্ছে অধিকাংশ বা (জমহুর) বালাগাত বিশারদগণের। মূল লেখক اَلْمَشْهُوْرُ বলে জমহুরের বর্ণিত সংজ্ঞাটি উপস্থাপন করছেন।

তাদের সংজ্ঞাটি হচ্ছে বাক্যের সূচনাতে– উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও নাম (তৃতীয়) পুরুষ-এর যে কোনো একটি দ্বারা কথা উপস্থাপন করত প্রকাশ্য অবস্থার দাবি এবং শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত ভিন্নভাবে ও ধারাতে কথাকে প্রকাশ করা। অতএব, এ দু'টি সংজ্ঞাতে স্পষ্টত বিরোধ হয়ে গেল। সাক্কাকী (র.)-এর সংজ্ঞানুসারে প্রথমে এভাবে কথা উপস্থাপন করা জরুরি নয়; বরং একটি মাত্র প্রয়োগ দ্বারা ইলতিফাত হতে পারে। পক্ষান্তরে জমহুরের মতে সূচনাতে একভাবে কথা উপস্থাপন করা এবং এরপর ভিন্ন ধারাতে উপস্থাপন হওয়া জরুরি। সুতরাং যদি কোনো বাক্যতে প্রথমেই ভিন্ন ধারায় বাক্য ব্যবহার হয়, তাহলে সাক্কাকীর মতে এটি ইলতিফাত; কিন্তু জমহুরের মতে এটা ইলতিফাত নয়।

قَوْلُهُ وَلَابُدَّ مِنْ هٰذَا الْقَيْدِ : মুসান্নিফ বলেন, বাক্যের দ্বিতীয় প্রয়োগটি বাহ্যিক অবস্থার দাবির বিপরীত হওয়া আবশ্যক। আর এ কয়েদটির কারণে অনেক বাক্য ইলতিফাতের আওতার বাইরে চলে যাবে, যেমন– اَنَا زَيْدٌ-এর মধ্যে উত্তম পুরুষ (اَنَا) থেকে (زَيْدٌ) তৃতীয় পুরুষের দিকে এবং اَنْتَ عَمْرٌو-এর মধ্যে মধ্যম পুরুষ থেকে তৃতীয় পুরুষ (عَمْرٌو) এ দিকে কথাকে রূপান্তরিত করা হয়েছে, এরপরেও তা ইলতিফাত নয়। কেননা, বাক্যদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় প্রয়োগটি এমন যা প্রকাশ্য অবস্থার দাবি মোতাবেক হয়েছে এবং শ্রোতাও এমনটি আশা করছিল। কেননা, নিয়ম হচ্ছে এই যে, যদি মুবতাদা সর্বনাম হয়, তাহলে তার খবর প্রকাশ্য বিশেষ্য আনা হবে। অতএব, বক্তা যখন اَنَا অথবা اَنْتَ বলল, তখন শ্রোতা ধারণা করবে যে, এরপর প্রকাশ্য বিশেষ্যই আনা হচ্ছে। অতএব, উত্তম পুরুষ এবং তৃতীয় পুরুষের সর্বনামের পর প্রকাশ্য বিশেষ্য আনাই বাহ্যিক অবস্থার দাবি– এটা কিছুতেই বাহ্যিক অবস্থার দাবির এবং শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কিছু নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে উদাহরণ দু'টিতে শর্ত (বাহ্যিক অবস্থার দাবির বিপরীত) না পাওয়া যাওয়াতে এখানে ইলতিফাত হয়নি। এমনিভাবে উল্লিখিত কয়েকটির কারণে نَحْنُ اللَّذُونَ صَبَّحُوا الصَّبَاحَ কবিতাটিতে ইলতিফাত হয়নি, যদিও দেখা যাচ্ছে উত্তম পুরুষ প্রথমে নিজেদের نَحْنُ সর্বনাম দ্বারা ব্যক্ত করেছে, এরপর اللَّذُونَ, তৃতীয় পুরুষ দ্বারা নিজেদের উপস্থাপন করেছে। এর কারণ হচ্ছে نَحْنُ (উত্তম পুরুষের) পর নাম পুরুষ আসাটাই হচ্ছে বাহ্যিক অবস্থার দাবি এবং শ্রোতার আশাও এরূপই। অতএব, ইলতিফাতের শর্ত না পাওয়া যাওয়াতে ইলতিফাত হয়নি। কবিতার অর্থ– আমরা তারাই যারা يَوْمَ النُّخَيْلِ-এ আক্রমণ করত প্রভাত করেছি। মুসান্নিফ বলেন, এ কয়েদটির কারণে إِيَّاكَ نَعْبُدُ . اِهْدِنَا . أَنْعَمْتَ ও ইলতিফাতের সংজ্ঞার আওতায় পড়েনি, কেননা مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (তৃতীয় পুরুষ) থেকে إِيَّاكَ نَعْبُدُ (মধ্যম পুরুষ)-এর রূপান্তরের মধ্যে অবশ্যই ইলতিফাত হয়েছে, কিন্তু إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ, اِهْدِنَا ও أَنْعَمْتَ যেহেতু তাদের পূর্ববর্তী প্রয়োগ إِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর অনুরূপ হয়েছে, তাই এতে নিঃসন্দেহে ইলতিফাত হয়নি।

قَوْلُهُ وَمَنْ زَعَمَ اَنَّ فِىْ مِثْلِ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : মুসান্নিফ বলেন, কতিপয় লোক মনে করেন উল্লিখিত আয়াত এবং এর অনুরূপ সকল আয়াতে ইলতিফাত হয়েছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে اَلَّذِيْنَ এখানে مُنَادٰى (যাকে ডাকা হয়) হওয়ার কারণে মধ্যম পুরুষের মধ্যে গণ্য। এরপর ফে'লটি নাম পুরুষের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। অথচ যুক্তি অনুসারে اٰمَنْتُمْ হওয়া সমীচীন ছিল। অতএব, বাক্যের সর্বনামগত ধারা পরিবর্তন হয়েছে এবং তা বহ্যিক অবস্থার দাবির বিপরীত হয়েছে, তাই নিঃসন্দেহে এটা ইলতিফাত। তাদের যুক্তির জবাবে মুসান্নিফ বলেন, তাদের দাবি ও দলিল ব্যাকরণশাস্ত্রের কিতাবাদির বক্তব্য অনুসারে ভুল এবং অগ্রহণযোগ্য। কিতাবের বক্তব্য হচ্ছে মাউসূল اِسْمٌ تَامٌ (পূর্ণাঙ্গ বিশেষ) নয়। এটা তার صِلَةٌ সহকারে পূর্ণাঙ্গ হয়। অতএব, যদি ইসমে মাউসূল মুনাদা হয়, তাহলে তা পূর্ণ হওয়ার আগে উত্তম পুরুষ হবে না; বরং তৃতীয় পুরুষের স্থানে হবে, পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর তা মধ্যম পরুষের মধ্যে গণ্য হবে। সুতরাং يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ مُنَادٰى এ কারণে পুরোটাই হচ্ছে মধ্যম পুরুষ। এরপর (صِلَةٌ শেষ হওয়ার পর) اِذَا قُمْتُمْ আবারও মধ্যম পুরুষ। অতএব, ইলতিফাত হলো না।

তবে صِلَةٌ অর্থাৎ اٰمَنُوْا-এর পূর্বে اَلَّذِيْنَ যেহেতু পূর্ণাঙ্গ مُنَادٰى নয়, তাই উহ্য তৃতীয় পুরুষের মধ্যে গণ্য, اَلَّذِيْنَ যেহেতু তৃতীয় পুরুষের মধ্যে গণ্য। অতএব, তার পরের শব্দ (ক্রিয়া) اٰمَنُوْاও সে মতে তৃতীয় পুরুষরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, আর اٰمَنُوْا যেহেতু তার পূর্ববর্তী শব্দের অবলম্বনে তৃতীয় পুরুষরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এটা ইলতিফাতের মধ্যে গণ্য হবে না।

وَهٰذَا اَىْ اَلْاِلْتِفَاتُ بِتَفْسِيْرِ الْجُمْهُوْرِ اَخَصُّ مِنْهُ بِتَفْسِيْرِ السَّكَّاكِىْ لِاَنَّ النَّقْلَ عِنْدَهٗ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ عَبَّرَ عَنْ مَعْنًى بِطَرِيْقٍ مِنَ الطُّرُقِ ثُمَّ بِطَرِيْقٍ اٰخَرَ اَوْ يَكُوْنَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ اَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ بِطَرِيْقٍ مِنْهَا فَتُرِكَ وَعُدِلَ عَنْهَا اِلٰى طَرِيْقٍ اٰخَرَ فَيَتَحَقَّقُ الْاِلْتِفَاتُ عِنْدَهٗ بِتَعْبِيْرٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ اِلْتِفَاتٍ عِنْدَهُمْ اِلْتِفَاتٌ عِنْدَهٗ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ كَمَا فِىْ تَطَاوَلَ لَيْلُكَ

مِثَالُ الْاِلْتِفَاتِ مِنَ التَّكَلُّمِ اِلَى الْخِطَابِ وَمَا لِىَ لَاۤ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ اُرْجَعُ وَالتَّحْقِيْقُ اَنَّ الْمُرَادَ مَالَكُمْ لَاتَعْبُدُوْنَ لٰكِنْ لَمَّا عُبِّرَ عَنْهُمْ بِطَرِيْقِ التَّكَلُّمِ كَانَ مُقْتَضَى ظَاهِرِ السَّوْقِ اِجْرَاءَ بَاقِى الْكَلَامِ عَلٰى ذٰلِكَ الطَّرِيْقِ فَعُدِلَ عَنْهُ اِلٰى طَرِيْقِ الْخِطَابِ فَيَكُوْنُ اِلْتِفَاتًا عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ وَمِثَالُ الْاِلْتِفَاتِ مِنَ التَّكَلُّمِ اِلَى الْغَيْبَةِ اِنَّاۤ اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ لَنَا ـ

অনুবাদ : আর এটা অর্থাৎ এ ইলতিফাত **জমহুর বালাগাত বিশারদগণের ব্যাখ্যানুসারে** সাক্কাকীর সংজ্ঞা থেকে **বেশি খাস,** অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ। কেননা, সাক্কাকীর মতে, রূপান্তরের বিষয়টি ব্যাপক, তার মতে কোনো বাক্যে একটি বিষয় তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতির সাহায্যে বর্ণনা করার পর ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে বর্ণনা করা (ইলতিফাত)। অথবা কোনো বিষয় প্রকাশ্য অবস্থার দাবি মতে একভাবে বর্ণনা করা উচিত। সেটা বাদ দিয়ে অন্য পদ্ধতিতে বর্ণনা করাও ইলতিফাত। অতএব, জমহুরের মতে যা ইলতিফাত তা সাক্কাকীর মতেও ইলতিফাত, কিন্তু তার বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ সাক্কাকীর মতে যা ইলতিফাত-এর সব জমহুরের মতে ইলতিফাত নয়। (মোটকথা, জমহুরের মতে ইলতিফাতের জন্য সূচনাতে এক ধরনের উপস্থাপন করে পরে ভিন্ন ধারায় উপস্থাপন করা, আর সাক্কাকী মতে একবার উপস্থাপনেই ইলতিফাত হওয়া সম্ভব।)

উত্তম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষে রূপান্তরে যে ইলতিফাত হয় তার উদাহরণ হচ্ছে وَمَالِىَ لَاۤ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ **যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন কেন আমি তার ইবাদত করবো না, অথচ তোমরা তার কাছেই ফিরে যাবে।** এখানে প্রকাশ্য অবস্থার দাবি অনুসারে وَاِلَيْهِ اُرْجَعُ হওয়া উচিত ছিল (এর পরিবর্তে এখানে تُرْجَعُوْنَ ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব, এখানে উত্তম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষের দিকে ইলতিফাত হলো) এ ব্যাপারে সঠিক বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, বাক্যটি মূলত এমন ছিল وَمَا لَكُمْ لَاتَعْبُدُوْنَ (কেননা, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ঈমানের দাওয়াত পৌঁছানো; কিন্তু এভাবে বললে তাদের মাঝে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে নিজেকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে) কিন্তু যখন উত্তম পুরুষের পরিবর্তন করা হলো, তখন প্রকাশ্য অবস্থার দাবি অনুসারে বাক্যের অবশিষ্টাংশ একই ধারাতে বর্ণনা হওয়া উচিত ছিল। অতঃপর সেই ধারা থেকে মধ্যম পুরুষের ধারার দিকে যাওয়া। অতএব, এটি উভয় (সাক্কাকীর ও জমহুর)-এর মাযহাব অনুসারে ইলতিফাত হবে। **আর উত্তম পুরুষ থেকে তৃতীয় পুরুষের ইলতিফাত হওয়ার উদাহরণ হচ্ছে** اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ অর্থাৎ **নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি সুতরাং আপনার প্রভুর জন্য নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন।** আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সূচনাতে নিজেকে উত্তম পুরুষ রূপে (اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ) উপস্থাপন করেছেন, এরপর আবার মধ্যম পুরুষরূপে (لِرَبِّكَ) নিজেকে উপস্থাপন করেছেন।

وَمِثَالُ الْاِلْتِفَاتِ مِنَ الْخِطَابِ اِلَى التَّكَلُّمِ قَوْلُ الشَّاعِرِ **شِعْرٌ** طَحَا بِكِ قَلْبٌ اَىْ ذَهَبَ بِكِ فِى الْحِسَانِ طَرُوْبٌ وَمَعْنٰى طَرُوْبٍ فِى الْحِسَانِ اَنَّ لَهُ طَرَبًا فِىْ طَلَبِ الْحِسَانِ وَنِشَاطًا فِىْ مُرَاوَدَتِهَا بُعَيْدَ الشَّبَابِ تَصْغِيْرُ بَعْدٍ لِلْقُرْبِ اَىْ حِيْنَ وَلّٰى الشَّبَابُ وَكَادَ يَنْصَرِمُ عَصْرَ ظَرْفٌ مُضَافٌ اِلَى الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ اَعْنِىْ قَوْلَهُ حَانَ اَىْ قَرُبَ مَشِيْبٌ يُكَلِّفُنِىْ لَيْلٰى فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ مِنَ الْخِطَابِ فِىْ بِكِ اِلَى التَّكَلُّمِ وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ يُكَلِّفُكِ وَفَاعِلُ يُكَلِّفُنِىْ ضَمِيْرٌ لِلْقَلْبِ وَلَيْلٰى مَفْعُوْلُهُ الثَّانِىْ وَالْمَعْنٰى يُطَالِبُنِى الْقَلْبُ بِوَصْلِ لَيْلٰى وَ رُوِىَ تُكَلِّفُنِىْ بِالتَّاءِ الْفَوْقَانِيَّةِ عَلٰى اَنَّهُ مُسْنَدٌ اِلٰى لَيْلٰى وَالْمَفْعُوْلُ الثَّانِىْ مَحْذُوْفٌ اَىْ شَدَائِدَ فِرَاقِهَا اَوْ عَلٰى اَنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَلْبِ فَيَكُوْنُ اِلْتِفَاتًا اٰخَرَ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى الْخِطَابِ وَقَدْ شَطَّ اَىْ بَعُدَ وَلْيُهَا اَىْ قُرْبُهَا وَعَادَتْ عَوَادٍ بَيْنَنَا وَخُطُوْبٌ قَالَ الْمَرْزُوْقِىْ عَادَتْ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ فَاعَلَتْ مِنَ الْمُعَادَاةِ كَاَنَّ الصَّوَارِفَ وَالْخُطُوْبَ صَارَتْ تُعَادِيْهِ وَيَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ مِنْ عَادَ يَعُوْدُ اَىْ عَادَتْ عَوَادٍ وَعَوَائِقُ كَانَتْ تَحُوْلُ بَيْنَنَا اِلٰى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلُ ـ

অনুবাদ : **মধ্যম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষের দিকে ইলতিফাতের উদাহরণ হচ্ছে, কবির কবিতা طَحَا بِكِ فِى الْحِسَانِ طَرُوْبٌ অর্থাৎ হে আমার আত্মা! তোমাকে সুন্দরী নারীর আসক্তকারী হৃদয় ধ্বংস করে দিচ্ছে।** طَحَا بِكِ অর্থ– নিয়ে যাওয়া, ধ্বংস করা ইত্যাদি। طَرُوْبٌ فِى الْحِسَانِ অর্থ হচ্ছে– সুন্দরী নারীদের খোঁজে আসক্ত এবং নারীদের বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোম, যৌবন শেষ হওয়ার কিছুকাল পরে। بُعَيْدَ শব্দটি بَعْد-এর تصغير নিকট দূর বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যখন যৌবন পিঠ দেখাল এবং বৃদ্ধ হতে লাগল এমন সময় (عَصْرَ) এটি যরফ, ক্রিয়াবাচক বাক্যের প্রতি মুযাফ হয়েছে অর্থাৎ (বাক্যটি হচ্ছে) তার বাক্য حان **অর্থ– নিকটবর্তী হলো বার্ধক্যে, সেই অন্তর আমাকে লায়লার ব্যাপারে কষ্ট দিচ্ছে।** এতে মধ্যম পুরুষ (بك) থেকে উত্তম পুরুষ (يُكَلِّفُنِىْ)-এর প্রতি ইলতিফাত হয়েছে। বাহ্যিক বা প্রকাশ্য অবস্থার দাবি হচ্ছে يُكَلِّفُنِىْ، يُكَلِّفُكَ-এর ফায়েল হচ্ছে সর্বনাম, যা অন্তরের জন্য ليلى হচ্ছে দ্বিতীয় মাফঊল। অর্থ অন্তর আমাকে লায়লার মিলনে উদ্বুদ্ধ করছে। অন্য বর্ণনায় تُكَلِّفُنِىْ রয়েছে (আলামতে মুযারে تاء-এর সাথে) তখন এটি লায়লার মুসনাদ হবে (এবং লায়লা তার ফায়েল) তখন দ্বিতীয় মাফঊল উহ্য থাকবে (তা হচ্ছে) شَدَائِد فِرَاقِهَا (তার বিরহের ব্যথা ও কষ্ট)। অথবা تُكَلِّفُنِىْ-এর (ইসনাদও) সম্বোধন হবে অন্তরের দিকে তখন আরেকটি ইলতিফাত হচ্ছে তৃতীয় পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষের দিকে। (কেননা ইতঃপূর্বে قلب (অন্তর) নাম পুরুষ ছিল এখন তা মধ্যম পুরুষ পড়া হচ্ছে) **অথচ তার নৈকট্য দূরবর্তী আর আমাদের মাঝে বিপদাপদ এবং প্রতিবন্ধক ফিরে এসেছে।** অভিধানশাস্ত্রের ইমাম মারযূকী বলেন, عادت ফে'লটি بَاب مُفَاعَلَة-এর مُعَادَاة থেকে নির্গত হতে পারে, (যার অর্থ শত্রুতা পোষণ করা) যেন প্রতিবন্ধকতা এবং বিপদাপদ তার সাথে শত্রুতা পোষণ করছে, আবার (عَادَتْ) ফে'লটি عَادَ يَعُوْدُ (باب نصر) থেকেও হওয়া সম্ভব। তখন অর্থ হবে আমাদের মাঝে বিপদাপদ ও প্রতিবন্ধকার দেয়াল ফিরে এসেছে, যেমন এটি পূর্বে ছিল।

وَمِثَالُ الْاِلْتِفَاتِ مِنَ الْخِطَابِ اِلَى الْغَيْبَةِ قَوْلُهُ تَعَالٰى حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ وَالْقِيَاسُ بِكُمْ وَمِثَالُ الْاِلْتِفَاتِ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى التَّكَلُّمِ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ سَاقَهُ اَىْ سَاقَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ السَّحَابَ وَاَجْرَاهُ اِلٰى بَلَدٍ مَيِّتٍ وَمِثَالُ الْاِلْتِفَاتِ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى الْخِطَابِ قَوْلُهُ تَعَالٰى مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ اِيَّاهُ وَ وَجْهُهُ اَىْ وَجْهُ حُسْنِ الْاِلْتِفَاتِ اَنَّ الْكَلَامَ اِذَا نُقِلَ مِنْ اُسْلُوْبٍ اِلٰى اُسْلُوْبٍ كَانَ ذٰلِكَ الْكَلَامُ اَحْسَنَ تَطْرِيَةً اَىْ تَجْدِيْدًا اَوْ اِحْدَاثًا مِنْ طَرَيْتُ الثَّوْبَ لِنِشَاطِ السَّامِعِ وَكَانَ اَكْثَرَ اِيْقَاظًا لِلْاِصْغَاءِ اِلَيْهِ اَىْ اِلٰى ذٰلِكَ الْكَلَامِ لِاَنَّ لِكُلِّ جَدِيْدٍ لَذَّةً وَهٰذَا وَجْهُ حُسْنِ الْاِلْتِفَاتِ عَلَى الْاِطْلَاقِ ـ

অনুবাদ : **মধ্যম পুরুষ থেকে নাম তৃতীয় পুরুষের ইলতিফাতের উদাহরণ হচ্ছে–** মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ (**তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদের স্থলে ও জলে পরিভ্রমণ করান। এমনকি যখন তোমরা নৌযানে অবস্থান কর আর নৌযান উত্তম বায়ুপ্রবাহে তাদের নিয়ে ভেসে চলে**) সাধারণ নীতি অনুসারে (ও প্রকাশ্য অবস্থার দাবি মতে) بِكُمْ হওয়া দরকার ছিল (কেননা, বাক্যের সূচনাতে بِكُمْ ছিল), **আর নাম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষের ইলতিফাত হওয়ার উদাহরণ হচ্ছে** মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী وَاللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ (**আল্লাহ তা'আলা সেই সত্তা, যিনি বাতাস প্রেরণ করেছেন। অতঃপর তা মেঘ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, অনন্তর আমরা তাকে এক মৃত নগরীতে উপনীত করলাম।**) (এখানে وَاللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ এই সূচনাংশে নাম পুরুষ ব্যবহার করা হয়েছে, এরপর উত্তম পুরুষের দিকে রূপান্তরিত হয়েছে।) প্রকাশ্য অবস্থার দাবিতে سَاقَهُ اللّٰهُ হওয়া দরকার ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সে মেঘমালাকে হাঁকিয়ে এবং ভাসিয়ে মৃত নগরীর দিকে নিয়ে গেছেন। নাম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষের দিকে ইলতিফাত হওয়ার উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী– مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ (**তিনি প্রতিদান দিনের মালিক; আমরা তোমারই ইবাদত করি।**) আয়াতের مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অংশে আল্লাহ তা'আলা নাম পুরুষ কিন্তু اِيَّاكَ نَعْبُدُ অংশে মধ্যম পুরুষ) এখানে বাহ্যিক অবস্থার দাবি মতে اِيَّاهُ হবে। **ইলতিফাতের সৌন্দর্যের দিক হচ্ছে বাক্যকে যখন এক রীতি বা ধারা থেকে অন্য রীতিতে রূপান্তরিত করা হয়, তখন সে বাক্যটিতে বৈচিত্র্য এবং নতুনত্ব সৃষ্টি হয়। এটা করা হয় শ্রোতার মনসংযোগের জন্য, আর তা শ্রোতার বাক্যটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অধিক সতর্ককারী।** কেননা, প্রত্যেক নতুনত্বে ভিন্ন স্বাদ রয়েছে। আর উপরোক্ত কারণটি হচ্ছে ইলতিফাতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, এ ছাড়া স্থানগত ও পূর্বাপরের ভিত্তিতে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলিও রয়েছে।

وَقَدْ يُخْتَصُّ مَوَاقِعُهُ بِلَطَائِفَ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ الْعَامِّ كَمَا فِىْ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ فَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا ذَكَرَ الْحَقِيْقَ بِالْحَمْدِ عَنْ قَلْبٍ حَاضِرٍ يَجِدُ ذٰلِكَ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهٖ مُحَرِّكًا لِلْاِقْبَالِ عَلَيْهِ اَىْ عَلٰى ذٰلِكَ الْحَقِيْقِ بِالْحَمْدِ وَكُلَّمَا اُجْرِىَ عَلَيْهِ صِفَةٌ مِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ الْعِظَامِ قَوِىَ ذٰلِكَ الْمُحَرِّكُ اَنْ يَؤُلَ الْاَمْرُ اِلٰى خَاتِمَتِهَا اَىْ خَاتِمَةِ تِلْكَ الصِّفَاتِ يَعْنِىْ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اَلْمُفِيْدَةِ اَنَّهٗ اَىْ ذٰلِكَ الْحَقِيْقَ بِالْحَمْدِ مَالِكُ الْاَمْرِ كُلِّهٖ فِىْ يَوْمِ الْجَزَاءِ لِاَنَّهٗ اُضِيْفَ مَالِكٌ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ عَلٰى طَرِيْقِ الْاِتِّسَاعِ وَالْمَعْنٰى عَلَى الظَّرْفِيَّةِ اَىْ مَالِكٌ فِىْ يَوْمِ الدِّيْنِ وَالْمَفْعُوْلُ مَحْذُوْفٌ دَلَالَةً عَلَى التَّعْمِيْمِ فَحِيْنَئِذٍ يُوْجِبُ ذٰلِكَ الْمُحَرِّكُ لِتَنَاهِيْهِ فِى الْقُوَّةِ الْاِقْبَالَ عَلَيْهِ اَىْ اِقْبَالَ الْعَبْدِ عَلٰى ذٰلِكَ الْحَقِيْقِ بِالْحَمْدِ وَالْخِطَابَ بِتَخْصِيْصِهٖ بِغَايَةِ الْخُضُوْعِ وَالْاِسْتِعَانَةِ فِى الْمُهِمَّاتِ فَالْبَاءُ فِىْ بِتَخْصِيْصِهٖ مُتَعَلِّقٌ بِالْخِطَابِ يُقَالُ خَاطَبْتُهٗ بِالدُّعَاءِ اِذَا دَعَوْتَ لَهٗ مُوَاجَهَةً وَغَايَةُ الْخُضُوْعِ هُوَ مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَعُمُوْمُ الْمُهِمَّاتِ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَذْفِ مَفْعُوْلِ نَسْتَعِيْنُ وَالتَّخْصِيْصُ مُسْتَفَادٌ مِنْ تَقْدِيْمِ الْمَفْعُوْلِ فَاللَّطِيْفَةُ الْمُخْتَصُّ بِهَا مَوْقِعُ هٰذَا الْاِلْتِفَاتِ هِىَ اَنَّ فِيْهِ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَخَذَ فِى الْقِرَاءَةِ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ قِرَاءَتُهٗ عَلٰى وَجْهٍ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهٖ ذٰلِكَ الْمُحَرِّكَ الْمَذْكُوْرَ ـ

অনুবাদ : উক্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি ছাড়া **ইলতিফাতের ক্ষেত্রগুলো অন্যান্য অনেক চমৎকার বিষয়াবলির সাথে যুক্ত হয়। যেমনটি হয়েছে** সূরাতুল **ফাতেহাতে। বান্দা যখন যাবতীয় প্রশংসার একমাত্র উপযুক্তকে** (মহান আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলির কথা) **স্মরণ করে প্রশংসা করে এবং** الحمد **বলে তখন সে বান্দা তার অন্তরে সেই পরম সত্তার যাবতীয় প্রশংসার উপযুক্ত রবের অভিমুখী হওয়ার একটি অনুপ্রেরণা বোধ করে, এরপর যখন সেসব গুণাবলির তথা** رَبِّ الْعَالَمِيْنَ **তথা জগতের প্রতিপালক,** اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **তথা পরমদাতা দয়ালু। তার উপর প্রয়োগ করা হয়, তখন** (তার অন্তরে) **সে অনুপ্রেরণা আরো জোরদার গতিময় হয়।** এমনকি তা সেসব গুণাবলির পরিশিষ্ট তথা مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে, **যা এই অর্থ করে যে,** আসলেই তিনি প্রশংসার উপযুক্ত। **প্রতিদান দিবসেও সব বিষয়ের মালিক, একচ্ছত্র অধিপতি।** (সব বিষয় বা اَلْاَمْرُ كُلُّهٗ তার মুযাফ ইলাইহের হবে) কারণ, مالك শব্দটিকে يَوْمِ الدِّيْنِ-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে ظرف-এর ক্ষেত্রের উদারতার ভিত্তিতে। (يَوْمِ الدِّيْنِ)-এর অর্থ কালের ও সময়ের হবে। অর্থাৎ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তথা তিনি প্রতিদান দিবসের অধিপতি হবে। এর মাফঊল ব্যাপকতার অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্যে উহ্য আছে। সেই অনুপ্রেরণা এতটা শক্তিশালী হয় যে, **তা তার রবের প্রতি তার অভিমুখী হওয়াকে ওয়াজিব করে** অর্থাৎ বান্দা যেন তার প্রতিপালকের চূড়ান্ত সান্নিধ্যে চলে যায় এবং তা ওয়াজিব করে **চরম বিনয় এবং আনুগতপূর্ণ বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে,** বিশেষভাবে সম্বোধন করাকে (অর্থাৎ বান্দা যখন এই পৃথিবী এবং পরকালে সব বিষয়ে তার রবের মুখাপেক্ষী জীবন-মৃত্যু ও হাশর-নাশরসহ সকল কঠিন সময়ে তার কাছেই সাহায্য চায় এবং বন্দেগি নিবেদন করে) بِتَخْصِيْصِهٖ-এর باء টি خطاب-এর সাথে متعلق হবে, (এভাবে ব্যবহার হয়) বলা হয় خَاطَبْتُهٗ بِالدُّعَاءِ তথা যখন তুমি তাকে মুখোমুখি ডেকেছ।

ইবাদতের অর্থ হচ্ছে চূড়ান্ত বিনয়। সবগুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ অর্থটি نَسْتَعِيْنُ-এর মাফঊল উহ্য রাখার দ্বারা পাওয়া গেছে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও তাঁর ইবাদতের অর্থটি মাফঊল (اِيَّاكَ)-কে অগ্রবর্তী করার দ্বারা হাসিল হয়েছে। এখানে যে (নাম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষের দিকে) ইলতিফাত হয়েছে তার চমৎকার সৌন্দর্যটি হচ্ছে বান্দা যখন (সূরা ফাতিহা) তিলাওয়াত শুরু করবে, তখন তার তিলাওয়াত এমন হওয়া আবশ্যক যার দ্বারা তার অন্তরে সেই বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করে।

وَلَمَّا انْجَرَّ الْكَلَامُ إِلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَوْرَدَ عِدَّةَ أَقْسَامٍ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَبَاحِثِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَقَالَ وَمِنْ خِلَافِ الْمُقْتَضَى أَيْ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ تَلَقِّي الْمُخَاطَبِ إِضَافَةُ الْمَصْدَرِ إِلَى الْمَفْعُولِ أَيْ تَلَقِّي الْمُتَكَلِّمِ الْمُخَاطَبَ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُهُ الْمُخَاطَبُ وَالْبَاءُ فِي بِغَيْرٍ لِلتَّعْدِيَةِ وَفِي بِحَمْلِ كَلَامِهِ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ إِنَّمَا تَلَقَّاهُ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُهُ بِسَبَبِ أَنَّهُ حَمَلَ كَلَامَهُ أَيْ الْكَلَامَ الصَّادِرَ عَنِ الْمُخَاطَبِ عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ أَيْ مُرَادِ الْمُخَاطَبِ وَإِنَّمَا حَمَلَ كَلَامَهُ عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ تَنْبِيهًا لِلْمُخَاطَبِ عَلَى أَنَّهُ أَيْ ذٰلِكَ الْغَيْرُ هُوَ الْأَوْلَى بِالْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ كَقَوْلِ الْقَبَعْثَرِيْ لِلْحَجَّاجِ وَقَدْ قَالَ الْحَجَّاجُ لَهُ أَيْ لِلْقَبَعْثَرِيْ حَالَ كَوْنِ الْحَجَّاجِ مُتَوَعِّدًا إِيَّاهُ لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ يَعْنِي الْقَيْدَ هٰذَا مَقُوْلُ قَوْلِ الْحَجَّاجِ مِثْلُ الْأَمِيرِ يَحْمِلُ عَلَى الْأَدْهَمِ وَالْأَشْهَبِ هٰذَا مَقُوْلُ قَوْلِ الْقَبَعْثَرِيْ فَأَبْرَزَ وَعِيْدَ الْحَجَّاجِ فِي مَعْرِضِ الْوَعْدِ وَتَلَقَّاهُ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُ بِأَنْ حَمَلَ الْأَدْهَمَ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْفَرَسِ الْأَدْهَمِ أَيِ الَّذِي غَلَبَ سَوَادُهُ حَتّٰى ذَهَبَ الْبَيَاضُ وَضَمَّ إِلَيْهِ الْأَشْهَبَ أَيِ الَّذِيْ غَلَبَ بَيَاضُهُ وَمُرَادُ الْحَجَّاجِ إِنَّمَا هُوَ الْقَيْدُ فَتَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْفَرَسِ الْأَدْهَمِ هُوَ الْأَوْلَى بِأَنْ يَقْصُدَهُ الْأَمِيرُ أَيْ مَنْ كَانَ مِثْلُ الْأَمِيرِ فِي السُّلْطَانِ أَيِ الْغَلَبَةِ وَبَسْطَةِ الْيَدِ أَيِ الْكَرَمِ وَالْمَالِ وَالنِّعْمَةِ فَجَدِيرٌ بِأَنْ يُصْفِدَ أَيْ يُعْطِيَ مِنْ أَصْفَدَهُ لَا أَنْ يَصْفِدَ أَيْ يُقَيِّدَهُ مِنْ صَفَدَهُ ـ

অনুবাদ : প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত বিষয়াদির আলোচনা যখন এসেই গেছে, তখন লেখক এর কয়েকটি প্রকার উল্লেখ করেছেন, যদিও সেগুলো মুসনাদ ইলাইহের প্রকার নয়; সুতরাং তিনি বলেছেন, **প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত এর একটি প্রকার হচ্ছে শ্রোতার সামনে উপস্থাপনা করা** (تَلَقِّيْ الْمُخَاطَبِ) এতে মাসদারের সম্বন্ধ করা হয়েছে মাফউলের দিকে অর্থাৎ বক্তা শ্রোতার সামনে উপস্থাপন করা **এমন বিষয় যার বিপরীত কিছুর সে অপেক্ষা করছিল**। بِغَيْرِ-এর بَاء হচ্ছে লাযিমকে মুতা'আদ্দী করার, بِحَمْلِ كَلَامِهِ-এর بَاء হচ্ছে সবরের জন্য। অর্থাৎ তার অপেক্ষা আশার বিপরীত কথা তার সামনে উপস্থাপন করেছে, তার কথা অর্থাৎ শ্রোতার পক্ষ থেকে যে কথা প্রকাশ পেয়েছে, **সেটাকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীতে শ্রোতার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করার কারণে,** আর কথাকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীতে গ্রহণ করেছে, শ্রোতাকে **এ ব্যাপারে সচেতন করার জন্যে যে, এই বিপরীত বিষয়টি ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য করার জন্য অধিক উপযোগী। যেমনটি কাবা'ছারীর কথা যা সে হাজ্জাজকে বলেছিল,** হাজ্জাজ তার অর্থাৎ কাবা'ছারীর উপর চোখ রাঙ্গিয়ে তাকে বলেছিল, **তোমাকে আমি অবশ্যই জেলে শেকলে চড়াবো** (অর্থাৎ শেকলে বেঁধে শাস্তি দিবো। أَدْهَم শব্দটির অর্থ লোহার শেকল) (এর উত্তরে কাবা'ছারী বলল) **আপনার মতো মহৎ হৃদয় বাদশাহ أَدْهَم এবং أَشْهَب যে কোনো ঘোড়ায় চড়াতে সক্ষম** এটি কাবা'ছারীর উক্তি, অতএব, তিনি হাজ্জাজের ধমকটিকে অঙ্গীকাররূপে প্রকাশ করলেন এবং সে যা আশা করছিল তার বিপরীত উপস্থাপন করলেন। তিনি তার বাক্যের أَدْهَم শব্দটিকে কালো ঘোড়ার অর্থে গ্রহণ করলেন (أَدْهَم বলা হয়) যার মধ্যে কালো জুড়ে রয়েছে ফলে শুভ্রতা হয়নি এবং এর সাথে সাদা ঘোড়াকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন (أَشْهَب বলা হয়) যার পুরো

শরীর সাদা জুড়ে আছে। হাজ্জাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে শেকল, ফলে সে সচকিত হলো যে, أَدْهَم শব্দটি ঘোড়ার অর্থে গ্রহণ করাটা অধিক উপযুক্ত যে, বাদশাহ এটার ইচ্ছা করুক, অর্থাৎ **যিনি ক্ষমতা প্রতিপত্তি তথা দানশীলতা, বিত্ত ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত, সে দান করবে** সেটাই তো স্বাভাবিক **বন্দী করবে না,** يُصْفِدُ (بَاب إِفْعَال) থেকে দান করা। আর (بَاب ضَرَبَ) يَصْفِدُ থেকে বন্দী করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَلَمَّا إِنْجَرَّ الْكَلَامُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেসব স্থানে মুসনাদ ইলাইহ হওয়া ব্যতীত বাক্যটি প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত ব্যবহৃত হয়, তার একটি স্থান হচ্ছে শ্রোতার কথাকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীতার্থে গ্রহণ করে সে যেরূপ বাক্য আশা করছিল তার বিপরীত বাক্য তার সামনে উপস্থাপন করা, শ্রোতাকে এ বিষয় বুঝানোর জন্য যে, তুমি তোমার বাক্যের যে অর্থ গ্রহণ করেছ সেটা তোমার শানের জন্য সমীচীন নয়; বরং তোমার জন্য এ অর্থ গ্রহণ করা সমীচীন, যে অর্থ তোমার বাক্য থেকে আমি নিয়েছি এর উদাহরণ হচ্ছে বিখ্যাত আরববাসী কাবা'ছারী এবং তৎকালীন ইরাকের দৌর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মাঝে চিত্তাকর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নিম্নে তাদের কথোপকথন হুবহু উঠানো হলো।

মৌলিক আরবি সাহিত্য গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে যে, কতিপয় সহচরদের নিয়ে কাবা'ছারী এক আঙুরের বাগানে বাক্য চর্চা ও মদপানে ব্যস্ত ছিল। ইতোমধ্যে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সম্পর্কে আলোচনা উঠল। কাবা'ছারী তখন এক গুচ্ছ আঙুর হাতে নিয়ে বলে উঠলেন قَطَعَ اللّٰهُ عُنُقَهُ وَسَقَانِيْ دَمَهُ অর্থাৎ আল্লাহ যদি এর ঘাড় মটকে দেন এবং এর রক্তে আমার গলা ভিজিয়ে দেন, তাহলে আমার প্রাণ জুড়ায়।

উপস্থিত এদের কোনো এক ব্যক্তি তা হাজ্জাজের কানে দিল। হাজ্জাজ তাকে ধরে এনে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নাকি এ কথা বলেছ قَطَعَ اللّٰهُ عُنُقَهُ وَسَقَانِيْ دَمَهُ কাবা'ছারী কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন,

نَعَمْ وَقَدْ قَصَدْتُ عُنْقُوْدَ الْعِنَبِ الَّذِيْ كَانَ بِيَدِيْ

অর্থাৎ জ্বি, বলেছি, তবে আমার উদ্দেশ্য ছিল আমার হাতে ধরা আঙুর গুচ্ছ এবং তার থেকে তৈরি লাল শরাব।

হাজ্জাজ সবই বুঝলেন, তাই তিনি ধমক দিয়ে বললেন, তোমাকে আমি অবশ্যই শেকলে চড়াবো, لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ তার বাক্যে ادهم শব্দটিকে তিনি শেকল জেলখানা বুঝিয়েছেন। এর জবাবে হাজ্জাজের কথার বিপরীতার্থ নিয়ে কবি বললেন, مِثْلُ الْأَمِيْرِ يَحْمِلُ عَلَى الْأَدْهَمِ وَالْأَشْهَبِ তথা আপনার মতো মহানুভব শাসক ادهم (কালো) ও اشهب (সাদা) যে কোনো ঘোড়ায় চড়াতে পারেন।

হাজ্জাজ এমন উত্তর মোটেও আশা করেননি, তাই তিনি পরক্ষণেই ধমক দিয়ে বললেন- قَصَدْتُ الْحَدِيْدَ ব্যাটা মূর্খ আমি حديد (লোহার শেকল) বুঝাতে চেয়েছি। এবারও কাবা'ছারী কৃতিত্বের সাথে তার কথাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, لَأَنْ يَكُوْنَ الْحَدِيْدُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ بَلِيْدًا অর্থাৎ জি, بليد (বোকা) না হয়ে حديد (চালাক) হওয়াই উত্তম।

এটা শুনে হাজ্জাজ তার কর্মচারীদের বললেন, তাকে উঠিয়ে নাও। অতঃপর তাকে উঠাল।

কাবা'ছারী বললেন, سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ অর্থাৎ সেই মহান সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি আমার জন্য একে আমাদের জন্য নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, অথচ আমরা একে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলাম না। এটা শুনে হাজ্জাজ বললেন, একে নিচে রেখে দাও। তখন বলে উঠলেন مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ অর্থাৎ মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নিবো।

কাবা'ছারীর এরূপ বাক চাতুর্যে হাজ্জাজের রাগ পড়ে গেল এবং তিনি তাকে উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করলেন।

মোটকথা, উপরোক্ত আলোচনায় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যে অর্থে কথা বলছিলেন প্রকাশ্য অবস্থার দাবি তাই ছিল, সে অর্থেই তার কথাকে গ্রহণ করা এবং সেভাবে জবাব দেওয়া, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে কাবা'ছারী তার বাক চাতুর্য ও উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা সেটাকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে أُسْلُوْبُ الْحَكِيْمِ বলা হয়।

اَوِ السَّائِلِ عَطْفٌ عَلَى الْمُخَاطَبِ اَىْ تَلَقِّى السَّائِلِ بِغَيْرِ مَا يَتَطَلَّبُ بِتَنْزِيْلِ سُؤَالِهِ مَنْزِلَةَ غَيْرِهِ اَىْ غَيْرَ ذٰلِكَ السُّؤَالِ تَنْبِيْهًا لِلسَّائِلِ عَلٰى اَنَّهُ اَىْ ذٰلِكَ الْغَيْرُ اَلاَوْلٰى بِحَالِهِ اَوِ الْمُهِمُّ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ سَاَلُوْا عَنْ سَبَبِ اِخْتِلَافِ الْقَمَرِ فِىْ زِيَادَةِ النُّوْرِ وَنُقْصَانِهِ فَاُجِيْبُوْا بِبَيَانِ الْغَرَضِ مِنْ هٰذَا الْاِخْتِلَافِ وَهُوَ اَنَّ الْاَهِلَّةَ بِحَسْبِ ذٰلِكَ الْاِخْتِلَافِ مَعَالِمُ يُوَقِّتُ بِهَا النَّاسُ اُمُوْرَهُمْ مِنَ الْمَزَارِعِ وَالْمَتَاجِرِ وَمَحَالِّ الدُّيُوْنِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَمَعَالِمُ الْحَجِّ يُعْرَفُ بِهَا وَقْتُهُ وَ ذٰلِكَ لِلتَّنْبِيْهِ عَلٰى اَنَّ الْاَوْلٰى وَالْاَلْيَقُ بِحَالِهِمْ اَنْ يَسْئَلُوْا عَنْ ذٰلِكَ وَلَايَسْئَلُوْا عَنِ السَّبَبِ لِاَنَّهُمْ لَيْسُوْا مِمَّنْ يَطَّلِعُوْنَ بِسُهُوْلَةٍ عَلٰى دَقَائِقِ عِلْمِ الْهَيْئَةِ وَلَايَتَعَلَّقُ لَهُمْ بِهِ غَرَضٌ وَكَقَوْلِهِ تَعَالٰى يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ سَاَلُوْا عَنْ بَيَانِ مَايُنْفِقُوْنَ فَاُجِيْبُوْابِبَيَانِ الْمَصَارِفِ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ الْمُهِمَّ هُوَ السُّؤَالُ عَنْهَا لِاَنَّ النَّفَقَةَ لَايُعْتَدُّ بِهَا اِلَّا اَنْ تَقَعَ مَوْقِعَهَا ـ

অনুবাদ : অথবা প্রশ্নকারীর সামনে উপস্থাপন করা اَلسَّائِلِ এটি আতফ হয়েছে اَلْمُخَاطَبِ-এর উপর, অর্থাৎ প্রশ্নকারী যা চাচ্ছে তার বিপরীত বিষয় তার সামনে উপস্থাপন করা। তার প্রশ্নটিকে অন্য প্রশ্নের স্থানে রেখে প্রশ্নকারীকে এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে, সে ভিন্ন বিষয়টি তাদের অবস্থানুসারে (প্রশ্নের জন্য) অধিক উপযোগী অথবা তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে চাঁদের (উদয়স্তের কারণ) সম্পর্কে। আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য বিভিন্ন সময় এবং হজের সময় নির্ধারণের মাধ্যম। তারা চাঁদের আলো চাঁদের পরিবর্তন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তাদের এ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে জবাব দেওয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে চাঁদ এ পরিবর্তনের মাধ্যমে অনেকগুলো নিদর্শন যার সাহায্যে লোকেরা তাদের বিভিন্ন বিষয়ের সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ তাদের চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ঋণ ইত্যাদি আদায়ের সময় রোজার সময় ইত্যাদি এমন কি হজের জন্য নিদর্শন, এর দ্বারা হজের সময় জানা যায়, আর এ জবাব দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে, তাদের অবস্থানুসারে অধিক উপযুক্ত বিষয় হচ্ছে তারা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে আর এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না, কেননা, তারা ঐ পর্যায়ের ছিলেন না যারা সহজেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে পারে এবং এর সাথে তাদের কোনো মৌলিক উদ্দেশ্য ও সম্পর্কিত নয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার আরেকটি বাণীতে (আমরা দেখতে পাচ্ছি) "তারা (সাহাবীগণ) আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ব্যয় করে? আপনি বলুন– যা কিছু অর্থ সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে, তা তোমার পিতা-মাতার জন্য, নিকটাত্মীয়ের জন্য, এতিম, মিসকিন (অসহায়) ও মুসাফিরের জন্য।" তারা প্রশ্ন করেছিলেন কি (এবং কি পরিমাণে ব্যয় করবেন, কিন্তু তাদের জবাব দেওয়া হলো দানের ক্ষেত্র সম্পর্কে এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে, এটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা, দান গ্রহণযোগ্য হবে না যে পর্যন্ত না, তা যথাস্থানে হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اَوِ السَّائِلِ عَطْفٌ الخ : মুসনাদ ইলাইহের বাইরে বাহ্যিক-প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত বাক্য ব্যবহার করার আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যের বিপরীত জবাব দিয়ে এ ব্যাপারে সতর্ক করা যে, তোমার প্রশ্ন এ সম্পর্কে হওয়াটাই সমীচীন ছিল।

ইতঃপূর্বে শ্রোতাকে তার আশার বিপরীত জবাব দান সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে।

এ দু'টি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে– প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যের বিপরীত এর মধ্যে প্রশ্ন থাকা আবশ্যক যেমন আমরা এর দু'টি উদাহরণের মধ্যে দেখলাম, পক্ষান্তরে শ্রোতার উদ্দেশ্যের বিপরীত-এর মধ্যে প্রশ্ন থাকা আবশ্যক নয়।

تَلَقِّى السَّائِلِ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُهُ : এর সারকথা হচ্ছে– প্রশ্নকারী যে উদ্দেশ্য নিয়ে যে প্রশ্ন করেছে। উত্তর প্রদানকারী তার প্রশ্ন ভিন্ন অন্য প্রশ্নকে তার প্রশ্নের স্থানে রেখে ভিন্ন প্রশ্নটির উত্তর দিবে, তার প্রশ্নের উত্তর দিবে না। উত্তর প্রদানকারী প্রশ্নকারীকে বুঝাবে যে, আপনার প্রশ্ন এটা হওয়া সমীচীন হয়নি; বরং প্রশ্ন সেটাই হওয়া উচিত ছিল যার উত্তর আমি দিলাম। যেমন কুরআনের আয়াত (প্রশ্ন) يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ (জবাব) قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ তারা অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করছেন, হে আল্লাহর রাসূল! চাঁদের ব্যাপারটি এমন কেন? এটা খুব সরু হয়ে উদিত হয়, এরপর ক্রমশ বাড়তে থাকে এক পর্যায়ে তা পূর্ণ শশী পূর্ণিমার চাঁদে পরিণত হয়। এরপর আবার হ্রাস পেতে থাকে এবং প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে, তাদের প্রশ্নটি ছিল চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাজাগতিক কারণ সম্পর্কে। কিন্তু এ জাতীয় প্রশ্ন দীন ও শরিয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। তা জানা বা না জানাতে শরিয়তের কোনো কিছু আসে যায় না। শরিয়তের সাথে চাঁদের পরিক্রমা ও হ্রাস-বৃদ্ধির যে সম্পর্ক, তা হচ্ছে এর দ্বারা সময়ের জ্ঞান লাভ হয়, আর বিভিন্ন সময়ে শরিয়তের যেসব হুকুম, যথা–হজের সময়, রোজার মাস, ঈদসহ অন্যান্য বিষয়।

তাই তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে; বরং এ সম্পর্কে তাদের কি প্রশ্ন হওয়া উচিত এবং তার উত্তর কি তা বর্ণনা করা হয়েছে। قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ বলা হয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে লেনদেন, বেচাকেনা, চাষাবাদ, ঋণদান ও গ্রহণের সময় নির্ধারণে বিশেষ উপকারিতা রয়েছে, এমনি ইবাদতের সময় নির্ধারণ, বিশেষভাবে হজের তারিখ নির্ধারণের মাধ্যম হচ্ছে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধিগত পরিবর্তন।

সারকথা হচ্ছে, এখানে চাদের মহাজাগতিক হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সংক্রান্ত প্রশ্নকে চাঁদের কল্যাণ ও উপকারিতা প্রশ্নের স্থানে রাখা হয়েছে এবং সে মতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। কেননা, প্রশ্নকারীদের জন্য এটা প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

قَوْلُهُ وَكَقَوْلِهِ تَعَالٰى يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ الخ : এটিই হচ্ছে تَلَقِّى السَّائِلِ بِغَيْرِ مَا يَتَطَلَّبُ-এর দ্বিতীয় উহাদরণ, এতে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের বিপরীত উত্তর দেওয়া হয়েছে শ্রোতাকে এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে, তোমার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং আমার দেওয়া জবাবটি তোমার জানা বেশি প্রয়োজন।

সাহাবীগণের প্রশ্ন ছিল তারা কি কি পরিমাণে খরচ করবেন, কিন্তু তাদের সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আল্লাহ তা'আলা কাদের জন্য খরচ করা হবে তা বর্ণনা করলেন, এটা তাদের প্রশ্ন এবং প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত। অতএব, তাদের বলা হলো যাই তোমরা খরচ করো এবং সেটা যে পরিমাণই হোক না কেন তা তোমরা তোমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম মিসকিন-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য খরচ করো। আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামকে সে খবরের বস্তু এবং পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং খরচের ক্ষেত্রেই হলো আসল গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সঠিক স্থানে অল্প ব্যয়ে পুণ্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে অক্ষেত্রের অবস্থানে বহু দানেও পুণ্য লাভ হয় না। তাই তোমাদের খরচের ক্ষেত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাই ছিল বেশি জরুরি। তাদের কৃত প্রশ্নের পরিবর্তে ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। অতএব, এটিও اُسْلُوْبُ الْحَكِيْمِ হয়েছে।

وَمِنْهُ اَىْ وَمِنْ خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ اَلتَّعْبِيْرُ عَنِ الْمَعْنَى الْمُسْتَقْبِلِ بِلَفْظِ الْمَاضِىْ تَنْبِيْهًا عَلٰى تَحَقُّقِ وُقُوْعِهٖ نَحْوُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ بِمَعْنٰى يَصْعَقُ وَمِثْلُهُ اَلتَّعْبِيْرُ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ بِلَفْظِ اِسْمِ الْفَاعِلِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ مَكَانَ يَقَعُ وَنَحْوُهُ اَلتَّعْبِيْرُ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ بِلَفْظِ اِسْمِ الْمَفْعُوْلِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ مَكَانَ يُجْمَعُ وَهٰهُنَا بَحْثٌ وَهُوَ اَنَّ كُلًّا مِنْ اِسْمَيِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ قَدْ يَكُوْنُ بِمَعْنَى الْاِسْتِقْبَالِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ بِحَسْبِ اَصْلِ الْوَضْعِ فَيَكُوْنُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَاقِعًا فِىْ مَوْقِعِهٖ وَارِدًا عَلٰى حَسْبِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ وَالْجَوَابُ اَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَقِيْقَةٌ فِيْمَا يَتَحَقَّقُ فِيْهِ وُقُوْعُ الْوَصْفِ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ هٰهُنَا فِيْمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ مَجَازًا تَنْبِيْهًا عَلٰى تَحَقُّقِ وُقُوْعِهٖ -

---

অনুবাদ : প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত বাক্য ব্যবহার করার **আরেক ক্ষেত্র হচ্ছে** ভবিষ্যৎকালের অর্থকে **অতীতকালের শব্দে প্রকাশ করা**। এ কথার صِيْغَةُ الْمُسْتَقْبِلِ-এর স্থানে صِيْغَةُ الْمَاضِى ভবিষ্যতের বিষয়টি (অতীতের ঘটে যাওয়া বিষয়টির মতো) সুনিশ্চিতভাবে ঘটবে এটার প্রতি করা। **যেমন– মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী–** يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ **যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, পৃথিবী এবং আকাশের সকলেই সংজ্ঞাহীনভাবে পড়বে**। صَعِقَ (অতীতকালবাচক ক্রিয়া) يَصْعَقُ (ভবিষ্যতকালবাচক ক্রিয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত (এটা প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত এটা করা নিশ্চয় তার অর্থ নেওয়ার জন্য) **এবং এর মতো** প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত ভবিষ্যৎকালের অর্থকে اِسْم فَاعِل-এর সাহায্যে প্রকাশ করা। যেমন– মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী وَاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ অর্থাৎ **আর প্রতিদান (দিবস) ঘটবেই**। وَاقِعٌ শব্দটি يَقَعُ (مضارع)-এর স্থানে হয়েছে **এবং এর মতো** প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত হচ্ছে ভবিষ্যৎকালের অর্থ ইসমে মাফঊল-এর সাহায্যে প্রকাশ করা। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী **"যেদিন সমস্ত লোকদের একত্রিক করা হবে।"** এখানে مَجْمُوْعٌ (اسم مفعول)-কে يُجْمَعُ (مضارع)-এর স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কিছু আলোচনা রয়েছে। (মুসান্নিফ (র.) আপত্তি আকারে বলেছেন যে) ইসমে ফায়েল এবং ইসমে মাফঊল উভয়েই ভবিষ্যৎকালের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যদিও উৎপত্তিগতভাবে এতে ভবিষ্যতের অর্থ নেই (যদি এদেরকে ভবিষ্যতের অর্থে ব্যবহার করা হয়) তাহলে তো এ দু'টি যথা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রকাশ্য অবস্থার দাবি অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে, এদের (ইসমে ফায়েল এবং ইসমে মাফঊল) প্রত্যেকটি নিশ্চয়তার অর্থাৎ অতীত এবং বর্তমানকালের অর্থ প্রদানে হাকীকত। এখানে এমন অনিশ্চয়তার অর্থে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নিশ্চয়তার অর্থের প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের জন্য।

সারকথা হচ্ছে– ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফঊলের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, বর্তমান ও অতীতের অর্থ দেওয়া, তবে রূপকভাবে ভবিষ্যতের অর্থ প্রদান করে। এটা জেনে রাখা দরকার, রূপকার্থ সবসময় প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত হয়ে থাকে। সে মতে এখানে ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফঊল ভবিষ্যতের অর্থ ধারণ করতে মাজায বা রূপকার্থে হয়েছে। আর রূপকার্থে হওয়াটাই প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত অর্থ এবং ইসমদ্বয় এখানে প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত রূপক ব্যবহৃত হয়েছে।

وَمِنْهُ اَىْ وَمِنْ خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ اَلْقَلْبُ وَهُوَ اَنْ يُجْعَلَ اَحَدُ اَجْزَاءِ الْكَلَامِ مَكَانَ الْاٰخَرِ وَ الْاٰخَرُ مَكَانَهُ نَحْوُ عَرَضْتُ النَّاقَةَ عَلَى الْحَوْضِ مَكَانَ عَرَضْتُ الْحَوْضَ عَلَى النَّاقَةِ اَىْ اَظْهَرْتُهُ عَلَيْهَا لِتَشْرَبَ وَقَبِلَهُ اَىْ اَلْقَلْبَ السَّكَّاكِيُّ مُطْلَقًا وَقَالَ اِنَّهُ مِمَّا يُوْرِثُ الْكَلَامَ مَلَاحَةً وَرَدَّهُ غَيْرُهُ اَىْ غَيْرُ السَّكَّاكِيْ مُطْلَقًا لِاَنَّهُ عَكْسُ الْمَطْلُوْبِ وَنَقِيْضُ الْمَقْصُوْدِ وَالْحَقُّ اَنَّهُ اِنْ تَضَمَّنَ اِعْتِبَارًا لَطِيْفًا غَيْرَ الْمَلَاحَةِ الَّتِىْ اَوْرَثَتْهَا نَفْسُ الْقَلْبِ قُبِلَ كَقَوْلِهٖ شِعْرٌ وَمَهْمَهَةٍ اَىْ مَفَازَةٍ مُغْبَرَّةٍ اَىْ مُتَلَوِّنَةٍ بِالْغَبَرَةِ اَرْجَاؤُهُ * اَطْرَافُهُ وَنَوَاحِيْهِ جَمْعُ الرَّجَا مَقْصُوْرًا كَاَنَّ لَوْنَ اَرْضِهٖ سَمَاؤُهُ عَلٰى حَذْفِ الْمُضَافِ اَىْ لَوْنُهَا اَىْ لَوْنُ السَّمَاءِ فَالْمِصْرَاعُ الْاَخِيْرُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ وَالْمَعْنٰى كَاَنَّ لَوْنَ سَمَائِهٖ لِغَبَرَتِهَا لَوْنُ اَرْضِهٖ وَالْاِعْتِبَارُ اللَّطِيْفُ هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِىْ وَصْفِ لَوْنِ السَّمَاءِ بِالْغَبَرَةِ حَتّٰى كَاَنَّهُ صَارَ بِحَيْثُ يُشَبَّهُ بِهٖ لَوْنُ الْاَرْضِ فِىْ ذٰلِكَ مَعَ اَنَّ الْاَرْضَ اَصْلٌ فِيْهِ ـ

<u>অনুবাদ :</u> প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত হওয়ার **আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে** قَلْب (قلب) বলা হয় বাক্যের একটা অংশকে অন্য অংশের স্থানে এবং অন্যটিকে তার স্থানে রাখা। **যেমন– উটনীর সামনে আমি গামলা পেশ করেছি**-এর স্থানে উটনীকে গামলার সামনে রেখেছি বলা, অর্থাৎ গামলাটিকে প্রকাশ করেছি– **যাতে পান করে**। **সাক্কাকী এটিকে সাধারণভাবে** (কোনো কয়েদ ছাড়াই) **গ্রহণ করেছেন**। আর তিনি বলেছেন যে, তার বাক্যের মধ্যে এক ধরনের চমক সৃষ্টি করে। **অন্যরা এটিকে সাধারণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন**। কেননা, উদ্দেশ্যের বিপরীত এবং মাকসাদের বৈরী। **তবে সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, যদি এতে কলবের সৃষ্টি করা চমক ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ তাৎপর্য থাকে,** তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। যেমন– রুবা ইবনে আজাজের **কবিতা অনেক মরুভূমি রয়েছে যার চতুষ্পার্শ্বে ধুলো মিশ্রিত**। اَرْجَاء-এর অর্থ হলো– চতুষ্পার্শ্ব এবং প্রান্ত ও প্রান্তর, এটি اَرْجَاء (ইসমে মাকসূর) **যেন তার ভূমির রক্ত আকাশের রঙ্গের মতো**, এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ **তার আকাশের রঙ,** দ্বিতীয় লাইনটিতে কলব হয়েছে, মূল অর্থ হচ্ছে, যেন তার আকাশের ধুলোর কারণে ভূমি (মাটির)-এর রঙের মতো। এখানে বিশেষ তাৎপর্যটি হচ্ছে, ধুলোর কারণে তার আকাশের রঙের আতিশয্য বুঝানো। এমনকি যেন সেটি হয়ে গেছে এমন যে, এর দ্বারা মাটির রঙের তুলনা করা হয় আতিশয্যের ব্যাপারে, অথচ ধুলোর রঙের ব্যাপারে মাটিই হচ্ছে মূল (ও মুশাব্বাহ বিহী)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَمِنْهُ اَىْ وَمِنْ خِلَافِ الخ : মূল লেখক বলেন, বাহ্যিক-প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত বাক্য ব্যবহার করার আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে قلب (স্থানান্তর)। قلب বলা হয় বাক্যের একটি অংশকে অন্য অংশে অন্যটিকে প্রথমটির স্থানে ব্যবহার করা। শুধুমাত্র এতটুকু পরিবর্তনকে قلب বলা হয় না; বরং প্রথম অংশটিকে দ্বিতীয় অংশের স্থানে রাখা হবে, তখন এর দ্বারা দ্বিতীয় অংশের হুকুম প্রমাণ হবে। আবার যখন দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশের স্থানে রাখা হবে– তখন এর দ্বারা প্রথম অংশের হুকুম প্রমাণিত হবে। যেমন– عَرَضْتُ الْحَوْضَ عَلَى النَّاقَةِ এ উদাহরণের عرض (উপস্থাপন)-এর মধ্যে

উভয়ে (حَوْض وَنَاقَة) শামিল, তবে حوض-এর উপর حرف جر (على) না থাকাতে এটি معروض (পেশকৃত) আর حرف جر যুক্ত) হচ্ছে যার সামনে পেশ করা হয়েছে। অতএব, এ উদাহরণের অর্থ হবে– আমি (পানি ইত্যাদির) হাউজ ناقة (গামলাটি পান করার জন্য উটনীর সামনে রেখেছি।

যদি এতে قلب করা হয়, তাহলে বলা হবে عَرَضْتُ النَّاقَةَ عَلَى الْحَوْضِ পরিবর্তিত উদাহরণে পেশকৃত হবে ناقة উটনী, যা পূর্বের উদাহরণে ছিল حوض-এর জন্য। এর অনুবাদ হচ্ছে, আমি উটনীকে পানির সামনে পেশ করেছি।

মোটকথা, عَرَضْتُ النَّاقَةَ عَلَى الْحَوْضِ-এর মধ্যে قلب হয়েছে যা পূর্বে عَرَضْتُ الْحَوْضَ عَلَى النَّاقَةِ-এর দলিল হচ্ছে مَعْرُوْض عَلَيْه যার সামনে পেশ করা হয় সেটা অনুভূতিশীল এবং ইচ্ছার অধিকারী হওয়া।

জরুরি যে, তা معروض (পেশকৃত)-এর প্রতি ধাবিত হবে অথবা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। আর এটা তো সকলেরই জানা যে, حوض এবং ناقة-এর মধ্যে ناقة হচ্ছে অনুভূতিশীল প্রাণী। অতএব, মূলে ناقة হবে مَعْرُوْض عَلَيْه (যার সামনে পেশ করা হয়) এবং حوض হবে معروض যা পাওয়া গেছে الناقة-এর মধ্যে এবং এটি (عَرَضْتُ الْحَوْضَ عَلَى النَّاقَةِ) হচ্ছে প্রকাশ্য অবস্থার অনুযায়ী। সুতরাং এর قلب পরিবর্তিত ও স্থানান্তরিত বাক্য عَرَضْتُ النَّاقَةَ عَلَى الْحَوْضِ হবে প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, আল্লামা সাক্কাকী (র.)-এর নিকট সাধারণভাবে (শর্তহীন) قلب বৈধ, এতে বিশেষ কোনো তাৎপর্য থাকা জরুরি নয়, তাৎপর্য থাকলে যেমন সহীহ হবে তেমনি না থাকলেও সহীহ হবে। সাক্কাকী (র.) বলেন, যেহেতু قلب দ্বারা বাক্যের মধ্যে এক ধরনের চমক ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয় তাই এটি গ্রহণযোগ্য এবং বৈধ, সাক্কাকী (র.) ছাড়া অন্য বালাগাত বিশারদগণের মতে قلب সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। চাই এতে চমক সৃষ্টি করা ছাড়া ভিন্ন কোনো তাৎপর্য নিহিত থাকুক অথবা নাই থাকুক; তাহলে তাদের দলিল হচ্ছে, এটি উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তো নয়ই; বরং বিরোধপূর্ণ এবং বাক্যের মাকসাদ পূরণে এটি বাধা স্বরূপ। আল্লামা মুহাম্মদ আবুল মা'আলী জালালুদ্দীন (তালখীসুল মিফতাহের মূল লেখক)-এর মতে قلب-এর মধ্যে যদি চমক সৃষ্টি করা ছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নিহিত থাকে, তাহলে قلب গ্রহণযোগ্য ও বৈধ হবে, শুধুমাত্র চমক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য قلب করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বিশেষ তাৎপর্যবহ قلب -এর একটি উদাহরণ তিনি রুবা ইবনুল আজাজের একটি কবিতার পঙ্ক্তি দ্বারা দেখিয়েছেন।

পঙ্ক্তি– وَمَهْمَةٍ مُغْبَرَةٍ أَرْجَاؤُهُ * كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاؤُهُ

শাব্দিক বিশ্লেষণ :

واو এখানে رب-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مهمة বলা হয় এমন বন জঙ্গলকে, যাতে গ্রাম এবং পানি নেই। এক কথায় মরুভূমির জঙ্গল, مغبرة ধুলো মিশ্রিত, ارجاء শব্দ رجاء (ইসমে মাকসূর)-এর বহুবচন, এর অর্থ হচ্ছে চতুষ্পার্শ্ব এবং আশপাশের এলাকা سماءه-এর মধ্যে মুযাফ উহ্য আছে, উহ্য মুযাফসহ ইবারত হচ্ছে– لون سماء

কবিতার মর্মার্থ : অনেক বনভূমি এমন রয়েছে, যার চতুষ্পার্শ্ব ধুলো মিশ্রিত, যেন তার ভূমির রঙ আকাশের রঙে পরিণত হয়েছে।

এ পঙ্ক্তির দ্বিতীয় লাইনে قلب হয়েছে, কেননা, মূলত আকাশ ধুলোমলিন হয়ে ভূমির রঙের সাথে মিশে যায় এবং একাকার হয়ে যায়। অর্থাৎ আকাশের রঙ হচ্ছে مشبه আর ভূমির রঙ হচ্ছে مشبه به-এর মধ্যে তুলনীয় বিষয় হচ্ছে ধুলো মলিনতা, অথচ কবিতার قلب করে দেখিয়েছেন ভূমির রঙ হচ্ছে مشبه আর আকাশের রঙ হচ্ছে مشبه به তিনি ভূমির রঙকে আকাশের রঙের সাথে তুলনা করেছেন, এখানে বিশেষ তাৎপর্যটি হচ্ছে আকাশের রঙের মধ্যে আতিশয্য তৈরি করা অর্থাৎ আকাশ এতটা ধুলোমলিন এবং এতে ধুলো এত বেশি যে, এর সাথে ভূমির তুলনা চলে। অথচ প্রকৃত ধুলোমলিন হচ্ছে ভূমি এবং ভূমি থেকেই ধুলোর সৃষ্টি হয়। ধুলোর রঙের তুলনা করা হলে সেটা স্বাভাবিকভাবে মাটির সাথেই করা হয়ে থাকে।

وَاِلَّا اَىْ وَاِنْ لَّمْ يَتَضَمَّنْ اِعْتِبَارًا لَطِيْفًا رُدَّ لِاَنَّهُ عُدُوْلٌ عَنْ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ نُكْتَةٍ يُعْتَدُّ بِهَا كَقَوْلِهٖ شِعْرٌ فَلَمَّا اَنْ جَرٰى سِمَنٌ عَلَيْهَا * كَمَا طَيَّنْتَ بِالْفَدَنِ اَىِ الْقَصْرِ السِّيَاعَا اَىْ اَلطِّيْنَ الْمَخْلُوْطَ بِالتِّبْنِ وَالْمَعْنٰى كَمَا طَيَّنْتَ الْفَدَنَ بِالسِّيَاعِ يُقَالُ طَيَّنْتُ السَّطْحَ وَالْبَيْتَ وَلِقَائِلٍ اَنْ يَقُوْلَ اِنَّهُ يَتَضَمَّنُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِىْ وَصْفِ النَّاقَةِ بِالسِّمَنِ مَا لَا يَتَضَمَّنُ قَوْلُنَا كَمَا طَيَّنْتَ الْفَدَنَ بِالسِّيَاعِ لِاِيْهَامِهٖ اَنَّ السِّيَاعَ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْعِظَمِ وَالْكَثْرَةِ اِلٰى اَنْ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْاَصْلِ وَالْفَدَنُ بِالنِّسْبَةِ اِلَيْهِ كَالسِّيَاعِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْفَدَنِ ـ

অনুবাদ : **অন্যথায়** অর্থাৎ যদি কল্ব বিশেষ কোনো তাৎপর্য বহন না করে তাহলে প্রত্যাখ্যান করা হবে। কেননা, এটা হচ্ছে বাহ্যিক অবস্থার দাবি থেকে বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছাড়া সরে পড়া। **যেমন– আমর ইবনে সালিম ছা'লাবীর উক্তি "যখন উটনী স্থূলদেহ হয়ে গেল যেমনটি তুমি লেপনকে প্রাসাদ দ্বারা প্রলেপ দিয়েছ"** سِيَاع বলা হয় এমন লেপনকে যাতে কাদার সাথে ভূষি মিশ্রিত করা হয়। অর্থ হচ্ছে– যেমন তু'মি প্রাসাদকে লেপন দ্বারা প্রলেপ দিয়েছ। বলা হয় আমি ঘর এবং ছাদ লেপেছি। কেউ বলতে পারে, এটি তো উটনী স্থূলতার ক্ষেত্রে আতিশয্য বুঝিয়েছে। যে আতিশয্যটি নেই আমি প্রাসাদকে লেপন গাদ দ্বারা প্রলেপ দিয়েছি এর মধ্যে। কেননা, কাল্ব এ ধারণা সৃষ্টি করছে যে, লেপন ছাড়া মোটা এবং পরিমাণে বেশি এর দিক থেকে এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, তা মূলে পরিণত হয়েছে। আর প্রাসাদ তার তুলনায় লেপন যেমনটি প্রাসাদের তুলনায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهٗ وَاِلَّا اَىْ وَاِنْ لَّمْ يَتَضَمَّنْ الخ : মূল লেখক বলেন, যদি قلب-এর মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ থাকে তাহলে সেটি অগ্রহণযোগ্য বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, এমতাবস্থায় কোনো তাৎপর্য ছাড়া বাহ্যিক অবস্থার দাবি থেকে সরে আসা আবশ্যক হয়, অথচ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া বাহ্যিক অবস্থার দাবি থেকে সরে আসা অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য। এর উদাহরণ আমর ইবনে সালিম ছা'লাবীর কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি– فَلَمَّا اَنْ جَرٰى سِمَنٌ عَلَيْهَا * كَمَا طَيَّنْتَ بِالْفَدَنِ السِّيَاعَا

শাব্দিক বিশ্লেষণ : ان অতিরিক্ত جرى এখানে প্রকাশ পাওয়ার অর্থে سمن (سين-এর নিচে যের, ميم-এর উপর যবর) অর্থ– স্থূলদেহ طين অর্থ– প্রলেপ দেওয়া فدن অর্থ– প্রাসাদ, ঘর, سياع অর্থ– ছানা বিশেষ, কাদা ও ভূসি মিশ্রিত বস্তু, যার দ্বারা ঘর ইত্যাদি প্রলেপ দেওয়া হয়। কবি উটনীর স্থূলতা বুঝাতে বলছেন, যখন উটনীর স্থূলতা প্রকাশ হলে এমন যে, তুমি প্রাসাদকে ছানা-লেপন দ্বারা প্রলেপ দিলে। কবি উটনীকে প্রাসাদের সাথে তুলনা করছেন, স্থূলতা ও মোটা হওয়ার দিক থেকে, প্রাসাদের দেয়াল প্রলেপ দিলে যেমন মোটা হয় তেমনি উটনীটি স্থূল মোটা।

কবিতার দ্বিতীয় লাইনে قلب হয়েছে। কেননা, কবি طَيَّنْتُ الْفَدَنَ بِالسِّيَاعِ-এর স্থানে طَيَّنْتَا بِالْفَدَنِ السِّيَاعَا বলেছেন, প্রাসাদকে লেপন ছানা দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হয়। যেমন বলা হয়– طَيَّنْتُ السَّطْحَ وَالْبَيْتَ মোটকথা হলো, যেহেতু এই قلب-এর মধ্যে কোনো বিশেষ তাৎপর্য নিহিত নেই এটি প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, কেউ হয়তো বলতে পারে যে, এতে পূর্ববর্তী কবিতার মতো مبالغه বা আতিশয্য রয়েছে। যার ভিত্তিতে কবিতাটিতেও قلب গ্রহণযোগ্য। কবি উটনীর স্থূলতার আতিশয্য বুঝানোর জন্য এই কলবটি করেছেন। অর্থাৎ যেমনটি লেপন তার স্থূলতা এবং আধিক্যে এত বড় হয়ে গেছে যে, তা আসলের (প্রাসাদের) মতো হয়ে গেছে এবং প্রাসাদ হয়েছে লেপনের মতো। এমনিভাবে উটনী স্থূলতা হয়ে গেছে, মূল আসল উটনী হয়ে গেছে স্থূলতার স্থানে। আর এটা তো সুস্পষ্ট যে قلب করার দ্বারা এই আতিশয্য বুঝানো সম্ভব। সাধরণভাবে طَيَّنْتُ الْفِدَنَ بِالسِّيَاعِ বলার দ্বারা আতিশয্য পাওয়া যায় না। এভাবে বললে অবশ্য قلب -এর একটি বিশেষ তাৎপর্য পাওয়া যায়, যার দ্বারা قلب বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ